বিপ্লবের সন্ধানে

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়



ডি এন. বি এ. ব্রাদার্স

৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৬০

প্রচ্ছদ
বিভূতি সেনগুপ্ত

ডিএনবিএ ব্রাদার্সের পক্ষে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াত খাঁ লেন, কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ॥

উৎসর্গ

শ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায়

ভাই জীবন,

আজ যখন আমার 'বিপ্লবের সন্ধানে' বই হয়ে বেরুচ্ছে, তখন বার বার সেই পুরাণো দিনগুলোর কথা মনে হচ্ছে, যেদিন তোমারই ডাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলুম,—আর তোমার পিছনে চলতে চলতেই আমার বিপ্লবের সন্ধান শুরু হয়েছিল। তাই বইখানা তোমার নামেই উৎসর্গ করলুম।

নারান

নিবেদন

বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে অবশেষে "বিপ্লবের সন্ধানে" সত্যাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল। কয়েক বছর আগে মাসিক বসুমতীতে বিপ্লবের সন্ধানে নাম দিয়ে আমার যে স্মৃতিকথা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, সেই বৃহৎ লেখাটাকে কেটে-ছেঁটে ছোট করে' কিছু সংশোধন ও পরিবর্ধন করে এ বইটা খাড়া করা হয়েছে। বস্তুত এ বইটাকে সেই লেখার সংক্ষিপ্তসার বলা যেতে পারে।

স্মৃতিকথা সাধারণত লিখে থাকেন নাম করা নেতৃস্থানীয় মহাজনেরা, যা থেকে দেশের লোক কিছু শিখতে পারে, আর সেইখানেই তার সার্থকতা। কিন্তু আমার মত সামান্য লোকের স্মৃতিকথা লেখার সখ কেন? সে বিষয়ে আমার কৈফিয়ৎ হচ্ছে এই যে,—আমার গৃহসংসার-ছাড়া, ছন্নছাড়া জীবনের প্রায় অর্ধশতাব্দী কালব্যাপী বিপ্লব-সন্ধানী জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেও দেশের লোকের জানবার ও শেখবার মত কিছু মাল-মশলা পাওয়া যাবে,—যে অভিজ্ঞতার কথা'ই এ বইটার মুখ্য অংশ। বস্তুত আমার ব্যক্তিগত জীবনের কথাগুলো আনুষঙ্গিক অংশ মাত্র।

আজ বাংলার লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী দেশকর্মী রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। কিন্তু এই বিশাল দেশের বিপুল বহুমুখী সমস্যার কতটুকু তারা বোঝে?—এ প্রশ্ন তাদের কর্ম ও ব্যবহারে বারবার মনে হয়। ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস তারা প্রায়শই জানে না, যে পরিপ্রেক্ষিতে ছাড়া বর্তমান যুগের সমস্যাবলীর সঠিক উপলব্ধি অসম্ভব। তা ছাড়া সে ইতিহাস জানার উপায়ও তাদের নেই—স্বার্থপ্রণোদিত বিভ্রান্তিকর প্রচারের বিপুল বন্যাপ্রবাহের সম্মুখে তারা নিরন্তর দিশেহারা হয়।

'বিপ্লবের সন্ধানে' বইটা থেকে তারা সে ইতিহাসের একটা পূর্বাপর সুসম্বদ্ধ ধারাবাহিক 'ছক' পাবে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটা মনে রাখা দরকার যে, এরকম বই সে ইতিহাসের একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র—বস্তুত তার মালমশলা সংগ্রহই এরকম বইয়ের কাজ। আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে আরো অনেকের অনেক অভিজ্ঞতার সমবায়ে ভবিষ্যতে একদিন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিত হবে। এ বইটা আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ফল মাত্র।

এ বইটার বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে একদিকে যেমন স্বদেশী আন্দোলন, সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা, কংগ্রেসের অহিংস স্বাধীনতার সংগ্রাম, কমিউনিস্ট গণবিপ্লবের আন্দোলন, নিছক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, আজাদ হিন্দ আন্দোলন ও বিপ্লব প্রচেষ্টা, "আগষ্ট বিপ্লব" ও আপোষপন্থী সংগ্রাম, পাকিস্তান আন্দোলন ও দেশবিভাগ, স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়ন, বৃটিশ আইনসিদ্ধ রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ভারতের আভ্যন্তরীণ বিকাশের ধারা দেখানো হয়েছে,—সঙ্গে সঙ্গে দেখানো হয়েছে এর সমান্তরাল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিকাশের ধারা, এবং এই দুই ধারার ঘাত-প্রতিঘাত।

সমগ্র বিষয়টা এত ব্যাপক ও জটিল যে কিছু ভুলচুক থাকা খুবই স্বাভাবিক। তবে আমি আশা করি, বৃহৎ ব্যাপার সম্পর্কে কিছু ভুল থাকবে না। ছোটখাটো ব্যাপারে কিছু ভুল হয়ত থাকতে পারে, বিশেষত বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি সংক্রান্ত ব্যাপারে, যে ব্যাপারগুলো হান্টার-মার্কা ঐতিহাসিকের এলাকার বহির্ভূত, এবং যে ব্যাপার সংক্রান্ত বহু তথ্যের ভিত্তি বিপ্লবী নেতাদের মুখের কথা। এক্ষেত্রেও একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, একই বৃহৎ ঘটনা সম্পর্কে একাধিক বিপ্লবী নেতার ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ—বস্তুত এক্ষেত্রে ভুলচুক সম্পূর্ণরূপে এড়ানো প্রায় অসম্ভব। এমন কি, সরকারী সিডিশন কমিটির রিপোর্টও ভুলশূন্য নয়,—যে রিপোর্ট রচিত হয়েছে "প্রায় আড়াইশো স্বীকারোক্তির সাহায্যে।" এখানে আর একটা কথাও স্মরণ রাখা দরকার—এ বিষয়ে লেখা কারো বইই ভুলশূন্য নয়,—আর ভুল সম্বন্ধে মতভেদও আছে।

তারপর সত্যভাষণের কথা। সত্য কথা বলা বিপজ্জনক—সরকারী অনুশাসনে সত্য কথা অনেক ক্ষেত্রেই সিডিশন, আর সামাজিক অনুশাসনে হাফ-সিডিশন—সত্যং ব্রুয়াৎ, প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। এ অনুশাসন মেনে চলতে গিয়ে অনেকেই অপ্রিয় সত্যকে একটু মিথ্যার ভেজাল মিশিয়ে প্রিয় করে পরিবেশন করে থাকেন।

বস্তুত সত্য কথা প্রায়শই অপ্রিয় হয়ে থাকে, কারণ কোন ভক্তিভাজন ব্যক্তিই দোষত্রুটিশূন্য নন, আর কায়েমী স্বার্থের কল্যাণে বারোমাস মিথ্যা প্রচারের জন্যে প্রচুর অর্থব্যয় করা হয়ে থাকে। বিশেষত এই কারণে অনেক অপ্রিয় সত্যকথা বলা দেশের কল্যাণের জন্যেই একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু লোকচক্ষে অপ্রিয় হওয়ার ভয়ে অনেকে সজ্ঞানে সত্যভাষণে বিরত থাকেন। ফলে মিথ্যা মিষ্টি কথাই হয়ে দাঁড়িয়েছে জনপ্রিয়তা অর্জনের সর্বপ্রধান কৌশল। আর এ কৌশলের ব্যাপক প্রতিযোগিতায় দেশ রসাতলে যেতে বসেছে।

তাই আমি আমার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতায় যা সত্য বলে বুঝেছি, যত অপ্রিয়ই হোক, অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রকাশ করেছি আমার এই স্মৃতি কথায়। এর জন্যে আমি বহুলোকের কাছে অপ্রিয় হওয়ার দায়িত্বও নিয়েছি সজ্ঞানে। আমি জানি, আমি যদি ১০ জনের প্রাণে ব্যথা দিয়ে থাকি, তাহলে অন্তত ১০টা গোষ্ঠী আমার নিন্দা করবে। কিন্তু যে সব কথা বলা একান্ত দরকার, অথচ কেউ বলে না, তা যদি বলতে পেরে থাকি, তাহলে সেটাই হবে আমার পরম সান্ত্বনা।

পরিশেষে বক্তব্য, এ রকম বই প্রকাশের বাধা অনেক। আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকুণ্ঠ আনুকূল্য ভিন্ন এ বই প্রকাশিত হওয়া দুরূহ হত। এই স্বীকৃতির পর ধন্যবাদ অপ্রয়োজনীয়।

গ্রন্থকার

বিপ্লবের সন্ধানে

এক

বাংলার অন্যতম প্রবীণ জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী নেতা ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' নামক পুস্তকের একস্থানে অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদরঞ্জন চৌধুরীর ফাঁসির বিবরণ উপলক্ষে আমার মতন একজন নগণ্য কর্মীর নাম উল্লেখ করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। আমার আগে আরো যাঁদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারতো, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই নাম তিনি উল্লেখ করেন নি। তাছাড়া তিনি তাঁর বইয়ে অনেক খুচরো খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় কথাও বাদ দিয়েছেন,—হয়ত বইটাকে সংক্ষিপ্ত করার জন্যেই,—যেসব কথার মধ্যে জ্ঞাতব্য, চমৎকার কথাও আছে প্রচুর।

বইখানা পড়তে পড়তে আমার তখনকার দিনগুলোর কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক আনুষঙ্গিক এবং প্রাসঙ্গিক কথা মনে পড়তে লাগলো,—স্মৃতির পুরানো ভাণ্ডারের কোণায় কোণায় অব্যবহার্য ডেয়ো-ঢাকনার মতন বহুদিন অনড় অবস্থায় পড়ে থেকে যেগুলো 'ছাতা পড়ে' প্রায় উহ্য হয়ে এসেছিল। ঐ ফাঁসির মামলা সম্পর্কে আমার নাম নিয়ে একটু মনোহারী একটা ঘটনাও মনে পড়ে গেল,—আর এখানে আমি সেইটুকু উপলক্ষ করে আমার এই স্মৃতিকথা মাঝপথ থেকেই শুরু করলুম।

'যাদুদা'র সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ১৯১৫ সালের শেষ বা '১৬ সালের প্রথমে,—জার্মান ষড়যন্ত্র ও প্রথম বিপ্লব প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যাওয়ার পর। তখন 'দাদা'—'বাঘা যতীন'—বালেশ্বরে বুড়ী-বালামের তীরে প্রথম বাঙ্গালী বিপ্লবী দলের ট্রেঞ্চ-যুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস রচনা করে বৃটিশ সরকারের গুলীতে চিত্তপ্রিয়-মনোরঞ্জনের সঙ্গে নিহত হয়েছেন। বাঙ্গালার বিপ্লবী জগতে একটা মর্মান্তিক চাপা শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিপ্লব প্রচেষ্টার অন্যতম নেতা রাসবিহারী বসু পালিয়েছেন জাপানে। দাদার অন্যতম সহকারী নরেন ভট্টাচার্য 'সি. মার্টিন' রূপে ব্যাঙ্কক থেকে জাপানে এবং তারপর আমেরিকায় পালিয়েছেন (পরবর্তী কালে যিনি রুশিয়ায় গিয়ে এম. এন. রায় রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন)। অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া, হুগলী), যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), অতুল ঘোষ (কুষ্টিয়া, নদীয়া), সতীশ চক্রবর্তী (খুলনা), পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (নদীয়া), নলিনী কর (নদীয়া) এবং ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা) এই সাতজন নেতা ফেরারী বিপ্লবী,—গোয়েন্দা সর্দার টেগার্ট এঁদের খুঁজে বার করার জন্যে সারা দেশ তোলপাড় করে বেড়াচ্ছেন। এছাড়া আরো অনেক পলাতক বিপ্লবী যুগান্তর এবং অনুশীলন দুই দলেরই, দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে।

এই অবস্থার মধ্যে হঠাৎ একদিন আমার এক সতীর্থ 'যাদুদা'কে পৌঁছে দিয়ে গেল আমাদের টালার বাড়ীতে। বাড়ীটার সম্মুখের অংশের প্রবেশদ্বার, বড় রাস্তার ওপর, সে অংশটা বরাবর ভাড়া দেওয়া থাকতো; আর পিছনের অংশের প্রবেশদ্বার পাশের গলির মধ্যে, সেই অংশে আমরা বাস করতুম। ভিতর-বাড়ী থেকে বার-বাড়ীতে আসা যেত একটা সরু গলিপথ দিয়ে। সে সময়ে বার-বাড়ীটা খালি ছিল, এবং সদর দরজায়

ছিল তালা লাগানো। পলাতকদের থাকার পক্ষে সে ছিল চমৎকার জায়গা। পুলিসের তাড়ার মুখে এমনি কেউ কেউ পলায়নের প.. ..-এক দিনের জন্যে সেখানে আশ্রয় নিতো। আমি তাদের ভিতর-বাড়ী দিয়ে নিয়ে আসতুম এবং দ্বার রুদ্ধ করে দিতুম।

এই ভাবেই একদিন যাদুদা এলেন, একমুখ চাপদাড়ি, চুলগুলো বড় হয়েছে, সাধারণ বাঙ্গালীর পোশাক। প্রাথমিক কথাবার্তার পর তাঁর পথপ্রদর্শক বিদায় হলে তিনি আমাকে বললেন, তুমি ..ক একটা কাজ করতে পারবে? তখনও আমার প্রথম রোমাঞ্চ কাটেনি, আমি তাঁর কাজে লাগার আনন্দে উৎসাহিত হয়ে বললুম, কি? তিনি একটু মৃদু হাসিমুখে বললেন, আমার মাথার চুলগুলো কোনরকমে একটু ছেঁটে কমিয়ে দিতে পার? তুমি যা পার, তাতেই হবে।

হরি হরি! কিন্তু দরকারী কাজ মাত্রেরই মর্যাদা যে সমান, এই কথাটার অন্তর্নিহিত সত্য সেদিন প্রথম অনুভব করলুম, এবং সাগ্রহে ও সপ্রতিভ ভাবে বললুম, খুব পারবো। তারপর একখানা কাগজকাটা কাঁচি নিয়ে যাদুদা'কে ছাতে নিয়ে গিয়ে সাবধানে সেই প্রথম যে চুল ছাঁটলুম, তা নেহাত নিন্দের নয়। সন্ধ্যার সময় যাদুদা যখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন, তখন তিনি দিব্যি একজন লুঙ্গীপরা মৌলবী সাহেব।

১৯১৬ সালের স্বনামধন্য গোয়েন্দা নেতা, যিনি স্বয়ং টেগার্ট সাহেবেরও গুরু বলে পরিচিত, সেই বসন্ত চাটুজ্যে বিপ্লবীদের গুলীতে নিহত হওয়ার পর যখন বিপ্লবীদের ঝাড়ে-বংশে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হল, তখন আমিও ঝাঁকের মধ্যে আটকা পড়ে গেলুম, এবং বিনা বিচারে অন্তরীণ হলুম। তিন বছর অন্তরীণ থাকার পর '১৯ সালের শেষে যখন ছাড়া পেলুম, তখন বাংলার আকাশ-বাতাসে একটা থমথমে ভাব, প্রকাশ্য বা গুপ্ত কোন আন্দোলন নেই, বৈপ্লবিক ঝঞ্ঝা তখন দ্বিতীয় বার নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে পাঞ্জাবে, অমৃতসর জালিয়ানওয়ালাবাগে।

সুতরাং আমি একটা বিপ্লব লাগিয়ে দিলুম বাড়ীতে—পৈতৃক বাড়ী বেচে ফেললুম, এবং বরাহনগরে এক বাড়ী ও সিঁথিতে একটু জমি কিনে, বাকী টাকায় ব্যবসা শুরু করে দিলুম, ১৯২০ সালে।

সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবের ঢেউ আসার বাংলাকে নাড়া দিলে। '২০ সালের সেপ্টেম্বরে আমেরিকা থেকে সদ্য-প্রত্যাগত লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হল, এবং সেখানে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব পাস হল। ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেসে নতুন গঠনতন্ত্রে দেশজোড়া কংগ্রেস সংগঠনের কার্যক্রম গৃহীত হল। দেশবন্ধু বাংলার আন্দোলনের নেতৃত্ব নিলেন। ইতিমধ্যে মন্টেগু-চেম্সফোর্ড রিফর্মের কল্যাণে অমরদা-যাদুদা প্রভৃতির ওপর থেকে ওয়ারেন্ট তুলে নেওয়া হয়েছে, শত শত মুক্ত বিপ্লবী কর্মী ফিরে এসেছে। দেশবন্ধু তাঁদের ডাক দিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের 'এক বছরে স্বরাজ' প্রোগ্রামটাকে তোমরা একটা চান্স দাও, কংগ্রেসে যোগ দাও। যুগান্তর দলের নেতারা ডাকে সাড়া দিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন। দেশবন্ধু একদল আত্মভোলা 'রেডিমেড' কর্মী পেয়ে গেলেন। অসহযোগ আন্দোলন এগিয়ে চললো।

ঢাকের বাদ্যি শুনলে গাজুনে পিঠ চড় চড় করে ওঠে। একবার একটু ভেবে নিয়ে, কাঁদা ব্যবসা তুলে দিয়ে দুর্গা বলে ঝুলে পড়লুম। দাদাদের নেতৃত্বে কংগ্রেস সংগঠনের

মারফত বৈপ্লবিক সংগঠনের নেশায় মেতে উঠলুম। এক বছরে অহিংসা আর চরকার জোরে স্বরাজ হবে, এই আজগুবী কথাটা মনে মনে একটা ব্যাখ্যা করে নিয়েছিলুম এই যে, এক বছর অনন্ত মনে খেটে ন্যাশান্যাল স্কুল-কলেজ-আদালত প্রভৃতি তৈরি করে নিয়ে খাজনা বন্ধ করে স্বরাজ ঘোষণা করে দেওয়া হবে, আর স্বরাজ ঘোষণার পর কংগ্রেসের অহিংসা নীতির অবসান হবে, লাগবে একটা সশস্ত্র লড়াই ইংরেজের সঙ্গে, এই ভাবেই আমাদের বিপ্লব আসবে। তারপর কি হবে, সেটা জানেন দাদারা।

মহাত্মাজীর যে এই রকমই একটা প্ল্যান আছে, না হলে একটা আক্কেলওয়ালা লোক সজ্ঞানে অমন আজগুবী কথা যে বলতে পারে না, আমার তখন পর্যন্ত এই রকম ধারণাই ছিল। আমার এক সিনিয়র সহকর্মী (বিক্রমপুরের জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়) ছিলেন আমার চেয়ে সব বকমেই পাকা; তিনি বলতেন মহাত্মাজী খাঁটি জাতকাট খাটমল-খিলানেওয়ালা, সশস্ত্র বিপ্লবের সব চেয়ে বড় শত্রু। শুনে তখন পর্যন্ত আমার প্রাণে ব্যথা লাগতো।

যাই হোক, ঘরের খেয়ে দিন-রাত চরকার পাক আর চরকী-পাকে দিন কাটতো, সুতরাং হাতের টাকা ফুরোতে দেরি লাগলো না, এবং শেষ পর্যন্ত বাড়ী-জমি বন্ধক দিয়ে টাকা সংগ্রহ করতে হল। বিপ্লব করে দেশ স্বাধীনও করবো, আর বাড়ী-ব্যবসা-টাকার পুঁটলিও অক্ষত থাকবে, এ তো এক বছরে স্বরাজের চেয়েও আজগুবী কথা। এ যুগের মত দেশ-সেবা করে বড়লোক হওয়ার রেওয়াজ তখন ছিল না, বরং যে দু-এক জন সে চেষ্টা করেছে, তাদের দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বলে গুলী করে মারারই রেওয়াজ ছিল। অবশ্য দু-একজন যে ফস্কেও যায়নি, তা নয়।

সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া টাকা নিয়ে বেশ কিছুদিন স্বদেশী হাঙ্গামায় মশগুল থাকলুম প্রেমানন্দে। তারপর '২৪ সালের শেষে ৩নং রেগুলেশনে একদিন জেলে চলে গেলুম। স্বরাজের সবখানিই বাকি থেকে গেল।

'২৫ সালের শেষে যখন মেদিনীপুর জেলে বদলি হয়ে যাদুদা'র সঙ্গে দেখা হল, তখন আমার মহাজন সুদে আসলে ১৬,০০০ টাকার দাবিতে আমার নামে মামলা ঠুকেছেন। আমি কোর্টে হাজির হওয়ার অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত করি, আর কর্তারা দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন। এমনি ভাবে কিছুদিন চলার পর '২৬ সালের শেষ দিকে দয়াময়েরা আমাকে আলিপুর সেনট্রাল জেলে বদলি করলেন, যাতে আমার মামলার তদ্বিরকারক আমার সঙ্গে জেলে দেখা করে উপদেশ নিতে পারেন। এখানেও আমার অনেকগুলো দরখাস্ত উপরোক্ত ভাবে নামঞ্জুর হল। আমার কোর্টে হাজির হওয়া কিছুতেই হল না।

ইতিমধ্যে যাদুদা'ও আলীপুর জেলে বদলি হয়ে এসেছিলেন। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার আসামীরাও সেখানেই কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন।

জেলের ফটকের ভিতরের প্রধান রাস্তা থেকে একটা গলিপথ বেঁকে এসে আমাদের স্টেট ইয়ার্ডের দরজায় শেষ হয়েছে। গলির একপাশে দুটো জেল-হাজতী ইয়ার্ড এবং ফাঁসির ইয়ার্ড, আর একপাশে গুদাম, খানিঘর এবং দক্ষিণেশ্বর ইয়ার্ড। আমাদের ইয়ার্ডের দরজা থেকে গলিতে বেরোলেই কয়েক ফুট তফাতে একদিকে দক্ষিণেশ্বর ইয়ার্ডের একটা দরজা এবং তার বিপরীত দিকে ফাঁসির ইয়ার্ডের দরজা। তিনটে দরজাই সব সময় বন্ধ

থাকে। ফাঁসি ইয়ার্ডে সেল খালি বলে দরজায় কোন পাহারা নেই, দক্ষিণেশ্বর ইয়ার্ডের দরজার ভিতরে একজন দেশী ওয়ার্ডার পাহারা থাকে, তার হাতে থাকে দরজার চাবি। আর আমাদের ইয়ার্ডের দরজার ভিতরে একখানা টেবিল ও চেয়ার নিয়ে বসে পাহারা দেয় একজন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার, চাবি হাতে নিয়ে।

দক্ষিণেশ্বরের অপর পাশে পুরানো বম্ব ইয়ার্ডে তখন আন্দামান ফেরত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীরা থাকেন। তার মধ্যে শিবপুর ডাকাতি মামলার নরেন ঘোষচৌধুরী, ভূপেন ঘোষ, এবং রাজাবাজার বোমার মামলার অমৃত হাজরা ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের পিছনে এবং আমাদের পাশের দিকে ইউরোপীয়ান কয়েদীদের ইয়ার্ড।

দক্ষিণেশ্বর ও বম্ব ইয়ার্ড এবং ইউরোপীয়ান ইয়ার্ডের বন্দীরা প্রত্যেকে পৃথক সেলে থাকেন এবং সন্ধ্যা হলেই নিজ নিজ সেলে তালাবন্ধ হন। আমাদের ইয়ার্ডে বেশ বড় চৌহদ্দির মধ্যে দোতলা ব্যারাকঘর, এক এক তলায় ৮।১০ জন করে রাজবন্দী একসঙ্গে থাকেন, এবং সে ব্যারাকঘরের দরজায় তালা পড়ে রাত ন'টার সময়।

দিনের বেলা দক্ষিণেশ্বর ও বম্ব ইয়ার্ড এবং ইউরোপীয়ান ইয়ার্ডের পাহারার চার্জে থাকে একজন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার, এবং সে-ই কয়েদীদের সেলে বন্ধ করে। তারপর রাত্রে পাহারা দেয় দেশী ওয়ার্ডারেরা এবং কয়েদী নাইট-ওয়াচম্যানেরা।

আমাদের ইয়ার্ডের দোতলার বারান্দায় দাঁড়ালে ফাঁসির ইয়ার্ডের সবখানিই পরিষ্কার দেখা যায়, দুই ইয়ার্ডের মাঝে আছে একটা ফুট আষ্টেক উঁচু দেওয়াল মাত্র। আর দক্ষিণেশ্বর ইয়ার্ডের দোতলার বারান্দার কোণায় এসে ওরা দাঁড়ালে আমাদের বারান্দা থেকে কথাবার্তাও চলে।

তখন গোয়েন্দা বিভাগের ডি আই জি ছিলেন লোম্যান, আর তাঁর নীচেই আসল বড়কর্তা, বসন্ত চাটুয্যের পদের উত্তরাধিকারী, ভূপেন চাটুয্যে, যাঁকে হত্যা করার দায়েই অনন্তহরি-প্রমোদরঞ্জনের ফাঁসি হয়েছিল। তিনি ছিলেন রায়বাহাদুর।

তিনি তখন মাঝে মাঝে রাজবন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। জেলগেটের অফিসে বসে দু একজন রাজবন্দীকে একে একে ডেকে পাঠাতেন, এবং কুশলপ্রশ্নের পর একটু গল্পগাছা করে চেষ্টা করতেন তাঁর কোন প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে একটু আধটু হদিশ সংগ্রহ করতে।

রাজবন্দীরা সরকারের কাছে সরাসরি কোন দরখাস্ত করলে সেগুলো সবই নাকচ হত, এবং রায়বাহাদুরকে সে কথা বললে, তিনি পরামর্শ দিতেন আর একখানা দরখাস্ত দিতে, আই-বির ডি আই জির মারফত। সেভাবে দরখাস্ত দিলে তার সুফল পাওয়া যেত। আমার মামলা সম্পর্কে অবশ্য এরকমের কোন সৌভাগ্য আমার হয়নি।

যাই হোক, সুফল দানের এই সুব্যবস্থা করে রায়বাহাদুর রাজবন্দীদের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত করেছিলেন, তার সুফলও ক্রমে দেখা দিতে শুরু করলো। রায়বাহাদুর গেটে এসেছেন শুনলেই কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে ইয়ার্ড থেকে খবর পাঠাতেন এবং তখন তিনি ডেকে পাঠাতেন। অবশ্য এরকম কাণ্ড সকলেই করতেন না, বলাই বাহুল্য।

দেখাসাক্ষাৎ বেশ সহজ ও চালু হওয়ার পর ক্রমে রায়বাহাদুর স্বয়ং আমাদের ইয়ার্ডে

পায়ের ধুলো দিতে শুরু করলেন। কোন অফিসার জেলের মধ্যে এলে জেল-কানুনের নিয়মে তাঁর দেহরক্ষী হিসেবে একজন ওয়ার্ডারকে সঙ্গে পাঠানো জেল-অফিসারদের ডিউটি। প্রথম প্রথম রায়বাহাদুরের সঙ্গে এমনি দেহরক্ষী ওয়ার্ডার থাকতো। শেষ পর্যন্ত রায়বাহাদুর দেহরক্ষী সঙ্গে নিতে চাইতেন না, একাই আসতেন। ঘটনাচক্র যেদিন নতুন পথে ঘুরলো, সেদিনও তিনি আমাদের ইয়ার্ডে একাই এসেছিলেন, অনুশীলন পার্টির নেতা অসুস্থ নরেন সেন ওরফে রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীকে দেখতে।

দক্ষিণেশ্বর ইয়ার্ডের বন্দীরা তাদের দোতালার বারান্দায় বসে গলিপথে রায়বাহাদুরের যাতায়াত দেখতো এবং হয়ত বা কেউ গান ধরে দিতো—'তোরে নেয় না কেন যম।' তরুণদের এইসব তারুণ্য গায়ে মাখার মতন কাঁচা লোক তো রায়বাহাদুর নন। বরং হয়ত তিনি আশা করতেন, এদের মধ্যে কেউ হয়ত ক্রমে একদিন দরখাস্ত নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইবে, এবং তিনি বাধিত করে তাদের সঙ্গেও খাতির জমাতে পারবেন।

সেদিন ঘটনাটা শুরু হল ঠিক সেই ভাবেই। তিনি যখন আমাদের ইয়ার্ড থেকে বেরিয়েছেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা।

হাজতী ইয়ার্ডের দোতলায় তালা লাগাতে যাচ্ছে দেশী ওয়ার্ডার, আর ইউরোপীয়ান ইয়ার্ডের দোতলার সেলগুলো বন্ধ করছে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার। তাদের বন্ধ করার পর সে দক্ষিণেশ্বরওয়ালাদের বন্ধ করবে। তারা তখনও দোতলার বারান্দায় বসে আছে।

আমাদের ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার রায়বাহাদুরকে বার করে দিয়ে তখন দরজায় চাবি দিয়েছে ভেতর থেকে। তার পরই দক্ষিণেশ্বরের বারান্দা থেকে কেউ রায়বাহাদুরকে ডেকেছে 'একটু কথা কইতে চাই' বলে। এতদিনে বুঝি সুযোগ এল ভেবে রায়বাহাদুর ওদের দরজায় টোকা মেরেছেন এবং ভিতর থেকে দেশী ওয়ার্ডার চাবির ফুটো দিয়ে রায়বাহাদুরকে দেখে দরজা খুলে দিয়ে সেলাম করেছে।

সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর থেকে বন্দীদের কেউ বেরিয়ে এসে এক শাবলের বাড়িতে রায়বাহাদুরকে ধরাশায়ী করেছে, তিনি একবার টুঁ শব্দ করতে পারেন নি। কানের ওপর দিয়ে শাবলখানা মাথার হাড়গোড় ভেঙ্গে চৌচাপটে বসে গেছে, একটা চোখ একেবারেই বেরিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ এই বীভৎস কাণ্ড দেখে স্তম্ভিত ওয়ার্ডারের ধাত ছেড়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে, সে হাতের বাঁশীটা বাজাতেই ভুলে গেছে। হাজতীদের দোতালা থেকে ওয়ার্ডারের নজরে পড়েছে গলিপথে বুঝি কেউ কাউকে মারছে। দেখেই সে রেওয়াজ মাফিক পাগলা ঘন্টির নির্দেশক ঘনঘন হুইস্‌লের আওয়াজ ছেড়েছে। তখন দক্ষিণেশ্বরের ওয়ার্ডারের হুঁশ হয়েছে-এবং সে-ও বাঁশী বাজিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সারা জেলে বাঁশীর আওয়াজের সঙ্গে গেটে পাগলা ঘন্টি বেজে উঠেছে।

পাগলা ঘন্টি বাজলেই বাইরের গারদ থেকে সকল ওয়ার্ডার ও জমাদারকেই সশস্ত্র হয়ে ছুটে এসে জেলে ঢুকতে হয়। যে যেমন অবস্থায়ই থাক, তাকে ছুটে আসতেই হবে। হয়ত বা কেউ রুটি বেলতে বেলতে বেলুন নিয়েই ছুটে আসে, হয়ত কেউ পায়খানার ঘটি হাতেই ছুটে আসে। সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ সশস্ত্র পুলিসের ফাঁড়ি থেকে একদল সশস্ত্র পুলিস এসে জেলখানা ঘিরে ফেলে। সকলে সব সময় সজাগ আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্যে

মাঝে মাঝে হঠাৎ পাগলা ঘণ্টি বাজানো হয়, এবং কেউ অনুপস্থিত থাকলে গাফিলতির জন্যে তাকে সাজা দেওয়া হয়।

কিন্তু কয়েদীদের যখন প্রায় বন্ধ করা হয়ে গেছে, তখন পাগলা ঘণ্টি, এবং গলির বাঁশীটা যেন একটু হুড়োহুড়ি করে বাজছে,—শুনে সকলেরই মনে হয়েছে, একটা কোন বড় রকমের কাণ্ডই ঘটেছে। যে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার ইউরোপীয়ান কয়েদীদের বন্ধ করছিল, সে বারান্দার কোণায় ছুটে এসেছে, সঙ্গে দুজন কয়েদীও এসেছে। তারা গলির দিকে উঁকি মেরে দেখে তাড়াতাড়ি ফিরে গেল। সেই ওয়ার্ডারই সেই কয়েদীদের বন্ধ করে দক্ষিণেশ্বর ইয়ার্ডে এল এবং সকলকে নিজ নিজ সেলে হাজির দেখে সেল বন্ধ করে ফেললে।

পাগলা ঘণ্টি পড়লে আমাদেরও বন্ধ হতে হয়। আমরা কয়েকজনে তখন ব্যাডমিণ্টন খেলছিলুম, বিরক্ত হয়ে ঘরে ফিরলুম এবং আসার পথে দেখলুম, আমাদের ওয়ার্ডার চাবির ফুটো দিয়ে দেখছে। আমিও এগিয়ে গিয়ে তাকে ঠেলে একবার দেখলুম, রায়বাহাদুর গলিতে পড়ে আছেন। ওয়ার্ডার ব্যস্ত হয়ে বললে, চল চল। তার সঙ্গে এসে ঘরে বন্ধ হলুম। সকলে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি? সে শুধু 'রায়বাহাদুর' উচ্চারণ করে ইশারায় বুঝিয়ে দিলে, কাত। পরে দেখে আবার এসে বলে গেল, বোধ হয় শেষ।

সে গিয়ে দরজার পাশের চেয়ারে চুপ করে বসলো। মুখে ভয় ও দুশ্চিন্তার ছাপ। দেখতে দেখতে গলিতে ভিড় হয়ে গেল,—জেলের কর্মচারী এবং সশস্ত্র পুলিস, আর বোধ হয় গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন। একটু পরেই আমাদের ইয়ার্ডে হন্তদন্ত হয়ে এসে ঢুকলেন স্বয়ং লোম্যান সাহেব একাই, এবং যাদুদা'র সঙ্গে কথা কইতে কইতে বার বার বলতে লাগলেন, ওঃ, তারা কেন আমাকে মারলে না!

লোম্যান যাওয়ার একটু পরেই ওয়ার্ডার এসে খবর দিলে, আই বি অফিসারেরা আমাদের ইয়ার্ড সার্চ করতে চেয়েছিল, কিন্তু সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কাপ্টেন মালেয়া অনুমতি দেননি। ওয়ার্ডারের মুখে স্বস্তির আভাস। মালেয়া নাকি বলেছেন, ব্যাপারটা যখন আমাদের ইয়ার্ডের বাইরে ঘটেছে এবং ইয়ার্ডের দরজার ভিতরেই একজন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডারের পাহারা আছে, তখন তিনি এ ইয়ার্ডকে কিছুতেই জড়াতে দেবেন না। লোকটা অসাধারণ!

যাই হোক, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী দুজন মাত্র: (১) দক্ষিণেশ্বরের ওয়ার্ডার—সে এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে, তার পক্ষে কে কি করেছে বলা অসম্ভব।

আর (২) হাজতী ইয়ার্ডের ওয়ার্ডার—সে দূরের দোতলা থেকে দেখেছে, তার পক্ষে লোক চেনা অসম্ভব।

কিন্তু ফাঁসি কয়েক জনকে দিতেই হবে! কাজেই কোর্টে ওদের ওয়ার্ডার সাক্ষী দিলে,—অনন্তহরি চাবি কেড়ে নিয়ে দরজা খুলেছে, প্রমোদ মেরেছে, আর বীরেন ব্যানার্জি ওদের সাহায্য করেছে। স্বয়ং রায়বাহাদুর চাবি খুলতে বললে হুকুম অমান্য করতে সে পারে না, অথচ কাজটা বে-আইনী। ওয়ার্ডার বেচারী ফ্যাসাদে পড়ে মিথ্যা সাক্ষী দিলে, আর তাকে সমর্থন করে মিথ্যা সাক্ষী দিলে দুজন পূর্বোক্ত ইউরোপীয়ান কয়েদী, আর একজন মুসলমান কয়েদী, যে আমাদের শখের বেতবোনা শেখাতে আসতো এবং ঘটনার অনেক আগেই চলে গেছে। এই কয়েদীগুলোকে দণ্ড মকুব করে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

বিচারে প্রথমে তিন জনেরই ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। পরে আপীলে অনন্তহরি ও প্রমোদরঞ্জনের ফাঁসির হুকুম বহাল রইলো, আর বীরেন ব্যানার্জির ফাঁসির হুকুম রদ হয়ে হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

এই আপীলের মামলার সময় বিচারক জজ র‍্যাঙ্কিন, পাবলিক প্রসিকিউটর নগেন ব্যানার্জি এবং আসামী পক্ষের উকিল শৈলেশ বিশী ও মন্মথ সরকার অকুস্থল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তাঁরা যখন আমাদের বারান্দার সামনে এসেছেন, তখন সংবাদপত্রে একটু প্রচারের মতলবে উকিলদের লক্ষ্য করে আমি চেঁচিয়ে বললুম, এদের বিচারের একটা নমুনা দেখে যান। আমার একটা সিভিল সুট এক বছরের ওপর ঝুলছে, আমাকে কিছুতেই কোর্টে হাজির হতে দিচ্ছে না, আমার সব দরখাস্ত তারা বাতিল করেই চলেছে। উকিলরা একবার আমার চেনা মুখখানা দেখে নিয়ে গেল।

তারপর থেকে কাগজে মামলার খবর পড়ি আর নজর রাখি, আমার মামলার কথা কিছু কাগজে বেরুলো কি না। হঠাৎ একদিন দেখি যে, আসামী পক্ষের উকিলরা এক চমৎকার থিওরি খাড়া করেছে। স্টেট ইয়ার্ড ও ফাঁসির ইয়ার্ডের মধ্যেকার যুট আষ্টেক উঁচু পাঁচিলের ধারে একটা ছোট আমগাছ আছে, যার সাহায্যে স্টেট ইয়ার্ড থেকে ফাঁসির ইয়ার্ডে যাওয়া যায়, এইভাবে স্টেট ইয়ার্ড থেকে গলিতে এসে কেউ রায়বাহাদুরকে মেরে যেতে পারে। তেমন লোকও স্টেট ইয়ার্ডে আছে, নারান ব্যানার্জি। সরকার তার অনেক দরখাস্ত বাতিল করেছে, আর তার মধ্যে রায়বাহাদুরেরও হাত ছিল, এবং সেজন্যে রায়বাহাদুরের ওপর নারান ব্যানার্জির রাগ থাকাও স্বাভাবিক।

পড়ে বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করলুম, ফাঁকতালে রাতারাতি বেশ একটু হিরো হিরো ভাব। এই থিওরি নিয়ে জেলার রায়ান সাহেবকে বেশ লম্বা জেরা করা হয়েছে। জবাবে রায়ান বলেছে, নারান ব্যানার্জির দরখাস্ত বাতিল হওয়ার কথাটা ঠিক বটে, কিন্তু যেহেতু ঐ আমগাছটার কাছেই স্টেট ইয়ার্ডের দরজার পাশে সর্বদা একজন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার পাহারা থাকে, অতএব সেখান দিয়ে কারো পক্ষে ফাঁসির ইয়ার্ডে আসা সম্ভব নয়। তাছাড়া ফাঁসির ইয়ার্ড থেকে গলিতে আসাও অসম্ভব, কারণ দরজা সর্বদা তালাবন্ধ থাকে, এবং ডিঙ্গিয়ে আসারও কোন কায়দা নেই।

যাই হোক, আমরা আশা করতুম, ফাঁসির হুকুমগুলো নিশ্চয়ই রদ হবে। কিন্তু যখন দুজনের ফাঁসির হুকুম বহালই রইলো, তখন থেকে আমাদের মনের ওপর যেন একটা মেঘলা গুমোট ধীরে ধীরে জমাট বেঁধে উঠলো।

ওদের ওখান থেকে সরিয়ে একটা একতলা ছোট ইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এক সারি সেল। সকলে দিনরাত পৃথক পৃথক সেলে বন্ধ। সেলগুলোর সামনে দিয়ে একটা লম্বা রাস্তা মাত্র আছে, আর সে রাস্তায় দিনরাত সশস্ত্র ওয়ার্ডার পাহারা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। বাইরের দরজায়ও দিনরাত একজন জমাদার পাহারা আছে।

জায়গাটা আমাদের ইয়ার্ড থেকে বেশ খানিক দূরে। আমরা রাতে চীৎকার করে ওদের গান শোনাতুম, স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনাপূর্ণ গান। আমাদের তালাবন্ধ জগতে তখন আমি ছিলুম একজন গাইয়ে। পূজো এল, আমরা মতলব করলুম, কিছু ভাল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং ওদের অন্ততঃ একটা দিন কিছু খাওয়াতে হবে।

যাদুদা এবং বন্ধ-ইয়ার্ডের নরেন ঘোষ চৌধুরীর ব্যবস্থায় একদিন রাত দুপুরে মস্ত এক হাঁড়ি রসগোল্লা ইয়ার্ডগুলোর পাঁচিল ডিঙোতে ডিঙোতে চলে গেল ওদের ডেরায়, এবং ওদের সেলে সেলে রসগোল্লা পরিবেশনও হয়ে গেল সুশৃঙ্খলে। যতগুলো ওয়ার্ডার, কয়েদী ওয়ার্ডার, জমাদার, মায় বড় জমাদার পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ছিল, সবাই বন্ধু হয়ে গেল। কাপড়, তেল, সাবান, ও নগদ কিছু খরচও হয়ে গেল। আনন্দও হল।

ক্রমে ফাঁসির দিন এগিয়ে এল। আমরা দরখাস্ত করলুম, অন্য জেলে ফাঁসির ব্যবস্থা হোক। দরখাস্ত না-মঞ্জুর হল। আবার দরখাস্ত করলুম, ফাঁসির দিন আমাদের অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা হোক। সে দরখাস্ত মঞ্জুর হল না। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বললেন, আমরা কেউ ইচ্ছে করলে রাত্রে হাসপাতালে গিয়ে থাকতে পারি, কিন্তু সেখানে সকলের জায়গা হবে না। তখন আমরা পরামর্শ করে স্থির করলুম, সরকার যখন মনে করেছে, আমাদের সামনে ওদের ফাসি দিয়ে আমাদের ভয় দেখাবে, তখন আমরা এই বর্বরতার জবাব দোব এইখানে থেকেই। আমরা জয়ধ্বনি করবো, পুষ্পবৃষ্টি করবো, দেখাবো, আমরা ফাঁসি দেখে আরো সাহসই সঞ্চয় করেছি, তাদের বর্বরতা ব্যর্থ হয়েছে। এই উপলক্ষেই যাদুদা তাঁর বইয়ে আমার নাম উল্লেখ করেছেন। কারণ ঐ প্রস্তাবটা আমিই করেছিলুম।

ফাঁসির আগের রাত্রে সারারাত বন্দে মাতরম্ ধ্বনি এবং স্বদেশী গান চললো। ওরাও বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করে মাঝে মাঝে সাড়া দিয়ে চললো। আমরা প্রচুর ফুল সংগ্রহ করে তোড়া বেঁধে রেখেছি। ভোরবেলা ওদের স্নান করিয়ে নতুন পোশাক পরানো হয়েছে। এদিকে ফাঁসির মঞ্চের ওপর লোহার বীম বসিয়ে দড়ি খাটানো হয়েছে—এক ইঞ্চি মোটা ম্যানিলা রোপ, ডগায় একটা ফাঁস। পাশাপাশি দুটো দড়ি ঝুলছে। কিছু সশস্ত্র পুলিস নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন। আমরা দোতলার বারান্দার সামনের জানালায় জানালায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছি।

ওদের ওখান থেকে সমবেত কণ্ঠে আকাশ কাঁপিয়ে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি উঠলো। আমরাও সাড়া দিলুম। দেখতে দেখতে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি এগিয়ে এল নিকটে। তার পরের দৃশ্য অপূর্ব, অভাবনীয়।

পিছনদিকে হাতকড়ি লাগানো দুই জোয়ান দৌড়ে এসে লাফ দিয়ে মঞ্চে উঠে পাশা-পাশি দুই গহ্বরের ঢাকনির ওপর বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো—মুখে মুহুর্মুহুঃ বন্দে মাতরম্ ধ্বনি। আমরাও প্রতিধ্বনি করে চলেছি এবং জানালা থেকে পুষ্পবৃষ্টি করছি।

দেখতে দেখতে জল্লাদ এগিয়ে এসে ওদের মাথা-মুখ ঢেকে গলা পর্যন্ত টুপি পরিয়ে তার ওপর দড়ির ফাঁস এঁটে দিলে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মালেয়া রুমাল নেড়ে ইশারায় আদেশ দিয়ে চোখে রুমাল চাপা দিয়ে চলে গেলেন। জল্লাদ একটা হাতল টেনে দিলে, গহ্বরের ঢাকনি দুটো নেমে গেল। ওদের দেহ দুটো ঝপ করে গহ্বরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। দড়ি দুটো টান হয়ে ঝুলতে লাগলো।

সব শেষ হয়ে গেল। আমরাও যেন অবসন্ন হয়ে শয্যাগ্রহণ করলুম। বিরাট উত্তেজনার পর নেমে এল যেন এক বিক্ষুব্ধ নিস্তব্ধতা। নীরব কান্না ছিল সকলেরই চোখে। শুধু চট্টগ্রামের নির্মল সেন কেঁদেছিল মেঝেয় লুটোপুটি করে। প্রমোদ ছিল তার ছোট ভাইটির মতন।

তারপরের বিষণ্ন দিনগুলোর মধ্যে আমার সে যুগের চিন্তাধারা রূপ নিয়েছিল এক কবিতায়—এক পরম গৌরবমণ্ডিত শোকস্মৃতি-চিত্ররূপে।

অনন্ত-প্রমোদ

পরপদ-নিপীড়িত ভারতের মুক্তি
দুজনার এই শেষ উক্তি—
প্রলয়ের কালো মেঘ
ঘূর্ণী ঝটিকা বেগ
তাদের জীবন সাথে করেছিল চুক্তি—
ছিলনাকো তর্ক ও যুক্তি।

গলিত শবের এই শান্তির শ্মশানে
বসেছিল তারা শব-সাধনে—
প্রেতের অট্টহাসি
পিশাচের মায়ারাশি
টলাতে পারেনি সেই দৃঢ় শব-আসনে
ভারত-জননী-ধ্যান-মগনে।

মায়া মরীচিকা করি পদাঘাতে চূর্ণ
যখন সাধনা হল পূর্ণ—
সাধ হল দেখিবারে
জীবনের পরপারে
অচিন গোপন পুরে আছে কোন্ রত্ন
আঁধার জলধিতল মগ্ন।

মৃত্যুর ডাক শুনি উল্লাসে মত্ত
জীবনের সেই সার সত্য—
ছুটিয়ে লাফায়ে আসি
দাঁড়াইল পাশাপাশি
গলায় পরাতে ফাঁসি চির অভ্যস্ত
জল্লাদ কম্পিতহস্ত।

বন্দে মাতরম্ আনন্দে গাহিল
জননীর পদযুগ স্মরিল—
হাসি হাসি দুই বীর
গর্বোন্নত শির—
মৃত্যুর গহ্বরে ঝাঁপ দিয়া পড়িল
জয় রবে ত্রিভুবন ভরিল।

জননীর মান বেচে উদরের জন্য
এ জগতে যেই পাপী ঘৃণ্য—
তাদের শিক্ষা দিতে
নিজ প্রাণ ডালি দিতে
জননী-ভক্ত বীর নাহি হল ক্ষুণ্ন
ধন্য রে বীর তোরা ধন্য।

ছুটে আয় কে আছিস জননীর ভক্ত
ঢেলে দিতে হৃদয়ের রক্ত—
যারা আজ গেল চলে
অপূর্ণ কাজ ফেলে
ঐ ডাকে তাহাদের আত্মা অতৃপ্ত
ছুটে আয় জননীর ভক্ত।

*　　*　　*　　*

আমার নিজের মামলারও যথাসময়ে যবনিকাপাত হল অত্যন্ত মামুলী ট্রাজেডিতে, এক্সপার্টি ডিক্রী হয়ে। বন্দিদশা থেকে সেবার যখন মুক্ত হলুম, তখন সর্ববন্ধনমুক্ত হয়ে এসে দাঁড়ালুম একেবারে পরিষ্কার শানবাঁধানো ফুটপাথে।

দুই

১৯৫৮ সালের এক সন্ধ্যায় এসপ্লানেডে ডেকার্স লেনের মোড়ের কাছে রাস্তায় বিরাট ভিড় জমেছে, উদ্বাস্তু সত্যাগ্রহ, মহিলাদের পালা। রাজ্যপালের বাড়ীর গেটের সামনে অনেকগুলো খালি বাস দাঁড়িয়ে আছে, তার সামনে পুলিসের ব্যারিকেড, তারপর উদ্বাস্তু মহিলা-সত্যাগ্রহীর দল, অনেকের কোলে শিশুও আছে, অনেকখানি রাস্তা জুড়ে বসে বিচিত্র স্বরগ্রাম-সমন্বিত কলকাকলিতে নিযুক্ত।

"আগো সাতটা বাইজা গেল যে, কত রাইত করবা?" হঠাৎ নেতারা পুলিসদের জানিয়ে দিলেন, এইবার তাঁরা প্রস্তুত। মেয়েরা উঠে দাঁড়ালো। পুলিসদল দুদিকে সরে একটু রাস্তা করে দিলে। মেয়ের দল ব্যারিকেড ভেদ করে গিয়ে বাসে উঠতে লাগলো, এবং আগে উঠে বসবার জায়গা দখল করার জন্যে বেশ হুড়োহুড়ি চলতে লাগলো।

এক বাসের মধ্যে থেকে শোনা গেল, "আগো, তুমি ক্যান আইলা? তোমার স্নান কাইল আহনের কথা।"

কাজেই সার্জেন্টকে ডেকে বলা হল, আমারে নামাইয়া দেন, আমি কাইল আছুম। সার্জেন্ট অনেক ধস্তাধস্তি করে তাঁকে বাস থেকে নামিয়ে দিলে। তিনি ব্যারিকেডের এপারে চলে এলেন।

এই হল রাজনৈতিক সংগ্রামে পুলিসের হাতে গ্রেপ্তারের এক চিত্র। একটা মামুলী নিরীহ আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র।

১৯২১ সালের শেষ দিকে ১৪৪ ধারা অমান্য করে কংগ্রেসীসভা করা উপলক্ষে আর এক রকমের গ্রেপ্তার চলতো। কলেজ স্কোয়ারে সভা ঘোষণা করা হয়েছে। পুলিস স্কোয়ার থেকে লোক বার করে দিয়ে আগে থেকেই ফটক বন্ধ করে পাহারা বসিয়ে দিয়েছে এবং কলেজ স্ট্রীটে একলরি পুলিস ও প্রিজন-ভ্যান নিয়ে অপেক্ষা করছে।

হঠাৎ নির্দিষ্ট সময়ে চারি দিক দিয়ে রেলিং টপকে কতকগুলো লোক স্কোয়ারের মধ্যে ঢুকে পড়লো, এবং একজন এক বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিলে, চারি দিকে ঘিরে দাঁড়ালো একটা ছোট ভিড়। তারপর হঠাৎ লরি থেকে পুলিসের দল নেমে এসে স্কোয়ারে ঢুকে সভার ভিড়টাকে ঘিরে ফেললে, এবং তাদের টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে প্রিজন-ভ্যানে তুললে। গ্রেপ্তার হওয়াই প্ল্যান, কাজেই গ্রেপ্তারে রোমাঞ্চ নেই।

কিন্তু বিপ্লবের গোপন আয়োজনে যারা গা-ঢাকা দিয়ে ঘোরে, ডাকাতি, গোয়েন্দা খুন, বোমা-পিস্তলের জোরে ইংরেজকে তাড়িয়ে ভারত স্বাধীন করার ষড়যন্ত্রে যারা লিপ্ত, ধরা পড়লে যাদের প্রথমে একচোট ছ্যাচা, এবং তারপরে জেল-দ্বীপান্তর-ফাঁসি, কার ভাগ্যে কি ঘটবে কিছুই জানা নেই, তাদের যখন পুলিসের সঙ্গে প্রথম মোকাবিলা হয়, তার রোমাঞ্চটাকে লোমহর্ষকও বলা চলে।

পুলিসের সঙ্গে আমার এমনি প্রথম পরিচয় হয়েছিল, ইংরেজ রাজত্বে বৃটিশ পুলিসের হাতে নয়, ফরাসী রাজ্যে ফরাসী পুলিসের হাতে। ভয় নেই, যতটা ভাবছেন, ততটা কিছু নয়। আমি ফরাসী চন্দননগরের কথা বলছি। কিন্তু আমি তুচ্ছ হলেও চন্দননগর তুচ্ছ ভাববেন না—১৯১৫-১৬ সালের চন্দননগর ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অভিনয় করেছে। শহীদ কানাইলালের গৌরবময় পবিত্র স্মৃতিমণ্ডিত চন্দননগর! ৮

১৯১৬ সালের মার্চ মাসে একদিন উপর থেকে নির্দেশ এল, কিছু দিন বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে থাকতে হবে। প্রাথমিক উপদেশও পেলুম।

উপদেশ মত বেলা দশটার সময় হেদুয়ার পশ্চিম ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। দু-এক মিনিট পরেই একজন ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কামারহাটি যেতে হলে কোথা দিয়ে যাওয়া সহজ, বলতে পারেন? আমি বললুম, সেখানে আপনার বিজ্‌নেসটা কি? তিনি নমস্কার করে বললেন, আসুন। চললুম তাঁর সঙ্গে। "কামারহাটি" আর "বিজ্‌নেস" —এই দুটো শব্দ ছিল কোড। আমার কোন চেনা লোক কিছু জানলো না।

যে রকম কার্যকলাপে গুপ্ত সমিতি লিপ্ত, তাতে আত্মগোপন এবং মন্ত্রগুপ্তি, এই দুটো নীতি ছিল অবশ্য পালনীয় সকলের পক্ষেই। কোন কার্যসূত্রে যার সঙ্গে যার মুখ-চেনা হয়, তা ছাড়া কেউ কাউকে জানবে না, মুখচেনার পরও কেউ কারো নাম-ঠিকানা জানতে চাইবে না, এই সব ছিল অলঙ্ঘ্য বিধি। পরে কংগ্রেসী আমলে পরিচয় হল, ভদ্রলোক সিমলার অমরকৃষ্ণ ঘোষ—ফেরারী নেতা অতুল ঘোষের ছোট ভাই।

যাই হোক, তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন এক মেসে, এক ক্ষিতীশ বাবুর কাছে, এবং বিকালে ক্ষিতীশ বাবু আমাকে নিয়ে হাওড়ায় ট্রেনে উঠলেন। সন্ধ্যার সময়ে দুজনে নামলুম চন্দননগরে। ক্ষিতীশ বাবু আমাকে এক বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে, বাড়ীর একমাত্র বাসিন্দা এক দাদার হাতে দিয়ে চলে গেলেন। দাদা তখন ডন-বৈঠক করে ঘেমে উঠেছেন।

কিছুই জানি না, কে তিনি। ঘরটা প্রায় খালিই, দু-একটা মাদুর-বালিশ-হ্যারিকেন মাত্র সম্বল। রাত্রে বোধ হয় দুধ-গুড় দিয়ে যবের ছাতুই খাওয়া হল।

মানুষ জীবনে কত কথাই না শোনে, কিন্তু এক-একটা কথা যেন মনের মধ্যে গভীর ভাবে কেটে বসে যায়। সহস্র কথা যখন বিস্মৃতির অতলতলে তলিয়ে যায়, তখন সেই কথাটা যেন নতুন আকাশপ্রদীপের মত সব স্মৃতির ওপরে জ্বল-জ্বল করে জ্বলতে থাকে। প্রথম দিনই দাদার মুখে এমনি একটা কথা শুনেছিলুম সারা জীবন ধরে সহস্র বার যে কথাটা মনে হয়েছে—"যে কাজে নেমেছ, সেটা তোমার নিজের কাজ, এটা সর্বদা মনে রেখো। সকলে এপথ ছাড়লেও, আমি ছাড়লেও, তুমি ছেড়ো না, কারো মুখ না চেয়ে নিজের কাজ করে যেও।"

তার পরদিন সে বাড়ী ছেড়ে অনেকখানি হেঁটে সকালবেলাই গিয়ে উঠলুম হলদে-ডাঙ্গার এক প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে একটা বড় দোতলা পোড়ো বাড়ীতে। সে অঞ্চলটায় শুধু বড় বড় বাগান, মাঝে মাঝে এক-আধটা বাড়ী, অনেকখানি তফাতে দু-চার ঘর গরীব লোকের বাস। সদর গলিটা থেকে একটা ভাঙ্গা ক্যালভার্ট পার হয়ে প্রথমে ঢুকলুম এক বাগানে, তারপর একটা পুকুর এবং বাঁশবাগান ঘুরে আর একটা বড় পুকুর। তারই অপর পারে একটা প্রকাণ্ড শান-বাঁধানো ঘাট একটু ফেটে-ফুটে গেছে। ঘাটের দুপাশে বেশ বড় সাঁকো। তারপর এক প্রকাণ্ড গাড়িবারান্দার নীচে দিয়ে ঢুকতে হয় বাড়ীর একটা বড় হলঘরে। তার ওদিকেও বারান্দা।

সে হলঘরের মেঝের সিমেন্ট উঠে গেছে, এক দিকে ভাঙাচোরা ডেও-ঢাকনার রাশি, আর এক দিকে একটু জায়গা মাটি দিয়ে লেপে একটা উনুন বানান হয়েছে, এবং আর এক কোণে শুকনো ডালপালার কাঁড়ি। সে ঘরে এক উড়ে মালী থাকে এবং রাত্রে রেঁধে খায়। সকালে পান্তা খেয়ে শহরে কাজ করতে যায়—ঠিকে কাজ।

সে ঘর থেকে ভেতরের উঠোনে পড়ে পাশের দিকের সিঁড়ি দিয়ে উঠলে আগে ছাদ, তারপর প্রকাণ্ড হলঘর, এবং তারপর বাইরের গাড়িবারান্দার ছাদ ও সামনে পুকুরঘাট। উপরের ঐ অংশটুকু বেশ ভালই আছে, সিঁড়ির পর থেকে বাড়ীর পিছনের অংশটার ভিত খানিক নেমে গেছে, ফলে দোতলার ছাদ ফেটে আধ হাত ফাঁক হয়ে গেছে।

বাড়ীটা মানকুণ্ডুর খাঁ বাবুদের। এক যোগেশ ভট্টাচার্য বাড়ীটা ভাড়া করেছেন। এক অনিল বসু পরিবার নিয়ে থাকবেন বলে নায়েব আগাম টাকা নিয়ে রসিদ দিয়েছেন, সেটা আমার কাছে থাকলো। আমি তৃতীয় ব্যক্তি বাড়ীতে থাকবো, দাদা শুধু দিনের বেলায় থাকবেন রাত্রে অন্যত্র। রাত্রে আমি একা।

আমার কাজ হল, সারা শহরে কোথায় কোন্ বাড়ী বা ঘর খালি আছে, হবু ভাড়াটে-রূপে তার সন্ধান করে বেড়ানো, আর মাঝে মাঝে জগদ্দল, কাঁকনাড়া এবং গৌদলপাড়ায় জুটমিলে চাকরির সন্ধান করা।

হলঘরের আসবাবের মধ্যে খান দুই মাদুর, পাতলা বালিশ, দুটো হ্যারিকেন, একটা স্টোভ, দড়িতে ঝোলানো দু-একটা কম্বল-চাদর, আর দেওয়ালের গায়ে পেরেকে আটকানো এক ডিজেল হাঁড়ি। দেওয়ালের গা-আলমারির এক তাকে কয়েকটা ঠোঙ্গায় কিছু চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, ডিম, যবের ছাতু, চিনি প্রভৃতি এবং দু-একটা বাটি, গেলাস

অ্যালুমিনিয়ম বা এনামেলের। এক কোণে জলের কুঁজো, বালতি এবং চিরপরিচিত অপরিহার্য মগ।

বাগানের পরে ছোট এক কুমোরপাড়া, সেখানে থাকে দুর্লভ ঘোষ। মালী তাকে বলে এল, সে একটু দুধ দিয়ে গেল। স্টোভ জেলে তখনি অ্যালুমিনিয়মের বাটিতে জাল দিয়ে তুলে রাখা হল। তিজেল হাঁড়িতে খিচুড়ি পাক করা হল, এবং মেঝেয় হাঁড়ি নামিয়ে দুদিকে দুজনে বসে বাঁ হাত দিয়ে হাঁড়ির কানা চেপে ধরে ডান হাত দিয়ে হাঁড়ি থেকে গরম খিচুড়ি হাপুস-হুপুস করে খেয়ে ফেলে হাঁড়িটা ধুয়ে আবার দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গানো হল। রাত্রে যবের ছাতু দুধ দিয়ে মেখে খাওয়া হল, এবং দাদা চলে গেলেন।

বাগান থেকে সদর গলিতে বেরিয়ে উত্তর-পশ্চিমে দু-একটা গলি ঘুরে গড়ের ধারে পড়া যায়, এবং গড়ের জঙ্গলের মাঝের একটা সুঁড়িপথ দিয়ে ওপারে গিয়ে একখানা বড় ক্ষেতজমি পার হলেই চুঁচুড়া স্টেশনের কাছে পৌছানো যায়। কলকাতা থেকে সটান হলদেডাঙ্গায় আসতে হলে চুঁচুড়া স্টেশন দিয়েই আসা হত।

গঞ্জের এক গোলদারী দোকান ছিল খবরাখবর আদান-প্রদানের ঘাঁটি। একদিন ঘুরতে ঘুরতে রাত হয়ে গেছে, আমি দোকানে গিয়ে বললুম, রাতে কোথাও থাকার ব্যবস্থা করতে। তাঁরা আমাকে নিয়ে গেলেন বৌড়াই চণ্ডীতলায় শ্রীমতিলাল রায়ের বাড়ীতে আর এক ফেরারী আসামীর কাছে। তিনি হচ্ছেন মন্মথ বিশ্বাস, পরবর্তী কালের আত্মশক্তি লাইব্রেরীর মোটাদা—দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা মারার মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বসন্ত বিশ্বাসের ছোট ভাই।

কিছু কথাবার্তার পর তাঁর খানা এল মতি বাবুর বাড়ী থেকেই, খান কয়েক রুটি এবং খানিকটা ডুমুরের তরকারি—নির্ভেজাল ডুমুর। বাড়ীর বাইরে গলিতে আসতে ডুমুরগাছ দেখেছিলুম, মনে হল। সেই খানা দুজনে ভাগ করে খেয়ে শুয়ে পড়লুম। বাইরের দিকে একক ঘর, বাড়ীর কেউ জানতেই পারলো না।

যাই হোক, প্রথম কয়েক দিন টো-টো করে ঘুরে চন্দননগরের পথঘাটগুলো রপ্ত করে নিয়েছিলুম। ক্রমে দু-এক জায়গায় গরীব বুড়ো একক দোকানদার দেখলে জিজ্ঞাসা করি, হ্যাঁ মশায়, এদিকে কোথাও বাড়ীটাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় বলতে পারেন? কেউ বলে, উই ওখানে পাড়ার মধ্যে গিয়ে খোঁজ করুন। কেউ বলে, ক-খানা ঘর চাই? কিন্তু কেউ যখন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কোথা থেকে আসছেন, তখন ভারি অসোয়াস্তি বোধ হয়।

এমনি করেই ক্রমে সারা চন্দননগরে অনেক খালি বাড়ী এবং ঘরের সন্ধান করে ফেললুম। শহরের বুকের ওপর ভাল দোতলা বাড়ী ওপর নীচে আটখানা ঘর, ভাড়া পাঁচ টাকা। শুনে দাদা বললেন, হুঁ, ওটা মেয়র নারান পালের বাড়ী, ও চলবে না। শিক্ষিত ভদ্রলোকের ঘনবসতি যেখানে, সেখানে চলবে না।

একদিন বারাসাতের শেষ প্রান্তে এক বাড়ীর খবর আনলুম। দাদা বললেন, ওটা বৃটিশ চন্দননগর, ফরাসী এলাকার বাইরে, ওখানে আর যেও না। অর্থাৎ ফরাসী চন্দননগরের পাশে এক ফালি বৃটিশ চন্দননগরও আছে!

যে সব ভদ্রলোক কলকাতায় চাকরি-বাকরি করেন, তাঁরা বেরোবার পর পাড়ার ভেতর

যেতুম। একদিন এক বাড়ীতে ঘর খালি আছে শুনে গিয়েছি। বাড়ীতে শুধু এক বৃদ্ধা থাকেন, আর কেউ নেই। তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, তোমাদের সংসারে কজন লোক? পাশের বাড়ীর এক বুড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। আমি বলছি, থাকবে একজন মাত্র লোক, মিলে চাকরি করে, একটু বেঁধে খাওয়ার জায়গা—নতুন বুড়ী ফোঁস করে উঠেছে, তোমরা বোমার দলের লোক নও তো? আমার প্রায় পিলে চমকে উঠেছে, বললুম, সে আবার কি কথা। বুড়ী বললে,—হ্যাঁ গো, আজ কাল অমন কত আসে। আমি তাড়াতাড়ি কোন রকমে শর্টকাট করেই সরে পড়লুম। দাদা শুনে শুধু একটু হাসলেন।

বস্তুতঃ তখন বৃটিশ স্পাই এবং ফেরারী বিপ্লবী চন্দননগরে অনেক ছিল, কিন্তু ধরা কেউ পড়তো না। কারণ বৃটিশ পুলিসকে ফরাসী পুলিসের অনুমতি নিয়ে নির্দিষ্ট বাড়ীতে খানাতল্লাসি করতে হত। পুলিসের কর্তা মাত্র ফ্রেঞ্চম্যান, আর সবই বাঙ্গালী, এবং তার মধ্যে দলের লোকও ছিল অনেক। কাজেই খানাতল্লাসির আগেই বাড়ীতে খবর পৌছে যেত এবং যে যার গা ঢাকা দিত। ফেরার হত।

স্থানীয় লোক ফরাসী পুলিসের কাছে রিপোর্ট করলে, তারা যদি খানাতল্লাসি বা গ্রেপ্তার করতে আসতো, শুধু তাহলেই ধরা পড়া সম্ভব হত। আমার কেসে তাই হয়েছিল। সেটা জানলুম গ্রেপ্তারের পরে।

একদিন খবর হল, সতীশদা সন্ধ্যার পর হলদেডাঙ্গার বাড়ীতে আসবেন, আমি যেন আগে থেকে উপস্থিত থাকি। আমি সন্ধ্যার আগেই বাড়ী গেলুম। তখন কালবৈশাখীর মেঘ আকাশ কালো করেছে, ঝড় আসে-আসে। ঘরে গিয়ে হ্যারিকেন জ্বেলে দরজা-জানালা বন্ধ করলুম।

ক্রমে বাইরে ঝড় উঠলো। দমকা বাতাস দরজা জানালায় ধাক্কা দিতে শুরু করলে। তারপর শুরু হল বৃষ্টি। কিন্তু পাগলা হাওয়া বন্ধ হল না। শেষ পর্যন্ত আকাশ-ভাঙ্গা ঝড় বৃষ্টির উন্মত্ত তাণ্ডব এবং কর্ণপটহবিদারী বজ্রাঘাত। হ্যারিকেনটা জ্বেলে রেখেই শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম এর মধ্যে যদি সতীশদা এসে দরজা ঠেলাঠেলি করেন, তাহলে কি টের পাব? উপায় হবে কি। মনকে প্রবোধ দিলুম, আজ আর তিনি আসতে পারলেন না। সেটা যে কত বড় সৌভাগ্য, তা তখন বুঝিনি।

ঘুমোতে পারলুম না। অনেক রাত পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে বোধ হয় ছোট-বড় পঞ্চাশটা বজ্রপাত চললো। ঝড়ের ধাক্কায় ঘরটা যেন মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে, আর ভাবি, ঘরচাপা পড়েই বুঝি মরতে হল। শেষ রাত্রে কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না।

ঘুম কিন্তু ভোরবেলাই ভেঙ্গেছে। আকাশ তখন লড়াইয়ের পর বিশ্রাম নিচ্ছে। মগ নিয়ে ছাদে বেরিয়েছি, হঠাৎ পাশের আলসের ওপর দিয়ে পুকুরপাড়ের রাস্তার দিকে নজর পড়তেই দেখি, সারি বেঁধে আসছে রীতিমত এক পুলিসবাহিনী। একবার মুহূর্তের জন্যে মাথাটা চন করে ঘুরে উঠলো, তারপর আবার স্টেডি হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে পুলিসবাহিনী বাড়ীটা ঘিরে ফেললে, এবং এক দল সিঁড়িতে দুপদাপ শব্দ করে ছাদে পৌছে গেল এবং প্রথম ব্যক্তির সঙ্গে আমার চারিচক্ষের মিলন হল। মগ দেখিয়ে বললুম, 'একটু দাঁড়াও, দেরি হবে না। বলে আমি পায়খানায় ঢুকলুম, ওরা বাইরে ভিড় করে দাঁড়ালো।

বাইরে পুলিসের ভিড, এবং মাথার মধ্যে এক মুঠো কেঁচোর কিলবিলির মতন হিজিবিজি চিন্তার ভিড—কোষ্ঠ বেচারী 'থ' হ'য়েই রইলো। তার সঙ্গে আপস করে বেরিয়ে পড়লুম। তারপরে সদলবলে ঘরে ঢুকে শুরু হল অগ্নিপরীক্ষার পালা। ডাহা মিথ্যে কথাগুলোকে বেপরোয়া ভাবে পটাপট সত্যের মতন সাজিয়ে বলার অভ্যাস তো ছিল না, কিন্তু ক্ষেত্রকর্মবিধীয়তে—আজকের দায় যে সারতেই হবে। হলও নেহাত মন্দ নয়।

ফরাসী পুলিস সাহেব ফরাসীতে প্রশ্ন করলেন, এক বাঙ্গালী অফিসার বাংলা করে জিজ্ঞাসা করলেন, আর সব লোক গেল কোথায়?

আমি—আর কেউ এখানে থাকে না, আমি একাই থাকি, আর এক উড়ে মালী সে কাল শহর থেকে ফিরতে পারেনি।

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন ফোঁস করে উঠলো, মিথ্যে কথা, মোটা মোটা চশমা-পরা লোক আমি দেখেছি।

দেখলুম, দুর্লভ ঘোষ। বুঝলুম, ঐ ব্যাটাই ইনফরমার। বললুম, আমি জামাজোড়া পরে চশমা পরলেই আমাকে মোটা দেখায়।

প্রঃ—আপনি কোথা থেকে কি জন্যে এখানে এসেছেন?

উঃ—এসেছি কলকাতা থেকে, জুটমিলে চাকরি খুঁজতে। গোঁদলপাড়া জুটমিলের বড়বাবু আশা দিয়েছেন বলে পরিবার আনার জন্যে বাড়ী ভাড়া করেছি।

প্রঃ—এ জঙ্গলে এলেন কেন? শহরে তো বাড়িঘরের অভাব নেই, ভাড়াও বেশী নয়।

উঃ—বাড়ী খুঁজতে খুঁজতে তালডাঙ্গার ফটকের কাছে চারু দাসের বাড়ীতে এসেছিলুম দেখি তিনি সপরিবারে বাইরে গেছেন, বাড়ী তালাবন্ধ। তারপর পাশের দোকানে জিজ্ঞাসা করে এই বাড়ীর সন্ধান পেলুম। খাঁ বাবুদের নায়েবের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছি। (চন্দননগরের উত্তর সীমানার একদিকে তালডাঙ্গার ফটক পার হলেই চুঁচড়োর এলাকা)।

প্রঃ—চারু বাবু আপনাকে চেনেন?

উঃ—হ্যাঁ, তার মেয়ে সরস্বতীর বিয়েয় আমি এসেছি। তাঁর স্ত্রীকে আমি মেজ মাসী বলি।

এ কথাটার অনেকখানিই সত্য। চারু বাবুর শালা এক সময়ে আমাদের বাড়ীতে ভাড়া ছিলেন। আমি তাঁকে মাসীমা বলতুম, আর তিনি আমাকে বলতেন, আমার বড় ছেলে। তাঁর সঙ্গেই চারু বাবুর বাড়ীতে এসেছিলুম সরস্বতীর বিয়েতে।

চারু দাস চন্দননগরের একজন অবস্থাপন্ন গণ্যমান্য ভদ্রলোক। সাহেবের একটা ভাল ধারণাই হল, মনে হল।

এর পর নীচে গিয়ে পুকুরঘাটের সাঁকোয় বসে ওঁরা রিপোর্ট লিখতে শুরু করলেন। আমি দুরু-দুরু হিয়া নিয়ে সপ্রতিভ ভাবে দাঁড়ালুম। এমন সময় দেখা গেল মালীপুঙ্গব আঁচলে কিছু সওদা এবং একটা ভিজে নারকেলপাতা নিয়ে পুকুরপাড় ধরে আসছে। এসে একেবারে ভ্যাবাচাকা, কিন্তু ঘাবড়েছে বলে মনে হল না। তারপর চললো তার ওপর জেরা।

তাকে একটা করে কথা জিজ্ঞাসা করে, আর আমি আগেই তার জবাবটা দিয়ে বলি,

বলুক না ও ঠিক কি না। দুর্লভ ফোঁস করে ওঠে, আপনি কেন কথা কইছেন? শেষে অফিসার আমাকে বারণ করলেন। কিন্তু ততক্ষণে মালী অবস্থা বুঝে নিয়েছে এবং আমার জবাবের লাইনটাও ধরতে পেরেছে।

দুর্লভ ঘোষ বললে, বলুক না ও, মোটা-মোটা বাবু এখানে আসা-যাওয়া করে কি না। অফিসার মালীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আর কেউ আসে এখানে?

মালী দিব্যি ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে, আউ কেই আসিনি।

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, এই বাবুই বাড়ী ভাড়া নিয়েছেন?

পরবর্তী সম্ভাব্য প্রশ্ন অনুমান করে টপ করে আমি বললুম, ঐ মালীই তো আমাকে সঙ্গে করে নায়েব বাবুর কাছে নিয়ে গিয়েছে। মালী বেমালুম সায় দিলে।

দুর্লভ ঘোষেদের পরাজয় হল। সাহেব বললেন, আপনার বিরুদ্ধে রিপোর্ট খারাপ, আপনি এখানে থাকতে পারবেন না। আপনি চন্দননগর ছেড়ে চলে যান।

প্রায় কাঁদ-কাঁদ ভাবে বললুম, বেকার সংসারী মানুষ, একটা চাকরিরও আশা পেয়েছি, আমার ওপর এতটা নির্দয় হবেন না।

মনে হল সাহেবের মন গললো। তিনি বললেন, এখানে থাকার অনুমতি নিয়েছেন আপনি? অফিসার মালীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোর এখানে থাকার পাশ আছে? হুকুম নিয়েছিস?

আমি বললুম, আমি তো নিয়ম-কানুন কিছু জানি না, আমি আজই দরখাস্ত করে দোব, দয়া করে মঞ্জুর করে দেবেন, না হলে মারা যাব। মালী বললে, হিঁঃ—মু তিরিশি বর্ষ ইঁয়াড়ে রহিছি, কৌ দিনি কেই কিছি কহিলা নি, হুককুম কঁড়? আমি বললুম, ওরও দরখাস্ত আমি আজ করিয়ে দোব।

সাহেবের কথা মত অফিসার বললেন, এখন চলুন তো আমাদের সঙ্গে, পরে সে সব দেখা যাবে।

পুলিসের দলের সঙ্গে আমি এবং মালী চললুম। আশা এবং আশঙ্কায় মনটা দুলছে বৃটিশ স্পাইগুলো জানবেই, তারপর কি? পকেটে নায়েবের লেখা ভাড়ার রসিদখানা, কাজেই পথে একটু ঘন ঘাসবন দেখে প্রস্রাব করতে বসে ঘাসের মধ্যে গুঁজে দিয়ে হালকা হলুম।

পুলিস হেড কোয়ার্টারে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর অফিসার এসে বললেন, সাহেব হুকুম দিয়েছেন, আপনি থাকার জন্যে দরখাস্ত দিন। যত সব মিথ্যে রিপোর্ট—হুঁঃ

দুজনেরই দরখাস্ত দেওয়া হয়ে গেল। মালীর সঙ্গে বাড়ী ফেরবার পথে গঞ্জের গোলদারী দোকানে খবর দিয়ে গেলুম, সার্চ হয়ে গেছে, ধরে নিয়ে গিয়েছিল, ছেড়ে দিয়েছে, কেউ যেন ও বাড়ীতে না যায়, আমি বাড়ী গিয়ে একবার ডঙ্কা মেরে আসি। তাঁরা খবর দিলেন, জল ঝড়ে সতীশদা আসতে না পেরে বেঁচে গেছেন, কিন্তু আজ তিনি ঐ বাড়ীতেই আসবেন। আপনি চুঁচড়োর পথে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে নিয়ে অতুলদার কাছে পৌঁছে দেবেন।

অতুলদা! এতদিন যাঁর সঙ্গে একহাঁড়িতে খিচুড়ি খেয়েছি, তিনিই অতুল ঘোষ! সমগ্র ব্যাপারটাই যেন কেমন ভাল লাগতে লাগলো।

বাড়ী ফেবাব পথে মালীকে একখানা আটহাতি কাপড কিনে দিলুম আগেব কথামত। ব্যাটা ঘুঘু, অনেক কাজ করেছে।

বাডী গিয়ে দেখি, কালো হাড জিবজিবে এক বৃদ্ধ নায়েব মশাই এক চাকব নিয়ে এসেছেন এবং ঘাটেব সাঁকোয় বসে তামাক খাচ্ছেন। বুঝলুম, খবরটা মানকুণ্ডু পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আমবা পবস্পবেব কাছে অপবিচিত, কাজেই আমি আগেই বললুম, আমি যোগেশ বাবুব ভাই, বাড়ীটা সাফ-সুফ কবে বাখাব জন্যে এসেছি। পাডাব লোকে মিথ্যে নালিশ কবে পুলিস এনেছিল, তারা পরীক্ষে টবাক্সে কবে ছেড়ে দিলে।

নায়েব মশাই তড়পাতে শুরু কবলেন, আমাব ভাডাটে আমাব বাডীতে ন্যাংটো হয়ে নাচবে, তো শালাদেব কি? আমি কালই কোর্টে নালিশ কববো, আমাব প্রজার ওপর কেন অত্যাচাব হয়? আমি যত হাসিমুখে বলি, থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়েছে তো, আর দবকাব কি ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে, নায়েব মশাই ততই চীৎকার কবেন, আমি ছাড়ছি না, দেখে নোব শালাদের, আমাব প্রজাব ওপব পুলিস হামলা! (বাডীটার একটা ঐতিহ্য ছিল—চন্দননগরেব সস্তা মদের লোভে কলকাতাব বাবুরা মাঝে মাঝে মেয়েমানুষ নিয়ে এসে ঐ বাড়ীটা ভাড়া কবতেন।)

বুড়ো বুঝি আবাব এক নতুন ফ্যাসাদ ঘটায়! ভেবে চিন্তিত হয়ে পডলুম। কিন্তু হাসিমুখ বজায় বেখে যাক্‌গে যাক্ বলে বুড়োকে ঠাণ্ডা কবে বিদেয় করলুম।

পববর্তীকালে সে সময়েব অবস্থা সম্পর্কে ঠাট্টা কবে বলতুম, পাঁঠা খাওয়ার জন্যে আস্ত পাঁঠা আব গরম মসলা কিনে আনা হল, পাঁঠা ব্যাটা গরম মসলাগুলো খেয়ে ফেললে।

টাকাব জন্যে ডাকাতি খুন, তা থেকে মামলা এবং ফেবারী, আবো টাকাব প্রয়োজন, আরো ডাকাতি, এই দুষ্টচক্র সৃষ্টি।

যাই হোক, সন্ধ্যাব পর বেবিয়ে চুঁচড়োর পথে গলি আর গড় পাইচারি করতে লাগলুম। ঘুটঘুটে অন্ধকার, কোলের মানুষ চেনা যায় না। পথে জনমানব নেই। অনেকক্ষণ পাইচাবিব পব হঠাৎ সামনে দেখি এক লম্বা-চওড়া অবয়ব। বুঝলুম সতীশদাই, কিন্তু যদিই তা না হয়! তিনি অমন জায়গায় একজন লোক দেখে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলেন, আমিও পিছু নিলুম নিঃশব্দেই। সুতরাং তিনিও আরো জোরে পা চালালেন। আমাব পক্ষে হল প্রায় হাফ-দৌড়।

কাজেই চেনা গলার আওয়াজ দেওয়াব জন্যে পিছন থেকে সহজ গলায় বললুম, কে যায়?

কাজ হল, গলার আওয়াজে চিনেছেন, দাঁড়ালেন। আমি এগিয়ে মুখটা দেখে নিয়ে বললুম, বাগানে ঢুকবেন না, বাড়ীটা আজ সার্চ হয়ে গেছে, আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, ছেড়ে দিয়েছে। চলুন, পবে সব শুনবেন। তিনি বললেন অতুল কোথায়? বললুম, ঠিক আছেন তাঁর ডেবায়। তিনি বললেন, তাহলে এইবাব তুমি আমাদের সঙ্গেই থেকে যাবে? আমি বললুম, একবার বাড়ী গিয়ে ওদিককার অবস্থা দেখে সেটা স্থির করাই কি ঠিক হবে না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাহলে এখন তুমি ফিরে যাও, আমি ডেরা চিনি, একাই যেতে পারবো। আমি ফিরে এসে শুয়ে পড়লুম।

পবদিন সকালে গঞ্জের গোলদারী দোকানে খবর দিলুম, আমি বাড়ী যাচ্ছি, অবস্থা

বুঝে পরে আসবো। সেই দিনই কলকাতায় চলে এলুম। কিন্তু সটান গিয়ে বাড়ীতে না উঠে এক বন্ধুর বাড়ীতে উঠলুম এবং বাড়ীতে খবর না দিয়েই কয়েক দিন গা-ঢাকা দিয়ে থেকে দেখলুম, বাড়ীতে কোন পুলিস এনকোয়ারী হয় কি না। গণ্ডগোল হয়নি বলে যখন বুঝলুম, তখন বাড়ী গেলুম। চন্দননগরের স্পাইগুলো ফাঁকিবাজ।

চন্দননগরে আর ফিরে যাওয়ার দরকার হল না, এবং আগের মতন কলকাতায় থেকেই কাজ করতে লাগলুম।

যে বন্ধুর বাড়ীতে গা-ঢাকা দিয়েছিলুম, তাঁদেরও বাড়ীর সংলগ্ন একটা পৃথক অংশে ফেরারীদের একটা আড্ডা কিছু দিন ছিল। সেখানে তিন-চার জন বাস করতো, এবং আসা-যাওয়া করতো অনেকে। টালার ডাকাতির ঠিক আগে সে বাড়ী ছেড়ে দেওয়া হয়। সে ডাকাতির বিবরণও কম মনোহারী নয়।

বন্ধুটি হচ্ছেন হারাধন ওরফে হারু। রাণাঘাটের হারাধন ঘটক। তিনিও ডিফেন্স অ্যাক্টে আটক হয়েছিলেন আমাদের অনেকের সঙ্গেই।

তিন

টালার ডাকাতি—সে বোধ হয় ১৯১৫ সালের শেষের কথা। সে গল্প বলতে হলে টালার সম্বন্ধে আগে কিছু বলতেই হয়, আর তা বলতে গেলে অনেক কথাই এসে পড়ে। কারণ আমার জন্ম টালায় এবং ২৫ বছর বয়েস পর্যন্ত টালাতেই বাস করেছি; স্বদেশী হাঙ্গামার হাতেখড়িও টালায়। জোয়ান বয়সের বিপ্লবের রঙীন নেশা, সতর্ক শিক্ষা, বৈপ্লবিক সাহিত্য ও নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ, গুপ্ত সমিতির বেআইনী কর্মকাণ্ড প্রভৃতির সবচেয়ে ঠাস-বুনানি প্রথম পর্যায়ের ইতিহাস টালার ইতিহাসেরই এক পর্ব।

১৯০৫ সালের স্বদেশী হাঙ্গামার প্রথম যুগ শুরু হওয়ার আগেকার টালা ছিল এখনকার টালার তুলনায় প্রায় পাড়াগাঁ। কিন্তু সে টালার একটা নিজস্ব বনেদী পল্লীরূপ ছিল, যা এখন একটা কস্মোপলিটান ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে। রেললাইন আর খালের মাঝের ফাঁকা জায়গাটা গঙ্গার ধারে হরি পোদ্দারের ঘাট থেকে বেলগাছিয়ার বড় রাস্তা পর্যন্ত ছিল খাস টালা। রেললাইনের উত্তরে পাইকপাড়ার দক্ষিণের জায়গাটুকু ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড থেকে অনাথ দেব লেন পর্যন্ত টালার অন্তর্গত হলেও তার অর্ধেকটা ছিল খেলাত ঘোষের বাগান ও লম্বা ঝিল এবং তারপরে একটা বস্তী, কম্পুর বাগান। এখন এই অংশটা জুড়ে হয়েছে টালার জলের ট্যাঙ্ক ও পার্ক।

খাস টালার মধ্যে বনমালী চ্যাটার্জি স্ট্রীটের দুপাশ নিয়ে আমাদের পাড়া। এর মধ্যেই ছিল ছ'টা বড় বড় পুকুর। এখন সেগুলোর ওপর বড় বড় বাড়ী এবং রাস্তা হয়েছে। শুধু একটা পুকুর হয়েছে চিলড্রেন্স পার্ক। আমাদের বাড়ী ছিল বনমালী চ্যাটার্জি স্ট্রীটের মাঝামাঝি।

আমাদের পাড়ার পুব দিকটা সরকার বাগান, পশ্চিম দিকটা স্রেফ 'ওপাড়া' ছুতোর পাড়া। আমাদের পাড়ায় ছিল ফেরারীদের আড্ডা এবং ছুতোর পাড়ায় হয়েছিল ডাকাতি।

সবচেয়ে ছোটবেলার যে কথাটা আজও স্পষ্ট মনে আছে, সে হচ্ছে ১৯০১ সালের কথা। সপ্তম এডোয়ার্ড রাজা হয়েছেন, আমাদের স্কুল থেকে আমরা গানের মিছিল নিয়ে কাশীপুর চিৎপুর মিউনিসিপ্যাল অফিসে গিয়ে এক একটি মাটির রেকাবি ভরা মিষ্টান্ন পেয়েছি। গানটি হচ্ছে :

জয় রাজরাজেশ্বর জয় ভারত ঈশ্বর
সুখেতে পালহ প্রজা থাক সুখে নিরন্তর।

তারপরের আর একটি বড় ঘটনা মনে আছে, সে হচ্ছে 'বড়বাবু অমর্ত মিত্তিরের ভোট'। আমাদের বাড়ীর খানিক দক্ষিণ দিকে ছিল মিউনিসিপ্যাল গোখানা, যার নাম ছিল কাজি হৌস। তার মাঝে একটা পুকুর ছিল। মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্বাচনে বড়বাবু দাঁড়িয়েছিলেন এবং ভোট হয়েছিল কাজি হৌসে। ভোটে মারামারি হয়েছিল। এক জনের মাথা ফেটে রক্তগঙ্গা হয়েছিল এবং সে পালাতে গিয়ে পুকুরে পড়ে গিয়েছিল। কাজেই আমার প্রথম নাগরিক জ্ঞান হয়েছিল, ভোট নামক একটা কাণ্ড আছে, মাথা ফাটাফাটি যার অঙ্গ। সে ১৯০৩ সালের কথা।

এর পর ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। স্বদেশী হাঙ্গামার ঢেউ টালাকেও নাড়া দিলে।

তখন খুব গুলি খেলতুম। সোডার বোতলের মুখের কাচের গুলি, পাথরের ছুনীগুলি ও 'টল' প্রভৃতির স্টক থাকতো একটা পুরোনো মোজার মধ্যে। সেই মোজাভর্তি গুলি, মোজায় গেরো বেঁধে যেদিন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এলুম কাজি হৌসের পুকুরের মাঝখানে, সেদিনকার সেই প্রথম আত্মদানের আত্মপ্রসাদ আপনারা বুঝবেন না!

ইতিমধ্যে পি. মিত্র প্রমুখ নেতাদের চেষ্টায় সিমলায় অনুশীলন সমিতি গঠিত হয়েছে। অক্সফোর্ড মিশনের পাশের গলির মধ্যে তার হেড কোয়ার্টার এবং কাছেই লাঠিখেলা প্রভৃতির আখড়া। ফরিদপুরের পুলিন দাস ঐ নেতাদের পরামর্শে ঢাকায় অনুশীলন সমিতি গড়তে গেছেন। আমাদের ও-পাড়ার রায় বাহাদুর কৃপানাথ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র দীননাথ দত্ত (চণ্ডীবাবু) এবং পরান মুখুজ্যের (প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) নাতি প্রভাত মুখুজ্যে (তুষ্টুবাবু) বড় লাঠিখেলা শিখে টালায় অনুশীলন সমিতি গড়েছেন। যুবক-তরুণ-কিশোর মহলে উৎসাহের ধুম লেগে গেছে।

শ্যামবাজারে বাবার সঙ্গে কাপড় কিনতে গিয়ে স্বদেশী তাঁতের প্রথম কাপড় দেখে আমি বললুম, ঐ কাপড় আমার চাই! বাবা বললেন, ঐ মোটা কাপড় পরতে পারবি না, ভিজলে আধ মন ভারি হবে, নিংড়াতে পারবি না। আমি না-ছোড়-বান্দা, কাজেই ঐ কাপড়ই কেনা হল একজোড়া।

আমি যে একটি ক্ষুদে প্যাট্রিয়ট, তাতে আর বাবার সন্দেহ রইলো না। কিন্তু আমার বৈপ্লবিক বিকাশটা বাবা দেখে যেতে পারেন নি। তিনি ১৯০৮ সালেই গত হলেন।

আমাদের পাড়ায় প্রোফেসর কে. ডি. শীলদের বাড়ীর পাশের শ্যামবল্লভের একটা বাড়ীতে হল অনুশীলন সমিতির হেড কোয়ার্টার; আর শিউবক্স বগলার লেনের পূর্ব মাথাটা রেলের লাইনের পাশ ধরে পুবদিকে খানিক এগিয়ে যে চৌদ্দভাগার মাঠে গিয়ে পড়েছিল, সেই মাঠে ছিল আখড়া। চৌদ্দভাগা আগে ছিল পুকুর। পরে সেটা বুজিয়ে

একটা মাঠ হয়েছিল, আখড়া উঠে যাওয়ার পর যেটা হয়েছিল ফুটবল গ্রাউণ্ড। এখন সেখানে হয়েছে বড় বড় বাড়ী।

আখড়া বাড়ী আর কে. ডি. শীলেদের বাড়ীর মাঝে ছিল একটা খুব সরু গলি, দু ফুটের মতন চওড়া এবং তার মাঝে এক সরু নালী। গলির দুপাশের দেওয়ালে বালির কাজ ছিল না, সুতরাং ইটের ফাঁকে পা দিয়ে দিয়ে আখড়াবাড়ীর আলসে টপকে ছাদে যাওয়া যেত।

আমাদের একটা খেলা, 'স্পোর্টস আইটেম' ছিল, একদল লোক বাড়ীটার ঘরে ঘরে থাকবে, সিঁড়ির নীচের দিকের দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়ে। আর এক দল লোক, তার মধ্যে আমাদের মত ছোট দুই-এক জন সমেত, বাইরের গলির দেওয়াল বেয়ে ছাদে উঠবে। তারপর ছোট একজনকে কোমরে দড়ির মতন করে পরনের কাপড় বেঁধে আলসের ওপর দিয়ে বাড়ীর ভেতর দিকে ঝুলিয়ে ছেড়ে দেবে এবং সে ঝপ করে বাড়ীর উঠোনে পড়েই সিঁড়ির দরজা খুলে দেবে, আর ছাদের বড়রা হুড়মুড় করে নেমে গিয়ে ঘরে ঘরে দরজা আগলে দাঁড়াবে, ঘরের লোকদের আটক করবে।

আমি ছাদের দলে থাকতুম। দু-চারটে ডানপিটে ছোট ছেলেকে ঐভাবে বাড়ীর মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হত, দেখে গায়ে কাঁটা দিত। কিছুদিন বড়দের পেছন পেছন দৌড়ে গিয়ে ঘরের লোকদের বন্দী করায় ওস্তাদ হওয়ার পর একদিন মনটাকে শক্ত করে নিয়ে বলে বসলুম, আজ আমাকে ঝুলিয়ে দিন। বড়রা বললেন, ল্যাঙট আছে তো? বললুম, আছে। যাই হোক, দাঁতে দাঁত চেপে অগ্নিপরীক্ষায় পার হলুম এবং মনে আর সন্দেহ রইলো না যে, আমি করিতকর্মা হয়েছি।

ভবিষ্যতের কোন্ প্রয়োজনে এই ট্রেনিং, তা তখন মনেই আসতো না, আর ভবিষ্যতে এ ট্রেনিং কোন কাজে লাগারও প্রয়োজন হয়নি। আখড়ার মাঠে নানা রকম ড্রিল হত, মার্চ হত। রিলে-মার্চে লাইনের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চকিতের মধ্যে একটা জিনিস রিলে করে চালান করে দেওয়া হত, নিজ নিজ ঘাঁটি রক্ষা করে। মাঠের মাঝখানে একজন ফ্ল্যাগ নিয়ে দাঁড়াতো, আর চারিদিক ঘিরে জন বারো জোয়ান, ছোটরা সমেত, বড় বড় লাঠি নিয়ে প্রাণপণে 'হারুয়া' ঘোরাতো, হাঁপিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। এর নাম ছিল মন্দির রক্ষা। মাঠের মাঝখানে সবচেয়ে ওস্তাদ 'বানা' খেলোয়াড়, 'গুলো'-দেওয়া লাঠি নিয়ে দাঁড়াতো, তাকে ঘিরে কয়েক জন বড় লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে মারার চেষ্টা করতো। সে এমন পাঁয়তাড়া সহকারে "বানা" ঘোরাতো যে, কেউ তার কাছাকাছিও পৌঁছতে পারতো না।

১৯০৭ সালে আখড়ার বাড়ীতে এক 'হোমযজ্ঞ' হল। একটা ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে সারিবন্দী বড়লাঠি সাজিয়ে, ছোটলাঠি দিয়ে রকমারি করে বেঁধে ব্যাকগ্রাউণ্ড তৈরী করে, তাতে ঢাল, তলোয়ার, বর্শা, সড়কী, খাঁড়া, টাঙ্গী, ছোরা প্রভৃতি বেঁধে সাজানো হল। একজন মুণ্ডিতমস্তক গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী 'স্বামীজি' এসে মেঝের ওপর কাঠের আগুন করে তাতে 'কুশী' করে ঘি দিতে দিতে কত মন্ত্র, শ্লোক প্রভৃতি আউড়ে যেতে লাগলেন, মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করে গেলেন।

সর্বশেষে, শবযাত্রীরা যেমন একে একে সকলেই চিতায় জল দেয়,—তুলনাটা মাপ

করবেন,—তেমনি কিউ করে একে একে সকলেই হোমাগ্নিতে একটুকরো কাঠ এবং একটু করে ঘি দিয়ে যেতে লাগলেন এবং স্বামীজি একটা মন্ত্র উচ্চারণ করে যেতে লাগলেন একটু তাড়াতাড়ি কাজ সারার গরজে। কিউয়ের পেছনে আমরা ছোটরাও হোমাগ্নিতে কাঠ-ঘি দিলুম।

তখনকার গান ছিল প্রধানত 'বন্দে মাতরম্', মার্চের সুর—এখনকার মতন এলিয়ে-দুলিয়ে মন ভুলিয়ে সংস্কৃতি-সম্মেলনের উদ্বোধন নয়। সে ছিল মায়ের বন্দনা, মাকে বসিয়ে গান-শোনানো নয়।

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ থেকে মুকুন্দ দাস প্রভৃতি অনেক কবির অনেক গান প্রচলিত হয়েছিল, চমৎকার গান। তখনকার বাঙালীর মনের ক্রোধ, ক্ষোভ, আত্মসমালোচনা, দার্শনিক-সান্ত্বনা, ভবিষ্যতের স্বপ্ন, উদ্দীপনা, সংগ্রামীপণ, সবই প্রকাশ হত সে সব গানে। সকল কবির নামও মনে নেই। কিন্তু 'জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা' গানটা এ যুগের আগে কখনো কোনো 'স্বদেশীকে' বা বিপ্লবীকে গাইতে শুনিনি।

যদি অভয় দেন তো বলি। গানটা শুনলেই আমার ছেলেবেলার 'জয় রাজ-রাজ্যেশ্বর' গানটা মনে পড়ে। 'পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল-বঙ্গ' প্রভৃতির 'ঐক্যবিধাতা' বলে কার জয়গান করা সঙ্গত? ভগবানের? হায় হায়! ভগবান যদি ভারতের ঐক্য বিধান করতেন, তাহলে দু'শো বছর ইংরেজের গুঁতো খেয়ে ভারতবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হত না। ঠিক তিনি পারেন নি বলেই সে ঐক্যবিধান করতে পেরেছিল ইংরেজ, সব ভারতবাসীকে একই গোলামির শৃঙ্খলে বেঁধে। সুতরাং গানটা উৎসর্গ করা যায় শুধু ইংরেজেরই নামে। কিন্তু যাক—

১৯০৭ সালে মানিকতলার বোমার আড্ডা ধরা পড়ার পর যখন সরকার বাহাদুর অনুশীলন প্রভৃতি সমিতি বে-আইনী করে দিলেন, তখন ১৯০৮ সালে আমাদের সমিতি এবং আখড়াও উঠে গেল। আমরা লাঠি, ছোরা প্রভৃতি এক দিন সব লুকিয়ে ফেললুম।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার ডিরেক্ট-অ্যাকশন ছিল বিলাতী বর্জন। বিলাতী কাপড় পোড়ানো হয়েছিল এবং মোটা দেশী মিলের কাপড় ও জোলাদের বোনা কাঁচি-ধুতির ব্যবহার বেড়েছিল, বিলাতী নুনের বদলে 'করকচ' নুন চালু হয়ে গিয়েছিল ব্যাপকভাবে। এই প্রকাশ্য বৈধ আন্দোলনের তলায় যে আর একটা গুপ্ত বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা আগে থেকেই গড়ে উঠেছিল, আখড়াগুলোর পেছনে ছিল তাদেরই গুপ্ত নেতৃত্ব। প্রকাশ্য আন্দোলনের জন আষ্টেক নেতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, অশ্বিনী দত্ত, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, রাজা সুবোধ মল্লিক, কৃষ্ণকুমার মিত্র, তাঁর জামাই শচীন বসু, পুলিন দাস প্রভৃতিকে ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনে বিনা বিচারে আটক করা হয়েছিল। বন্দে মাতরম্ রণধ্বনির ওপর নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়েছিল প্রথমে বরিশালে। লাঠির বাড়িতে মাথা ভেঙ্গে দিয়েও পুলিস চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতাকে বন্দে মাতরম্ রণধ্বনি ছাড়াতে পারেনি।

সরকারের ক্ষতি হয়েছিল, টনক নড়েছিল, আন্দোলন দমনের নানাবিধ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। মুসলমানেরা যাতে আন্দোলনে যোগ না দেয়, তার জন্যে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা

বাধাবার চেষ্টা করে কিছুটা সফলও হয়েছিল। ব্যারিস্টার আবহুর রসুল, মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন প্রভৃতি মুসলমান নেতারা ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সক্রিয় নেতা। হিন্দু-মুসলমান ভারতমাতার দুই চক্ষুর মতন, হিন্দুরা বড় ভাই, মুসলমানেরা ছোট ভাই, এই সব কথারও সৃষ্টি হয়েছিল। কংগ্রেসে মডারেটরা বিলাতী বয়কটের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, কিন্তু মহারাষ্ট্রের তিলক এবং পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় বাঙ্গালাকে সমর্থন করেছিলেন। পরবর্তীকালেও দেখা গেছে, ঐ দুই প্রদেশে বিপ্লব প্রচেষ্টাও গড়ে উঠেছিল। লাজপৎ রায়কেও সরকার বাহাদুর ৩নং রেগুলেশনে আটক করেছিল (তাঁর সঙ্গে সর্দার অজিত সিং-ও ছিলেন) এবং তিলককে সিডিশন কেস করে ছয় বছর জেল দিয়েছিল।

কিন্তু যখন দেখা গেল, বড় বড় সরকারী কর্মচারীকে গুপ্ত হত্যার জন্যে বোমার কারখানা হয়েছে, বোমা পিস্তল চলতেও শুরু করেছে, তখন সরকার বাহাদুর মর্লি-মিণ্টো রিফর্ম দিয়ে বঙ্গভঙ্গ রদ করে বড়লাটের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে একজন ভারতীয় সদস্য নিয়ে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করলে। তাতে 'আন্দোলন' বন্ধ হল কিন্তু গুপ্ত বিপ্লবীদের ওপর নির্যাতন চালিয়েও দমন করতে পারলে না। তারা সাময়িকভাবে একটু থমকে গেল মাত্র।

আমি বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে বসিনি। সে বিরাট ইতিহাসের মধ্যে আমার ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাটুকুর বিবরণ মাত্র লিখছি। আর একটা রাজনৈতিক ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না, যে ঘটনাটা মনে থাকলে পরবর্তী কালের এবং এ যুগের অনেক কথা বুঝতে পারার সুবিধে হবে।

বড়লাটের শাসন পরিষদে প্রথম ভারতীয় সদস্য নেওয়ার প্রস্তাব যখন 'ভারত-ভাগ্য-বিধাতা' সপ্তম এডোয়ার্ড শুনলেন, তখন তিনি প্রথমে আপত্তি করে বলেছিলেন—আমাদের সাম্রাজ্যিক-নীতি একজন ভারতবাসী জানতে পারবে, এ কি ভয়ঙ্কর কথা! মর্লি সাহেব তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন, শিক্ষিত ভারতবাসীদের মধ্যে আমাদের বিশ্বস্ত লোকের অভাব নেই। তিনি আশ্বস্ত হলেন, রাজী হলেন।

বয়েসও হয়েছে, গুপ্তচক্রে প্রবেশও করলুম ১৯১২ সালে দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা-পড়ার পর। প্রথম শিক্ষা চলতে লাগলো পড়াশুনো—বিবেকানন্দ স্বামীর কর্মযোগ এবং অন্যান্য, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী প্রভৃতি, নেপোলিয়ন, নন্দকুমার, ঝান্সীর রাণী, রবি ঠাকুরের গোরা এবং সাধনা (প্রবন্ধ) প্রভৃতি বই। সব চেয়ে অবশ্য-পাঠ্য ছিল একখানা 'নিষিদ্ধ' বই সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা'। পড়লে মনটা সত্যিই উত্তেজিত হয়ে উঠতো, ইংরেজের শয়তানিতে ভারতের কি হাঁড়ির হাল হয়েছে দেখে।

মাঝে মাঝে গুপ্ত বিজ্ঞপ্তি, ইস্তাহার প্রভৃতি আসতো। আমরা সেগুলো গোপনে রাত্রে লোকের বাড়ীতে ফেলে দিয়ে বা দেওয়ালে এঁটে দিয়ে আসতুম। একবার এক ইস্তাহার এল—Director of India Revolution, Vigilance Department, Bengal Branch-এর! তাতে বলা হয়েছে, পাইকপাড়ার অমুক ঠাকুর শত্রুর গুপ্তচর, দলের কেউ যেন তার সঙ্গে আর কোন প্রকারের সম্পর্ক না রাখে। ইস্তাহারাদি আনতেন জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়।

ঘটনাটা হচ্ছে এই যে, পাইকপাড়ার এক স্বনামধন্য 'ঠাকুর' বড় লোক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বেশ বড় একজন অ্যামেচার প্যাট্রন বিপ্লবীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নাম করে 'রাইট অ্যাণ্ড লেফ্‌ট' ছেলে ধরে বেশ বড় একটা নিজস্ব দল গড়েছিলেন।

তাঁর দলের বড় ছেলেগুলোর অনেকে শেষ পর্যন্ত গুপ্ত বিপ্লবীচক্রের কর্মী হত, কাজেই এক হিসেবে তিনি ছিলেন একজন আড়কাঠি। আর ছোট ছেলেগুলোকে তিনি ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দিতেন এবং বাড়ী থেকে টাকা চুরি (গহনা পর্যন্ত) করিয়ে এনে দেশের জন্যে তাঁর হাতে দিতে বলতেন। দেশের জন্যে নিজের সব কিছু বিসর্জন দিতে পারলে, তবেই না দেশভক্ত! ছেলেরা লজ্জায় বাড়ী থেকে যে যা পারতো চুরি করে এনে দেশের জন্যে তাঁর হাতে দিতো।

ঠাকুর মশায় অদ্ভুতকর্মা, অঘটন ঘটাতে পারতেন। রিভলভার-পিস্তলের বড় বড় smuggler-এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। এদিকে তাঁর যোগাযোগ ছিল অতুলদার সঙ্গে। জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ও কিছুদিন তাঁর কাছে যাতায়াত করেছিলেন। কিন্তু জীবনলালের শ্যেন দৃষ্টির কাছে ঠাকুর মহারাজের ক্রিয়াকলাপ সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছিল। তিনি দাদাদের কাছে সেটা বলেছিলেনও, কিন্তু জুনিয়ারের কথায় তাঁরা আমল দেন নি।

১৯১৪ সালে যুদ্ধ লাগার পর যখন জার্মান ষড়যন্ত্র পেকে উঠলো, তখন হঠাৎ প্রচুর টাকার জরুরী প্রয়োজনে অনেক বিবেচনার পর ডাকাতির সিদ্ধান্ত করা হল।

প্রথম ডাকাতি হল গার্ডেনরীচে সরকারী টাকা। খুঁজতে খুঁজতে পুলিস গ্রেপ্তার করে বসলো নরেন ভট্টাচার্যকে (এম. এন. রায়)। কিন্তু কোর্ট জামিন দিয়ে বসলো অল্প টাকার। সুতরাং তিনি গা ঢাকা দিলেন, জামীন বাজেয়াপ্ত হল, টাকাটা গেল।

মওকা বুঝে ঠাকুর মহারাজ খবর দিলেন এক বাক্স revolver পাওয়া যাচ্ছে, পাঁচ কি দশ হাজার টাকা চাই—ঠিক মনে নেই।

তার পর দাদারা টাকার পুঁটুলি নিয়ে গেলেন ঠাকুর মহারাজের কাছে রাত্রে নির্দিষ্ট সময়ে। তার একটু পরেই বাড়ীর গেটে এক পুলিস-অফিসার মোটরে এসে হাজির। সর্বনাশ! ঠাকুর মহারাজ বললেন, টাকার পুঁটলিটা দিন শীগ্‌গির, বাড়ীর মধ্যে পাঠিয়ে দিই, আমার ওপর আপনারা অতুলের মতনই নির্ভর করতে পারেন, আপনারা খিড়কি দিয়ে বাগানের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যান। অগত্যা তাই করতে হল, কিন্তু তার পর থেকে স্বয়ং ঠাকুরমশায়ই হলেন ফেরার। দাদারা আর তাঁকে খুঁজে পান না অথচ তাঁর নামে পুলিস-ওয়ারেন্টও নেই আর তিনি বাড়ীতেই বাস করেন।

রিভলবারের বাক্সের বদলে পুলিস আমদানি করাতেই ঐ পূর্বোক্ত ইস্তাহার বেরিয়েছিল।

গার্ডেনরীচের পর বেলেঘাটার এক আড়তে ডাকাতি হল। মোটর ডাকাতির হিড়িক শুরু হল। পুলিসও সক্রিয় হল, খুনও প্রয়োজন হল, এমনি এক গোয়েন্দা বোধ হয় সুরেশ মুখার্জি, হেদোর মোড়ে খুন হল। সেই সূত্রে অতুল ঘোষ গা ঢাকা দিলেন।

বেলেঘাটার পর টালার ডাকাতি। গোবিন্দ পালের লেনে ঢুকে বাঁদিকে শেঠবাগান লেন। সেখানে কালাচাঁদ ভট্টাচার্যের দোতলা বাড়ী। তিনদিকে অন্যান্য বাড়ী, গলির উপর সদর দরজা সর্বদা ভিতর থেকে বন্ধ থাকে। বাড়ীর একমাত্র ছেলে, শ্যাম আমাদের দলের ছেলে। ভট্টাচার্য মশায়ের টাকা আছে এবং তেজারতী মহাজনী ব্যবসা আছে।

টাকা এবং বন্ধকী ও তামাদী গহনাপত্র লোহার সিন্দুকে থাকে বাড়ীতেই। সেই বাড়ীতে ডাকাতি। দলের মধ্যে প্রচার, শ্যামই সন্ধান দিয়েছিল এবং সুবিধা-অসুবিধা বাতলে দিয়েছিল। পুলিস কিন্তু তাকে সন্দেহও করেনি এবং গ্রেপ্তার বা আটক করেনি।

রঞ্জন ব্যানার্জি বলে পাড়ার একটি ছেলে ছিল আমাদের দলের। আমাদের পাড়ায় ছিল চারু, করালী, সতীশ নিয়োগী, পঞ্চানন দাস। পঞ্চানন বন্দুক-পিস্তল মেরামতে এক্সপার্ট। তাঁর ঠাকুরদাদার নিজস্ব ছোট কারখানা ছিল কর্মকারের। দেশী বন্দুক তৈরী করে বিলাতী কোম্পানীর দোকানে সরবরাহ ছিল তাঁর ব্যবসা। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র—পঞ্চাননের বাবা—বন্দুক মেরামতের কারখানা করেছিলেন। সেইখানেই পঞ্চাননের শিক্ষা।

একবার এক ৪৫০ নম্বরের রিভলভার, 'ঘোড়া'টা ঠিক কাজ করে না বলে মেরামত করতে দিয়ে গেছে। চেম্বারটা মাঝে মাঝে এক একবার ঠিক ঘুরছে, আবার আটকে যাচ্ছে। হঠাৎ একবার দড়াম করে আওয়াজ! পঞ্চাননের দুই আঙুলের মাঝখানে মাংস ভেদ করে এক গুলী গিয়ে লাগলো দেওয়ালে। সোডার বোতল ভেঙ্গে গেছে বলে হাত বেঁধে ফেলে তখনকার মতন সামলানো হল। তারপর ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে দলের এক ডাক্তার এসে পড়লেন এবং ব্যাণ্ডেজ বেঁধে তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। তিনিই যাদুদা।

প্রথমে পঞ্চাননকে তোলা হল সিমলার অতীন বসুর বাড়ীতে। সেখান থেকে নিয়ে গিয়ে রাখা হল আহীরিটোলার যুগল দত্তের বাড়ীতে। সেখান থেকে সেরেস্তরে পাড়ায় এসে অতুল দাসদের বাড়ীতে কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থেকে তারপর পঞ্চানন বাড়ী এল।

অনেক দিন ধরে পাড়ায় অনেক 'পানিস' (পিস্তলাদি) এবং অনেক 'ফুড' (গুলী) এসে জমেছিল। সেগুলো নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রাখাও ছিল একটা বড় কাজের অঙ্গ। ডাকাতির বন্দোবস্ত যখন হল, তখন সব 'মাল' সরাবার হুকুম এল। সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যেই সব নিরাপদ স্থানে সরাতে হবে, অথচ মাল একগাদা। রডা কোম্পানীর চোরাই মশার পিস্তল, ফুটখানেক লম্বা। তার কাঠের কেসগুলো এমন ভাবে তৈরী, যাতে তার মাথায় পিস্তলটা জুড়ে দিয়ে সমস্তটাকে রাইফেলের মতন ব্যবহার করা যায়। তার ১০টা করে কার্টিজ গাঁথা, 'ম্যাগাজিন' একগাদা। ৪৫০, ৪৫৫, ৩৮০, ছোট ৩২০, এমনি সব। নতুন পুরোন একগাদা পিস্তল আর তার গুলী একগাদা। কোনটা কোথায় কেমন করে সরাই? করালীর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হল, আগে সব মাল আমার বাড়ীতে জমা করা হোক, তারপর ভাবা যাবে।

তদনুসারে মালের গাদা আমার বাড়ীতে এসে জমলো। আমরা রাস্তা দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়ার মতন অনেকগুলো পোঁটলায় সব বাঁধলুম। আমি একটা পোঁটলা রেখে এলুম সওদাগর পট্টির পিছন দিকে শ্রীশ চন্দ্রের বাড়ীতে। তাদের বাড়ীতেই নার্সারীর ব্যবসা ছিল। আর একটা পোঁটলা রেখে এলুম ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড এবং ভেরিটোলার বাজারের মাঝের বস্তিতে একটা ছেলের কাছে। তার নামটা এখন মনে নেই। শ্রীশ ছিল বন্ধু, দলের লোক নয়। আর ছেলেটা ছিল দলের।

বিকেলবেলা জীবন এল। গায়ে মোটা দুই কোট, তার ওপর এক মোটা চাদর। সব ক্লিয়ার হয়নি দেখে বললে, আমার কাছে যত পার দাও, আমি নিয়ে যাই। তার অঙ্গে

প্রায় মোষেব গাড়িব মতন মাল বোঝাই কবে চাদবখানা দোলাই-এব মতন করে ঘাড়ের কাছে বেঁধে ছেড়ে দিলুম।

· সন্ধ্যার খানিক পবে হারুদেব বাড়ীব ফেবাবীদের আড্ডায় কাঙালদা প্রভৃতি এসে জুটলেন। আমাদের সকলকে সকাল পর্যন্ত আপন আপন বাড়ীতে থাকাব হুকুম হল। রাত্রেব ঘটনা পবদিন সব শুনলুম।

কর্তা রাত ন টায বাড়ী ফেবেন এবং তাঁর গলার আওয়াজ শুনলে তবে চাকর দরজার ভিতবেব তালা খুলে দরজা খুলে দেয়। সেদিনও ঠিক তেমনি ভাবে কর্তা যখন বাড়ী ঢুকছেন, সঙ্গে সঙ্গেই পিছন থেকে কযেকজন ঢুকে পড়ে রিভলবাব দেখিয়ে কর্তাকে এবং চাকবকে একটা পূর্বনির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে গিয়ে আটক কবলো এব এক এক ঘব থেকে এক একজন বিভলভাব দেখিয়ে মেয়েদেব এবং শ্যামকেও এক ঘবে আটক করলে। তাবপব সিন্দুকেব চাবি চেয়ে নিয়ে টাকা গয়না সংগ্রহ কবে যাবাব সময় বলে এলো, কাল বেলা ন'টাব আগে যদি পুলিসে খবব দেন, বা বাত্রে যদি চেঁচামেচি কবে লোক জড়ো করেন, তাহলে কিন্তু ভাল হবে না, আমবা আবাব আসবো। কাজেই পরদিন বেলা ন'টার আগে কাণ্ডটা পাশেব বাড়ীর লোকেবাও জানতে পাবেনি।

যাই হোক, কযেক দিন পবে হিন্দু হোস্টেলে পুলিন বসুব কাছে আমাকে পাঠানো হল। ভদ্রলোক আমাকে একটি কাগজে-মোড়া শক্ত কবে বাঁধা ছোট ভারী প্যাকেট দিলেন। বললেন, টাঁলাব গযনা, পঞ্চাননকে দিয়ে গালিয়ে বাট কবে দিতে হবে। সেটা কোমরে ভাল করে বেধে নিয়ে চলে এলুম। পঞ্চাননকে বলে ঠিক কবলুম, হারুদের বাড়ীর ফেবাবীদেব পবিত্যক্ত অংশের একটা ঘরে গালাবাব ব্যবস্থা কবা হবে। পঞ্চাননদের বাড়ীব পিছনের পাঁচিল টপকে সে বাড়ীটাতে যাওয়া যেত। সেই ভাবে বন্ধ-বাড়ীতে ঢুকে গযনা গালিযে বাট তৈবী হল। পঞ্চাননই সেটা যথাস্থানে পৌছে দিলে।

এসব কাজ একবার কবলেই বশ হয়ে যায়। প্রথম বিবেকেব দুর্বল কামড়েব সামনে রুখে দাঁড়ায় ভাবতেব গোলামি, ইংবেজেব শযতানি। বিবেক লজ্জায় মাথা নত করে। তাবপবে আব একবাবও মাথা তুলতে সাহস করে না। নতুন ঘটনাব সামনাসামনি পড়লেই, আগে থেকেই বেমালুম সবে পড়ে। বিপ্লবের গুপ্ত পথের এ এক অবশ্যম্ভাবী এবং অপবিহার্য নিয়তি।

কিন্তু সে মবে না-ই, ববং প্রয়োজনেব সময মৃত্যুব সম্মুখীন হতেও সাহস যোগায়, যেন বলেব অপব্যয় না কবে শক্তিসঞ্চয়ই কবেছে।

চার

নিবস্ত্র ভাবতবাসী সশস্ত্র বিপ্লব কবে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ করে ভারত থেকে ইংবেজকে তাড়িয়ে ভারতকে স্বাধীন কববে, বিংশ-শতাব্দীর প্রথম দশকে এ কল্পনা বাংলার মানুষের কাছে প্রায় পাগলের প্রলাপ বলে মনে হত। দেশের সেই অবস্থায় গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে তুলতে যারা নেমেছিল, তাদেব সমস্যার বিরাটত্ব এবং জটিলতার কথা

নিয়ে সে যুগের লোক কখনো মাথা ঘামায় নি। বস্তুত সমস্যাটা তাদের মাথায় প্রবেশই করে নি।

কিন্তু এ প্রসঙ্গ আলোচনার আগে বিপ্লব আন্দোলনের উৎপত্তি ও বিকাশের গোড়ার কথা কিছু ব'লে নেওয়া দরকার সংক্ষেপে।

সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি, সাহিত্যের মাধ্যমে আদর্শ প্রচার এবং তদুপযোগী শিক্ষা-সংগঠনের নির্দেশ, এই সব গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক কাজ বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এবং এ-বিষয়ে সর্বাগ্রগণ্য অবদান ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের। তাঁর রচিত উপন্যাস 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী' এবং সাহিত্য রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক 'ধর্মতত্ত্ব' বা 'অনুশীলন' এই উদ্দেশ্যে রচিত।

পরবর্তীকালের বৈপ্লবিক সংগঠনের নাম তাই হয়েছিল অনুশীলন সমিতি। তার সংগঠক নেতা ব্যারিস্টার পি. মিত্রের স্বদেশ প্রেমের দীক্ষাও হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই। দু'জনেরই বাড়ী ছিল নৈহাটী কাঁঠালপাড়ায়।

আবার বঙ্কিমচন্দ্রের পরামর্শেই যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ম্যাটসিনী-গ্যারিবল্ডীর জীবনী প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন।

এই রকম আর একখানি বই ছিল সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা'—রমেশ দত্ত, দাদাভাই নৌরজী, ডিগবী প্রভৃতির বই থেকে ইংরেজের ভারত-শোষণের বীভৎস তথ্য সঙ্কলন, যে বই সরকার বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ করেছিল।

১৯০২।৩ সাল থেকে বাংলার নানা জেলায় সমিতি ও আখড়া সংগঠিত হয়েছিল, যার কর্মসূচী ছিল স্বাস্থ্য চর্চা, লাঠি-ছোরা প্রভৃতি খেলা, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি আত্ম-রক্ষার কৌশল শিক্ষা, জনসেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন এবং গীতা-ক্লাস প্রভৃতির সাহায্যে যুবকদের চরিত্র গঠন।

এসব ছিল 'মানুষ তৈরির' ধান্ধা। বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি তখনও দেখা দেয়নি। সে কাজ শুরু হয়েছিল মহারাষ্ট্রে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে। পুনার 'ঠাকুর সাহেব' ছিলেন তার সংগঠক।

১৯০২ সালে বরোদারাজ্যের উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত অরবিন্দ ঘোষ ঐ ঠাকুর সাহেবের দ্বারা বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং গুজরাটের নেতৃত্বের ভার প্রাপ্ত হন। তার পরই তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রনাথকে বাংলায় পাঠান গুপ্ত বিপ্লবী দল গঠনের উদ্দেশ্যে।

বারীন ঘোষ ঐ সালের গোড়ায় বাংলায় এসে নানাস্থানে আখড়া দেখে শুনে বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরে যান। কারণ সশস্ত্র বিপ্লবের জন্যে গুপ্ত সমিতি গঠন সম্বন্ধে তিনি কোথাও অনুকূল সাড়া পান নি।

কিন্তু ঐ সময়েই বর্ধমান জেলার চান্না গ্রামের নিভৃতে এক যুবক যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরবর্তী কালের সন্ন্যাসী নিরালম্ব স্বামী) ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছিলেন। স্বাস্থ্য-শক্তি-সাহসে ভরপুর এই যুবকের মনে হল বাঙ্গালীর সামরিক শিক্ষার অভাবটাই সবচেয়ে বড় অভাব। তিনি ঠিক করলেন, নিজে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাঙ্গালী বিপ্লবী তরুণদের সামরিক শিক্ষা দেবেন।

তখন বাঙ্গালীকে সরকারী সৈন্যদলে ভর্তি করা হত না। কাজেই যতীন্দ্রনাথ কোনো

দেশীয় রাজ্যের সৈন্যদলে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে একদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। নানা রাজ্য ঘুরে শেষ পর্যন্ত তিনি বরোদায় গেলেন এবং অরবিন্দের সহায়তায় গায়কোয়াড়ের সৈন্যদলে ভর্তি হলেন। ক্রমে মহারাজার দেহরক্ষী বাহিনীর কম্যাণ্ডার হলেন।

এই অবস্থায় অরবিন্দ তাঁকে বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গঠনের পরামর্শ এবং পি. মিত্রের নামে পরিচয় পত্র দিয়ে বাংলায় পাঠালেন। তিনি কলকাতায় এসে সার্কুলার রোডে সুকিয়া স্ট্রীটের কাছে এক বাড়ী ভাড়া করে প্রথম বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গঠন করলেন।

ঠিক এই সময়ে আর একটি গুপ্ত সমিতির সংগঠন চলছিল মেদিনীপুরে হেম দাস (কানুনগো) ও সত্যেন বসুর নেতৃত্বে। সত্যেনের দাদা জ্ঞানেন্দ্রমোহন বসু (রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র অরবিন্দ-বারীন্দ্রের মাতুল) ১৯০২ সালে বুয়র যুদ্ধে ইংরেজের পরাজয়ের বিবরণ সংবাদপত্রে পাঠ করে হেম দাস ও সত্যেনকে বুঝিয়ে দেন, বুয়রদের সাফল্যের মূল কারণ তাদের গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন। ইংরেজের হাত থেকে ভারতের মুক্তির প্রকৃষ্ট উপায়ও ঐ রকম গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন। তাঁরই পরামর্শে হেম দাস-সত্যেন এক গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি গঠন করেন।

তিন সালের শেষে অরবিন্দ একবার বাংলায় আসেন এবং স্বয়ং মেদিনীপুরে গিয়ে হেম দাস ও সত্যেনকে বিপ্লবের দীক্ষা দিয়ে যান। অতঃপর হেম দাস যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আড্ডায় যাতায়াত শুরু করেন।

অরবিন্দ বরোদায় ফিরে গিয়ে চার সালের গোড়ায় বারীন্দ্রকে দ্বিতীয়বার বাংলায় পাঠান। তিনি এসে যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আড্ডাতেই বাস করতে থাকেন।

এই চার সালেই একদিকে বাংলাকে দুর্বল করার জন্যে লর্ড কুর্জন বঙ্গভঙ্গের প্ল্যান ঘোষণা করে বিদ্রোহী বাংলাকে আরো ক্ষেপিয়ে তুললেন, আর একদিকে রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়ে বাংলার বিপ্লবীরা আরো উৎসাহিত হয়ে উঠলো। সারাদেশে যেন আন্দোলনের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। পাঁচ সালের বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা সে আগুনে যেন ঘৃতাহুতি দিল। বারীন দ্বিগুণ উৎসাহে বিপ্লব প্রচারে মাতলেন।

কলকাতার অনুশীলন সমিতি কেন্দ্রীয় সংস্থা রূপে নানাস্থানে শাখা বিস্তার করতে লাগলো। বিলাতী বয়কট আন্দোলন চললো। তার রণধ্বনি হল বন্দেমাতরম। গোলামি শিক্ষা বর্জন করার জন্যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সংগঠিত হল। অরবিন্দ বরোদার মোটা মাইনের চাকরি ছেড়ে কলকাতায় এসে ৭৫ টাকা মাইনে নিয়ে জাতীয় শিক্ষালয়ের শিক্ষক হলেন। জাতীয় শিক্ষা তহবিলে লাখটাকা দান করে জনগণের কাছে 'রাজা' বলে সম্মানিত হলেন সুবোধ মল্লিক। সুরেন ব্যানার্জি, বিপিন পাল, এ. রসুল, মৌলবী লিয়াকৎ হোসেনের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা এবং রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান ও কবিতার বন্যাপ্রবাহে সারাদেশ তোলপাড় হয়ে উঠলো।

ইতিমধ্যে বারীনের বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টা এক পৃথক নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিলিটারী শিক্ষা ও মিলিটারী ডিসিপ্লিনের বহর দেখে চটে গিয়ে তিনি তাঁর আড্ডা ছেড়ে গ্রে স্ট্রীটে এক নতুন আড্ডা করেছেন। পি. মিত্রের লাঠির আখড়ার উপরও তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন। সশস্ত্র বিপ্লবের ব্যাপক প্রচারের জন্যে তিনি কোমর বেঁধেছেন। তারই ফলে ৬ সালের শেষে বিখ্যাত বিপ্লবী সাপ্তাহিক পত্র 'যুগান্তর'

প্রকাশিত হলো। তাঁর সঙ্গে আছেন দেবব্রত বসু, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। অরবিন্দ নতুন দলের সভাপতি।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের গোড়ায় ঢাকায় পুলিন দাস এক লাঠিখেলার আখড়া এবং সমিতি গঠন করেছিলেন। পি. মিত্র অনুশীলন সমিতির কার্যক্ষেত্র বিস্তারের জন্যে ঢাকায় গিয়ে পুলিন দাসের কর্মশক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পুলিন দাস কলকাতাতে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন। পরে তিনি পি. মিত্র কর্তৃক বিপ্লবের দীক্ষালাভ করেন এবং পূর্ববঙ্গে অনুশীলন সমিতি সংগঠনের ভার প্রাপ্ত হন।

পুলিন দাস ঢাকাকে কেন্দ্র করে সমগ্র পূর্ববঙ্গে প্রায় ৫০০ শাখা স্থাপন করেছিলেন, হাজার হাজার তরুণ বিপ্লবী তৈরী করেছিলেন। বৈপ্লবিক উপায়ে অর্থসংগ্রহ এবং পথের কণ্টক অপসারণের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছিল।

যুগান্তর কাগজের আড়ালে বারীন এক গুপ্ত বোমার কারখানাও স্থাপন করেছিলেন মানিকতলায় মুরারিপুকুর বাগানে। উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ বাছাবাছা বোমাপন্থী যুবক সেখানে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীরূপে ধর্মালোচনায় এবং রাত্রির অন্ধকারে বোমা তৈরিতে নিযুক্ত হলেন। ইতিমধ্যে হেম দাস ইউরোপ থেকে বোমা তৈরী শিখে এসেছেন। তিনিও বারীন্দ্রের দলে যোগ দিলেন।

প্রকাশ্য স্বদেশী আন্দোলন দমনের সঙ্গে সংবাদপত্র দলনের দিকে সরকার নজর দিলেন। সাত সালে যুগান্তরের প্রথম সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের (পরে ডক্টর) জেল হল। সংবাদ পত্র দলনে কুখ্যাত ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে বিপ্লবীরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। আঁচ পেয়ে সরকার তাঁকে মজঃফরপুরে জেলা জজরূপে বদলি করলেন। তাকে হত্যা করার জন্যে বোমা ও পিস্তলসহ মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম এবং উত্তর বঙ্গের প্রফুল্ল চাকী প্রেরিত হলেন।

কিংসফোর্ডের গাড়িতে বোমা মারা হয়েছিল ঠিকই, বোমা ঠিক কাজও দিয়েছিল; কিন্তু সে গাড়িতে কিংসফোর্ডের বদলে ছিলেন মিসেস ও মিস কেনেডি। সুতরাং তাঁরা নিহত হলেন, কিংসফোর্ড বেচে গেল। ক্ষুদিরাম ঘটনাস্থলের কিছু দূরে ধরা পড়লেন রিভলভার সমেত। তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল। প্রফুল্ল চাকীও ঘটনার পরদিন রেলস্টেশনে গোয়েন্দা সাব ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জ কতৃক গ্রেপ্তার হয়ে নিজ রিভলভারের গুলীতে আত্মহত্যা করলেন। পরে এই নন্দলালও সার্পেন্টাইন লেনে বিপ্লবীদের গুলীতে নিহত হয়েছিলেন।

মজঃফরপুরের ঘটনার পরই পুলিসের বেড়াজালে অরবিন্দ-বারীন্দ্রের বিপ্লবী গোষ্ঠী ধরা পড়ে গেল। জেলে থাকা কালে নরেন্দ্র গোস্বামী পুলিসকে ভিতরের কথা বলতে শুরু করে। পাছে সে মামলায় রাজসাক্ষী হয়, তাই বিপ্লবীরা তাকে হত্যা করার মতলবে বাইরের সাথীদের সাথে যোগাযোগ করে রিভলভার সংগ্রহ করে এবং আলিপুর জেলের মধ্যেই সত্যেন ও কানাইলাল তাকে হত্যা করে।

সত্যেনের গুলীতে নরেন পায়ে জখম হয়ে পালাতে থাকে। কানাইলাল পিছনে তাড়া করে গুলী চালাতে থাকে। নরেন পড়ে গেলে কানাইলাল একে একে তার সব গুলী নরেনের উপর নিঃশেষ করে রিভলভার ত্যাগ করে এবং গ্রেপ্তার হয়।

বিচারে প্রথমে কানাইলালের এবং পরে সত্যেনের ফাঁসি হয়। কানাইলালের শবদেহ

তাঁর ভাইয়ের হাতে দেওয়া হয়। সেই শবদেহ নিয়ে সারা কলকাতার লোক শোভাযাত্রা করে অপূর্ব ঘটা ক'রে চন্দনকাষ্ঠের স্তূপসহ দাহ ক'রে। তাই পরে সত্যেনের শবদেহ তাঁর আত্মীয়দের হাতে দেওয়া হয়নি। সে দেহ জেলের মধ্যেই দাহ করা হয়।

এর মধ্যে আট সালে বাংলার সমস্ত সমিতি বেআইনী করে দেওয়া হয় এবং প্রকাশ্য আন্দোলনের ৮ জন নেতার সঙ্গে পুলিন দাসকে ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনে জেলে আটক করা হয়। সমিতি উঠে যায়, বিপ্লব আন্দোলন থমকে যায়।

দেশের লোক ক্ষুদিরামকে নিয়ে গান বেঁধেছিল, কানাইলালকে নিয়ে অদ্ভুত কাল্পনিক গল্প রচনা করেছিল। আনন্দ উৎসাহ-উত্তেজনায় দিনকতক প্রায় উন্মাদ হয়েছিল। এই কারণেই বারীন ঘোষ বলেছিলেন, 'My mission is over'—বাঙ্গালী যে মারতে পারে এবং হাসিমুখে মরতে পারে, এই বিশ্বাসই একদিন সশস্ত্র বিপ্লবের সম্ভাব্যতাকে বাস্তবে রূপায়িত করবে।

কিন্তু বিপ্লবীদের সমস্যাগুলো তাদেরই নিতান্ত নিজস্ব রয়ে গেল। সাধারণ মানুষ দিনকতক নেচে কুঁদে হাঁপিয়ে, মনের গ্যাস বের করে দিয়ে হালকা হয়ে নিজেদের কাজে মন দিলে। গুপ্ত বিপ্লবীদলের নড়তে চড়তে যে টাকার প্রয়োজন, দেশবাসীর উৎসাহ সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না। ওরা সব পারে, ভূগর্ভে অস্ত্রের কারখানা, সর্বত্র গতিবিধি, বিরাট গুপ্তবাহিনী, ওরাই এ-সব করবে, আমরা ওদের আরো বাহবা দোব—ভাবখানা কতকটা এই রকম।

অথচ একটি একটি করে যে-কোন রকমের পিস্তল সাধারণ জাহাজী স্মাগলারদের কাছ থেকে বাজার দরের দশগুণ দাম দিয়ে কিনতে হয়। সে বাজারেও স্পাই আছে, টাকা মারা যায়, ধরা পড়তে হয়, মামলা চালাতে হয়, ফেরারী পুষতে হয়, পুলিস খুন করতে হয়,—টাকার শ্রাদ্ধ হয়ে যায়। টাকা কোথা থেকে আসবে? ডাকাতিই সাধারণ উপায়, সকল দেশেই। সান ইয়াট-সেন নাকি আফিং স্মাগলারদের কাছ থেকেও সাহায্য নিতেন, যে আফিং স্মাগলাররা চীনাদের আফিংখোর করে তোলার সহায়। স্টেলিনও তরুণ বয়সেই লেনিনকে নির্বাসনে অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছিলেন—ঘোড়া চুরি করে হাটে বেচে অর্থ সংগ্রহ করে।

টাকার জন্য শত বদনাম, সহস্র ঝকমারি-বরণ গুপ্ত বিপ্লবীদের নিয়তি সর্বদেশে, সর্বকালে। দাদা বাঘা যতীন ডাকাতির বিরোধী ছিলেন। তাঁর মনোভাব এবং কাজও ছিল অনন্যসাধারণ। অন্য বিপ্লবীদের জরুরী টাকার প্রয়োজনে তাঁর কাছে লোক এসেছে কিছু অর্থ সাহায্যের জন্যে। তিনি সে দিন মাইনে পেয়েছেন, পথেই পকেট থেকে সমগ্র টাকাটা তুলে দিয়ে দিলেন। অথচ পরিবারের নির্ভর সেই টাকাগুলোই।

যাই হোক, টাকার প্রয়োজনে ডাকাতি প্রথম যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অনেক বেশী ডাকাতি হ'ত পূর্ববঙ্গে ঢাকা অনুশীলন পার্টির দ্বারা। ১৯০৮-৯ সালে প্রেস আইন এবং সমিতি বে-আইনী করে গভর্নমেন্ট বিপ্লব প্রচারের ওপর প্রকাণ্ড আঘাত হেনে প্রচার এবং দল গড়ার কাজে গুপ্ত সমিতিগুলোকে কিছুকালের জন্য থমকে দিয়েছিল বটে, কিন্তু ডাকাতি, বিশেষত পূর্ববঙ্গে, বন্ধ হয়নি। কারণ মামলার পর মামলায় টাকার প্রয়োজন যেন বেড়ে চলেছিল। আনুষঙ্গিকভাবে গোয়েন্দা-স্পাই খুন, দলের বিশ্বাসঘাতক খুন, মামলার সরকারী সাক্ষী খুনও চলেছিল বরাবরই।

টালায় সমিতি উঠে যাবার পর কয়েকটা বছর রাজনীতি এবং বিপ্লব প্রচারের নামগন্ধ প্রায় লোপ পেয়েছিল। '১২ সালে দিল্লীতে হার্ডিঞ্জের ব্যাপারে আবার একটু উৎসাহ-চাঞ্চল্য শুরু হল। '১৩ সালে বর্ধমানে দামোদরের বন্যায় টালা থেকে একদল কর্মী গেল। গুপ্ত সমিতির সে যেন একটা সমাবেশের সুযোগ।

আমি তখন অত অল্প বয়সেই রেলের গুড্‌স শেডে এক টেম্পোরারী চাকরিতে ঢুকে ইংরেজীর একটু পরীক্ষা দিয়ে পার্মানেন্ট হয়েছি। আমার দামোদর বন্যায় যাওয়া হল না। তার কিছুদিন পরেই লাগলো যুদ্ধ এবং তারপর জার্মান ষড়যন্ত্র।

তারপর আমি শিয়ালদায় বদলি হয়ে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান শেড ইনস্পেক্টরের সঙ্গে ঝগড়া করে রিজাইন দিয়ে চলে এলুম। মনটা স্বস্তিতে ভরে গেল, যেন অধঃপাতের পথ থেকে ফিরে এসেছি।

এরপর একদিন এলো mobilisation-এর order—প্রত্যেককে ৫ জন করে নতুন রিক্রুট করতে হবে যতশীঘ্র সম্ভব এবং জরুরী অবস্থার জন্যে তৈরী থাকতে হবে। বুঝলুম অভ্যুত্থান আসন্ন।

১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা হয়েছিল জার্মান অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে। বোধনের আগেই বিসর্জন হয়ে গেল।

পরে বিপ্লব-আন্দোলন সমূলে বিনাশের জন্য বিপ্লব-আন্দোলনের ইতিহাস পরীক্ষা করে বে-আইনী আইন তৈরির পরামর্শ দেবার জন্যে সরকার (১৯১৭-১৮ সাল) যে সিডিশন (রৌলট কমিটি) কমিটি বসিয়েছিল, সেই কমিটির রিপোর্ট অনুসারে জার্মান ষড়যন্ত্রের সরকারী বিবরণ এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করলুম। এ থেকেই ঘটনাটা সম্বন্ধে ধারণা মোটামুটি পরিষ্কার হবে।

১৯১১ সালের আগে থেকেই হরদয়াল আমেরিকায় গদর পার্টি গঠন করে ইউরোপের ভারতীয় বিপ্লবীদলের ও জার্মান এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রচার চালাচ্ছিলেন—জার্মানী ভারত আক্রমণ করবেই এবং যুদ্ধ বাধলে জার্মানীর সাহায্য নিয়ে ভারতে বিপ্লব অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। ডক্টর তারকনাথ দাস, হেরম্বলাল গুপ্ত প্রভৃতিও তাঁর সঙ্গে কাজ করছিলেন। যুদ্ধ বাধার পর হেরম্বলাল কিছুদিনের জন্যে ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে জার্মানীর প্রতিনিধিরূপে কাজ করেছিলেন। ওদিকে জার্মানীতে বরকতউল্লা, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী প্রভৃতিও জার্মান সমর বিভাগের সঙ্গে যোগস্থাপন করেছিলেন। চম্পকরমণ পিল্লাই জার্মান বৈদেশিক দপ্তরে চাকরি নিয়ে জার্মানী ও আমেরিকার ভারতীয় বিপ্লবীদলের যোগাযোগের ব্যবস্থার সাহায্য করছিলেন। বরকতউল্লার উপর ভার দেওয়া হয়েছিল ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে বিপ্লব প্রচারের। বার্লিন থেকে চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীকে সানফ্রান্সিস্কোতে পাঠানো হয়েছিল হেরম্ব গুপ্তের স্থলে কাজ করার জন্যে।

জার্মান সমর বিভাগের পরিকল্পনা ছিল, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ প্রচারের ঘাঁটি করতে হবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। আর সানফ্রান্সিস্কোর গদর পার্টি ও বাংলার বিপ্লবীদলের সঙ্গে কাজ করার ঘাঁটি হবে ব্যাংকক এবং বাটাভিয়াতে।

১৯১৪ সালের শেষে পিংলে এবং সত্যেন্দ্র সেন আমেরিকা থেকে ভারতে আসেন। পিংলে উত্তর প্রদেশে অভ্যুত্থানের বন্দোবস্ত করতে যান। আর সত্যেন্দ্র সেন কলকাতায় থেকে যান।

'১৪ সালেই পুলিস খবর পায়, হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ের ওয়াই. এম. সি. এর বাড়ীতে শ্রমজীবী সমবায় নামক দোকানের মালিক অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও রায় মজুমদার প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্যে যতীন মুখার্জি, অতুল ঘোষ ও নরেন্দ্র ভট্টাচার্যের (এম. এন. রায়) সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে।

'১৫ সালের গোড়াতেই বাংলার বিপ্লবীরা শ্যাম ও অন্যান্য স্থানের ভারতীয় বিপ্লবীদের এবং জার্মানদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে বিপ্লব অভ্যুত্থানের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার এবং ডাকাতির সাহায্যেই অর্থ সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত স্থির করেন।

তদনুসারে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে গার্ডেনরীচ ও বেলেঘাটায় ডাকাতি করে ৪০ হাজার টাকা সংগৃহীত হল। ভোলানাথ চ্যাটার্জিকে ইতিপূর্বেই ব্যাঙ্ককে পাঠানো হয়েছিল যোগাযোগের জন্যে। মার্চ মাসে জিতেন লাহিড়ী (শ্রীরামপুরের) ইউরোপ থেকে ভারতে এসে জার্মানীর সাহায্যের প্রস্তাবের সংবাদ দিয়ে বাংলার বিপ্লবীদের একজন প্রতিনিধিকে বাটাভিয়ায় যোগাযোগের জন্যে পাঠাতে বলেন। তদনুসারে পরামর্শ করে নরেন ভট্টাচার্যকে বাটাভিয়ায় পাঠানো হয় জার্মানদের সঙ্গে যোগস্থাপন করতে। তিনি সি. মার্টিন নাম নিয়ে ছদ্মবেশে বাটাভিয়ায় যান এপ্রিল মাসে।

তারপরই অবনী মুখার্জিকে পাঠানো হয় জাপানে। গার্ডেনরীচ ডাকাতির পর পুলিস পিছনে লাগায় ষড়যন্ত্রের নেতা যতীন মুখার্জি ফেরার হয়ে বালেশ্বরে গিয়ে বসেন। ওদিকে জার্মান জাহাজ ম্যাভারিক ক্যালিফোর্নিয়া থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভারতের দিকে যাত্রা শুরু করে।

বাটাভিয়ায় 'মার্টিন'কে বলা হয়, ৩০ হাজার রাইফেল ও প্রত্যেক রাইফেলের জন্য ৪০০ করে বুলেট, এবং দু লাখ টাকা নিয়ে ম্যাভারিক ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্যে করাচীতে যাচ্ছে। মার্টিনের অনুরোধে সাংহাইয়ের জার্মান কনসালের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হয়, জাহাজখানাকে করাচীর বদলে বাংলায় পাঠানো হবে। তারপর মার্টিন ফিরে এসে সুন্দরবনে রায়মঙ্গলে অস্ত্রশস্ত্র নামানোর বন্দোবস্ত করেন।

ইতিমধ্যে তিনি কলকাতার হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সের অফিসে তার করে জানান, ব্যবসার অবস্থা ভাল। হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স হরিকুমার চক্রবর্তী কর্তৃক পরিচালিত ভুয়ো ফার্ম—ষড়যন্ত্রের অন্যতম ঘাঁটি। মার্টিনের বন্দোবস্তে বাটাভিয়ার জার্মান ব্যবসায়ীরূপে হেলফারিখের কাছ থেকে হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সের অফিসে কয়েক দফায় ৪৩ হাজার টাকা পাঠানো হয় কিন্তু ৩৩ হাজার টাকা পৌঁছানোর পর পুলিস ব্যাপারটা জানতে পারে।

তারপর যতীন মুখার্জি, যাদুগোপাল মুখার্জি, নরেন ভট্টাচার্য, ভোলানাথ চ্যাটার্জি এবং অতুল ঘোষ মিলে বন্দোবস্ত করেন, জার্মান অস্ত্রশস্ত্র তিনভাগে ভাগ করে একভাগ বরিশাল পার্টির হাতে পূর্ববঙ্গে অভ্যুত্থানের জন্যে হাতিয়ায় নামানো হবে। একভাগ যাবে বালেশ্বরে—শৈলেশ্বর বসু পরিচালিত ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম নামক ভুয়ো ফার্ম ষড়যন্ত্রের অন্যতম ঘাঁটিতে—আর একভাগ কলকাতায়।

বাংলায় যে সৈন্য ছিল, তার পক্ষে বিপ্লবীদের লোকবল ছিল যথেষ্ট। কিন্তু বাংলার বাইরে থেকে সৈন্য এলে, সেইটে হবে ভয়ের কারণ। কাজেই সেটা বন্ধ করার প্রয়োজনে তিনটে প্রধান রেল পথের পুলগুলো উড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থার জন্যে ঠিক হল, যতীন

মুখার্জি ব্যলেশ্বর থেকে মাদ্রাজ রেল লাইনটাকে ভেঙ্গে দেবেন ; বেঙ্গল-নাগপুর রেল সামাল দিতে ভোলানাথ চ্যাটার্জিকে পাঠানো হবে চক্রধরপুরে এবং ই. আই. রেল লাইনের জন্যে অজয়ের পুল উড়িয়ে দিতে সতীশ চক্রবর্তী যাবেন।

নরেন ঘোষচৌধুরী এবং ফণী চক্রবর্তী হাতিয়ায় গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এক সেনাবাহিনী গঠন করে পূর্ববঙ্গ দখল করবেন। তারপর কলকাতার দিকে অভিযান করবেন। আর কলকাতায় নরেন ভট্টাচার্য এবং বিপিন গাঙ্গুলীর দল প্রথমে কলকাতার আশপাশের অস্ত্রাগার লুঠ করবেন। তারপর ফোর্ট উইলিয়ম দখল করবেন। ম্যাভারিকের জার্মান অফিসাররা পূর্ববঙ্গে সংগৃহীত বাহিনীকে সামরিক শিক্ষা দেবার জন্যে পূর্ববঙ্গেই থেকে যাবেন।

ইতিমধ্যে যাদুগোপাল মুখার্জি রায়মঙ্গলের কাছে এক জমিদারের সঙ্গে জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামাবার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। জাহাজ যেখানে ভিড়বে, সেখানকার নিশানা হিসাবে এক সারি আলো ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। ১লা জুলাই অস্ত্রশস্ত্র বণ্টন করা হবে।

অতুল ঘোষের নেতৃত্বে একদল লোক নৌকাযোগে রায়মঙ্গলের কাছে গিয়ে দশ দিন অপেক্ষা করছিল। কিন্তু জুনের শেষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাহাজও পৌছালো না এবং বাটাভিয়া থেকে দেরির কারণ সম্বন্ধে কোন খবরও এল না।

৩রা জুলাই ব্যাঙ্কক থেকে পাঞ্জাবী বিপ্লবী আত্মারামের এক চিঠি নিয়ে এক বাঙ্গালী বিপ্লবী এসে খবর দিলেন, শ্যামের জার্মান কনসাল ৫ হাজার রাইফেল, কার্ট্রিজ এবং একলাখ টাকা এক বোটে করে রায়মঙ্গল পাঠাচ্ছে। আগের প্ল্যান পরিবর্তন করা হয়েছে মনে করে বাংলার বিপ্লবীরা বাঙ্গালী দূতকে ব্যাঙ্ককে ফেরত পাঠালেন, তিনি বাটাভিয়া হয়ে হেলফারিখকে বলে যাবেন—আগের প্ল্যান যেন বদল করা না হয় এবং অস্ত্রশস্ত্রের অন্য চালান যেন হাতিয়ায় ও বালেশ্বরে পাঠানো হয় বা ভারতের পশ্চিম উপকূলে কারোয়ারের দক্ষিণে গোকর্নাতে পাঠানো হয়।

এদিকে জুলাই মাসেই পুলিস রায়মঙ্গলের খবর পেয়ে গেল এবং তৈরী হল। ৭ই আগস্ট হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সের অফিস খানাতল্লাসি হল এবং কয়েকজন গ্রেপ্তার হল।

১৩ই আগস্ট বম্বে থেকে হেলফারিখকে সতর্ক করে এক তার পাঠানো হল। ১৫ই নরেন ভট্টাচার্য (মার্টিন) ও আর একজন হেলফারিখের সঙ্গে আলোচনার জন্যে বাটাভিয়ায় রওনা হলেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর বালেশ্বরে ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম খানাতল্লাসি হল। তারপর ২০ মাইল দূরে কাপ্তিপদায় যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে প্রথম বাঙ্গালী বিপ্লবীদের ট্রেঞ্চ যুদ্ধ—যে কাহিনী আজ বাংলা দেশে সর্বজনবিদিত।

সে যুদ্ধের বাহিনী মাত্র ৫ জনের ক্ষুদ্র দল। সশস্ত্র পুলিস ও সৈন্যের প্রকাণ্ড দলের বিরুদ্ধে বহুক্ষণ যুঝে শেষ পর্যন্ত তাঁদের পরাজয় হল। যতীন মুখার্জি গুলীর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বন্দী হয়ে হাসপাতালে মারা গেলেন। চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী (যিনি হেদোর মোড়ে গোয়েন্দা অফিসার সুরেশ মুখার্জিকে হত্যা করেছিলেন) আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা গেলেন। আর মনোরঞ্জন, নীরেন ও জ্যোতিষ বন্দী হলেন। পরে মনোরঞ্জন ও নীরেনের ফাঁসি হয় এবং জ্যোতিষ পাগল হয়ে যান। ফাঁসির আগের দিন মনোরঞ্জন বাড়ীতে চিঠি লিখেছিলেন—কাল আমাদের বিজয়া।

এদিকে বাটাভিয়া থেকে মার্টিনেরও কোন খবর আসে না দেখে দু'জন বিপ্লবী গোয়ায় গেলেন বাটাভিয়ার সঙ্গে তারে খবরাখবর চালাবার চেষ্টায়। ২৭শে ডিসেম্বর মার্টিনের কাছে এক তার করা হল, How doing no news very anxious—Chatterton. সেই টেলিগ্রাম ধরেই গোয়ায় দু'জন বাঙ্গালীকে ধরা হল। তার একজন ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়। পুলিস বলে, তিনি পুণা জেলে আত্মহত্যা করেন। আমরা শুনেছি, পুলিসের অত্যাচারে তিনি গোয়াতেই নিহত হয়েছিলেন।

এপ্রিল মাসে ম্যাভারিক যখন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে যাত্রা শুরু করে, তখন তাতে অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। ছিল ২৫ জন অফিসার ও নাবিক এবং ৫ জন ভারতীয় বিপ্লবী। পারস্যদেশীয় ভৃত্য পরিচয়ে তাঁরা ভারতে আসছিলেন। তার মধ্যে একজন পাঞ্জাবী—নাম হরি সিং—ট্রাঙ্ক বোঝাই গদর সাহিত্য নিয়ে আসছিলেন। পথে সমুদ্রের বুকে আর একটা জাহাজ থেকে ম্যাভারিক অস্ত্র বোঝাই করে নেবে, এই ব্যবস্থা ছিল। দরকার হলে, শত্রুর হাতে পড়ার বদলে জাহাজটা ডুবিয়ে দেওয়ারও নির্দেশ ছিল।

সে জাহাজটার সঙ্গে ম্যাভারিকের দেখাই হল না। সে জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র সহ আমেরিকায় ফিরে গিয়ে ধরা পড়ে গেল এবং অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত হল। ম্যাভারিক বাটাভিয়ায় এলে অফিসার ও নাবিকদের হেলফারিখ আমেরিকায় ফেরত পাঠালেন এবং হরি সিং-এর পরিবর্তে মার্টিনকে সেই সঙ্গে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই ভাবে মার্টিন (নরেন্দ্র ভট্টাচার্য) আমেরিকায় পালালেন। কিন্তু সেখানে গিয়েই তিনি গ্রেপ্তার হলেন। পরে আমেরিকায় জার্মান ষড়যন্ত্রের মামলার আসামী হয়ে তিনি মেক্সিকোয় পালিয়ে যান।

ইতিমধ্যে আর একটা ছোট জাহাজে ৫০০০ মশার পিস্তল ও কার্টিজ চট্টগ্রামের (সন্দ্বীপ হাতিয়া) জন্যে আসছিল। কিন্তু সেটা সাংহাইয়ে ধরা পড়ে যায়। ওদিকে ম্যাভারিক প্ল্যান বানচাল হওয়ার পর সাংহাইয়ের জার্মান কনসাল অন্য দু'খানা জাহাজে বঙ্গোপসাগরে অস্ত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। একটাতে রায়মঙ্গলের জন্য ২০০০০ রাইফেল, ৮০ লাখ কার্টিজ, দু হাজার পিস্তল এবং হ্যাণ্ডগ্রেনেড ও বোমা এবং দু লাখ টাকা যাবে। আর একটাতে বালেশ্বরের জন্যে যাবে দশ হাজার রাইফেল, দশ লাখ কার্টিজ এবং হ্যাণ্ড-গ্রেনেড ও বোমা।

কিন্তু মার্টিন বাটাভিয়ার জার্মান কনসালকে বলেন, রায়মঙ্গল আর নিরাপদ নয়, সুতরাং ও জাহাজটা হাতিয়ায় পাঠানো হোক। তদনুসারে হেলফারিখের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হয়, একটা জাহাজ ডিসেম্বরে সরাসরি সাংহাই থেকে হাতিয়ায় যাবে; এক ডাচ পোর্ট থেকে একটা খালি জাহাজ ছেড়ে সমুদ্রের ওপর আর এক জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র তুলে নিয়ে বালেশ্বরে যাবে; আর একটা তৃতীয় জাহাজ সমুদ্রবক্ষে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করে নিয়ে আন্দামান আক্রমণ করবে এবং পোর্ট ব্লেয়ার থেকে বিপ্লবী বন্দী ও সিঙ্গাপুরের বিদ্রোহী বন্দী সৈন্যদের মুক্ত করে নিয়ে রেঙ্গুন আক্রমণ করবে।

মার্টিনের সঙ্গে অপর যে বাঙ্গালী বিপ্লবী বাটাভিয়ায় গিয়েছিলেন, তাঁকে সাংহাইয়ে পাঠানো হল, জার্মান কনসালের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি হাতিয়ার জাহাজে ফিরবেন বলে। কিন্তু তিনি অনেক কষ্টে সাংহাইয়ে পৌছেই গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন।

অক্টোবরে দুজন চীনার মারফত ১২৯টা অটোমেটিক পিস্তল এবং ২০৮৩০টা বুলেট

কলকাতায় পাঠানো হচ্ছিল তক্তার বাক্সগুলোর মধ্যে লুকিয়ে, শ্রমজীবী সমবায়ের অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে দেবার জন্যে। কিন্তু সাংহাই পুলিসের হাতেই তারা ধরা পড়ে গেল।

যে ঠিকানা থেকে তাদের পাঠানো হচ্ছিল, সেই ঠিকানাটা আবার পাওয়া গেল অবনী মুখার্জীর নোটবুকে, যিনি জাপান থেকে ভারতে ফেরার সময় সিঙ্গাপুরে ধরা পড়ে যান। তখন রাসবিহারী বসু সেই ঠিকানায় বাস করছিলেন। অবনী মুখার্জীর নোট বুকে আরো অনেক ঠিকানা পাওয়া যায়—চন্দননগর, কলকাতা, ঢাকা ও কুমিল্লা সমেত শ্যামের এক ইঞ্জিনিয়ার অমর সিং এর ঠিকানাও পাওয়া যায়, পরে মান্দালয় জেলে যাঁর ফাঁসি হয়েছিল। যাই হোক, রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে যে জার্মান ষড়যন্ত্রের আর একটা শাখা গড়ে উঠছিল, তাও বোঝা গেল।

সব ষড়যন্ত্র বানচাল এবং দাদার (যতীন মুখার্জীর) মৃত্যুর পর বিপ্লবী নেতারা চন্দননগরে আশ্রয় নিলেন। আমার চন্দননগর যাত্রা তারই পরের ঘটনা।

আর ইউ পি-তে শচীন সান্যাল যে কাজ শুরু করেছিলেন কাশীতে, তার সঙ্গে ইউ. পি-র অনুশীলন পার্টির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছিল। কিন্তু তারা রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বেই কাজ করেছিলেন, যার সঙ্গে যতীন মুখার্জী, অমরেন্দ্র চ্যাটার্জী প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

আবার, হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা মারার সম্পর্কে যে বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি হয়েছিল, সে বসন্ত বিশ্বাস (অমরদার আত্মশক্তি লাইব্রেরীর মন্মথ বিশ্বাস ওরফে মোটাদার দাদা) দেরাদুনে রাসবিহারী বসুর বাসার ভৃত্য পরিচয়ে গা ঢাকা দিয়ে বাস করতেন, এবং তিনি ছিলেন অমরদার চেলা।

'১২ সালের শেষে যখন দিল্লীতে বোমা পড়ে, তখন তার কোন কিনারা পুলিস করতে পারেনি। তারপর '১৪ সালে আর একটা বোমা মারা সম্পর্কে বসন্ত বিশ্বাস ধরা পড়েন এবং মামলার অ্যাপ্রুভার দীননাথের স্বীকারোক্তিতে হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপকারী বলে বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি হয়। সে মামলায় আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ এবং অবোধবিহারীরও ফাঁসি হয়।

যাই হোক, রাসবিহারী কাশীতে বাঙ্গালী-টোলায় শচীন সান্যালের আড্ডায় আশ্রয় নিলেন।

মারাঠী দলের বিপ্লবী পিংলে রাসবিহারীকে লাহোরে নিয়ে যান, তিনি '১৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে বিপ্লব অভ্যুত্থানের আয়োজন করেন। দলের মধ্যেকার বিশ্বাসঘাতক স্পাইয়ের কাছে পুলিস খবর পায় এবং সব চেষ্টা পণ্ড হয়। কোমাগাতা মারুর ফেরত অন্তরীণ অনেক শিখও বন্দী হন।

পিংলে ও রাসবিহারী সরে পড়েন। একমাস পরে পিংলে এক ক্যান্টনমেন্টে বোমা সহ ধরা পড়েন এবং তাঁর ফাঁসি হয়। আর রাসবিহারী কলকাতায় চলে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত জাপানে চলে যান গোপনে।

এদিকে গার্ডেনরীচ ডাকাতির পর পুলিস পিছনে লাগায় যতীন মুখার্জি ও বিপিন গাঙ্গুলী যখন গা ঢাকা দিয়েছেন, তখন বিপিন গাঙ্গুলীর মলঙ্গা গ্রুপ এক বিরাট বন্দুক-সংগ্রহ-চেষ্টায় সফল হয়। বিখ্যাত মশার পিস্তল ৫০টা এবং ৪৬ হাজার কার্টিজ—বন্দুক-বিক্রেতা রডা কোম্পানীর মাল।

মলঙ্গা লেনের বকাটে ছেলের দল ছিল অনুকূলদার চেলা। আর তাদেরই মধ্যে একজন ছিল শ্রীশ মিত্র ওরফে হাবু। গায়ে তার শক্তিও অসাম, আর মনে সাহসও তেমনি। সে একবার এক নিউমার্কেটে কসাইদের ঠেঙ্গিয়ে এসেছিল। সে এক অফিসে ৪০ টাকা মাইনেতে চাকরি করতে। সে চাকরি ছাড়িয়ে অনুকূলদা তাকে রডা কোম্পানীর জেটি সরকারের কাজ যোগাড় করে দিয়েছিলেন অল্প বেতনে।

১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে একদিন রডা কোম্পানির বন্দুকের চালান খালাস করতে গিয়ে হাবু শেষের একগাড়ি মাল—দশটা বাক্স এক গাড়ি বোঝাই—নিয়ে এসে হাজির করলো মলঙ্গা লেনে। শানের মোড়ে কে. সি. মুখার্জি এণ্ড সন্সের লোহার কড়ি প্রভৃতির দোকান ছিল এবং সামনে খানিকটা জায়গা ছিল। সেইখানে মাল খালাস করে গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হল। মালিক ত্রৈলোক্য মুখার্জি এবং তাঁর মুটেরা বলে, এসব মাল আমাদের নয়, হটাও এখান থেকে। অনুকূলদা চেলাদের নিয়ে কোমর বেঁধে লাগলেন।

দুর্দান্ত জোয়ান পূর্ণ হাজরা ওরফে পোনামাতাল, প্রমথ দাস ওরফে ল্যাটা ভাবী বাক্সগুলোকে চাকিতের মধ্যে সরিয়ে ফেললে। হাবু বলে, কি মাল আনলুম, দেখে যাবো না? তা হবে না। তাকে ৪৪ নম্বর মলঙ্গা লেনের মেস বাড়ীর ছাতের ওপর একদিন রেখে দেওয়া হল। বাক্স খুলে ৪৭টা পিস্তল ও প্রায় সব কার্টিজ সকল বিপ্লবীদের মধ্যে বেঁটে দেওয়া হল। সবই এক দিনের মধ্যেই। হাবুকেও সরিয়ে দেওয়া হল।

পরের দিনই পুলিস এসে পড়লো। লোহার দোকানে মাঠ দেখিয়ে দিলে গাড়োয়ান। ত্রৈলোক্যবাবু এবং উড়ে মুটেরা বললে, আমাদের এখানে এমন কোন মাল আসে নি। অনুকূলদা, গিরিনদা, কালিদাস বোসের বাড়ী খানাতল্লাসি হল।

অনুকূলদা প্রভৃতি গ্রেপ্তার হলেন। গিরিনদার বাড়ীতে নরেন ব্যানার্জীও থাকতেন। গিরিনদার ছোট ভাইয়ের ডাকনাম ছিল কাটু। পুলিস প্রশ্ন করছে, Who is Naren Banerjee? Who is Katu? নরেন ব্যানার্জি এগিয়ে এসে বললেন, আমারই ডাকনাম কাটু। সকলে চেপে গেল। নরেন ব্যানার্জিও গ্রেপ্তার হলেন। আর গ্রেপ্তার হলেন জেলে পাড়ার ভুজঙ্গ ধর। হাবু সেই যে ফেরার হল, আজ পর্যন্ত তার পাত্তা পাওয়া যায় নি।

সাত মাস মামলা চললো। নরেন ব্যানার্জিকে মিথ্যা করে গাড়োয়ান সনাক্ত করলে। তাঁর দু বছর জেল হল। কালিদাস বসু এবং ভুজঙ্গ ধরেরও জেল হল। অনুকূলদা এবং গিরিনদা খালাস হলেন, এবং পনের সালের শেষে ডিফেন্স অ্যাক্ট জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরীণের আদেশ পেলেন—জলপাইগুড়ি জেলার পচাগড় থানায় গিরিনদা এবং ময়নাগুড়ি থানায় অনুকূলদা।

একসঙ্গে পঞ্চাশটা মশার পিস্তল পেয়ে বিপ্লবীদের উৎসাহ বেড়ে গেল। চৌদ্দ সালের শেষ থেকে ১৭ সাল পর্যন্ত চুয়ান্নটা ডাকাতি-খুনের মধ্যে মশার পিস্তল ব্যবহার হয়েছিল এবং একত্রিশটা মশার পুলিসের হস্তগত হয়েছিল।

চৌদ্দ সালের শেষে আলমবাজারের কাছে এক ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ হয়। 'ডাকাত'দের ধরে পুলিস যখন ঠেঙ্গাচ্ছে, তখন একজনের ভাই এসে আড্ডায় খবর দিলে, অমুককে পুলিস ঠেঙ্গিয়ে মেরে ফেলছে, আর এখানে আপনারা চুপ করে বসে আছেন?

সেখানে তখন ফেরারী বিপিনদা ছিলেন। তিনি উঠে একটা রিভলভার এবং কিছু কার্টিজ টেনে নিয়ে অকুস্থলে গিয়ে হানা দিলেন। হবি হবি। ফায়ার হল না। তিনি ভুল রকমের কার্টিজ নিয়ে গিয়েছেন।

পুলিসদল ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে ধরে ফেললে। তিনি রিভলভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এক পুকুরের ধারে। কিন্তু বৃথা! ডাকাতি মামলাতেই তার পাঁচ বছর জেল হয়ে গেল। তিনি মুক্ত হলেন উনিশ সালের শেষে, যখন অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত আসন্ন।

বিপিনদার মামলার সরকারী সাক্ষী প্রভাস মিত্রের পিতা পুলিসের সাহায্যকারী মুরারি মিত্রও (সন্তোষ মিত্রের খুল্লতাত সম্পর্কীয়) খুন হয়েছিলেন।

যোল সালের জুন মাসে বসন্ত চাটার্জির হত্যার পর পুলিন মুখার্জি এবং ঠাকুর ধরা পড়েন, যিনি অসংখ্য খুন ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পুলিসের অত্যাচারে তিনি সব স্বীকার করেন। এর জুলাই মাসে শত শত লোকের সঙ্গে আমিও গ্রেপ্তার হই।

পাঁচ

যে পুলিন মুখার্জি এবং ঠাকুর স্বীকারোক্তির ফলে আমরা শত লোক গ্রেপ্তার হয়েছিলুম, তিনি কলেজ স্কোয়ার থেকে পুলিসের তাড়া খেয়ে গিয়ে ঢুকেছিলেন হিন্দু হোস্টেলে। পুলিস সমগ্র হিন্দু হোস্টেল ঘিরে ফেলে তন্ন তন্ন করে খানাতল্লাস করে ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করে। এর সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশ একটা প্রকাণ্ড দলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। পরে কতকজনকে রেখে বাকি সব ছেড়ে দেয়। পুলিন মুখার্জি তখন চেতলায় তার কাকার বাসায় থেকে এম-এসসি পড়ছিলেন। পুলিস তাঁকে এস বি অফিসে ডাকিয়ে নিয়ে যায় এবং সেখানেই গ্রেপ্তার করে ডিটেন করা হয়।

বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে গুপ্ত সমিতির সম্বন্ধে কিছু কিছু গুজব চলে। বাইরের গুজব কাল্পনিক, যেমন কানাইলাল সম্বন্ধে লোকে বহুকাল পর্যন্ত বলেছে যে তাকে নাকি কাঁঠালের মধ্যে রিভলভার পুরে জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়েছিল এবং তার সেই রিভলভার দিয়ে কানাইলাল নরেন গোঁসাইকে খুন করেছিল।

পরবর্তীকালের জেলের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝেছি টাকায় না হয়, এমন কাজ নেই। আবার নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশী বাবুদের সাহায্যের জন্য সব ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত, এমন দেশী ওয়ার্ডার, সান্ত্রী, জমাদারও জেলে দেখেছি।

গুপ্ত সমিতির সকলে সব কথা জানতে পারে না। বলেই টুকরো খাপছাড়া কথা জোড়াতালি দিয়ে অনেকে একটা কিছু গল্প খাড়া করে, যেটার কিছু ভিত্তি থাকে বটে, কিন্তু তবু তা ভুলই। পরে অনেক কথা প্রকাশ হওয়ার পর ঠিক কথাটা জানা যায়।

অনেকদিন পর্যন্ত আমরাই শুনে এবং বলে এসেছি, যে-ম্যাভারিকে জার্মান অস্ত্র আসছিল, স্যাঙ্ককে ধরা পড়ে যাওয়ায় জার্মান কন্সালের আদেশে জাহাজটা ডুবিয়ে দেওয়া হয়। অথচ পরে সরকারী রিপোর্টে এবং যাদুদার বইতেও সত্য কথা জানা গেল।

সরকারী রিপোর্ট অনেকটা নির্ভরযোগ্য হলেও তাতে সব কথা পাওয়া যায় না।

যেমন ভূপতিদার কথা সিডিশন কমিটির রিপোর্টে নেই, অথচ যাদুদার বইয়ে আছে। তাকে ১৯১২ সালেই বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। তিনি ইউরোপ ঘুরে আমেরিকায় যাচ্ছিলেন। কিন্তু ইউরোপে যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ায় অর্থসঙ্কটে প. দেশে ফিরে আসেন।

তারপরে 'দাদা' যতীন মুখার্জির সঙ্গে তাঁর বালেশ্বরে যাওয়ার কথা হয় এবং সেখান থেকে নরেন ভট্টাচার্য ও ফণী চক্রবর্তীর সঙ্গে বাটাভিয়ায় যাওয়ার কথা। কিন্তু পরে সে ব্যবস্থার পরিবর্তে তাকে ওদিকায় নাসিরহাট বন্দর কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু যাত্রাপথে ফিলিপাইনের কাছে সমুদ্রবক্ষে তিনি গ্রেপ্তার হন। তাকে হংকং হয়ে সিঙ্গাপুরে এনে আটক রাখা হয় সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে। তিনি বলেন, আমি পর্যটক, দেশভ্রমণে বেরিয়েছি। আর কিছুই জানি না। কাগজপত্র যা ছিল, তা তিনি সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলেন। অনেক অত্যাচার করেও তাকে স্বীকার করানো যায়নি। কিন্তু তবু তাকে ফাঁসির আসামীর মত এগারো মাস নির্জন কারাবাসে রাখা হয়। তারপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ রিপোর্ট পরীক্ষা করে তাকে আর এক বেঙ্গল আইনে বন্দী করে রাখে। এইভাবে কিছুকাল সিঙ্গাপুর জেলে আটক থাকার পর তিনি ভারতে প্রেরিত হয়ে রাজবন্দী হন।

এ বিবরণ আমি শুনেছি স্বয়ং ভূপতিদার মুখেই।

বড়া কোম্পানীর বন্দুক চুরির ব্যাপারে অনেকে বলেন, হরিদাস দত্ত, শ্রীশ পাল, নরেন ঘোষচৌধুরী প্রভৃতির হাত ছিল। ব্যাপার হচ্ছে, শ্রীশ মিত্র বা হাবুর কাজের পর মাল সরানো ব্যাপারেই এদের হাত ছিল, যেমন আরো অনেকের ছিল।

বালেশ্বরে একটা বৃটিশ সামরিক ঘাঁটি ছিল কামান ও গোলার শক্তি পরীক্ষার জন্যে। সেদিকটাতে কাউকে যেতে দেওয়া হত না। সেই ঘাঁটি আক্রমণ ও ধ্বংস করার জন্যেই বালেশ্বরে আড্ডা তৈরী করা হয়েছিল। সেখানে 'দাদা' গিয়ে বসেছিলেন প্রধানত সেই উদ্দেশ্যে, যাতে সেখানে জার্মান অস্ত্র নির্বিঘ্নে নামানো যায়।

যাই হোক, সরকারী রিপোর্টে ওরা জুলাই ব্যাংক থেকে পাঞ্জাবী বিপ্লবী আত্মারামের চিঠি নিয়ে যে বাঙালী বিপ্লবীর কলকাতায় আসার কথা বলা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন উকিল কুমুদ মুখার্জি।

১৯১৩ সালে ভোলানাথ চ্যাটার্জি ব্যাঙ্ককে যান বাঙ্গালী বিপ্লবীদের একটা ঘাঁটি এবং পাঞ্জাবী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ছদ্মবেশী সাধু ননী মহারাজ (ননী বসু)। তখন ব্যাঙ্কক থেকে ব্রহ্ম সীমান্ত পর্যন্ত একটা রেল লাইন তৈরী হচ্ছিল। সে কাজে জার্মান ইঞ্জিনিয়ার এবং অনেক পাঞ্জাবী নিযুক্ত ছিল। যে ইঞ্জিনিয়ার অমর সিংয়ের পরে মান্দালয় জেলে ফাঁসি হয়েছিল, তিনি ছিলেন তাদের একজন। ভোলানাথ এই উকিল কুমুদ মুখার্জি এবং ইঞ্জিনিয়ার অমর সিংকে রিক্রুট করেছিলেন।

সাংহাই থেকে কিছু অস্ত্র ব্যাঙ্ককে আসবার কথা ছিল। ব্রহ্ম সীমান্তে প্যাকো নামক স্থানে সে অস্ত্র লুকিয়ে রাখার বন্দোবস্ত হয়েছিল অমর সিংয়ের মারফত। বন্দোবস্ত হয়েছিল, আমেরিকা থেকে হেরম্ব গুপ্ত কর্তৃক প্রেরিত জার্মান অফিসার বোয়েম ব্যাঙ্ককে আসবেন বিপ্লবীদের সামরিক শিক্ষা দিতে। সময় হলে তাঁরা ঐ অস্ত্র নিয়ে ব্রহ্ম আক্রমণ করবেন।

বালেশ্বর ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম ছিল কলকাতার হ্যারি এণ্ড সন্সের ব্রাঞ্চ। হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সে খানাতল্লাসি ও গ্রেপ্তার হয় আগস্ট মাসে এবং পুলিস বালেশ্বরে যায় সেপ্টেম্বরে।

হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সে হরিদার ছোট ভাই মাখন চক্রবর্তীও গ্রেপ্তার হন এবং পরে রাজবন্দী হন। গ্রেপ্তারের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ষোল-সতের বছর।

ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামের পরিচালক শৈলেশ্বর বসুর জেল হয়। কটক জেলে তিনি থাইসিসে আক্রান্ত হন। তারপর কয়েক বছর ভুগে মুক্তির পর তিনি মারা যান। তাঁর আর দুই ভাইও, শ্যাম এবং কানাই রাজবন্দী হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত থাইসিসেই মারা গিয়েছিলেন।

যাই হোক, ষড়যন্ত্র প্রকাশ হওয়ার পর ফেরারী চন্দননগরে আশ্রয় নিলেন অনেকে এবং কলকাতায়ও থাকতে হল অনেককে। ফেরারী কর্মী, যারা অনেকে তখনও পুলিসের নজরে পড়েন নি, তাঁদের বেশ কয়েকজন ফেরারী নেতাদের লুকিয়ে রাখার কাজে খাটতে লাগলেন। জীবন চ্যাটার্জি হচ্ছেন তাঁদেরই একজন।

টেগার্টও উঠে পড়ে লাগলো ফেরারীদের ধরার জন্যে। তার নিচেই গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা বসন্ত চ্যাটার্জি। বারবার টেগার্টকেও চালান তিনিই। সুতরাং বিপ্লবীরা তাকে খতম করার চেষ্টায় মাতলো। দুবার চেষ্টা বিফল হওয়ার পর তৃতীয়বারে তারা সফল হল।

সুতরাং এর পর টেগার্ট এবং সমগ্র গোয়েন্দা বিভাগ প্রায় ক্ষেপে গেল। যেখানে যত সন্দেহজনক ঘাঁটি ও লোক ছিল, সর্বত্র খানাতল্লাসি ও গ্রেপ্তারের ধুম লেগে গেল। গ্রেপ্তারের পরই চলতে লাগল অত্যাচার—অত্যাচার, খিস্তি, মার এবং বহুবিধ নতুন নতুন বীভৎস কাণ্ড। বসন্ত চ্যাটার্জি নিহত হন ৩০শে জুন।

এই অবস্থায় একদিন বোধ হয় ৪ঠা জুলাই কলেজ স্কোয়ার থেকে তাড়া করে হিন্দু হোস্টেল ঘেরাও করে পুলিস গ্রেপ্তার করলো পুলিন মুখার্জি ওরফে ঠাকুরকে, যিনি টাকার হাকদের বাড়ীর আড্ডায় ছিলেন এবং যার নাম পুলিসের খাতায় অসংখ্য খুন ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিল।

তিনি ছিলেন অনুশীলন পার্টির ওপর ভীষণ খাপ্পা। ডামাল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়া, দাদার মৃত্যু, এ সবের ফলে মনটা ছিল আরো বিষিয়ে। শোনা যায়, পুলিস তাঁকে নিছক চোর-ডাকাত ক্রিমিন্যাল বলে এবং অনুশীলন পার্টিকে খাঁটি বিপ্লবী বলে সুখ্যাতি ও তারিফ করে আরো ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল। এই শেষ খোঁচাতেই উটের পিঠ ভেঙে পড়লো। ঠাকুর বিস্তারিত ভাবে তাঁর বৈপ্লবিক আদর্শ ও ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করে পুলিসকে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি নিতান্ত চোর ডাকাত নন। মনস্তাত্ত্বিক পরিণতিটা ভাববার মতন। এর আরো নানা রকমের দৃষ্টান্তও আছে

ফলে অজস্র লোক ধরা পড়তে লাগলো। বিপ্লব প্রচেষ্টার এ পর্ব শেষ হয়েছে, জের টানা বৃথা, সব মুছে ফেলে ভবিষ্যতে নতুন করে আবার যদি বিপ্লব গড়ে তোলা যায়, সেই আশায় বেঁচে থাকাই ভাল —এই ছিল তখনকার দিনে অনেকেরই মনোভাব, যাঁরা কনফেশন করছিলেন। সরকারী সিডিশন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, তাঁদের অনুসন্ধানের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে গুরুতর শ্রেণীর ২৫০টা স্বীকারোক্তি। ভুপেন্দ্রকুমার

দত্তের স্মৃতিকথা'র (বিপ্লবের পদচিহ্ন) মধ্যেও অনেকের নামসহ এই কথাটা আছে। বারীন ঘোষ এবং তাঁর কথায় আরো অনেকে মানিকতলা বোমা কেসে স্বীকারোক্তি করেছিলেন। হেম দাস (কানুনগো) করেন নি।

যাই হোক, ১৬ সালের আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে এক দিন সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের এক নাটক 'মৃচ্ছকটিক' অভিনীত হয়েছে স্টার থিয়েটারে। আমাদের দলের হারাণীবও তাতে পার্ট আছে। তার সঙ্গে দিদিমাকে দেখতে গেছি। থিয়েটার ভাঙতে রাত প্রায় শেষ হয়েছে। আমি একা ফিরোচ্ছি, পায়ে হেঁটে। বাড়ীর কাছে এসে দেখি, পুলিসের ভিড়। মাথাটা একবার ঘুরে গেল, চন্দননগরের কথা মনে হল।

দূর থেকেই পাড়ার একজন লোক দেখিয়ে দিল আমাকে। পুলিস কয়েক জন এগিয়ে এল। আমি গিয়ে বাড়ীতে ঢুকলুম। পুলিসের ভিড়টাও ঢুকলো।

তার পর চললো ভিতর ও বার বাড়ী খানাতল্লাসি। হরি হরি। টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা স্লিপের শেষ টুকরা পাওয়া গেল, " Please do not fail to meet us at Satyababu's lodge.—Karali "

পুলিস জিজ্ঞাসা করলে, এটা কি ? বললুম আমাদের লাইব্রেরীর অ্যানিভার্সারীতে নাটক অভিনয় হবে বলে সেক্রেটারী করালী আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং সত্যবাবুর বাড়ীতে রিহার্সেলের ব্যবস্থা হয়েছিল। কথাটা সত্যি। কিন্তু কাগজের টুকরোটা সন্দেহজনক রীতিমতন।

আমাদের বাড়ীর সব পুরুষদের গ্রেপ্তারের কথা ছিল। পাওয়া গেল মাত্র দুজন— আমি আর ভাগ্নীজামাই জ্ঞানানন্দ গোস্বামী। আমরা চললুম পুলিসের সঙ্গে। বাড়ীতে রইলো দিদি, ভাগ্নী আর এক পিতৃহীন শিশু ভাগনে।

আমাদের নিয়ে গিয়ে তুললো লর্ড স্ট্রীট থানায়—টেগার্টের অত্যাচারের ঘাঁটি। গেটের ভেতরে ঢুকে গাড়ি থেকে নেমে অফিসের দালানে উঠতেই ঘরের দরজায় দেখা দিলেন এক অফিসার—মনোজ বোস। তার বাঁ হাতে একটা কালো মোটা রুল ঘুরছিল। আমাদের দুজনকে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, Who is Habu ? (আমার ডাকনাম ছিল হাবু)। আমি বললুম—আমি। বলার সঙ্গে সঙ্গে ধড়াস করে একটা চড় পড়লো গালে, কান পর্যন্ত চেপে। কানে তালা লেগে গেল, চোখে সর্ষের ফুল দেখলুম। অবস্থাটা আন্দাজ করে নিলুম—চন্দননগরের চালাকি চলবে না।

ভাগ্নীজামাই কেঁদে ফেললে। তাকে নাম জিজ্ঞাসা করতে সে নাম বললে। শুনে কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন--বিদ্যাভূষণ ? সে বললে, না আমি পণ্ডিত-টণ্ডিত নই, অমুক জায়গায় চাকরি করি, ওর ভাগ্নীজামাই। বুঝলুম, হারুদের বাড়ীর অন্য ফেরারীদের খুঁজছে। সেখানে একজনের নাম ছিল বিদ্যাভূষণ। ওদের এনকোয়ারীর একটু হদিশ পেলুম, মনে হল। তার পর ভাগ্নী জামাইকে সরিয়ে নিয়ে গেল। পরে শুনলুম, তাকে সন্ধ্যাবেলা ছেড়ে দিয়েছে। বাড়ীতে হাড়ি চড়েছে সে ফেরার পরে।

যাই হোক, আমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে জেরা শুরু হল। কতকগুলো নাম করে জিজ্ঞাসা করলে, এরা কোথায় ? সব নাম মনে নেই, চিনিও না। মনে আছে, শুধু সতীশ চক্রবর্তী, বিদ্যাভূষণ আর বোধ হয় জীবনের নাম।

বললুম, জানি না। কিছুই এর কাউকে চিনি না। বলামাত্র দুড়দাড় করে রুলের বাড়ি কনুইয়ে, কাঁধে, হাঁটুর পাশে আর তার সঙ্গে গালি। বললে, তোমার অমুক যে সব কথা বলে দিয়েছে। বলে আর যাবে। এমনি কিছুক্ষণ চলল।

চুপ করে ঢোক গিলে গিলে এগুলো হজম করলুম। তারপর নিয়ে গিয়ে বন্ধ করলো একটা ঘরে। পাশাপাশি চারটে সেল। দরজার কাছে কম্বলে বসে আছে কে একজন। বুঝলুম, আমাকেও এদের মত এখন জাঁইয়ে রাখলো।

সেলে একখানা মোটা কম্বল ছাড়া আর কিছুই নেই। জামা জুতো খুলে অফিসে রেখে দিয়েছে। জল খেতে চাইলে দরজার গরাদের ফাঁকে হাত পাততে হয়—পাহারা ঘটিতে জল ঢেলে দেয়। খেতে দিল চিমড়ে মুড়ি আর তেতো মুড়কি এক পয়সার আন্দাজ—দুবেলাই। কিন্তু আহার্য্য কাছে থাকলে কি খাদ্যের রুচিবিচার। জলখাবার জন্যে ঐ একমুঠো খেয়ে।

শোনা এসে ব্যথা ভুলে গিয়েছি। মনটা প্রবল বেগে হাতড়ে বেড়াচ্ছে—কি বলেছে ঠাকুর আমার সম্বন্ধে, কতটুকু জানতে পেরেছে ওরা? আমাদের বাড়ীটা যে ফেরারীদের একটা আশ্রয়স্থল, একথা ছাড়া আর কোন কথা ঠাকুর বলতে পারে কি? কেন বলবে?

আর কে কে ধরা পড়লো না পড়লো না, জানি না। ধরা পড়ে কেউ কিছু বলেছে কি? অনেক লোক আছে, যারা পার্টির লোক নয়, অথচ পার্টির লোকের বন্ধু হিসেবে ফেরারীদের সাময়িকভাবে আশ্রয় দেয়। পার্টির লোকের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাদের শুধু এই টুকুই কাজ। অন্য কাজ তাদের দিয়ে করানো হয় না, যাতে তারা পুলিসের নজরে পড়তে পারে। এই শ্রেণীতে থাকলে অন্যের ওপর দিয়ে পার পাওয়ার পথ করে নেওয়া যায়।

অস্ত্র-শস্ত্রের সংস্পর্শ নেই, ফেরারীও নেই, খুন-ডাকাতির মধ্যেও নাম পাবে না। অনেক কথা জানি বলে সন্দেহ করবারও কোন কারণ দেখা যাচ্ছে না। অত্যাচারের মাত্রা খুব বেশী না হতেও পারে। বেশী হতেই পারে না। সুতরাং ঘাবড়াবার কিছু নেই, বিশেষত যখন বাড়ীতে ফেরারী পায়নি।

কিন্তু হিসেবগুলো থেকে যে পলায়নের মনোবৃত্তি ধরা পড়েছে না, মন দুর্বল হলে চলবে না। কিন্তু যোক দেখানোরই বা দরকার কি? তাতে শুধু অকারণ অত্যাচারের মাত্রা বাড়ানো হবে। সুতরাং বোকাও সাজতে হবে, টাইটও থাকতে হবে। তারপর যা থাকে কপালে।

বিকেলে এক পাহারাওয়ালা চাবি নিয়ে আসতে দেখে মনে করলুম, আমায় নিতে আসছে। মনে মনে তৈরী হলুম। কিন্তু না, পাশের সেলের লোককে নিয়ে গেল। কান খাড়া করে থাকলুম অনেকক্ষণ। না, কিছুই শোনা যায় না। তাকে আবার রেখে গেল। এইবার বোধ হয় আমায় নেবে। না—নিলে না।

একটু রাত হলে আবার এল। কুকুর এগিয়ে এলে যেমন বিড়ালের রোঁয়া খাড়া হয়ে ওঠে, তেমনি অবস্থা আমার। এবার আবার আমাকেই নিলো।

অফিসে এক টেবিলে এক বাবু বসে কাগজপত্র ঘাঁটছেন, আমাকে এক দিকে দাঁড় করিয়ে রাখলো। অনেকক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, নাম কি? বাড়ী কোথায়?

ইত্যাদি। তারপর বোঝাতে শুরু করলেন, যা জান, সরলভাবে বললে ছেড়ে দেবে, সকলেই বলছে, জোয়ান ছেলে জীবনটাকে নষ্ট করবে কেন, ইত্যাদি। আমি চুপ করে থাকলুম এবং শেষে বললুম, আমি কিছুই জানি না, কি বলবো।'

তিনি উঠে চলে গেলেন। আবার বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আর এক অফিসার এলেন, হাতে রুল। 'বলবে?'—'কিছু জানি না।' শুরু হল মার। আগের মারের ব্যথাগুলো টের পেলুম। কিন্তু ভাববার কি অবসর আছে? মার ঠেকাবার চেষ্টাতেই হাঁপিয়ে গেছি।

'হারুকে চেন না?' 'সে পাড়ার ছেলে, চিনবো না কেন?' 'হারুদের ঠাকুর?' 'সে তো তাদের রাঁধুনী বামুন।' আবার মার।

হারু ঠাকুরকে নিয়ে তোমার বাড়ী যায়নি? তোমার বাড়ী ওরা থাকেনি? হারু যে সব কথা বলে দিয়েছে।'

একদিন ওদের ভাড়াটেদের দেশ থেকে লোক এসেছিল, শোবার জায়গা ছিল না বলে আমাদের বাড়ী খালি আছে জেনে বলে সে শোবার ব্যবস্থা করেছিল। আমি আর কিছুই জানি না।'

'এখনো ন্যাকামি?' বলে আবার মার কতক।

মনে মনে ভাবলুম, এই ন্যাকামির ওপরই শেষ পর্যন্ত দাঁড়ানো যাবে। কর্তা পাশের ঘরে চলে গেলেন। আমি আবার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর আমাকে আবার সেলে নিয়ে গেল।

তারপর দুটো দিন আর কিছু করলে না। রাত্রে আবার নিয়ে গিয়ে খাড়া করলো একটি মেয়েছেলের সামনে—বছর চব্বিশ পঁচিশ বয়েস, আধ ময়লা কাপড় পরনে, গরীব গৃহস্থের মেয়েও হতে পারে, বড়লোকের বাড়ির ঝিও হতে পারে। ভাবভঙ্গী শান্ত ও ভদ্র।

অফিসার বললে, দেখ ভাল করে। মেয়েটা চুপ করে আছে। আমার মনে মহা উৎকণ্ঠা, ভয়ে ভুল করে সনাক্ত করে বসলে কি হবে কে জানে। বললুম, আমাকে যদি কোথাও দেখে থাক, বল। মেয়েটা ঘাড় নেড়ে জানালে, না। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। আবার সেলে নিয়ে গেল।

পঞ্চম দিন বিকেলে প্রিজন ভ্যানে তুললে। ভাবলুম, বোধ হয় জেলে নিয়ে যাবে। কিন্তু নিয়ে গেল ডালাণ্ডা হাউসে। সেটা আগে পুলিস ট্রেনিং স্কুল ছিল—আলিপুরের। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড মাঝে অর্ধচন্দ্রাকার সেলের সারি, সামনে চওড়া বারান্দা। সেলগুলো বড় ও পরিষ্কার।

সেলে সেলে খাটে বসে আছেন বাবুরা। বারান্দায় বরাবর পুলিস পাহারার খাট। পায়খানায় যাওয়ার ধুম পড়ে গেল। দেখলুম, আমাদের পাড়ার প্রায় সকলেই আছেন।

ছয়

ডালাণ্ডা হাউসটা ছিল গোয়েন্দা অফিস এবং প্রেসিডেন্সি জেলের মাঝের হল্টিং স্টেশনের মতন। প্রথমে গ্রেপ্তার করা হত তখনকার, বোধ হয়, Section 52 Cr. P. C. অনুসারে। তাতে ১৫ দিন রাখার পর প্রেসিডেন্সি জেলে ডিফেন্স অ্যাক্ট বা রেগুলেশন থ্রিতে আটক রাখা হত সাধারণত এক মাস—কুখ্যাত ৪৪ ডিগ্রি বা 44 cell এ। তার পর ডিফেন্স অ্যাক্ট ওয়ালাদের সাধারণত বাইরে গ্রামে অন্তরীণ করা হত। রেগুলেশন থ্রি ওয়ালাদের তার পরেও জেলেই আটক রাখা হত। তখনকার দিনে আসামী ও পুলিস, সকলেই মনে করতো, তাদের সারা জীবন আটক রাখা হবে।

৫২ ধারার প্রথম ১৫ দিন লর্ড স্ট্রীট ও ডালাণ্ডা হাউসে কাটতো। লর্ড স্ট্রীটে প্রথম সম্ভাষণ-আপ্যায়ন আর ডালাণ্ডায় বিশ্রাম। যারা পুরো স্বীকারোক্তি করতো, যারা আধা স্বীকারোক্তি করতো এবং যারা স্বীকারোক্তি না করেই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হত, সব রকম লোকই ডালাণ্ডায় আসতো।

স্বীকারোক্তি করার ঢং করে কিছু বলা এবং কিছু চেপে যাওয়া, এই হল আধা স্বীকারোক্তি। এই চালাকি করতে গিয়ে বেসামাল হয়েও অনেকে পুরো স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হত। গোয়েন্দা অফিসাররা প্রায় প্রত্যহই ডালাণ্ডা হাউসে আসতো কারো না কারো সঙ্গে দেখা করার জন্য। শুনেছিলুম, দু-চারটে সেলের দরজা দিনের বেলা খোলা রাখা হত, বন্দী যখন খুশী বাইরে বেরুতে পারতো।

ঠাকুরের স্বীকারোক্তির পর অনেক লোক ধরা পড়েছে। তার মধ্যে অনেকে স্বীকারোক্তি করায় আরো অনেক লোক ধরা পড়ছে। আবার তাদের অনেকে স্বীকারোক্তি করছে। এই রকম একটা হুড়োহুড়ি তখন চলছিল। গোয়েন্দা-অফিসে হুড়হুড় করে মাল আমদানি হচ্ছে। আসামী এই দুড়দাড় করে ঠেঙানো চলছে। বাসি মাল ডালাণ্ডায় পাচার করে টাটকা মালের জায়গা করা চলছে। একটা হৈ হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার চলছে।

স্বীকৃতির কথা লিখেছি। পড়ে এক বন্ধু বললেন, বিপ্লবীদের নাকি জাত মেরে দিয়েছি। তাঁকে আশ্বস্ত করে বললুম, জাতমারার এখনো অনেক বাকি, এখনও জাত আধমারাও করতে পারিনি। আমি গরীব দুখিয়া বলেই যে আমারই ওপর খিস্তি চলেছে, তা নয়, সে সময় যারা ধরা পড়েছে, তাদের সকলেরই ঐ হাল। ফরারীদের ওপর আক্রোশ সব চেয়ে বেশী। ভবিষ্যুক্ত ভদ্র টচার বাদের কথা।

বিপজ্জনক সেবার ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত বিভলভার সহ বাংলায় ধরা পড়েছিলেন। ওজন পড়েও পুলিসের সঙ্গে মরিয়া হয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে জখম হয়েছিলেন। অজ্ঞান হয়েছিলেন। পাছে স্বীকারোক্তি করতে হয় বলে লালবাজার লক আপে গলায় ফাঁসি লাগিয়েছিলেন আত্মহত্যা করার জন্যে। ফাঁসি কেটে নামিয়ে তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। তিনি পরবর্তী কালে তার স্মৃতিকথায় (বিপ্লবের পদচিহ্ন) লিখেছেন :

"হিন্দুস্থানী একটি পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আমার চুল ধরে টানতে শুরু করলো। জানি তো মারবে, চুপ করে রইলাম।

"সাহস পেয়ে চারিদিক থেকে গাল পাড়তে শুরু করলো। মার হয়ত সহ্য হত, গাল সহ্য হয় না।"—ভদ্র গালাগাল?

তারপর তিনি চীৎকার করে ধমক দিলেন। তাঁর কেস কোর্টে যাবে বলে তাঁকে আর মারতে বারণ করা হল, মার বন্ধ হল।

অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "নিজেকে বাঁচাবার জন্য অপরের সর্বনাশ করা বিপ্লবীর ধর্মত্যাগ, বিপ্লবীর জাতিপাত। অথচ কার নামে না রটেছে? জীবন চ্যাটার্জির নামে পর্যন্ত, যে জীবনকে আমি নিজের চেয়েও বেশী বিশ্বাস করি! অনুশীলনের অমৃত সরকার—পরে শুনেছি, এঁদের নামে যা কিছু রটেছে, সবই মিথ্যা। আত্মসম্মান অনাহত রেখেই এঁরা উতরেছেন।"

(অন্যত্র) "শুনেছিলাম ডালাণ্ডা হাউসের কথা। এক বন্ধুকে শীতের রাতে জলে চুবিয়ে রেখেছিল স্বীকারোক্তি করাবার জন্যে। অমর ঘোষ, অন্নদা মজুমদার, অরুণ গুহ, জীবন চ্যাটার্জি, আরো কত বন্ধুকে লীড স্ট্রীট পুলিস অফিসে অমানুষিক মার মেরেছে, দিনের পর দিন না খেতে দিয়ে সর্বক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছে, তার উপর হাত পা বেঁধে রাতের পর রাত রুল দিয়ে পিটিয়েছে। জীবন ১০৪ ডিগ্রী জ্বর নিয়ে ধরা পড়েছেন, সেই অবস্থায় তাঁকে নিয়ে তিন চার জনে মদ খেয়ে এসে শেষ রাত অবধি ঘরের এদিক থেকে ওদিকে ঠেলে ঠেলে ফেলে টেনিস খেলেছে। আরো যা করেছে, ভদ্রলোকের মুখের ভাষায় তা বেরোয় না।"

এই যে চারজনের নাম এক সঙ্গে লেখা, অনেক দাদার মুখে শুনেছি, এইখানে ভূপেন বাবু তাঁর এক বন্ধুর স্বীকারোক্তি ঢাকা দিয়েছেন। অতিরিক্ত অত্যাচারের জন্যে এরকম সহানুভূতি অসম্ভব নয়।

স্বীকারোক্তির সম্পর্কে ভূপেন বাবু লিখেছেন, "একদিন দুপুরের পরে ডাক পড়লো জেলের ফটকে। দেখি দশ-বারোজন বন্ধুকে জেলের বিভিন্ন স্থান থেকে ও অন্যত্র থেকে নিয়ে এসেছে সনাক্ত করার জন্যে। তার মধ্যে আছেন অধ্যাপক শরৎ ঘোষ, অধ্যাপক বিপিন দে, সাংবাদিক সুরেন সিংহ এবং আরো কয়েকজন। চোখ-মুখের অবস্থা প্রায় কারো সুবিধার নয়।···আমরা যখন সবাই একত্র জড়ো হয়েছি, এক জনকে ধরলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'সব স্বীকার করেছ কেন?'—'কি করব? দেখুন, অমুক বাবু সব বলে দিয়েছেন।'

"এই অমুক বাবুও সেখানে হাজির ছিলেন।···বন্ধুরা সবাই নীরব—আমিই একা কথা বলছি। কাজেই হিলের নজর পড়েছে আমার দিকে।···তখন এক হাতে আমায় ধরলো, এক হাতে বন্ধুটিকে ধরলো, নিয়ে গোল্ডির কাছে হাজির করলো।"

অবস্থাটা নেহাত ভবিষ্যুক্ত নয়। সব কথা বলে দিয়ে অনেক লোকের গ্রেপ্তারের কারণ হওয়ার পরও রাজবন্দী হয়েছেন অনেকেই।

যাই হোক, ডালাণ্ডা হাউসে আমাকে যে খোপে পুরলো, তার কাছেরই এক খোপে ছিল করালী। পায়খানার নাম করে সকলে বেরোতে আরম্ভ করেছে দেখে আমিও বেরোলুম এবং করালীর পাশে পাশে চললুম। পেছনে পাহারাও চললো। বেশ একটু দূরে একটা টিনের চালায় একসঙ্গে অনেকগুলো পায়খানা—দু'সারি ছোট ছোট খোপ।

দু'জনে পাশাপাশি ঘরে ঢোকালে ঢুকলুম। এমনি আরো অনেক ছোড়া পাশাপাশি রেখে ঢুকলো। চাপা গায় গুঞ্জরণ শুরু হল।

দু মিনিট না যেতেই পাহারা হাঁক দিলে, জলদি করো। তাড়াতাড়ি দুই চারটে কথা বলে সব চেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সে গোড়াতেই মার এড়িয়েছে। বন্দুক-পিস্তলের কথা চেপে গিয়ে আর কতকগুলো কথা বলেছে। তার মধ্যে পাড়ার কথা খুব কম। সে তখন সবেমাত্র বি এ পাস করেছে। কলেজ, হাডঙ্ক ও হিন্দু হোটেল, সতীশ চক্রবর্তী এবং ঠাকুরের বাড়ীর ফেরারীদের কথাই প্রধান। একজনের কথা বললে, সে যা কিছু জানতো সবই বলে দিয়েছে। কবালীকে কার্ড স্ট্রীটে থাকতে হয়নি।

সন্ধ্যার সময় সব দের ফাঁক দিয়ে দের থান দিলে গেল—কিন্তু মনে নেই। অনেক রাত পর্যন্ত আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে গরম হয়ে গেছে ঘুম আসছে না। এমনি ছটফট করে শেষে ঘুমিয়ে পড়লুম। আবার কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে ভোরে উঠে পায়খানা যাওয়ার পথে। এমনি করে দেখা হল প্রায় সকলের সঙ্গে। কিন্তু কথা বলার সুযোগ হল না। ওরা এবং তাদের সেলে ছিল। ওদের পায়খানা যাওয়ার অন্য সঙ্গী ছিল।

দু'একদিন পরে একদিন দুপুরে বারান্দায় চেঁচামেচি শুনে গরাদের ফাঁক দিয়ে নাক বাড়িয়ে আড়চোখে দেখি, সেলের বাইরে বারান্দায় বসে এক পাহারাদারের গড়গড়ায় মুখ লাগিয়ে খাঁসাহেব টান দিয়েছে, আর সে চেঁচাচ্ছে তার গড়গড়া নষ্ট হয়ে গেছে বলে। হারুদা বার বার তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে।

রোজ দশটার সময় সাদা পাগড়ি বেষ্টিত এক সাহেব আসেন এবং প্রত্যেক সেলের সামনে দাঁড়িয়ে বলে যান, "You are remanded till tomorrow" তিনি ম্যাজিস্ট্রেট—'till tomorrow সাহেব'। অর্থাৎ রোজ আমাদের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হতে হয়। তবে পর্বত মহম্মদের কাছে যায় না, মহম্মদই পর্বতের কাছে আসেন

কয়েক দিন পরে একদিন পঞ্চাননের সঙ্গে পায়খানায় মেলবার এক সুযোগ ঘটে গেল। তিনিও বললেন আমাদের 'একজনের' কথা, সে যা জানতো, সবই বলে দিয়েছে। গয়না লুকানোর কথাটা সে জানতো না তাই পুলিস জানতে পারেনি। পঞ্চাননকে যখন কার্ড স্ট্রীটে নিয়ে যায়, তখনই তিনি দেখে আশ্চর্য হন যে, আমাদের ঐ একজন "freely" ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে আর অফিসার তাকে সিগারেট দিচ্ছে, সে সিগারেট খাচ্ছে।

সে পঞ্চাননকে বলে, সব পুলিস জানতে পেরেছে, সুতরাং শুধু শুধু মার না খেয়ে, যা জান সব বলে দাও। সে ই পঞ্চাননের জখম হাতটার দাগ দেখিয়ে দিলে। সেই হাতটাকে পুলিস রুল দিয়ে পিটলে শেষ পর্যন্ত পঞ্চানন কিছু চেপে, কিছু বলে রেহাই পেলেন।

শুধু তাই নয় পঞ্চানন বললেন, আমার সামনে অফিসাররা সতীশ চক্রবর্তীর সন্ধানে কোথায় যেতে হবে তার পরামর্শ করলে এবং আমাদের ঐ 'একজনকে' গোঁফ-দাড়ির পরচুলো পরিয়ে মোটরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলে। তাকে নিয়ে যাওয়ার পর পঞ্চাননকে অফিসার বললে এই সব ছেলে নিয়ে বিপ্লব করবে? হুঁঃ।

গোয়েন্দা অফিসারদের কাজটার প্রকৃতি একই। কিন্তু একজন অ-পরিচিত বয়স্ক ভদ্রলোককে প্রথম সাক্ষাতেই মার এবং নোংরা ভাষায় গাল দেওয়ার মতন 'এলেম' সকলের থাকে না। তার জন্যে বাছাবাছা মার্কামারা ছোটলোক অফিসার থাকে। উদ্ভট অকথ্য

অত্যাচারের ব্যবস্থাও তাদের স্বাধীন মস্তিষ্কের আবিষ্কার। এদের মধ্যে আবার 'পাজির শিরোমণি' বলে কারো কারো খ্যাতি আছে। তাদের হাতে যারা পড়ে, সবচেয়ে বেশী দুর্ভোগ হয় তাদের। এরা কিন্তু চাকরির সবচেয়ে ওপরের ধাপে উঠতে পারে না। তার জন্যে অন্যপ্রকার 'এলেম' দরকার।

যাই হোক ১০ দিন ডালাণ্ডা হাউসে till tomorrow থেকে এক দিন বিকেলে এক কালো গাড়ি-বোঝাই হয়ে ঢুকলুম প্রেসিডেন্সি জেলে কুখ্যাত ৭৭ ডিগ্রী বা 11 cell-এ। সে হচ্ছে নির্জন কারাবাস।

জেলের ফটকে ঢুকে একটা খাতায় নাম ধাম লেখা হল। তারপরে আর একটা ফটক খুলে জেলের মধ্যে গিয়ে খানিক দূরে ৪৭ ডিগ্রীর ফটকে ঢুকলুম। সেখানে একজন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডারের টেবিলে আবার নাম ধাম লিখিয়ে নিয়ে চললো। চওড়া একটা রাস্তার বাঁ দিকে বরাবর দেওয়াল আর ডানদিকে পর পর ৪৭টা সেলের সারি। মাঝে আর একটা গেট ও দেওয়াল দিয়ে সেলের সারিটা দুভাগে ভাগ করা হয়েছে, এবং সে গেটেও এক ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডারের পাহারা আছে।

আমরা যত এগোচ্ছি, আমাদের আগে আগে একজন কয়েদী মেট ডানদিকের সেলের কপাটগুলো বন্ধ করতে করতে চলেছে এবং আমরা পার হয়ে গেলে আবার কপাটগুলো খুলে দিচ্ছে আর একজন। অর্থাৎ বন্দীরা যাতে কারো মুখ দেখতে না পায়, তার নিখুঁত ব্যবস্থা। যে কপাটগুলো বন্ধ করা এবং খোলা হচ্ছে, সেগুলোই সেলের কপাট নয়। সেলের গরাদ দেওয়া দরজায় তালা বন্দী আছেন বন্দীরা। তার বাইরে আর একটা সেলের মতন ছাদহীন জায়গা আছে, তার নাম অ্যান্টিসেল। লোহার কপাটগুলো সেই অ্যান্টিসেলের।

বন্দীরা দিনরাত সেলের মধ্যে তালাবন্ধ থাকেন। সকালে মুখ ধোয়া বা স্নান করার জন্যে একবার পনেরো মিনিট, আর বিকেলে 'Exercise' এর (বেড়ানোর) জন্যে আর একবার পনেরো মিনিট বন্দীকে সেই অ্যান্টিসেলে বার করা হয়। কিন্তু এক সেল বাদ দিয়ে এক সেল, এই ভাবে দুই দলে দুবার তাদের বেরোতে দেওয়া হয়, যাতে পাশাপাশি সেলের বন্দীরা কথাবার্তার সুযোগ না পায়। আবার লোহার কপাটগুলোর মাঝে একটা ঢাকনা দেওয়া ঘুটো আছে, যাতে বাইরে থেকে ওয়ার্ডাররা ঢাকনা সরিয়ে ঘুটোতে চোখ লাগিয়ে দেখতে পারে, বন্দী কি করছে।

সেলগুলো এতটা চওড়া, যাতে দুখানা খাট পাশাপাশি রাখা যায়, আর তার পিছনে আর একখানা খাট আড়াআড়ি রাখা যায়, এতটা লম্বা। তিনখানা খাটের মত জায়গায় একখানা খাট চটের তোশক কম্বল বালিশসহ দরজার মাঝ পর্যন্ত দখল করে আছে। পাশে আর একটা খাটের মতন জায়গা আছে নড়াচড়ার মতন। সেখানে আছে একটা জলের কুঁজো, একটা এনামেলের থালা ও মগ। এবং পিছন দিকে আর একখানা খাটের মতন জায়গায় আছে দুটো আলকাতরা মাখানো চুপড়ি—মলমূত্র ও শৌচক্রিয়ার জন্যে। গরাদের বাইরে আছে এক বালতি জল। পিছনের দেওয়ালের উপর দিকে, একটা ঘুলঘুলি জানালা।

ব্যবস্থা দেখে অঙ্গ জল হয়ে গেল। তখনও জানি না, কতদিন ঐখানে ঐভাবে

রাখবে। আমার আসার আগে যাঁরা এসেছেন, যাঁদের অনেককে ঐখানে ঐভাবে অনেক দিন রেখেছে, তাঁরা কেউ পাগল হয়ে গেছেন, কেউ আত্মহত্যা করেছেন, সকলেরই স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে। তার ফলে কিছু সুব্যবস্থা হয়েছে। আমি এসেছি সেই সুব্যবস্থার আমলে।

ডাণ্ডা থেকে খাইয়ে নিয়ে এসেছিল। কাজেই শুয়ে পড়লুম। মনে হতে লাগলো ইহলোক সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর যে সব ভদ্রলোক পরলোকে (অবশ্য নরকে) যান, তাঁদের সেখানে ঠিক এমনি ব্যবস্থা। অতঃপর একমাত্র সঙ্গী অশরীরী চিন্তা—অস্পষ্ট, এলোমেলো, দম-আটকানো! ক্রমে অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

রাতটা কখন্ কেটে গেল, জানতে পারলুম না। ভোরের আগেই পাশের cell-এর দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মেথর এল কয়েদী মেটের সঙ্গে, টুকরী খালি দেখে যথোচিত পরামর্শ দিয়ে গেল। পরামর্শ গ্রহণ করে বাঁচলুম। বেলা ৯ টায় ও বিকেলে আর দুবার এল।

সকালে অ্যাণ্টি সেলে বার করে দিলে। মুখ ধুয়ে একটু পায়চারি করে নিলুম। চার কদম হাঁটলেই দেওয়ালে নাক ঠেকে যায়। কাজেই সে প্রায় ঘুরপাক খাওয়াই হল। ১৫ মিনিটেই আবার তালাবন্দী।

তারপর এল চা। তোরঙ্গের ডালার মতন একটা টিনের ট্রেতে আধখানা পাউরুটিতে মাখন লাগানো সাজানো, আর প্রকাণ্ড এক বালতি চা। এক পিস মাখন রুটি এবং প্রায় এক মগ চা গরাদে গলিয়ে দিয়ে গেল। খেয়ে পেট ভরে গেল। বুঝলুম Defence of India Act-এ পড়েছি এবং ভদ্রলোক হয়েছি।

দুপুরের খানা এল। যে ট্রাঙ্কের ডালায় পাউরুটি এসেছিল, সেই ট্রাঙ্কভরা ভাত, আর বালতি বালতি ডাল, ঘ্যাট, মাছের ঝোল আর ডিমসিদ্ধ। যেন লাটসাহেবের মেয়ের বিয়ে।

গরাদের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে গলিয়ে আমার এনামেলের থালা আর মগ ভরে দিয়ে গেল, মনে হল দুবেলার খোরাক। কিন্তু সব খেয়ে ফেললুম। অনেক দিনের খিদে!

বাইরের বালতির জল দিয়ে গরাদের ফাঁকে হাত গলিয়ে থালা মগ ধুয়ে রেখে শুয়ে পড়লুম। বস্তুতান্ত্রিক পোড়া-পেট প্রচুর বস্তু সংগ্রহ করে ঠাণ্ডা হল এবং ঘুম আসতেও লজ্জা হল না।

বেশ খানিক ঘুমিয়ে উঠে পেটের অবস্থা দেখে চিন্তা হল—হজম তো করা চাই! খুব কতকগুলো ডন বৈঠক দিয়ে হাঁপিয়ে আবার শুলুম। তারপর বিকেলে ১৫ মিনিট অ্যাণ্টিসেলে ঘুরপাক খাওয়া হল। তার পর সন্ধ্যার আগে আবার রাত্রের খাওয়ার পালা।

বড় বড় লাল লাল মোটা মোটা পোড়া দাগওয়ালা রুটি দুখানা নিলুম। ডালটা ভাল, আধমগ নিলুম। আর তার সঙ্গে এক হাতা মাংস। চেহারাটা দেখে ভক্তি হচ্ছিল না। কিন্তু খেতে ভাল লাগলো।

চব্বিশ ঘণ্টার এই প্রোগ্রাম দিনের পর দিন চলতে লাগলো। এলোমেলো চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে যখন-তখন ডন-বৈঠক করি। দিনের পর দিন ঐ একই মুখগুলো কলের পুতুলের মতন আসে যায়, আর একটাও মুখ দেখার উপায় নেই। আমিও যেন কলের পুতুল বনে গেছি।

ইতিমধ্যে এক দিন এক মেটের হাতে একগাদা বই সমেত ওয়ার্ডারে এসে বললে, ইচ্ছা হলে এর থেকে একখানা বই নিতে পার পড়বার জন্যে, হপ্তায় একখানা করে বই জেল-লাইব্রেরী থেকে দেওয়া হয়।

বই দেখলুম মহান টাইপের। অমিয় নিমাইচরিত অমিতাভ, ডাক্তার চুনীলাল বসুর খাদ্য। এই তৃতীয় বইটাই নিলুম। ছোট বই, এক নিঃশ্বাসে পড়া হয়ে গেল। সাত দিন ধরে সেইটেরই চারবার চর্বণ করলুম প্রায় মুখস্থ হয়ে গেল। খাদ্য সম্বন্ধে অত চমৎকার বাংলা বই কিন্তু আর হয় না। খাদ্য সম্বন্ধে পরিপাক প্রণালী সম্বন্ধে আমার অদ্যাবধি ঐ বিদ্যাটেই চলেছে ... ৯৯ ডিগ্রীর নীট লাভ

ঠেসে খাই আর যখন তখন ডন বৈঠক করি। ওজনও বাড়তে লাগলো। কত দিন এভাবে থাকতে হবে জানা নেই—এই প্রশ্নটা যখন মনে হয়, তখনই মনটা অস্থির হয়ে ওঠে আর আবার বসে ডন বৈঠক করে হাঁপিয়ে চিন্তাটাকে তাড়াই।

দেওয়ালের গায়ে একটা মশা রক্ত খেয়ে গোল হয়ে বসে আছে তাকে ধরতে চেষ্টা করি। সে উড়ে যায়। কিন্তু একটু দূরে গিয়ে আবার বসে একটু গুরুভোজন হয়েছে আমারই মতন। ডন বৈঠক দিতে পারে না। একবার ধরে ফেলি। সবমের মতন এক ডলা জমাট রক্ত আমার আঙ্গুলে লেটকে যায় আর মশাটা উড়ে পালিয়ে যায়। বাহাদুর!

অমিয় নিমাইচরিত আর অমিতাভ পড়া হয়েছে দুবার পড়তে ইচ্ছে করে না। তবু ৭ দিন ধরে চোখ বুলোই। চটের গদিতে গোঁজা একটা বড় আলপিন আবিষ্কার করলুম। দেওয়ালে আঁচড় কেটে নামটা লিখলুম। আলপিনটা যথাস্থানে রেখে দিলুম। সময় কাটে না। ডন-বৈঠকই চলে।

হঠাৎ একদিন গেটে ডাক পড়লো। বার তারিখ ভুলে গিয়েছিলুম। Internment order পেলুম। দেখলুম, ৪৪ ডিগ্রীতে ১ মাস হয়ে গেছে।

Whereas in the opinion of the Government you have acted, is acting or is about to act in a manner prejudicial to public safety, the Government is pleased to direct that you shall proceed directly to Krishnagar, Dist Nadia, and report yourself to the S P. etc. etc. হুকুম অমান্য করলে জেল হবে।

এই বাঁধা গতের মধ্যে পুলিস সাহেবের নির্দেশমত স্থানে থাকা এবং নানা বিধি-নিষেধের শর্তের ফিরিস্তি। order-এর সঙ্গে রাহাখরচ দিয়ে ব্রেক ছেড়ে দিলে। পুলিস সাহেবের কাছে হাজির হওয়ার সময় নির্দেশ করা হয়েছে ট্রেনের টাইম দেখে,—এবং ছাড়া হয়েছে সে টাইমের ঘণ্টা দুই আগে।

কৃষ্ণনগরে যখন পৌছলুম, তখন অনেক রাত। স্টেশন থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা ধরে যেতে যেতে এক বাঙ্গালী হাওলদারকে দেখে পুলিস সাহেবের খোঁজ নিলুম। আমার প্রয়োজনের কথা শুনে তিনি বললেন, এত রাতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, আজ কোতোয়ালী থানায় শুয়ে থেকে কাল সকালে সাহেবের কাছে গেলেই হবে।

কোতোয়ালী থানার বড় দারোগা একটা ইজিচেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ওতেই রাতটা কাটিয়ে দিন। তাই হল। পথে কিছু খাবার খেয়ে নিয়েছিলুম, রাতটা কেটে গেল।

সকালে পুলিস সাহেবের কাছে গেলুম, তিনি I B officer এর হাতে আমাকে সপে দিলেন। বিকালে আমাকে নিয়ে তিনি রওনা হবেন শান্তিপুরে।

বিকালে প্রচণ্ড ঝড় উঠলো, সব চেয়ে বড় আশ্বিনে ঝড়, যাতে পদ্মায় অসংখ্য নৌকা ডুবেছিল, একখানা লঞ্চকে উড়িয়ে নিয়ে একটা চরের মাঝখানে কাত করে ফেলে ছিল। দেশের গাছপালা প্রায় নির্মূল হয়েছিল, অসংখ্য বড় বড় গাছ পড়ে টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে পথঘাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল

দিদি আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছিলেন গোড়া থেকেই এবং শেষ পর্যন্ত ওরা দেখা করবার অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু সে একটা রসিকতা। দেখা করবার তারিখ ছিল আমাকে জেল থেকে বার করে দেওয়ার পরের দিন। অর্থাৎ দিদি যখন একবার সেন্ট্রাল জেল, আর একবার প্রেসিডেন্সি জেলের চারকে ঘুরে পাত্তা পাচ্ছেন না, তখনও চলছে ঐ ঝড়, মাথার ওপর গাছের ডাল ভেঙে পড়ছে। ভাগ্নীজামাইকে সঙ্গে করে জল ঝড়ে ভিজে নাস্তানাবুদ হয়ে আমার দেখা না পেয়ে দিদি বাড়ী ফিরেছেন

প্রথমে গোয়েন্দারা দিদির পিছনে লেগেছিল, আপনি সব জানেন, সবাই বলেছে, অমুক বলেছে, "হাবু বলেছে", (দিদির ভাষা) "তখন বুঝলুম, গাঁটকুড়ীর ব্যাটারা ধোঁকা দিচ্ছে।"

যাই হোক, তারপর থেকে দিদি আদের পেছনে লাগলেন, ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, আমি কারো সাথে মিশতে দেব না, ও আমার কথার অবাধ্য হবে না, ইত্যাদি। সে কথায় আমল না দিলেও ওরা দিদির কথা শুনে নিয়েছিল, শান্তিপুরে ছোট ভগ্নীপতির বাড়ীর কথা এবং তার সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিল আমাকে সেখানে রাখার।

ভগ্নীপতি [illegible] সপরিবারে কলকাতায় চলে আসার বন্দোবস্ত করছিলেন, আমি যাওয়ার পর তাঁরা চলে এলেন, শুধু তাঁর বৃদ্ধা মা থেকে গেলেন।

চৌহদ্দির মধ্যে মস্ত প্রাচীন ভাঙ্গাচোরা বাড়ী, প্রচুর ফল-ফুলের গাছ, ভাঙ্গা পাঁচিল, ইটের গাদা, এবং বড় বড় দাঁড়াশ ও [illegible] সাপের আড্ডা।

সকালে সন্ধ্যের এবং প্রায় থানায় রোজ একবার হাজিরা দেওয়ার আদেশ পালন করতুম

দিনটা কেটে যেতো। রাতে অশান্তি। বাড়ীর বাইরে যাওয়ার আদেশও নেই, না। সে কথাও ওঠে না, ঘরের বার হতেও ভয় করতো।

শান্তিপুর [illegible] কানাইদার ছোটভাই বল ইদা—সম্ভব ব্যানার্জ্জি বোধ হয়—ছেলেবেলা বাড়ী থেকে পালিয়ে আমেরিকায় গিয়ে ইলেকট্রিকের কাজ শিখে ১৫ সালে দেশে ফিরছিলেন বিনা পাসপোর্টে, এবং ধরা পড়ে Ingress into India Act-এর বন্দী হয়ে কিছুদিন জেলে থেকে বাড়ীতে অন্তরীণ হয়ে এসেছিলেন। চমৎকার গৌরবর্ণ জোয়ান, প্যান্টের ওপর বুট পরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এক দৌড়ে থানায় হাজিরা দিয়ে আবার এক দৌড়ে ফিরে আসতেন—দেখবার জন্যে পথে লোক দাঁড়িয়ে যেতো। এখন তিনি সাহেবের চেয়ে পাকা বাঙ্গালী।

হিন্দু হস্টেলের রাম ভট্টাচার্য শান্তিপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির পুত্র। তার দাদার সঙ্গে আলাপ করে নিয়েছিলুম, পরে রামবাবু হোম-ইন্টার্ণ হয়ে আসার পর দেখা হল। গোপনে একদিন তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ পেলুম।

আলিপুর বোমার মামলার নিরাপদ রায়ের বাড়ী বাগ-আঁচড়া গ্রামে। তিনি আন্দামানে কয়েক বছর দণ্ডভোগ করে ফিরে এসে গেঞ্জি বা মোজার কল নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। গোপনে একদিন তাঁর সঙ্গেও আলাপ হল।

ভগ্নীপতির বাড়ীর পাশে রজনী মল্লিকের নাতি প্রভাস মল্লিক (ডাক নাম পিলু) তখন ফার্ষ্ট ক্লাশের ছাত্র। তাকে হারমোনিয়ামে আঙ্গুল টিপে টিপে "শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মোরা" গানটা শিখিয়ে শেষ পর্যন্ত রিক্রুট করে ফেলেছিনুম। তারপরের রিক্রুট হল তার বন্ধু সারদা ব্যানার্জি, শ্যামবাজারের (শান্তিপুরের) দিকে বাড়ী। স তখন ম্যাট্রিক পাশ করেছে।

সাত

অন্তরীণে এসে অল্পদিনের মধ্যেই মনটা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো, আগের ধারায় চিন্তা শুরু হল। মনে হল বিপ্লব প্রচেষ্টার এক অঙ্ক শেষ হয়েছে প্রথম ব্যর্থতায়, এখনও যবনিকাপাতের অনেক দেরি, নতুন অঙ্কে নতুন সাজে আবার বিপ্লবের শুভসূচনার উদ্বোধন হবে, কবে, কেমন করে, জানি না। কিন্তু হবেই। তার জন্যে যেন প্রস্তুত থাকতে পারি।

অবস্থাটা ছিল অনুকূল দু'দিক থেকে। দারোগা আনন্দমোহন মিত্রের স্ত্রীর অনন্ত বা ঐ রকম কি একটা ব্রত। থানাটা শান্তিপুরের এক সীমানার ধারে। হাতের কাছে ব্রাহ্মণ নেই, আমি রোজ সকাল ৯টায় হাজিরা দিতে যাই। সুতরাং আমিই হলুম ব্রাহ্মণ। সারা বৈশাখ মাস ডাব, সন্দেশ, পৈতে ও পয়সা প্রত্যহ পেলুম, শেষ দিনে বোধ হয় একখানা কাপড়ও। অত্যন্ত নিরীহ ভদ্র এক ব্রাহ্মণ সন্তানকে গোয়েন্দা বিভাগের শয়তানগুলো যে মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছে, ভদ্রমহিলার এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। মায়ের জাত তো!

বস্তুত সাধারণ লোকের ধারণাও সাধারণত এই রকমই। কিন্তু যারা কিছুটা ওয়াকিবহাল, তারা আমাদের ক্ষুদিরাম-কানাইলালের সগোত্র মনে করে শ্রদ্ধা করতো, ভালবাসতো। আমি সত্যি কতটুকু, সে খোঁজে তাদের কোন গরজ ছিল না। বিশেষত শান্তিপুর বিপ্লব আন্দোলনের ঐতিহ্যেও দরিদ্র ছিল না। "যুগান্তর" পত্রিকা এবং আলিপুর বোমার মামলা সম্পর্কে যে কার্তিক দত্ত ছিলেন এক বিখ্যাত কর্মী, তিনি এই শান্তিপুরেরই ছেলে। আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন এই শান্তিপুরের কার্তিক দত্ত। হুগলি জেলার বিঘাটী গ্রামে এক ডাকাতি হয় এবং সেই মামলায় কার্তিক দত্ত সাজা পান। শান্তিপুরের পাশে বাঘ-আঁচড়া গ্রামের নিরাপদ রায়ের কথাতো আগেই বলেছি। তাঁর বোমার মামলায় ১০ বছর দ্বীপান্তর সাজা হয়েছিল।

সুতরাং বেমালুম আগের মতন ছেলে রিক্রুট করার ধান্ধা আবার দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে অন্তরীণে পাঠাবার সময় গোয়েন্দা অফিসাররা ঠাট্টা করতো,—"যান,—সরকারী খরচে আবার দল গড়ুন গিয়ে।" আমরাও বলতুম, "আমরা ধর্মঘট করলে তো ইলিশিয়াম রো-তে ঘুঘু চরবে!"

যাই হোক, আমাদের সময়েই হোমরুল আন্দোলনের নেত্রী অ্যানি বেশান্তও ডিফেন্স অ্যাক্টে আটক হয়েছিলেন। ফলে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁকে সভানেত্রী নির্বাচিত করা হয়, এবং তাঁর অবর্তমানে সরোজিনী নাইডু অধিবেশনে নেতৃত্ব করেন।

মহাত্মা গান্ধীও ঐ সময়েই ভারতে আসেন এবং চম্পারণে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সত্যাগ্রহ সংগ্রাম সংগঠন করেন। ঐ সময়েই কিছু শাসন-সংস্কার দিয়ে ভারতবাসীকে একটু ঠাণ্ডা করাব পরিকল্পনা নিয়ে ভারত সচিব মণ্টেগু ভারত পরিদর্শনে আসেন এবং কংগ্রেস ও মোসলেম লীগ তাঁর হাতে এক সম্মিলিত দাবী-পত্র পেশ করে। আমাদের মনে পড়তো—"আবেদন আর নিবেদনের থালা বহে বহে নতশির।"

যাই হোক, বছব তিনেক অন্তরীণ থেকে ১৯১৯ সালে ফিরে এলুম। দেখলুম, পাড়ার সকলেই ফিরেছে। দিদি আগে থেকেই মনে মনে ভ'জেছেন এইবার একটা বিযে দিতে পারলেই এক রকম নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

একদিন সকালে হঠাৎ দিদি বলছেন, জামাটা গায়ে দিয়ে একবার ও-ঘরে যা। আমার সন্দেহ হয়েছে, বললুম, কেন ?

দিদি বললেন, দেখতে এসেছে। আমি যাবো না বলাতে দিদি বিপদে পড়ে জোড়হাত করে বললেন, একবার দয়া করে মানটা বাঁচাও, আর এ গুখুরি করবো না। একটু ভেবে নিয়ে গেলুম।

দেখি দুজন ভদ্রলোক এসেছেন। নাম জিজ্ঞাসা করার পর বললেন, কাজকর্ম কিছু কর ? আমি—না, ঠিক করেছি, ব্যবসা করবো।

ব্যবসার কিছু জান ? আব মূলধন কত, কিসের ব্যবসা ?

ব্যবসা, করতে কবতেই শিখবো, কিসের ব্যবসা করবো, তা এখনো ঠিক করিনি। আর মূলধন সংগ্রহ করতে পারবো এই বাড়ী বেচে।

ভদ্রলোকদের চক্ষু চডকগাছ ! ছেলেটি ভাল, আর কলকাতায় বাড়ী, এই দুটি খুঁটির ওপর তাঁরা ভর করেছিলেন। এখন আমার কথা শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে আস্তে আস্তে সরে পড়লেন। আমিও বীরদর্পে দিদিকে শাসিয়ে দিলুম, ফের এমন কাজ করলে আমি বাড়ী ছেড়ে পালাবো। দিদি একা-একা আধ ঘণ্টা ধরে গজর গজর করে ঠাণ্ডা হলেন।

তখন সাবা দেশে একটা থমথমে ভাব—কোথাও কোনো আন্দোলন নেই। শুধু মৌলবী লিযাকৎ হোসেন রোজ বিকেলে একদল স্কুলের ছেলের প্রোসেশন নিয়ে রাস্তায় রাস্তার ঘুরে poor students fund-এর চাঁদা তুলে বেড়ান। ছেলেদের দল স্বদেশী গান গেযে চলে, ২।৪ জন রাস্তার লোকও পেছন পেছন চলে। পথে কোনো থানা পেলে প্রোসেশনটা সেখানেও ঢোকে এবং বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দেয়। মৌলবী সাহেব থানার অফিসারদের কাছ থেকেও কিছু চাঁদা না নিয়ে হটেন না—বলেন, "ইস ফাণ্ডমে তুমলোক কেঁও নেহি চাঁদা দেগা ? ইয়ে কুছ বোম্বওয়ারি হ্যায় ?" পুলিস অফিসার তাড়াতাড়ি কিছু দিয়ে রেহাই পান। তর্ক করলে, ছেলের দল বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিয়ে হারিয়ে দেয়।

রাজদ্রোহকর বক্তৃতা দিয়ে তিনি অনেকবার জেল খেটেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের

সময়ে যখন এখানে মডারেট নেতারা এবং আফ্রিকায় গান্ধী সবকারকে রিক্রুটিংয়ে সাহায্য করছিলেন, তখন এক বিরোধী সভায় এক বক্তৃতায় মৌলবী সাহেব বলেছিলেন, যে ইংরেজের পক্ষে লড়াইয়ে যাবে, সে "বাপকা পুত নেহি—মুত কা মুত।" (অর্থাৎ তার জন্ম বাপের বীর্য থেকে নয়, প্রস্রাব থেকে) এই বক্তৃতার ফলে তাঁর দু' বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি ঐ "স্বদেশী" কাজে আত্মনিয়োগ করেন, ভিক্ষা করে চাঁদা তুলে দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য করা।

সকল বিষয় জানবার বোঝবার আগ্রহ তখন অসীম। রবিবারে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যেতুম—প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় ধর্ম ও সমাজ-সংক্রান্ত নানা বিষয়ের আলোচনা বড় ভাল লাগতো। বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলুম আচার্য ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের বক্তৃতায়। শেষ পর্যন্ত একদিন তাঁর হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে হানা দিয়ে আলাপ করলুম। তিনি "ধর্মজিজ্ঞাসা" পড়তে দিলেন। হিন্দু পৌত্তলিকতার আনুষ্ঠানিক ধর্মব্যবস্থার অজস্র অদ্ভুত তথ্য ও কেলেঙ্কারিতে বইটা ঠাসা।

আমি করালীর কাছে ব্রাহ্মধর্মের পক্ষে ওকালতী করে হিন্দু, শাক্ত, তান্ত্রিক-ধর্ম ব্যাখ্যাও শুনতুম এবং তার যুক্তিগুলো ব্রাহ্ম আচার্যের কাছেও হাজির করতুম। মজা হত এই যে, এই দুই পক্ষের সমস্ত যুক্তির মধ্যে নিজ নিজ স্বপক্ষীয় যুক্তির চেয়ে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে যুক্তিগুলোই হ'ত জোরালো,—আর আমার মনে দুই পক্ষের বিরুদ্ধ যুক্তিগুলোই ধীরে ধীরে শেকড় গাড়ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনকে অধিকার করছিল,—এই সব তথাকথিত আধ্যাত্মিক, পারত্রিক, অবাস্তব ব্যাপারগুলো আমার জীবনাদর্শের বাস্তব ইহলৌকিক ধান্ধা, দেশের দুর্দশা, পরাধীনতার বিড়ম্বনা, স্বাধীনতার আদর্শ, বিপ্লব প্রচেষ্টা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জ্ঞান প্রভৃতির পক্ষে একেবারে অবান্তর। ফলত, দুনিয়ার সর্বপ্রকার আনুষ্ঠানিক ধর্মের সম্বন্ধে সর্বপ্রকার মোহ মন থেকে একেবারে মুছে গেল। মনটা যেন একটা ব্যাধিমুক্ত হয়ে পরম সন্তোষে গেয়ে উঠলো, "দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।"

নিজেকে তৈরী হতে হবে, অজস্র ঘাটতি পূরণ করতে হবে। বর্তমানে সর্বপ্রধান কাজ লেখাপড়া। অবকাশরঞ্জিনী নাটক-নভেল নয়,—"নীরস" প্রবন্ধ, বই এবং মাসিকপত্র। বস্তুত, লোকে যাকে সাধারণত নীরস বলে, সে সব বিষয়ের মধ্যেই আমি সবচেয়ে রস খুঁজে পেতুম; একটা নতুন কথা বুঝলে, নতুন কিছু শিখলে পড়া সার্থক মনে হত, আনন্দ পেতুম।

লেখাও অভ্যাস করা দরকার, ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে।

লাইব্রেরীর অ্যানিভারসারী এল। অভিনয়ের জন্যে নবীন সেনের 'রৈবতক' এবং 'প্রভাস' থেকে কয়েকটা 'সিন' নিয়ে "অভিশাপ" নামে এক নাটক খাড়া করে অভিনয় করলুম। মহাভারতের রাজনীতি, ক্ষত্রিয় রাজশক্তির বিরুদ্ধে দুর্বাসা-বাসুকির ষড়যন্ত্র। আমি দুর্বাসা এবং বন্ধুর দাদা ননকুদা' বাসুকি। নর্থ সুবারবান স্কুলের চিরগম্ভীর হেড-মাষ্টার আমার সঙ্গে আলাপ ও অভিনন্দন করলেন। কিন্তু দু'দিন পরে এক I B officer-ও বই-এর সন্ধানে এলেন। রৈবতক-প্রভাসের নাম করে তাঁকে হাঁকিয়ে দিলুম।

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কতকগুলো বিরাট বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। রুশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব সফল হয়েছে, বিপ্লবী বলশেভিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মহাযুদ্ধের অবসানের (নভেম্বর ১৯১৮) পর সেভার্স সন্ধিতে বিজয়ী বৃটেন-ফ্রান্স তুরস্কের রাজ্য ভাগাভাগি করে গ্রাস করে নিয়ে সুলতানকে ক্ষুদ্র এশিয় অংশটুকুতে কোণ-ঠাসা করেছে। কিন্তু নবীন তুর্কীদলের নেতা কামাল পাশা বিদ্রোহ করে সেভার্স চুক্তির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছেন, রুশিয়ার বলশেভিকরা তাঁকে মদৎ দিচ্ছে।

যুদ্ধের আগে ভারতে সৈন্য সংগ্রহের সময় বৃটিশ সরকার ভারতের মুসলমানদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তুরস্কের সুলতানের রাজ্যে হস্তক্ষেপ করা হবে না, কারণ মুসলমানরা তাদের ধর্মগুরু খলিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে রাজী হচ্ছিল না। কিন্তু এখন সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে খলিফার হাড়ির হাল করাতে ভারতীয় মুসলমানেরা ক্ষেপে গেল, মৌলানা মহম্মদ আলী, সৌকত আলী প্রভৃতির নেতৃত্বে তারা খিলাফত আন্দোলনে সংঘবদ্ধ হতে লাগলো, একটা বিদ্রোহের ঝড় আসন্ন হয়ে উঠলো।

আর এক দিকে, ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টার মূলোচ্ছেদের জন্যে সরকার এক যথেচ্ছাচারী বে-আইনী আইন (রৌলট আইন) পাশ করে পুলিসের হাতে অবাধ ক্ষমতা দিয়ে সর্বসাধারণের অসন্তোষ জাগিয়ে তুললে।

ফলে একদিকে কলকাতায় টাউন হলে ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও সি. আর. দাশের নেতৃত্বে এক বিরাট সভা করে প্রতিবাদ করা হল এবং অনেক দিন পরে যেন বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নবজীবনের সঞ্চার হল, ভয় কেটে গেল, উত্তেজনা বাড়তে লাগলো।

আর এক দিকে হল এক বিরাট ব্যাপার। মহাত্মা গান্ধী রৌলট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্যে '১৯ সালের ৬ই এপ্রিল সারা ভারত জোড়া হরতাল সংগঠিত করলেন। এই উপলক্ষে বিপ্লবী পাঞ্জাবের বিপ্লবাকাঙ্ক্ষা ফেটে পড়লো। অমৃতসরে এবং দিল্লীতে জনগণ সরকারী ভবন, ব্যাঙ্ক, রেললাইন প্রভৃতি আক্রমণ করে ভেঙ্গে পুড়িয়ে একাকার করলো। সরকারও মার শুরু করলো বেপরোয়া। অমৃতসরে এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলা পর্যন্ত হয়েছিল।

১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে সরকারের নির্বিচার অত্যাচারের প্রতিবাদে সভা হল, এবং জেনারেল ডায়ার সেখানে মেসিনগান চালিয়ে ১২০০ লোককে হত্যা করলে। তারপর চললো মার্শাল ল'র অত্যাচার। ফলত জনগণের অসন্তোষ হয়ে উঠলো প্রায় সার্বজনীন। উপায় কি ?

মার্শাল ল'র আমলে এক এক গাঁশুদ্ধ লোককে রাস্তায় বার করে পুরুষগুলোকে বুকে হাটানো হচ্ছিল। অসংখ্য লোককে প্রকাশ্য স্থানে খোঁটায় বেঁধে বেত মারা হচ্ছিল। নেতাদের সামরিক বিচারের প্রহসন করে দণ্ড দেওয়া হচ্ছিল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। তার মধ্যে সত্যপাল ও কিচলুর সঙ্গে সরলা দেবীর স্বামী পণ্ডিত রামভুজ দত্ত-চৌধুরীও ছিলেন।

এই অত্যাচারের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ বড়লাটকে এক চিঠি লিখে স্যার উপাধি বর্জন করেন। তাতে তিনি লেখেন, ভারতবাসীর অসহায় অবস্থা পাঞ্জাবে যেরকম নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে, তাতে সরকারী খেতাবে ভূষিত হয়ে চুপ করে বসে থাকার লজ্জা সহ্য করা আমার

পক্ষে অসম্ভব। আমিও ঐ লাঞ্ছিত অসহায় ভারতবাসীদেরই একজন, এবং আমার স্থান তাদের পাশেই।

সারা ভারত ধন্য ধন্য করে উঠলো। নতুন যুগে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে জনগণের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। পরবর্তী কালে হিজলী বন্দী নিবাসে সরকারি গুলী চালনার প্রতিবাদ সভায়ও রবীন্দ্রনাথ নেতৃত্ব করেছিলেন।

কিন্তু আমায় কিছু একটা করতে হবে তো। বসে খেলে তো চলবে না, কিছু রোজগারের ব্যবস্থা দরকার।

মন স্থির করে বাড়ী বেচে ফেললুম এবং কোটের ভিতরের পকেটে নগদ ১৮,৫০০৲ টাকা নিয়ে হেঁটে কাশীপুর সাব-রেজেস্ট্রী অফিস থেকে বাগবাজারে এসে ট্রামে ড্যালহাউসী স্কোয়ারে টাটা ব্যাঙ্কে জমা দিলুম। আজ সে কথা মনে হলে গা শিউরে ওঠে। তখন রাহাজানির যুগও শুরু হয়নি, আর আমার অর্বাচীন দুঃসাহসও ছিল প্রচুর। বুদ্ধির বহরও কম ছিল না—ঘোড়ার গাড়ীতে যাওয়ার চেয়ে সাবধানতা হিসেবে বড় রাস্তা ধরে বরাবর হেঁটে যাওয়াই নিরাপদ মনে হয়েছিল।

লোকে বলে, বাড়ী গেলে আবার বাড়ী হওয়া শক্ত। মাথা গোঁজার ঠাঁই থাকা চাই। সুতরাং বরাহনগর কুঠিঘাটার কাছে এক বাড়ী এবং সিঁথিতে সাতপুকুরের বাগানের পিছনে কিছু জমি কিনলুম। বাকী টাকায় কিছু ছোট দোকানদারী ব্যবসা করাই স্থির করলুম। পয়সা নষ্ট করে ব্যবসা শিখতে হবে, সুতরাং দিল-দরাজী চলবে না। ভেবে চিন্তে শ্যামবাজারে প্রমথ মল্লিকের চকে রাস্তার ওপর একখানা ঘর খালি পেয়ে ভাড়া করে ফেললুম। তখনও টালায় থাকি।

শান্তিপুরের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কারিগর তাঁতীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—তারা পরামর্শ দিয়েছিল শান্তিপুরের কাপড়ের ব্যবসা করার। প্রথমে ঠিক করলুম তাই করবো। কয়েকশো টাকার দামী ধুতি, শাড়ী এবং চাদরও কিনে ফেললুম। কিন্তু কাপড়গুলো দুজন জুয়াচোরে ফাঁক করে দিলে।

একদিন রাস্তায় এক বেকার ভদ্রলোক সাহায্য ভিক্ষা চাইলে, ছেলে মেয়ে নিয়ে অনাহার চলছে। একটি সিকি দিয়ে নাম ঠিকানা জেনে নিলুম এবং দু-একদিন পরে আমার ঠিকানায় দেখা করতে বলে দিলুম। তার ঠিকানায় খোঁজ নিয়ে দেখলুম পাকপাড়ায় এক বস্তির একটা খোলার বাড়ীর ভাড়াটে, যা যা বলেছিল সব সত্যিই।

সুতরাং দুদিন পরে সে যখন আমার কাছে এল, একটা নতুন চামড়ার স্যুটকেস ভরে তাকে একগাদা দামী কাপড় দিয়ে বলে দিলুম বড় বড় বাড়ী দেখে ঘুরে যদি রোজ একখানা কাপড়ও বেচে আসতে পারো, তাহলে এমন কমিশন দোব, যাতে তোমার চলে যায়। সে ভক্তিভরে পায়ের ধুলো নিয়ে বিদায় হল।

কিন্তু সেই প্রথম দিন যে গেল, আর তার দেখা পেলুম না, কোনো রকমেই ধরতে পারলুম না। মনকে প্রবোধ দিলুম, ব্যবসায় যাই হোক, কাজ তো কিছু হল!

বাকি কাপড়ের বেশীর ভাগ ধারে কিনলে টালার ফণী মুখুজ্যের ছোট ভাই পাগলা। বিক্রী তো হল, দামটা না হয় পেতে একটু দেরীই হবে। কিন্তু কিছুতেই একটা পয়সা

আদায় করতে পারলুম না। দুত্তোর বলে কথাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেললুম। ততদিনে ব্যবসার আর একটা নতুন সূত্র পেয়েছি। সে কথা পরে বলছি।

১৯২০ সাল শেষ হয়ে আসছে। সেপ্টেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হল। আমেরিকা থেকে সদ্য প্রত্যাগত লালা লাজপৎ রায় হলেন সভাপতি।

কংগ্রেসের মূ প্রস্তাব হ। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ। উদ্দেশ্য পাঞ্জাব ও খিলাফৎ-সংক্রান্ত অন্যায়ের প্রতিকার। খিলাফৎ আন্দোলনে মুসলমানেরা পাছে হিংসার পথ অবলম্বন করে, তাই মহাত্মা গান্ধী তাদের কংগ্রেসের সমর্থন ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দলে টেনে নিয়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনটাকে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত আন্দোলনে পরিণত করার ব্যবস্থা করলেন।

বাংলার নেতারা মূল-প্রস্তাবের সংশোধনী প্রস্তাব করে স্বরাজের দাবীটাও জুড়ে দিতে চাইলেন। কারণ স্বরাজ না হলে কোন অন্যায়েরই স্থায়ী প্রতিকার হবে না। গান্ধীজী এটা মেনে নিলেন।

প্রস্তাব অনুসারে স্কুল কলেজ, আদালত বয়কট করতে হবে, বিলাতী কাপড় বর্জন করতে হবে, জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সালিশী আদালত করে মামলার নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে, চরকার প্রচলন করে খদ্দর উৎপাদন করে বস্ত্রসমস্যার সমাধান করতে হবে, হিন্দু মুসলমান ঐক্য সুদৃঢ় করতে হবে।

মহাত্মা বললেন, এই কার্যক্রম একটা বছর রীতিমত ভাবে চালাতে পারলেই স্বরাজ হয়ে যাবে। কিন্তু তার জন্যে কংগ্রেসের নতুন গঠনতন্ত্র তৈরী করে কংগ্রেসকে গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে এবং কংগ্রেসের আদর্শেরও পরিবর্তন (creed change) করতে হবে। স্থির হল এদুটো ব্যবস্থা ডিসেম্বরে নাগপুরে সাধারণ অধিবেশনে করা হবে।

একটা বড় আন্দোলন আসছে বোঝা গেল, কিন্তু স্বরাজ-মরাজ যাই হোক, স্বাধীনতা যে অহিংসপন্থায় হতে পারে না, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু সরকার বিরোধী একটা দেশজোড়া লড়াই তো বটে। দেখা যাক—

আন্দামান থেকে সদ্য-প্রত্যাগত শচীন সান্যাল ছিলেন কলকাতা কংগ্রেসে ভলান্টিয়ারদের ক্যাপ্টেন মহারাষ্ট্রীয় ডেলিগেটরা ভলান্টিয়ারদের মেরেছিল, তিনি থামাতে গিয়েছিলেন এবং তাঁর মাথায়ও তারা লাঠির বাড়ি মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। ভলান্টিয়াররা পাল্টা মার দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের থামানো হয়েছিল এই বলে যে যদি মারতে হয়, তাহলে নাগপুর কংগ্রেসে গিয়ে মারবো।

২০ সালের আগষ্ট মাসে নতুন শাসন সংস্কার (মন্টেগু চেমসফোর্ড) ঘোষিত হয়েছে। বিপ্লবীরা মুক্ত হয়েছেন।

এমন সময় জীবনও জেল থেকে মুক্ত হয়ে এল, টালায় তার মামার বাড়ীতে উঠলো। ওদিকে মামার দেশের (নড়িয়া, ফরিদপুর) লোক গোপাল-ভট্টাচার্য (জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্তমান সম্পাদক, বোস ইনষ্টিটিউটের অন্যতম বৈজ্ঞানিক গবেষক), কলকাতায় এসে ঐখানেই উঠেছেন ভাগ্য অন্বেষণে। আসার পরে কয়েক দিনের মধ্যেই কাশীপুরে র‍্যালী ব্রাদার্সের গুমটিতে টেলিফোন ক্লার্কের কাজ জুটিয়ে নিয়েছেন।

জীবনের মারফৎ আলাপ হল। নির্ভেজাল বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পেয়ে বেশ

ভাল লাগলো এবং দু'-চার দিনেই বন্ধুত্ব জমে উঠলো। বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার দিকে তাঁর ছিল অসাধারণ ঝোঁক এবং গ্রামে থেকেই বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি-সংক্রান্ত পুঁথিপত্রের সাহায্যে ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের বলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বেশ একজন ছোট খাটো বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রবিদ। কীটপতঙ্গ, বিশেষত মাকড়সাগোষ্ঠীর আচার-ব্যবহার ও নানা অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা সম্বন্ধে তাঁর পর্যবেক্ষণের ফলাফল সম্পর্কে তিনি "প্রবাসী"তে প্রবন্ধ লিখতেন, এবং ছুরি-নরুণের সাহায্যে ঘড়ি মেরামতও করতেন।

আমি ব্যবসা করতে নেমেছি, পদক্ষেপ নেহাৎ কম হয়নি, কিন্তু ফল এপর্যন্ত হয়েছে অগ্রগতির বদলে ঘুরপাকমাত্র। শুনে তিনি বললেন, যদি ঘড়ি মেরামতের দোকান করেন, আমি সকালে-বিকালে গিয়ে বসতে পারি। আমিও কাজ করবো, আপনি শিখে নিতেও পারবেন। উৎসাহের চোটে তাই স্থির করে ফেললুম।

নিলাম থেকে আলমারী-সো-কেস কিনলুল, রাধাবাজার থেকে একসেট যন্ত্রও নিলুম।

লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে অনেকগুলো নানারকমের ছোট বড় বিকল ঘড়িও যোগাড় করে ফেললুম। কিন্তু হঠাৎ সমগ্র পরিস্থিতি গেল বদলে, ঘড়ির দোকান হল না।

বিপ্লবী নেতা পুলিন দাস গোপালবাবুর দেশের লোক। আচার্য জগদীশ বসু তাঁকে অর্থ সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা করেছেন, প্রত্যহ বৈকালে পুলিন বাবু বোস ইনষ্টিটিউটের কর্মীদের একটু করে লাঠি খেলা শেখাবেন। গবেষকদের ওপরও তাঁর হুকুম, সকলকেই বিকালে একবার লাঠি নিয়ে মাঠে নামতে হবে।

গোপাল বাবু সেখানে গিয়ে পুলিন বাবুর সঙ্গে দেখা করে, তাঁর সাহায্যে Laboratory Assistant-এর এক চাকরী জোগাড় করে ফেললেন। তাঁর আর দোকানে বসা সম্ভব হল না। ছুতোর বলে বাড়ী থেকে কিছু ফার্নিচার নিয়ে দোকানে তুললুম—এই ব্যবসাই করবো। ভাগ্নীজামাইকে বসালুম দোকানে।

ইতিমধ্যে এসে পড়লো নাগপুর কংগ্রেস। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গেলুম ডেলিগেট হয়ে। জন পঞ্চাশেক বাছা বাছা ডেলিগেট চললেন, হাতে এক একটা মজবুত ছোট লাঠি। সেখানে মারাঠিদের সঙ্গে ঝগড়াও হল, তাদের রীতিমত মার দেওয়াও হল, কলকাতার জবাব দেওয়া হল।

নাগপুর কংগ্রেসে দুটো বড় বড় মূল কাজ হল, (১) কংগ্রেসের আদর্শের (creed) পরিবর্তন, আর (২) নতুন গঠনতন্ত্র। ব্যবস্থা হল, কংগ্রেসের আদর্শপত্রে সই দিলে এবং বাৎসরিক চার আনা চাঁদা দিলে যে-কেহই কংগ্রেসের সভ্য হতে পারবে। এই ভাবে কংগ্রেস হবে সারা ভারতব্যাপী জনসংগঠন। বিস্তারিতভাবে গঠনতন্ত্র রচনার জন্যে কমিটি তৈরী হল।

আর, কংগ্রেসের creed আগে ছিল "Attainment of Self-Government within British Empire by Constitutional means." পরিবর্তন প্রস্তাবিত হল "Attainment of Swaraj by peaceful and legitimate means." আপত্তি করলেন দুজন নেতা—বিপিন পাল ও জিন্না। বিপিন পাল বললেন, "এতে সরকার কংগ্রেসকে বে-আইনী করে দেবে, আমাদের সর্বনাশ হবে।"

মহাত্মা জবাব দিলেন, "এই বে-আইনী করার ভয়টা ভুল, এতে বে-আইনী কিছু

নেই। আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকবো কি না, সেটা একটা খোলা প্রশ্ন থাক, তার মীমাংসা নির্ভর করুক সরকারের ব্যবহারের উপর।"

জিন্না বললেন, "within British Empire" কথাটা তুলে দাও, ক্ষতি নেই, কিন্তু তার স্থলে লিখে দেওয়া হোক, "বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত স্বরাজ"। কারণ তা না হলে কর্মীরা ও জনসাধারণ দিশেহারা হবে, কেউ "within," কেউ "without" মনে করে কাজ করবে, কাজে গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা হবে। সরকার বে-আইনী ঘোষণা করে তো আমরাও তার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার ব্যবস্থা করবো।"

মহাত্মা জবাব দিলেন, "আমরা যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরেই যেতে চাই, একথাই কি ঠিক? একথা ঠিক করার সময় এখনো আসেনি। যখন স্বরাজ হবে, তখন জনগণ সেটা ঠিক করবে।" প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

ফিরে এসে দেখি, দোকানের চেহারা যেমন ছিল, অবিকল তেমনি আছে। ফার্নিচারের ব্যবসায়ে আমার পাণ্ডিত্য নিলাম চেনা পর্যন্ত, ভাগ্নীজামাই ততোধিক পণ্ডিত, তিনি নিলামও চেনেন না।

দোকানের পিছনে চকের মধ্যে দুটো বড় বড় ডেকরেটর-এর ব্যবসা ছিল। দেখতে দেখতে মনে হল এই ব্যবসাটা বেশ। একদিন স্থির করে ফেললুম, এই ব্যবসাই করতে হবে।

আট

আমার ব্যবসার দৌড় দেখে এতক্ষণ আপনারা মুখ টিপে হেসেছেন, কিন্তু এইবার আপনারা গম্ভীর না হয়ে পারবেন না। ডেকরেশনের ব্যবসাটা একটা পূর্ণাবয়ব বৃহৎ ব্যবসাই হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে বিবরণের আগে স্বদেশী হাঙ্গামার বিকাশের বিভিন্ন দিকের বিবরণ কিছু দেওয়া দরকার।

বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধে যোগ দিয়ে প্রাণপাত করলে ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসনের দাবী জোরদার হবে, এবং সে দাবীর সম্মান রেখে বৃটিশ সরকার যে ভারতবাসীকে নিশ্চয়ই স্বায়ত্তশাসন পুরস্কার দেবে, একথা প্রচার করে যে নিষ্ঠাবান রিক্রুটিং এজেন্ট গান্ধী, তিলক, অ্যানী বেসান্ট প্রভৃতি কংগ্রেসী গরম দলের থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন, রৌলট আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় সেই গান্ধী বিগড়ে গিয়ে বললেন, এই সরকার আমার সকল বিশ্বাসের গোড়া কেটে দিয়েছে। কিন্তু বৃটেন বা বৃটিশ সাম্রাজ্যের ওপর বিশ্বাস তাঁর শিথিল হয়নি। তাই সশস্ত্র বিপ্লবের আশংকাকে তিনি অহিংস অসহযোগের পথে পরিচালিত করলেন।

মডারেট কংগ্রেস নেতা প্রভাস মিত্র ছিলেন রৌলট কমিটির অন্যতম সদস্য। ১৮ সালের শেষেই কংগ্রেসের এই মডারেট নেতারা কংগ্রেস ছেড়ে পৃথক নতুন লিবার্যাল ফেডারেশন গঠন করেছিলেন।

২০ সালের আগষ্ট মাসে মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হয় এবং সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ প্রস্তাব পাশ হয়। সংস্কার প্রবর্তনের

সঙ্গে সঙ্গে আন্দামান থেকে মাণিকতলা বোমার আসামীরা, বারীন ঘোষ প্রভৃতি মুক্ত হন। ২১ সালে বারীন ঘোষ "বিজলী" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হলে প্রথম নির্বাচনে কংগ্রেস অবতীর্ণ হবে বলে নেতারা স্থির করেছিলেন এবং বাংলা দেশে নির্বাচন-প্রার্থীদের নাম পর্যন্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অসহযোগ প্রস্তাব অনুসারে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত করা হয়, এবং লিবার‍্যাল ফেডারেশন প্রভৃতি অন্যান্য দলের নির্বাচনের পথ নিষ্কণ্টক হয়।

শাসন সংস্কার পরীক্ষা করে দেখা গেল, কয়েকজন মিনিষ্টার করার ব্যবস্থা করা হয়েছে জাতি গঠন সম্পর্কিত বিভাগগুলোর জন্যে—যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, কৃষি-শিল্প প্রভৃতি। রাজস্ব, অর্থ, পুলিশ প্রভৃতি প্রধান বিভাগগুলো সরকার নিজের হাতেই রেখেছে, আগেকার মত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের হাতে।

প্রথম বিভাগগুলোর নাম ট্রান্সফার্ড সাবজেক্ট, আর দ্বিতীয় বিভাগগুলোর নাম রিজার্ভড্ সাবজেক্ট। তাই এই শাসন ব্যবস্থাকে দ্বৈতশাসন বা ডায়ার্কি বলা হত। নির্বাচিত কাউন্সিল সদস্য কিছু বাড়ানো হয়েছিল।

ব্যবস্থা হয়েছিল, জাতি গঠনের বিভাগগুলোর ব্যয় বরাদ্দ করার দায়িত্ব অর্থ বিভাগের ওপর থাকবে না, তাঁদের সংরক্ষিত বিভাগগুলোর ব্যয় নির্বাহ করে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাহলে হস্তান্তরিত বিভাগগুলোকে কিছু কিছু বেঁটে দেওয়া হবে, অন্যথা হস্তান্তরিত বিভাগের মন্ত্রীদের নিজ নিজ বিভাগের ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে, দরকার হলে তাঁরা সেজন্যে নতুন ট্যাক্স আদায় করতে পারবেন।

প্রথম মন্ত্রী হয়েছিলেন সুরেন ব্যানার্জি, প্রভাস মিত্র এবং নবাব আলি চৌধুরী (বগুড়ার নবাব)। সুরেন ব্যানার্জির হাতে ছিল স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগ। অর্থাভাবে তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়গুলো থেকে কিছু টাকা তোলার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথম দিন নাম লেখানোর সময় রোগীদের কাছ থেকে চারটে করে পয়সা নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। ফলে, "দিশী" মন্ত্রীদের ওপর সাধারণ লোকের অশ্রদ্ধা হয়েছিল।

কিন্তু সেই প্রথম চান্স পেয়েই সুরেন ব্যানার্জি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন বিধিবদ্ধ করেন, কলকাতা কর্পোরেশনের উপর মেয়রের শাসনের ব্যবস্থা করেন, যে ব্যাপারটাকে কংগ্রেস সমেত সারা দেশ তাঁর জীবনের একটা বিরাট সাফল্য বলে অভিনন্দিত করে।

যাই হোক, ডায়ার্কির সঙ্গে ভারতবাসীদের আর কয়েকটা বড় চাকরী-ঘুস দেওয়ারও ব্যবস্থা বৃটিশ সরকার করেছিল। কেন্দ্রে আর একজন ভারতীয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলার, বিলাতে ভারতসভায় একজন ভারতীয় সভ্য, বিলাতে একজন ভারতীয় হাই কমিশনার প্রভৃতি। ফলত শাসন সংস্কারের অন্তঃসারশূন্যতা প্রচারে কংগ্রেসকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

এদিকে যে ছয়জন বিপ্লবী নেতা এতকাল ফেরার ছিলেন (গোয়ায় নিহত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় বাদে) তাঁরা ফিরে না এলে সরকারও নিশ্চিন্ত হতে পারেন না, আর বিপ্লবীদেরও বর্তমান অঙ্কের পরিসমাপ্তি হয় না। সুতরাং বারীনদা' প্রভৃতি সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। একদিকে বিজলীতে বিজ্ঞাপন বেরুতে লাগলো, "ভাই অমর, বা ভাই অতুল, তোমরা যেখানেই থাক, আমাদের সঙ্গে পত্রালাপ কর" আর একদিকে

চন্দননগরের মতি রায়ের সঙ্গে অতুলদা'র গোপনে কথাবার্তা চলতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত স্থির হল, চন্দননগরে ফেরারী বিপ্লবীদের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার হবে এবং কথাবার্তার পর বিপ্লবী নেতাদের নির্বিঘ্নে ফিরে যেতে দেওয়া হবে।

তদনুসারে বাংলা সরকারের সেক্রেটারী এবং গোয়েন্দাচীফের সঙ্গে অতুলদা'র সাক্ষাৎকার ও কথাবার্তা হয়ে স্থির হল, ফেরারীদের বিরুদ্ধে সকল চার্জ তুলে নেওয়া হবে, অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণের কথা তোলা চলবে না এবং আবার কখনো তাঁদের গ্রেপ্তার করতে হলে, আগে তাঁদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট জানিয়ে তাঁদের বক্তব্য বলার সুযোগ দিতে হবে।

এই বন্দোবস্তের পর ফিরে এলেন অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী (খুশনা) পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নলিনী কর। যাদুদা মেডিক্যাল পড়তে পড়তে গা ঢাকা দিয়েছিলেন, ফেরারী অবস্থায় প্রয়োজন হলে ডাক্তারীও কিছু কিছু করতেন, এখন হঠাৎ ডাক্তারী (এম, বি) পরীক্ষা দিয়ে ফার্স্ট হয়ে স্বর্ণপদক পেলেন।

দাদারা কোন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করবেন, তার আলোচনা হল। দেশজোড়া প্রকাশ্য গণ আন্দোলন সুরু হয়েছে, সশস্ত্র বিপ্লবের আন্দোলন বা কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রও নেই, অহিংসার আদর্শ সামনে না রেখে "এই শয়তানী শাসন ব্যবস্থাকে হয় সংশোধন, না হয় ধ্বংস" করার প্রকাশ্য আন্দোলন চলতেও পারে না, এবং এতবড় আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকাও ভবিষ্যৎ বিপ্লব আন্দোলনের পক্ষে সমীচীন হবে না। সুতরাং তাঁরা ঠিক করলেন, কংগ্রেসে যোগ দিতে হবে।

আমি তার আগে থেকেই ১৯২১ সালের গোড়া থেকেই, ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিগতভাবে আন্দোলনের দিকে ঝুঁকেছিলুম। হিংসা অহিংসার কথা একটা বছর পরে ভেবে দেখা যাবে। সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা বুকে পুষে রেখেও তো হয়ত এখনো বহু বৎসর অহিংসই থাকতে হবে। ইতিমধ্যে একটা বছর সারাদেশে প্রকাশ্যভাবে সরকার-বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলার সুযোগটার সদ্ব্যবহার করলে কি ভবিষ্যতের সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতির ক্ষেত্রই প্রশস্ত হবে না?

যুদ্ধের কটা বছর বিলিতী কাপড় আমদানীর অসুবিধা হওয়ায় দেশে বস্ত্রাভাব হয়েছিল, দর চার গুণ বেড়েছিল। কিছু জাপানী কাপড় এবং কিছু দেশী মিলের কাপড়ের ব্যবসার সুযোগ এসেছিল, কিন্তু দর বৃদ্ধির জন্য গরীব লোক কাপড় কিনতে পারতো না, বস্ত্রাভাবে গরীব ঘরের মেয়েরা ঘরের বার হতে পারতো না, বস্ত্রাভাবে গলায় দড়ি দিয়ে মরার খবরও কাগজে প্রকাশ হচ্ছিল। একটা অর্থনৈতিক জাতীয়তার ভাবও ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। বিলিতী কাপড় আবার আমদানী শুরু হয়েছিল।

এই সময়ে বিলিতী কাপড় বয়কট করা এবং খদ্দর উৎপাদন করে বস্ত্রসমস্যার আংশিক সমাধানের পরিকল্পনা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছিল। যারা নতুন উৎপন্ন মোটা খদ্দর পরতে পারবে না, তারা যাতে অন্তত মিলের মোটা কাপড়ই পরে, তার জন্যে একদল লোকের খদ্দর পরা প্রয়োজন। সেটা হবে দেশ-প্রেমিকের কর্তব্য। এই একটা কাজের খাতিরেই তো আন্দোলনে সামিল হওয়া চলে। চিন্তা এই লাইনে চললো।

এদিকে ডেকরেশনের ব্যবসার জন্যে নিলাম থেকে বড় বড় সতরঞ্চি, কার্পেট, বড় বড় কয়েক জোড়া করে ফুলদান, শামাদান, পরদা প্রভৃতি কেনা হল, কয়েকটা হাঁড়িবাতি

(Punch light) এবং কিছু অ্যাসিটিলিন গ্যাসের আলো কেনা হল। বিয়ের প্রসেশনের আলো তৈরীর জন্যে একজন মিস্ত্রীও রাখা হল এবং মোটা দামে একগাড়ী পাইপ কেনা হল। দোকানে থাকে ভাগনী জামাই এবং একজন ছোকরা। আমি out door কাজ করার অজুহাতে বাইরে বাইরেই থাকি এবং নানা আড্ডায় ঘুরে সমস্ত কাগজ ও ম্যাগাজিনগুলো পড়ি এবং বিকালে কলেজ স্কোয়ারে মিটিং দেখি। সেখানে পদমরাজ জৈন, জে. এল. ব্যানার্জি, হরিদাস হালদার, ললিত ঘোষাল, মৌলবী আহমদ আলী প্রভৃতি অসহযোগ আন্দোলনের প্রচার ও ব্যাখ্যা করেন। আহমদ আলী তার মধ্যে "নব্য ইটালী"র ম্যাটসিনীর বক্তৃতা মুখস্থ করে অসহযোগ ব্যাখ্যার নামে চালাতে শুরু করেছিলেন।

হরিদাস হালদার বলতেন, যে সরকারী যন্ত্রটা আমাদের হাতের জোরে চলে, হাত সরিয়ে নিয়ে সেটাকে অচল করে দিতে হবে। কারণটা অতি সহজ, একটি negation, inaction মাত্র।

যন্ত্রটা চালাবার লোকের অভাব যে এদেশে হবে না, ৩২ কোটি লোকই যে অসহযোগ করবে না, অচল হওয়াটাই যে শেষ নয়, সেটাকে দখল ও সচল করাই শেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত, এ সব কথা মনে হত না কারো, মনে হওয়াটা যেন তখন দেশপ্রেমের পরিচয় নয়। বক্তৃতা শুনতে সকলেরই ভালো লাগতো।

টালা বরানগর ছিল ২৪ পরগণার অন্তর্গত। ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন ইংরাজী সাপ্তাহিক 'মুসলমান' পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক সর্বজনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা মৌলবী মজিবর রহমান। কড়েয়াতে তাঁর বাড়ীতে ছিল অফিস।

আমরা কংগ্রেস অফিস থেকে নতুন-ছাপানো রসিদ বই এনে মেম্বার করতে শুরু করলুম। টালায় কংগ্রেস কমিটি সংগঠন করলেন পাটু বাবু, তাঁদের বাড়ীতেই অফিস (পরাণ মুখুজ্যের বাড়ী)।

কিন্তু বরানগরেও তো একটা কংগ্রেস কমিটি করা দরকার। আমি প্রথমে গেলুম বিপিনদা'র চেলা, ভূতপূর্ব আটকবন্দী বিশু সেনের বাড়ীতে। তিনি বয়সে আমাদের চেয়ে বড়—তাঁর ছোট ভাইকে নিয়ে পড়লুম। তাঁরা বিশেষ আমল দিলেন না। কিন্তু সেখানকার আড্ডা থেকে একটা হদিস সংগ্রহ করলুম। বড়বাজারের লৌহ ব্যবসায়ী প্রৌঢ়-ভদ্রলোক হরিশঙ্কর দে এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণধন দেকে গাঁথতে পারলে অনেক লোক আসবে, কংগ্রেস কমিটি করা যাবে।

কৃষ্ণধনের সঙ্গে দেখা করে অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়ে তাঁকে বোঝালুম, রাজী করালুম, এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হরিশঙ্কর বাবুর সঙ্গে দেখা করে বললুম, আপনি সভাপতি না হলে তো এখানে কংগ্রেস কমিটিই হয় না, বরানগরের বদনাম হয়ে যায়।

ভদ্রলোক, যাকে বলে hard nut to crack, কিন্তু কয়েকদিন ধ্বস্তাধ্বস্তির পর রাজী হলেন। তিনি প্রেসিডেণ্ট এবং কৃষ্ণধন বাবু সেক্রেটারী—হল বরানগর কংগ্রেস কমিটি।

আলমবাজারে বিপিনদা'র আর এক চেলা, ভূতপূর্ব আটকবন্দী ছিলেন তুলসী ঘোষ। তাঁর কাছে গেলুম আলমবাজারে কংগ্রেস কমিটি করার জন্যে। তিনি রাজী হয়ে গেলেন। তাঁর দোসর (জুনিয়ার) ছিলেন ধীরেন চাটুজ্যে (যিনি পরে বরানগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন)—তিনিও থাকলেন।

যাই হোক, Forbes Mansion থেকে একটা চরকা কিনে এনে দিদিকে দিয়েছিলুম, তিনি বাড়ীতে চরকা কাটতেন। আমি সকালে একটু চরকা কেটে পাড়ায় বেরিয়ে একবার সেক্রেটারী কৃষ্ণধন বাবুর বাড়ীতে কংগ্রেস অফিসে গিয়ে তাঁকে একটু তাতিয়ে এসে খেয়ে দেয়ে কলকাতায় চলে আসতুম। একবার দোকানে পদধূলি দিয়ে সরে পড়তুম। খদ্দর প্রচারের জন্যে নীলা-বরানগরে খদ্দরের ধুতি ও শাড়ী ঘাড়ে করে লোকের বাড়ী পৌঁছে দিতুম। পাটু বাবু তো খদ্দর প্রচারের জন্যে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর কাছে এক খদ্দরের দোকানই করে বসলেন। কিছু অর্থনষ্ট এবং কিছু মনঃকষ্ট হয়েছিল তাঁর নীট লাভ।

ফেব্রুয়ারী মাসে প্রিন্স অফ ওয়েলসকে ভারতে এনে সরকার জনগণের রাজভক্তির উদ্রেকের ব্যবস্থা করলেন। বোধ হয় ২০ সালের শেষে এই উদ্দেশ্যে ডিউক অফ কনটকে (রাজার ভাই) আনা হয়েছিল এবং কলকাতায় আগমন উপলক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও আনুষঙ্গিক কিছু মারামারি, পুলিশের লাঠিবাজী ও ধরপাকড় হয়েছিল। সুতরাং প্রিন্স অফ ওয়েলস যেদিন কলকাতায় আসেন, সেদিন লোক যাতে দেখতেই না যায়, হাওড়া থেকে গভর্ণমেণ্ট হাউস পর্যন্ত রাস্তা যাতে ফাঁকা থাকে, তার জন্যে কলকাতার সমস্ত পার্কে আটটা সভার বন্দোবস্ত হয়েছে, এবং নিখিলভারত নেতারা এসেছেন। ঐ আটটা সভাতেই তাঁরা বক্তৃতা করবেন—মতিলাল নেহেরু, গান্ধী, মহম্মদ আলী, সৌকত আলী, ডাঃ সত্য পাল, কিচলু, সেনগুপ্তা প্রভৃতি। পার্কে পার্কে বিরাট জনসমাগম দুপুর থেকেই শুরু হয়েছে, ষ্ট্রাণ্ড রোড ফাঁকা, বয়কট সম্পূর্ণ সফল বিনা গণ্ডগোলেই।

নেতারা এক এক সভায় বক্তৃতা করে অন্য সভায় রওনা হচ্ছেন, এক সঙ্গে কয়েকটা পার্কে সভা চলছে। আমিও এক পার্ক থেকে অন্য পার্কে চলেছি মিটিং দেখতে। রাত আটটা পর্যন্ত এমনি চলে। সব মিটিং শেষ হলে আমি ইডেন হসপিট্যাল রোডে এক মেসে খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়েছি। তার আগের দিনও বাড়ী যাওয়া ঘটেনি।

সকালে উঠে টালা হয়ে কাশীপুর দিয়ে ষ্টীমারে বাড়ী যাবো, টালার পোল পার হয়েই দেখা একদল মহিলা গঙ্গাস্নানার্থীর সঙ্গে। আমাকে দেখে এক দিদি জিজ্ঞাসা করলেন "হ্যাঁরে, তোর দিদির কি হয়েছিল?" বললুম, কিছু হয়নি তো। তিনি বুঝলেন আমি বাড়ীর খবর রাখি না, চেপে গেলেন। আমি মনে করলুম, কথার ছিরি দেখ, যেন দিদি মারা গেছে।

কাশীপুরে র‍্যালী ব্রাদার্সের গুমটিতে গোপাল বাবুর সঙ্গে দেখা করলুম—তিনি তখনও সে চাকরী ছেড়ে বেরোতে পারেন নি। তিনি বললেন, বাড়ী যান শীগ্‌গির। বুকটার মধ্যে ধড়াস করে উঠলো। বাড়ী চলে গেলুম। উঠোনে পৌঁছতেই ভাগ্নী এসে হাউমাউ করে চীৎকার করে পায়ের কাছে আছড়ে পড়লো। পাশের বাড়ীর গিন্নী "লক্ষ্মীর মা" তাকে টেনে তুলে ঘরে নিয়ে গেলেন। আফশোষ করে বলতে লাগলেন, আহা, মেয়ে-জামাইয়ের কথা কিছু না বলে শুধু কেঁদেছে, খোকার সঙ্গে দেখা হল না।" দিদি আমাকে খোকা বলে ডাকতেন।

ছুটলুম রতন বাবুর ঘাটে, শ্মশানঘাটে, এবং দেখলুম দাহ হয়ে গেছে। চিতায় জল দিলুম এবং বাড়ী ফিরে বেকুবের মতন বিছানায় উপুড় হয়ে পড়লুম।

ঘটনাটা হয়েছে, আমি যখন যতীন দত্তের মেসে হৈ হৈ করে সভার বিবরণ দিয়ে মাতব্বরী করছি, ঠিক সেই সময়ে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে দিদি আমার জন্যে ধড়ফড় করছেন,

আর ভাগ্নীজামাই সারা কলকাতার সব জানা ঠিকানায় আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যতীন দত্তের মেসটা তার জানা ছিল না। ভোরে দিদির মৃত্যু হয়েছে, স্যালাইন ইন্‌জেকশন দেওয়ার ব্যবস্থার আগেই। অপূর্ব ঘটনাচক্র।

দু'দিন বিছানায় পড়ে নিঃশব্দে কাঁদলুম, আর ভাবলুম, কি হবে। চারদিকে যেন একটা শূন্যতা, রিক্ততা, সহায়হীনতার অন্ধকার নেমে এসে সর্বকিছু ঝাপসা করে দিয়েছে। দিদি যে কি ছিল, কেমন ছিল, সে কথা এখানে বলার অবকাশ নেই—সে একটা বৃহৎ উপন্যাসের কাহিনী হতে পারে। অতি সংক্ষেপে মাত্র দু'একটা কথা এখানে বলবো।

আমি জন্মাবার বছর খানেক আগে দিদির একটা ছেলে হয়ে অল্পদিন বাদেই মারা গিয়েছিল। সুতরাং আমি জন্মের পর সমানে মা ও দিদির মাই খেয়েছি এবং শেষ পর্যন্ত দিদিই আমাকে ছেলের মতন করে মানুষ করেছিলেন। মা'র কাছে তাড়া খেলে দিদির কাছে পালাতুম, কিন্তু দিদির কাছে তাড়া, এমন কি মার খেলেও মা'র কাছে কখনো পালাই নি। তারপর মা মারা গেছেন, আমার বয়স যখন আট বছর। তার পর থেকে মানুষ হয়েছি দিদির হাতেই। ভগিনীপতি নেশাখোর হয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল।

আমার বারো বছর বয়সে বাবা মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বাড়ীর অর্ধাংশ দিদির নামে লেখা পড়া করে দিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু দিদিই তাঁকে নিবৃত্ত করেন এই বলে যে, আপনি যদি এই ভাবে খোকার সঙ্গে আমার একটা "দেইজি" সম্পর্ক করে দিয়ে যান, তাহলে শেষ পর্যন্ত ওর সঙ্গে আমার বিরোধ বাধবেই, আজ যে বিরোধের কোন সম্ভাবনাই নেই। এই ছিলেন আমার দিদি।

যাই হোক, দুদিন পড়ে থেকে উঠলুম, চাঙ্গা হলুম এবং সংসার ও ব্যবসার দিকে একটু মনোযোগ দিতে মনস্থ করলুম। ব্যবসার একটা সুযোগও এসে গেল।

টালার খালধারে ফাঁড়ির পাশে গুড়ের আড়তে একটা বড় বারোয়ারী হত, সেখানে অনেকদিন ধরে যাত্রা, পুতুলনাচ প্রভৃতি হত। সেই বারোয়ারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ম্যারাপ প্রভৃতির কনট্রাক্ট নিয়ে ফেললুম। ১০ গাড়ী বাঁশ, ১৬০০ হোগলা, ৩ গাড়ী শালের খুঁটি, তিনটে বড় খুঁটি ৪০ ফুট করে, এই সব কিনে ফেললুম ম্যারাপের জন্যে। সরু খেরো থান একগাদা কিনে লাল, নীল, হলদে রং ছুপিয়ে ফেস্টুন হল, বড় চওড়া থান একগাদা কিনে তৈরী হল বড় বড় চাদর এবং ফুলকাটা রঙীন Ceiling এর কাপড়। যাত্রার আসরের খুঁটিতে খুঁটিতে পরদার ওপর জোড়া জোড়া ন্যাশান্যাল ফ্ল্যাগ এবং জাতীয় নেতাদের ত্রিবর্ণ ছবি—গ্রীন বোর্ড Oval করে কেটে আমেরিকান সাদা নক্সাদার ফ্রেমে বাঁধানো। সকলে দেখে খুসী হল, আমার স্বাদেশিকতার সখও একটু মিটলো। সব মিলে কাজটা প্রকাণ্ড এবং বেশ সুশৃঙ্খলভাবে সুসম্পন্নও হল। টাকা পেতেও বেগ পেতে হল না!

এই কাজের মারফৎ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল, তাও সামান্য নয়। চারটে বিদঘুটে শ্রেণীর লোক নিয়ে কাজ—মুটে, গাড়োয়ান, ঘরামি আর মিস্ত্রী—প্রায় একটা যুদ্ধ ম্যানেজ করা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলুম।

এদিকে এসে গেল বরিশাল কন্‌ফারেন্স। চললুম বরিশালে, টালার বন্ধু বঙ্কুকে সঙ্গে নিয়ে গেলুম। বঙ্কুর ভারি ফুর্তি—এত বাঙ্গাল একসঙ্গে কখনো দেখেনি।

গান্ধীজি তখন মহাত্মা হয়েছেন এবং আমার মুখে গজিয়েছে এক প্রকাণ্ড চাঁপ দাড়ি, Plain leaving এর রূপায়ণ। High thinking-এরও বটে।

কনফারেন্সের নির্বাচিত সভাপতি বিপিন পাল। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধ সমালোচনা করতেন এবং আন্দোলন থেকে স্বভাবতই দূরে সরে যাচ্ছিলেন। প্রতিনিধি ও দর্শকে বিরাট প্যাণ্ডাল পরিপূর্ণ, বাইরেও বিশাল জনতা। সি. আর. দাশ, অখিল দত্ত প্রভৃতি নেতারাও উপস্থিত। সভাপতির ভাষণ শুরু হল। যেমন দরাজ কণ্ঠস্বর, তেমান অকুণ্ঠ ওজস্বিনী ভাষা। বক্তৃতার মধ্যে তিনি যেই বলেছেন মিষ্টার গান্ধী, অমনি চারিদিক থেকে আওয়াজ উঠলো "মহাত্মা" বলুন।

গোলমাল থামলে তিনি আবার শুরু করলেন, আরো দৃঢ়কণ্ঠে বললেন মিঃ গান্ধী। আবার আওয়াজ উঠলো মহাত্মা বলতে হবে। গোলমাল বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটু থামলে বিপিন বাবু বজ্র নির্ঘোষে বললেন, বলবো না। বলে তিনি সভাপতির আসন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। প্যাণ্ডালের মধ্যে এবং বাইরে উদ্দাম ধ্বনি চলতে লাগলো—মহাত্মা গান্ধী কি জয়। কনফারেন্স প্রায় ভেঙ্গে যায়।

তখন বরিশালের অগ্নিপ্রাণ জুনিয়ার নেতা শ্রীশরৎ ঘোষ (যিনি পরবর্তীকালে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ হয়েছিলেন) উঠে মহাত্মার স্তুতি করে বক্তৃতা শুরু করলেন, ত্ব' ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা করলেন, থিয়োজফি ও নন কো-অপারেশনের অপূর্ব মিশ্রণ। স্বরাজ পাওয়ার অর্থ তাঁর মতে, নিজকে মায়াময় বহির্বিষয় থেকে সরিয়ে এনে সংহত করে আত্মস্থ হওয়া, স্বরাট হওয়া। 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' রবে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে সভা ভঙ্গ হল। আবার যখন সভা বসলো তখন সভাপতিত্ব করলেন শ্রীঅখিল দত্ত। তিন মাসের জন্যে আদালত বর্জন করে অসহযোগ আন্দোলনের কার্যক্রমে যোগ দিতে উকীলদের আহ্বান করে প্রধান প্রস্তাব পাশ হ'ল।

সাবজেক্টস কমিটির সভার পর সি. আর. দাশ ও অখিল দত্ত কথা কইছেন, একটু তফাতে দাঁড়িয়ে শুনলুম। অখিল দত্ত বলছেন, তিন মাস আদালত ছাড়লে কী বা হবে। দাশ মহাশয় বললেন, একবার সবাই আদালত ছেড়ে বেরিয়ে আসুক, তারপর তিন মাসে আমরা এমন অবস্থা করে তুলবো যে, কেউ আর ফিরে যেতেই পারবে না।

কার্যতও হয়েছিল কতকটা ঐ রকমই। অনেকে আদালত ছেড়েছিলেন এবং তিন মাস পরে অনেকেই আর ফিরে যান নি। অবশ্য একথাটা মনে রাখা দরকার, উকীল নন-কো অপারেটরদের অধিকাংশই ছিলেন উপার্জনহীন বুভুক্ষু শ্রেণীর এবং তাঁদের অধিকাংশকেই মাসিক ১০০ টাকা পর্যন্ত অ্যালাউয়েন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন দাশ মহাশয়।

তিনি যখন ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করলেন, এবং ডুমরাঁও রাজার মামলা ত্যাগ করে তাদের অগ্রিম দেওয়া ৪০,০০০ টাকা ফেরত দিলেন, তখন স্বভাবতই সারা দেশ অবাক বিস্ময়ে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। এমন একটা ভাবাবেগের সৃষ্টি হল যে, অসংখ্য লোক আদালত ছেড়ে, কলেজ ছেড়ে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। অনেকের বিশ্বাস, সি. আর. দাশ ব্যারিষ্টারী না ছাড়লে বাংলা দেশে গান্ধীর আন্দোলন সফল হত না। বস্তুত আমরাও আরো আকৃষ্ট হলুম সত্যিকারের দেশপ্রেম, ত্যাগ ও নিষ্ঠার বাস্তব উদাহরণ দেখে।

ববিশাল থেকে ফেরার পবই এলো নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিব বেজোয়াদা প্রোগ্রাম—মে এবং জুন এই দু মাসের মধ্যে সাবা দেশে এক কোটি কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহ করতে হবে, তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারে এক কোটি টাকা তুলতে হবে এবং ২০ লাখ চরকা চালু করতে হবে। এই প্রোগ্রাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাবাদেশে এক স্বতঃস্ফূর্ত বিরাট কর্মোন্মাদনার বন্যা বয়ে গেল। সব কাজ ছেড়ে দিনরাত ভূতের মত খাটতে লাগলুম।

বুঝলুম ব্যবসা এবং সংসারের মায়া কাটাতে হবে। ব্যবসাটা ঠিক যখন দাঁড়িয়ে গেছে, তখনই আবাব সেটা তুলে দিয়ে মালপত্র বাড়ীতে নিয়ে গেলুম। বাড়ী থেকে ভাগনী-জামাই যেটুকু পাবে তাই চালাতে লাগলো।

গোপাল বাবু তখন বোস ইনষ্টিটিউটে যোগ দিয়েছেন এবং ফ্যামিলি আনাব জন্য ঘর খুঁজছেন। আমি বললুম, আমাদের বাড়ীতে একটা ঘরে থাকতে পারেন তো ভাড়াটা লাগবে না। তিনি বললেন, বরানগর থেকে অফিসে যাতায়াত বড় অসুবিধা, একখানা সাইকেল থাকলে চলতে পাবে। তদনুসারে ১১০ টাকা দিয়ে একখানা সাইকেল কেনা হল, আমি টাকা দিলুম, পবে গোপাল বাবু সেটা শোধ করলেন। মোটেব উপর গোপাল বাবুকে বাড়ীতে বসিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হলুম, অন্তত একটা আক্কেলওয়ালা লোকতো বাড়ীতে থাকলো।

একটা কথা এখানে বলে রাখতে চাই। খবরের কাগজে নেতাদের সিদ্ধান্ত বের হওয়া মাত্র দেশসুদ্ধ লোক যে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে সে সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করতে উঠে পড়ে লেগে যায়, এমন কর্মোন্মাদনা আমরা যারা ২১ সালে দেখেছি, রুশিয়া বা চীনের কর্মোন্মাদনা তাদের কাছে একটুও অসম্ভব বা দুর্বোধ্য নয়। যাবা ২১ সাল দেখেনি, তাবা এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয় যে, লোকগুলোকে জোর করে খাটানো হচ্ছে।

জুনের পরেই এল বি পি সি সি-র ইলেকশন। সিঙ্গল ট্রান্সফারেবল ভোট প্রথম প্রবর্তিত হল। অন্যান্য প্রধান কর্মী ও সংগঠকদের সঙ্গে আমিও নিবাচিত হলুম।

আন্দোলনের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা শুনে জ্ঞানার্জন করি, সুখ পাই না। ঠেসে পড়াশুনা করি। বঙ্কিমের গ্রন্থাবলীর সাহিত্যখণ্ডগুলো ভালো করে পড়লুম এবং আনন্দ পেলুম। সবচেয়ে আনন্দ পেলুম ধর্মতত্ত্ব পড়ে। ছোটবেলায় পড়েছিলুম এগুলো বাদ দিয়ে শুধু উপন্যাসগুলো।

একখানা বই পেলুম "যোগসাধন"। বড় ভাল লাগলো। রহস্যময় মিষ্টিক-ভাববাদী কথা একেবারে নেই, যোগ কর্মেব কৌশল, এটাই প্রতিপাদ্য। যোগের অষ্ট অঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। প্রথম অঙ্গ যম হচ্ছে অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য) ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ (বিলাসবর্জন)। ব্রহ্মচর্যের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, শ্রবণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং, সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া-নিষ্পত্তিরেব চ—এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ, বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ।' হিংসা তিন প্রকার—কৃত, কারিত এবং অনুমোদিত। দোষ তিনটাতেই সমান।

একখানা এক্সারসাইজ বুকে এক রুটিন লিখলুম,—যম সাধনের প্রাত্যহিক রেকর্ড—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ, এই পাঁচ খাতের সাফল্য ও ব্যর্থতার পরিমাণ রোজ লিখে রাখতুম।

দাদারা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, অস্ত্র-শস্ত্র শিকেয় তোলার ব্যবস্থা হয়েছে। জীবন কিছু মাল রেখেছিল এক স্কুলে, হেডমাষ্টার হৃষী বাবু আমাদের লোক। শ্যামবাজারে দীনেন্দ্র স্ট্রীটের মোড় যেখানে, ঐখানে তখন ছিল "গাঁজার গলি"। তার মধ্যে একটা হাফবস্তিতে ছিল ঐ স্কুল। মালের মধ্যে একটা রাইফেলও ছিল—বাঁট আর ব্যারেল খুলে পৃথক ক'রে খাটো করা ছিল। সেগুলো চন্দননগরে সরাতে হবে। জীবনের ব্যবস্থায় বন্ধু রোহিণী মুখুজ্যে আর আমি সেগুলো নিয়ে গেলুম চন্দননগরে।

রোহিণী মুখুজ্যের বাড়ী জীবনদের গ্রামে, বিক্রমপুরে পঞ্চসার গ্রামে। সেও আমাদের সঙ্গে গেপ্তার ও অন্তরীণ হয়েছিল। ফিরে এসে মির্জাপুর ষ্ট্রীটে সাবিত্রী এজেন্সী নামে এক ষ্টেশনারী দোকান করেছিল, যে দোকান ২৪ সালের কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় আসামীদের তরফের এক পোষ্ট অফিস বলে' গণিত হয়েছিল। আসামীদের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে জীবনের নামও ছিল। ২৪ সালে জীবন ছিল দ্বিতীয়বার ষ্টেট প্রিজনার।

ইতিমধ্যে জাতীয় সাহিত্য প্রচারের জন্য সরস্বতী লাইব্রেরী স্থাপিত হয়েছে মনোরঞ্জনদা, অরুণ গুহের পরিচালনায়।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের কি একটা বই পড়েছিলুম, মনে নেই। শুধু একটা টুকরো মনে আছে—"ধনপুরঃসর হওয়া করিবে"—একটা সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা। টাকায় আমরা যে "অভিশাপ" নাটক অভিনয় করেছিলুম, তার শেষ দৃশ্যে ব্যাসদেব, কৃষ্ণ এবং অর্জুনের সম্বন্ধে শিষ্যের কাছে যে ধর্মযুদ্ধের ব্যাখ্যা করেছিলেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের বইটাও সেই ধর্ম-যুদ্ধের ব্যাখ্যা। আমাদের চোখে অহিংস ও বিপ্লববিরোধী ভূমিকা ছিল সুস্পষ্ট।

হ্যারিসন রোডের কাছে রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটের মোড়ে সরস্বতী লাইব্রেরী হল। কিরণদাকে এনে চার্জে বসানো হল। দু'জন তরুণকে সর্বক্ষণের জন্যে রাখা হল, লাইব্রেরীতে বই বিক্রীর জন্যে। তারই মধ্যে একজন ছিল গোপী শা—ডে সাহেবকে টেগার্ট ভ্রমে হত্যা করে যার ফাঁসী হয়েছিল।

এই সময়ে মুন্সীগঞ্জ (বিক্রমপুর) থেকে জীবন প্রভৃতির ডাক এল, ন্যাশানাল স্কুলের ভার নেওয়ার জন্যে। প্রাথমিক সংগঠন করেছিলেন বৃদ্ধ "মাষ্টার মহাশয়" শ্রীশচীন ঘোষ, বাজেরকের জিতেন কুশারী প্রভৃতি। প্রথমে হাই স্কুল খালি হয়ে গিয়েছিল, তারপর আবার হাইস্কুলও চালু হল। ন্যাশানাল স্কুলে আড়াইশো ছাত্র, আর হাইস্কুলে ২০০-র মতন। কালীবাড়ীর সামনে প্রকাণ্ড টিনের চালাঘরে ঝাঁপ বেঁধে বেঁধে ক্লাশের ঘর প্রভৃতি ভাগ করা হয়েছিল।

যতীন দত্ত হ্যারিসন রোডে Graduates' union নামক Sporting goods-এর দোকান করেছিলেন, দোকান ছেড়ে তিনি মুন্সীগঞ্জে গিয়ে ন্যাশানাল স্কুলের হেডমাষ্টার হলেন। জীবনও টিচার হয়ে গেল। কামারখাড়ার পরেশ সেন মুন্সীগঞ্জের সরকারী উকীল উমাচরণ সেনের জামাতা চট্টগ্রাম কালেকটারেটে অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট ছিলেন, এখন চাকরী ছেড়ে ন্যাশানাল স্কুলে যোগ দিলেন।

জীবনকে এখানকার কাজের অবস্থার কথা বলেছিলুম। মুন্সীগঞ্জে যাওয়ার আগে আমাকে বলে গেল, আমাদের ওখানে কর্মীর প্রয়োজন হলে তোমায় লিখবো, লিখলেই তুমি চলে এসো। তাই স্থির হলো।

গোপাল বাবু আমাদের বরানগরের বাড়ীতে বৌমাকে এনেছেন, বড় ছেলে পটলও (সুধীর) এসেছে। তার তখন এতটা বয়স হয়েছে যে সে ছড়া বলতে শিখেছে—"শীত কলেলে দাদাবাই কাথা কিন্যা দে, কাথাল মইদ্দে বউ হুইব, বউ কিন্যা দে।"

নয়

১৯১৯ সালের শেষ ও ২০ সালের প্রথমে যখন আটকবন্দীরা এবং ক্রমশ রাজবন্দীরা অন্তরীণ ও জেল থেকে ফিরে আসতে লাগলো, তখন অনেকেরই অবস্থা হয়েছিল যেন জলে-পড়া।

এরকম অবস্থা বুঝে দেশের নেতারাও উদ্বিগ্ন, কেউ কেউ কারো কারো জন্যে কিছু চেষ্টাও করছেন। সরকারও দেখছেন, এদের জন্যে কিছু না করলে এরা আবার কোন্ পথ ধরে, কে জানে—তাই তাদেরও মাথায় কিছু মতলব ঘুরছে। তার ওপর অসহযোগ আন্দোলন একটা আসন্ন ঝড়ের মতন এগিয়ে আসছে—"ঈশান কোণে ম্যাঘ উঠেছে, করতিছে গোঁ গোঁ—ওরে, ডিঙ্গা বেঁধে থো।"

এই অবস্থায় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং Y. M. C. A.-র নেতা O. R. Raha এবং বি. সি. চ্যাটার্জি, এস. আর. দাশ প্রভৃতি মডারেট নেতাদের নেতৃত্বে মুক্ত বন্দীদের জন্যে কটালা বেনেপুকুরের একটা বড় বাড়ী নিয়ে একটা ফ্রি মেসের মতন ব্যবস্থা হয়। ঢাকা অনুশীলন পার্টির একজন নেতৃস্থানীয় সদ্যমুক্ত রাজবন্দী নলিনীকিশোর গুহকে সেখানে বসানো হল পরিচালক হিসাবে।

ওই আড্ডা থেকেই নলিনী বাবু 'শঙ্খ' নামে সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। তারপর পুলিন দাসের নেতৃত্বে ওখানেই ভারত-সেবক-সংঘ সংগঠিত হয় এবং তার মুখপত্র "হক কথা" প্রকাশিত হয়। হক কথারও সম্পাদক হয়েছিলেন নলিনী বাবুই। অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচারই ছিল এই সংঘ ও পত্রিকার কাজ।

মৌলানা মহম্মদ আলী খিলাফৎ সম্বন্ধে সুবিচারের দরবার করতে বিলেতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর এক অসহযোগ প্রস্তাব খিলাফৎ কমিটির সভায় রচিত হয়। মহাত্মা গান্ধী আগে থেকেই হাওয়া বুঝে খিলাফৎ কমিটির বন্ধু ও পরামর্শদাতার ভূমিকা নিয়ে বিক্ষুব্ধ মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের সহযোগিতা দিয়ে বাগ মানাবার মতলব করেছিলেন। ১৯২০ সালের ১৯শে মার্চ খিলাফৎ কমিটির এক সভায় তাঁদের অসহযোগ-প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতায় গান্ধীজী বলেন, "প্রস্তাবটিতে অতি সম্মানজনক ভাবে ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আন্দোলনের কয়েকটা স্তর নির্দেশ করা হয়েছে, যার শেষ পর্যায়ে হবে সশস্ত্র বিপ্লব। ভগবান করুন, এদেশকে যেন এমন সশস্ত্র বিপ্লব ও তার আনুষঙ্গিক বিভীষিকার মুখ দেখতে না হয়। কিন্তু খিলাফৎ প্রশ্ন সম্পর্কে মানুষের মনোভাব এত তীব্র যে, সমস্যার যথোচিত সমাধান না হলে, বা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ব্যর্থ হলে এমন এক সশস্ত্র বিপ্লব আসবে, যা এদেশ কখনো দেখেনি। আশা করি, ক্রোধোন্মত্ত নির্যাতন দ্বারা সরকার সে অবস্থা টেনে আনবেন না।"

এই বক্তৃতা থেকে বোঝা যায়, কেন মহাত্মাজী অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফৎকে

মূলনীতিরূপে জুড়ে দিয়েছিলেন এবং কেনই বা বেপরোয়াভাবে ১৯২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ হবে।"

তাঁর অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল খিলাফৎ কমিটিরই কাজের দ্বারা। ১৯২০ সালের ২২শে জুন খিলাফৎ কমিটি বড়লাটকে লেখেন, ১লা আগষ্টের মধ্যে তুরস্কের প্রতি সুবিচারের ব্যবস্থা না হলে তাঁরা অসহযোগের কার্যক্রম শুরু করবেন। গান্ধীজীও বড়লাটকে চিঠি লিখে ব্যাখ্যা করেন, কেন তিনি খিলাফৎ কমিটিকে সমর্থন করছেন। ১লা জুলাই আবার গান্ধীজী হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের তরফ থেকে বড়লাটকে ঐ কথা জানিয়ে দেন।

তারপর ১লা আগষ্ট পার হলে হাকিম আজমল খাঁ তাঁর সরকারী সম্মান উপাধি বর্জন করেন। ৩১শে আগষ্ট খিলাফৎ কমিটির অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় এবং গান্ধীজী তাঁর কাইজার-ই-হিন্দ পদক বর্জন করেন। সেপ্টেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে "অহিংস" অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাতে খিলাফৎ কমিটির কার্যক্রমের সঙ্গে থাকলো অহিংসা, আর সেটাকে মানানো হল "এক বছরে স্বরাজ"-এর "প্রতিশ্রুতি" দিয়ে।

কলিকাতা কংগ্রেসের সময়েই সদ্যমুক্ত রাজবন্দী অমরকৃষ্ণ ঘোষ (অতুলদার ভাই) এবং বোধ হয় অরুণ গুহ প্রথমে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে ঐ সম্পর্কে সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁর সাহায্য চান। তিনি প্রথমে যথেষ্ট আপ্যায়ন করে পরে যখন শুনলেন, ফেরারী নেতাদের নামে সরকারের ঘোষণা আছে, ধরে দিতে পারলে ১০।২০ হাজার টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে, তখন তিনি পাশ কাটালেন।

তারপর তাঁরা গেলেন গান্ধীজীর পরামর্শ নিতে। তিনি পরামর্শ দিলেন, ফেরারীরা যদি তাঁর কাছে অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করে সবরমতীতে থাকতে চান, তিনি তাঁদের গ্রহণ করবেন।

শেষে অমর বাবুরা গেলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে, ব্যারাকপুরে। তিনি ওঁদের বুকে করে জড়িয়ে ধরে আশ্বাস দিলেন এবং সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাতেই চন্দননগরে সেক্রেটারী নেলসন ও ডি. আই. জি., আই. বি., গোল্ডির সঙ্গে অতুলদা'র সাক্ষাতের ব্যবস্থা হল।

ইতিমধ্যে নাগপুর কংগ্রেসে ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত এবং পূর্ণ চক্রবর্তী গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং তিনি তাঁদের বলেন অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করতে।

জীবন ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজীর কাছে এক দীর্ঘ পত্র লিখে নিজের সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস প্রকাশ করে পরামর্শ চেয়েছিল, কি করবে। তিনি স্বহস্তে জবাব লিখে দিয়েছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের কার্যক্রমের একটা কিছু বেছে নিয়ে একটা বছর কাজ করে যাও। সে চিঠিটা জীবন রেখে দিয়েছিল এবং পরে একদিন সেটা বিশেষভাবে কাজেও লেগেছিল। সে কথা যথাসময়ে আসবে।

১৯২১ সালের শেষার্ধে সারা দেশে চরকা চলতে শুরু করেছে। কবি সত্যেন দত্তের বিখ্যাত কবিতা 'চরকার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর ঘর' টালায় পাটুবাবুদের বাড়ীতে বসে তিনি লিখেছিলেন। "জাপান" লেখক সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি টালায় যেতেন। একদিন পাটুবাবু ও তাঁর দাদা ভানুদা' এক সঙ্গে চরকা কাটতে বসলেন, আর কবি সত্যেন দত্ত কবিতা লিখলেন।

অনেক ছেলে স্কুল কলেজ ছেড়ে বেরিয়েছে, তাদের জন্যে ন্যাশান্যাল কলেজ হল, গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন (ন্যাশান্যাল ইউনিভারসিটি), সেখানে অধ্যক্ষ করে বসানো হল সুভাষচন্দ্রকে। কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি কয়েকজন হলেন প্রোফেসর।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সম্পাদনায় সার্ভেন্ট নামে ইংরাজী দৈনিক কাগজ বেরোয়। সুরেশ মজুমদারের গৌরাঙ্গ প্রেস প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ছাপার কাজ করে কিছু পয়সা পেতো। সেখান থেকে মাখন সেন ও সত্যেন মজুমদারের সহযোগিতায় বেরুলো আনন্দবাজার পত্রিকা।

সার্ভেন্ট ও আনন্দবাজার হল পুরোপুরি কংগ্রেসী কাগজ। মহাত্মাজী এবং অসহযোগ আন্দোলনের প্রচার এবং প্রাসঙ্গিক সংবাদই ছিল কাগজের প্রধান উপজীব্য। মহাত্মাজীর ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজও বেরিয়েছিল, সে ছিল আন্দোলন পরিচালনের গাইড। পড়ে তারিফ করতে হত, চমৎকার! কিন্তু মহাত্মাজীর রাজনীতির অভিনব, অবিশ্বাস্য প্রকৃতিও তাতে প্রকট হত।

সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও মডারেট দল তাদের কাগজগুলোতে অ্যান্টি ননকোঅপারেশন প্রোপাগ্যাণ্ডা করে চলেছিল। কিন্তু জনগণের মধ্যে তাদের প্রচারের উপযোগী কাগজ, সংস্থা বা কর্মীদল ছিল না। আন্দোলন বেড়েই চলেছিল, এবং সরকারও ক্রমশ নির্যাতন ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকছিল। ফলে আন্দোলন দমার পরিবর্তে আরো জোরালো হয়ে চলেছিল।

'২১ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে গভর্ণমেণ্ট সভা বন্ধ করার জন্যে ১৪৪ ধারা জারি করতে শুরু করলে। সে বাধা গ্রাহ্য না করে সভা করে লোকে গ্রেপ্তার বরণও শুরু করলে। কলেজ স্কোয়ারে এই রকম নিষিদ্ধ সভা ও গ্রেপ্তারের একটা চিত্র আমি আগে লিখেছি।

খদ্দর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী বস্ত্র বয়কটের জন্যে পিকেটিং এবং ধরপাকড়ও শুরু হয়েছিল। দেশী মিলওয়ালারা চাঁদাও দিচ্ছিল। ব্যবসাযের ক্ষেত্রে দেশী মালিকদের স্বার্থের সঙ্গে কংগ্রেসের একটা মিলনও লোকচক্ষুর অগোচরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল, পরবর্তী যুগে যেটার পরিণতি হয়েছিল দেশী ধনিকদের স্বার্থের সঙ্গে কংগ্রেসের স্বার্থের পরিপূর্ণ মিলন।

পুলিশ পিকেটারদের মারতে শুরু করলে সি. আর. দাশ নিজের একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন, স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও ভগিনী উর্মিলা দেবীকে পিকেটিং-এ পাঠালেন, পরের ছেলেদের বিপদের মুখে পাঠাবার আগে আপনার প্রিয়জনদের পাঠালেন। তাঁরা গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলেন। আন্দোলন আরো জোর হল।

তখন সরকার ১৪৪ ধারা অমান্য করে সভা করার জবাব দিতে শুরু করলে লাঠি চার্জ করে সভা ভেঙ্গে দিয়ে। ফল হল না, মেয়েরাও সে সব সভায় বক্তৃতা শুরু করলেন।

প্রথমে মেয়ে বক্তা বেশী ছিল না। বৃদ্ধা মহিলা কংগ্রেস নেত্রী মোহিনী দেবী গোড়া থেকেই ছিলেন আর ছিলেন বাসন্তী দেবী, উর্মিলা দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, হেমপ্রভা মজুমদার প্রভৃতি। ক্রমশঃ নতুন নতুন মেয়ে-বক্তা তৈরী হচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত বোধ হয় '২১ সালের নভেম্বরে গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ার দলকে বে-আইনী ঘোষণা করলে, এবং ভলাণ্টিয়ারদের লীডাররূপে কংগ্রেস নেতাদেরও গ্রেপ্তার শুরু

করলে। সি. আর. দাশ গ্রেপ্তার হলেন, তাঁর স্থলে একে একে অনেক নেতা বসেন আর গ্রেপ্তার হন, শেষ পর্যন্ত সুভাষ বাবুও গ্রেপ্তার হলেন।

এদিকে '২১ সালের ডিসেম্বর এবং আহমদাবাদ কংগ্রেস এসে গেল। গেলুম আহমদাবাদে। বাংলার ডেলিগেট ক্যাম্পে বেদের পণ্ডিত মোক্ষদা সামাধ্যায়ী প্রমুখ কয়েকজন স্বরাজ ঘোষণার প্রস্তাব চাই বলে হৈ-চৈ শুরু করেছিলেন। কোথায় স্বরাজ?

নির্বাচিত সভাপতি সি. আর. দাশের অনুপস্থিতিতে হাকিম আজমল খাঁ হলেন প্রেসিডেন্ট। মূল প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী, কংগ্রেসের সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে সব চেয়ে ছোট মূল প্রস্তাব। জেল ভর্তি করে দিতে হবে, এমন কি যাঁরা গঠনমূলক কাজ নিয়ে আছেন, দরকার হলে তাঁরাও কাজ ছেড়ে জেলে যাবেন। The battle may be prolonged—এই হল মহাত্মাজীর বক্তব্য।

হজরৎ মোহানী চরমপন্থী, তিনি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করার, সে প্রস্তাব ভোটে টিকলো না। কংগ্রেসের পাশেই চলছিল মোসলেম লীগের অধিবেশন। হজরৎ মোহানীই ছিলেন সে অধিবেশনের সভাপতি, তিনি সেখানেও ইণ্ডিপেণ্ডেন্স রেজলিউশন এনে পরাজিত হলেন। কংগ্রেসের মধ্যেকার খিলাফৎওয়ালারাই সেখানে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, কাজেই তারা কংগ্রেসের লাইনেই চললো। তখন মুসলমানেরা কংগ্রেস এবং মোসলেম লীগ, উভয় সংস্থারই সভ্য হতে পারতো।

এই উপলক্ষে মহাত্মাজী তাঁর ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজে যা লিখেছিলেন, সেটা আজও কংগ্রেসের ইতিহাসের পাতা কালো করে অক্ষয় হয়ে আছে। তিনি লিখেছিলেন, "Moulana Hasrat Mohani put up a plucky fight for independence on the Congress Platform and then as President of the Muslim league, and was happily each time defeated. He wants to sever all connections with British people even as partners and equals, and even though the Khilafat question is satisfactorily solved.... It is Common cause that if the Khilafat question connot be solved without complete independence there is nothing left for us to do but insist on independence..... But assuming that Great Britain alters her attitude, as I know she will when India is strong, it will be religiously unlawful for us to insist on independence."

অর্থাৎ মৌলানা হজরৎ মোহানী কংগ্রেস এবং মোসলেম লীগের সভাপতিরূপে স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলে বীতিমত লড়াই করেছিলেন, কিন্তু সুখের বিষয়, তিনি দু'জায়গাতেই পরাজিত হয়েছেন। তিনি বৃটিশের সঙ্গে সবপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান, এমন কি সমান অংশীদার হিসাবেও, এবং খিলাফৎ সমস্যার ন্যায্য সমাধান হলেও। অবশ্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভিন্ন যদি খিলাফৎ সমস্যার সমাধান না হয়, তাহলে স্বাধীনতার দাবী করা ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই। কিন্তু বৃটেন যদি তার বর্তমান মনোভাবের পরিবর্তন করে, আমি জানি, ভারত শক্তিশালী হলে তারা তা' করবেই, তাহলেও স্বাধীনতার জন্য পীড়াপীড়ি করাটা আমাদের পক্ষে একটা ধর্মবিরুদ্ধ কাজ হবে।

স্বরাজ যে স্বাধীনতা নয়, অসহযোগ আন্দোলন যে স্বাধীনতার সংগ্রাম নয়, তার আরো অনেক প্রমাণ ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল। নাগপুর কংগ্রেসের পর থেকেই লোকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেছিল, স্বরাজ কথাটার সঠিক অর্থ কি? মহাত্মা জবাব দিয়েছিলেন, যখন স্বরাজ পাওয়ার সময় আসবে, তখন ভারতবাসীই সেটা স্থির করবে, আমি নয়। কিন্তু স্বরাজের ব্যাখ্যার দাবী নিস্তব্ধ হচ্ছিল না। বোম্বাইয়ে পার্শী এসোসিয়েশনে বক্তৃতাকালে মহাত্মাজী বললেন, তিনি নিজে সন্তুষ্ট হবেন ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস পেলে। অসহযোগের বিরোধীরা প্রচার চালাচ্ছিল আন্দোলনটা অবৈধ। তার জবাবে মাদ্রাজ মেলের প্রতিনিধির কাছে তিনি বললেন, "I do not consider non-cooperation to be unconstitutional, but I do believe that of all the constitutional remedies now left open to us, non-cooperation is the only one left for us." অর্থাৎ আমি অসহযোগ আন্দোলনকে অবৈধ মনে করি না। আমি মনে করি, অন্যায়ের প্রতিকার আদায় করার সর্বপ্রকার বৈধ উপায়ের মধ্যে এই একটি মাত্র উপায়ই আমাদের হাতে অবশিষ্ট আছে।

গভর্ণমেণ্ট কেন কংগ্রেসকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করছে না, এ কথার উত্তরে পার্লামেণ্টে কর্ণেল ওয়েজউড বলেছিলেন যে, কংগ্রেসের স্বরাজের অর্থ স্বায়ত্তশাসন, সুতরাং কংগ্রেসকে বে-আইনী করার কোন কারণ নেই।

অনেক জমিদার-শিল্পপতিও যে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, তার কারণও এই। ভারতের তুলার ব্যবসায়ের রাজা উমর সোবানী ছিলেন কংগ্রেসের তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ, মহাত্মাজীর পরম ভক্ত। তিনি ওয়ার্ধা কটনের একচেটিয়া কারবারী হয়ে উঠেছিলেন কংগ্রেস-চরকা খদ্দরের দৌলতে। কংগ্রেস ওয়ার্ধা তুলা সম্বন্ধে সুপারিশ করেছিল, সারা ভারতে গ্রামাঞ্চলের কোণায় কোণায় পর্যন্ত খদ্দর উৎপাদন কেন্দ্রে কেন্দ্রে ওয়ার্ধা তুলা বিক্রি হত, দর দু' টাকা সের পর্যন্ত উঠেছিল। বাজার কোটির অঙ্কে টাকা রোজগার করে লাখের অঙ্কে কংগ্রেসকে চাঁদা দিয়েছিলেন। ন্যাশাণ্যাল এডুকেশনের পাশ কাটিয়ে তিনি নিজের ছেলেকে পড়তে পাঠিয়েছিলেন বিলেতে।

আমরা এসব লক্ষ্য করেও একটা লড়াই চলছে এবং এগোচ্ছে দেখে প্রাণপণে খেটে চলেছিলুম। অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি ব্যাপারে সরকারী সাহায্য বর্জন করে নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে সরকারকে খাজনা-টেক্স দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা বা দায়িত্ব থাকবে না এবং তখন খাজনা বন্ধ করা হবে, এই ভাবে একটা State within State গড়ে তোলা হবে, এ ধরনের প্রচারও চলছিল, কাজেই খেটে যাওয়ার একটা প্রেরণাও বর্তমান ছিল।

ইতিমধ্যে আর একটা বৃহৎ ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল, বলা হয়নি। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম জোয়ারের মুখে আসামের চা-বাগানের চির-নির্যাতিত কুলীরা ধর্মঘট করে একযোগে, এবং মালিকেরা তাদের ঘরছাড়া করে তাড়িয়ে দেয়। তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন হিসাবে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের কর্মীরাও ধর্মঘট করে, শেষ পর্যন্ত সে ধর্মঘট বিস্তৃত হয় গোয়ালন্দ, চাঁদপুর প্রভৃতি ষ্টীমার কর্মীদের মধ্যেও। ফলে রেল ও ষ্টীমার চলাচল বন্ধ হয় এবং চা-কুলীর দল পদব্রজে বাড়ীমুখো যাত্রা শুরু করে। পথে তাদের বিশ্রাম ও

খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থার জন্য স্থানীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে জনসাধারণ স্থানে স্থানে লঙ্গরখানা স্থাপন করে। এক এক স্থানে হাজার হাজার কুলী জমে যায়, একটা প্রকাণ্ড সমস্যা দেখা দেয়। স্বভাবতই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে টেলিগ্রাম আসতে থাকে।

সি আর. দাশ স্বচক্ষে অবস্থা পরিদর্শনের জন্য রওনা হন এবং গোয়ালন্দে পৌঁছে দেখেন স্টীমার বন্ধ। ঝড়ের পদ্মা মেঘনা সমুদ্রের আকার ধারণ করেছে। সেই অবস্থায় তিনি নৌকা পাড়ি দিলেন গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুরে, কারো নিষেধ মানলেন না। ধর্মঘটী ও সাধারণ জনগণের সাহস ও উৎসাহ কতখানি বেড়ে গেল, তা সহজেই অনুমেয়।

ওদিকে চট্টগ্রামে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ব্যারিস্টারী ছেড়ে কংগ্রেসের হাল ধরেছেন। তাঁর স্ত্রী বিলাতের মেয়ে নেলী সেনগুপ্তা বিলাতী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করে গ্রেপ্তার হয়েছেন, জেলে গেছেন। ধর্মঘটের দরুণ সেনগুপ্তের প্রায় ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়। পরে সেনগুপ্ত ও নেলী কলকাতায় চলে আসেন এবং তাঁদের কলকাতার লোক এক বিরাট প্রোসেশন করে অভ্যর্থনা করে। এই সব ঘটনার ফলে আন্দোলনের জোর বেড়েই চলেছিল।

কংগ্রেসের ভাববন্যার মধ্যে বিপ্লবী বিবেককে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে বিপ্লবীরা নানা স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, মাঝে মাঝে উৎসব উপলক্ষে সেখানে বিপ্লবীদের জমায়েত হত, স্থানীয়ভাবে পিকেটিংও চলতো। আহমদাবাদ কংগ্রেসের পর '২২ সালের ফেব্রুয়ারীতে কি মার্চে দোলের দিনে ডায়মণ্ড হারবারের কাছে আবদালপুরে গঙ্গার কাছেই এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়, এবং সেখানে বসানো হয় রসিক দাসকে, যিনি ৩০ সালে ড্যালহাউসী স্কোয়ার বোমার মামলায় প্রথমে দণ্ডিত ও পরে আপীলে খালাস হয়ে রাজবন্দী হয়েছিলেন।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন নেতৃত্ব করেন মনোরঞ্জন দা' (মনোরঞ্জন গুপ্ত) এবং আমার রচিত একখানা গান গেয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। গানটি এই ঃ

আজ হোলীর রাঙা উৎসবে
উঠলো মেতে রক্ত-পাগল প্রাণ
তোরা আয় সবে
ফাগুনের এই উজান টানে
জাগলো সাড়া বনে, মনে
শুকনো ডালে ফুটলো রে ফুল
নবীন শোভা, সৌরভে।
আনন্দের এই পাগলা ঝোরা
ভাসিয়ে দিল সকল ধরা
বাঁধন ছিঁড়ে কাঁদন ছেড়ে
উল্লাসে আয়, আয় সবে
খুনখারাপীর রক্ত স্রবে
বিশ্বটারে রাঙিয়ে দে রে
ঘর ছেড়ে আজ আয় বাহিরে
অবাধ পানে চলবি কে।

আহমদাবাদ কংগ্রেসের পর "জেল ভর্তি করে দাও" হল প্রধান কর্মসূচী। সর্বত্র সভা এবং ধরপাকড়, পিকেটিং এবং ধরপাকড় অনেক বেড়ে গেল এবং জেল ভর্তি হতে দেরী লাগলো না। জেলের কর্মচারীরা সত্যাগ্রহীদের ভিড়ে এবং হুল্লোড়ে উদ্বাস্ত হওয়ার জোগাড়। সরকার বাহাদুর খিদিরপুর মেটিয়াবুরুজে বড় বড় গুদামে সত্যাগ্রহীদের পুরতে লাগলো। সভায় লাঠি চার্জ করে কতক লোককে তাড়িয়ে তুড়িয়ে বাকি লোকদের ধরে নিয়ে যায়, এবং অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। রক্তবীজের ঝাড় নির্মূল হয় না, আবার দেখা দেয়।

এক দিকে এই অবস্থা, আর দিকে খাজনা বন্ধের মহলাও পেকে উঠছে। ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশন এ্যান্টি-ননকোঅপারেশন প্রোপাগ্যাণ্ডার জন্যে টাকা ঢেলেও কূল পাচ্ছে না। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই সময় সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের একটা আপোষ ঘটাবার চেষ্টায় মহাত্মাজীর কাছে এক রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের প্রস্তাব নিয়ে এলেন। কংগ্রেস নেতাদের বিভিন্ন জেল থেকে এক জেলে জড়ো করায় সরকার রাজী হল। মহম্মদ আলী, সৌকত আলী তখন করাচীতে এক খিলাফৎ সভায় রাজদ্রোহকর বক্তৃতা ও প্রস্তাব পাশ করে কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। মহাত্মাজী বললেন, তাঁদের সভায় আনতে হবে। সরকার রাজী হল না। আপোষ প্রস্তাব ফেঁসে গেল। সি আর. দাশ চটলেন।

কংগ্রেস থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সারা দেশে সর্বত্র সভা করে ঐ করাচী প্রস্তাব পাশ করতে হবে। মাদারীপুরের বিপ্লবীনেতা পূর্ণ দাশ ঐ করাচী প্রস্তাব পাশ করিয়ে তিন বছর কারাদণ্ড পেয়েছিলেন। অনেক দাদা কাজটা সমর্থন করেন নি। কিন্তু পূর্ণ দাশ বলেন, জেলে অসংখ্য নতুন নতুন জোয়ান ছেলের ভিড়, রিক্রুটিংয়ের বিরাট ফিল্ড।

ঢাকার অনুশীলন পার্টি প্রথমে অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেছিলেন প্রধানত অহিংসার বিপ্লববিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রচারের জন্যে। তাঁদের কথা ছিল, বৈপ্লবিক প্রগতির মুখে এই গান্ধীবাদ দেশটাকে ক্লীবে পরিণত করবে নতুন করে। কিন্তু শুধু এই নেতিবাচক প্রচারের জোরেই বৈপ্লবিক সংগঠনের বাস্তব কাজ চলে না। সপত্নী-প্রতিম যুগান্তর দল গান্ধী এবং কংগ্রেসের নামের জোরে সারা দেশে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে, টাকারও অভাব নেই, কংগ্রেসের স্থানীয় ফাণ্ডও তাদের হাতেই, সর্বত্র কংগ্রেস কমিটি করে নিজেদের লোক বসাচ্ছে, ধীরে অথচ নিরবাচ্ছন্নভাবে দলের রিক্রুটিং-এর কাজও চলেছে। এ অবস্থার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। মন তাদের আরো বিষিয়ে উঠতে লাগলো যুগান্তর পার্টির ওপর।

এই অবস্থায় পুলিন দাশের সঙ্গে এস. আর. দাশের বন্দোবস্ত হল, তাঁর সঙ্গে (তিনি তখন অ্যাডভোকেট জেনারেল) ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বন্দোবস্ত হল, তারা প্রচুর টাকা ছাড়তে লাগলো, সে টাকা এস. আর. দাশের মারফৎ পুলিন দাশের হাতে আসতে লাগলো, ভারত-সেবক-সংঘ গঠিত হল, মুখপত্র 'হক কথা' সারা দেশে ছড়াবার ব্যবস্থা হল, সর্বত্র ভারত-সেবক-সংঘের প্রচারকেন্দ্র গড়া হতে লাগলো, সর্বত্র স্থানীয় কংগ্রেসের এবং যুগান্তরদলের কর্মীদের সঙ্গেও তাদের চাপা ঠোকাঠুকিও চলতে লাগলো। কিন্তু গান্ধী, কংগ্রেস, যুগান্তর দল এবং আন্দোলনের ভাবাবেগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্বভাবতই তারা হ'টে যেতে লাগলো। যুগান্তর দলের বিশেষ বিশেষ কর্মী হল তাদের চক্ষুশূল।

যাই হোক, ২২ সালের গোড়ার দিকেই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সভা করে গ্রেপ্তার হওয়া মুন্সীগঞ্জে (বিক্রমপুর) চলছিল। একদিন এমনি এক সভায় মুন্সীগঞ্জ ন্যাশান্যাল স্কুলের প্রথম তিন শ্রেণীর ২৭ জন ছাত্র, ৪ জন শিক্ষক, এবং শেষ পর্যন্ত "বড়দি" (মুন্সীগঞ্জের সরকারী উকিল উমাচরণ সেনের বড় মেয়ে, বেণু সেনের মা) একে একে নিষিদ্ধ সভায় বক্তৃতা করে গ্রেপ্তার হলে জীবন আমাকে টেলিগ্রাম করলে, 'অবিলম্বে চলে এসো'। আমিও অবিলম্বেই মুন্সীগঞ্জে চলে গেলুম, সংসার-ধর্ম শিকেয় উঠলো। একটু হাল্কা বোধ করলুম। পরে শান্তিপুরের প্রভাস এবং সারদাকেও মুন্সীগঞ্জ ও ঢাকায় কাজ করবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলুম।

মুন্সীগঞ্জের অভিজ্ঞতা আমার রাজনৈতিক জীবনে এক মহামূল্যবান এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বস্তুত, সেখানকার প্রায় সকল কর্মীরই জীবন সে সময় ছিল নিতান্তই রাজনৈতিক জীবন। ২।৪ জন বিবাহিত, এবং যে ২।৪ জনের পরিবারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল, সে সম্পর্কটা যেন নিতান্তই গৌণ, একবার দয়া করে ভাত খেয়ে আসা মাত্র। অধিকাংশেরই অবস্থা ভোজন যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে। দিনরাত ভূতের মত খাটুনী।

আন্দোলনের প্রথমে একটা মাত্র হাই স্কুল ছিল, এবং সেটাই ভেঙে হয়েছিল ন্যাশান্যাল স্কুল, পরে আবার হাই স্কুলটাও পুনর্গঠিত হয়। হাই স্কুলে ২০০ ছাত্র, ন্যাশান্যাল স্কুলে ২৫০। এই রকম ন্যাশান্যাল স্কুল ঐ এক সাব ডিভিশনে ১৭টা।

পরেশ সেন ছিলেন কংগ্রেসের থানা অফিসার। অর্থাৎ মুন্সীগঞ্জ থানা এলাকায় যতগুলো লোকাল কংগ্রেস কমিটি ছিল, তিনি সেগুলোর তদ্বির করতেন, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। প্রথমে আমাকে সেই পদ দেওয়া হয়।

কিছুদিন পরেই বজ্রযোগিনী থেকে ন্যাশান্যাল স্কুলের সেক্রেটারী পূর্ণ গুহ, হেডমাস্টার রমানাথ মিত্র এবং টিচার ও কংগ্রেসের সেক্রেটারী ফণী বাবু গ্রেপ্তার হয়ে মুন্সীগঞ্জে এসে খবর দিলেন, সেখানে সেক্রেটারী হবার মতন লোক পাওয়া যাচ্ছে না, মুন্সীগঞ্জ থেকে একজন লোক অবিলম্বে পাঠানো দরকার।

মুন্সীগঞ্জ থানার অন্তর্গত, প্রাচীন ইতিহাসে বিখ্যাত এক গণ্ডগ্রাম এই বজ্রযোগিনী। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের জন্যে যে বাঙ্গালী পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ইতিহাসে বিখ্যাত, তিনি জন্মেছিলেন এই বজ্রযোগিনী গ্রামেই। মুন্সীগঞ্জ থেকে মাইল পাঁচেক দূর, ইতিহাস-বিখ্যাত রামপাল গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

সেখানে কংগ্রেস সেক্রেটারী করে পাঠানো হল আমাকে। যাবার সময় স্থানীয় রাজনীতি একটু বুঝিয়ে দেওয়া হল। পর পর কয়েকজন সেক্রেটারী গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেছে। ন্যাশান্যাল স্কুলই এখন কংগ্রেসের প্রধান ঘাঁটি।

ছিল হাই স্কুল, সেটাই হল ন্যাশান্যাল স্কুল, ছাত্রসংখ্যা ২০০র মতন। জমিদার রায়বাহাদুর অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট রমেশ গুহ ছিলেন সেক্রেটারী, তিনি বাধা দেন নি। কিন্তু তাঁর জ্ঞাতি পূর্ণ গুহের সঙ্গে ছিল তাঁর বহুকালের মামলা মোকদ্দমা। সেই পূর্ণ গুহ ন্যাশান্যাল স্কুলের সেক্রেটারী হয়ে কংগ্রেস কমিটির সাহায্যে রমেশ গুহকে নানা ভাবে জব্দ করবার চেষ্টা করেন।

হাটে একটা ঘরে কংগ্রেস অফিস, অফিসের বাইরে একটা বড় বোর্ডে রোজকার সংবাদ-

পত্রের খবর, কংগ্রেস সংক্রান্ত খবর সংক্ষেপে হাতে লিখে সেঁটে দেওয়া হয়, সাধারণ লোক ভিড করে পড়ে যায়।

আমি গিয়ে কংগ্রেস অফিসে উঠলুম, খাওয়াব ব্যবস্থা হল ন্যাশান্যাল স্কুলের পণ্ডিত মশায়েব সঙ্গে। তিনি রেঁধে খেতেন। সর্বক্ষণের ভলান্টিয়াব কর্মী চন্দ্রভূষণ, ডাকনাম গৌবা, অমাবস্যার নিশির চেয়ে কালো, সত্যিকারেব কর্মী। ভোরে দৌড়তে দৌড়তে পাচ মাইল দূরে মিরকাদিম ষ্টীমার ঘাট থেকে খবরেব কাগজ এনে বাড়ী বাড়ী বিলি করে, রান্না খাওয়াব ব্যবস্থা করে পণ্ডিত মশায়েব সঙ্গেই খায়, এবং সারাদিন কংগ্রেসেব তরফ থেকে সর্বপ্রকার লোককে ধমকধামক দিয়ে কংগ্রেসেব কাজ করে।

আমি গিয়েই চন্দ্রভূষণের সাহায্যে একখানা প্রকাণ্ড নোটিশ লিখে বাজারে সেঁটে দিলুম —আমি অমুক, মুন্সীগঞ্জ থেকে বজ্রযোগিনীর কংগ্রেসের ভার নিয়ে এসেছি। আমি শুনলুম, কোন কোন কংগ্রেস কর্মী কংগ্রেস সংগঠনকে তার ব্যক্তিগত বিবাদে হাতিয়াব স্বরূপ ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের উপর অত্যাচার করেছেন। এ রকম কাজ কংগ্রেসের নীতির বিরোধী। অতঃপর এ রকম কোন ঘটনা ঘটলে কংগ্রেস অফিসে জানালে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা হবে।

"লোকটা কোলকাতা থেকে এসেছে" এটা প্রচার হয়ে গিয়েছিল। এখন তারা ভাবলে "লোকটা জবরদস্ত"। কাজেই সবাই হয়ে গেল সাধু। রমেশ গুহের বাড়ী নিকটেই। তিনি বিকেলে হাটে এসে নোটিশ দেখে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন এবং চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন। গেলুম এবং অনেক কথা শুনলুম ও শোনালুম।

অল্পদিন পরেই জীবন গ্রেপ্তার হল ভলান্টিয়ার আইনে।

জীবন গ্রেপ্তার হতেই আমাকে বজ্রযোগিনী থেকে সরিয়ে এনে জুড়ে দেওয়া হল স্কুলে, জীবনের জায়গায়। আমি পড়াতুম ১ম, ২য়, ৩য় শ্রেণীতে বাংলা এবং ৪র্থ, ৫ম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভূগোল। তা ছাড়া সপ্তাহে একদিন এক ঘণ্টা "সাধারণ" ক্লাশ সব ছেলেই এসে বসতে পারতো এবং যার যা খুসী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতো, সে প্রশ্নের জবাব তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হত।

জীবনের মামলা উঠলো কোর্টে, জীবন বললে, I take no part in the proceedings, কোন কথার জবাব দেবো না। প্রধান সাক্ষী গ্রামের দফাদার বললে, আমি জানি, জীবন বাবু কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার। কোর্ট প্রশ্ন করে, কেমন করে জানলে? দফাদার বললে, উনি লোকের বাড়ী বাড়ী বিনা পয়সায় চরকা দেন, কলেরা হলে লোকের সেবা করেন। জীবনকে খালাস দেওয়া হল। কিন্তু জীবন আর স্কুলে যোগ দিলে না, উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠে চলে এল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়ে। বিপ্লবীদের আড্ডা-আশ্রমের অন্যতম ছিল উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠ।

মুন্সীগঞ্জের মাইল দু-আড়াই দূরে রেকাবীবাজার, বেশ বড় বাজার, কয়েক শত মুসলমান কলুর বাস, তাদের ডাকাত বলে ডাকনাম ছিল, এখন সেখানে হয়েছে কংগ্রেস ও খিলাফৎ কমিটি, একসঙ্গে একঘরে, সেক্রেটারী একজন মুসলমান, সংগঠক ও নেতা আমাদের দলের সুরেন মজুমদার। ২৫০ জন কলু ভলান্টিয়ার এক কথায় ওঠে বসে, সব অহিংস। কংগ্রেসের সভ্য সংখ্যা সব জায়গার চেয়ে বেশী। রুমাবরই সমানে বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং,

বিবাদ বিসম্বাদ, মামলা মোকদ্দমার সালিশী বিচার প্রভৃতি সব জায়গার চেয়ে সফল। দোকানের সামনে খদ্দরের হাফপ্যান্ট, কুর্তাটুপী পরিহিত কলু ভলান্টিয়ার বসলেই হল, দোকানে কেউ যাবে না। পিকেটিং তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা হল, বিলাতী কাপড়ের গাঁট বেঁধে কংগ্রেসের ছাপ মেরে দেওয়া হবে, সে গাঁট আর খোলা চলবে না, কংগ্রেস অফিসে কিছু জরিমানা দিতে হবে, আর যে কদিন পিকেটিং করতে হয়েছে, ভলান্টিয়ারদের মাথা-পিছু আট আনা হিসাবে রোজ দিতে হবে। সুরেন মজুমদারের প্ল্যান।

সালিশী বিচারে দুই পক্ষই সন্তুষ্ট হয়ে কংগ্রেস অফিসে কিছু কিছু সেলামী দিয়ে যেত। সব চেয়ে সচ্ছল কংগ্রেস খিলাফৎ কমিটি।

আমার হাতের টাকা-কড়ি ফুরিয়ে এল।

একবার বাড়ীতে গিয়ে সবাইকে আপ্যায়িত করে এলুম, এবং গোপনে ব্যবস্থা করে বাড়ী ও জমি বন্ধক দিয়ে ৮০০০ টাকা সংগ্রহ করে এলুম। সত্যাদি মহাজন যা খুসী লিখে নিলে, আমি নির্বিবাদে সই করে দিলুম। খুব গোপনে ভাগ্নীর কাছে টাকাগুলো রেখে, কিছু রাণী-টানা দিয়ে কিছু টাকা নিয়ে মুন্সীগঞ্জে ফিরে এলুম। ভাগ্নের পড়াশুনো বন্ধ হয়েছিল, তাকেও নিয়ে এলুম মুন্সীগঞ্জে। জীবনদের বাড়ীতে থেকে সে ন্যাশান্যাল স্কুলে পড়তে লাগলো।

দুদিন বাদে শেষ সংগ্রাম আসবেই, কে কোথায় থাকবে বা মরবে কিছুই ঠিক নেই, কিসের বাড়ী? কিসের সম্বল? মনটা চাঙ্গাই হল।

দশ

১৯২১ সালেই ভারতের নানা স্থানে শ্রমিক ও কৃষকদের অসন্তোষ নানা ভাবে প্রকাশ হচ্ছিল, সরকারী হিসাব অনুসারে '২১ সালে ৪০০ ধর্মঘট হয়েছিল এবং ৫ লক্ষ শ্রমিক তাতে সংশ্লিষ্ট ছিল। দেশের মুক্তিসংগ্রামে শ্রমিকরা সামিল হতে চাচ্ছিল নিজেদের বিশিষ্ট সংগ্রাম পদ্ধতির মারফত, কিন্তু মহাত্মাজী সেটা পছন্দ করছিলেন না এবং শ্রমিক-নেতাদের তদনুসারে নিরুৎসাহিত করছিলেন।

কৃষকরাও নানা স্থানে তাদের দুরবস্থার প্রতিকারের জন্যে বিপুলভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল এবং স্থানে স্থানে সত্যাগ্রহের দিকে ঝুঁকছিল। এপ্রিল মাসে মুলসীতে কৃষকরা সত্যাগ্রহ শুরু করতে যাচ্ছিল। জমির মালিক টাটাগোষ্ঠী, মহাত্মাজী তাঁদের পরামর্শ দিয়েছিলেন 'উপযুক্ত' ব্যবস্থা করতে। রায়বেরিলীতে বিরাট কৃষক বিক্ষোভের পর কৃষকনেতাদের গ্রেপ্তার করা হলে কৃষকরা বিদ্রোহমুখী হয়ে ওঠে এবং সরকার গুলী চালিয়ে ৭ জন কৃষককে হত্যা এবং বহুসংখ্যককে আহত করে। ফলে সেখানকার ৭০ হাজার কৃষক কংগ্রেসে যোগ দেয়। শিখদের তীর্থস্থান ও মন্দিরাদিতে ছিল দুশ্চরিত্র মোহন্তদের রাজত্ব, সরকার ছিল তাদের পৃষ্ঠপোষক, তাদের হাত থেকে পাবলিক কমিটির হাতে কর্তৃত্ব আনবার জন্যে শিখেরা চেষ্টা করছিল। এই অবস্থায় নানকানা-সাহেব-এর মোহন্ত ১০০ শিখ তীর্থযাত্রীকে মন্দিরের মধ্যে হত্যা করে এবং পেট্রোল দিয়ে মৃতদেহগুলো জ্বালিয়ে দেয়। ফলে শিখ কৃষকরাও দলে দলে কংগ্রেসে যোগ দেয়। মহাত্মাজীর এক বছরে স্বরাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে এইভাবে কৃষকেরাও

তাদেব দুর্দশার অবসানেব আশা নিয়ে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করছিল। মহাত্মাজীও প্রাণপণে তাদের অসন্তোষকে অহিংসার পথে টেনে রাখার চেষ্টা করছিলেন।

মালাবারের সমুদ্রোপকূলের চিরনির্যাতিত দরিদ্র মোপলা কৃষকরা কিন্তু এক রীতিমত সশস্ত্র বিদ্রোহ করে এক খিলাফৎরাজ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল।

এর আগে তারা বহুবার বিদ্রোহ করেছিল এবং সরকার রক্তের বন্যায় সে সব বিদ্রোহ ডুবিয়ে দিয়েছিল—একদল বিশেষ সশস্ত্র পুলিশ এবং একদল সৈন্য সেখানে স্থায়িভাবে মোতায়েন করেছিল। '২১ সালের কংগ্রেস খিলাফৎ আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে তারা এবার পুলিশ, সৈন্য, জমিদার, মহাজন, সবাইকে আক্রমণ করেছিল, এবং অবশ্য হিন্দুদেরও, যাদের তারা বরাবরই শত্রুশিবিরের সামিল বলে দেখে এসেছে। তাছাড়া তারা ইউরোপীয়দের হত্যা করেছে, সরকারী-ভবন লুঠ করেছে, রেল, টেলিগ্রাফ বিধ্বংস করেছে।

হাওয়া বুঝে মহাত্মাজী মোপলা বিদ্রোহকে ধিক্কার না দিয়ে বললেন, তারা সাহসী ও ঈশ্বরভক্ত, সরকার তাদের অসহ্য উৎপীড়ন করেছে এবং তাদের অপকর্মের সরকারী বিবৃতি অতিরঞ্জিত। তিনি এবং মৌলানা মহম্মদ আলি মালাবারে যাওয়ার পথে ওয়ালটেয়ারে গ্রেপ্তার হলেন, তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল। তার পরেই করাচীতে রাজদ্রোহকর বক্তৃতা ও প্রস্তাব পাশ করে মৌলানা প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন এবং তাঁদের জেল হয়। ম্যালকম হেলীর সরকারী হিসাব মতে মোপলা বিদ্রোহ দমনে কয়েক হাজার মোপলা হতাহত হয়েছিল।

'২২ সালের গোড়াতেই জেলে ৩০,০০০ লোক জমে গেছে। মহাত্মাজী ছাড়া বড় বড় নেতারাও জেলে গেছেন।

দেশের লোক কিন্তু খাজনা বন্ধের জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। অনেক স্থান থেকে মহাত্মার কাছে আবেদন আসছে খাজনা বন্ধ শুরু করার অনুমতির জন্যে, মহাত্মা অনুমতি দিচ্ছেন না। অন্ধের গুণ্টুর জেলা খাজনা বন্ধ শুরু করে দিয়েছিল, ১৫ লাখের মধ্যে মাত্র ৪ লাখ টাকার বেশী সরকার আদায় করতে পারে নি, এই অবস্থায় মহাত্মাজী তাদের নিন্দা করে সব খাজনা চুকিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। লোকে হতভম্ব হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি বড়লাটকে নোটিশ দিলেন, সরকার যদি নির্যাতন বন্ধ করে বন্দীদের মুক্তি না দেয়, তিনি খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু করবেন। তিনি সকলকে বলে দিয়েছিলেন, সরকারী নির্যাতন ও প্ররোচনার মুখে কেমনভাবে সম্পূর্ণ অহিংস থাকতে হয়, তা তিনি নিজে আগে দেখিয়ে দেবেন, তার পরে অন্যত্র খাজনা বন্ধ শুরু করা যাবে। তিনি এজন্যে বারদোলী তালুকে খাজনা বন্ধের পরিকল্পনা করেছিলেন। ইতিমধ্যে মেদিনীপুরে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে নতুন শাসন সংস্কার অনুযায়ী ইউনিয়ন বোর্ড সংগঠনে বাধা দিয়ে একটা নতুন রকমের আইন অমান্য শুরু হয়ে গিয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত সফলও হয়েছিল, সরকার ইউনিয়ন বোর্ড সংগঠন করতে পারে নি।

যাই হোক, বারদোলীতে খাজনা বন্ধ শুরু হওয়ার আগেই চৌরীচৌরার বিখ্যাত ঘটনা ঘটে গেল। বিক্ষুব্ধ কৃষকদের ওপর পুলিশ গুলী চালিয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত কৃষকেরা থানা আক্রমণ করে জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং ২২ জন পুলিশকে হত্যা করেছিল। ঘটনা শ্রবণমাত্র মহাত্মা গান্ধী তীব্র অপমান বোধে জর্জরিত হয়ে আন্দোলন বাতিল করে দিলেন এবং

বললেন, তিনি ত'ব হিমালয় প্রমাণ ভ্রান্ত বিচারেব জন্যে ঈশ্বর ও মানুষেব চোখে বেইজ্জং হয়েছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সভা কবে নিদেশ দিলে, অতঃপব আইন অমান্য স্থগিত থাকবে, এবং ক গ্রেসকর্মীদের সর্বত্র চবকা, অস্পৃশ্যতা নিবাবণ, মাদকবর্জন ও শিক্ষাকাম নিয়ে থাকতে হবে।

স গামী উৎসাহ উত্তেজনাব উত্তুঙ্গ তবঙ্গ স্তব্ধ হয়ে গেল, কর্মীবা ক্ষুণ্ণ হয়েও নেতৃত্বেব নিদেশ অনুসাবে তথাকথিত গঠনমূলক কাজেই মনঃসংযোগ কবলে। আমবা চবকা-খদ্দব এবং ন্যাশান্যাল স্কুল নিয়েই খাটতুম, সবটুকু সময় ও শক্তি তাতেই নিয়োজিত ছিল, আমবা তাই নিয়েই থাকলুম। ক গ্রেসেব স্বরাজ যে স্বাধীনতা নয়, এবং তাও এখন গিয়ে পড়েছে "বিশ বাঁও জলে" সুতবাং আমাদের নিজেদেব আদর্শ কংগ্রেসেব মধ্যে প্রতিষ্ঠাব চেষ্টাই এখন আমাদেব কবতে হবে, এই আবিষ্কাব হবে গ।।

এদিকে চট্টগ্রামে প্রাদেশিক কনফাবেন্স এসে পড়ল। গেলুম সেখানে। সভানেত্রী বাসন্তী দেবীব বক্তৃতায় আমাদেব সংগ্রামেব ক্ষেত্র কাউন্সিলেব ভিতব পর্যন্ত প্রসাবিত কবাব ইঙ্গিত পাওয়া গেল। আমবা উৎসাহিত হলুম, কিন্তু গোঁড়া গান্ধীবাদীবা তাব মধ্যে সি আব. দাসের ব্যাবিষ্টোক্রেসাব দুর্গন্ধ ।।

মুন্সীগঞ্জ সাব ডিভিশন এবং নবাবগঞ্জ থানা নিয়ে হয়েছিল বিক্রমপুর (সাবডিভিশন্যাল) কংগ্রেস কমিটি, ৬টা থানা, তাব মধ্যে দোহাব এবং নবাবগঞ্জ ছিল প্রফুল্ল ঘোষ প্রমুখ গোঁড়া গান্ধীবাদীদেব আড্ডা। বাকি ৪টে থানা মুন্সীগঞ্জ, বাজাবাড়ী, টঙ্গীবাড়ী এবং শ্রীনগব আমাদেব আড্ডা।

দাশ মহাশয় জেল থেকে বেরিয়ে স্বরাজপার্টি গঠনেব পবিকল্পনা প্রচাব কবলেন। সার্ভেন্ট ও আনন্দবাজাব গোঁড়া গান্ধীবাদীদেব কাগজ দাশ মহাশয়কে অজস্র গালি দিয়ে ভূত ভাগাতে লাগলো। দাদাদেব সঙ্গে দাশ মহাশয়েব বন্দোবস্ত হল, যুগান্তবপার্টি স্বরাজপার্টিকে সমর্থন কববে, এবং কাজ কববে। স্বভাবতই কংগ্রেসেব কেন্দ্রগুলো দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, No-changer গান্ধীবাদীদেব কেন্দ্র, এবং Pro-changer স্বরাজপার্টিব সমর্থকদেব কেন্দ্র। বিক্রমপুবে প্রফুল্ল ঘোষেদেব সঙ্গে লাগলো আমাদেব ঠোকাঠুকি।

কলকাতায় দাদাবাই প্রথমে আত্মশক্তি কাগজখানা বাব কবেছিলেন এবং উপেনদাকে সম্পাদক কবেছিলেন। গৌবাজাবেব চবকা প্রেস এসেছিল অমবদাব হাতে। শেষ পর্যন্ত চেবী প্রেস আত্মশক্তি উঠে গেল এবং এই একখানি ছোট সাপ্তাহিক পত্রিকাই হল দাশ মহাশয়েব সমর্থক, স্বরাজপার্টিব কর্ম ব্যাখ্যা প্রচাবক। সুতবাং সেখানে এসে জমলেন সুভাষ চন্দ্র বসু প্রভৃতি স্বরাজপার্টির প্রাথমিক সর্বক্ষণেব কর্মীরা। চেবী প্রেস হল স্বরাজপার্টির প্রধান বড় কেন্দ্র।

মুন্সীগঞ্জ ন্যাশান্যাল স্কুল থেকে আমবাও একটা হাতে লেখা মাসিক পত্র বার কবেছিলুম। কাগজটার প্রকৃতি বোঝা যাবে একটা সংবাদ উদ্ধৃত কবলে। —"আনন্দ বাজারের দেশসেবা", —(এটা গয়া কংগ্রেসের পবেব কথা) গত ২২শে বৈশাখ আনন্দবাজাবেব সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়েছে :

"যখন দেশের সকল মতের সকল সম্প্রদায়েব একযোগে কংগ্রেসেব পতাকাতলে সমবেত হইয়া কর্ম কাবিবাব প্রয়োজন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, সেই মুহূর্তে বৃহৎ নেতৃত্বে পরিচালিত

স্বরাজ্য দল প্রতিকূল সমালোচনায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা লাঘব এবং কাউন্সিলের মহিমা কীর্তন করিবার জন্য দেশের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।"

ঐ কাগজেই দেশবন্ধুর মির্জাপুর পার্কের বক্তৃতা বেরিয়েছে, তাতে কাউন্সিল সম্বন্ধে দেশবন্ধু বলেছেন :

"কাউন্সিল যে অসার তা তিনি বিশ্বাস করেন এবং অসহযোগ নীতি প্রবর্তিত হইবার পূর্বে তিনি অমৃতসর কংগ্রেসেও একথা বলিয়াছিলেন। কাউন্সিল দ্বারা আমাদের কোন উপকার হইবে না সত্য, কিন্তু দেশদ্রোহীদিগের সাহায্যে কাউন্সিল দেশের অনেক ক্ষতি করিতে পারে।"

আমাদের কাগজে আমরা এইরকম ভাবে প্রচার করতুম। গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধু বলেন, কাউন্সিল বয়কট করার ফলে আমরা গভর্ণমেন্টের একটা মস্ত সুবিধে করে দিয়েছি, কতকগুলো জো-হুকুমের দল দেশের লোকের প্রতিনিধি সেজে সেখানে বসে গভর্ণমেন্টকে সমর্থন করছে, আইনতঃ গভর্ণমেন্ট দেশবাসীর সমর্থনেই নির্যাতন চালাচ্ছে। আমরা কাউন্সিলের ঐ আসনগুলো দখল করে সরকারের দুষ্টনীতিকে পদে পদে বাধা দেব, যাতে তারা দেশবাসীর নামেই দেশের সর্বনাশ না করতে পারে। কংগ্রেসের তাতে জোরই বাড়বে, বাইরের আন্দোলন কাউন্সিলের জন-প্রতিনিধিদের দ্বারা সমর্থিত হবে, জোরদার হবে।

গয়া কংগ্রেসের পর এই কাউন্সিল প্রবেশের প্রচার নিয়ে নো-চেঞ্জ, প্রো-চেঞ্জ দুই দলের গুঁতোগুঁতি বেড়ে চললো। ইতিমধ্যে অ্যাডভোকেট জেনারেল এস. আর. দাশ একদিন কাউন্সিলে বক্তৃতার মধ্যে একটি কথা বলে সকলের তাক্ লাগিয়ে দিলেন, "বিপ্লবীরা কংগ্রেসে ঢুকে গেছে। দেশে কংগ্রেসের আড়ালে নিজেদের দল গড়ছে, এবং তাদের নামের লিষ্ট আমার পকেটেই আছে।"

জীবন ও আমি গয়া কংগ্রেসে গিয়েছিলুম। এম. এন. রায়ের একখানা ম্যানিফেষ্টো সেখানে বিলি হয়েছিল, যাতে বলা হয়েছিল, চাষা-মজুরদের ব্যক্তিগত ভাবে কংগ্রেস-সদস্য না করে, তাদের সংগঠনগুলোকে কংগ্রেসের affiliation দেওয়া হোক। সেটা অবশ্য গ্রাহ্য হয় নি।

এই গয়া কংগ্রেসে অনুশীলনের চারজন নেতার নামে এক ম্যানিফেষ্টো বিলি হয়—ম্যানিফেষ্টোটা নিম্নলিখিত মত : —

ভারত-সেবক সংঘ

সাধারণের অবগতির জন্য আমরা জানাইতেছি যে, শ্রীযুত পুলিনবিহারী দাসের বর্তমান কার্যকলাপের সহিত আমাদের কোন প্রকার সংস্রব নাই এবং ভারত-সেবক-সংঘ নামক যে সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার অস্তিত্ব অনেক দিন হইল লুপ্ত হইয়াছে।

(স্বাক্ষর) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রমোহন সেন
,, প্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
,, রমেশচন্দ্র আচার্য্য
,, রমেশচন্দ্র চৌধুরী

এই ম্যানিফেষ্টোটা কলিকাতার আত্মশক্তি কাগজেও ছাপা হয়েছিল এবং আমরা আমাদের কাগজে (উন্মত্ত) তা উদ্ধৃত করেছিলুম।

রহস্যটা পরে শুনলুম। এস. আর. দাশের পকেটে বিপ্লবীদের নামের তালিকা গেল কেমন করে? অনুশীলনপার্টির কর্মীরা বিভিন্ন কংগ্রেস কেন্দ্রে ভারত-সেবক-সংঘের নামে "হক কথা" প্রচার করতো, কিন্তু যুগান্তরপার্টির কর্মীদের দ্বারা তাদের প্রচার বানচাল হত। তাদের ব্যর্থতার কৈফিয়তে তারা এস. আর. দাশের কাছে (পুলিন দাসের মারফত) লিখতো যুগান্তর দলের অমুক কর্মীর জন্যে আমাদের প্রচার ব্যাহত হচ্ছে, সে এখানে কংগ্রেস কমিটি দখল করে বসে ছেলেদের বিপ্লবের মন্ত্র দিয়ে দল গড়ছে। এমনি করে নানা জায়গা থেকে যুগান্তর দলের দাদাদের নাম এস. আর. দাশের পকেটে জমা হয়েছে। তিনি নির্বোধের মতন সেটা নিয়ে বড়াই করায় যুগান্তরের দাদাদের আর বুঝতে কিছু বাকী নেই। তাই এই কেলেঙ্কারী থেকে অনুশীলন পার্টিকে বার করে আনার জন্যে ঐ ম্যানিফেস্টো প্রচার করা হয়েছে। দোষটা সবই পুলিন দাসের ঘাড়ে চাপিয়ে অনুশীলনের নেতারা সরে এসেছেন। পরবর্তীকালে পুলিন দাস ব্যাপারটার উল্লেখ করে বলতেন, "বেইমানের দল! আরে তবাই তো সব খাইচস্—আমি একটা পয়সা খাইচি?"

এর পরই অনুশীলন দল যুগান্তরের সঙ্গে মিতালী করে কংগ্রেসে যোগ দেয়। এ বিষয়ে ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের বই (বিপ্লবের পদচিহ্ন) থেকে কয়েকটা কথা উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি লিখেছেন:

"ধরা পড়ার কিছুদিন আগে থেকে ('২৩ সাল) প্রতুল বাবু ও রমেশ বাবু আমার কাছে যাওয়া-আসা করছিলেন। তখন এঁরা ভারত সেবক-সংঘ করার দরুন বাংলা রাজনীতিক্ষেত্রে অপাংক্তেয়। প্রতুল বাবু একদিন আমায় বলেন, "ও যা করতে গিয়েছিলাম, দেশের ভাল হবে বলেই তো করতে গিয়েছিলাম।"

"কিন্তু দেশের ভাল হবে বলে ওঁরা এই সময়ে মিলতে এসেছিলেন, এ কথাটা যে কত অসার, সেটা বুঝি ১৯২৮ সালে খালাসের পর। এসেছিলেন তখন স্বরাজপার্টি গঠিত হচ্ছে বলে।... (১২৪ পৃষ্ঠা।)

"...যাই হোক, স্বরাজ্যদল গঠনের ভার কিন্তু প্রায় সবটাই পড়লো আমাদেরই উপর। এবং তাই স্বাভাবিক। প্রতুল বাবুদের এই সময় আমাদের সঙ্গে মিলন কামনাও তেমনি স্বাভাবিক।"—(২১৭ পৃষ্ঠা।)

ফলত, এস. আর. দাশের পকেটের তালিকায় স্বভাবতই অনুশীলনের নেতা ও বিশিষ্ট কর্মীদের নামও উঠলো। কিন্তু I B তো সেই তালিকার উপরই নির্ভর করে না! তাদের খাতায় আরো বড় তালিকা গড়ে তোলার ব্যবস্থা তারা আগে থেকেই করেছিল। দাদারা এক বছরের জন্যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে একনিষ্ঠভাবে চান্স দিয়ে, তারপর নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছিলেন বটে, কিন্তু সেটা ঐ কংগ্রেসকে বিপ্লবের পথে টেনে আনার চেষ্টা মাত্র, এবং তার জন্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে চলার নীতিই গ্রহণ করেছিলেন, যাতে কংগ্রেসের ভিতর দিয়ে তাঁদের দল গড়ার কাজ I B বানচাল করে দিতে না পারে, ঝাঁকশুদ্ধ গ্রেপ্তার করার কোন সুযোগ না পায়।

তার পর যখন কাউন্সিল-প্রবেশের প্রশ্নে নো-চেঞ্জ প্রো-চেঞ্জ দু'দল ভাগ হয়ে গেল, তখন প্রকৃতপক্ষে গান্ধীবাদী, বিপ্লব-বিরোধী, অহিংসাপন্থীরাই হল নো-চেঞ্জার, আর বিপ্লবীরাই হল প্রো-চেঞ্জার, I Bর টার্গেট আরো পরিষ্কার হয়ে গেল। কিছু সন্ত্রাসবাদী

কার্যকলাপ দেশে চালু করার ব্যবস্থাও তারা আগে থেকেই শুরু করেছিল এজেন্ট প্রোভোকেটর লাগিয়ে, ছুটকো-ছাটকা বিপ্লবী তরুণদের দিয়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সাহায্যের ব্যবস্থা করে। এই রকম একজন এজেন্ট ছিল শিশির ঘোষ। সে মির্জাপুর ষ্ট্রীটে এক খদ্দরের দোকান করে বসে কাজ চালাতো।

বিপিনদা'র চেলা হিসাবে সন্তোষ মিত্র তাঁর কাছ থেকে (বা শিশিরের কাছ থেকে?) রিভলভার যোগাড় করে তাই দেখিয়ে ছেলে রিক্রুট করতো, এবং নেতা বলে বিপিনদা'রই নাম করতো। বিপিনদা' কংগ্রেসে দাদাদের সঙ্গে যোগ দিয়েও এ ব্যাপার বন্ধ করার চেষ্টা করেননি। শিশিরের বন্দোবস্তেই সন্তোষ মিত্রের দল শাঁখারীটোলা পোষ্ট অফিসে ডাকাতি করতে গিয়ে পোষ্ট মাষ্টারকে হত্যা করে। বরেন ঘোষ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলেই ধরা পড়ে এবং পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করে। বরেনের প্রথমে প্রাণদণ্ড ও পরে Mercy petition করায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তারপর সন্তোষ মিত্রের দল কোণা (হাওড়া) ডাকাতি করে, ডাকাতি ব্যর্থ হয়। তারপর সন্তোষ মিত্র, ধীরেন বাগচি এবং সুবোধ লাহিড়ীকে রেগুলেশন থ্রি তে রাজবন্দী করা হয় এবং দেবেন দে (খোকা) গা ঢাকা দেয়।

পরে মির্জাপুর ষ্ট্রীটে শিশির ঘোষের খদ্দরের দোকানে বোমা পড়ে, শিশির পালিয়ে বেঁচে যায় এবং তার কর্মচারী প্রকাশ বণিক্য বোমার আঘাতে মারা পড়ে।

এই সব সন্ত্রাসবাদী কাণ্ড শুরু হওয়ার সময় থেকেই দাদারা মনে মনে বিপদ গণছিলেন, দিন বুঝি ঘনিয়ে এল। ওদিকে আর এক রকমের কাণ্ডও চলছিল। দাদারা মোজাফ্ফর আহমদের মারফৎ এম. এন. রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ভারতীয় বিপ্লবে রুশ সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টা শুরু করেছিলেন, কিন্তু এম. এন. রায়ের চাষী মজুরের বিপ্লবের প্ল্যান গ্রহণ করতে সম্মত হন নি। ২।১ জন দাদা, যেমন ভূপতি মজুমদার, প্রায় কট্টর কমিউনিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। উপেনদা'ও আত্মশক্তি কাগজে এম. এন. রায়ের ভ্যানগার্ড প্রভৃতি থেকে চাষীমজুরের বিপ্লবের আদর্শ সন্তর্পণে প্রচার করতেন। দাদাদের মধ্যে মনোরঞ্জনদা' ছিলেন এসব কাণ্ডের সব চেয়ে উগ্র বিরোধী।

বস্তুতঃ একদিকে গান্ধী আর এক দিকে বলশেভিজম দাদাদের মধ্যে রীতিমত ভাব-বিরোধের সৃষ্টি করছিল। স্বরাজ্যপার্টির উৎসাহী কর্মী এবং কমিউনিষ্টিক ভূপতিদা' কমিউনিজমের খেয়াল বর্জন করেছিলেন এবং '২৩ সালে তাঁকে বি-পি-সি-সির সেক্রেটারি করে দিয়ে দাদারা তাঁর কমিউনিজমপ্রেম সম্পূর্ণভাবে মুছে দিয়েছিলেন। জীবন কিন্তু দাদাদের সঙ্গে স্বরাজ্যপার্টিও করে এবং ভ্যানগার্ডও প্রচার করে। দাদাদের সঙ্গে মোজাফ্-ফর আহমদের যোগাযোগ রক্ষার জন্যে দাদারা জীবনকেই নিযুক্ত করেছিলেন।

যাই হোক, গয়া কংগ্রেসের পর আমি ও জীবন কয়েক দিন একটু মধুপুর, দেওঘর, জামসেদপুর ঘুরে গেলুম লক্ষীসরাইয়ে। সেখানে জীবনের একটু ছোট্ট জমিদারী ছিল। বৎসরান্তে কিছু খাজনা আদায় হত, জীবন সেটুকু বিক্রী করার বন্দোবস্ত করে এল। এদিকে মুন্সীগঞ্জে রটে গেল জীবন বাবু মুন্সীগঞ্জ ছেড়ে চলে গেছেন, এবং তার ফল হল, ন্যাশান্যাল স্কুল প্রায় উঠে যাওয়ার যোগাড়। তখন চৌরীচৌরার মামলায় ১৭২ জনের ফাঁসির হুকুম হয়েছে, মহাত্মা গান্ধীকেও সরকার গ্রেপ্তার করেছে এবং ৬ বছর জেল দিয়েছে। আন্দোলনের ভাঁটার মুখে সরকার নির্ভয়ে তাঁর উপর চরম আঘাত হানার বন্দোবস্ত করেছিল।

জীবন চৌরীচৌরার আসামী ১৭২ জন কৃষকের ফাঁসির হুকুমের বিরুদ্ধে এক বিরাট প্রতিবাদ-সভা করলে। জীবনের বক্তৃতায় এমন এক নতুন উৎসাহ উত্তেজনা সৃষ্টি হল যে আবার ন্যাশান্যাল স্কুল জমজমাট হয়ে উঠলো।

খরচ সঙ্কুলানের অসুবিধা বরাবরই ছিল। যতীন দত্ত, পরেশ সেন প্রভৃতি মাষ্টার মশায়রা জেলে গিয়ে জাঁতায় গম পেষা শিখে এসেছিলেন, ২খানা জাঁতো কেনা হল, এবং টিচারদের ডিউটি হল এক ঘণ্টা করে গম পেষা। অনেকের বাড়ী থেকেই গম আসতো, এবং আমরা চার পয়সা সের হারে গম পিষে দিতুম।

এইখানে একটা মনোবিজ্ঞানের প্যাঁচের কথা বলে নিই। যারা কোন আদর্শ নিয়ে খাটে, কর্মপন্থা সঠিক হোক বা না হোক, তারা নিজেরা কষে খাটে বলেই মনে করে, কাজের কাজ অবশ্যই কিছু হচ্ছে। আমাদের অবস্থাও ছিল কতকটা ঐ রকমের। সারাদিন ভূতের মতন খেটে বার লাইব্রেরীর গরাদবিহীন জানালা টপকে ঢুকে লম্বা লম্বা টেবিলের ওপর লম্বা হয়ে খানিক ঘুমিয়ে নেওয়া, এই হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রাত্যহিক ঘটনা। পঞ্চসারের এক কায়স্থ বৃদ্ধ থাকতেন বার লাইব্রেরীর রাত্রের পাহারা, তাতেই আমাদের এই সুযোগ হয়েছিল।

পরদিন পাইকপাড়া (আবদুল্লাপুর) যাওয়ার প্রোগ্রাম আছে, মিটিং করতে হবে, শেষ রাতটুকু না ঘুমিয়ে কয়েকজনে হাঁটা দিলুম, মাইল পাঁচেক হেঁটে সকালেই সেখানে পৌছে গেলুম। ২২ সালেও কংগ্রেসের মেম্বার করা কঠিন হয়নি, কিন্তু ২৩ সালে সেটা কঠিনই হয়ে উঠেছিল। বিশেষত ঐ কেন্দ্রে প্রধানত চাষীদের বাস, তারা স্রেফ কংগ্রেসে আসতে চায় না। স্থানীয় কর্মীরা হতাশ হয়ে পড়েছে।

বিকালে আবদুল্লাপুরের মাঠে সভা হল, আমি প্রধান বক্তা— "কলকাতার বক্তা"! এক মৌলবী সাহেবকে করা হল সভাপতি আর পাইকপাড়ার (পার্শ্ববর্তী গ্রাম) ন্যাশান্যাল স্কুলের কর্মীরা কংগ্রেসের রসিদ বই নিয়ে সভার মধ্যে ছড়িয়ে থাকলেন। আমি বক্তৃতা দিলুম, প্রায় কম্যিউনিজম—"কংগ্রেসে শুধু বাবুদের ভিড়, তারাই কর্তা, সুতরাং কংগ্রেস শুধু তাদের স্বার্থ সাধনের কল হয়ে উঠছে, আর যদি স্বরাজ হয়ই তাহলে সেটা হবে বাবুদের স্বরাজ, তাতে কৃষকদের স্বার্থরক্ষা হবে না, কারণ কৃষকদের স্বার্থ আর বাবুদের স্বার্থ এক নয়। সুতরাং কৃষকদের দলে দলে কংগ্রেসে প্রবেশ করা দরকার, তারাই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী, তারা যদি কংগ্রেসের মধ্যেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়, তাহলে তাদের স্বার্থ নষ্ট হওয়ার ভয় থাকবে না।"

মৌলবী সাহেব যখন আমাকে সাধুবাদ দিয়ে বক্তৃতা করছেন, তখন ওদিকে দশ জায়গায় কংগ্রেসের সদস্য করে রসিদ কাটা চলছে! সভাতেই বেশ কিছু সদস্য সংগৃহীত হল, এবং তারপর সেখানে কংগ্রেস কমিটিও হয়ে গেল।

এদিকে কংগ্রেসের এডুকেশন বোর্ডের যে রকম ভগ্নদশা, তাতে ন্যাশান্যাল স্কুলের ছেলেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা চিন্তিত হলুম।

Education may wait, but Swaraj cannot—এ শ্লোগান স্বরাজের সম্ভাবনা দূরে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোঁতা হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা মনস্থির করে লেখালেখি করে স্বদেশী যুগের National Council of Education-এর অন্তর্ভুক্ত হলুম, যাতে

আন্ত পরীক্ষার পর ছেলেরা Bengal Technical Institute-এ সহজে ভর্তি হতে পারে। সেটা হয়েছিলও—আমাদের কয়েকজন ছাত্র বেঙ্গল টেক্‌নিক্যালে ভর্তি হয়ে পাশ করে চাকরী বাকরী পেয়েছিল।

যাই হোক, '২৩ সালের মাঝামাঝি স্বরাজ্যদলের ঘাঁটি চেরী প্রেসে যখন সুভাষ বাবু আড্ডা গাড়েন, তখন উপেনদা' তাঁর ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেন এবং দাদাদের মতিগতি দেখে সুভাষবাবুকে করায়ত্ত করে গোপনে অনুশীলন পার্টিকে নিয়ে কাজ করার প্ল্যান করেন। অনুশীলন পার্টি চাইছিলো জনপ্রিয় সুভাষচন্দ্রকে যুগান্তর দলের প্রভাব থেকে ছিনিয়ে নিতে এবং তার সঙ্গে তার একচ্ছত্র নেতৃত্ব মেনে নিতে, যাতে কংগ্রেস এবং পাবলিক ফিল্ডে তাদের কাজের সুবিধা হয়। সুভাষবাবুর মনেও এক রোমান্টিকের মোহ দেখা দিয়েছিল, উপেনদা'র মতন মন্ত্রী এবং একদল অভিজ্ঞ বিপ্লবী কর্মীর সাহায্য পেলে তিনি হতে পারেন স্বরাজ সংগ্রামের একটি deciding factor.

এই সময়ে দেশবন্ধু বেরুলেন পূর্ববঙ্গ সফরে, সঙ্গে নিলেন সুভাষচন্দ্র, কিরণশঙ্কর এবং উপেনদা'কে। জীবনও সুযোগ বুঝে বেকারীবাজারে (সুরেন মজুমদারের সাহায্যে) বিক্রমপুর রাজনৈতিক সম্মেলনের বন্দোবস্ত করে তাঁদের নিমন্ত্রণ করলে। তাঁরা মুন্সীগঞ্জে এলেন। কমলা ঘাট থেকে মুন্সীগঞ্জ সহরের মাঝখানের খাল দিয়ে নৌকায় সহরে আসাই সুবিধা। দেশবন্ধু আসছেন বলে লোকের যে উৎসাহ, ততোধিক উৎসাহ সুভাষবাবু আসছেন বলে। সবচেয়ে বেশী উৎসাহ মতি সিং-এর। বজ্রযোগিনীর চন্দ্রভূষণ ওরফে গৌরার মতন সে হচ্ছে মুন্সীগঞ্জ কংগ্রেসের পাঁজরার হাড়, সনাতন ভলান্টিয়ার। তফাৎ এই যে মতি তার চেয়ে কালো, তার হাতের লোটাও কালো। কিন্তু ওপরটা যত কালো, ভেতরটা তত সাদা, আর সাদা তার সুন্দর দাঁতের পাটি, যাকে বলে milk white, সাদা মনের পরিচয় তার নির্মল হাসিতে, আর সে হাসির অন্তও নেই বিরামও নেই, তাকে ধরে মারলেও সে হাসে। বোধ হয় তার পেট কামড়ালেও সে হাসে, আর সে হাসিতে যেন মুক্তা ঝরে।

নেতাদের নৌকা ঘাটে ভিড়তে না ভিড়তে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুভাষচন্দ্রকে দেখে তার আনন্দ আর উৎসাহ যেন লাফিয়ে উঠল। সে এক লাফে নৌকায় উঠে পড়ে সুভাষবাবুর একখানা হাত ধরে টেনে তার পাশে নিজের কুচকুচে কালো হাতখানা রেখে দেখে হেসে একেবারে লুটোপুটি। সদাগম্ভীর সুভাষবাবুর মুখেও হাসি ফুটে উঠলো, সুভাষবাবু তাকে বুকে টেনে নিলেন, এক মুহূর্তে সে সুভাষবাবুকে আপনার করে নিলে।

যাই হোক, কনফারেন্সের অধিবেশন চলার মধ্যেই রাত্রে উপেনদা' অনুশীলন দলের প্রতুল গাঙ্গুলীকে খবর দিয়ে আনিয়ে সুভাষবাবুকে নিয়ে এক পুকুরের 'ঘাটলার' সাঁকোয় বসে কিছু গোপন পরামর্শ করলেন। ওদিকে কনফারেন্সে কাউন্সিল প্রবেশ নিয়ে 'নো-চেঞ্জার প্রো-চেঞ্জারে গুঁতোগুতি চললো। নো-চেঞ্জার নেতা ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ দলবল নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি জীবনকে লক্ষ্য করে সভায় বললেন, যারা অহিংসায় বিশ্বাস করে না, তাদের কংগ্রেসে থাকার কোন অধিকার নেই। তার জবাবে জীবন মহাত্মা গান্ধীর স্বহস্তলিখিত পত্র বার করে পড়ে শুনিয়ে প্রফুল্ল বাবুদের আহ্বান করলে স্বচক্ষে পত্রখানি দেখে যাওয়ার জন্যে। ওঁরা চুপ করে থাকলেন, থোঁতামুখ ভোঁতা হয়ে গেল। স্বরাজ-পার্টির সমর্থনে প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

ন্যাশান্যাল স্কুলে বাংলা পাঠ্যপুস্তক ১ম শ্রেণীর জন্যে নির্বাচিত হয়েছিল,—সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন,—কাব্য, নবীন সেনের রৈবতক এবং প্রবন্ধ, বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব বা অনুশীলন। দেশপ্রেম, বারত্ব, সশস্ত্র সংগ্রাম, রাজনীতি, বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, এইসব নিয়েও হত আলোচনা। ফার্ষ্ট ক্লাশের ফার্ষ্ট বয় ছিল একটি মুসলমান ছেলে, নীরব ও নিরীহ প্রকৃতির। সে একদিন হঠাৎ আমাকে গোপনে তার লেখা এক প্রবন্ধ দেখালে, যার প্রতিপাদ্য, ধর্মানুষ্ঠান এবং ধর্মের প্রচলিত বচনগুলো, ঈশ্বর-আল্লার কুদরৎ, সবই বুজরুকী, সাধারণ সরল লোকদের ধোঁকা দিয়ে ঠকিয়ে খাওয়ার জন্যে মোল্লা-পুরুতদের কৌশলমাত্র। প্রকাণ্ড প্রবন্ধ, প্রত্যেকটি কথার সমর্থনে প্রচুর উদাহরণ ও যুক্তি, দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ, আমার মাষ্টারীর সন্দেহাতীত সাফল্য, আশাতীত ফল। এখন সে কোথায় আছে, কি করে জানিনা, মনে পড়লে জানতে ইচ্ছে করে, মনে মনে বুঝি, যেখানেই থাক, সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, নীচতা তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। ভেবে আনন্দ পাই। নাম তার আবু দাউদ।

'২৩ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লী কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়ে গেল। নো চেঞ্জ প্রো চেঞ্জ নিয়ে কংগ্রেস প্রায় দ্বিখণ্ডিত হওয়ার যোগাড় হয়েছিল বলে একদল সেণ্টার গ্রুপ রূপেও গজিয়ে উঠেছিল, বাংলায় তার একজন পাণ্ডা ছিলেন বাকুড়ার অসহযোগী প্রোফেসর অনিলবরণ রায়। একদিকে গান্ধীভক্ত, আর একদিকে যুগান্তর দলের দাদাদের প্রো-চেঞ্জ কর্মকাণ্ড, এবং দে টানাহেঁচড়ে মনোরঞ্জন দা'র (গুপ্ত) অবস্থাও হয়েছিল কতকটা মধ্যপন্থী। অনিলবরণ রায়ের সঙ্গে তাঁর খাতির এবং ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। সরস্বতী প্রেস থেকে মনোরঞ্জনদা এক সাপ্তাহিক কাগজ বার করেছিলেন "সারথি" এবং অনিলবরণকে সম্পাদক করে আরো নিকট বন্ধু করে নিয়েছিলেন।

যাই হোক, এই সেণ্টার গ্রুপের চেষ্টায় দিল্লীতে আপোষ মীমাংসার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়। মৌলানা মহম্মদ আলী হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট। বাংলা থেকে দেশবন্ধু তাঁর ডেলিগেটের দলবল নিয়ে দিল্লী চললেন, মুন্সীগঞ্জ থেকে আমরাও কয়েকজন দিল্লী গেলুম—যতীন দত্ত, পরেশ সেন প্রভৃতি। জীবন কলকাতা থেকেই গিয়েছিল।

বৈধ গণতান্ত্রিক রাজনীতির রাজা ছিলেন দেশবন্ধু, বেপরোয়া জাঁদরেল। তখন ডেলিগেটের নির্বাচনও হত না, প্রাদেশিক সম্পাদক ডেলিগেটের চাঁদা নিয়ে certificate ও card issue করলেই যত খুসী ডেলিগেট হতে পারতো, সংখ্যা বাঁধা ছিল না।

দেশবন্ধুর একটা বৈধ গণতান্ত্রিক কায়দা দেখা গেল অপূর্ব। সারা ভারতের নো-চেঞ্জার ডেলিগেটদের চেয়ে বেশী সংখ্যক প্রো-চেঞ্জার ডেলিগেট জমা করে নো-চেঞ্জারদের out vote করে দেওয়ার অবস্থা করতে না পারলে তারা আপোষ মীমাংসায় বাগ মানবে না, সুতরাং অগুন্তি ডেলিগেট নিয়ে যেতে হবে। বাংলায় লোকের অভাব নেই, কিন্তু দিল্লী যাওয়া-আসার খরচ জোগাতে জিভ বেরিয়ে যাবে।

সুতরাং কয়েকজন লোক পাঠানো হল কাশীতে এবং প্রায় সমগ্র বাঙ্গালীটোলাটাকেই খদ্দরে সাজিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হল দিল্লীতে, বেঙ্গল ডেলিগেট! কংগ্রেসে দেশবন্ধু বললেন, যদি আপনারা চান, আমি ভোটাভুটিতে রাজি আছি, কিন্তু আমি চাই না, কংগ্রেস ভেঙ্গে দুখানা হয়ে যাক। আমি মিলিত, সংহত কংগ্রেসই চাই।

ডেলিগেটের বহর দেখে out vote হওয়ার ভয়েই নো-চেঞ্জাররা রাগ মানলেন। ঠিক হল, দু'দলই কংগ্রেসের ভিতরে থেকে দুটো বিভাগের মতন কাজ করবে, একদল প্রধানত কাউন্সিলের কাজ নিয়ে থাকবে, আর একদল গঠনমূলক কাজ নিয়েই থাকবে।

কিন্তু ইতিমধ্যেই ১৭ জন নেতার নামে রেগুলেশন থ্রি ওয়ারেন্ট বেরুলো, আর অনেকেই ফেরবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। তাঁরা হচ্ছেন—অমরদা' (চ্যাটার্জি), উপেনদা', যাদুদা', মনোরঞ্জনদা' (গুপ্ত), ভূপতিদা', ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, প্রাঃ জ্যোতিষ ঘোষ (মাষ্টার মশায়), মনোমোহন ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রমোহন সেন, রমেশ চৌধুরী, অমৃত সরকার, সতীশ পাকড়াশী এবং বিপিনদা (গাঙ্গুলী)। জীবন পথে খবর পেয়ে কলকাতায় ফিরে এসে কিছুদিন গা ঢাকা দেওয়ার পর গ্রেপ্তার হল, হঠাৎ একদিন রাস্তার মধ্যে। পূর্ণ দাশ এবং প্রতুল গাঙ্গুলীও গা ঢাকা দিয়েছিলেন, এর পরে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

কাণ্ড দেখে আমি স্কুলে নোটিশ দিলুম, ডিসেম্বরের পর আমি আর থাকবো না, কলকাতায় ফিরে যাবো। ডিসেম্বরে হল কোকনদ কংগ্রেস, সাধারণ অধিবেশন। আমি কোকনদ কংগ্রেস থেকে ফিরে কলকাতায় চলে এলুম। সারদাও পরে চলে এল, প্রভাস মুন্সীগঞ্জেই থেকে গেল, আমার ভাগ্নে।

'২৪ সালের জানুয়ারীতে হঠাৎ একদিন গোপী শা টেগার্ট ভ্রমে আর্নেষ্ট ডে নামক এক সাহেবকে গুলী করে হত্যা করে পালাবার পথে ধরা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আর পাঁচজন নেতাকে গ্রেপ্তার করলে রেগুলেশন থ্রিতে। তাঁরা হলেন, অতুলদা' (ঘোষ), সতীশদা' (চক্রবর্তী, খুলনা), কিরণদা' (মুখার্জি), গোপেনদা' (রায়, পাবনা) এবং অরুণ গুহ। সরস্বতী প্রেস ও লাইব্রেরী একটা বিরাট ধাক্কা খেলো। স্বরাজ্য পার্টিও একটা ধাক্কা খেল।

যেন বিপ্লব প্রচেষ্টার দ্বিতীয় পর্ব শেষ হল। হরিদা' (চক্রবর্তী), সুরেনদা' (ঘোষ), নরেশদা' (চৌধুরী) প্রভৃতি যাঁরা থাকলেন, তাঁরা আবার ভাঙ্গাঘর গোছাতে শুরু করলেন। আমরাও থাকলুম পিছনে।

এগারো

১৯২৪ সালের প্রথমেই যখন আমি কলকাতায় চলে এলুম, ঘটনাচক্রের সঙ্গে জীবনধারাও যেন পরিবর্তিত হয়ে গেল।

কলকাতায় প্রথমেই প্রয়োজন হল একটা রোজগারের ঠাট Ostensible means of livelihood। তখনও কিছু টাকা হাতে ছিল, তাই দিয়ে কলকাতায় শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে এক ঘর ভাড়া করে সারদাকে (ব্যানার্জি) বসালুম, হল এক ফার্ণিচারের ব্যবসা, নিলেম থেকে ফার্ণিচার কিনে বিক্রী। খরচ চলে প্রায় পকেট থেকেই। কিছুদিন পরে ময়মনসিং-এর আনন্দ মজুমদার কলেজ রো'তে এক বোর্ডিং করলেন, বোর্ডাররা সবই দলের লোক, আমি সেখানেই নীচের তলায় একখানা ঘর নিয়ে উঠে গেলুম। '২৪ সালের অক্টোবরে সেই বাড়ী থেকেই সুরেন দা' প্রভৃতির সঙ্গে রেগুলেশন থ্রিতে ধরা পড়ি।

যাই হোক, ব্যবসার Outdoor work করার নামে বাইরে ঘোরাফেরা রীতিমত

চললো। চৌরীচৌরা কাণ্ডের পর আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন মোটামুটি ব্যর্থ হল বলেই লোকে ধরে নিয়েছিল এবং তারপর মহাত্মাজীর গ্রেপ্তার ও জেল হওয়াতে আন্দোলনের ভাঙ্গন প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছিল।

কংগ্রেসকে বিপ্লবের পথে টেনে আনা ছিল আমাদের লক্ষ্য। আমাদের সংগ্রামশীল চেতনার "দুধের সথ ঘোলে মেটানোর" জন্যে আমরা ধরেছিলুম স্বরাজ্য পার্টির সংগ্রামী কর্মসূচীকে। কিন্তু জনগণের সংগ্রামী চেতনা অন্য দুই ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল। এক ধারা হচ্ছে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন, আর তার মধ্যে ধীরে ধীরে বলশেভিকবাদের অনুপ্রবেশ, এবং আর এক ধারা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক চেতনা ও হাঙ্গামা। মুসলমানেরা মসজিদে নমাজ পড়ছে, এমন সময় এক হরিনাম সংকীর্তনের দল এক শবযাত্রা করে যাচ্ছে। মসজিদ থেকে মুসলমানেরা বেরিয়ে বললে এখন নমাজ হচ্ছে, তোমরা সংকীর্তন বন্ধ করে যাও। হিন্দুরা রাজী হল না, মুসলমানেরা ইট পাটকেল ছুঁড়ে শবযাত্রার মিছিল ভেঙ্গে দিলে। এই ভাবে এক জায়গায় গোলমাল শুরু হলেই সব জায়গায় সেটা ছড়িয়ে পড়লো অনেক বড় হয়ে। মুসলমানেরা দাবী করলো, নমাজের সময় হোক বা নাই হোক মসজিদের সুমুখ দিয়ে বাজনা বাজিয়ে যাওয়া কোন সময়েই চলবে না। হিন্দুদেরও জেদ চললো, তারা মসজিদের সুমুখ দিয়ে সংকীর্তন করে যাবেই, গান বাজনা থামাবে না। ইটপাটকেল গিয়ে দাঁড়ালো লাঠিবাজীতে। নিত্য নতুন জায়গা থেকে লাঠালাঠির খবর আসে।

অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে, স্বরাজ এক বছরে দূরে থাক, কত বছরে হবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। অসহযোগের ফলে কিছু মুসলমান ছাত্রেরও লেখাপড়া বন্ধ হয়েছিল, এখন সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতারা বলতে শুরু করলে, হিন্দুরা লেখাপড়ায় অনেক এগিয়ে আছে, তাদের চেয়ে মুসলমানদের ক্ষতি হল বেশী।

খিলাফৎ আন্দোলনও ব্যর্থ হয়েছে। মুস্তাফা কামাল পাশা সেভার্স সন্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে ভারতের খিলাফৎ কমিটি উৎসাহিত হয়ে চাঁদা তুলে একখানা এরোপ্লেন কিনে তাঁকে উপহার দিয়েছিল। সেই কামাল পাশা যখন নতুন তুর্কী রাষ্ট্র গঠন করলেন, তখন সর্বাগ্রে তিনি খিলাফৎই ভেঙ্গে দিলেন। তুরস্কের সুলতান ছিলেন সমগ্র মুসলমান জগতের ধর্মগুরু। প্রেসিডেন্ট কামাল পাশা মুসলমান জগতের সঙ্গে তুরস্ককে জড়িয়ে রাখার ব্যবস্থা তুলে দিলেন এবং তুরস্ককে করলেন একটা মডার্ণ ষ্টেট। ভারতের খিলাফৎ আন্দোলনের স্বভাবতই সমাধি হয়ে গেল।

ভারতের মুসলমানেরা, যাঁরা খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে স্বরাজ আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন এবং বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একটা সংগ্রাম করছিলেন দুই দিক থেকে ব্যর্থ হয়ে, তাঁদের মনের বিষ সাম্প্রদায়িকতার চোরা গলিতে প্রবাহিত হল। অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারের যুগে দিল্লীতে আর্য সমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে মুসলমানেরা জুম্মা মসজিদে বক্তৃতা দিতে দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা শুরু হওয়ার পর হিন্দুরা যেমন সর্বত্র হিন্দুসভার সংগঠন শুরু করেছিল, তেমনি শ্রদ্ধানন্দ শুদ্ধি আন্দোলনও শুরু করেছিলেন, মুসলমানদের "শুদ্ধি" করে হিন্দু করে নিতে শুরু করেছিলেন। আবার হিন্দুদের এই শুদ্ধি ও সংগঠনের পাল্টা ব্যবস্থা শুরু করেছিলেন কংগ্রেস নেতা ডক্টর সৈফুদ্দীন কিচলু (এ যুগে যিনি শান্তি সংসদের প্রেসিডেন্টরূপে ষ্টেলিন প্রাইজ পেয়েছিলেন)। কিচলুর আন্দোলনের

নাম তবলীগ ও তাঞ্জিম আন্দোলন, মুসলমান সংহতির আন্দোলন। এই সব সংগঠনের যুগে দিল্লীতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ একদিন এক মুসলমান আততায়ীর ছুরির আঘাতে নিহত হলেন। সাম্প্রদায়িক বিরোধ আরো বেড়ে গেল। প্রকাশ্য স্থানে গোহত্যা এবং তা নিয়ে দাঙ্গাও হল।

এই সব ব্যাপারের পাশাপাশি আর এক রকমের আর একটা আন্দোলনও মুসলমানদের মধ্যে শুরু হয়েছিল—সে মুসলমানদের কাউন্সিলে সদস্য সংখ্যা এবং সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের সংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধির আন্দোলন। বাংলায় এ আন্দোলন বেশ জোর পেয়েছিল, কারণ এখানে মুসলমানের সংখ্যা যত বেশী, পদাধিকার ছিল তার তুলনায় অনেক কম। কাজেই দেশবন্ধু মুসলমানদের অসন্তোষ নিবারণের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করছিলেন, যাতে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা শান্ত হয়। তাঁর নেতৃত্বে এক হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট বা চুক্তি হয়েছিল, যাতে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী এবং কিছু বেশী কাউন্সিলের সদস্যপদ এবং চাকুরী স্বীকৃত হয়েছিল, এবং স্থির হয়েছিল, হিন্দুরা মসজিদের কাছ দিয়ে সংকীর্তনাদি নিয়ে যাওয়ার সময় মসজিদের কিছু আগে থেকে কিছু পরে পর্যন্ত গান বাজনা বন্ধ করে যাবে, আর হিন্দুদের ধর্মভাবে যাতে আঘাত লাগে, মুসলমানেরা এমনভাবে গোহত্যাদি করবে না।

স্বভাবতই মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই চুক্তিতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছিল, এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধের শান্তি কামনাও করা হয়েছিল। এমন কি, এই চুক্তির পরে '২৪ সালের প্রথমে (বা '২৩ সালের শেষে?) ঈদের সময়, কলকাতার ইতিহাসে এই একটা মাত্র বৎসর গো-কোর্বানী হয়নি—বড় মসজিদে কোর্বানী হয়েছিল একটা উট, অন্যত্র ভেড়া। চুক্তির বিরুদ্ধে হিন্দুদের তরফ থেকে প্রতিবাদের ঝড়ও উঠেছিল। বিশেষত নো-চেঞ্জার কংগ্রেসীদের তরফ থেকে প্রো-চেঞ্জ নেতার বিরুদ্ধে বিষোদগারের যেন একটা মহাসুযোগ জুটে গিয়েছিল। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দুসভা-ঘেঁষা একটা দল গড়ে ওঠার সূত্রপাত হয়েছিল, যে দল পরবর্তী কালে হিন্দুমহাসভার বাঁশিমত বিটিমে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং যখন কোকোনদ কংগ্রেসে দেশবন্ধু তাঁর হিন্দু মুসলমান চুক্তি মঞ্জুরীর জন্যে উপস্থাপিত করলেন, তখন সে মঞ্জুরী প্রত্যাখ্যাত হয়। মৌলানা মহম্মদ আলী বিরক্ত হয়ে বললেন, আজান আর সংকীর্তনই যদি হিন্দু মুসলমান মিলনের চেয়ে বড় ধর্ম হয়, তাহলে আমাদের এ দুশ্চেষ্টা ত্যাগ করাই ভাল।

জেলে মহাত্মাজীর অ্যাপেণ্ডিসাইটীস হয়েছিল এবং তাঁকে যারবেদা জেল থেকে পুণার সাশুন হাসপাতালে এনে অপারেশন করা হয়েছিল। এবং তিনি আরোগ্য হওয়ার পর গভর্ণমেন্ট তাকে মুক্তি দিয়েছিল। তাঁর মুক্তির পরই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কোহাটে এক প্রকাণ্ড দাঙ্গা হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের হাতে হিন্দুরা বহু সংখ্যায় হতাহত হয়। মহাত্মাজী আত্মশুদ্ধির জন্যে ২১ দিন অনশন করেন।

যাই হোক, এদিকে স্বরাজ্য পার্টি কাউন্সিলের সাধারণ সিট প্রায় সবগুলো দখল করেছিল, এবং কলকাতা কর্পোরেশনেও সব সিট দখল করেছিল। কাউন্সিলের নির্বাচনে দুটো কেন্দ্রে হয়েছিল সবচেয়ে বড় জয়। ব্যারাকপুরে সুরেন্দ্রনাথ পরাজিত হয়েছিলেন বিধান রায়ের কাছে এবং বড়বাজারে এস্. আর. দাশ পরাজিত হয়েছিলেন সাতকড়িপতি রায়ের

কাছে। এস. আর. দাশের তখনকার দিনে ৬০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল। তিনি দেশবন্ধুকে বলেছিলেন, তোমাদের স্বরাজ যেদিন হবে, সেদিন আমি বিলেতে পালাবো।

বিধান রায়কে নির্বাচনে নামিয়েছিলেন দেশবন্ধু স্বয়ং। তিনি প্রথমে তাঁকে বলেছিলেন, তুমি কংগেসের সদস্য (চার আনার) হয়ে যাও, আমরা তোমাকে ইলেকশনে দাঁড় করাই। বিধান বাবু কংগ্রেস সদস্য হতে রাজী হননি, ইলেকশনেও দাঁড়াতে চাননি। তারপর দেশবন্ধু বলেন, বেশ, কংগ্রেসের সদস্য না-ই হও, ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট প্রার্থী হয়ে দাঁড়াও, আমরা তোমাকে সমর্থন করবো। তাই শেষ পর্যন্ত হল, বিধান রায় জিতলেন এবং তার পরে কংগেসের সদস্য হলেন।

ময়মনসিংএ নলিনীরঞ্জন সরকারকেও ইলেকশনে নামিয়েছিলেন স্বয়ং দেশবন্ধু এবং তিনি পরাজিত করেছিলেন এস. এম. বোসকে। বিপ্লবীরা, বিশেষত যুগান্তর পার্টি এবং তার তখনকার নেতা সুরেন দা এই সব নির্বাচনে দেশবন্ধুর স্থায়ী হাতিয়াররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

অনুশীলন পার্টি কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর থেকেই দুই পার্টির মিলনের বচন পর্যবসিত হয়েছিল দুই পার্টির প্রতিযোগিতায়, এবং সে প্রতিযোগিতা ক্রমে রক্তারক্তিতে পর্যন্ত উঠেছিল। ঢাকা ছিল অনুশীলনের দুর্গ,—ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটি তাদের দখল করা চাই-ই,—অথচ সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত নেতা ছিলেন শ্রীশ চ্যাটার্জি, যিনি অনুশীলনের লোক নন এবং দুটো বছরের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যাঁর যুগান্তরের দাদাদের সঙ্গে, এবং বিশেষভাবে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। অনুশীলনের নেতা প্রতুল গাঙ্গুলী তাঁর ভগিনীপতি উকীল মনোরঞ্জন ব্যানার্জিকে শ্রীশ বাবুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেতৃত্ব দখল করতে খাড়া করেছিলেন। সে প্রতিযোগিতার মুখে একদিন শ্রীশ বাবুকে খুন করার ভয় দেখাতে এক ছোকরাকে রিভলবার দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু ঘটনা গড়ালো অন্য দিকে। ছোকরাকে রিভলবার সমেত ধরে শ্রীশ বাবু পুলসের হাতে দিলেন।

খবরটা যখন কলকাতায় এল, তখন দেশবন্ধু অনুশীলন পার্টির ওপর চটে আগুন হয়ে গেলেন, এবং যুগান্তরের দাদাদের তরফ থেকে জীবনকে পাঠানো হল ঢাকায়, এক দিকে শ্রীশ বাবুকে অভয় দেওয়ার জন্যে আর একদিকে প্রতুলবাবুকে জানিয়ে দেওয়ার জন্যে যে, শ্রীশ বাবুর ওপর আর কোন আক্রমণের চেষ্টা হলে যুগান্তর পার্টি সেটাকে নিজেদের ওপর আক্রমণ বলেই মনে করবে। তার পরে আর শ্রীশ বাবুর ওপর আক্রমণ হয় নি।

আর একদিকে চলছিল রিক্রুটিং-এর টানা-হেঁচড়া। আগে রিক্রুটিংয়ের প্রসেস্ ছিল এক একটি ছেলের পিছনে ছমাস ধরে লেগে থেকে তাদের ভারতমাতার দুঃখে কাতর হতে শেখানো, এবং কিছু বোমা পিস্তল যোগাড় করে ভবিষ্যতে একদিন ইংরেজগুলোকে মেরে তাড়াতে পারলেই যে ভারতমাতার শৃঙ্খল ঝন ঝন করে ভেঙে যাবে, পরাধীনতার বেদনার টনটনানি আর থাকবে না এবং স্বাধীনতার পতাকা পৎপৎ করে উড়বে, এই কথা কটা মুখস্থ করানো। কি করে কতদিনে কি হবে, সেটা দাদারা জানেন, ছেলেদের কাজ শুধু দাদাদের ইঙ্গিতে চলা, কারণ, তারাতো বিপ্লবের সেপাই মাত্র।

বোমা-বন্দুকের কাজকর্ম যখন সামনে কিছুই নেই, তখন হবু গ্যারিবল্ডীরা সহজেই কথা কটা শিখে ফেলতে এবং আওড়াতে শুরু করে দিত। এই সহজ রিক্রুটিংয়ের স্থলে

এক নতুন প্রসেস্ দেখা দিল, ছেলেগুলোর দুই কাণ দিয়ে দুই দলের নিন্দে ঢুকতে শুরু করলো। কিছু দিন টানাটানির মধ্যে দুই দলেরই সত্য মিথ্যা সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য নিন্দাগুলো শিখে ফেলে শেষ পর্যন্ত একটা দলে ভিড়ে গিয়ে ছেলেটা আর এক দলের নিন্দা প্রচার করে, এই দাঁড়ালো এ যুগের অনেক ভাল ভাল ছেলেরও পরিণতি। যাদের হাত ফসকে যায়, তারা বলে ছেলেটা পয়মাল।

প্রায় এই রকম টানাটানি সুভাষবাবুকে নিয়েও চলেছিল। তবে তিনি যেহেতু স্কুল পালানো স্কুলবয় নন, সুতরাং তাঁকে ভারত উদ্ধারের গুপ্তপ্রক্রিয়া শিক্ষা দিতে যাওয়া চলে না, আর কানে কানে অন্য দলের নিন্দেও চলে না। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে পদাঘাত, I C S চাকুরীর মাথের মস্তকে পদাঘাত, ছাত্র ও তরুণদের কাছে প্রচুর জনপ্রিয়তা, অর্থাৎ বোমা বন্দুক খুন ডাকাতির সম্পর্ক ছাড় সকল বিষয়েই তিনি নেতৃত্বের গুণসম্পন্ন। সুতরাং তাঁকে বিকৃত করার একমাত্র কায়দা হল গুণমুগ্ধ ভক্তের মতন "ফোলানো" কথা বলা। তাকে নিয়ে দুই বিপ্লবী দলে তারই প্রতিযোগিতা চলেছিল।

এদিকে গোপী সাহার ফাঁসীর পর একদল ছাত্র তার মৃতদেহ নিয়ে সৎকার করবে বলে দাবী করলে সুভাষবাবু তাদের নেতৃত্ব নিয়ে জেলগেটে গিয়ে হাজির হলেন। স্বরাজপার্টি উপলক্ষে তার যে বিপ্লবী দাদাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তা I Bর অজানা নয়। তারপর এই ঘটনায় তাঁর নাম I Bর খাতায় পাকা হয়ে গেল।

গোপী সাহার সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলেছিলেন, তার প্যাট্রিয়টিক মোটিভ থাকতে পারে, কিন্তু সে কাজটা করেছে অত্যন্ত গর্হিত। দেশবন্ধু বলেছিলেন, তার কাজটা ঠিক হয়নি বটে, কিন্তু তার দেশপ্রেমের তুলনা নেই। এই দুরকমের কথা নিয়ে অ্যালবার্ট হলের এক সভায় গোঁড়া চরম্প্রো-নচেঞ্জ দুই দলে প্রায় মারামারি হওয়ার যোগাড় হয়েছিল।

যাই হোক, স্বরাজ্যদল কর্পোরেশন দখল করার পর চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের পদ নিয়ে এক গণ্ডগোল সৃষ্টি হল। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে জয়ী হয়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছেন, তিনি চান, তাঁর কর্মশক্তি প্রমাণ করার বৃহত্তর ক্ষেত্র কর্পোরেশনের কর্মকর্তৃত্ব। দেশবন্ধু স্থির করলেন, তাঁকেই সে পদে বসাবেন

কিন্তু যে স্বরাজ্য পার্টির সাফল্যের জন্যে যুগান্তরের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়েছে, সেই স্বরাজ্যদলের হাতে কলকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব আসার পরেও সেই যুগান্তর দলের অর্থসমস্যার কোন সুরাহা হবে না, এ কেমন কথা? ঝানো শাসমলের গায়ে দাঁত বসানো অসম্ভব, সুতরাং সুরেন দা ঠিক করলেন কর্পোরেশনের কর্মকর্তা করতে হবে সুভাষ বাবুকে। তিনি সুভাষ বাবুকে বললেন। সুভাষ বাবু বললেন, তা কেমন করে হবে? দেশবন্ধু যে শাসমলকেই বসাতে চান।

তখন নাকি সুরেন দা বাসন্তীদেবীকে গিয়ে ধরলেন, এবং তাঁকে দিয়ে দেশবন্ধুকে বাগ মানিয়ে শাসমলের বদলে সুভাষ বাবুকে কর্পোরেশনের গদীতে বসাবার ব্যবস্থা করলেন। শাসমল বিপ্লবী দাদাদের ওপর এমন ক্ষেপে গেলেন যে '২৫ সালে (কৃষ্ণনগর) প্রাদেশিক কনফারেন্সে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে বললেন, এরা দেশের জন্যে ডাকাতি শুরু করে শেষ পর্যন্ত পেশাদার চোর ডাকাতে পরিণত হয়।

ঘটনা সব দেখে যাচ্ছিলুম। খাটছিলুম আর চিন্তা করছিলুম। ধ্যান-ধারণার মধ্যে একটা পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল, অনেক জিনিসই নতুন ভাবে দেখতে শুরু করেছিলুম। হিন্দু মুসলমান মিলন যে ধর্মের দোহাই দিয়ে হবার নয়, ববং দেশের শতকরা ৯৯ জন মানুষই শ্রমজীবী কৃষক-শ্রমিক বলে তাদের জীবনের বাস্তব অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে কৃষক-শ্রমিক সংগঠনের মধ্য দিয়েই দেশের শতকরা ৯৯ জন হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্ভব, এই সব কথা ধীরে ধীরে মনের মধ্যে শিকড় গাড়ছিল।

আর বিপ্লব? শতকরা ৯৯ জন শোষিত শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী সংগঠন, সেটাই কি বিপ্লবের সব চেয়ে বড় আয়োজন নয়? শোষণের অবসানের চেয়ে বিপ্লবের আর কি মহত্তর উদ্দেশ্যই বা থাকতে পারে? এ সব কথাও ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠছিল। কিন্তু তার অভ্যস্ত ধারা এবং বিপরীত যুক্তি তখনও মনের মধ্যে একটা বিরাট অস্পষ্ট হিজিবিজির মত ঘুরপাক খাচ্ছিল।

কর্পোরেশনের ফার্স্ট ডেপুটি এক্সিকিউটিভ অফিসার করা হয়েছিল নোয়াখালীর উকীল হাজি আবদুর রসিদ খাঁকে। নোয়াখালীর সত্যেন্দ্র মিত্র ছিলেন স্বরাজ পার্টির সেক্রেটারী। উপেনদার সহকর্মী আন্দামান ফেরৎ বিভূতি সরকারও একটা চাকরী পেয়েছিলেন, ট্যাক্স কালেক্টিং সরকার!

যাই হোক, চাকরী বণ্টনের এই সব বিশেষ বিশেষ নমুনা ছাড়াও, এমন একটা নমুনা ছিল, যার তুলনা হয় না। বিপ্লব যাদের লক্ষ্য, তারা অভ্যস্ত হয়ে যায় একা একা কানে কানে কথা বলতে। সকলে সব কথা জানতে পায় না, ভজাভজি নেই। এ অবস্থায় পাকা জুয়াচোরেরা সুযোগ নিতে চেষ্টা করলেই সফল হতে পারে। এই রকম এক জুয়াচোর মাঝে থেকে একটা বেশ বড় চাকরী বাগিয়ে নিয়েছিল।

তার কায়দাটা ছিল চমৎকার। একটা গরীব জুয়াচোরের সত্যিকারের দৃষ্টান্ত দিলেই কায়দাটা বুঝতে পারবেন।

এক ব্যবসায়ী গুদাম থেকে দোকানে এক গাড়ী (গরুর গাড়ী) মাল নিতে এসেছেন, সঙ্গে আর লোক নেই। রাস্তা থেকে একটা গাড়ী ডাকলেন গাড়োয়ান গাড়ীটা হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে, আর গাড়ীর পিছনটা ধরে একটা খোট্টা হেঁটে আসছে। গুদামের সামনে এসে মালিক বললেন, গাড়ী ঘুরাও। খোট্টাটাও বললে ঘুরাও। গাড়োয়ান মাল বোঝাই করে নিলে, খোট্টাটা তাকে সাহায্য করলে। মাল নিয়ে গাড়ী চললো। দোকানের ঠিকানা রাস্তা "পুস্তা" নিয়ে, খোট্টাটাও চললো।

গাড়ী দোকানে পৌছালো, খোট্টাটা সঙ্গে নেই। ভাড়া দেওয়া হল, গাড়োয়ান বললে, আউর দশ আনা? মালিক বললেন, কাহে? গাড়োয়ান বললে আপকা আদমী আপকা ওয়াস্তে মাঙ্গ লিয়া। মালিক অবাক।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, খোট্টাটা জুয়াচোর। সে এমন বেপরোয়াভাবে মালিক ও গাড়োয়ানের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল যে, গাড়োয়ান বরাবর তাকে মালিকের লোক মনে করেছে, আর মালিক মনে করেছেন, ও গাড়োয়ানের লোক। গাড়ী গুদাম ছেড়ে কিছু দূর আসতেই সে গাড়োয়ানকে বলেছে, তুমারা পাশ রুপেয়া হ্যায়?—একঠো দেওতো,

বাবুকা পাশ খুচরা রুপেয়া নেই হ্যায়, দুকানমে যাকে ভাড়াকা সাথ দিয়া যায়গা। গাড়োয়ান বলেছে, রুপেয়া নেই হ্যায়, দশ আনা পয়সা হ্যায়। সে বলেছে, আচ্ছা ওহি দেও। বলে সে দশ আনা পয়সা নিয়ে সরে পড়েছে।

এ জুয়াচোরটাও ঠিক ঐভাবে সুভাষবাবু ও সুরেনদার মাঝখানে ঢুকে পড়েছিল। কখনো বা সুরেনদা দেখেন সে সুভাষবাবুর সঙ্গে গম্ভীরভাবে কথা কইচে একা, তিনি বোঝেন, ও সুভাষবাবুর বন্ধুলোক, আবার কখনও বা সুভাষবাবু দেখেন সুরেনদার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ ভাব, তিনি মনে করেন সেও একজন বিপ্লবী, সুরেনদার দলের লোক। অথচ সে কোন কালেই না ছিল সুভাষবাবুর, না ছিল সুরেনদার দলের। সে পেয়েছিল উপেনদা'র চেয়ে বড় চাকরী!

যাই হোক, ছোটবড় চাকরী অনেকেই পেয়েছিল। চাকরী পাওয়ার আগে এবং চাকরী পাওয়ার পরে মানুষ একরকম থাকতে পারে না, যেমন এডওয়ার্ডস টনিক বা সুরবল্লী কষায় খাওয়ার আগে আর পরে মানুষ একরকম থাকতে পারে না। বড় চাকরী বন্টন মারফৎ দলের কিছু অর্থসংস্থানের আশা স্বাভাবিক, কিন্তু চাকরী বন্টনের পরে দেখা যায়, অনুগত অনুগৃহীত বিপ্লবের বন্ধু 'কালেভদ্রে" কিছু চাঁদা এবং মাঝে মাঝে কিছু চা-সিঙাড়া ছাড়া বিপ্লবের জন্যে আর কিছু ছাড়তে নারাজ। সবই দেখলুম এবং জ্ঞানলাভ করলুম। কিন্তু তখনও মুখ ফুটতে দেরী ছিল।

স্বরাজ্যদলেরও টাকার প্রয়োজন বেড়ে চলছিল। অর্থাগমের নতুন স্থায়ী পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। দেশে অনেক মঠ মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, যেগুলো লুটে খায় জুয়াচোর সেবাইৎ-মোহন্তের দল। সেগুলোকে পাবলিক ম্যানেজমেন্টের হাতে আনতে পারলে, এবং সেখানে নিজেরা বসতে পারলে অতিথিসেবাও নিয়মিত হতে পারে, প্রজাদের জন্যে নানাবিধ কল্যাণকার্যেরও ব্যবস্থা হতে পারে, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজ সংগ্রামের কিছু স্থায়ী অর্থসংস্থানও হতে পারে।

হাতের কাছে ছিল তারকেশ্বর মন্দির বিরাট আয়, অথচ মোহন্ত একটা দুশ্চরিত্র জমিদার ছাড়া আর কিছুই নয়। মোহন্তকে গদীচ্যুত করে ম্যানেজমেন্ট দখল করতে পারলে ঐ বিরাট আয় দেশের ও দলের কাজে লাগানো যায়। সুতরাং দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কংগ্রেসীরা প্রজাদের তরফ থেকে আন্দোলন শুরু করলে। ইতিপূর্বেই অসহযোগ আন্দোলনের এক বেওয়ারিশ" নেতা স্বামী বিশ্বানন্দ এবং "হঠাৎ স্বামী" সচ্চিদানন্দ (দুজনেই খোট্টা) স্থানীয় লোকদের সাহায্যে মন্দিরটা দখল করে বসেছিলেন। স্থানীয় লোকেরা মন্দিরের আশেপাশের রাস্তা জোড়া করে দিনরাত পালা করে বসে থাকে, মোহন্তের লোকেরা মন্দিরে ঢুকতেই পারে না। মন্দিরের দৈনন্দিন আয়টা স্বামীদের হস্তগত হয়েছে, মোহন্তের লোকদের সঙ্গে স্থানীয় লোকের গুঁতোগুতি চলছে, এবং যথাশাস্ত্র দুই "স্বামী"তেও ঠোকাঠুকি শুরু হয়েছে। বিশ্বানন্দ হটে গেছেন, সচ্চিদানন্দ মন্দিরের পাশেই আস্তানা গেড়েছেন প্রায় পাকাপোক্তভাবে।

কিন্তু আইনগত সমস্যা হচ্ছে মোহন্তকে গদীচ্যুত করে দেবোত্তর এবং বেনামী জমিদারী দখল করা। আবার আইনগত সমস্যা আরো জটিল করে তুলেছে ব্রাহ্মণ সভা (ভাটপাড়া)। তারা তারকেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার এক বংশধর খুঁজে বার করে তাকে

দিয়ে আদালতে নালিশ করিয়েছে, দুশ্চরিত্র মোহন্তকে গদীচ্যুত করে মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তির ম্যানেজমেন্টের ভার ব্রাহ্মণসভার হাতে দেওয়া হোক।

দেশবন্ধু সে মামলারও বাদী, মোহন্তরও বাদী, একটা ত্রিভুজাকার মামলা চলে। এ দিকে মোহন্তর বাড়ী দখলটা মন্দির দখলের পরবর্তী সমস্যা, তার জন্যে শুরু হল সত্যাগ্রহ। প্রথম দিন মিটিং করে বহু লোক জড়ো করে বেশ বড় একদল ভলান্টিয়ার মোহন্তর বাড়ীতে হানা দিলে। গেটে পুলিস পাহারাও বসলো। ভলান্টিয়াররা গ্রেপ্তার হল, খবরটা দেশময় ছড়িয়ে পড়লো। নানা স্থান থেকে ভলান্টিয়ার আসতে লাগলো। একটা ক্যাম্প তৈরী হল ভলান্টিয়ারদের থাকা খাওয়ার জন্যে। ক্যাম্পের চার্জে স্বরেনদা ময়মনসিং থেকে "নিজস্ব লোক" এক সতীশ চক্রবর্তীকে বসালেন। পরে এই সতীশ চক্রবর্তী কর্পোরেশনের একটা বড় চাকরী পেয়েছিলেন স্বরেনদা ও নলিনী সরকারের সুপারিশে।

প্রথম উত্তেজনা যথাশীঘ্র মিইয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভলান্টিয়ারও কমতে লাগলো। নতুন উত্তেজনা সৃষ্টির জন্যে প্ল্যান হল, স্বামী সচ্চিদানন্দকে সত্যাগ্রহ করে জেলে যাওয়াতে হবে, তাতে এক ঢিলে দুই পাখী মরবে, সচ্চিদানন্দকে মন্দির থেকে হঠানো হবে। কিন্তু সে কিছুতেই নড়তে চায় না। অবশেষে একদিন স্বয়ং দেশবন্ধু এলেন তাঁর কাছে প্রস্তাব নিয়ে। দেশবন্ধু আসছেন শুনে বিরাট ভিড় হল মন্দিরের কাছে, দেশবন্ধু সেই ভিড়ের সামনে সচ্চিদানন্দের পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন, লোকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

তারপর ঘরের ভেতরে সচ্চিদানন্দকে ডেকে নিয়ে দেশবন্ধু রুদ্রমূর্তি ধরে বললেন, মোহন্ত হবার সখ হয়েছে? কাল যদি সত্যাগ্রহ করে জেলে না যাও, তা হলে—ইত্যাদি।

সঙ্গে সঙ্গে কাগজে খবর বেরিয়ে গেল, স্বামী সচ্চিদানন্দ কাল সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করবেন। এই সুচিকাভরণ চিকিৎসার ফলে আর কিছু ভলান্টিয়ার এল, কিন্তু সে যেন নিদানের ঔষধ, প্রদীপ নিভবার আগে একবার জ্বলে ওঠার মতন। সুতরাং তখন দেশের নানা দিকে দলের লোক পাঠিয়ে ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করে আনার প্ল্যান হল। আমাকে পাঠানো হল বিক্রমপুরে—আমি সেখানে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঘুরে জন ২০ ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করে নিয়ে এলুম।

এই সব হাঙ্গামার মধ্যে মধ্যে কর্পোরেশনের কাজ আছে, আর তার ওপরে আছে কাউন্সিলের কাজ। নতুন শাসন-সংস্কারে ব্যবস্থা হয়েছিল, মন্ত্রীদের বেতন কাউন্সিলের ভোটে পাশ করাতে হবে। বৈধ বিধিব্যবস্থার এইখানে একটু ফাঁক, একটু দুর্বলতা আবিষ্কার করে দেশবন্ধু এইখানেই আঘাত হানার ব্যবস্থা করছিলেন। মন্ত্রীদের বেতন বছরে ৬৪০০০৲ টাকা নির্ধারণ করে সরকার কাউন্সিলে এক বিল উপস্থাপিত করলেন। স্বরাজ পার্টি তার এক সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন, মন্ত্রীদের বেতন বছরে এক টাকা।

সাধারণ ছাড়াও যে সব বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী ছিল, তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেকে দেশবন্ধুর খাতিরে এবং অনুরোধে স্বরাজদলের দিকে ভোট দিলেন, স্বরাজ্যদলের সংশোধন প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। ব্যাপারটাকে মন্ত্রীদের প্রতি কাউন্সিলের অনাস্থার সামিল বলে গণ্য করা হল, মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলেন। স্বরাজ পার্টির জয়জয়কারে দেশ উদ্বেল হয়ে উঠলো।

এদিকে মহাত্মাজী অবস্থা বুঝে ঘোষণা করলেন, বর্তমান অবস্থায় স্বরাজ পার্টির কর্মসূচীই কংগ্রেসের কর্মসূচী বলে গৃহীত হওয়া কর্তব্য। তিনি নিজে তখনকার মত কংগ্রেস নেতৃত্ব স্বরাজ পার্টির হাতে দিয়ে সরে গিয়ে অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে তাঁর ভক্তবাহিনী নিয়ে চরকা-খদ্দরের কাজেই আত্মনিয়োগ করলেন।

ওদিকে শ্রমিক আন্দোলন এগিয়ে চলেছিল গান্ধী কংগ্রেসের মোহ কাটিয়ে নিজেদের বিশেষ পথে, এবং তার মধ্যে জঙ্গীভাব এবং বলশেভিকবাদের প্রচার বেড়ে চলছিল। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের (কমিউনিষ্ট—মস্কো) প্রেসিডিয়ামের সদস্য এম. এন. রায়ের যোগাযোগে বাংলায় মোজাফ্ফর আহমদ প্রভৃতি ক্রমশ ধীরে ধীরে বলশেভিকবাদের আদর্শ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করছিলেন, যেমন বম্বেতে ড্যাঙ্গে, মাদ্রাজে শিঙ্গারাভেলু প্রভৃতি।

'২০ সালের আগে শ্রমিক আন্দোলন ছিল প্রধানত শ্রমিকদের মধ্যে জনকল্যাণের কাজ, সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন ছিল নাম মাত্র। '২০ সালে লালা লাজপৎ রায়কে সভাপতি করে প্রথম এক সভায় সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের চেষ্টা হয়। তার পর অসহযোগ আন্দোলনের হুড়োহুড়ি থামলে '২২ সালে দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে প্রথম সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ইউনিয়নের সংখ্যাও নিতান্ত কম, এবং অতি অল্প-শ্রমিকই তাতে সংঘবদ্ধ ছিল। কিন্তু আন্দোলন তাড়াতাড়ি বেড়ে চলছিল, এবং সরকারের নির্বোধ নির্যাতন-নীতির ফল বিপরীত হয়ে শ্রমিক সংঘগুলো ক্রমে সুসম্বদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠছিল।

এর এক চমৎকার দৃষ্টান্ত হচ্ছে বম্বের গিরনি কামগর ইউনিয়ন। একবার ধর্মঘট হল, সরকারী সাহায্যে এক পাঠান শ্রমিক বাহিনী রিক্রুট করে লাগিয়ে দেওয়া হল ধর্মঘট ভাঙতে। ফলে বম্বে সহরে লাগলো এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কিন্তু গিরনি কামগর ইউনিয়ন হয়ে উঠলো সবচেয়ে বড ও শক্তিশালী ইউনিয়ন। তার নেতাদের অন্যতম ছিলেন মিরাজকর।

যাই হোক, বলশেভিকবাদের প্রচার অঙ্কুরে বিনাশ করার জন্যে সরকার '২৪ সালে কানপুরে এক বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করলেন। বলশেভিক এজেন্ট বলে আটজনের নামে মামলা হয়েছিল। তার ১ নম্বর আসামী এম. এন. রায় দেশে ছিলেন না বলে তাঁকে হাজির করা যায় নি। মাদ্রাজের শিঙ্গারাভেলুর স্বাস্থ্যের অজুহাতে তাঁকেও হাজির করা হয়নি। লোকে বলে তিনি নাকে খৎ দিয়ে রেহাই পেয়েছিলেন। পাঞ্জাবের এক প্রোফেসর, গোলাম হোসেন বা ঐ রকম কি নাম, তিনি নাকি স্বীকারোক্তি করে বলেছিলেন, "পার্টির জন্যে প্রেস করবো বলে এম. এন. রায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে মেরে দিয়ে আমি নিজের নামে প্রেস করেছি, সরকারের তো আমাকে ধন্যবাদ দেওয়াই উচিত।"

শেষ পর্যন্ত মামলায় মোজাফ্ফর আহম্মদ, নলিনী গুপ্ত, ড্যাঙ্গে এবং সওকৎ ওসমানী এই চারজনের কারাদণ্ড হয়। বলশেভিকবাদ প্রচার কিছু দিনের জন্যে থমকে যায়।

এদিকে নূতন মন্ত্রী নিয়োগ করে গভর্ণমেণ্ট তাঁদের ৬৪০০০ টাকা বেতনের বিল দ্বিতীয়বার কাউন্সিলে পাশ করাতে চেষ্টা করে, এবং সেবারও পরাজিত হয় এবং স্বরাজ পার্টির সংশোধনী প্রস্তাব ১ টাকা বেতন পাশ হয়।

এ হল '২৪ সালের ২৬ শে আগষ্টের কথা।

বোমা-বন্দুকের মত বিপজ্জনক রাজনীতি ও গুপ্ত সমিতির আমলে রেওয়াজ ছিল, একজন বিপ্লবীর কাছে একজন তৃতীয় অপরিচিত ব্যক্তিকে "আমাদের লোক" বলে সুপারিশ করলেই সে ঐ তৃতীয় অপরিচিত ব্যক্তিকে পরম আত্মীয় জ্ঞানে অবাধে বিশ্বাস করে। সে যুগে সেটা ছিল এক অপরিহার্য ব্যবস্থা, এবং তাতে কোন ক্ষতিও হত না, কারণ লঘুভাবে কেউ কাউকে সুপারিশ করতে পারতো না সে যুগে।

কিন্তু যখন বোমা-বন্দুকের মতন বিপজ্জনক ব্যাপার কিছুই নেই, অথচ সে যুগের রেওয়াজটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তখন অত্যন্ত লঘু ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবেই, এমন কি দাদারাও অনেককে "আমাদের লোক" বলে চালাতেন। নিত্য নূতন "আমাদের লোক" দেখা যেত, এবং বিশ্বাসও করা হত লঘুভাবেই। ফলে জুয়াচোর বা গুপ্তচরদের নিশ্চয়ই খুব সুবিধে হয়েছিল। বস্তুত গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে সকল দাদাই বুঝতেন যে সরকার আমাদের দলের ভিতরকার কথা, খুঁটিনাটি কথাও, প্রায় সবই জানে। সম্ভবত আনন্দবাবুর বোর্ডিংয়েরও সকল কথা তারা জানতো।

একদিন সারা ছাদ জুড়ে অনেকেই শুয়ে আছি, হঠাৎ সিঁড়িতে দুপদাপ শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ চাইতেই টর্চের আলোতে চোখ ধেঁধে গেল। ছাদ ভরে গিজগিজ করছে পুলিশ, আরো আসছে। বুঝলুম, আপাততঃ লীলা সাঙ্গ হল।

সমগ্র বাড়ীটা তন্ন তন্ন করে সার্চ হল। তারপর কয়েকজনকে নিয়ে গিয়ে তুললে গাড়ীতে—আমাকেও। সারদাকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, অবস্থা বুঝে যা ভাল মনে কর, অসঙ্কোচে করো।

সে হচ্ছে '২৪ সালের ২৫শে অক্টোবরের সকাল। একবার ইলিসিয়াম রো দেখিয়ে কাগজপত্র ঠিকঠাক করে আমাদের নিয়ে গিয়ে তুললে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। সেখানেই প্রথম দেখলুম আমাদের ওয়ারেন্ট রেগুলেসন থ্রি অনুসারে অর্থাৎ ষ্টেট প্রিজনার —ভারত সরকারের বন্দী। ঐদিন এক অর্ডিন্যান্স জারী হয়েছিল, এবং সারা বাংলায় খানাতল্লাসী করে প্রায় দুশো জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কলকাতা এলাকার অর্ডিন্যান্স প্রিজনারদের নিয়ে গিয়েছিল প্রেসিডেন্সি জেলে।

সেনট্রাল জেলে ষ্টেট ইয়ার্ড বা সিগ্রিগেশন ইয়ার্ডে আমাদের তুললে। দেখলুম, আমরা ১৮ জন জমেছি—সুভাষবাবু এসেছেন, অনিলবরণ রায়ও এসেছেন।

কিন্তু মজা হল, আমাদের ওয়ারেন্টের তারিখ ২৭শে আগষ্ট। অর্থাৎ ২৬শে আগষ্ট দ্বিতীয়বার মন্ত্রীদের বেতন ব্যাপারে সরকারের পরাজয়ে যেন ক্ষেপে গিয়ে ২৭শে আগষ্ট ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয়েছিল, কিন্তু তখন গ্রেপ্তার করা হয়নি, কারণ তাতে স্পষ্ট বোঝা যেত স্বরাজ পার্টিই আক্রমণের আসল লক্ষ্য। পরে অর্ডিন্যান্স জারি ও গ্রেপ্তারের সঙ্গে ২৫শে অক্টোবর আমাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

লর্ড লিটন মালদহে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, বাংলার দুটো প্রধান বিপ্লবী দল সারা দেশ জুড়ে বিপ্লবী দল গড়ছিল, একটা দল অবিলম্বে কিছু করার পক্ষপাতী, আর একটা দল আরো প্রস্তুতির পক্ষপাতী।

দেশবন্ধু কাউন্সিলে বক্তৃতায় দেখিয়ে দিয়েছিলেন, স্বরাজপার্টিই আক্রমণের লক্ষ্য—

স্বরাজপার্টির কাছে ভোটে পরাজিত হয়ে ক্ষেপে গিয়েই সরকার স্বরাজপার্টির ভাল ভাল কর্মীকে (best workers) গ্রেপ্তার করেছে।

ষ্টেট ইয়ার্ডের পাশে ছিল বক্স ইয়ার্ড (পরে যেখানে দক্ষিণেশ্বর মামলার আসামীরা থাকতেন)—সেখানে তখন আছেন আন্দামান ফেরৎ যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত শিবপুর ডাকাতি মামলার নরেন ঘোষ চৌধুরী, ভূপেন ঘোষ, সানুকুল চ্যাটার্জি এবং রাজাবাজার বোমার মামলার অমৃতলাল হাজরা (শশাঙ্ক বাবু) প্রভৃতি। ভূপেন ঘোষ ছিলেন সর্বপ্রকারের রান্নায় ওস্তাদ। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা প্রথমে তাঁর সঙ্গে করা হল, আমাদের মোট food allowance এর টাকা হিসেব করে তিনি বাজারের ফর্দ করে দেবেন এবং মালের ভাণ্ডার এবং রান্নার ব্যবস্থা তাঁর হাতেই থাকবে।

কিন্তু প্রথম দিনই আমাদের সত্যেনদা (মিত্র) দইয়ের পরিমাণ কম হয়েছে বলে রেগে টেবিল চাপড়ে চীৎকার করে এক কাণ্ড বাধালেন, ডেপুটী জেলার বাবুকে ডাকিয়ে হিসেব চাইলেন, ১৮ জনের খোরাকী কত? ইত্যাদি। তিনি লজ্জায় জড়সড় হলেন,—আমরাও অনেকেই লুকিয়ে লজ্জা ঢাকলুম, আর বেচারী ভূপেন বাবু কাতরভাবে কৈফিয়ৎ দিলেন, রাত্রে তিনি ভালো কিছু খাওয়াবেন বলে মাল মজুত রেখেছেন, সকালে তাড়াতাড়ির জন্যে সেটা করে উঠতে পারেন নি।

যাই হোক, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা পরিবর্তন করে ষ্টেট ইয়ার্ডেই নিজেদের তত্ত্বাবধানে কয়েদীদের দ্বারা রান্না করানোর ব্যবস্থাই হয়ে গেল। এ সব কূট কৌশল জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংগ্রামাদি ব্যাপারে অভিজ্ঞ ঘাঘী বিপ্লবীদের এলাকা, সুভাষবাবু বা অনিলবরণ বাবু এসব ব্যাপারে অনভিজ্ঞ, সুতরাং তাঁরা 'থ' হয়ে গেলেন, চুপ করে সব দেখলেন।

সুভাষবাবুর যে বিপ্লবীদের খাতায় নাম উঠেছে, দাদারা তাতে সন্তুষ্ট হয়েছেন। অনিলবরণ লোভনীয় নয়, কারণ তাঁর গান্ধী ভক্তি বাগ মানবে না, সকলেই বুঝতেন। বস্তুত বিপ্লবীদের সঙ্গে আটক থেকে তাঁর মন এমন হাঁপিয়ে উঠেছিল যে, পরে মুক্তি পেয়েই তিনি পণ্ডিচেরীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

যাই হোক, এর পর এল ভাতা স্থির করার পালা। আইনানুসারে ভাতা নির্ধারিত হবে according to rank and station in life. সুভাষবাবু I. C. S., সত্যেনদা সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলির সদস্য, অনিলবরণ বাংলা কাউন্সিলের সদস্য—এঁরা বিশেষ, এবং বাকি সকলে সাধারণ।

গভর্ণমেণ্ট অনিলবাবুকে সাধারণ ভাতার চেয়ে কিছু বেশী দেওয়ার প্রস্তাব করলে তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, আমি এখানে এম. এল. সি. হিসেবে আসিনি, অতএব সাধারণ ভাতাই নোব। সত্যেনদা এম. এল. এ. হিসেবে দৈনিক ১০ টাকা হিসাবে ভাতা দাবী করে দরখাস্ত করলেন, সরকার সেটা নামঞ্জুর করলেন। তখন রণনীতির পরিবর্তন করে সত্যেনদা লিখলেন, শুধু এম. এল. এ. বলেই নয়, তাঁর বহুমূত্র রোগের লক্ষণ আছে, সুতরাং আহারাদি সম্বন্ধে সাবধানতা প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত সরকার "মেডিক্যাল গ্রাউণ্ড" বলে তাঁর ১০ টাকা দৈনিক ভাতাই মঞ্জুর করলেন।

পরে তাঁর আর একটা নতুন দাবী এল, সেটা নিয়ে দাদামহলে প্রথমে বিস্ময়, ও পরে চাপা হাস্যকৌতুকের গুঞ্জরণ চললো। সে হচ্ছে তাঁর স্ত্রী-কন্যার জন্য ভাতার দাবী। সবাই

জানতেন, তিনি অবিবাহিত। এই প্রথম শুনলেন তাঁর স্ত্রী-কন্যা বর্তমান। সরকার জবাব দিলেন, তাঁরা অনুসন্ধান করে দেখেছেন, তাঁর স্ত্রী-কন্যা নেই, তিনি বিবাহ করেছেন বলেই কোন প্রমাণ নেই। দাদা বললেন, বৌদির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল কাশীতে, দেশবন্ধুর উপস্থিতিতে। কোন বিশেষ কারণে তিনি সে বিবাহের কথা গোপন রেখেছিলেন। যাই হোক, পরে বৌদির ভাতাও মঞ্জুর হয়েছিল।

তারপর সুভাষবাবুর কথা। তিনি I. C. S. এবং কর্পোরেশনের চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসার, সুতরাং তাঁর standard of living ইউরোপীয়ানদের মতন, এই যুক্তিতে তাঁর আহারাদির ভাতা সরকার স্থির করলেন মাসিক ২০০ টাকা। তিনি স্থির করলেন, ইউরোপীয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড তিনি স্বীকার করবেন না, এবং ঐ ভাতা প্রত্যাখ্যান করবেন।

সুরেনদা প্রভৃতি তাঁকে বোঝাতে লাগলেন, এ ভাতা তাঁকে নিতেই হবে। কারণ এবার জেল থেকে বেরোবার পর তাঁকে যুগান্তর দলের অল-ইণ্ডিয়া প্রতিনিধি, পাবলিক ফিল্ডের নেতা হিসাবে কাজ করতে হবে, সুতরাং তাঁর স্থান যে সবার উপরে, সেটা দেখতে ও ভাবতে লোকের অভ্যস্ত হওয়া দরকার, এবং উঁচু ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও বেশী ভাতার হিপ্‌নোটিক এফেক্ট তাতে সাহায্য করবে।

একসঙ্গে একটা বিপ্লবী দলের নেতা বলে পরিচিত হওয়া, হঠাৎ ডবল প্রোমোশন, এ অবস্থায় লোকের মাথা ঘুরে যাওয়ারই কথা, বিশেষত তখনও সুভাষবাবুর মাথাটা খুব পাকেনি। তিনি ভাতা প্রত্যাখ্যান করবার মতলব ছেড়ে দিলেন।

যাই হোক, আমরা ছয়দিন আলিপুর সেনট্রাল জেলে থাকার পর বদলীর অডার এল। সুভাষবাবু, অনিলবরণ বাবু প্রভৃতি কয়েকজন চললেন বহরমপুর জেলে। অমুকুলদা, গিরীনদা এবং অংশু ব্যানার্জি চললেন মেদিনীপুরে এবং আমি, বঙ্কিম ব্যানার্জি এবং গণেশ ঘোষ বাকুড়ায়। আবার কোন্ নতুন অভিজ্ঞতা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, কে জানে।

বারো

আলিপুর সেনট্রাল জেলের প্রথম ছ'দিনের যে অভিজ্ঞতা সম্বল করে বাঁকুড়ায় চললুম, সেটা নেহাৎ তুচ্ছ নয়।

যেদিন প্রথম সেনট্রাল জেলে প্রবেশ করলুম সেই দিনই জেল কর্তৃপক্ষ যেন আমাদের প্রত্যেকেরই এক একটি সংসার সাজিয়ে দিলে। এটা মনে রাখা দরকার, '১৬ থেকে ২০ সাল এবং '২৩ ২৪ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত নানা যন্ত্রণা ভোগ এবং অবিরাম মরণবাঁচন লড়াই করে রাজবন্দীরাই সরকারকে বাধ্য করেছিল রাজবন্দীদের জন্যে একটা নির্দিষ্ট মানের সুখসুবিধার ব্যবস্থা করতে।

প্রত্যেকের জন্য একখানা লোহার খাট, চটের গদি ও কম্বল ছাড়া তোষক, চাদর ও বালিশ এল, একখানি ছোট প্লেন টেবিল চেয়ার এবং একটি লকার (ছোট্ট আলমারি) দেওয়া হল, কাপড়, জামা-জুতা, সেভিংসেট, টুথপেষ্ট ও ব্রাস থালা-বাটি-গ্লাস এবং এ ছাড়া

কারো ট্রাঙ্ক, কারো সুটকেস ফরমাস অনুযায়ী এসে গেল। এই initial expenses বাবদ বছরে ২৫০ টাকা নির্দিষ্ট ছিল। তা ছাড়া পড়াশুনা, খেলাধুলা এবং কুচাকাচা জিনিসের প্রয়োজনে পৃথক মাসিক ভাতাও নির্দিষ্ট। আর খাই খরচের সাধারণ ভাতা দৈনিক ১।০, কোন জেলে বা ১৵০, আবার কোথাও বা ১॥৵০ পর্যন্ত।

প্রথম কয়েকটা দিনের বিচিত্র ঘটনার হুড়োহুড়িতে ভাববার অবসর ছিল না, পরে ধীরে সুস্থে বাইরের জীবনের সঙ্গে এই নতুন পরিবর্তনগুলোকে মিলিয়ে দেখে বেশ খানিক রোমাঞ্চ অনুভব করলুম, যেন পদোন্নতি হয়েছে।

বাবুয়ানির নাম গন্ধ বিধাতা পুরুষ আমার কপালে লেখেন নি। শনেরগুণে টাকাই তো নিজের হাতে ফুঁকেছি, কিন্তু একটা দামী সাবান, এক শিশি এসেন্স কখনো ব্যবহার করিনি, পাঞ্জাবী ছাপা সবচেয়ে সস্তার টিকিট ছাড়া কখনো বায়োস্কোপ থিয়েটার দেখিনি। যখন একটু বাবুয়ানি করবার বয়েস এবং অবস্থা, তখনই এল নন-কোঅপারেশন আন্দোলনে godly হতে মুখে চাপদাড়ি গজিয়েছে, পিওর খদ্দরের পোষাক এবং নাগরা বা স্যাণ্ডেল সজ্জা, plain living and high thinking এর যুগ।

যাই হোক, মেদিনীপুরবাসী অনুকূল দা, গিরিনদা এবং অংশুদাদু (শশাঙ্ক) আর বাঁকুড়াগামী আমি, বঙ্কিম আর দিনেশ ঘোষ একসঙ্গে হাওড়া স্টেশনে এলুম, সঙ্গে নেওয়া হল ট্রাঙ্ক, বিছানা ও জিনিসপত্র। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার পৃথক escort, একজন করে ইউরোপীয়ান officer ও ৪ জন করে armed police, হাওড়ায় কিছুক্ষণ একসঙ্গে থাকার পর পৃথক হলুম, যেন নতুন পৃথক সংসার ঘাড়ে পড়ে। আমারই, কারণ আমিই বয়োজ্যেষ্ঠ।

বিকালে খড়্গপুরে নামলুম, রাত্রে অন্য গাড়ীতে বাঁকুড়া যেতে হবে। পথে আমাদের খাওয়ার বরাদ্দ কত তাও জানি না, officer বেটা সব হাতিয়ে রেখেছে। আমাদের চা ও খেতে দেয় না দেখে তাগাদা করতে হল। কিছু ব্যবস্থা হল সন্ধ্যার সময়। officer-এর মুখে মদের গন্ধ টের পাওয়া গেল—বেটার কিছু উপরি পাওনা হয়েছে।

গাড়ীর অনেক দেরী দেখে তাস নিয়ে বসা গেল, এবং খাপ চেপে officer বেটাকে নিয়েই ব্রীজ খেলে সময় কাটানো হল। রাত্রের খাবার সময় পার হয়ে গেছে, ক্ষিধে পেয়েছে, বাটাকে বললুম। সে বলে এখানে খানার কোন ব্যবস্থা নেই। একটু ইতস্তত করে শেষে বললুম, দেখছি তোমার নামে রিপোর্টই করতে হবে, তোমার profit করা বেরিয়ে যাবে। বেটা গজ গজ করতে করতে চলে গেল, খাওয়ার ব্যবস্থা হল। ফাইটের হাতেখড়িও হয়ে গেল, লজ্জারও আড় ভাঙলো।

সকালে বাঁকুড়ায় পৌঁছে জেলে প্রবেশ করলুম। গেটের অফিসে নাম ধাম লেখা হল, জিনিসপত্র তল্লাসী করে ছাড়া হল, আমাদের ওজন নেওয়া হল, তার পর চললুম ডেরায়। সেটা ফিমেল ইয়ার্ড, মেয়ে কয়েদী ছিল না বলে আমাদের জায়গা করা হয়েছে সেখানেই।

আমাদের ঘরটার মধ্যে দু' সারিতে অনেকগুলো মাটির বেদী ছিল,—কয়েদীদের শোওয়ার জায়গা। তার চারটে রেখে বাকিগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, ঐ ঢিবি চারটেকে নিকিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে আমাদের জিনিসপত্র রাখবার জন্যে, এবং ঘরের আর একদিকে

আমাদের জন্যে লোহার খাট, টেবিল প্রভৃতি আনা হয়েছে। আমাদের সঙ্গে ঘরে থাকবে একজন "ফাংতু"—কয়েদী attendant, সে সেখান থেকে কখনও বাইরে যেতে পারবে না। বাইরে থেকে আমাদের ঘরে যে সব কয়েদীরা জল বা খানা নিয়ে আসবে, ধোপা বা নাপিত আসবে, সকালে একবার ডাক্তার আসবে, একবার সদলবলে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আসবে, তাদের দরজা খুলে দেওয়ার জন্যে একজন warder সর্বদা মোতায়েন থাকবে বন্ধ দরজার বাইরে। ঘরটার অপরদিকের দরজা দিয়ে একটা ছোট্ট ঘেরা কম্পাউণ্ডের মধ্যে পায়খানা, সেই কম্পাউণ্ডের পিছনের দরজা দিয়ে মেথর যাতায়াত করবে, তারও সঙ্গের পাহারা সে দরজা খুলবে এবং বন্ধ করবে। সকালে ও বিকেলে দুবার সামনের দরজার পাহারা ওয়ার্ডার আমাদের বাইরের কম্পাউণ্ডের মাঠে বেড়াতে কিংবা Badminton খেলতে নিয়ে যাবে, দরজায় তালাবন্ধ থাকবে, ফাংতু ওয়ার্ডার আমাদের সঙ্গে থাকবে এবং ফিরিয়ে এনে আবার তালাবন্ধ করবে। অদ্ভুত জীবন, কতদিন চলবে কে জানে।

জেলার জ্যোতির্ময় বসু সেকেলে ডাকসাইটে ঝুঁদে জেলার, পাঁড় মাতাল এবং জেলখানার মধ্যে সবচেয়ে বড চোর।

২।১ দিনের মধ্যেই তিনি আমাদের গরম জামা নেই দেখে গায়ের মাপ নেওয়ালেন, বললেন এখানে ভয়ঙ্কর শীত পড়ে, গরম জামা না হলে চলে? তারপর ২।১ দিনের মধ্যেই জামা নিয়ে এলেন, খেরো পট্টুর half-lining দেওয়া জামা, দেখে গা জ্বলে গেল। ওর চেয়ে গরম জামা না থাকাও ঢের ভাল। কিন্তু ঝানু অমায়িক বচনের কাছে হার মানতে হল। বুঝলুম, ডবল দামের বিল দিয়ে অনেকগুলো টাকা মারবে। ছেলেমানুষ পেয়ে ভোগা দিয়ে আরো কত মারবে, কে জানে।

মাঝে মাঝে তিনজনেই তাস নিয়ে বসি. আর পৃথকভাবে আমি একটু পড়াশুনার চেষ্টা করি। রঞ্জিত ফালতু আশুকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার মতন ভাবে গল্প করে কাটায়। বিষ্ণুপুরে রেল থেকে নেমে সিংহডের আশু নাপিত বললেই সবাই চিনবে। সে অমাবস্যার রাতে কাগের ঠ্যাং এনে দিলে তালা খুলে দিতে পারে এমন গুণীন। রঞ্জিত গদগদ হয়ে শোনে। আর গণেশ যেন একটা দুরন্ত স্কুল পালানো ছেলে, একটা না একটা হুড়োহুড়ি নিয়েই আছে।

আমাদের ঘরটার মতন ঘর বোধ হয় কোনো জেলে আর একটা নেই। ঘরটা খুব পুরানো—জেল তৈরী হওয়ার আগেকার। পিছন দিকের প্রকাণ্ড দরজাটা এবং জানালাটা পুরানো সেকেলে—জানালাটাতে খড়খড়ি লাগানো এবং দুটোরই ফ্রেম কাঠের। দরজার ফ্রেমটা ৮ ইঞ্চি × ৬ ইঞ্চি মোটা বীম দিয়ে তৈরী, তাতে লাগানো আছে প্রকাণ্ড দুটো কাঠের পাল্লা। সেই কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে জেলের মোটা গরাদেওয়ালা একটা প্রকাণ্ড দরজা গেঁথে দেওয়া হয়েছে। বাইরে থেকে তার হুড়কো (লোহার) বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয় রাত্রে। রাতের প্রয়োজনের জন্যে ঘরের এক কোণে দুটো টুকরী থাকে। লোহার হুড়কোটা যে হুকে আটকে তালা ঝোলানো হয়, সে হুকটা মোটা মোটা ইস্ক্রুপ দিয়ে দরজার কাঠের ফ্রেমের একদিকে আঁটা।

একদিন দেখি, গণেশ লোহার খাটের ডাণ্ডা ছত্রীর একটা ডাণ্ডা খুলে নিয়ে জানালার ছিটকিনি আটকাবার হুকের মধ্যে গলিয়ে চাড় দিয়ে ভাঙছে। বললে, দেখুন

না, কি করি। হুকটাকে খুলে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করে পিটিয়ে সোজা একটুকরো লোহার পাত করে নিয়ে তার একটা ধার পিছনের সিঁড়ির ধাপে জল দিয়ে ঘষতে শুরু করে দিলে। বলে, দেখুন না, শালাকে ইস্ক্রুপ ড্রাইভার করে দরজার হুড়কোর ইস্ক্রুপ খুলবো। সে অসীম ধৈর্য্যসহকারে ঘষে, আমরা বলি, একটু ঠাণ্ডা আছে, থাক্ ঐ নিয়ে।

একদিন দেখি রাত্রে পিছনের দরজায় তালা লাগানোর পর সে হ্যারিকেন থেকে একটা পালকে করে তেল নিয়ে ইস্ক্রুপগুলোকে ভিজিয়ে তার ইস্ক্রুপ ড্রাইভার চালাতে শুরু করেছে গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে। কয়েক ঘণ্ট খেটে শেষে একটু ধুলো দিয়ে ইস্ক্রুপের তেল ঢাকা দিয়ে দিলে। এমনি চললো দিনের পর দিন।

দুটো মাটির ঢিবির মাঝের গলিতে মেঝেয় বিছানা করে আশু শোয়। তার কয়েদী-খানা সেলের কিচেন থেকে আসে, আমাদের রান্না হয় হাসপাতালে। আমাদের খানার কিছু ভাগও আশু পায়। সে বেশ খুশীই আছে। কিন্তু গণেশের কাণ্ড তাকে লুকিয়েই করতে হয়।

একদিন রাত্রে আমাদের খাওয়াদাওয়ার পর আশুকে খাইয়ে শুইয়ে গণেশ দরজা নিয়ে পড়েছে। আশু একটু টের পেয়েছে যে বাবুরা দরজার কাছে কি যেন করে। সে উঁকি মেরে দেখার জন্যে ঘুমিয়ে পড়ার ভাণ করে পড়ে থাকে। একটু মাথা তুললেই দেখতে পায় রঞ্জিত সামনে বসে আছে। সেদিন কিন্তু ঘটনাটা হল একটু অন্যরকম। গণেশ আমাদের ডাকলে, আশু ঘুমিয়েছে দেখে আমরা উঠে গেলুম। ইস্ক্রুপ ঘুরেছে, খুলে গেছে। কিন্তু হুড়কোর মাথাটা পাশের দেওয়ালে এমন ঠেসে ঢুকেছে যে তাতেই দরজাটা খোলা যাচ্ছে না। কাজেই দেওয়ালের বালি কুরে কুরে একটা নালার মত করা হল, দরজাও খুললো।

ইতিমধ্যে রঞ্জিত আশুকে নিয়ে একদিন এক কাণ্ড বাধিয়েছিল। আমরা যে মাঠে খেলতে যাই সেখানে একটা বড় বেলগাছ ছিল এবং তার গোড়াটা মাটি দিয়ে বাঁধিয়ে একটা বেদীর মত করা ছিল। একদিন সেটাকে একটু গোবরমাটি দিয়ে নিকিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে, আশুকে দিয়েই। আশু জিজ্ঞাসা করেছে, ওখানে কি হবে? রঞ্জিত বলেছে, আসছে অমাবস্যায় আমরা ওখানে কালীপূজো করবো, আর নরবলি দেব। বেশ নিখুঁত কালো একটা লোক চাই। তা অন্য লোক পাওয়া না গেলে তোকে দিয়েও হবে। তুইও তো বেশ কালো আছিস। তুই স্বর্গে চলে যাবি।

আশুর তো শুনে পিলে চমকে গেছে। সে যা কিছু প্রশ্ন করে, রঞ্জিত আরো রং চড়িয়ে জবাব দেয়। শেষে আশু কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমার ঘা আছে, আমি জেল থেকে আমার চেয়ে কালো একটা লোক এনে দোব, আমাকে মারবেন না। রঞ্জিত বলে, ঘা থাকলেও আমরা শোধন করে নোব। আশু আরো কাঁদে।

যে দিন দরজা খোলা হয়েছে, সেদিন আশু ঘুমের ভাণ করে দেখেছে। দরজা খুলে একখানা চেয়ার বার করে তার ওপর উঠে কম্পাউণ্ডের দেওয়ালের মাথা ডিঙিয়ে দেখা গেল না। তারপর চেয়ারের পাশে আমি দাঁড়ালুম এবং চেয়ার থেকে আমার কাঁধে উঠে গণেশ দেখলে, দেওয়ালের ওপারে সামনেই এক লাঠি এবং হ্যারিকেন নিয়ে এক ওয়ার্ডার বসে পাহারা দিচ্ছে। সুতরাং ঘরে ফেরা হল। হুড়কোর ইস্ক্রুপও এঁটে দেওয়া হল। কিন্তু বালিভাঙ্গা নালী মেরামতের উপায় কি?

ঘরে পানের সরঞ্জাম ছিল। খানিক চূণ নিয়ে বালিব সঙ্গে মেখে নালী ভরাট করা হল, কিন্তু দেওয়ালের ময়লা হলদে রংয়ের সঙ্গে মিললো না, যেন দাঁত বার করে রইলো। ভেবেচিন্তে একটু খয়ের গুলে লাগিয়ে দিলুম, কিন্তু তাতে যেন সাদা দাঁত লাল হল মাত্র। শেষে অগত্যা তারই ওপর কিছু ধুলো চাপা দিয়ে তাকটাকে ঝেড়ে ঝুড়ে দুর্গা বলে শুয়ে পড়লুম।

ভোরে জমাদার দরজাটা খুলে দিয়ে যায়। রোজকার মতন সেদিনও খুলে দিয়ে গেছে, "দাঁত" নজরে পড়েনি। দিনের বেলা আমরা আর একটু মেরামত করে ফেললুম।

অনবরত দরজা খোলা আর বন্ধ করার ডিউটি দিতে দিতে সামনের দরজার পাহারা ওয়ার্ডার একটু ঢিলে হয়ে গেছে। রোজকার মতন সেদিন সকালে যখন সে আমাদের মাঠে চরাতে নিয়ে গেছে, দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে। আমরা ফিরে এসে দেখি আশু নেই। ওয়ার্ডারের মহা বিপদ! সে আমাদের বন্ধ করে রেখে ছুটলো আশুর খোঁজে। পরে জানা গেল, দরজা খোলা পেয়েই আশু এক ছুটে পালিয়ে গেছে একেবারে গেটে।

সেখানে গিয়ে গেটের দরজার গরাদে চেপে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদে আর বলে, শীগ্‌গির গেট খুলুন, আমাকে বাঁচান। জেলার ভেতর থেকে ধমক দেয়, বলে, কি হয়েছে বল,—ও বলে, আগে আমাকে বাঁচান, সব বলছি। তারপর তাকে তালা খুলে অফিসে নিয়ে গেলে সে বলেছে, স্বদেশী বাবুরা ভারী গুণীন, কালী সাধনা করে, রোজ রাতে দরজার তালা খুলে সারা জেল ঘুরে বেড়ায়, এই আমাবস্যেতে কালীপূজা করবে, আমাকে কেটে নরবলি করে দিবে বলেছে।

দারোগা এ সব কথা বিশ্বাস করতে পারে না, কিন্তু তবু সাবধান হওয়া ভাল। সেই দিনই আমাদের সে ঘর থেকে সরিয়ে ইঁদারার ধারের বড় ঘরটাতে নিয়ে যাওয়া হল। সে ঘরটারও দরজাটা কাঠের, তার ওপর গরাদে দেওয়া লোহার দরজা বসানো। ইঁদারার পাড়ের চারিদিকে বেশ চওড়া করে শানবাঁধানো। প্রকাণ্ড ঘর, বড় বড় জানালা অনেকগুলো, এক এক জানালার সামনে এক একখানা খাট পড়লো। ঘরে দিনরাত বন্ধ থাকতে হয় না, উঠান খোলা, আগের চেয়ে অনেক ভালো। রাত্রে ঘরে তালাবন্ধ করা হয়, ভোরে খুলে দেওয়া হয়, এবং ওয়ার্ডার বেড়াতে নিয়ে যায় আগের মতই। ঘরটার সঙ্গে সংলগ্ন একটা ছোট ঘরে টুকরী আছে, পায়খানা। সেটারও বাইরের দিকে একটা গরাদে লাগানো খোলা জানালা আছে, সেটাকে কম্বল টাঙিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। একজন নতুন "ফালতু" এল, তরুণ, জাতে ভূমিজ, নাম মহুয়া। নম্র, সৎ, বুদ্ধিমান এবং গান গাইতে পারে।

সেখানে গিয়ে গণেশের চোখের অসুখ হল, পড়াশুনো মোটেই করতে পারে না, মাথা ধরে, চোখ টনটন করে, ভীষণ অবস্থা, কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে চোখ পরীক্ষা করানো একান্ত দরকার। দরখাস্তের পর দরখাস্ত চললো এবং শেষ পর্যন্ত একদিন তাকে কলকাতায় পাঠানো হল।

তারপরই সেখানে এলেন সত্যেনদা—সত্যেন মিত্র। তিনি খানিক জায়গা পর্দা দিয়ে ঘিরে নিলেন—একটু সাধন ভজন করবেন। তার কয়েকদিন পরেই সেখানে নিয়ে যাওয়া হল অজিত মৈত্র এবং অম্বিকা খাঁকে। দমদমার কাছে রেল লাইনের ওপর এক শাস্তি

চক্রবর্তীকে কেউ ঘাড়ে ভোজালীর কোপ মেরে খুন করেছিল। সেই খুনের দায়ে ধরা পড়ে মামলায় খালাস হয়ে অভিনান্সে আটক হয়ে এঁরা দুজন এসেছেন। দুজনই তরুণ, অজিত নিতান্ত ছেলেমানুষ, আর অম্বিকা একটু বড়।

সত্যেনদার একটু অসুবিধা বোধ ছিলই এবং এসেই বদলীর জন্যে লেখালেখি শুরু করেছিলেন। এখন আরো অসুবিধা বোধ হল এবং তিনি জেলকর্তৃপক্ষের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ঐ ঘরের সংলগ্ন পাশের আর একটা বড় ঘরে একা থাকার বন্দোবস্ত করলেন এবং কয়েকদিন পরেই বদলী হয়ে গেলেন।

তিনি দৈনিক দশ টাকা food allowance পান, জেল থেকে মাছ-মাংস-ডিম-দুধ নেন, ফরমাস দিয়ে কিছু কিছু রান্না করিয়ে নেন, একটা ইকমিক-কুকারও আছে, আর কলকাতা থেকে নানা রকমের tinned food আনান, রোজ দশ টাকা খরচ করা চাইতো! কাজেই একটু সাধন-ভজনের জন্যে পৃথক না থাকলে চলে না।

যাই হোক, তিনি যাওয়ার পর এক দিন আমরা চারজন ইঁদারার পাড়ে বসে জটলা করছি, আর মনুয়ার গান শুনছি—স্নানের সময় হয়েছে। মনুয়া গাইছে—

আর বাঁশী বাজাও শ্যাম কেনে
ও শ্যাম কেনে হে
তুমার বাঁশী কুল চোরা জ্বালা দেইছে পানে হে
লিব তুমার বাঁশী কাড়্যে
(আর) যবুনাতে দিব ছাড়্যো হে—
লিব তুমার চূড়া ধোড়া করবো অপমানে হে
তুমার বাঁশীর এমনি ধারা
(আর) শীরাধিকার মন চোরা হে
(এই) পোচাই শেখকে চরণ ছাড়া ক'রো না আর যেনে হে।

পচাই শেখ একজন কৃষ্ণভক্ত ভূমিজ জাতীয় মুসলমান জোলা, যার বাঁধা আরো গান মনুয়া গায়। সেই পচাইকেও মনুয়ার সঙ্গে কারাদণ্ড দেওয় হয়েছে, এক মিথ্যা মারামারির মামলায়।

আমরা তেল মাখছি, এমন সময় ডেপুটী জেলার হাজির। গেটে অফিসে পুলিশ সাহেব (S. P. Bankura) বসে আছেন, আমাকে আর রঞ্জিত বাবুকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

আমরা বললুম, একটু বসতে বলুন, আমরা স্নানটা সেরেই যাচ্ছি। তিনি ফিরে গেলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক slip নিয়ে ফিরে এলেন। তাতে পুলিশ সাহেব লিখেছেন, You are ordered to come at once.

আমরা পরামর্শ করে slip-এর উল্টো পিঠে লিখে দিলুম। We shall not go until we finish our bath or unless we are physically forced to go.

ডেপুটী জেলার slip নিয়ে চলে গেল এবং একটু পরে ফিরে এসে বললে চান করে নেন, আমি দাঁড়াচ্ছি। আমরা বেশ ধীরে সুস্থে দেরী করে স্নান সেরে গেলুম। পুলিশ সাহেব রেগে লাল হয়ে বসে আছে। আমি আগে অফিসে ঢুকলুম। সাহেব জিজ্ঞাসা

করলে Narayan Banerjee? আমি—yes. সাহেব একখানা চোথা এগিয়ে দিয়ে বললে, Here are the charges against you, you can write your answer here if you like, বলে চোথার নিচের দিকটা দেখিয়ে দিলে। চার্জ হল—Conspiracy to wage War against His Majesty's Government organising terroristic activities ইত্যাদি।

জবাব দিলুম, The charges are vague, false and without any foundation whatsoever. You note it down if you like.

রাগে গর গর করতে করতে ডেপুটী জেলারকে ইসারা করলে, ডেপুটী জেলার আমায় বললে, আসুন, আমি বাইরে এলে রঞ্জিত ঘরে ঢুকলো। সে বাইরে থেকে সব শুনেছিল, আমারই মতন জবাব দিয়ে চলে এলো।

ঘরে এসে জল্পনা-কল্পনা চললো, ব্যাটার নামে রিপোর্ট করতে হবে। ব্যাটা আমাদের সঙ্গে অভদ্র আচরণ করেছে।

আনাড়ী তো! Caseটা গোছাতে পারছিলুম না। order মানাতে পারেনি, ওতেই তো জব্দ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত খেয়াল হল, বসতে চেয়ার তো দেয় নি।

একটা লড়াইয়ের জন্যে মন ছটফট করছিল। ঠিক করা হল, ৭ দিনের নোটিশ দিয়ে hunger strike করবো যদি ব্যাটা না মাপ চায়।

দরখাস্ত দেওয়া হল। ৭ দিন কেটে গেল, কোন জবাব নেই। স্থির হল, hunger strike শুরু করবো। অজিত এবং অম্বিকা বললে, আমরাও যোগ দোব। আমরা তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলুম, বরং তোমাদের অন্যত্র সরিয়ে নিতে বলি, তোমরা আমাদের সঙ্গে জড়িয়ো না। তারা বললে, আমরা এ জেলে থাকতে আপনারা hunger strike করলে আমরা পৃথক থাকলেও যোগ দোবই।

সুতরাং আমাদের দুজনের নামে hunger strike ঘোষণা করে Superintendent-এর কাছে লিখে পাঠানো হল, ওরা দুজনও লিখে দিলে আমাদের প্রতি সহানুভূতিতে ওরাও যোগ দিলে।

গায়েও কিছুদিন আগে থেকে চুলকানি হয়েছিল এবং সেজন্যে সকালে চিরেতা ভিজে আর মিছরির জল একটু করে খেতুম। স্থির হল, ওটা চালিয়ে যেতে হবে। রঞ্জিত বললে, ঐটুকু থাকলে ছ' মাস চালানো যাবে।

Hunger Strike এর খবর পেয়ে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, জেলার, ডাক্তার এসে লেকচার শুরু করলে। শেষ পর্যন্ত S. D. O.—নাম বোধ হয় সত্যেন দত্ত—এসে বোঝাতে লাগলেন। সত্যেন মিত্র আমার বন্ধু, সুতরাং আমি আপনাদের দাদার মতন, আমার কথা শুনুন, রিপোর্ট যখন করেছেন, S. P.-কে কৈফিয়ৎ দিতেই হবে, সেই ওর শাস্তি, ইত্যাদি।

আমরা সব কথা উড়িয়ে দিলুম। রোজ দু'বেলা রীতিমতন খানা তৈরী করে টেবিলে সাজিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখে, আবার দুবেলা যেমন-কে-তেমন আছে দেখে সরিয়ে নিয়ে যায়। কয়েক দিন এমনি চলার পর একদিন সকালে ডাক্তার এসে খবর দিয়ে গেল, আজ আপনাদের পৃথক পৃথক সেলে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে, একটু পরেই নিতে আসবে—আমি পালাই।

আমরা পরামর্শ করে দরজার কপাট ভেজিয়ে দিয়ে তার ওপর ঠেসে লোহার খাট, টেবিল, চেয়ার, ট্রাঙ্ক স্তূপাকার করে আটকে রেখে যে যার বিছানায় শুয়ে থাকলুম।

খানিক পরে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সদলবলে এসে দরজা ঠেলাঠেলি করে জানালায় এসে আমাদের বললে, দরজা খোল। আমরা চুপ করে পড়ে থাকলুম। শেষে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট চলে গেল এবং খানিক পরে S. P. এবং armed force নিয়ে ফিরে এল। তারাও দরজা ঠেলাঠেলি করলো, খুলতে পারলে না। শেষে S. P. আমাদের ভয় দেখিয়ে warning দিয়ে সেপাইদের জানালার সামনে সাজালে। তারা গুলী চালাবার ঢংয়ে হাঁটু মুড়ে বসলো। আমরা দেখছি শুয়ে শুয়ে নির্বিকার।

সুতরাং এ ঢং ছেড়ে আবার দরজা ঠেলাঠেলি করে শাবল এনে দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে চাড় দিয়েও সুবিধে করতে না পেরে শেষে দরজার পাশের দেওয়াল ভাঙতে শুরু করলে। S P রেগে আগুন হয়ে গেছে, এদিকে দরজার ফাঁকেও শাবল চালিয়ে ঝাঁকি দেওয়া হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দরজা একটু ফাঁক হল এবং তার মধ্যে শাবল চালিয়ে খাট সরাবার চেষ্টা করতে করতে খাট সরলো। সবাই মিলে ঠেলে দরজা খুলে ফেললে।

S P. আমাদের খাটের কাছে এসে একে একে জিজ্ঞাসা করলে, will you get up or not? আমরা বললুম, we won't! S. P. সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের মুখের দিকে চেয়ে ইসারায় permission চাইলে গায়ে হাত লাগাবার, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইসারায় বারণ করলে। ওরা থোঁতা মুখ ভোঁতা করে গর গর করতে করতে চলে গেল। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টও দুঃখ এবং সহানুভূতি প্রকাশ করে lecture দিয়ে চলে গেল। আমরা উঠলুম, যেন লড়াই ফতে করেছি।

আমাদের সেলে পোরা হল না, কিন্তু ২।১ দিন পরেই আমার বদলীর অর্ডার এল, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলেই। আমি বয়োজ্যেষ্ঠ এবং spokesman বলে আমাকে পৃথক করার বন্দোবস্ত হল। বঙ্কিম বলে দিলে, আমরা হাঙ্গার ষ্ট্রাইক চালিয়ে যাবো, যতদিন না আপনার কাছ থেকে খবর পাই। আমরা বলবো, আমাদের সঙ্গে পৃথক ফয়শালা করলে চলবে না, ফয়শালা করতে হবে নারান বাবুর সঙ্গে, আমরা তাঁর ফয়শালা মেনে নোব।

গেটে গিয়ে দেখি, বঙ্কিমের দাদা এসেছেন বঙ্কিমের সঙ্গে interview করতে। তাঁরা গোড়া থেকেই চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু মঞ্জুর হয়েছে হাঙ্গার ষ্ট্রাইকের পর, যাতে বাড়ীর লোকের পীড়াপীড়িতে হাঙ্গার ষ্ট্রাইক ছাড়ে। সরকারের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে যখন ষ্টেট ইয়ার্ডেই নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিল, তখন সবাই এসে ঘিরে ধরলেন খবরের জন্যে এবং খাওয়াবার জন্যে। তখনও ওঁরা জানেন না, আমি হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করে এসেছি। সকলে বাঁকুড়ার কথা শুনলেন, এবং তারপর নানা মন্তব্য এবং ষ্ট্রাইক ছাড়ার পরামর্শ এবং খাওয়াবার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু হল। তাঁদের সুখের সংসারে একি উৎপাত!

আমি বিপদে পড়লুম। জলতেষ্টা পেয়েছে, অথচ বলতে পারছি না! শেষ পর্যন্ত ওঁরা এক কাপ লেবুর রস এনে চেপে ধরে মুখে ঢেলে দিয়ে বললেন, এতে দোষ হবে না, এ জলেরই সামিল। বললুম, বাঁকুড়ায় ওদের কে পীড়াপীড়ি করে ফলের রস খাওয়াচ্ছে? মনটা খিচড়ে গেল।

ওদিকে দাদারা গেটে লিখে পাঠিয়ে বন্দোবস্ত করছিলেন, একটু পরেই লোকজন এল, আমাকে লটবহর সমেত নিয়ে গেল হাসপাতালে। একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। দাদারাও—

হাসপাতালে একটা বড ঘরে তখন একা থাকতেন কুমিল্লার অতীন রায়, যিনি পরে কুমিল্লায় এক লেবার হাউস সংগঠন করেছিলেন। তিনি অনুশীলন পার্টির লোক, কিন্তু বলশেভিক বিপ্লব তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিল।

যাই হোক, আমাকেও সেই ঘরেই নিয়ে তুললে। সেটাই রাজবন্দীদের থাকার ঘর। অতীন বাবুর সঙ্গে আলাপ হল। সে রাতটা অতীন বাবুর সঙ্গেই কাটলো।

সকালেই অতীন বাবুকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

দু'-এক দিন পরেই আবার আমাকে সরিয়ে নিয়ে গেল হাসপাতালের ইউরোপীয় ওয়ার্ড নামক একটা ছোট ঘরে। সেখানে attendant একজন জাপানী কয়েদী, নাম ওকিমা, সম্ভবত ছদ্মনাম, ভাল ম্যাজিসিয়ান। তার কাছে ২।৪টে তাসের খেলা শিখলুম। পরে শুনেছিলুম, ডাক্তারের বন্দোবস্তে, ওকিমা আমাকে জল খেতে দিত গ্লুকোস মেশানো জল। কথা বলতো পরিষ্কার বাংলা।

১৯ দিন হল। বাঁকুড়ার ওদের কথা ভাবি, কূলকিনারা পাই না, কিন্তু বুঝি, ওরা টাইটই আছে। আমার মনের অবস্থা যন্ত্রবিস্মৃতি তন্ত্রবিস্মৃতি। এমন সময় হঠাৎ এলেন non-official visitor মণিলাল নাহার (বিজয় নাহারের কাকা বোধ হয়)। তিনি বললেন, সরকার বাঁকুড়ার পুলিশ সাহেবের কৈফিয়ৎ তলব করেছিল, তিনি কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, ডেপুটি জেলার নাকি তাঁকে বলেছিল, The state prisoners were not actually bathing when they were summoned to the office। তাই তিনি misled হয়েছিলেন।

মণিলাল নাহার খুব সহানুভূতি প্রকাশ করে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে নানা কথা বোঝালেন, বললেন, বাঁকুড়ার ছেলেরা কারো কোন কথা শুনতেই চায় না, বলে, নারান বাবুর কাছে যান, তিনি হাঙ্গার ষ্ট্রাইক ছেড়েছেন জানলেই আমরা ছাড়বো, না হলে ছাড়বো না। এ অবস্থায় আপনার ঘাড়েই সব দায়িত্ব। পুলিস সাহেবকে যে ডেপুটী জেলারের ঘাড়ে অনেকটা দোষ চাপিয়ে দিয়ে পাশ কাটাবার চেষ্টা করে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে, এটা তার পক্ষে যথেষ্ট লজ্জার কথা। এর চেয়ে বেশী কিছুর জন্যে জেদ করে বসে না থেকে, ছেলেগুলোকে কষ্ট না দিয়ে, আপনার উচিত একটু নরম হওয়া। এত অন্যায় দুনিয়ায় আছে যে, একটু compromise করে না চললে বেঁচে থাকাই অসম্ভব। আপনি কিছু খান, প্রথমে এক গ্লাস সরবৎ খান, আমি দেখে যাব।

অনেক ভাবলুম, দাদাদের মতিগতির কথাও ভাবলুম এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর কথায় রাজী হলুম। ইতিমধ্যেই তাঁর ইঙ্গিতে এক গ্লাস ঘোলের সরবৎ এসে গেছে। চোখ কান বুজে ওষুধ গেলা করে সেটা খেয়ে নিলুম। নাহার অনেক ভাল কথা বলে বিদায় নিলেন।

তারপর এক চিঠি লিখলুম গভর্ণমেণ্টের কাছে এবং যেন আহত বিবেককে চাঙ্গা করার জন্যেই তাতে লিখলুম, অতঃপর এ ধরনের ব্যাপার ঘটলে I shall take the law into my own hands and not wait for the government.

তারপর চিন্তা হল বাঁকুড়ায় ওদের জানাবো কি করে? অন্য কারো কথায় ওরা বিশ্বাস করবে না, অথচ রাজবন্দীদের মধ্যে পত্রালাপ নিষিদ্ধ। ভেবে চিন্তে বাঁকুড়া জেলের Superintendent Dr. mann-এর নামে এক চিঠি লিখে সব জানালুম এবং লিখে দিলুম চিঠিটা বন্দিদের না দেখালে তারা হাঙ্গার ষ্ট্রাইক ছাড়বে না। ওদের হাঙ্গার ষ্ট্রাইক ছাড়তে আরো দুদিন দেরি হয়েছিল।

হাঙ্গার ষ্ট্রাইকের কাণ্ডকারখানার একটা ভাল অভিজ্ঞতাই হল। প্রথম দিন পেট চুঁই চুঁই করে, দ্বিতীয় দিন পর্যন্ত অভ্যাসবশে ৫০ বার খাওয়ার কথা মনে হয়, তৃতীয় দিন থেকেই easy হয়ে আসে।

হাসপাতালে আমাকে ইউরোপীয়ানদের ওয়ার্ডে সরাবার পর রাজবন্দীদের ঘরে আনা হয়েছিল নলিনী গুপ্তকে, খোঁড়া নলিনী গুপ্ত, সদ্য গ্রেপ্তার হয়ে এসেছিলেন। বিলেত, রাশিয়া প্রভৃতি ঘুরে এম. এন. রায়ের লোক বলে পরিচয় দিয়ে তিনি গোপনে ভারতে ফিরে কিছু দিন সপত্নীপ্রতিম দুই বিপ্লবীদলের নেতাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ এবং ভিন্ন ভিন্ন রকমের কথা বলে জল ঘুলিয়ে পরে গ্রেপ্তার হয়েছেন।

আমাকে কিছু দিন হাসপাতালে রেখে chicken soup খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। ওকিমা স্যুপ তৈরী করার পর মাংসটুকু বেঁধে খেতো গোপনে, আমাকেও এক আধ টুকরো দিত। কয়েক দিনের মধ্যেই শরীর ভাল হল, ওজন বাড়লো, তারপর আমাকে সরানো হল misdemeanant yard-এ। সেটা Bomb yard-এর পাশেই।

খাওয়ার ব্যবস্থা হল State-yard-এর সঙ্গেই, সেখান থেকেই ফালতুরা খাবার দিয়ে যেত। ঝাল একেবারে বাদ, ডাল তরকারী সবই মিষ্টি, এক দিন বিরক্ত হয়ে কি বলেছি, ফালতুরা গিয়ে কি বলেছে, কে জানে—উপেনদা এক slip পাঠিয়েছেন, "ভায়া হে, ১ টাকা ৬ আনায় এর চেয়ে ভাল খাওয়া হয় না।"

রাগে গা জ্বলে গেল, ডেপুটী জেলারকে ডেকে বললুম, আমার খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে Bomb yard এর ভূপেনদা'র সঙ্গে, নইলে আমি আবার খাওয়া বন্ধ করবো। তাই হল।

এদিকে নৃপেন মজুমদারকে আনা হল সেই ইয়ার্ডে এবং আমাকে পাঠানো হল ঐ State yard এই। সকলে আলাদা খায়দায়, আমি আলাদা। ডেপুটী জেলারকে এবং ভূপেনদাকে বলে গিয়েছিলুম, আমার খানা Bomb yard থেকেই যাবে, নইলে খাবো না। তাই চললো দিন দুই-তিন। আমি ওদের চেয়ে ভালই খাই, লজ্জা চেপে থাকি। ব্যাপারটা হল অত্যন্ত দৃষ্টিকটু, উপেনদার একটু জব্দ-জব্দ ভাব। শেষে একদিন অমরদা আমাকে ডেকে কাছে বসিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে সন্তর্পণে বললেন, এখানে খেলে কি তোমার কষ্ট হবে?

শোনো কথা! উপেনদাকে লক্ষ্য করে অমরদাকে দুটো মিষ্টি কথা শুনিয়ে রাগ জল হয়ে গেল। ডেপুটী জেলার এবং ভূপেনদাকে লিখে দিয়ে ওখানেই ভিড়ে গেলুম।

উপেনদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ জমলো তারপরে, এবং কথাবার্তায় আমার এলেমের পরিচয় পেয়ে তিনি appreciation হিসাবে বললেন, "তোমাকে আমাদের old cows association এর junior member করে নিলুম। আমাদের কাজ হল, খাওয়া-দাওয়া আর জাবর কাটা।"

দিন কতক বেশ কাটলো। রোক একটু বেড়েছে। অমরদাও ভালবাসতে শুরু করেছেন। এমন সময় একদিন ২৫ সালের গোড়ার দিকেই, হঠাৎ order এল মেদিনীপুর জেলে বদলীর। মনে হল, এইবার একটু "থিতু" হব। কারণ, মেদিনীপুর জেলে বাছা-বাছা অনেক দাদা আছেন। কিন্তু আমাকে সেখানে পাঠাবার কারণ কি?

ভাবতে ভাবতে মনে হল, হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক ছাড়ার পর গভর্ণমেন্টকে যে চিঠি লিখি, স্থপারিন্টেণ্ডেণ্ট সেটা ফেরং পাঠিয়েছিল improper language বলে। তাতে আমি তার নামেই এক রিপোর্ট করে আর একটা দরখাস্ত করি অনধিকার চর্চ্চা বলে। তখন সে আমার আগের চিঠিটা পাঠিয়ে দেয়। আমরা India Govt. এর prisoner বলে তাঁর মাতব্বরী খাটেনি। লোকটা ছিল অত্যন্ত পাজী, নাম সলিসবেরী। সম্ভবত সে-ই চেষ্টা করে আমার মেদিনীপুরে বদলীর ব্যবস্থা করেছে। মেদিনীপুরে পাঠানোর অর্থ, শীঘ্র বেরোতে পারবো না।

যাই হোক, উপেনদা তখন লেখালেখি ও দরবার করছেন খালাস পাওয়ার জন্যে। ১২টা বছর আন্দামানে কাটিয়ে এসে তিনটে বছরও না যেতে, আবার অনির্দিষ্ট কালের জন্যে জেলে পচা, তাও কিছু না করেই, অর্থাৎ না পেরেই, এটা তিনি বরদাস্ত করতে পারছিলেন না।

তখন I. B-র কর্তা ভূপেন চাটুজ্যে আর S. B-র কর্তা নলিনী মজুমদার। তিনি মাঝে মাঝে জেলের officeএ গিয়ে বসে উপেনদাকে ডেকে পাঠান, সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি চলে। এমনি ভাবে একদিন উপেনদা Officeএ গেছেন, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসেছেন। জিজ্ঞাসা করলে বললেন, "বড্ড পায়খানা লেগেছে" বলে পালিয়ে এসেছি।

ব্যাপারটা হচ্ছে, যখন অবনী মুখার্জী মস্কো থেকে এম. এন. রায়ের চিঠি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন, তখন উপেনদা তাঁকে লুকিয়ে রাখার জন্যে কার কাছে যেন এক পোষ্টকার্ড লিখেছিলেন ইসারায়। নলিনী মজুমদার উপেনদাকে সেই গল্প শোনালে তিনি অস্বীকার করলেন। তখন নলিনী মজুমদার মুখ টিপে হেসে ধীরে ধীরে সেই intercepted পোষ্টকার্ডখানা বার করে তাঁকে দেখায়। তাই তাঁর হঠাৎ বড্ড পায়খানা পেয়ে গেল।

আমার মেদিনীপুর যাত্রার কথা শুনে বললেন, বেশ হল, ভেসে ভেসে বেড়ানোর চেয়ে পাকা বন্দোবস্ত ভালই হল। আমারও যে একটা উৎসাহের আমেজ না লেগেছিল, তা নয়।

আমি যখন মেদিনীপুরে গেলুম তখন State yard-এ আছেন ১০।১২ জন রাজবন্দী—প্রায় সকলেই বাছা বাছা দাদা। যুগান্তর দলের আছেন যাদুদা, মনোরঞ্জন দা (গুপ্ত), ভূপতিদা, নরেশদা—অনুশীলনের প্রতুল গাঙ্গুলী, রবি সেন, অমৃত সরকার, সতীশ পাকড়াশী এবং সুরেশ ভরদ্বাজ—মলঙ্গার অনুকূলদা, গিরীনদা, অংশু ব্যানার্জী। আমার পরে একে একে গিয়ে জুটেছিলেন গণেশ ঘোষ, পঞ্চানন চক্রবর্তী, নিরঞ্জন সেন।

মেদিনীপুর কলকাতার চেয়ে গরম, শুকোরুখো জায়গা, জলকষ্ট জেলেও আছে। কয়েদীদের স্নান করার জল মাপা, লোহার সরার দু'সরা। কাজেই তারা আমাদের স্নান-করা জলটা পাশের দুটো নালীতে আটকে রাখতো, বেরিয়ে যেতে দিত না। এবং সেই জলে পরে নিজেরা স্নান করতো, প্রথম প্রথম মনটা পাক দিয়ে উঠতো, মনে মনে তাদের কাছে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হত, কিন্তু সময়ে সব রোগই নিরাময় হয়—কয়েকদিনেই সয়ে গেল।

আলিপুরে লেখাপড়ার atmosphereই ছিলনা, ছিল খেলাধূলো এবং exerciseএর রেওয়াজ। মেদিনীপুরে পড়াশুনোও প্রচুর, আর খেলাধুলার ব্যবস্থাও যথেষ্ট।

ইয়ার্ডের মধ্যে Badminton খেলা চলতো, আর জেলের একদিকে একটা প্রকাণ্ড মাঠ ছিল, সেখানে বিকালে আমরা ওয়ার্ডারের পাহারায় খেলতে যেতুম—টেনিস, ফুটবল, সব কিছু। খেলা ও বেড়ানো অন্ততঃ ঘণ্টা দুই। আমাদের মধ্যে ভূপতিদা ছিলেন সব খেলায় ওস্তাদ।

আমার ভুঁড়ি গজিয়েছিল এবং পা দুটোর জোর কমে গিয়েছিল। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াকে মাসের পর মাস বেঁধে রেখে দিলে বোধ হয় এমনিই হয়। রবি সেনের ওজন তখন ২১৬ পাউণ্ড, কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে দৌড়ে পারতুম না। ফুটবল খেলতে গিয়ে খানিক দৌড়াবার পর হাঁটু দুটোর যেন খিল খুলে যেত, দাঁড়াতে পারতুম না।

ক্রমে অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছিল। এই অবস্থায় একবার এক রীতিমত tournament খেলার ব্যবস্থা হল। টেনিস single ও double কে কার সঙ্গে খেলবে, সেটা lottery করে ঠিক হল। এক অপূর্ব tenis singles match হল, আমি আর ভূপতিদা। আমি সে খেলার বর্ণনা লিখতে পারবো না, আপনারা আন্দাজ করে নেন। শুধু এইটুকু বলতে পারি, শেষ পর্যন্ত খেলেছিলুম, আর দর্শকেরা সারাক্ষণ লুটোপুটি করে হেসেছিল।

পড়াশুনো চলতো রীতিমত, ২।১ জন ছাড়া সকলেই রীতিমত মনোযোগ দিয়ে প্রচুর লেখাপড়া করতেন। একখানা হস্তলিখিত মাসিকপত্র চালানো হত, তাতে প্রায় সকলকেই কিছু না কিছু লিখতে হত। মাসিকের নাম "ভাঙ্গাকুলো"।

মেদিনীপুর জেলাটা যেমন সর্ববৃহৎ, জেলটাও তেমনি সর্ববৃহৎ। এইখানেই সেই বিখ্যাত—কুখ্যাত বলার চেয়ে বিখ্যাত বলাই ভাল—১০০ ডিগ্রী নামক সেল, যার বীভৎসতার তুলনা হয় বোধ হয় ফরাসী বাস্তিলের সঙ্গে, যদিও বাস্তিলের বীভৎসতাটা আমার অনুমান মাত্র। মনে করুন একখানা দোতলা ইমারৎ পাথরের ইট সাজিয়ে গাঁথা একটা বিরাট বন্ধ বাক্সের মতন। তার দু'মুড়োয় আছে দুটি লোহার দরজা, এবং দুই পাশের দেওয়ালের মধ্যে দুই সারিতে দুই তলায় ২৫টা করে ১০০টা গবাক্ষ ও মোটা জাল লাগানো ঘুলঘুলি জানালা। মাঝখান দিয়ে একটা পথ এবং দুই ধারে ২৫টা করে সেল, দুই তলায় ১০০টা সেল। দিনরাত অমাবস্যা। এই সব সেলে একসময় রাজবন্দীরা দিনরাত তালাবন্ধ থাকতেন।

তেরো

২৪ সালে আমরা ধরা পড়ার আগে দুই দফায় যে ২২ জন বিপ্লবী নেতা ধরা পড়ে রাজবন্দী হয়েছিলেন—১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে, ১৭ জন এবং ১৯২৪ সালের জানুয়ারীতে ৫ জন—তাঁদের মধ্যে অনেকে প্রথমে মেদিনীপুরে ষ্টেট ইয়ার্ডে ছিলেন। সেখানে পরস্পরের ব্যক্তিগত বিশেষ অভিজ্ঞতার আলাপ আলোচনার সুযোগ হয়েছিল—তার মধ্যে ২।৪ জন অনুশীলন পার্টির নেতাও ছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় যে সব ছেলেরা কংগ্রেসের কাজ করতে এসেছিল, বিপ্লবী দাদারা তাদের অনেকের কানে সশস্ত্র বিপ্লবের মন্ত্র দিয়েছিলেন। অসহযোগ ব্যর্থ হওয়ার

পর তাদের অনেকে বিপ্লবের জন্য ক্ষেপেছিল, এবং দাদাদের অজ্ঞাতসারেই এখানে-সেখানে ছোট ছোট সন্ত্রাসবাদী দল গড়ে তুলতে শুরু করেছিল।

দাদারা বন্দুক-পিস্তল সব গায়েব করে রেখেছিলেন, তরুণরা ছটফট করে বেড়াচ্ছিল, কেমন করে একটা রিভলভার হাতানো যায়। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, যার হাতে একটা রিভলভার আছে, সেই একটা দল তৈরী করে ফেলছিল। একটা রিভলভারের জন্যে নিজেদের মধ্যেই খুনোখুনি শুরু হয়েছিল। শান্তি চক্রবর্তী খুন হয়েছিল এমনি কারণেই। সন্তোষ মিত্রের দলও এই অবস্থার মধ্যেই গড়ে উঠেছিল।

বিপিনদা' এবং জ্যোতিষ ঘোষ (মাষ্টার মশাই) সন্তোষ মিত্রের দুই নেতা, এঁরা ছিলেন মেদিনীপুরে। সেখানে সকলের অভিজ্ঞতার stocktakingএর পর তাঁরা নিঃসন্দেহে বুঝেছিলেন, ছোকরা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের পিছনে সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের এজেন্ট প্রোভোকেটরদের হাত আছে।

২৪ সালের মাঝামাঝি, জীবন ও ভূপেন দত্ত যান বার্মায় বেসিন সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে দুজনে পরামর্শ করেন যে, এজেন্ট প্রোভোকেটরদের ব্যাপারটা দেশের লোকদের জানিয়ে দেওয়া দরকার। তদনুসারে তাঁরা Memorial to White-Hall নামক বিখ্যাত ২৪ পৃষ্ঠাব্যাপী এক বিবরণী লিখে গোপনে বাইরে পাঠান এবং সারা দেশে তাই নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে যায়। তারই একটা কপি দেশবন্ধুর কাছে যায় এবং তিনি মহাত্মাজীকে সেটা দেখালে, মহাত্মাজী সেটা পড়ে বিবৃতি দেন যে স্বরাজপার্টিকে বেকায়দা করার জন্যেই যে সরকার মিথ্যা অজুহাতে তার শ্রেষ্ঠ কর্মীদের বিনাবিচারে আটক করেছে, সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ নেই। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্বরাজপার্টির নেতা শ্রীমতিলাল নেহেরুও সেটা প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে শ্রীশরৎ বসু কর্তৃক প্রকাশিত Lawless Laws নামক বইয়ে সে বিখ্যাত বিবরণীটাও দেওয়া হয়েছিল।

কলকাতার ভূতপূর্ব পুলিশ কমিশনার এবং তাঁর পরে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল মুলভেনি রিটায়ার করে বিলেতে গিয়ে ১৯১৬—২০ সালের রাজবন্দীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে সরকারী এজেন্ট প্রোভোকেটর নিয়োগ এবং তাদের কাজের ধারা সম্বন্ধে কিছু বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন, এবং জীবন ও ভূপেন বাবু তাঁদের Memorial to Whitehall এ তাঁদের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে নিজেদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বেসিন জেলের কর্তাদের এ নিয়ে অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়।

এদিকে স্বরাজপার্টি প্রথম সংগ্রামী অবস্থা পার হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চমকপ্রদ বৈপ্লবিক ধরনের বাণীগুলোও যথাশাস্ত্র ক্রমশ ভোঁতা হয়ে আসছিল এবং পার্টির মধ্যে ধনিক জমিদারদের প্রভাব ক্রমশ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করছিল। দেশবন্ধু এক সময় বলেছিলেন, তাঁর স্বরাজের আদর্শ শতকরা ৯৮ জনের জন্য স্বরাজ। ক্রমশ এসব কথাও তাঁর মুখ থেকে শোনা যেতে লাগলো যে, কৃষকদের প্রতি সুবিচার অবশ্যই চাই, কিন্তু তার জন্যে জমিদারদের প্রতি অবিচার করলে চলবে না। মতিলাল নেহেরু টাটা কোম্পানির জন্যে বরাবর লড়েছেন, কিন্তু শ্রমিকদের জন্যে কিছু করেন নি।

১৯২৫ সালের মে মাসে যখন বিলেতে ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড বলছেন, তিনি ১০০ বছরের মধ্যেও ভারতের স্বাধীনতা সম্ভব মনে করেন না, তখন দেশবন্ধুর মুখে বৃটিশ

গভর্ণমেন্টের সঙ্গে আপোষ ও সহযোগিতার কথা শোনা গেল। বার্কেনহেডের সঙ্গে দেশবন্ধুর নাকি এক রাউণ্ড-টেবল্ কনফারেন্সের কথা চলছে, এমন কথাও শোনা গেল। কিন্তু ঠিক এই সময়েই দার্জিলিংয়ে হঠাৎ দেশবন্ধুর মৃত্যু হল।

যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। সারা দেশ শোকাচ্ছন্ন, বাংলার কংগ্রেস মহল কিংকর্তব্য-বিমূঢ়, দাদাদেরও প্রকাশ্য রাজনীতিক্ষেত্রের প্রধান অবলম্বন যেন ভেঙ্গে পড়লো। মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় এসে জে. এম. সেনগুপ্তের মাথায় দেশবন্ধুর তিন মুকুট পরিয়ে দিয়ে গেলেন —কাউন্সিলে লীডার, প্রাদেশিক কংগ্রেসে সভাপতি, কর্পোরেশনে মেয়র। সুতরাং দাদাদের ভরসাটা চেপে পড়লো সুভাষ বাবুর ওপর, তিনি অন্ধের নড়ি। এসব ঘটনা আমার মেদিনীপুর যাওয়ার ঠিক পরের কথা।

যাই হোক, মেদিনীপুরে পড়াশুনোর যথেষ্ট সুযোগও ছিল, ভাল ভাল বইও অনেক ছিল, আমি এ সুযোগ, পুরো মাত্রায় গ্রহণ করলুম। ইকনমিক্সের জ্ঞান প্রয়োজন, এটা তীব্রভাবে অনুভব করতে শুরু করেছিলুম। মনোরঞ্জনদা'র কাছে Kale র Indian Economics ছিল, বললুম পড়তে চাই, আপনাকে পড়াতে হবে। তিনি খুশী হয়ে পড়াতে লাগলেন। আমি ছাত্র বরাবরই ভাল, এবং ভাল ছাত্র পেয়ে মনোরঞ্জনদা'রও যে উৎসাহ বেড়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি রীতিমতন খেটে বইটা পড়িয়ে ছেড়ে দিলেন। আমার জীবনে একটা নতুন দিকের বিকাশ শুরু হল। মনোরঞ্জনদার ঋণ আমি জীবনে ভুলতে পারি না।

ক্রমে তাঁর সঙ্গে আর একখানা অত্যন্ত গুরুত্বর বিষয়ের বই পড়লুম, রাজনীতি ও অর্থনীতির ওতপ্রোত মিশ্রণ, প্রকৃত প্রস্তাবে applied economics বলা যেতে পারে—Reverse council Bills and other organised plunders—একজন মাদ্রাজী অর্থনীতিবিদের লেখা, নামটা মনে নেই, কৃষ্ণস্বামী আয়ার হতে পারে। ২০ সালের শাসন সংস্কার দানের মূল্য হিসেবে বৃটিশ সরকার কেমন করে ভারতের ৮০০ কোটি টাকা গ্যাঁড়া মেরেছে, তারই বিশদ বিবরণ। আমার ভাল করে economics পড়াটা হয়ে গেল।

তারপরে পড়লুম পুরকায়স্থের Indian Finance, খৈতানের Railway Finance প্রভৃতি। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের Roads to Freedom, ব্রেলসফোর্ডের Russian workers' Republic-ও পড়লুম। এ বইগুলো মনোরঞ্জনদা'র কাছে ছিল। আমি নিজে কিনলুম Factory Legislation in India, আর. কে. দাসের তিনখানা বই—Labour movement in India, Hindusthani workers in Pacific Coast (America), এবং Production. এই বইটাতে শতখানেক চার্ট ও টেবল ছিল দুনিয়ার Comparative production সম্বন্ধে। আমি অনেক টেবল-চার্ট ভেঙ্গে তিনটে বড় টেবল তৈরী করে দুনিয়ার নানা দেশের তুলনায় ভারতের সর্ববিধ উৎপাদনের তুলনামূলক তথ্য দিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলুম আমাদের "হাতেলেখা" মাসিক "ভাঙ্গা-কুলোতে"। অন্য বই দুটো অনুবাদ করে রেখেছিলুম। যাদুদা' একখানা মিলিটারী বই যোগাড় করেছিলেন Contour and Map Reading—আমি তাঁর সঙ্গে সে বইটাও পড়লুম। প্রায় বছরখানেক ছিলুম, 'পরীক্ষার্থী ছাত্রের মতন খেটে পড়েছি, শিখেছি, আনন্দ পেয়েছি, মেদিনীপুর জেল জিন্দাবাদ!

সুভাষ বাবুকে মুক্ত কবার নানা চেষ্টাব মধ্যে শরৎ বসু মহাত্মাজীকে এক চিঠি লিখে তাঁর পরামর্শ চেয়েছিলেন। তিনি অনেক কথাব পর শরৎ বসুকে নিয়মিত ভাবে চরকা কাটার পবামর্শ দিয়েছিলেন।

ভূপতিদা' এক কবিতা লিখলেন—

হয়েছে এক মহৌষধিব আবিষ্কাব
মাঝে মাঝে একটি ডোজে সর্বব্যাধি পবিষ্কার
* * * * দাঁত কনকন্ পেটেব ব্যথা
মিনিট দু চাব কেটো সুতা, আবাম পাবে সত্যিকার।

তখন আমবা খাদি প্রতিষ্ঠানের গিদোড় থেকে খদ্দবেব কাপড়-জামা পরি। ভূপতিদা' বলেন, no-changer-বা এইবার আমাদের ভক্ত কবেছে। চবকা ও খদ্দবেব ওপর মনোবঞ্জনদা'র এবং আমাব ভক্তি তখনও আব সকলেব চেয়ে বেশী। তাব পবেব মাসে ভাঙ্গাকুলোতে আমাব এক প্রবন্ধ বেরুলো এবং ভূপতিদা'ব কবিতাব প্রতিবাদে তাতে লেখা হল, চবকাপন্থীবা যদি আমাদেব ঠাট্টা কবে কবিতা লেখে,—

হয়েছে এক মহৌষধিব আবিষ্কার—
মাঝে মাঝে একটি ডোজে সর্বব্যাধি পবিষ্কাব
বন্যা, মাবী কি দুর্ভিক্ষে মবছে মানুষ লক্ষে লক্ষে,
"ব্ল্যাকহোল ট্রাজেডি"ব বিপক্ষে কসে কব বে চীৎকাব।
শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্নহাবা, কুসংস্কারে দেশটা ভবা—
ডাকাতি টিকটিকি মারা এসব বোগেব প্রতিকাব।
গান্ধীব্যাটার নিন্দে কবে চবকা বিদ্বেষ চালাও জোবে
বাসায় গিয়ে থাকবে মরে' বৃটিশসিংহ দুবাচাব—

তাহলে কেমন হয়? চবকা কাটলে স্বরাজ না হোক, বর্তমান অবস্থায় আমাদের বিলিতী কাপড় বয়কটেব এবং বস্ত্র সমস্যার সমাধানের আংশিক সাহায্য যে হচ্ছে, একথা কি কেউ অস্বীকাব করতে পাবে?

মনোবঞ্জনদা' দেখে হাসিমুখে তিবস্কারেব সুবে বললেন, এটা কি কবেছেন! ভূপতিদা' চটে গিয়ে আমায় বুঝিয়ে দিলেন, আমি একটি আকাট, আমাব একটুও বসবোধ নেই। কিন্তু আমার ওপব ভূপতিদা'ব মমতাও যে বেড়ে চললো, তাও টের পেতে থাকলুম, যত দিন একসঙ্গে ছিলুম।

একটা দুর্বুদ্ধি মাথায এল। আমাদেব মাসিক পত্রে সবই আছে, নেই শুধু প্রেমের কবিতা। একটা প্রেমেব কবিতা লিখতে হবে। চললো একটা মাথা খোঁড়াখুঁড়ি ব্যাপাব। কল্পনা এবং অভিজ্ঞতা, দুদিকেই দারিদ্র্য, কিন্তু ধবস্তাধবস্তি কবে যা বেরুলো, নেহাৎ নিন্দের নয়।

প্রণয় যদি টুটেই সখা, দুঃখ কি—
দুঃখ তো হায় আছেই জীবন ভরিয়ে
জীবনটা তো অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামই
প্রণয় সেথা দুদণ্ডেবি বিরাম যে!

কাজের মানুষ, কাজের জগৎ ?—হায় সখা
জগৎ, মানুষ তৈরী শুধুই ইট-কাঠে ?
বুক ঠেলে ঐ প্রাণের নাচন যায় দেখা
গন্ধে রঙে মাতিয়ে জগৎ ফুল ফোটে।

হৃদয় মধু, শোভা, সুবাস বিলিয়ে হায়
একটি দিনেই জীবন যদি শুকিয়ে যায়
মুগ্ধ অলি নাইবা যদি ফিরেই চায়
জগৎ যদি অবহেলায় পায় দলেই—
হৃদয় টুটে ধুলায় লুটে—নাই ক্ষতি
একটি দিনের আদর সোহাগ স্বর্গ সেই।

একটা চমক! ভূপতিদা' appreciate করে বললেন, ছেড়েছো একটা ?

যাদুদা' এবং নরেশদা' (চৌধুরী) লিখতেন গল্প বা নক্‌সা। মনোরঞ্জনদা', প্রতুল গাঙ্গুলী, সতীশ পাকড়াশী লিখতেন প্রবন্ধ। গিরীনদা' লিখতেন মুসলমানযুগের ধারাবাহিক ইতিহাস। অমৃত সরকার আইরিশ বিপ্লবী ড্যানব্রীন বাংলা "অনুবাদ" করতেন—হাত-মক্‌স হিসেবে। গণেশ ঘোষ ওখানে যাওয়ার পর তাকে ধরে-বেঁধে লেখানো হল—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখলো এবং দেখা গেল, নতুন লেখক হিসেবে লেখার হাত চমৎকার!

অনুকূলদা' ছিলেন একজন ভাল আর্টিষ্ট, হয়ত অনেকেই জানেন না। তিনি ছবি আঁকতেন, water colour রঙের বড় বাক্স এবং সব রকম সরঞ্জামই ছিল। রবী সেন লেখা এড়াবার মতলবে অনুকূলদা'র কাছে ছবি আঁকা শিখতেন এবং শেষ পর্যন্ত শিখেছিলেনও বেশ।

লেখাপড়া, খেলাধূলার ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু সকলেরই মনের একটা দম আটকানো ভাব হঠাৎ উদ্দামভাবে হাফ ছাড়তো। দিনের পর দিন একই ব্যাপারের পুনরুক্তি আর পুনরাবৃত্তি, একই সেট লোকের মুখ অহরহ দেখতে দেখতে যেন হঠাৎ দাড় ছেঁড়ার জন্যে প্রাণটা লাফ দিয়ে ওঠে। যেন সকলেরই একটু পাগলের ছিট।

গিরীনদা'কে যাঁরা জানেন, তাঁরা কি কল্পনা করতে পারেন যে, তিনি এক হাত কোমরে রেখে আর এক হাত মাথার ওপর তুলে ঘুরে ঘুরে নাচতে পারেন ? এবং তার সঙ্গে গান—জিস্‌কা ফাটে, উস্‌কা ফাটে, ধোবীকা কেয়া ভাই!

অনুকূলদা' রোজ বেলা দশটার সময় ঘরের বাইরে গিয়ে তাঁর খাটের সামনের জানালার ধারে এসে আপন মনে ডাকেন, অনুকূল বাবু বাড়ী আছেন ?

পাঁচ দিন দেখতে দেখতে আমি একদিন ভেতর থেকে বললুম, তিনি বেরিয়ে গেছেন। অনুকূলদা' সটান বললেন, কার সঙ্গে ? কাজেই আমাকে বলতে হল লোম্যানের সঙ্গে।

সতীশ পাকড়াশীকে যাঁরা জানেন, তাঁরাও ধারণা করতে পারবেন না, মেদিনীপুর জেলে তিনিও গান গাইতেন। তবে সে এক লাইন মাত্র—'সে কোন বনের হরিণ ছিল আমার মনে, কে তারে বাঁধলো অকারণে ?'

প্রতুল বাবুর সঙ্গে আমার আগে থেকেই আলাপ পরিচয় ছিল। তিনি মাঝে মাঝে আমাকে টেনে নিয়ে একটা জানালার ধারে একান্তে বসে গান শুনতে চাইতেন—আর একটা, আর একটা করে অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক কাটাতেন। আমি বুঝতুম, কোন কারণে মনটা উতলা হয়েছে, সেটা ভোলবার জন্যে চেষ্টা করছেন।

অমৃত সরকার আমাকে বলতেন নারুদা', আর আমি তাঁকে ডাকতুম আমির্তিদা' বলে। বাঙ্গালরা অমৃতি জিলিপীকে বলে আমিত্তি। একবার তাঁর পায়ে একটা চোঁচ ফুটেছে, তিনি একটা ছুঁচ নিয়ে গোড়ালী খোঁচাচ্ছেন। এমন অবস্থায় যা হয়ে থাকে—একে একে অনেকে এসে "আমি দেখি" বলে কিছু কিছু খুঁচিয়ে গেছেন, আমি তখনও বাকি, এমন সময় চোঁচটা বেরিয়ে পড়েছে। আমি বললুম, বা রে! আমার ভাগের খোঁচানিটা মারা যাবে, তা হবে না। তাই নিয়ে বেশ খানিক ধ্বস্তাধ্বস্তি করে ছুঁচ কেড়ে নিয়ে গোড়ালীতে ফুটিয়ে দিয়ে তবে ছাড়লুম। আমাকে ভাল না বেসে উপায় আছে?

এত সব খুচরো পাগলামির পরও এক একদিন রাত্রে হঠাৎ সবাই মিলে পাইকারী পাগলামি শুরু হত—যাদুদা' মণ্ডায় থেকে এক ব্যাণ্ডপার্টির প্রোশেশন হত তালাবন্ধ ঘরের মধ্যে। যাদুদা' extempore—যা মুখে আসে তাই গান বেঁধে এক লাইন করে গাইতেন, সকলে প্রাণপণে গলা ছেড়ে কোরাসে repeat করতো। গানের নমুনা হচ্ছে,

চুরি করে কত কাল কাটাবে রজনী
গোকুলে গোপিনী কাঁদে যশোদা-জননী।

ছোকরারা যে দাদাদের আর মানতে চায় না, এই ব্যথাটা নিয়ে যাদুদা' এক গান বেঁধেছিলেন লক্ষ্মণ বর্জন, যার মোদ্দা কথা হচ্ছে রামচন্দ্র বনবাসে গিয়ে নিজে পক্ষী মেরে খেতেন, সে পক্ষীর নাম রামপাখী, আর লক্ষ্মণকে খেতে দিতেন কলা মূলো। লক্ষ্মণ কাজেই রাগ করে চোদ্দবছর উপোস করেই থাকলো। রাম সেটা টের পেয়ে রাগ করে লক্ষ্মণকে বর্জন করলেন। শেষ কথা হচ্ছে, অতএব কেউ ক'রো না আর দাদার সেবা অকারণ।

আমাদের কুচো কাচা জিনিসের প্রয়োজনের তখন কোন নির্দিষ্ট ভাতা ছিল না, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পাশ করলেই কনট্রাক্টর সেগুলো সরবরাহ করতো। হঠাৎ I. G. of Prisons এর এক হুকুম এল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কোন জিনিসই দিতে পারবেন না, আমাদের প্রত্যেকটি প্রয়োজনের কথা I. G.-র কাছে দরখাস্ত করে মঞ্জুর করিয়ে আনতে হবে। কারণ ঐ কুচো কাচা জিনিসের বাবদ নাকি অনেক টাকা খরচ হচ্ছে। হবে না কেন? ছ'পয়সার একটা জিবছোলা সরবরাহ করে ঘটা করে tongue scraper লিখে যদি বারো আনা বিল করা হয়, এবং সে বিল নির্বিবাদে পাশ হয়ে যায়, তাহলে ১৫।১৬ জন লোকের তেল-সাবান থেকে ছুঁচ সুতো পর্যন্ত যোগাতে যে অনেক টাকা খরচ হবে, সে আর বিচিত্র কি?

আমরা সকলে মিলে দরখাস্ত করলুম অসুবিধা জানিয়ে এবং অনাবশ্যকভাবে বিবাদ টেনে আনা ঠিক নয় বলে, কিন্তু কোন ফল হল না। সুতরাং আমরা পরামর্শ করে এক অভিনব লড়াই শুরু করলুম—দরখাস্তের লড়াই।

ঠিক হল, দরখাস্ত লিখতে হবে বাংলাভাষায় এবং I. G. of Prisons-এর কাছে বা নামে নয়, খোদ Additional Deputy Secretary, Govt. of Bengal-এর নামে,

যিনি আমাদের দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত। তারপর চললো এক রীতিমত কম্পিটিশন, কে কত মজাদার দরখাস্ত লিখতে পারে।

যাদুদা' এক দরখাস্ত লিখলেন, "কুলগাছে আঁচল বাধিয়ে ঝগড়া"—"পাড়া কুঁদুলীর মতন" ইত্যাদি। ভূপতিদা' এক দরখাস্ত লিখলেন—তিন পাতা সাহিত্যিক শুদ্ধভাষা—"প্রাচীনকালে যখন মানুষ জুতার ব্যবহার জানিত না" থেকে শুরু করে কেমন করে জুতার আবিষ্কার হল, জুতা মানুষের কত উপকারী, কত রকমের জুতা কত সুখপ্রদ, ইত্যাদি এক প্রবন্ধ লিখে, তার উপসংহারে লিখলেন - 'কিন্তু, অহো দুর্দৈব, আমার জুতার সুখতলা খুলিয়া গিয়াছে এবং আমি আজ তিনদিন যাবৎ কি রূপ মনোকষ্টে কাল কর্তন করিতেছি, তাহা মহাশয়কে কেমন করিয়া বুঝাইব? অতএব মহাশয় অবিলম্বে আমাকে চারিটি কণ্টককীলক (কাঁটাপেরেক) সরবরাহ করিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিবেন। কিমধিকমিতি—"

এইভাবে কেউ চাইলেন সার্টের জন্যে ঝিনুকের বোতাম, কেউ ছুঁচ-সুতো, কেউ কানখুস্কী, কিন্তু দরখাস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড।

কয়েক দিনের মধ্যেই লড়াই ফতে—সুপারিন্টেণ্ডেন্টের হাতেই ক্ষমতা ফিরে এল, এবং পরে মাসিক ৭ টাকা ভাতা নির্দিষ্ট হল।

যাই হোক, গণেশ ঘোষের কাছে তার দ্বিতীয় কীর্তির গল্প শুনলুম। আমাদের হাঙ্গার ষ্ট্রাইক মিটে যাওয়ার পর গণেশকে আবার বাঁকুড়ায় ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল কলকাতায় চোখ পরীক্ষার পর। বাঁকুড়া জেলে হাসপাতালে আমাদের খানা রেঁধে ঘরে দিয়ে যেত মানভূমের একজন প্রৌঢ় পুরানো চোর কয়েদী। তাকে দিয়ে গণেশ বাইরে থেকে একটা লোহাকাটা করাত সংগ্রহ করেছে, এবং আমাদের ঘরের সংলগ্ন পায়খানার যে গরাদে দেওয়া জানালায় কম্বল ঢাকা দেওয়া ছিল, তার একটা গরাদের দুমুড়ো কেটে খুলে ফেলেছে। তারপর খাটের একটা লোহার ডাণ্ডা বেঁকিয়ে ইংরেজী এস (S) অক্ষরের মতন একটা প্রকাণ্ড হুক বানিয়েছে। তারপর দুখানা কাপড় বেঁধে রসি করেছে। খাটের একটা সরু লোহার ছত্রীর এক মুখ বেঁকিয়ে নিয়েছে, যাতে বড় হুকটাকে জেলের দেওয়ালের ওপর আটকে দেওয়া যায়।

তারপর এই সব সাজ সারঞ্জাম নিয়ে পায়খানার জানালা দিয়ে রাত্রে বেরিয়েছে। জেলের ঐ প্রান্তে দেওয়ালের ধারে একটা সেকেলে পাকা জোড়া পায়খানা ছিল। তার পাশে জেলের দেওয়ালের ধারে যে গলিটুকু ছিল, সেখানে গিয়ে ছত্রীর ডগায় কাপড়ের রসি-বাঁধা হুকটাকে তুলে দেওয়ালের মাথায় আটকে কর্তা রসি বেয়ে উঠেছেন। কিন্তু তাঁর ভারে কাঁচালোহার ডাণ্ডার হুকের এক মুখ সিধে হয়ে গিয়ে কর্তা ঢিপ করে পড়ে গেছেন, এবং সাজসজ্জা নিয়ে পালিয়ে এসে আবার ঘরে ঢুকে কাগজের গুঁজি দিয়ে কাটা-গরাদেটা সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন। পরের দিন আবার একটা চেষ্টা করার ইচ্ছে।

কিন্তু, অহো দুর্দৈব! সকালে মেথর পায়খানায় চুনের পোঁচড়া দিতে এসে হঠাৎ সেই কাটা গরাদেটাই চেপে ধরেছে এবং গরাদেটা খুলে গেছে। মেথরের তো চক্ষু স্থির!

সুতরাং কীর্তি প্রকাশ হয়ে পড়লো। বাবুরা বললেন, আমরা কিছুই জানি না। মনুয়াকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেদম প্রহার করলো। সে জানতো, কিন্তু কিছুই বললো না—

মুখ বুজে মার খেলো। তারপর রাঁধুনীকে প্রহার দিতেই সে সব বলে দিলে। তারপরই গণেশের মেদিনীপুরে আগমন।

মেদিনীপুরে বেশ সংসার পাতিয়ে প্রেমানন্দে আছি। ক্রমে ক্রমে বাড়ী থেকে খবর আসছে ভাইয়ের কালাজ্বর, যথোচিত চিকিৎসা হচ্ছে না, শয্যাশায়ী অবস্থা, ক্রমে খারাপ হচ্ছে।

ক্রমে খবর এল, ১৬০০০ টাকার দাবীতে আমার মহাজন নালিশ করেছেন—বাড়ী বুঝি যায়। দরখাস্ত করি, আমাকে কোর্টে হাজির হতে দাও, দরখাস্ত মঞ্জুর হয় না। নিয়মিত ভাবে চিঠি আসে, প্রভাস উকীল দিয়ে মামলা স্থগিত করাচ্ছে, সময় নিচ্ছে, আমিও দরখাস্ত করে চলেছি, একটা deadlock চলছে।

ওদিকে ভাগ্নাজামাই I. B. Officeএ ঘোরাঘুরি করে দরবার করে। তারা হাকিয়ে দেয়, সে আমাকে চিঠি লেখে, আমি সব কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি, লেখাপড়া এবং খেলাধূলোয় মন দিতে চেষ্টা করি।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন খবর এল, মনোরঞ্জনদা', ভূপতিদা', নরেশদা', প্রতুলবাবু, রবী সেন, অমৃত সরকার প্রভৃতিকে বদলী করা হয়েছে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জেলে। তাঁরা চলে গেলেন। আমাদের সংসারে ভাঙ্গন ধরলো। মনোরঞ্জনদা' যাওয়ার সময় আমাকে দুখানা বই দিয়ে গেলেন—Roads to Freedom এবং Russian workers Republic—আমি বললুম, আমি বই দুটো বাংলায় অনুবাদ করবো।

ক্রমে আমাদের জেলের সংসারের ভাঙ্গন বেড়ে চললো। ওঁরা যাওয়ার পর যাদুদা' মাঝে মাঝে একা গান ধরেন—

'বাড়ীর পাশে আরসী নগর (ও তাতে) পড়শী বসত করে, একদিনও না দেখিলাম তারে—'

"রাজপুরীতে বাজায় বাঁশী" গানটার একটা প্যারডি লিখেছিলুম—

রাত দুপুরে বাজায় কাঁসা ঝালাপালা কান
পথে যেতে পড়ে টলে কি করেছে পান
শ্বশুরবাড়ী আনার বেলা
কি খাওয়ালে · শালা
রাত দুপুরে তারি ঠেলায় প্রাণ করে আনচান
ঘরে আমার কত কুটুম রোজই আসেন যান
থতোমত, মিষ্টি জুতো, কেউ বা বিষম খান
নেশার মুখে দেবার তরে
কি চাট আছে তোমার ঘরে—

এই পর্যন্ত লিখে শেষ লাইনটা মনের মতন করে মেলাতে পারছিলুম না, যাদুদা' শুনে গেয়ে মিলিয়ে দিলেন—

সঙ্গে আছে যেটুকু মাল হবে দু'-চার টান।

একজন কয়েদী নাপিতের কাজ করতে আসতো, যাদুদা' তাকে নিয়ে মেদিনীপুরী ভাষায় অনেকক্ষণ গল্প করে কাটাতেন। তার, নাম "ময়েস্" (মহেশ)—বাইরে হালচাষ করতো,

শুনে যাদুদা' বলেন, সেটা তোমার কামাবার হাত দেখেই বুঝতে পাচ্ছি। আমাদের সেফটি রেজার দিয়েই কামিয়ে দিতো, বলতো কামাবার ষড়যন্ত্র (সরঞ্জাম)!

একদিন সে বলছে, লাড়াজোলের রাজার ছেলে হয়েছে। জেলখানাটা রাজার কিনা, তাই রাজা গবমেণ্টকে বলেছে ১০০০ কয়েদী ছেড়ে দিতে হবে. না হলে আমার জেল ছেড়ে দাও।— ছুতোয় নাতায় ওরা মুক্তির স্বপ্ন দেখে।

সেই সময়ে কুইন আলেকজাণ্ড্রা মারা যাওয়ার খবর এসেছে। ময়েস যাদুদা'কে জিজ্ঞাসা করলে, ছবাদ হবে তো? যাদুদা' বললেন, ছবাদ হবে নি? ছবাদ হবে, মেরেসো উচ্ছুগ্গা হবে, পণ্ডিতদের এক এক ঘড়া ভরে টাকা দিয়ে দেবে।

ময়েস জিজ্ঞাসা করলে, রাজারা নাকি খিস্তান? যাদুদা' বললেন, তা হলই বা খিস্তান, মায়ের কাজটি করতে হবে নি? ময়েস বললে, বটে বইকি বাবু!

হঠাৎ একদিন যাদুদা'র সমন এল—কলকাতায় বদলী। ক্রমে ক্রমে গিরীনদা', অনুকূলদা', অংশুবাবুও চলে গেলেন।

বাড়ীর চিঠি পাই, প্রভাসের চিঠি পাই, দরখাস্ত করি, কিছু হয় না। মনে মনে কল্পনা করি—ভাগ্নী ম'লো, মহাজন বাড়ী বেচে নিলো, ভাগ্নীজামাই শিশুপুত্র নিয়ে—

ছুতোর বলে সব কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার জন্যে ঠিক করলুম. এসা দিন নেহি রহেগা।

শেষে একদিন দরখাস্ত করলুম, আমাকে কলকাতার জেলে বদলী করা হোক, যাতে আমি বাড়ীর মামলার তদ্বিরকারকের সঙ্গে দরকারমত দেখা করে উপদেশ দিতে পারি। না হলে আমার বাড়ী গেলে গভর্ণমেণ্টকে অন্তত ন্যায়ত দায়ী হতে হবে।

কিছু দিন কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ খবর এল, দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে। আলীপুর সেনট্রাল জেলে বদলীরও হুকুম এসে গেল। চললুম আবার আলীপুরেই।

গণেশ ঘোষ তখন ড্যানব্রীন পড়ে লাফাতে শুরু করেছে—এই রকম একটা কাণ্ড করতেই হবে। ৩০ সালের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্বন্ধে অনেক নেতার নাম শোনা গেছে (যায় চারুবিকাশ দত্ত পর্যন্ত) কিন্তু আমার এ বিশ্বাস কেউ টলাতে পারবে না যে, গণেশ ঘোষই ছিল কাণ্ডটার prime mover—স্বয়ং শ্রীগণেশ ঘোষ অস্বীকার করলেও আমি মানবো না।

চৌদ্দ

২৬ সালের গোড়াতেই যাদুদা আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বদলী হয়েছিলেন। তার কিছুদিন পরেই আমি বদলী হয়ে এলুম। তখন শয়তান সলিসবেরীর স্থলে জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হয়ে এসেছেন ক্যাপ্টেন মালেয়া—চমৎকার লোক—যাদুদার সঙ্গে খুব খাতির। তিনি রোজ সকালে রাউণ্ডে বেরিয়ে আমাদের ইয়ার্ডে এসে যাদুদাকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে যেতেন।

একদিন হাসপাতালে যাওয়ার সময় তিনি যাদুদার সঙ্গে আলোচনা করছিলেন, পাশে দাঁড়িয়ে শুনলুম, হাসপাতালে সে দিন মালেয়া স্বহস্তে একটা মেজর অপারেশন করবেন—

অর্শ—তিনটে-ভিতরবলী কেস। আমি যাতুদাকে বললুম, আমার যে দেখতে ইচ্ছে করছে। মালেয়াকে বলে যাতুদা আমাকে সঙ্গে নিলেন। অপারেশনে মালেয়ার কেরামতি স্বচক্ষে দেখলুম।

উপেনদা অকারণ জেলভোগটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। আই বি-র কর্তা রায়বাহাদুর ভূপেন চ্যাটার্জি জেলের অফিসে আসা শুরু করেছিলেন এবং উপেনদা তাঁর কাছে দরবার শুরু করেছিলেন—কেন দাদা বুড়ো ব্রাহ্মণকে এবং ব্রাহ্মণীকেও অকারণ কষ্ট দিচ্ছ—ইত্যাদি।

নরেন সেনকে (রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী) ডেকে রায়বাহাদুর undertaking-এর কথা বলেছিলেন। তিনি জবাবে বলেছিলেন, সরকার সবচেয়ে বড় হিংসাবাদী, বিপ্লবীরা তার জবাবে হিংসার আশ্রয় নেয়। অহিংস আছেন একমাত্র গান্ধীজী। সরকার যদি তাঁর কাছে অহিংসার undertaking দেয়, তাহলে আমিও তাঁর কাছেই undertaking দিতে রাজী আছি।

Hopeless Case বলে রায়বাহাদুর ছেড়ে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমি আসার আগেই উপেনদা, অমরদা undertaking দিয়ে মুক্ত হয়েছেন। অতুলদা'কে গ্রামে অন্তরীণে পাঠানো হয়েছে।

আমি আসার অল্পদিন পরে—বোধ হয় মার্চের শেষাশেষি কলকাতায় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হল। কয়েকশো দাঙ্গাকারী গ্রেপ্তার হল—হিন্দুদের আনলে সেন্ট্রাল জেলে এবং মুসলমানদের পাঠালো প্রেসিডেন্সি জেলে। একদিন সকালে দেখি under trial-দের দুটো ইয়ার্ডভরা লোক গিজ গিজ করছে— শুনলুম দাঙ্গার কথা। সবই প্রায় হিন্দুস্থানী। তারাও স্বদেশী বাবুদের খবর পেয়েছে।

Under trial ইয়ার্ড থেকে তারা "বন্দেমাতরম" বলে নমস্কার করছে। ক্রমে ২।৪ জন পিছনের দরজা দিয়ে (হিন্দু ওয়ার্ডারদের মেহেরবাণীতে) আমাদের বেড়াবার রাস্তায় ইয়ার্ডের কাছে এসে বন্দেমাতরম বলে 'নমস্কার করে' হাত পাতে—বিড়ি না খেতে পেয়ে হেদিয়ে উঠেছে। অনুকূলদার চেনা লোকও দেখা গেল। আমরা আমাদের stock উজাড় করে বিড়ি দিয়াশলাই ছুঁড়ে দিলুম। তারা ভারি খুশী।

বোম্ব ইয়ার্ডের নরেন ঘোষ চৌধুরীও রায়বাহাদুরের সঙ্গে জেলের দুঃখ জানাবার ছল করে দেখা করতেন। তিনি যে নিজে জেলের ওয়ার্ডার জমাদারদের হাত করে প্রায় একটা underground রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিলেন, সেটাকে ক্যামোফ্লেজ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

নৃপেন মজুমদারও রায় বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতো, ছুটি পেয়ে বাড়ীও যেতো। কিরণ দে তো তাঁর সঙ্গে দেখা করে' করে' একাধিকবার ছুটি পেয়ে দেশে ঘুরে এসেছিল। অম্বিকা খাঁও তাঁর সঙ্গে দেখা করতো।

এদের সকলের ওপরই আর সকলের মন ছিল অপ্রসন্ন, কাউকে কাউকে কেউ কেউ বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখতেন। অম্বিকার ওপর বিরাগটা ছিল বেশী—বিশেষত আমাদের দলের। একে বে-পার্টির লোক, তায় তরুণ, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তার ওপর রায় বাহাদুরের সংস্পর্শ।

• তাকে অনেকেই এড়িয়ে চলতো এবং সে প্রায় কোণঠাসা হয়ে ছিল। অবস্থা দেখে নরেন সেন তাকে আশ্বাস দিতেন, ওরা তোমাকে বর্জন করে তো তুমি বেরিয়ে আমাদের সঙ্গে কাজ ক'রো। স্বহস্তে খুন করার মতন এলেম যে তরুণের আছে, তাকে অনুশীলন পার্টি তখনও appreciate করতো, ঠিক যে ব্যাপারটা ছিল তখন অনুশীলন পার্টির ওপর আমাদের দাদাদের বিরাগের অন্যতম কারণ।

আমার কিন্তু তার ওপর একটা সহানুভূতির ভাব বরাবরই ছিল, সে আমার হাঙ্গার-স্ট্রাইকের সাথী ছিল বলে। গণেশের কাণ্ডের পর বাঁকুড়ার আড্ডা ভেঙ্গে দিয়ে গণেশকে পাঠানো হয়েছিল মেদিনীপুরে, অজিত মৈত্রকে পাঠানো হয়েছিল বহরমপুরে এবং রঞ্জিত ও অম্বিকাকে পাঠানো হয়েছিল আলিপুরে। অজিতের সঙ্গে ছাড়াছাড়িটাই তার বড় দুঃখ, সে অজিতকে খুব ভালবাসতো, রায়বাহাদুরের কাছে তার দরবার ছিল, অজিতকে আর আমাকে একসঙ্গে থাকতে দিন।

স্বভাবতই রায়বাহাদুর এই সুযোগে তার কাছ থেকে কিছু কথা বার করবার চেষ্টা করেছেন, এবং অম্বিকাও, অন্তত রায়বাহাদুরকে ঠকাবার মৎলব করেও, তাঁকে সন্তুষ্ট করার মত কিছু না কিছু বলছেই।

সে হঠাৎ যেন অকারণেই বাছা বাছা ২।১ জনের দিকে চেয়ে খুব হাসতো। যাদুদা তাকে "পাগল" বলতেন। হাসিটা অনেক সময় যাদুদার সামনেই বেশী হ'ত। আমার মনে হ'ত তার দৃষ্টিটা অর্থপূর্ণ এবং সম্ভবত কারো কিছু কারচুপি বা গ্যাঁড়াকল আবিষ্কার করেছে এবং কাউকে সে-কথাটা বলতে পারছে না বলে' একাই হাসছে।

শেষ পর্যন্ত একদিন দেখা গেল, অজিত মৈত্র আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বদলী হয়ে এসেছে। নীচের ঘরে অম্বিকা নিজের কাছে তার খাট পাতলো—ভারি স্ফূর্তি।

অজিত স্বাস্থ্যবান যুবক, শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতি, পড়াশুনোয় ঝোঁক খুব। ছেলে রিক্রুট করা যাদের পেশা, তাদের পক্ষে লোভনীয় টার্গেট। অমর ঘোষের বিশেষ নজর পড়ল তার ওপর। "কুসঙ্গ" থেকে তাকে ছিনিয়ে আনার জন্যে যাদুদার সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি অজিতের পিছনে লাগলেন এবং অজিতকে রাজী করে তাকে দোতলায় আমাদের ঘরে আনার ব্যবস্থা করলেন। তিনি জানতেন না, ছেলেটা ভেতরে ভেতরে পেকে পাঁড় হয়ে গেছে।

সাধারণ হৈ-হল্লা এবং অম্বিকার Sentimental প্যাচাল ও ইয়ার্কির মধ্যে তার পড়া-শুনোর ব্যাঘাত হচ্ছিল বলে অজিত দোতলার অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে আসার জন্যে অমরবাবুর কথায় রাজী হয়েছিল এবং এইটে হয়েছিল অম্বিকার সবচেয়ে মর্মান্তিক অভিমানের কারণ।

অজিতকে কেউ একথাও বলেনি যে অম্বিকাকে কেউ স্পাই বলে মনে করে। অমরবাবুও (ঘোষ) অজিতের পড়াশুনোর সুবিধার অজুহাতেই তাকে উপরে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। অম্বিকাকে স্পাই মনে করে তার হাত থেকে অজিতকে উদ্ধার করা হচ্ছে জানতে পারলে অজিত তাকে ছেড়ে উপরে আসতো না নিশ্চয়ই।

যাই হোক, প্রথমে অম্বিকা অজিতকে কাছে রাখার জন্যে বুঝিয়ে চেষ্টা করে যখন ব্যর্থ হল, তখন যাদুদার কাছে দরবার শুরু করলে, কারণ তিনিই লীডার। যাদুদা তাকে হাঁকিয়ে

দিলেন—তিনি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, তিনি হস্তক্ষেপ করতে যাবেন কেন? তা ছাড়া এতে হয়েছেই বা কি? অজিত ওপরে থাকলেও তো তোমার কাছেই থাকবে।

তখন সে যাদুদার হাতে পায়ে ধরা শুরু করলে, তার খাটখানাও ওপরে নেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্যে। তাও হল না। সে দিন অম্বিকা কিছু খেল না। বিকালে যখন যাদুদার সঙ্গে গলিতে বেড়াচ্ছি, তখন অম্বিকা এসে আবার যাদুদার পায়ে পড়তে লাগলো। যাদুদা সরে সরে পাশ কাটালেন।

সমগ্র ব্যাপারটা দেখলুম। ভাবতে লাগলুম, ভালবাসার সেন্টিমেন্ট—যেন একটা অন্ধ জেদ চড়ে গেছে। সরকারী হার্ডল পার হয়ে এসে আবার এ কি কঠিন হার্ডল। ভাবতে লাগলুম, সারাদিন খেলে না, কারো কথা শুনলে না—বললে হাসে! ভাবতে লাগলুম, এ অবস্থায় অজিতের ওপর নিদারুণ অভিমানে আত্মহত্যার চেষ্টা করাও বিচিত্র নয়।

রাত্রে বন্ধ হওয়ার পর খাওয়া দাওয়া করে শুয়েছি, সবেমাত্র ঘুম এসেছে, এমন সময় হঠাৎ নীচের ঘর থেকে এক বিরাট হৈ হৈ আওয়াজ। আপনারা বিশ্বাস করুন, আমার সেই মুহূর্তেই মনে হয়েছে It must be Ambika. পরমুহূর্তেই বাইরের পাহারা ওয়ার্ডার এসে বললে নীচের এক বাবু গায়ে আগুন লাগিয়েছে। নরেন ব্যানার্জিও চিৎকার করে বললে, অম্বিকা গায়ে আগুন লাগিয়েছে।

হুইস্‌ল বাজলো, পাগলা-ঘন্টি বাজলো, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, জেলার, ওয়ার্ডারের দল ছুটে এল। আগুন তখন নেভানো হয়ে গেছে। ওরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে চলে গেল। নীচের ঘরের ওরা বলতে লাগলো ভয়ঙ্কর পুড়েছে, বাঁচে কিনা সন্দেহ।

সকালে তালা খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নীচের ঘরে গেলুম, সব শুনলুম। দরজার পাশেই যে পরদা ঘেরা রাতের পায়খানা ছিল, অম্বিকা তার মধ্যে গিয়ে সারা গায়ে কাপড় জড়িয়ে কেরোসিন ঢেলে (হারিকেন থাকতো কয়েকটা) আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে বিরাট আগুন। যন্ত্রণায় সে বেরিয়ে পড়ে ঘরের মাঝখান দিয়ে শেষ পর্যন্ত দৌড়ে গেছে। দুপাশে মশারি খাটানো, একটা মশারিতে আগুন ধরে গেছে।

নরেন ব্যানার্জি বললে, "আমি তখনো ঘুমিয়ে পড়িনি, সবেমাত্র ঘুম আসছে, হঠাৎ একটা আওয়াজে চোখ চেয়েই দেখি একটা বিরাট আগুনের থাম ছুটে এগিয়ে আসছে। এক লাফে উঠে পড়ে 'হেই' শব্দে চীৎকার করে আগুনটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়তেই সেটা ঘুরে আবার দরজার দিকে ছুটলো। আমি মশারির দড়িগুলো পটাপট ছিঁড়ে ফেলে, মশারির আগুন চাপড়ে নিবিয়ে কম্বল টেনে নিয়ে জলন্ত আগুনটাকে চাপা দিয়ে মেঝেয় পেড়ে ফেলেছি। একজন কালতুও কম্বল নিয়ে আমার সঙ্গে আগুনের ওপর চাপা দিলে। আগুনটা নিভিয়ে ফেলা হল, সকলে ভিড় করে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দেখছে, একটু পরেই সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি এসে পড়লো এবং তাড়াতাড়ি ২।১ কথায় ব্যাপারটা শুনে নিয়ে ওকে খাটে শুইয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেল।"

অম্বিকার বিছানা থেকে একটা চিঠি পাওয়া গিয়েছিল, সেটা সরিয়ে ফেলা হল। ছোট চিঠি বেশ মনে আছে, কারণ তাতে একটা ইংরেজী শব্দ ছিল এবং তার বানান ভুল ছিল। তার মধ্যে একটা কথা ছিল, "বন্ধুর প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাকে কেউ বিশ্বাস করে না। তাই এই Step নিলুম।" এই Step কথাটারই বানান ছিল Stape.

"আমি দেখি" "আমি দেখি" করে অনেকেই চিঠিটা দেখলো, সকলকে দেখতে দেওয়া হলনা, লুকিয়ে ফেলা হল। তারপর সেটাকে বন্ধ ইয়ার্ডের নরেন ঘোষ চৌধুরীর মারফত বাইরে "Forward" কাগজে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সংগে দেওয়া হল এক ঘোরালো বিবরণ, অম্বিকার গুপ্তচরবৃত্তির বিবরণ। কয়েকদিন পরে "Forward" কাগজে অম্বিকার চিঠির ফোটোষ্টাট কপি এবং সে বিবরণ ছাপা হল। দেশশুদ্ধ লোক জানলো, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে এক রাজবন্দী স্পাই আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা করেছে। অজিত ঘটিত ব্যাপার কেউ জানলো না।

যাই হোক, হাসপাতালে অম্বিকাকে বাঁচাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাদের ইয়ার্ডে এসে যাদুদার সঙ্গে যখন কথা কইছেন, আমি গিয়ে দাঁড়ালুম। শুনলুম পুড়ে গেছে সর্বাঙ্গ, এবং ভীষণভাবে—বাঁচবে না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যাদুদাকে বললেন But I can't understand why he punished himself like that.

আমরা কেউ হাসপাতালে তাকে দেখতে যাইনি। কিন্তু তার জ্ঞান ছিল। বেলা প্রায় নটার সময় হাসপাতাল থেকে কে একজন খবর দিলে—অম্বিকা অনুকূলদাকে ডেকে পাঠিয়েছে। যেতে তাঁর একটু দেরী হয়েছিল। তিনি হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে বললেন, "হয়ে গেছে। যে আমাকে ডেকে পাঠালে, সে যে এত শীঘ্র মরবে, তা কেমন করে বুঝবো? আমাকে ডেকেছিল একেবারে অন্তিম সময়ে। তার শেষ কথাটা আর শোনা হল না, অজানাই থেকে গেল!"

অনুকূলদা বার বার আফশোষ করতে লাগলেন। আমরা কেউ তখন জানতুম না, অম্বিকার সঙ্গে অনুকূলদার বাইরে পরিচয় ছিল। তিনি ঘটনার ত্বরিত বিকাশে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে চুপ করেছিলেন। এখনও চুপ করেই থাকলেন। ফরোয়ার্ডে খবর বেরোনোর পরও চুপ করেই ছিলেন।

মরবার সময় অম্বিকা অজিতকে ডাকেনি, তার স্মৃতিতেই সে আগুন লাগিয়েছিল। ঘটনার পরিণতি দেখে অজিত কাঠ হয়ে গিয়েছিল। সে-ও চুপ করেই থাকলো।

আমার মনটা কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না যে, অম্বিকা স্পাই ছিল। কিন্তু এই সায় না দেওয়াটা ছিল সিডিশন বিশেষ। আমি সামান্য লো , পার্টিম্যান, দাদাদের বিরোধী মনোভাব মহাপাপ, মন থেকে সেটা ঝেড়ে ফেলারই চেষ্টা করলুম। কিন্তু অন্ধ আনুগত্যের অস্পষ্টতার মধ্যে যেন একটু নতুন জ্ঞানের রেখাপাত আমাকে মাঝে মাঝে একটু অন্যমনস্ক করে দেয়, আবার সে কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলি। কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা পুরানো হয়ে বিস্মৃতির রাজ্যের এলাকায় প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেদিনীপুর থেকে পড়াশুনোর যে বিপুল আগ্রহ এবং অভ্যাস নিয়ে আলিপুরে এসেছিলুম, তার জের এখানেও চলছিল। আমি Collectorate Library থেকে বই আনিয়ে পড়তে লাগলুম। প্রথমে পড়লুম Royal Commission-এর Report-গুলো—Currency Commission, Fiscal Commission প্রভৃতি। পড়ি-শুধু Recomendation-গুলো। ১৬ সালের Industrial Commission-এর রিপোর্ট থেকে মালব্যের Note of dissent পড়লুম—সুবিখ্যাত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক দলিল। ধীরে ধীরে একটা ধারণা গড়ে উঠছিল, দেশের অবস্থার কথা কি ভাবে বিচার করতে হয়, কত কথা জানতে হয়।

বুঝি, না বুঝি, নিষ্ঠাসহকারে পড়ে যাই। মনে হয়, ভারত উদ্ধার ব্যাপারটাকে আমরা যেমন over-simplify করে বসে আছি, ব্যাপারটা তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক জটিল।

ক্রমে রমেশ দত্তের Economic History of Ancient India এবং Victorian Age পড়লুম। কিছু জ্ঞান হল, আনন্দও হল। শেষে আনালুম Census Report, এবং তার নানাবিধ পরিসংখ্যানের চার্ট-টেবল নিয়ে বেশ কিছু দিন মেতে থাকলুম। একখানা মোটা এক্সার্সাইজ বুক ভরে নতুন নতুন চার্ট-টেবল তৈরী করে লিখে রাখতে লাগলুম। তার একটা মনোহারী নমুনা এখানে না দিয়ে পারছি না।

১৯২১ সালের Census Report হইতে—

বিভিন্ন জাতি হিসাবে জেল-কয়েদীর সংখ্যা (বঙ্গদেশ)—

জাতি		লোকসংখ্যা		কয়েদী সংখ্যা
ব্রাহ্মণ	—	১৩১৪৪৩০	—	৪২৫
কায়স্থ	—	১২৯৫৯০৩	—	৫৪১
বৈদ্য	—	১০২৮৭০	—	৩৫
কৈবর্ত্ত (চাষী)	—	২২০৬৩৪৮	—	১৭০
„ (জেলে)	—	৩৮৩২২৫	—	৪৭
পোদ	—	৫৭৫৯৯৪	—	৭৮
রাজবংশী	—	১৬৬৩৯৪৮	—	১১৫
নমঃশূদ্র	—	২০০৪৯১১	—	২৯৩
বৈষ্ণব	—	৩৭৭৬৯২	—	৮৮
সাঁওতাল	—	৭১০৭৭৩	—	৬২
বাউরী	—	৩০৩০১৩	—	২৫
বাগদী	—	৮৮৬৮২১	—	২৩৬
ধোপা	—	২২৭২৯৫	—	৩৮
কাওরা	—	১১০১৪১	—	২৯
মুচি	—	৭১৭২২৫	—	১০৭
চামার	—	৪৭৬৫৪	—	৬৫
হাড়ি	—	১৪৩৫৯৩	—	৫০
ডোম	—	১৪৭৮৫৯	—	৮৫

জাতি, লোক ও কয়েদী সংখ্যার অনুপাত ও অপরাধ-প্রবণতা—

ডোম—	১৭৩৯ জন প্রতি ১ জন কয়েদী—	১ম
চামার—	২২৭১ „ „ „ „ —	২য়
কায়স্থ—	২৩৯৫ „ „ „ „ —	৩য়
হাড়ি—	২৮৭২ „ „ „ „ —	৪র্থ
বৈদ্য—	২৯৩৯ „ „ „ „ —	৫ম
ব্রাহ্মণ—	৩০৯৩ „ „ „ „ —	৬ষ্ঠ
বাগদী—	৩৭৫৭ „ „ „ „ —	৭ম

কাওরা—	৩৭১৮ জন প্রতি ১ জন, কয়েদী—						৮ম
মুচি—	৩৮৯৯	"	"	"	"	—	৯ম
বৈষ্ণব—	৪২৯২	"	"	"	"	—	১০ম
ধোপা—	৫৯৮১	"	"	"	"	—	১১শ
নমঃশূদ্র—	৬৮৪৩	"	"	"	"	—	১২শ
পোদ—	৭৩৮৪	"	"	"	"	—	১৩শ
কৈবর্ত্ত (জেলে)—	৮১৫৪	"	"	"	"	—	১৪শ
সাঁওতাল—	১১৪৬৪	"	"	"	"	—	১৫শ
বাউরী—	১২১২০	"	"	"	"	—	১৬শ
কৈবর্ত্ত (চাষী)	১২৯৭৮	"	"	"	"	—	১৭শ
বাগ্দবংশী—	১৩৬৫৩	"	"	"	"	—	১৮শ

মন্তব্য—দেখা যাইতেছে যে, অপরাধ প্রবণতায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য অন্যান্য তথাকথিত নিম্নবর্ণকে পরাজিত করিয়া হাড়ি, ডোম এবং চামারের সঙ্গে Neck to Neck চলিয়াছে। ইহার সঙ্গে যদি ধরিয়া লওয়া যায় উচ্চবর্ণের শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক প্রভাবের সুযোগে তাহাদের অনেক অপরাধ আদালত পর্যন্ত পৌঁছায় না এবং অনেক অপরাধ আদালতে প্রমাণ হওয়াও কঠিন হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়, তাহারাই অপরাধপ্রবণতায়ও শীর্ষস্থানীয়।

*　　　*　　　*

যাই হোক, আমার সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণার এই সূত্রপাত যে উৎসাহব্যঞ্জক, তা স্বীকার করতেই হবে। যা কিছু পড়ি, তা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি, কিছু কিছু note সংগ্রহ শুরু করলুম। ভারতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একখানা অদ্ভুত চমৎকার বই সে সময়ে বেরিয়েছিল "Our Empire in Asia"—by Torens, M. P. বইটা অনেককাল আগের লেখা, অনেকদিন Out of print থাকার পর এলাহাবাদের পাণিনি অফিস থেকে Reprint হয়ে বেরিয়েছিল। কোম্পানীর আমলে ইংরাজদের বেইমানী, বিশ্বাসঘাতকতা, জাল-জুয়ারীর ইতিহাস। একজন ইংরাজ এম পি যে এমন বই লিখতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতুম না। বইটার বাংলা অনুবাদ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি। ভারতে ইংরেজ শাসনের সত্য ইতিহাস লিখতে হলে আজও সে বইটা হবে একটা অপরিহার্য উপাদান।

প্রোফেসর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর লিখিত একখানা ছোট বই চার্বাক ষষ্ঠি (ইংরাজী) কিছুদিন আগে বেরিয়েছিল। আমি সেটা কিনেছিলুম এবং পড়ে কিছু জ্ঞান এবং প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলুম। মহামহোপাধ্যায় ভাগবত শাস্ত্রীর ভূমিকাও চমৎকার। বস্তুবাদী দর্শন যে প্রাচীন ভারতের জনজীবনে গভীর ও ব্যাপক প্রতিষ্ঠা লাভ করে বৈদিক যুগেই বৈদিক ধর্মের আদর্শ এবং আচার-অনুষ্ঠানকে বহুদিনব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আঘাতের পর আঘাত হেনে চলেছিল, পরবর্তী যুগের দার্শনিক পণ্ডিতের দল যে এককাট্টা হয়েও মিথ্যা অপপ্রচারের সাহায্য ছাড়া চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনকে কোণঠাসা করতে পারেনি, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" কথাটা যে চার্বাকের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জন্য ঐ বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতেরাই

তাঁর উক্তি বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন, এসব কথা বিংশ শতাব্দীর দুইজন সর্বজনমান্য বাঙ্গালী পণ্ডিতের লেখায় প্রথম জানতে পেরে আমার বস্তুবাদমুখী মনোভাব ও চিন্তাধারা যেন একটা দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড়ালো। পরবর্তীকালে মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে ধনবাদী দুনিয়ার ভাববাদী দার্শনিকদের অপপ্রচারের স্বরূপ বুঝতে তাই আমার বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

এ বইটাও বাংলায় অনূদিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি। আমি বইটার সংক্ষিপ্ত মর্মানুবাদ লিখে রাখলুম।

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার দণ্ডিত আসামীরা আমাদের পাশের ইয়ার্ডেই থাকতো, বলেছি। তাদেরই সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকজন কিছুদিন পরে ধরা পড়ে ডেটিনিউ হয়ে আমাদের ইয়ার্ডে এল এবং নীচের ঘরে আড্ডা গাড়লো—উত্তরপাড়ার বিখ্যাত আর্টিষ্ট চৈতন্যদেব চ্যাটার্জি, ভূমেশ চ্যাটার্জী, বঙ্কিম চ্যাটার্জী, তারকেশ্বরের শচীন দত্ত, ভবানীপুরের বিশ্বনাথ মুখার্জি (ইনি এসেছিলেন সকলের শেষে) প্রভৃতি।

চৈতন্যদেবের একটা প্রিয় গান ছিল "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধূলির তলে"। আমি ঠাট্টা করতুম—"ঘাড় ধরে' বলে'। একদিন এক প্যারডি লিখে ফেললুম—

(তোমার) মাথা নত করে দাও হে আমার চরণ ধূলির তলে
কানমলা খাও নাকে খৎ দাও ভাসহে চোখের জলে।
শুনিয়ে তোমার গৌ রব তান
ঝালাপালা হল আমাদের কান
(এবার) ঘানিগাছে দিয়ে ঘুরায়ে ঘুরায়ে ভাঙ্গিব তোমার তেলে।
আপনারে আর ক'রোনা প্রচার নিজ ঢাক পিটাইয়ে
দেখাইব মজা এবার তোমায়—হয়েছে বড়ই ইয়ে।
সকলের সাথে করিয়া চালাকি
বড় বেঁচে গেছ—আমি ছিনু বাকি—
আমার চরণে লইয়া শরণ এবারে বাঁচিয়া গেলে।

একদিন গেয়ে শুনিয়ে দিলুম। বঙ্কিম কানমলা খেয়ে নমস্কার করলে, পাপকথা কানে গেছে। পরে দেখেছি তার গলায় তুলসীর মালা, সর্বক্ষণ হরি হরি বলে।

নরেন সেন ওরফে রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীকে ওখান থেকে বদলী করা হবে,—রায় বাহাদুর তাঁকে একবার আপ্যায়িত করতে এসেছেন।

সেদিন বিকালে রায় বাহাদুর এসে নরেনবাবু বলে আলাপ করতেই তিনি মূর্চ্ছা গেছেন। ঐ দিকক্ষণ থেকে রায় বাহাদুর আমাদের ইয়ার্ড থেকে বেরিয়েই গলিতে এক শাবলের ঘায়ে ধরাশায়ী হয়েছেন। এই সূত্রে অনন্তহরি এবং প্রমোদ রঞ্জনের (দক্ষিণেশ্বর ইয়ার্ডের) ফাঁসী হয়।

ইতিমধ্যে সতীশ পাকড়াশী এসেছিলেন এবং নীচের ঘরেই উঠেছিলেন। নীচের ঘরটায় রীতিমত ভিড় হয়ে গিয়েছিল। যতীন দাস এবং সূর্য সেনও এসেছিলেন এবং উপরের ঘরে ছিলেন। কিছুদিন পরে যতীন দাসকে লাহোর ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে সেখানে পাঠানো হয়।

হিন্দুস্থানী ওয়ার্ডার তেওয়ারী ছিল এক অদ্ভুত লোক। সে কথনো কারো সঙ্গে কথা কইতো না, কিন্তু নীরবে আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করতো, বাইরে থেকে রোজ "ফরোয়ার্ড" কাগজ এনে দিত। একদিন গেটে হঠাৎ তাকে সার্চ করা হল, তার উরুতে জড়ানো "ফরোয়ার্ড" বেরিয়ে পড়লো। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন্ বাবুর জন্তে কাগজ নিয়ে যায়? সে জবাব দিলে "নেই বোলেগা।" তাকে বলা হল "তুমারা জেহেল হোগা"—সে জবাব দিলে "হামারা মালুম হায়।"

মালেয়ার আমল বলে তাকে জেল দেওয়া হল না, ডিসমিস করা হল। সে নীরবে চলে গেল।

বিলেত থেকে টেগার্ট (তখন ছুটিতে ছিল) মালেয়াকে prosecute করার পরামর্শ দিয়েছিল, রায বাহাদুর সম্বন্ধে গাফিলতী করার দায়ে। সে মতলব খাটেনি। মালেয়াকে বদলী করা হল, হাচিন্স নামক এক I. C. S. Superintendent হয়ে এলেন। I. M. S. বা অন্ততপক্ষে I. M. D. ছাড়া এর আগে জেলের মধ্যে কখনো I. C. S.-এর শাসন ছিল না।

ইনি এসেই, জেলের অবস্থা-ব্যবস্থা কিছুর পরোয়া না করেই নানারকম order চালাতে শুরু করলেন। জেলের officer-রা বুঝিয়ে কূল পায় না, সকলেই অসন্তুষ্ট। আমরা রাত্রে গান গাই শুনে হুকুম দিলেন বন্দীরা জেলে গান গাইতে পারবে না। ফল হল, রাত দুপুরে সবাই মিলে গান শুরু করে দিতুম। officer-রা ব্যাপারটাকে বেশী দূর গড়াতে দিলে না। হাচিন্দ্রকে (বঙ্কিম নাম দিয়েছিল) বুঝিয়ে দিলে State prisoner-দের বিগড়ে দিলে তারা সমগ্র জেলের কয়েদীদের বিগড়ে দেবে, সামলাতে পারবে না।

এই সময়ে একদিন বঙ্কিম চ্যাটার্জির পিতৃবিয়োগের খবর এল। শ্রাদ্ধ করার জন্য বাড়ী যাওয়ার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর হল না। ইয়ার্ডের মধ্যেই হবিষ্যের জায়গা করা হয়েছিল, কিন্তু শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা হতে পারে না, অথচ শ্রাদ্ধের তারিখ এসে পড়লো। হাচিন্দ্রের সঙ্গে গোলমাল বাধলো। ফলে বঙ্কিমের খাওয়া বন্ধ হল, আমরাও জানিয়ে দিলুম, আমাদেরও খাওয়া বন্ধ। পাকেচক্রে একটা হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক লেগে গেল।

রাজবন্দীর পিতৃশ্রাদ্ধে বাধা, হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক, বাইরে খবর ছড়িয়ে পড়লো—হৈ চৈ শুরু হল। হাচিন্দ্রের প্রথম পরামর্শদাতা যে I. B. ইনস্পেক্টর পুরোহিত নিয়ে গিয়েছিল, সে গোলমাল বাধিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে, হাচিন্দ্র একা পড়ে গেছে। গভর্নমেন্টের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়ে সারতে পারে না। আমাদের ইয়ার্ডে যখন রাউণ্ডে আসে, আমরা বিছানায় শুয়ে ঠ্যাং-এর ওপর ঠ্যাং তুলে নাড়া দিয়ে সম্বর্দ্ধনা করি। গোঁ গোঁ করতে করতে বেরিয়ে যায়। কিন্তু পরের দিন আবার আসতে হয়—duty। ওপরওয়ালারাও মিটিয়ে ফেলার পরামর্শ দেয়।

এমনি কয়েকদিন চলার পর একদিন অমরদা' I. B. office-এ গিয়ে একজন officer নিয়ে জেলে এসে সকলের সঙ্গে দেখা করে ব্রাহ্মণ-ভোজনাদির ব্যবস্থা করে গণ্ডগোলটা মিটিয়ে দিয়ে গেলেন। হাচিন্দ্র খানিকটা ঢিট হল।

আমার বাড়ীর মামলায় আমাকে কিছুতেই কোর্টে হাজির হতে দিলে না। মাঝে মাঝে প্রভাস দেখা করে যায়। তার কাছে একদিন খবর পেলুম, ভাগ্নীর অবস্থা খারাপ, একবার

আমাকে দেখতে চায়। জামাই I. B. office-এ দরবার করছে, আমারও একটা দরখাস্ত করা দরকার। আমি ভেবে-চিন্তে এক দরখাস্ত করলুম "through D. I. G. I. B. C. I D" কয়েকদিন পরে এক order নিয়ে escort এসে হাজির, আমাকে বাড়ী নিয়ে যাবে একদিনের জন্যে।

বৃদ্ধ I B. Inspector হরিদাস মুখার্জি এবং দুজন Armed Police সঙ্গে চললো। বাড়ী গিয়ে ঘরে ঢুকছি, হরিদাস বাবু সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকতে চান, বলেন দোষ কি? উনি তো আমার মেয়ের মতন! আচ্ছা, আচ্ছা, আমি দরজাতেই থাকছি।

ভাগ্নীর সঙ্গে কথা কয়ে একটু মাথায় হাতটাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বেরিয়ে আসছি, হরিদাস বাবু তাড়াতাড়ি আমার পাশ কাটিয়ে আসতে গিয়ে দালানের থামের গোড়ার একটা কোণে মস্ত এক হোঁচট খেয়েছেন। ফিরে দেখি, পায়ের একটা আঙ্গুলের নখ উল্টে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। দেখে আমি বললুম, যাক, বাঁচা গেল!

হরিদাস বাবু হকচকিয়ে মুখপানে চেয়ে বললেন, বলেন কি! আমি বললুম, বিধাতা পুরুষের লেখা ছিল, আমার বাড়ীতে I. B Officer-এর রক্তপাত হবে। কত সংশয় সেরে গেলেন ভেবে দেখুন। তখন হরিদাস বাবু এক-গাল হেসে বলেন, তা বটে, বেশ বলেছেন!

তিনি আমাকে বাইরের ঘরে রেখে পাহারা বসিয়ে দিয়ে চলে এলেন—পরদিন বিকালে এসে জেলে ফিরিয়ে আনবেন। ওদের ওপর হুকুম, ওরা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আমি ওদের সঙ্গে গল্প শুরু করে আলাপ জমিয়ে নিলুম। রাত্রে যখন বাড়ীর ভেতর থেকে যাচ্ছি, ওরা বলাবলি করছে, এখন কি আমরা বাবুর সঙ্গে খাওয়ার জায়গায় গিয়ে বসবো? আর আমরা যদি না যাই, আর বাবু যদি পালিয়ে যায়, তাহলে আমরাই হব দায়ী। যেমন চাকরী, তেমনি হুকুম! ঝাড়ু মারো!

আমি ওদের আশ্বস্ত করে খেতে গেলুম। ফিরে এসে পাহারাদারদের খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলুম এবং শেষ পর্যন্ত কিছু খাবার আনিয়ে দিলুম দোকান থেকে।

সকালে ওদের সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাস্নান করে এলুম—বাড়ীর কাছেই গঙ্গা। লোকে হা করে চেয়ে দেখছে, দেখে ভালই লাগলো, যেন একটা নতুন ঐশ্বর্য!

বিকেলে জেলে ফিরে এলুম। ১৭ সাল এসে পড়েছে। বাইরে internment-এ পাঠানো শুরু হয়েছে। হঠাৎ একদিন আমারই internment-এর order এসে হাজির। বাড়ার মামলা যেখানে ছিল, সেইখানেই রইলো। চললুম পাততাড়ি গুটিয়ে পাবনা জেলার কামারখন্দ গ্রামে।

পনেরো

পাবনায় অন্তরীণ যাত্রার কথা আপাতত স্থগিত রেখে আমাকে একটা গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করতে হচ্ছে।

বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত বিরাট পুস্তক "বিপ্লবী-জীবনের স্মৃতি"তে অম্বিকার আত্মহত্যা সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেটা আমার বিবরণ থেকে আগাগোড়া সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের একটা পৃথক গল্প।

কিন্তু যেহেতু আমি আমার বিবরণ বাতিল করতে প্রস্তুত নই, অতএব যত পাপই হোক, আমাকে যাদুদার বিবরণ বিশ্লেষণ করতেই হবে। সব দ্বিধা-সঙ্কোচ ত্যাগ করে' যুক্তি ও সাক্ষ্যপ্রমাণের কষ্টিপাথরে সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে হবে। কারণ বিষয়টা তুচ্ছ নয়।

প্রথমে যাদুদার প্রদত্ত বিবরণটা উদ্ধৃত করা যাক। তিনি লিখেছেন (বিপ্লবী-জীবনের স্মৃতি—৫১৩ ১৪ পৃষ্ঠা)—

"আমি ১৯২৬ সালে আলিপুরে বদলি হয়ে আসি আলিপুরে রাজবন্দী মহলের একটা দুর্নাম দূর পর্যন্ত গিয়েছিল। আমাদের নতুন করে পুনর্গঠন-গঠনের কাজ চলছিল—বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী দুটি সংগঠন, 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর' এক হয়ে যাচ্ছিল। সুতরাং সন্দেহ-চরিত্র যারা, তাদের এড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা কওয়ার স্থান আলিপুর জেলেই করে নিতে হয় (১)। আমার চিরশ্রদ্ধেয় বন্ধু নরেন সেন: তার সঙ্গে পরামর্শ করলাম··· স্থির হল রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী একতলায় বাছা বাছা লোকদের নিয়ে বসবাস করবেন। আমি থাকবো দোতলায় বেণের দোকান খুলে পাঁচ রকম ভাল মন্দ মশলা নিয়ে (২)। একজন খাঁ (হিন্দু) আমাদের সঙ্গে দোতলায় থাকতো (৩)। ·· তার সম্বন্ধে ভাল মন্দ কিছুই আমি জানতাম না। জেনেছিলাম সে বিদ্রোহী সংসদের লোক। বিদ্রোহী সংসদে চাটগাঁয়ের কয়েকটি লোকও ছিল। এদের পরস্পরের মধ্যে তেমন মিল ছিল না—মন-ভাব-ভার অবস্থা ছিল।···· খাঁর সঙ্গে অন্য দলের কেউ বিশেষ সৌহার্দ্য রাখতো না। ওটা ছিল দলাদলির ব্যাপার। আমি তাকে আদর করে একটা নামে ডাকতাম। সে তাতে ভারি খুশি হত। হায়রে, স্নেহ বুভুক্ষু! ·· ·· আমার জেলখানার কর্তা বলেন--আমার জেলখানা সর্বদা সর্বত্র প্রহরী বেষ্টিত। আমি কোথায় কি হচ্ছে জানি না। অথচ গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আমায় জানায় কবে কি ঘটছে। আপনি সতর্ক থাকবেন (৪)। "আমি প্রশ্ন করলাম, আমায় সতর্ক করার অর্থ কি? আমি তো জেলে রাজনীতি করি না। তিনি বললেন, বেশী প্রশ্ন করা নিরর্থক। তাঁর সন্দেহ, জেল থেকে গোয়েন্দা বিভাগে খবর যায় (৫)।

"আমার শরীরে একটা অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সে জন্য আমাকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় ভীষণ হিন্দু-মোস্লেম দাঙ্গা শুরু হয়। পুলিশ দাঙ্গা থামাতে ব্যস্ত ছিল। আমায় জেলখানায় ফিরিয়ে আনার পাহারা পাওয়া না যাওয়ায় আমাকে অনর্থক কিছু বেশিদিন হাসপাতালে থাকতে হয় (৬)।

"এরই মধ্যে খাঁ সাহেব একদিন হাসপাতালে এসে উপস্থিত। বলল, তার ভাই হাসপাতালে অন্যত্র রোগী ছিল। তাকে সে দেখতে আসে (৭)। সেই সুবিধায় আমার সঙ্গে দেখা করে নেয় (৮)। খেদ করে বলে, তাকে কেউ ভালবাসে না (৯)। আমি কেন জেলে ফিরে যাচ্ছি না? কতদিনে যাব? কবে যাব? ইত্যাদি—(১০)। বেশ বুঝতে পারলাম, তার হৃদয় বড়ই ক্ষুধাতুর। তাকে অনেক ভাল কথা বললাম। সে সময়মত বিদায় নিল (১১)। সেদিনের বিদায় বড় ব্যথাদায়ক (১২)। সে আমার পায়ের ধুলো নেবে—আমি দেব না। এটা আমি বহুকাল ধরে পালন করে আসছি। সে আমার সঙ্গে দস্তুরমত

ধস্তাধস্তি আরম্ভ করে দিল। পায়ের পাতায় হাত দিতে না পারলেও হাঁটুর নীচে ছুঁয়ে সেই হাত মাথায় লাগিয়ে চলে গেল (১৩)।

"তার পর গেছে একদিন। আমি সংবাদ পেলাম, খাঁ গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। যেদিন সে শম্ভুনাথ হাসপাতালে আসে, ঐদিন রাত্রে সে নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল। তা সামলে রাখা হয়। পুলিশের তরফ থেকে ধুম করে অনুসন্ধান চলে (১৪)। সে আত্মহত্যা সত্যই কি করেছিল? অথবা অন্য কেউ বা কারা তাকে ঐ ভাবে হত্যা করেছিল (১৫)? ...আমি হাসপাতাল থেকে জেলে প্রত্যাবর্তন করলে চিঠি আমায় দেওয়া হয় (১৬)। তাতে সে বহু অপকর্মের স্বীকারোক্তি করে যায় (১৭)। জেল থেকে সে গোয়েন্দা বিভাগকে খবর সরবরাহ করতো। সময়মত এই চিঠি দৈনিক ফরোয়ার্ড কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া হয়। চিঠিখানি জেলের শত সতর্কতা এড়িয়ে গোপন পথে শরৎ বোসের কাছে পাঠানো হয়।"

* * * *

দেখা যাচ্ছে, অজিত মৈত্র নামক একজন ডেটিনিউয়ের অস্তিত্বই যেন যাদুদার অজ্ঞাত ছিল, বা অম্বিকার আত্মহত্যার ব্যাপার সম্পর্কে অজিত মৈত্র নামক কোন ডেটিনিউয়ের কোন সম্পর্কের কথা যাদুদা জানতেন না। অথচ অম্বিকার যে চিঠি ফরোয়ার্ডে ছাপা হয়েছিল, সেটা যে অম্বিকার স্বহস্ত লিখিত, এটা দেখাবার জন্য চিঠিটার যে ফটোষ্টাট কপিই ছাপা হয়েছিল, তাতে "ভাই অজিত" বলে সম্বোধন করেই চিঠিটা শুরু হয়েছিল। সে চিঠিটা যে যাদুদাকেই দেওয়া হয় এবং তাঁর ব্যবস্থাতেই ফরোয়ার্ডে পাঠানো হয়, তা তিনি নিজেই বলেছেন। সুতরাং অজিতের নামটা যাদুদা ভালো করেই জানতেন।

অজিত চিঠিটা চেয়েছিল,—কিন্তু তাকে সেটা দেওয়া হয়নি এই কথা বলে' যে, এখন নয়, পরে নিও, আমাদের কাছেই থাক, It is your property, তুমি পাবে। তারপর সেটা ফরোয়ার্ডে পাঠানো হয়।

যাদুদার গল্পের ১৭টা জায়গায় আমি নম্বর দিয়েছি, কারণ ওর সবগুলিই ভুল। আর দেড় পৃষ্ঠার গল্পে যদি ১৭টি ভুলের একটি সুন্দর মালা গাঁথা হয়, তা হলে স্বভাবতই মনে হয়, ভুল নয়, সজ্ঞান গল্প রচনা।

কথাটা বড় দুঃসাহসের কথা। কিন্তু এর চেয়ে দুঃসাহসের কথাও আছে! এমন বেপরোয়া ভাবে এই গল্প রচিত হয়েছে যে রচয়িতার হুঁস নেই যে, অনেক কথা শুধু পরস্পর বিরোধী নয় অনেক কথা কোন প্রকারেই সম্ভব হতে পারে না। এমন বেপরোয়া হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, বিপ্লবান্দোলন সম্পর্কে তাঁর মত একজন নেতার গল্পের কেউ যে কোনদিন প্রতিবাদ করবে, একথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি—বিশেষত এত বছর আগের এক 'স্পাই'-সংক্রান্ত গল্পের।

কিন্তু আমার গল্প শুধু অজিত মৈত্রই সমর্থন করেন, এমন নয়, স্বয়ং অমর ঘোষও সমর্থন করেন, যিনি যাদুদার সঙ্গে পরামর্শ করেই অজিতকে অম্বিকার প্রভাব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।

এখন যাদুদার গল্পের বিশ্লেষণ করা যাক :—

(১) অনুশীলন-যুগান্তরের মিলনের জন্য কথা কওয়ার স্থান নাকি "আলিপুর জেলেই

করে নিতে হয়।" শুনলে হাসি পায়। আলিপুরে সে সময় অনুশীলনের একটিমাত্র নেতা ছিলেন নরেন সেন এবং যুগান্তরেরও একটি মাত্র নেতা ছিলেন যাদুদা! মিলনের কথা-বার্তার সুযোগ হয়েছিল ২৫ সালে মেদিনীপুর জেলে এবং কথাবার্তা অনেকখানিই এগিয়েছিল। কারণ সেখানে দুই দলের অনেকগুলি নেতা অনেকদিন একত্র ছিলেন।

মিলনের কথাবার্তার প্রথমভাগ মেদিনীপুর জেলে, এবং final amalgamation-এর জন্যে সকল দলের নেতাদের তিন দিনব্যাপী গুপ্ত সম্মেলন ২৮ সালে আমারই ঘরে হয়—সে কথা যথাসময়ে আসবে। আর মাঝখানে ২৬ সালে আলিপুর জেলে যাদুদা এবং নরেন সেনের আলাপন।

(২) "স্থির হল, রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী একতলায় বাছাবাছা লোক নিয়ে বসবাস করবেন। আমি থাকবো দোতলায় বেণের দোকান খুলে পাঁচ রকম ভাল-মন্দ মশলা নিয়ে।"

"বাছাবাছা লোক' মানে অনুশীলন ও যুগান্তরের বাছাবাছা নিশ্চয়—যেমন ধরুন নৃপেন মজুমদার, কিরণ দে প্রভৃতি। আর "বেণে মশলা" যেমন ধরুন, অমর ঘোষ, মনোমোহন ভট্টাচার্য, অনুকূল মুখার্জি প্রভৃতি। হাসবো না কাঁদবো, ভেবে পাই না। ২৩ সালে রেগুলেশন থ্রি-র প্রথম ব্যাচে যুগান্তরের দাদারাই অন্তত ডজনখানেক এবং তাঁরা যে প্রথমে দোতলাটাই দখল করেছিলেন, ফিমেল ইয়ার্ড থেকে উপেনদা প্রভৃতি ফিরে এসে যে দোতলাতেই উঠেছিলেন, সেই থেকে ২৮ সাল পর্যন্ত দোতলাটা ছিল প্রধানত যুগান্তরদলেরই একচেটিয়া এবং নেতাদের একচেটিয়া। অন্যদল বা ঝড়তি পড়তি এবং জুনিয়ার দলই বরাবর একতলায় থাকতো। এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম করা স্বয়ং হিটলার এলেও পারতো না।

(৩) "একজন খাঁ (হিন্দু) আমাদের সঙ্গে দোতলায় থাকতো।" হায় বেতুল! সে যে পায়ে আগুন লাগিয়েছিল নীচের ঘরে এক তলায়! "পাঁচ মিশেলী" দেখাবার জন্যে তাকে দোতলায় আনা যে একটা দুপুরে ডাকাতি! আর অম্বিকা নামটা উচ্চারণে এমন সর্বাত্মক আপত্তিটা কি 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি'র একটা উৎকট দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছু? কিছু ঢাকা দেওয়ার গরজে অম্বিকা নামটা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে।

(৪) "জেলখানার কর্তা বলেন গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আমায় জানায় (জেলে) কবে কোথায় কি ঘটছে—আপনি সতর্ক থাকবেন।" কোনো স্পাই যদি জেল থেকে গোয়েন্দা বিভাগকে গুপ্ত খবর দেয়, তখন সেটা জেল কর্তৃপক্ষকে জানাবে স্বয়ং গোয়েন্দা বিভাগ, কেন যাদুদা? আপনাকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্যে? ভগবান!

অম্বিকার চিঠির মত চিঠি যখন বিপ্লবীরা ফরোয়ার্ডে গোপনে পাঠায়, তখনই গোয়েন্দা বিভাগের প্রয়োজন হয় জেল কর্তৃপক্ষকে গাফিলতী করার দায়ে ধমক দেওয়ার। আর জেলের মধ্যে "কোথায় কি ঘটছে" সবই বিপ্লবীকাণ্ড এবং স্পাইয়ের এলাকা?

(৫) "আমি তো রাজনীতি করি না! তাঁর সন্দেহ, জেল থেকে গোয়েন্দা বিভাগে খবর যায়।" কথাটা কি "আমি তো কলা খাইনি" ধরনের হল না? spy theory খাড়া করার জন্য এতটা বাহুল্য কি নিষ্প্রয়োজন নয়?

(৬) "অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ দাঙ্গা থামাতে ব্যস্ত ছিল। আমায় জেলখানায় ফিরিয়ে আনার পাহারা পাওয়া না যাওয়ায় আমাকে অনর্থক কিছু বেশিদিন হাসপাতালে থাকতে হয়।" সমস্ত পুলিশ এতদিন ধরে

এত ব্যস্ত ছিল দাঙ্গা থামাবার জন্ম যে, escort-এর অভাবে বেশ কিছুদিন তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হল, কারণ তাঁকে জেলে ফিরিয়ে আনতে একটা প্রকাণ্ডবাহিনী দরকার, ব্যাপারটা কি এই ?

(৭-৮) "এরই মধ্যে খাঁ সাহেব একদিন হাসপাতালে উপস্থিত। তার ভাই—রোগী ছিল। তাকে সে দেখতে আসে। সেই সুবিধায় আমার সঙ্গে দেখা করে নেয়।" —অর্থাৎ সে স্পাই ছিল বলেই তাকে অত সুবিধা দেওয়া হয়েছিল এবং escort এরও অভাব হয়নি। তার জন্যে ২।১ জন পুলিশই যথেষ্ট কিনা !

(৯-১০) "খেদ করে বলে, তাকে কেউ ভালবাসে না। আমি কেন জেলে ফিরে যাচ্ছি না, ইত্যাদি।" Spy এর মুখে এমন কথা ! আর দুজনের পাহারা-পুলিস নিশ্চয়ই সবে গিয়েছিল, কারণ তাদের সামনে ভালবাসাবাসিটা কি ভাল কথা ?

(১১-১২) "বেশ বুঝতে পারলাম, তার হৃদয় বড়ই ক্ষুধাতুর। তাকে অনেক ভাল কথা বললাম।" সেদিনের বিদায় বড ব্যথাদায়ক, অর্থাৎ Spy-টা যাদুদার বিরহে কাতর এবং যাদুদাও তাকে বড্ড ভালবাসতেন। যাদুদা যদি সেদিন জেলে ফিরে যেতেন, হয়ত অম্বিকা আত্মহত্যা করতো না। অর্থাৎ অম্বিকার স্নেহ-বুভুক্ষু বিরহ কাতর হৃদয় তাঁর প্রতি এতটা আসক্ত ছিল বলেই সম্ভবত তার আত্মগ্লানি এসেছিল এবং তার আত্মহত্যার প্রাক্কালে যাদুদার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল অনাবিল স্নেহের। অজিতের ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু জানা দূরে থাক, অম্বিকার আত্মহত্যার সম্বন্ধে যাদুদার গৌণভাবেও বিন্দুমাত্র দায়িত্ব ছিল না। তিনি সে ঘটনার কিছুদিন আগে থেকে কিছু দিন পর পর্যন্ত জেলেই ছিলেন না !—কিন্তু অম্বিকার চিঠিটা যাদুদার নামে না হয়ে অজিতের নামে হওয়া কি উচিত হয়েছে ?

(১৩) "সে আমার পায়ের ধুলো নেবে, আমি দোব না। এটা আমি বহুদিন ধরে পালন করে আসছি। সে আমার সঙ্গে দস্তুর মত ধস্তাধস্তি আরম্ভ করে' দিল।" পায়ের ধুলো দিতে চায় না অনেকেই, কিন্তু কেউ সেটা 'পালনও' করে না এবং তা নিয়ে 'ধস্তাধস্তি'ও করে না। কিন্তু ভাল মানুষ সাজার এতখানি প্রয়োজনও হয়ত কারো কখনও হয় না।

(১৪) "পুলিশের তরফ থেকে ধুম করে অনুসন্ধান চলে।"—ধুম করে অনুসন্ধান চলে না। কেন চলবে ? রুটিন মাফিক সকলের Statement নেওয়ার জন্যে পরদিন সকালে Lowman ও ভূপেন চাটুয্যে এসেছিলেন, নীচের ঘরে বসে সকলের সামনেই সকলকে জিজ্ঞাসাপত্তর করেছিলেন, অজিতও সেখানে গিয়েছিল, ভূপেন চাটুয্যে তাকে কিছু বেতালা প্রশ্ন করতে সে চাৎকার করে তাঁকে মারতে গিয়েছিল, সকলে ধরে ফেলতে সে জুতো ছুঁড়েছিল, ব্যস ! অনুসন্ধান ঐ পর্যন্ত। তার শেষ ফল, অজিতের যশোর জেলে বদলী। যশোর জেলটা ছিল শাস্তির জায়গা, নানা অসুবিধা এবং ম্যালেরিয়ার আড্ডা।

পাশেই দক্ষিণেশ্বর ইয়ার্ডে হরিনারায়ণ চন্দ্র এবং বীরেন ব্যানার্জি ছিলেন, তাঁরা আমার গল্প সমর্থন করেন এবং বলেন তাঁরা কোন "ধুম করে অনুসন্ধান" টের পাননি।

(১৫) "সে আত্মহত্যা সত্যই কি করেছিল ? অথবা অন্য কেউ বা কারা তাকে ঐ ভাবে হত্যা করেছিল ?" সে যখন স্পাই, তখন আত্মহত্যার চেয়ে হত্যাই বেশী সম্ভব,

পুলিশের অনুসন্ধানের ধুম এই সন্দেহেই। নীচের ঘরেই যদি কাণ্ডটা ঘটে থাকে, রাত্রে, তালা বন্ধ ঘরের মধ্যে, তাহলে নীচের ঘরের কেউই দায়ী। কিন্তু যে নরেন ব্যানার্জি কম্বল চাপা দিয়ে আগুন নিবিয়েছিলেন বলে সকলের কাছেই বলেছিলেন, তাঁর ওপর পর্যন্ত পুলিশের কোন সন্দেহ ছিল বলে কখনও কেউ কিছু শোনেন নি। জেরাও হয় নি। "ধুম" বটে।

(১৬-১৭) "আমি হাসপাতাল থেকে জেলে প্রত্যাবর্তন করলে চিঠি আমাকে দেওয়া হয়। তাতে সে বহু অপকর্মের স্বীকারোক্তি করে যায়।" বাঁকুড়া জেলে গণেশ ঘোষের পলায়ন চেষ্টার সময় অম্বিকা সেখানে ছিল, কোন অপকর্ম করেনি। আলিপুরে কয়েক মাসে এমন কিছু বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র হয়নি, যা নিয়ে অপকর্ম "বহু" হতে পারে। বাইরে কয়েক বছর ধরে বোমা-বন্দুক, খুনোখুনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, "বহু অপকর্মের স্বীকারোক্তি" হতে পারে সেই বাইরের ব্যাপারগুলো সম্পর্কে। যাদুদার গল্পের মধ্যে তার একটারও উল্লেখ নেই। তার চিঠিটা ছিল একটা ছোট slip মাত্র। "বহু অপকর্মের স্বীকারোক্তি" তাতে থাকতে পারে না এবং ছিল না। স্বীকারোক্তি এবং অপকর্ম একটা মাত্র লাইনে ছিল —"বন্ধুর প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাকে কেউ বিশ্বাস করে না।" অজিত, অতুল রায়, অনুকূলদার মতে ওটা শান্তি চক্রবর্তীর হত্যার কথাটা ইঙ্গিতে বলা,—কারণ ওঁরা জানতেন যে বন্ধু শান্তি একটা বিভলভার মেরে দিয়েছিল বলে অম্বিকাই তাকে নিমন্ত্রণের ছল করে নিয়ে গিয়ে পথে, রেললাইনের ধারে হঠাৎ আক্রমণ করে খুন করেছিল এবং সেই সূত্রেই সে অজিতসহ গ্রেপ্তার হয়েছিল।

কিন্তু তার বাইরের সহকর্মীদের মধ্যে কেউ কোন অপকর্মের কথা বলে না। অজিত মৈত্র বলে না। অতুল রায় বলেন, অম্বিকা যদি স্পাই হত, আমাদের রাজবন্দী হতে হ'ত না, ঘানি টানতে হত। (এখানে বলা প্রয়োজন যে অতুল রায় যখন জেল থেকে ছাড়া পান, তাঁকে বাঙলা দেশ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়, এবং বহু বৎসর তিনি বাঙলার বাইরে থাকতে বাধ্য হন।) নর্থবেঙ্গল যুগান্তর পার্টির একদল কর্মী নীলফামারীতে এক বৈঠক করে অম্বিকাকে স্পাই বলে প্রচার করা হয়েছে বলে দুঃখ প্রকাশ করে' অম্বিকার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে কালী বাকচিও ছিলেন। তিনি দাদাদের বিশ্বস্ত অনুচর, যাদুদারও বিশ্বস্ত।

অনুকূলদাও তাকে স্পাই বলেন নি।

মৃত্যুর আগে অম্বিকা যে অনুকূলদাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, অজিতকে ডাকেনি, তার ব্যাখ্যা, অজিতেরও ধারণা, অনুকূলদার কাছ থেকে অজিতের মনোভাব সম্বন্ধে কিছু শুনে, তারপর হয়ত তাঁকে দিয়েই অজিতকে ডেকে পাঠাতো।

এই অজিত মৈত্র যাদুদার গল্পে একেবারে out of picture !

সত্য মিথ্যা বিচারের ভার পাঠকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি এ প্রসঙ্গ এই বলে শেষ করতে চাই যে, সে সময়ে যে ব্যাপারটা আমার শুধু বিসদৃশ মাত্র লেগেছিল, আজ সে ব্যাপারটার কথা ভেবে, বিশেষত যাদুদার বই পড়ে আমার শুধু এই কথাই মনে হচ্ছে বিপ্লবান্দোলনের এবং বিপ্লবীদের চরিত্রের এই অজ্ঞাত দিকটা চিরকাল দেশের লোকের অজ্ঞাত থাকলে বিপ্লবান্দোলনের লিখিত ইতিহাস হবে একটা জুয়াচুরীর নামান্তর।

* * * *

এখন অন্তরীণ যাত্রার কথায় ফিরে আসা যাক। আমি পাবনায় পৌঁছালুম রাত্রে। পুলিশ সাহেবের অফিসে গিয়ে শুনলুম, তিনি শিকারে গেছেন। আই বি অফিসার আমাকে ডি এস পির অফিস ঘুরিয়ে পুলিশ ক্লাবে রেখে এলেন। তার পরদিন সেখানে খাওয়া দাওয়া করে চললুম সিরাজগঞ্জ সাবডিভিসনে জামতৈল রেলষ্টেশন হয়ে কামারখন্দ থানায়। সৌভাগ্যক্রমে কামারখন্দের দারোগা সেদিন কার্যোপলক্ষে সিরাজগঞ্জে এসেছিলেন। আমাকে তাঁর সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়া হল সুতরাং ভাল escort-ই পেয়ে গেলুম।

অন্ধকার রাতে প্রায় ১০টার সময় ষ্টেশনে নামলুম। মাইলটাক পথ হেঁটে যেতে হবে। গরুর গাড়ীও নেই, একটা কুলিও নেই। একা হলে বিপদে পড়তুম। দারোগা সাহেব (মুসলমান, বয়স বেশী নয়) রেলের কুলি জোগাড় করলেন। এক চৌকিদার হ্যারিকেন নিয়ে পথ দেখিয়ে চললো।

রাত্রে খাবারের কোন ব্যবস্থা আছে কি না, জিজ্ঞাসা করাতে দারোগা সাহেব বললেন, নেই, এবং হওয়াও শক্ত, এখান থেকেই কিছু খাবার খেয়ে বা নিয়ে যেতে হবে। একটা খাবারের দোকানে তখনও টিমটিম করে আলো জ্বলছে এই ট্রেনটা আসার অপেক্ষাতেই। সেখান থেকে কিছু চিপ সন্দেশ কিনে নিলুম।

আধঘণ্টাটাক হেঁটে থানায় উঠলুম এবং তারপর গেলুম "আমার ঘরে।" জেলাবোর্ডের রাস্তার একদিকে থানার টিনের ঘর আর তার বিপরীত দিকেই আমার জন্যে নতুন ঘর তৈরী হয়েছে। রাস্তা থেকে এক ফুটটাক্ উঁচু খানিকটা জমির ওপর একখানা বড় নতুন টিনের ভাল ঘর, কিন্তু সেটা আমার ঘর নয়, সেটা ম্যারেজ রেজেষ্ট্রি অফিস—কাজী সাহেবই ঐ জমিটার মালিক। অফিসের খানিকটা পিছনে এক পাশে আর একখানা ঘর, টিনের দোচালা, দরমার বেড়া, একফুট দেড়ফুট জানালা, নতুন তৈরী হয়েছে আমার জন্যে। ঘরের মেঝে আর বাইরের জমি এক level। সে মেঝেও পিটিয়ে চৌরস করা হয়নি। তার মধ্যে এক-পাশে একটা মাচা, আর একপাশে এক তক্তপোষ বিরাজ করছেন। সমস্ত কাণ্ডটা দেখে "এই ঘরে আমায় থাকতে হবে?" বলে আমি তক্তপোষে বসে পড়লুম।

দারোগা সাহেব একটু অপ্রতিভভাবে বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাববেন না। মৌলবী সাহেবের সঙ্গে আমার কথা আছে আপনার প্রয়োজনমত ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যে। এখানে এমন একটা শিক্ষিত ভদ্রলোক নেই, যার সঙ্গে দুটো কথা কই। তাই ডেটিনিউ রাখার বন্দোবস্তের order যখন এল, তখন কাজী সাহেবের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলুম। তিনিও মাসে ১০টা করে টাকা ভাড়া পাবেন, আর আপনিও থাকবেন আমার কাছেই!

কাজেই বিছানা পেতে শোয়ার জোগাড় করলুম। এক কলস খাবার জল একটা বালতি ও মগ এবং একটা হ্যারিকেন থানা থেকে দিয়ে গেল। আর সব জিনিস সকালে দেওয়া হবে।

গোবরের সঙ্গে গুড় মেখে ঘুঁটে দিলে কেমন হয়, যদি কল্পনা করতে পারেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন, কেমন সন্দেশ খেলুম। একটুখানি খাবার চেষ্টা করে জল খেয়ে শুয়ে পড়লুম। দারোগা সাহেব বললেন, সকালে সব জিনিসই পাবেন, কাছেই হাটখোলা আছে। শুনে রাগ হতে লাগলো, কিন্তু এই নতুন অবস্থার সঙ্গেই তো নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে

হবে। দারোগা সাহেব চলে গেলে চিৎপাৎ হয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালে উঠে একটু সার্ভে করতে বেরিয়ে দেখলুম, যেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, লোক-বসতির চিহ্ন নেই। আমার ঘরটা মৌলবী সাহেবের ভিটের এক পাশে। তার ঠিক পাশে পুরানো কবরখানা। এখন সেখানে কবর দেওয়া হয় না, কিন্তু কবরই কতকগুলো সেখানে আছে এবং আমার জানালা দিয়ে থুতু ফেললে সেই কবরস্থানেই পড়ে। তারপর খানিকটা চাষের জমি, তারপর একটা ছোট শুকনো খাল, তারপর একটু দূরে হাটখোলা। খালটা হচ্ছে জামতৈল এবং কামারখন্দ গ্রামের মাঝের সীমানা। মৌলবী সাহেবের ভিটের আর দু'চারখানা ছোট ছোট একানে ভাঙ্গা-পড়ো চালাঘর আছে। ভিটের অপর পাশেও খানিক চাষের জমি, তারপর নতুন কবরস্থান, তারপর আবার চাষের জমি তারপর শ্মশান। মৌলবী সাহেব অন্য গ্রামের বাড়ী থেকে রোজ সকেলে আসা যাওয়া করেন।

হাটখোলা থেকে খাল পার হয়ে, থানা এবং মৌলবী সাহেবের ভিটের মাঝখান দিয়ে, কবরস্থান ও শ্মশানের পাশ দিয়ে জেলা বোর্ডের সড়ক চলে গেছে। তারই সমান্তরাল আমার বাসার পিছন দিয়ে চলে গেছে একটা ছোট শুকনো নদী এবং তার ওপারে দিগন্ত বিস্তৃত চাষের জমি। বর্ষাকালে সে জমি ডুবে সমুদ্র হয়ে যায়, নদীর সঙ্গে একাকার হয়ে আমাদের ভিটের কানায় কানায় জল হয়, পাশের খালেও নৌকো আসে। আমার ঘরের সামনে নদীর ঢালুতে চারটে বাঁশ পুঁতে তার ওপর একটা বাঁশের ফ্রেম বেঁধে আমার উঠোন থেকে দুটো বাঁশ পেতে দিয়ে পায়খানা বানানো হয়েছে এবং তার বেড়া দেওয়া হয়েছে পাটকাটি বা পাটখড়ির। দরজা করা হয়েছে একটা দরমা ঝুলিয়ে দিয়ে। রান্নাঘরও প্রায় তথৈবচ, তবে চালটা ঠিক আছে।

কামারখন্দ গ্রামটা খুব ছোট, থানা ছাড়া একপ্রান্তে কয়েক ঘর মুসলমান কৃষকের বাস আছে মাত্র। প্রকৃত পক্ষে গ্রামটা যেন জামতৈল গ্রামেরই একটা অংশ মাত্র—জামতৈল গ্রামে মুসলমানের বাস নেই, আর কামারখন্দ গ্রামে হিন্দুর বাস নেই। একজন বাঙ্গালী জমাদার, একজন হিন্দুস্থানী কনষ্টেবল এবং এক নতুন আমদানী ডেটিনিউ আমি, এই তিনটি প্রাণী মাত্র হিন্দু।

আমার সরকারী অন্তরীণ আদেশপত্রে শুধু বাসার চৌহদ্দী লেখা আছে এবং থানায় রোজ হাজিরা দেওয়া ছাড়া এই চৌহদ্দীর বাইরে যাওয়া নিষেধ। অর্থাৎ Orderটার মধ্যে একটা ভুল ছিল, যার ফলে আমি দিনরাত ঘরে আটক থাকতে বাধ্য।

সুতরাং আমি একটা দরখাস্ত করলুম। আমি লিখলুম—আমার যতদূর জানা আছে, Internment Orderএ দুটো চৌহদ্দী দেওয়া থাকে। একটা দিনের বেলার জন্য—সাধারণত একটা গ্রামের চৌহদ্দী, যেখানে আমি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারি, আর একটা চৌহদ্দী রাত্রের জন্য, বাসার চৌহদ্দী, যেটা আমি সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারি না। সুতরাং আমার Internment Orderএ শুধু বাসার চৌহদ্দী দেওয়াটা তোমাদের ভুল হয়েছে। তার জন্য কে দায়ী, সে কথা ছেড়ে দিয়ে পত্রপাঠ Orderটা সংশোধন করে' পাঠাও, না হলে আমার নির্জন কারাবাসে থাকতে হচ্ছে।

দারোগা সাহেব বললেন, আমি কি এসব জানি মশাই? একটা চৌহদ্দী চেয়েছে,

আমি বাসার চৌহদ্দী লিখে দিয়েছি! যাই হোক, দরখাস্তের ফলে দিনের চৌহদ্দীর বন্দোবস্ত হল জামতৈল গ্রামের আর্ধেক নিয়ে। কিন্তু Orderটা সংশোধন হয়ে আসতে প্রায় এক মাস কেটে গেল। আমি সুযোগ বুঝে দিন রাত ঘরে বসে Bertrand Russell-এর Roads to freedom বইখানা বাংলায় অনুবাদ করে ফেললুম। পরে Brailsford-এর Russian Worders' Republic বইখানাও ঐখানেই বাংলা করেছিলুম।

দরখাস্তের লেখাটা ভাল, attitude ভাল, সরকারী Order মেনে দিনরাত ঘরেই থাকি এবং লেখাপড়া করি, বেশ একটা propaganda হয়ে গেল পুলিশ সাহেবের অফিসে, লোকটা ভাল লোক এবং পণ্ডিত।

সিরাজগঞ্জের সিনিয়র মোক্তার প্রাণনাথ সেন non-official visitor, একদিন আমার ঘরে এসে বসে পরিচয় দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি দারোগা সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন কি? তিনি বললেন, তাঁর কাছে যাওয়ার আমার কোন দরকার নেই, আমি আপনার সঙ্গে privately দেখা করতে পারি। আমি বললুম, আমার ওপর সরকারী আদেশ, আমি বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারি না, ঘরেও receive করতে পারি না। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের চিঠি দেখিয়ে বললেন, এই দেখুন তিনি আমাকে non official visitor appoint করে বলছেন, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করে' আপনার অভাব-অভিযোগ জেনে তাঁকে জানাবো। আমিও আমার Internment Order বার করে তাঁকে দেখিয়ে বললুম, আমার অনেক অভাব অভিযোগ আছে, কিন্তু এই দেখুন আমি বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারি না। তারপর খানিক ধস্তাধস্তি করে' হার মেনে ফিরে গিয়ে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখলেন, detenue আমার সঙ্গে কোন কথা বলতে রাজি নয়, কারণ আমি বাইরের লোক।

ফল হল এই যে, সেখানে আবার একটা propaganda হল, detenue অক্ষরে অক্ষরে Govt. order মেনে চলে। ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ সাহেবকে লিখলেন, পুলিশ সাহেব আমাকে লিখলেন অমুক অমুক non-official visitor, তাদের সঙ্গে আমি privately কথা বলতেও পারি, ঘরেও তাদের receive করতে পারি।

আমি পাবনায় যাওয়ার আগে সেখানে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেছে, তার ফলে মুসলমান পুলিশ সাহেব বদলী হয়ে গেছেন এবং তাঁর স্থলে এসেছেন মোহনবাগান ক্লাবের বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় 'কানু'—(J. Roy)।

এদিকে ঘরের অবস্থা সম্বন্ধে আমি প্রভাসের কাছে একটা বিস্তারিত চিঠি লিখলুম একটা মজাদার প্রবাসের গল্পের মতন করে। সেটা পাশ হয়ে গেল এবং সেটা পেয়ে প্রভাস তার ঘোরালো ইংরাজী অনুবাদ করে' প্রকাশ করে দিলে ফরোয়ার্ড কাগজে এমন ভাবে যে, আমার চিঠির খবর বলে বোঝা না যায়।

পরের দিন দারোগা সাহেবের কাছে খবর পেলুম, ফরোয়ার্ডে আমার ঘরের এক বিতিকিচ্ছি বর্ণনা বেরিয়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মোটর বাইকে এক তরুণ সাহেব একটা মাপের ফিতে নিয়ে হুড়মুড় করে এক চোটে আমার ঘরে এসে উঠলেন। দারোগা সাহেব ছুটে এসে পড়লেন। সাহেব তখন গম্ভীরভাবে মাপজোপ করতে শুরু করে দিয়েছেন। দারোগা সাহেব নিঃশব্দে সাহায্য করতে লাগলেন। মাপজোপ বোধ হয় ফরোয়ার্ডের

বিবরণের সঙ্গে মিললো। দারোগা সাহেব কৈফিয়ৎ দিতে শুরু করলেন, বাড়ীওয়ালার সঙ্গে কথা আছে, detenue-এর প্রয়োজন মতন সব ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে, আমি detenue বাবুকে সে কথা বলেছি।

সাহেব কিছু উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন আমার সঙ্গে একটাও কথা না বলেই। শুনলুম উনি সিরাজগঞ্জের S. D. P. O. অর্থাৎ সিরাজগঞ্জের ভারপ্রাপ্ত অ্যাসিষ্ট্যান্ট পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, নাম বোধ হয় Minister.

মৌলবী সাহেব এলেন, সব শুনলেন, দারোগা সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ হল। পরদিনই কাজ শুরু হয়ে গেল। ঘরের মেঝে ইঞ্চি ছয়েক উঁচু করা হল, বাইরে রোয়াক হল, নিকিয়ে দেওয়া হল, রোয়াকের ওপর চাল হল, পায়খানা নতুন করে তৈরী হল, ঘরের জানালা বড় করার ব্যবস্থা হল।

একজন কম্বাইণ্ডহ্যাণ্ড ঠাকুর-চাকর দরকার। প্রথমে ঠিক করা হল এক মালি-চৌকিদারকে, জামতৈল গ্রামে থাকে। থানার কাছে যে চৌকিদারের বাস, তাকে দারোগা-জমাদারের বেগার খাটতে হয় সবদাই, তার জন্যে রোজ সকালে তাকে থানায় আসতে হয়। চৌকিদারের মাইনে তখন ৬ থেকে ৯ টাকা। অন্য কাজ না করলে চলে না, কিন্তু এ বেচারীর অন্য কিছু করার উপায় নেই। সে যেন বরতে গেল।

একদিন সে রাঁধছে, এমন সময় এক কনেষ্টবল এসে হাজির—জমাদার বাবুর ঘোড়া খুঁজে আনতে হবে, এখনি! আমি এক ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিলুম। চৌকিদার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। বিকালে বললে, আমি আর কাজ করতে পারবো না। তখন দারোগা সাহেব বদলী হয়েছেন, এক সেকেলে বৃদ্ধ মুসলমান দারোগা এসেছে—মূর্খ, পাজী, ভীতু।

চৌকিদারকে বললুম, জমাদারবাবু শাসিয়ে দিয়েছে, এই তো? সে কিছুতেই তা বলে না, বলে, আমার অসুবিধা হয়। সুতরাং একটা লড়াই লাগলো চাকর নিয়ে। জামতৈল গ্রামে এক বুড়ো কামার ছিল গরীব এবং বেকার। তাকে বলা হল, সে রাজী কিন্তু কামার-গিন্নী রাজী নয়, বলে ওখানে খেতে হবে তো? কিন্তু উনি তো মালির হাতের ভাত খেয়েছেন, কাজেই ওখানে খাওয়া চলবে না।

ঐ গ্রামের এক ছুতোর বড় জানালা বসাতে এসেছিল, তাকে চাকরের সমস্যার কথা বললুম। সে ভেবেচিন্তে কামার বুড়োর কথা বললে। আমি বললুম তার কাছে লোক গিয়েছিল, সে রাজী কিন্তু আমি মালির হাতে ভাত খেয়েছি বলে কামারগিন্নীর আপত্তি। শুনে ছুতোর মুখ টিপে হাসতে লাগলো। আমি বলি, হাস কেন? সে বলতে চায় না। শেষে হাসতে হাসতে বললে গ্রামে কামারগিন্নীর মালি বদনাম আছে।

চৌকিদারী হাজিরার দিন এক বুড়ো হিন্দুস্থানী চৌকিদারকে ডেকে দারোগা সাহেব বললেন, তোর ছেলে তো কিছু করে না, ভাত রাঁধতে পারে? সে বললে, পারবো না ক্যান্ হুজুর, কিন্তু উনির কি পশন্দো হবে? দারোগা সাহেব আমাকে বললেন ও কিন্তু জাতে মুচি,—আপনার চলবে? আমি বললুম, খুব চলবে। তাই ঠিক হল।

পরের দিন এক ১৫।১৬ বছরের ছোকরা এসে কাজ কর্ম করলো, রাঁধলো, আমাকে খাওয়ালে, বাসন মেজে, উনুন নিকিয়ে, শেষে বলে কিনা আমি বাড়ী চললুম ভাত খেয়ে

আসবো। আমি বললুম, তোর তো এখানে খাওয়ার কথা। সে বলে, না—মা বারণ করে দিয়েছে। আপনি তো কিরিস্তান।

অবাক কাণ্ড। আমি বললুম, কে বলেছে আমি কিরিস্তান? সে বলে আপনি যে সব জাতের হাতে ভাত খান। বলে সে চলেই গেল।

দারোগা সাহেবকে বললুম, তিনি অন্য লোকের সন্ধান করবেন বললেন কিন্তু লোক মেলে না। মালি-মুচির হাতে ভাত খেয়ে এক দফা গোল পাকিয়েছি। তার ওপর মুসলমান রেখে আবো গোল পাকাবার ভরসা হল না। জামতৈল গ্রামের হিন্দুরা একটু খাতির করে, তারাও শেষে বিগড়ে যাবে?

সুতরাং পাবনার S. P-র কাছে এক ঘোরালো দরখাস্ত লিখলুম আগাগোড়া ইতিহাস, মায় জমাদার বাবুর ঘোড়ার গল্প পর্যন্ত। ফলে কয়েক দিন মধ্যেই জমাদার বাবুর বদলীর হুকুম এসে হাজির। আমার কাছেও খবর এল S. P. স্বয়ং কামারখন্দে আসছেন।

কয়েকদিন পরে একদিন সকালে থানার "হাতা"র প্রকাণ্ড বটগাছের তলার ছায়ায় আমার ঘরের প্রায় সামনে এক টেবিল ও দুখানা চেয়ার পড়েছে, একখানা নতুন টেবলক্লথও পড়েছে, আর দারোগা সাহেব full uniform-এ বড়া-চুড়ো পরে অপেক্ষা করছেন। বুড়ো মানুষ, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে, ঘুরে ফিরে অপেক্ষা করার পর হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলেন, S. P. এসে হাজির সাইকেলে।

দারোগা সাহেব খটাস করে সেলাম দিলেন। S. P. চেয়ারে বসেই হুকুম করলেন, ডাকুন detenue বাবুকে। আমি গিয়ে বসতে বসতেই দারোগা সাহেবের বাসা থেকে এক-গাদা গরম লুচি, আলুর দম, হালুয়া আর একটা প্লেট ভরা ল্যাংড়া আম ছাড়ানো, টুকরো করা। আমি একটু অপ্রতিভ হচ্ছি না হচ্ছেই S. P. বললেন, হাত লাগান, এক প্লেটেই চলুক। আমরা খাই আর কথাবার্তা চালাই, আর দারোগা বাবু সামনে attention হয়ে খাড়া—এই show জেলাবোর্ডের রাস্তার ধারে। সুতরাং রাস্তার দুদিকে একটু একটু তফাতে দেখতে দেখতে দুটি ছোট ভিড় জমে গেল।

খাওয়া এবং কথাবার্তা শেষ হলে S. P. দারোগা বাবুকে কড়াভাবে জিজ্ঞাসা করলেন চাকর পাওয়া যায় না কেন? দারোগা বাবু সটান বললেন, একটা লোকের সন্ধান পেয়েছি স্যার, আজই তাকে ডাকিয়ে আনবো। S. P. বললেন, কাল থেকেই চাকর চাই, অন্য কোন কথা শুনবো না। আমাকে বললেন, যখন যা কিছু অসুবিধে হবে, আমার কাছে লিখবেন, একটা খামে ভরে আঠা দিয়ে এঁটে "confidential" লিখে দারোগার কাছে দেবেন। আমি বললুম, তাহলে তো উনি নিশ্চয় চিঠি খুলে দেখবেন এবং চিঠি চেপে দেবেন। S. P. বললেন, Let him do it, তারপর আমি তার ব্যবস্থা করবো।

S. P. চলে গেলেন। অনেক দূরের অনেক পথ-চলতি লোক কাণ্ডটা দেখে গেল। দারোগা সাহেব একটু চুপসে গেলেন। পরদিনই একজন চাকর এল, কিন্তু সে দু'বেলা এসে শুধু রেঁধে খাইয়ে যায় মাত্র। সব অসুবিধা ঘুচলো না। কিন্তু গাঁয়ে গাঁয়ে খবর পৌঁছে গেল, স্বদেশীবাবু দারোগার চেয়ে বড় অফিসার।

২।৭ দিন পরেই এক ঘোরালো লম্বা দরখাস্ত লিখলুম S. P.র কাছে। তারপর সেটাকে খামে ভরে আঠা দিয়ে এঁটে "confidential" লিখে থানায় মুন্সী সাহেবের

(literate constable) কাছে দিয়ে এলুম। তিনি বাঙ্গালী মুসলমান, আধাবয়সী, আমি আলাপ জমিয়ে নিয়েছিলুম। বলে এলুম, দারোগা সাহেব নিশ্চয় চিঠিটা খুলে দেখবেন এবং চেপে দেবেন। আপনি শুধু খবরটা আমাকে দেবেন, আমি এ নিয়ে লেখালিখি কিছুই করবো না। আমি চাই, চিঠিটা চেপে দিয়ে দারোগা সাহেব একটু ভয়ে ভয়ে থাকবেন এবং আমার পিছনে লাগবেন না। মুন্সী সাহেব কথাটা বুঝলেন এবং দিন দুই পরে বললেন, আপনার আন্দাজ ঠিকই হয়েছে। আমি নিশ্চিন্ত হলুম।

বুড়ো হাজি সাহেবদের সঙ্গে আলাপ জমেছে এবং কথায় কথায় তাদের বুঝিয়ে দিয়েছি আল্লা হচ্ছে জমিদারের দালাল, আর মোল্লারা তার দালাল। কথাটা সহনীয় এবং গ্রহণীয় করার জন্যে হরিকেও সঙ্গে রাখি—আমাদের হরিও তাই, জমিদারদের দালাল আর গুরু পুরুতরা তার দালাল। হিন্দু মুসলমান চাষারা একজোট হলে কি জমিদাররা তাদের ঠকাতে পারে? কিন্তু একজোট হওয়ার লক্ষণ দেখলেই একদিক থেকে মোল্লা, আর একদিক থেকে গুরু পুরুতরা ধর্মের দোহাই দিয়ে, আল্লা হরির দোহাই দিয়ে ভেদ ঘটায়, দাঙ্গা বাধায়; চাষারাই মরে, জমিদার মোল্লা পুরুতদের গায়ে হাত লাগে না। শুনে হাজি সাহেবদেরও বলতে হয়, তা, বাবু যা বলছেন, কথ গুলোতো ঠিকই। চাষাদের বুদ্ধি যে বলদের মতন, তাই মারও খায় বলদের মতন। ওরা যেদিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, সেইদিকেই যায়।

যাই হোক চাকর আমার টিকলো না। অগত্যা মুন্সী সাহেবের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলুম। তিনি আমাদের "ভিতের" একটা পড়ো ঘরে বেঁধে খেতেন। বন্দোবস্ত হল, আমি কিছু কই মাগুর মাছ এবং মাঝে মাঝে মুরগী হাট থেকে কিনে দেবে, তিনি বাঁধবেন তাঁর ঘরে, আর আমি আমার ঘরে স্টোভে দুজনকার ভাত বাঁধবো, তার পর দুজনে এক সঙ্গে খেয়ে বাসন ধুয়ে ফলবো। তিনি অবশ্য আমাকে বাসন ধুতে দিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন হঠাৎ এক চাকর জুটে গেল নোয়াখালীর এক জোয়ান, নাম লক্ষ্মণ। বাড়ীতে "বাইয়েরা ক্যাবলই খ্যাচর খ্যাচর করে" বলে চাকরী করতে বেরিয়েছে, অনেক জায়গায় কাজ করে শেষে জামতৈল গ্রামে এসেছিল। জাতে কায়স্থ, বেশ পরিচ্ছন্ন স্বভাব।

তখন আমি গড়গড়ায় তামাক খাওয়া ধরেছি। লক্ষ্মণ সর্বদা কান খাড়া করে রাখে, গড়গড়ার আওয়াজ বন্ধ হলেই নতুন কল্কে চড়িয়ে দিয়ে যায়। অবশ্য কল্কে পাল্টানোর সময় প্রত্যেকবারই বেশ দু'চার টান মেরে ভাল করে ধরিয়ে তারপর নিয়ে আসে। মনে হল, এই ধোঁয়ার বাঁধনেই টিকে যাবে। কিছু দিন বেশ চললোও। তারপর হঠাৎ একদিন বেমালুম উধাও। মাইনের টাকার আন্দাজ মতন টাকা আগে নিয়েছিল, তাছাড়া যাবার সময় একটি কুটোও নিয়ে যায়নি, সব সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে গেছে। বুঝলুম, এমনি করেই ও অনেক জায়গায় কাজ করে এসেছে! বলতো, "আমার হক্কল স্থাশ গ্যাখোনের ইচ্ছা।" অদ্ভুত স্বভাব।

'২৭ সাল শেষ হয়ে আসছে। বোধ হয় সেপ্টেম্বরের শেষে, হঠাৎ একদিন release order এসে গেল। চাটিবাটি গুটিয়ে কলকাতায় রওনা হলুম।

ষোল

'২৭ সালের শেষের কয়েকটা মাস অনেকগুলো বড় বড় ঘটনা ঘটেছিল, বিশেষত আমার পক্ষে বড়। জেলখানা বা গ্রামের কতকটা নিরালা পরিবেশের মধ্যে থেকে বাইরেকার বিচিত্র হুড়-হাঙ্গামার মধ্যে এসে পড়লে যা স্বাভাবিক, খুঁটিনাটি সব কথাও মনে নেই, আর ঘটনাগুলোর সময়ের পারম্পর্যও সব সময়ে মনে থাকে না। তাই কয়েকটা বড় ঘটনার কথাই কতকটা বিচ্ছিন্ন ভাবে বলবো।

আমি যেদিন কলকাতায় আসি, সেই দিনই মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত স্বরাজ পার্টির তরফের সেক্রেটারী সদ্য মুক্ত রাজবন্দী সত্যেন মিত্রকে কর্পোরেশনে At Home দিচ্ছেন। আমি ৭১ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটের কংগ্রেসকর্মী সংঘের বাড়ীতে প্রথমে উঠে লট বহর রেখেই চললুম "Forward" অফিসে উপেনদার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি '২৬ সালে মুক্ত হয়ে "ফরোয়ার্ডে" যোগ দিয়েছিলেন।

সেখানে মনোমোহন ভট্টাচার্যের সঙ্গেও দেখা হল। তিনিও কিছু দিন আগে মুক্ত হয়েছিলেন। আমাকে দেখে দুজনে কিছু আপ্যায়িত করেই কানে কানে পরামর্শ করে ফোনে মেয়রের সঙ্গে কথা কয়ে আমাকে নিয়ে চললেন কর্পোরেশনের At Home সভায়। সেখানে যাওয়ার পর যথাশাস্ত্র বক্তৃতাদি হল এবং সত্যেনদার সঙ্গে আমাকেও সভার মাঝখানে নিয়ে গিয়ে মেয়র দুজনার গলায় দুছড়া বড় বড় মোটা বেলফুলের "গোড়ে" মালা পরিয়ে দিয়ে সম্বর্ধনা করলেন। আমি সত্যেনদার প্রকাণ্ড ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে অভিনন্দন করলুম, তিনি সলজ্জ হাসিমুখে আমার বাহু দুটোতে একটু অস্তটিপুনী দিলেন।

কিন্তু সারা কলকাতার বড় বড় লোক, কাউন্সিলার প্রভৃতির সভায় হঠাৎ 'প্রোমোশন পেয়ে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। ব্যারিষ্টার সুরেন হালদার (বাসন্তী দেবীর ভ্রাতা) সেটা কাটিয়ে দিলেন 'হ্যালো" বলে মোক্ষম রকমের হাত-ঝাঁকানি (সেকহ্যাণ্ড) দিয়ে। তাঁর সঙ্গে আলাপ বিশেষ ছিল না, তিনি নেতা, আমি কর্মী, বি, পি, সি, সিব মিটিংয়ে দেখা সাক্ষাৎ হ'ত। মনে হল, তিনি তাঁর বন্ধু বান্ধবদের বুঝিয়ে দিলেন, এই দেখ একজন বিপ্লবী নেতা, তোমরা হয়ত চেননা কিন্তু আমার সঙ্গে খাতির আছে। তিনি বললেন, আমাদের বাড়ী একদিন যেও। আমি বিনীতভাবে হাসিমুখে বললুম, যাবো। পরে আরো অনেকবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তিনি বলেছেন কৈ আমাদের বাড়ী এলে না? আমি বরাবরই বলেছি যাবো, কিন্তু যাওয়া কোনদিন ঘটে ওঠেনি।

প্রোফেসর বিনয় সরকারের স্ত্রী, জার্মান মহিলা, এসে আলাপ করলেন এবং চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন। সেখানে অবশ্য না গিয়ে পারিনি।

প্রভাস তখন কর্মীসংঘের mess manage করতে করতে mismanage করে উধাও হয়েছে, তার কোন পাত্তা নেই; উপরন্তু তার আর একটা বদনামও রটে গেছে, সে নাকি আই বির কাছে খবর দিত। মনটা খারাপ হয়ে গেল। বদনাম বিশ্বাস করতে পারলুম না। অথচ হঠাৎ অদৃশ্য হওয়া তো ভাল কথা নয়!

বরানগরের বাড়ীতে তখনই গেলুম না, কারণ ভাগ্নীর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ায় জামাই তাকে নিয়ে পুরী চলে গিয়েছিল জানতুম। কিন্তু তারপর তাদের খবর বা চিঠি-পত্র পাইনি।

দেনার মামলার তদ্বির করতো প্রভাস, উকীলের নাম শুনেছিলুম—বোধ হয় সুধীন্দ্র মুখার্জি, পদ্মপুকুরে থাকেন; ঠিকানা জানি না। খুঁজে যেতে ২।৪ দিন দেরী হল। তিনি দুঃখ করতে লাগলেন, ২।১ দিন আগেই তারিখ ছিল, প্রভাসও কিছুদিন যায়নি। আমার মুক্তির খবরটা সম্বর্দ্ধনার পরের দিন ফরোয়ার্ডে ঘটা করে ছাপা হয়েছিল, আমার পরিচয় ছিল প্রায় এক কলম জুড়ে। মহাজনের উকীল বাগ মানেনি, জজ এক্স পার্টি ডিগ্রী দিয়ে দিয়েছেন। ল্যাঠা চুকে গেল ভেবে স্বস্তিবোধ করলুম।

পরে অমরদার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি ডিগ্রীর কথা শুনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে মহাজনের বাড়ী গেলেন (কাশীপুরের বামন দাস মুখোপাধ্যায়ের কৃষ্ণপুত্র)। তিনি কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করার পর অমরদা আমার কথা তুলে প্রস্তাব করলেন, ওভাবে বাড়ীটা নিয়ে নেওয়াটা তো ভাল দেখায় না, ওকে আর কিছু টাকা দিন, যাতে ও কিছু রোজগার করে খেতে পারে, ও বাড়ী বিক্রীর দলিল লিখে দিক। মহাজন বললেন, এসব বিষয়ে আমি কিছুই করি না, ম্যানেজারই যা ভাল বোঝে, করে। ম্যানেজার অবশ্য স্রেফ হাকিয়েই দিলেন।

সারদা দিল্লীতে বড়দাদার কাছে চলে গিয়েছিল, আমার মুক্তির খবর পেয়েই চলে এল। দোসর পেয়ে ভরসা হল, কারণ সে আমার সঙ্গে জাহান্নম পর্যন্ত যেতেও রাজি।

কিছু অর্থের সংস্থান হয়েছিল ঘটনাচক্রে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে। কামারখন্দে থাকার সময় চাকরের অসুবিধাটা হয়েছিল শাপে-বর। প্রতি মাসেই কয়েকটা করে টাকা বাঁচতো। জামতৈল গ্রামের এক বড় জোতদার রাধাগোবিন্দ সাহার ভ্রাতুষ্পুত্র অখিল সাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, টাকা ক'টা তাঁর কাছে রাখতুম। মুক্তির পর তাঁদের শোভা-বাজারের পাটের আড়তে এসে তিনি আমাকে জমানো টাকাটা দিয়ে যান। সেই আমার প্রাথমিক সংস্থান। ভদ্রলোক শিক্ষিত, সৎ, চমৎকার লোক।

কলেজ রো'তে এক "ব্রাহ্মণ মেস" নামক বোর্ডিংয়ে এক ঘর নিলুম এবং গুলিসুতো কিনে দুজনে পৈতে বানিয়ে পরলুম! পৈতে না দেখালে সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

কিন্তু এখনই কিছু রোজগারের ব্যবস্থা না করলে চলে না। ক'টা মাত্র টাকা, কয়েক দিনেই ফুরিয়ে গেল। নিলামে যাতায়াত শুরু করে দিয়েছিলুম এবং বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ঘুরে তাদের কাছ থেকে এক আধটা জিনিসের অর্ডার সংগ্রহ করে, কিনে দিয়ে ২।৫ টাকা পেতুম। তাতেই খরচ চলতো কায়ক্লেশে।

ঘর সংসারের ২।৪টে অপরিহার্য জিনিষের সন্ধানে বরানগরের বাড়ীতে গেলুম। বাড়ীর সামনে এক স্বর্ণকারের কাছে জামাই বাড়ীর চাবি দিয়ে গিয়েছিল। তাঁর কাছে খবর পেলুম ভাগ্নী মারা গেছে। আর এক ল্যাঠাও চুকলো।

'২১ সালে যখন ডেকোরেশনের ব্যবসা তুলে দিয়েছিলুম, তখন প্রোসেশনের লাইট তৈরী চলছিল। লড়াইয়ের পরের চড়া দামে বহু লোহার পাইপ কিনেছিলুম এবং সেগুলো বাণ্ডিল বাঁধা অবস্থায় বাড়ীতে পড়েছিল। দেখলুম, মরচে ধরে এক একটা থাম্বা হয়ে গেছে। সেগুলো নিয়ে ঝঞ্ঝাট বাড়ানোর চেয়ে ভুলে যাওয়াই ভাল মনে করলুম।

বাড়ী থেকে সংগ্রহ করলুম একখানা বড় তক্তপোষ, একটা বেঞ্চ, একটা আলনা, একটা টেবিল, একটা চেয়ার, একটা অ্যাসিটিলিন গ্যাসের দেওয়ালগিরি আলো, ছাদে ওঠার একটা কাঠের সিঁড়ি আর ১২ ফুট লম্বা একখানা সাইনবোর্ড (দোকানের)। জামাই যা নিয়ে যেতে পারেনি তাই পড়েছিল। আমি ঐ জিনিসগুলো নেওয়ার পর আর যা কিছু পড়ে থাকলো, সেগুলো স্বর্ণকার মশাইকে দিলুম। বললুম, যদি পারেন, আমাকে কয়েকটা টাকা দিয়ে দেবেন। তিনি সদ্য সদ্য পনেরোটা টাকা দিয়ে বললেন, পরে আর যা পারি দোব। আমি তার পরে আর যাইনি। অর্থাৎ আমার বাকি সম্পত্তি থেকে পেলুম পনেরো টাকা।

তখন বি. পি. সি. সি-র Acting President ছিলেন অখিল দত্ত। কেন তা মনে নেই। সম্ভবত সেনগুপ্ত বম্বেতে মমতাজ বেগমের মামলায় বেগমের সমর্থনে মামলা করতে গিয়েছিলেন।

তখন সুভাষ বাবু ভাওয়ালী বা রাণীক্ষেতে স্বাস্থ্য-নিবাসে আছেন। রোজ বিকালে টেম্পারেচার বাড়ে, রোগা হয়ে গেছেন, suspected T B., তাঁকে মুক্ত করার চেষ্টা চলছে। এক বে-সরকারী মেডিক্যাল বোর্ড তাঁকে পরীক্ষা করে টি. বি সন্দেহই প্রকাশ করলেন। বোধ হয় তার মধ্যে ডক্টর বিধান রায়ও ছিলেন। সরকার এত দিন মানছিল না, এবার এক সরকারী মেডিক্যাল বোর্ড দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে suspected T. B. বলেই মুক্তি দিলে।

তাঁর মুক্তির কয়েক দিন আগে বি. পি. সি. সি-র সভায় শ্রীঅমরকৃষ্ণ ঘোষের এক প্রস্তাব গৃহীত হল, যাতে সুভাষ বাবুকে বি. পি. সি. সি-র প্রেসিডেন্ট করা হল। সুভাষ বাবু এলেন। সর্বত্র তাঁর সম্বর্ধনা হল। ধীরে ধীরে তাঁর স্বাস্থ্যও ভাল হয়ে উঠলো।

'২৭ সালের শেষেই বোধ হয়, বিলাত থেকে পার্শী এম. পি. বিলাতের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য সাপুরজী সাকলাতওয়ালা ভারতে এবং কলকাতায় এসে অ্যালবার্ট হলে এক বক্তৃতায় যুবকদের পরামর্শ দিলেন, তোমরা সর্বত্র Young Communist League সংগঠন কর। তখনও কমিউনিষ্ট পার্টি নামের কোন প্রকাশ্য সংগঠন ছিল না—কমিউনিষ্টরা workers party, peasants party প্রভৃতি ধরনের নামের আড়াল থেকে কাজ করে। বস্তুত কমিউনিজম কথাটাই তখনও চালু হয়নি, তার বদলে চলতো বলশেভিজম কথাটা, কারণ আমাদের দেশের রয়টারের একচেটিয়া সংবাদজগতে রুশিয়ার কমিউনিষ্টদের বা পার্টির বিরুদ্ধে অপপ্রচার বলশেভিক নামেই চালানো হত।

কমিউনিষ্ট পার্টি সংগঠিত হয়ে ওঠার লক্ষণ দেখামাত্রই সে প্রচেষ্টার অঙ্কুরে বিনাশের জন্যই সরকার বাহাদুর '২৪ সালে কানপুর "বলশেভিক" ষড়যন্ত্র মামলা করেছিলেন, যার এক নম্বর আসামী ছিলেন এম. এন. রায়। তিনি তখন রুশিয়ায়, মস্কোর তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সভাপতিমণ্ডলীর ১১ জন সদস্যের অন্যতম, সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে কমিউনিজম প্রচারের এবং পার্টি সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সদস্য।

এদিকে সুভাষবাবুকে বি. পি. সি. সি-র গদীতে বসানোর পর তাঁকে কর্পোরেশনের গদীতেও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা শুরু হল। জেলে যাওয়ার আগে তিনি ছিলেন কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং তাঁর অবর্তমানে ফার্স্ট ডেপুটি এক্সিকিউটিভ

অফিসার জে. সি. মুখার্জী "চীফ" হয়েছিলেন। তাঁকে কংগ্রেস-নেতারা অনুরোধ করলেন, সুভাষবাবুকে জায়গা ছেড়ে দিতে। তিনি বললেন, অন্য কারো কথায় ছাড়বো না, সুভাষ-বাবু অনুরোধ করলে ছাড়বো। সুভাষ বাবুর সে অনুরোধ করতে সরমে বাধলো। সুতরাং মুখার্জীই চীফ থেকে গেলেন এবং সুভাষবাবুকে মেয়রের গদীতে বসাবার তোড়জোড় শুরু হল, সামনের কর্পোরেশন-নির্বাচনের মধ্য দিয়ে।

ওদিকে আমার ভাগ্নে বেচারা তখনও বাহেরকে জিতেন কুশারীর সত্যাশ্রমে পড়ে আছে। তাকে নিয়ে এলুম। কিন্তু খরচ চালানোও দুষ্কর, আর পড়াশুনোর ব্যবস্থাও প্রায় অসম্ভব। আমার কাছে থাকলে পড়াশুনো হবে না ভেবে তাকে নিয়ে গেলুম তার জ্যাঠামশায়ের কাছে। তিনি retired Govt. Pensioner—বালিগঞ্জে বন্দেল রোডে সপরিবারে বাস করতেন। তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে তাকে গ্রহণ করলেন। ভাগ্নের একটা হিল্লে হল, আর একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। তার লেখাপড়া সেখানেই আবার শুরু হল।

দাদারা মুক্ত হয়ে আসছেন। দুই দলে জোট বাঁধতে পারলে একটা বিরাট শক্তির সৃষ্টি হবে। পারস্পরিক খেয়োখেয়িতে শক্তি ক্ষয় হবে না, অবিপ্লবী নেতাদের বিপ্লববিরোধী কর্মসূচীর লড়াইয়ে দুই বিপ্লবীদল দুপক্ষ থেকে পরস্পরের বিরোধিতাকেই তাদের কর্মসূচীর প্রধান ধান্ধা করে বরবাদ হয়ে যাবে না। নতুন নিজস্ব কর্মসূচী আসবে, তার জন্য তৈরী থাকাই দরকার।

বারট্রাণ্ড রাসেল এবং ব্রেলসফোর্ডের কাছে চিঠি লিখে অনুমতি চাইলুম, তাঁদের বইয়ের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের জন্যে। রাসেল উত্তরে লিখলেন, তোমার চিঠি আমার প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দিলুম, তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত কর। প্রকাশক আমাকে জানালেন, যদি অবিলম্বে পাঁচ পাউণ্ড পাঠাতে পার অনুমতি পাবে, দেরী করলে পাঁচ পাউণ্ডে চলবে না।

তখন দিন-কাল এমনি ছিল। কিন্তু আমার দিন-কালও এমন ছিল যে, পাঁচ পাউণ্ডের মতন টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব। ওটার আশা ছেড়েই দিলুম।

ব্রেলসফোর্ড লিখলেন, আমিতো তোমার পরিচয় জানিনা, যদি একটা আমার চেনা লোকের সুপারিশ পাঠাতে পার, ধর যদি জে. সি. বোসের সুপারিশ সংগ্রহ করে পাঠাতে পার, তাহলে আমি অনুমতি দিতে পারি।

বুঝলুম, আমার প্রথম চিঠিতে একটু ঘোরানো করে পরিচয়টা দিলে হয়তো কাজ হয়ে যেত। কিন্তু একে আনাড়ী, তাতে নিজের সম্বন্ধে ভাল কথা বলার অভ্যাস কোন কালেই নেই, কাজেই সেটা হয়নি। যাই হোক, জগদীশ বসুর সুপারিশ সংগ্রহের জন্য বোস ইনষ্টি-টিউটে গিয়ে গোপাল বাবুর (ভট্টাচার্য) সঙ্গে দেখা করলুম এবং শুনলুম, কয়েকদিন আগেই তিনি "ফরেন টুরে" বেরিয়ে গেছেন। সুতরাং সে বইটা সম্বন্ধেও আশা ছেড়ে দিলুম।

তখন সস্তাগণ্ডার দিন, নতুন কায়দার হোটেল হয়েছে পাইস হোটেল, ছ'পয়সায় মাছের ঝোল ভাত খাওয়া হয়ে যায়। তাই কোন মতে চলে যেত। কিন্তু আর কিছু, কয়েকটা টাকা রোজগার না করতে পারলে যুত হচ্ছে না। সুরেশ মজুমদারকে একদিন বললুম, আপনার "আনন্দবাজারে" আমাকে এমন একটা চাকরী দিতে পারেন, যাতে রোজ ঘণ্টা দুই খেটে মাসে ১৫।২০ টাকা পাওয়া যায়? তিনি বললেন, না—খাটনি ৩।৪ ঘণ্টা আর মাইনে গোটা ত্রিশ টাকা, যদি চান, হতে পারে। তখন মাদ্রাজে ডিসেম্বরে কংগ্রেস আসন্ন।

সুতরাং রাজী হলুম এবং ৩০ টাকা মাইনের সাব-এডিটারী চাকরী নিলুম। যতীন ভট্টাচার্যও তখন (সিনিয়র) সাব-এডিটার ছিলেন। সে ঠিক কংগ্রেসের আগেই। হরদম টেলিগ্রামে খবর আসছে এবং আমরাও হরদম অনুবাদ করে চলেছি, এইভাবে কংগ্রেসের কয়েক দিন একটু বেশী রাত পর্যন্তই খাটুনী হল এবং তার পর হল জ্বর।

মাদ্রাজ কংগ্রেসে তরুণ স্বাধীনতাবাদী ও বিপ্লবীদের চেষ্টায় এক প্রস্তাব পাশ হয়ে গিয়েছিল, কংগ্রেসের চরম লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা। এটা হল এক প্রস্তাবের আকারে, creed পরিবর্তন হল না। মহাত্মাজী তখন অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে খদ্দর উৎপাদন চালাচ্ছেন, কংগ্রেসের নেতৃত্ব স্বরাজ পার্টির হাতে ছেড়ে দিয়ে। মাদ্রাজের কাণ্ড দেখে তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, ফিরে এসে আবার কংগ্রেসের কর্ণ ধারণ করলেন।

আমার প্রবল জ্বর, ওঠে-নামে, কিন্তু ছাড়ে না। পাশের ঘরে এক তরুণ ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের সিক্সথ ইয়ার ষ্টুডেণ্ট। তিনি ক'দিন দেখে, জ্বর নামার মুখে কুইনাইন খাওয়ালেন। আবার জ্বর ওঠা নামা এবং আবার কুইনাইন—এমনি করে অনেক কুইনাইনও খাওয়া হল, জ্বরও চললো।

তখন আমাদের "ব্রাহ্মণ মেসে" ইলেকট্রিক ছিল না, ঘরে ঘরে জ্বলতো হ্যারিকেন। জ্বর অবস্থায় একদিন আমি "গোথেল্‌স্‌ স্পাচ" বইখানা পড়ছি। ক্ষুদে টাইপে ছাপা প্রকাণ্ড বই। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তখনও পড়ছি। চোখের ওপর একটু অত্যাচার হচ্ছে। সারদা বারণ করলে, পড়া বন্ধ করলুম।

সেই দিন শেষ রাত্রে মাথার যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙ্গে গেল, মাথার পিছন দিকটাকে যেন কেউ ছুরি দিয়ে খোঁচাচ্ছে। আমার আর্তনাদে আর সকলের ঘুম ভাঙ্গলো। পাশের ঘরের ডাক্তারও এল। হ্যারিকেন জেলে আমার মুখের কাছে ধরলো। আমি শুধু আলোর একটা আভাস বুঝতে পারছি, আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সম্পূর্ণ অন্ধ।

কাণ্ড দেখে সারদার সঙ্গে ডাক্তারও ঘাবড়ে গেল এবং তখনই মেডিক্যাল কলেজে ছুটলো। বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরলো এক মোটর নিয়ে। তখন সকাল হয়েছে। আমাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে ওরা দুজনে চললো হাসপাতালে। তখন দেশী ওয়ার্ডে সিট খালি ছিল না, ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে একটা মাত্র সিট খালি ছিল। "ডাক্তারের" তদ্বিরে আমাকে সেখানেই ভর্তি করে নেওয়া হল। খানিক পরেই এলেন কর্ণেল কোপিঞ্জার (আই স্পেসিয়্যালিষ্ট ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) এবং কয়েক জন ডাক্তার ও ষ্টুডেণ্ট। কোপিঞ্জার চোখ পরীক্ষা করে বললেন অ্যাকিউট গ্লকোমা, সাডন্‌ অ্যাটাক, ভেরি রেয়ার—ওঃ, আমার এক্ষুণি কাটতে ইচ্ছে করছে।

তার পর চললো লেকচার আর চোখ দুটোকে টিপে, পাতা টেনে তুলে দেখানো। সকলেই এক একবার চোখ দুটোকে টেপাটিপি করলেন। আমি তখন দেখছি শুধু কতকগুলো মানুষের অবয়ব মাত্র নড়াচড়া করছে—সবই ঘোলা। প্রাণটার মধ্যে চলছে একটা হাহাকার—এ কি হল!

তৃতীয় দিনে হল অপারেশন। সেদিন "টেনশন" কমেছে, কাছের মানুষ চিনতে পারছি, একটু ভরসা হয়েছে। কিন্তু সজ্ঞানে চোখ কাটবে—ভয়ও হচ্ছে।

মুক্তির পরও আমার ওপর একটা Restriction order ছিল, যেখানেই থাকি, I. B-র D. I. G. বা জেলার S. P-র অফিসে ঠিকানা জানাতে হবে, কলকাতায় বাস করতে করতে বাইরে যেতে হলে D. I. G-র কাছে খবর দিতে যেতে হবে, ইত্যাদি। যেদিন হাসপাতালে গেছি, তার পরের দিনই সে অর্ডারটা Cancel করার notice serve করার জন্যে একজন S. B. Inspector বাসায় গিয়েছিলেন সেখান থেকে হাসপাতালে এসেছেন notice serve করতে। সুতরাং জানাজানি হয়ে গেল যে, আমি আটক ছিলুম। মেম নার্সেরা হাঁ করে আমার মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে does he make bombs? অফিসার মৃদু হেসে চুপ করে থাকেন।

অপারেশন টেবিলে যখন চোখের সামনে ছুরি ধরে কোপিঞ্জার বলছেন look straight, তখন উঠে পালাতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু বোমাওয়ালা হয়ে কেমন করে পালাই! কাজেই লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে থাকলুম। দুটো eyeball-ই ইঞ্জেকশন দিয়ে বেহুঁস করেছিল কাটার জন্যে, কিন্তু বাঁ চোখটা কাটতে যন্ত্রণা টের পেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে ডান চোখটা কাটতে দিলুম না।

প্রথম দিনই সাবদা অন্নুকূলদাকে খবর দিয়েছিল—তিনিও কিছুদিন আগে অন্তরীণ থেকে ফিরে এসেছেন, তিনি দেখতে এসে, খাওয়ার অবস্থা ভাল নয় দেখে বন্দোবস্ত করে গিয়েছিলেন এবং রোজ দুপুর বেলা বাড়ী থেকে লুচি তরকারী মাছ প্রভৃতি থালা সাজিয়ে নিজে হাসপাতালে এসে খাইয়ে যেতেন। তাঁর ভালবাসা আমি ভুলতে পারি না।

যাই হোক, তৃতীয় দিনে ব্যাণ্ডেজ খুলে দেখে all right বলে, আবার বেঁধে ছেঁদে দিলে এবং আট দিন পরে ব্যাণ্ডেজ খুলে ছেড়ে দিলে। লেখাপড়া আপাতত একেবারে নিষিদ্ধ হল। সুতরাং ব্যবসা ছাড়া আর কোন পথ রইলো না। নিলেমের উপরই চেপে পড়লুম।

'২৭ সালের শেষে কলকাতায় কংগ্রেস অফিসে (বৌবাজার ষ্ট্রীট) ইউনিটি কনফারেন্স হল, অন্যান্য স্থানেও ইউনিটি কনফারেন্স চলতে লাগলো। তখন মহম্মদ আলী, সৌকত আলী প্রভৃতি কংগ্রেস নেতারা বিগড়ে গেছেন এবং মুসলমানদের দাবী নিয়েই ইউনিটি কনফারেন্সে লড়ছেন। কলকাতার মোহাম্মদী প্রভৃতি কাগজে মুসলমানদের দাবীর মধ্যে নতুন চাকরীর শতকরা ৮০টা তাদের জন্য রিজার্ভ রাখার দাবী উঠেছে। উপেনদা ঠাট্টা করে বললেন, মন্দির মসজিদ ভাঙ্গাও ঐ অনুপাতে করা চাই, শতকরা ৮০টা মসজিদ এবং ২০টা মন্দির।

'২৭ সালের শেষে বা '২৮ সালের প্রথমে, ঠিক মনে নেই—দেশবন্ধু পার্কে হিন্দু মহাসভার অল-ইণ্ডিয়া সম্মেলন হল, মূল লক্ষ্য ইউনিটি কনফারেন্সের বিরুদ্ধে হিন্দুদের এককাট্টা করা। সেই কনফারেন্সে প্রস্তাব হল, এটা হিন্দুর দেশ, মুসলমানরা যদি এদেশে থাকতে চায়, তাহলে তাদের হিন্দুদের কাছে মাথা হেঁট করেই থাকতে হবে! এইভাবে সেই কনফারেন্সেই "টু নেশন থিওরী" বা দ্বিজাতি তত্ত্বের জন্মকথার সূত্রপাত। দাঙ্গার পর হিন্দুদের মন এতখানি বিষিয়ে উঠেছিল যে, "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ" পর্যন্ত হিন্দু মহাসভার সুর ধরেছিল।

আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়, সাম্প্রদায়িকতার আকারে বিপ্লব-বিরোধী শক্তি সর্বত্রই প্রবল হয়ে উঠেছে। দাদারা ফিরলে final amalgamation হলে আবার একটা শক্তিশালী বিপ্লবীদল আসরে নামবে, এই আশায় দিন গুণছি।

একটা দোকান না করতে পারলে আর চলছে না, এটা বেশ বুঝলুম এবং অল্প ভাড়ার ঘর খুঁজে বেড়াতে শুরু করলুম।

শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীটের কোণায় অ্যালবার্ট বিল্ডিংয়ের দুটো দরজায় তালা বন্ধ দেখে এক বন্ধু ঠাট্টা করে বললে, এই ঘরটা নিয়ে ফেলুন। আমি বললুম, ঠাট্টা করছেন?—বেশ, এই ঘরই নোব।

দু দরজাওয়ালা বড় ঘর,—কিছুদিন আগে সে ঘরে খদ্দর প্রদর্শনী হয়েছিল। ভাড়া মাসিক ১০০ টাকা। তখন আমার পকেটের সম্বল মাত্র গোটা পঞ্চাশেক টাকা। সেক্রেটারী সত্যানন্দ বসু বিক্রমপুরের লোক, পঞ্জাবের যতীন দত্তের সঙ্গে (মুন্সীগঞ্জ ন্যাশান্যাল স্কুলের ভূতপূর্ব হেড মাষ্টার) আলাপ আছে। সুরেশ মজুমদারের কাছ থেকে ৫০টা টাকা ধার করলুম এবং যতীন দত্তকে সঙ্গে নিয়ে সত্যানন্দ বাবুর বাড়ী গিয়ে আগাম একমাসের ভাড়া ১০০ টাকা জমা দিয়ে পকেট খালি করে ঘরের চাবি নিয়ে এলুম।

সাবদা অবাক হয়ে আমার কাণ্ড দেখছিল। আমার ওপর তার অগাধ বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের জোরেই সে আমার পিছন পিছন বিপ্লবের পথে চলার জন্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল। তাকে আমার প্ল্যান বললুম,—একটু দেখে শুনে মাল কিনবো, মিস্ত্রীর খরচ এক পয়সাও করবো না; আমি ছুতোর মিস্ত্রী, তুমি পালিস মিস্ত্রী, দুজনেই দুজনের কাজে সাহায্য করবো। আমি বাইরে ঘুরবো, তুমি থাকবে দোকানে। এখানেই রেঁধে খাবো, যত সংক্ষেপে পারা যায়। সে বুঝলো, সায় দিলো, "ব্রাহ্মণ মেস" ছেড়ে ঘরের জিনিস ক'টা নিয়ে দোকানে উঠলুম।

ভাতে-ভাত একদিন বেঁধে দুদিন খাই, দ্বিতীয় দিনে ফুলুরী কিনে গুঁড়িয়ে তেলনুন মেখে নিই। ক্রমে এক এক দিন তৃতীয় দিনেও জল দেওয়া ভাত থাকে, ভাতগুলো আধ-পচা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, জলটা লাল-হড়হড়ে। সেগুলোকে টাটকা জলে দু-তিনবার ধুয়ে নিয়ে তেল-নুন দিয়ে একটু ভেজে নিয়ে ফুলুরী দিয়ে খাই।

হাতড়ে হাতড়ে দুজনে মিস্ত্রীর কাজ করি। নিলেমে মাল কেনা বাড়লো, বিক্রীও বাড়লো, ২।১টা করে মাল দোকানেও জমতে শুরু করলো। ৭৮ মাসের মধ্যেই দোকানও ভরে উঠলো, বিক্রী হাজার টাকায় পৌঁছলো, দোকান দাঁড়িয়ে গেল রীতিমত Self-supporting হয়ে। দুজনার আনন্দ হল, নিজেদের ওপর ভরসা ও বিশ্বাস বাড়লো। এতদিনে '২৮ সালের মাঝামাঝি এসে পড়েছি।

ইতিমধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একটা নতুন কাণ্ডের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। ১৯২০ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড এক ধাপ স্বরাজ দেওয়ার সময় ঘোষণা করেছিল, ১০ বছর অন্তর অন্তর নতুন নতুন এক এক ধাপ স্বরাজ দেওয়া হবে। সুতরাং '৩০ সালে পরবর্তী শাসন সংস্কারের কথা। তারই ব্যবস্থা করার জন্যে বৃটিশ সরকার '২৭ সালে এক রয়েল কমিশন তৈরী করলেন—Simon Commission. তাঁরা ভারতে এলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টি, সম্প্রদায়, নেতা প্রভৃতির মতামত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা ও বিবেচনা করে '৩০ সালের শাসন সংস্কারের মূলনীতি নির্ধারণ করে কাঠামো বেঁধে দেবেন। কংগ্রেস সে কমিশন বয়কট করলো, কারণ তার মধ্যে একজনও ভারতীয় সদস্য ছিল না।

এই রকম এক কমিশন '২২ সালে ইজিপ্টের শাসন সংস্কারের জন্য তৈরী হয়েছিল,

বোধ হয় Milner Commission. মিশরবাসীরা তাকে এমন সর্বাত্মকভাবে বয়কট করেছিল যে, তারা ইজিপ্টে গিয়ে কারো তরফের কোন কথা শুনতে পায় নি। তারা যেখানেই যায়, যার কাছেই যায়, সকলেই তাদের প্রশ্নের উত্তরে বলে, Go to Zoglul. তখন জগলুল পাশা মিশরীদের নেতা।

ভারতে '২০ সালে মণ্টেগুর কাছে সকল দল এবং লোকই দরখাস্ত করেছিল, সাক্ষ্য দিয়েছিল—কংগ্রেস এবং মোসলেম লীগও যুক্ত মেমোরিয়্যাল দিয়েছিল। '২৭ সালে সাইমন কমিশনের কাছেও কংগ্রেস ও লীগ ছাড়া আর সকলেই দরখাস্ত ও সাক্ষ্য দিয়েছিল। আর কংগ্রেস তাদের বয়কট করেও এক কমিটি তৈয়ারী করেছিল, Nehru Committee. আগামী শাসন-সংস্কারে কি রকম ব্যবস্থা হলে কংগ্রেস ও ভারত সন্তুষ্ট হবে, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সে কমিটির সভাপতি, আর সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে তরুণ বয়স্ক ছিলেন সোয়ায়েব কোরেশি আর সুভাষ বসু।

'২৮ সালের গোড়ায় সে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হল, অবশ্য প্রধানত সাইমন কমিশনকেই দাবী জানানোর জন্য, যে দাবীর মূল কথা ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস। স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম সুভাষ বসু। বুঝা গেল, কংগ্রেসের creed যে স্বরাজ, তার প্রকৃত অর্থ ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস এবং সেটা বিপ্লবীদাদাদেরও অনুমোদিত। তা না হলে হয়ত সুভাষ বাবু একটা note of dissent দিয়ে বসতেন।

এদিকে জহরলাল নেহেরু '২৭ সালের শেষে ইউরোপ সফরে গিয়েছিলেন এবং বিলাতের বামপন্থী শ্রমিকনেতা ফেনার ব্রকওয়ে কর্তৃক সংগঠিত League Against Imperialism-এর সদস্য হয়ে এবং সোভিয়েত রুশিয়া সফর করে ফিরে এসে একটু বেসুরো কথা বলতে শুরু করেছেন,—Independence এবং Socialism.

দোকান দাঁড়িয়ে গেছে বলে আমার দুঃসাহসও বেড়ে গেছে। অ্যালবার্ট বিল্ডিং-এর তেতলায় ফোটো আর্টিষ্ট সি. গুহের ঘরের পাশে একটা অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সীর অফিস ছিল, সেটা উঠে গেল দেখে ৩৫৲ টাকা ভাড়ায় সে ঘরও নিলুম। অজুহাত গুদাম করবো, কিন্তু বাস্তবে সেটা হল গোপন কথা-বার্তার জায়গা এবং তার সঙ্গে অবশ্য কিছু মালও থাকে, রান্না খাওয়ারও সেখানেই ব্যবস্থা হল।

ক্রমে দাদারা সকলে ফিরে এলেন। যাদুদাকে রাঁচিতে extern করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সেখানে যাওয়ার আগে কয়েক দিনের জন্য কলকাতায় থাকার অনুমতি পেয়েছিলেন। সেই সুযোগে সকল বিপ্লবী দলের amalgamation-এর জন্যে নেতৃ সম্মেলনের ব্যবস্থা হল গোপনে এবং আমার ঐ ঘরে। অ্যালবার্ট বিল্ডিং-এর পাশের গলিতে একটা দরজা এবং সিঁড়ি ছিল। আমি গলির মুখে দাঁড়ালুম এবং নেতারা একে একে আসতে লাগলেন এবং আমি তাঁদের ঐ দিক দিয়ে গিয়ে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসতে লাগলুম।

পর পর তিন দিন ধরে ঐ ভাবে সম্মেলন চললো এবং মিলন হয়ে গেল। অনুশীলনের তরফে প্রতুল গাঙ্গুলী, রবী সেন প্রভৃতি, যুগান্তরের যাদু'দা, মনোরঞ্জন'দা, ভূপতি'দা প্রভৃতি, যুগান্তর দলের সহযোগী বিপিনদার দলের বিপিন'দা, গিরীন'দা প্রভৃতি, পূর্ণ দাসের দলের

পূর্ণ দাস এবং আরো ২।১ জন, এমনি করে প্রায় জন কুড়ি নেতা সকল বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করে সকল অবিশ্বাস সন্দেহের নিরসন করে' সর্ববাদীসম্মত মিলন হয়ে গেল। আমি অবশ্য বরাবরই বাইরের গার্ড, escort এবং হুকুম বরদার থাকলুম। ভরসা হল, আনন্দ হল, একটা নতুন যুগের সূচনা হল।

জীবন তখনও টি.বি র আক্রমণের সন্দেহে সরকারী ব্যবস্থায় আলমোড়ায় রয়েছে। হঠাৎ একদিন কাগজে খবর দেখা গেল, তার কাশের সঙ্গে রক্ত পড়ছে, জ্বর চলছে, অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ। দাদাদের তরফ থেকে আমাকে পাঠানোর ব্যবস্থা হল, আমি গেলুম আলমোড়ায়। গিয়ে দেখলুম, অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ বটে, কিন্তু আমরা যতটা আশঙ্কা করেছিলুম, ততটা নয়।

সেই প্রথম শুনলুম, পাহাড়ী ডাক্তার জ্বর হলে ভাত খেতে নিষেধ করে, বলে, খিচড়ী খাইয়ে। আর সেখানে দেখলুম প্রভাসকে, সে বার্মায় ছিল, কাগজে জীবনের খবর পড়ে' সেখান থেকে দেখতে এসেছে।

তার কাছে শুনলুম, আমাদের মুক্তাগঞ্জের এক সহকর্মী তার মাতব্বরীর position দেখে ঈর্ষা ও বিদ্বেষবশত তার নামে নানা অকথা কুকথা প্রচার করে' তার এমন অবস্থা করেছিল যে, কর্মী-সংঘের সংস্রব ছেড়ে তাকে পালাতে হয়েছিল এবং দেশত্যাগের জন্যই সে বর্মায় গিয়েছিল।

আমি বললুম, আমার সঙ্গে কলকাতায় ফিরে চল, দোকান নিয়ে থাকবে, কারো সঙ্গে মিশবে না, আমার কাছে কিছুদিন চুপ করে থাকলে ও সব কথা আপনি die out করবে। ঠিক তাই হল, আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ফিরলুম।

প্রভাস দোকানেই থাকলো এবং আস্তে আস্তে তার ওপর লোকের আস্থা ফিরে এল।

ওদিকে জহরলাল ইউরোপ থেকে আসার পর এলাহাবাদে এক নতুন সংগঠন আরম্ভ করলেন—Independence League. তখন ডক্টর কানাই গাঙ্গুলী সেখানে ছিলেন জহরলাল তাঁর ওপর ভার দিলেন, বাঙ্গলায় Indepedence League-এর শাখা সংগঠনের, এবং তিনি কলকাতায় এসে দাদাদের কাছে তদনুযায়ী প্রস্তাব করলেন। তিনিও সোসিয়্যালিজমের কথাই বলতেন।

দাদারা সুভাষ বাবুকে 'অল-ইণ্ডিয়া' ক্ষেত্রে বাংলার বিপ্লবীদের প্রতিনিধিরূপে খাড়া করার প্ল্যান নিয়ে কাজ করছিলেন। সুতরাং জহরলালের নেতৃত্বে সুভাষ বাবু কাজ করবেন এ তো হতে পারে না। ফলে দেখা গেল, কলকাতায় এক নতুন স্বাধীন সংগঠন হল Independence for India League, Bengal. কিরণশঙ্কর রায়কে করা হল সেক্রেটারী। কানাই বাবু সরে পড়লেন।

'২৭ সালে চীনে কমিউনিষ্টরা এক বিদ্রোহী সরকার গঠন করে ফেলেছিল এবং কুয়োমিনটাং সেনাপতি চিয়াং কাইশেক সে বিদ্রোহ দমন উপলক্ষে সাংহাই সহরে হাজার হাজার বিপ্লবী-অবিপ্লবী শ্রমিককে হত্যা করেছিল। এম এন. রায় তখন চীনে উপস্থিত ছিলেন এবং অসময়ে বিপ্লব ও তার ব্যর্থতার জন্য দায়ী করে কোমিণ্টান থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তিনি বলেন, এসবের জন্য দায়ী বোরোডিন, যিনি কোমিণ্টানের পক্ষ থেকে বহুকাল ধরে সেখানে কাজ করছিলেন।

এ Controversy র কথা এখানে অবান্তর। শুধু এই কথাটুকু বলা দরকার যে, ভারতের কমিউনিষ্টরাও অতঃপর তাঁকে বর্জন করলেন, শুধু বদনাম রটাতে লাগলেন, এবং শেষ পর্যন্ত ভারতে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে বসেও তাঁর নামটা সম্পূর্ণ Black out করলেন।

'২৮ সালে ভগৎ সিং প্রমুখ কয়েকজন তরুণ এক 'নওজোয়ান ভারত সভা' সংগঠন করেন—বৈপ্লবিক সংগঠন, যার মধ্যে বোমা বন্দুক এবং সোস্যালিজমের আদর্শ দুইই ছিল। জেলে যতীন দাসের ইতিহাস বিশ্রুত অনশন এবং ৬৩ দিন পরে তিলে তিলে সজ্ঞান মৃত্যুবরণও এই সময়েই।

সতেরো

'২৮ সালে রাজবন্দীদের মুক্তির সম্বর্দ্ধনার একটা হিড়িক লেগে গিয়েছিল সাইকারী-ভাবে। ব্যাপারটা হয়ে উঠেছিল একটা অ্যান্টি গভর্ণমেন্ট ডিমনষ্ট্রেশনের মতন, সরকার যাদের বিনা বিচারে বন্দী করে, দেশের লোক তাদের শ্রদ্ধা করে, সভা থেকে এটাই ঘোষণা করা হত। সব রাজবন্দীই ছিল কংগ্রেস কর্মী এবং খাঁটি খদ্দর শোভিত, সুতরাং প্রদর্শনীটা হত ভালই এবং বিভিন্ন স্থানের কংগ্রেস কমিটিই ছিল উদ্যোক্তা।

এমনি এক সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা হয়েছিল হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে। তখন ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট। তাঁকে ব্যবহারিক রাজনীতিতে নামাবার চেষ্টা শুরু হয়েছিল এই হাওড়া জেলা কংগ্রেস থেকেই। অবশ্য কংগ্রেসের কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি শেষ পর্যন্ত ইস্তফা দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, আর যারাই স্বরাজ চাক্, হাওড়ার লোক যে স্বরাজ চায়না এটা তিনি বুঝেছেন!

যাই হোক, দুই বড় বিপ্লবী দলের মিলনের পর পরামর্শ হয়েছিল সন্তোষ মিত্রকে কোণঠাসা করতে হবে, যাতে সে আবার '২২ সালের মত "ফুট্‌ফাট্‌" শুরু করে পুলিসকে আবার ধর পাকড়ের সুযোগ না দিতে পারে। তখন তার একটা নিজস্ব দল গড়ে উঠেছিল, এবং সে বিপিনদাকেও চ্যালেঞ্জ করতো, নিজেকে একটা পৃথক বিপ্লবী দলের নেতা মনে করতো।

দার্জিলিং জেলে '২৪ সালে লর্ড লিটন সন্তোষ মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং কথাবার্তার মধ্যে সন্তোষ নাকি বড়াই করে বলেছিল, হ্যাঁ খুন-ডাকাতি তো করেছিই। এই ব্যাপারটা থেকে দাদারা বলতে শুরু করেছিলেন যে, সন্তোষ লিটনের কাছে সব-কিছু বলে দিয়েছে। কিন্তু প্রকাশ্যে দেশের লোকের কাছে এই কথাটা প্রচারের প্রয়োজন, অথচ তার কোন সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না। সে সুযোগ এল, হাওড়ায় রাজবন্দী সম্বর্দ্ধনার উপলক্ষে।

দাদারা পিছনে থেকে শরৎ চট্টোপাধ্যায় এবং সুভাষ বাবুর হাতে তামুক খাওয়ার প্ল্যান আঁটলেন। প্রথমে নিমন্ত্রণ পত্র বিলির ব্যবস্থার মধ্যে সন্তোষ মিত্রের দলকে বাদ

দেওয়ার চেষ্টা হল, গিরীন ব্যানার্জি, অনুকূল মুখার্জি প্রভৃতি বিগড়ে গেলেন। ওদিকে হাওড়ায় বিপিনদা এবং সন্তোষ মিত্রের দলের ছেলেরা গোপনে একগাদা নিমন্ত্রণ পত্র, শরৎ বাবুর সই করা পত্র সন্তোষ মিত্রের হাতে পৌঁছে দিল। দেখা গেল, প্যাণ্ডালের সভায় সদলবলে সন্তোষ মিত্র উপস্থিত!

তখন সুভাষ বাবুকে দিয়ে শরৎ বাবুকে চাপ দেওয়া হল, সভায় তাঁর বক্তৃতার মধ্যে সন্তোষ মিত্রের বিরুদ্ধে বলতে হবে। শরৎ বাবু পড়লেন মহা ফাঁপরে এবং শেষ পর্যন্ত বক্তৃতার মধ্যে বললেন, দুঃখের বিষয়, উপস্থিত রাজবন্দীদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যাদের সরকারের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ আছে, যারা পুলিসের কাছে গোপন রিপোর্ট দেয় ইত্যাদি।

একটা বিতিকিচ্ছি অবস্থা! সন্তোষের নাম করে কিছু বলা হয়নি বলে সে চুপ করেই থাকলো। কিন্তু সভার পরে ভুরিভোজনের ব্যবস্থাটা মাঠে মারা যাওয়ার জোগাড়। পাছে সন্তোষের সঙ্গে বসে খেতে হয়, সে জন্যে দাদারা ভোজ বয়কট করে চলে এলেন, যাতে কাণ্ডটা এবং প্রচারটা আরো ঘোরালো হয়। বিপিনদার দল থেকে গেল, যাতে ব্যাপারটা অত উৎকট না হয়। আমি গোপনে ভূপতিদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম,—ব্যাপারটা কি? আপনারা সন্তোষ মিত্রকে সত্যই স্পাই মনে করেন, না, এটা তাকে কোণঠাসা করার প্ল্যান? তিনিও গোপনেই বলেছিলেন, কোণঠাসা করার প্ল্যান।

এরপর বিপিনদার দল সন্তোষ মিত্রের জন্যে এক বিশেষ সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করেছিলেন মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে। আমি সারদাকে সেখানে পাঠিয়েছিলুম। সন্তোষ মিত্র এই সুযোগে নিজেকে আরও স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে নিলে এবং বিপিনদার বিরুদ্ধেও যা তা বলতে শুরু করলে। ফলে বিপিনদা এবং গিরীনদা আবার আমাদের দাদাদের সঙ্গে ভিড়ে গেলেন। অনুকূলদা কিন্তু সন্তোষ মিত্রকে বর্জন করলেন না। সুভাষ সেনগুপ্ত লড়াইয়ে সন্তোষ মিত্র এবং অনুকূলদা সেনগুপ্তের সমর্থনে দাঁড়ালেন।

পরবর্তীকালে, '৩৩ সালে হিজলী বন্দী নিবাসে সন্তোষ মিত্র পুলিসের গুলীতে নিহত হলে সুভাষবাবু স্বয়ং সন্তোষ মিত্রের বাড়ীতে গিয়ে তার বাবার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এবং হাওড়ার ব্যাপারে ভুল করেছিলেন বলে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। দাদারা অবশ্য এ রকম কাণ্ড করেন নি।

ঢাকায় তখন শ্রীসংঘ তরুণদের মধ্যে বিপ্লবী সংগঠন করছিল এবং তাদের সঙ্গে অনুশীলন পার্টির সংগ্রামও চলছিল; ফলে শ্রীসংঘের সঙ্গে যুগান্তর পার্টির সহযোগিতাও চলছিল। শ্রীসংঘের চারজন নেতা—অনিল রায়, সত্য গুপ্ত ("মেজর"), ভূপেন রক্ষিত এবং মণীন্দ্রনারায়ণ রায়—আর মহিলা বিভাগের নেত্রী লীলা নাগ (রায়)।

এই সময় ঢাকায় এক যুব সম্মেলন হয়,—শ্রীসংঘ ছিল তার উদ্যোক্তাদের মধ্যে। কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত ও সদ্য জেল-প্রত্যাগত মোজাঃফর আহম্মদ বোধ হয় প্রধান অতিথি ছিলেন। অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল, গলার আওয়াজ ততোধিক ক্ষীণ। আমিও নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে গিয়েছিলুম। কমিউনিষ্ট পার্টি বা তার মার্কা তখনও চালু হয়নি। মোজাঃফর প্রভৃতি তখনও বলশেভিক আদর্শে অনুপ্রাণিত কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের নেতা বলেই পরিচিত। আর কংগ্রেসী ও বে-সরকারী কাগজে পত্রে তখনও

সরকার বিরোধী আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে এই নীতির দোহাই দিয়ে "কমিউনিষ্টদের" সমর্থনে লেখা হত যে, শুদ্ধ মতবাদের জন্যে কাউকে কারাদণ্ড দেওয়া অন্যায়। কার্যত কোন বে-আইনী কাজতো তারা করেনি। ঢাকায় যুব সম্মেলনে মোজাঃফর আহম্মদের নিমন্ত্রণের কারণ এই।

এখন একটা অল ইণ্ডিয়া কমিউনিষ্ট পার্টি সংগঠনের সাহায্য করার জন্যে বিলাতী কমিউনিষ্ট ফিলিপ স্প্রাট এবং হাচিন্সন, আর অস্ট্রেলিয়ার কমিউনিস্ট নেতা ব্রাডলে ভারতে আসেন এবং মোজাঃফর, ডাঙ্গে প্রভৃতির সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে কাজ করতে থাকেন। মাদ্রাজ কংগ্রেসের পর থেকেই শ্রমিক আন্দোলন আবার জোরদার হতে থাকে। '২৮ সালে বড় বড় ধর্মঘটের হিড়িক লেগে যায়। বম্বের গিরনি কামগর (লালঝাণ্ডা) ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা (বস্ত্রশিল্প শ্রমিক) ৭০ হাজারে ওঠে। বম্বের বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের এক বিরাট ধর্মঘট ছয় মাস স্থায়ী হয়। সারা দেশে ধর্মঘটে সর্বসাকুল্যে ৩ কোটি ২০ লক্ষের ওপর "রোজ" ধর্মঘটে কাজ বন্ধ থাকে। সোসিয়্যালিজম কথাটাও ক্রমে জনপ্রিয় হতে থাকে। তরুণদের মনে কংগ্রেসী অকংগ্রেসী নির্বিশেষে কমিউনিষ্টদের কথাগুলোই সবচেয়ে বেশী সাড়া দেয়। কারণ তার মূলে রয়েছে বিপ্লবের কথা, এবং সাইমন কমিশন বয়কটের আন্দোলনেও তারা সামিল আছে।

এই সাইমন কমিশন লাহোরে গেলে যে বিরাট বিক্ষোভ মিছিলে কৃষ্ণপতাকা প্রদর্শিত হয়, পুলিস তার ওপর প্রচণ্ড লাঠি চার্জ করে মিছিল ভঙ্গে দেয়। সে মিছিলের নেতৃত্ব করছিলেন লালা লাজপত রায় সামনের সারিতে থেকে। তাঁর পাঁজরে এক লাঠির গুতো মেরে পুলিস তাঁকে জখম করে এবং সেই আঘাতেই তিনি হাসপাতালে মারা যান। এরই কিছুদিন পরে সণ্ডার্স নামক একজন পুলিস সাহেব বিপ্লবী নওজোয়ানদের গুলীতে নিহত হয়।

যাদুদার অবর্তমানে কলকাতার বাজারে যুগান্তরের নেতৃত্ব করছেন সুরেনদা' (ঘোষ), হরিদা (চক্রবর্তী), মনোরঞ্জনদা, ভূপতি দা' প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে সুরেনদার প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল। একদিকে তিনিই সুভাষবাবুর সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ, আর একদিকে নলিনী সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে টাকাকড়ি সম্বন্ধেও তাঁর অবস্থা সচ্ছল, আর "বিগ ফাইভের" (শরৎ বসু, বিধান রায়, তুলসী গোঁসাই, নির্মলচন্দ্র, নলিনী সরকার) সঙ্গেও তিনিই যুগান্তর দলের পক্ষ থেকে সলাপরামর্শ করেন। এই রাজনৈতিক কূট-কৌশলের ক্ষেত্রে ক্রমে তাঁর প্রাধান্য সকলেই মেনে নিয়েছিল। যাদুদার সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ রাখতেন। এই অবস্থায় '২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেস সামনে এসে পড়লো। তার সংগঠনের সর্ববিধ ক্ষেত্রেই সম্মিলিত বিপ্লবীদলই প্রধান কর্মী। তার তোড়জোড় শুরু হল।

পার্ক সার্কাসের নতুন ময়দানে কংগ্রেস হবে। তার কাছেই প্রধান সড়কের ওপর কালী মুখার্জিদের (মন্ত্রী) বাড়ী, সে বাড়ীতে নতুন পোষ্ট অফিস হয়েছে। বড় বড় বাড়ী ওখানে অনেক তৈরী হয়েছে এবং হচ্ছে। আমার মনে হল, যদি ঐ পাড়ায় ফার্নিচারের দোকান এখন করা যায়, পরে খুব ভাল চলবে। ঘুরে দেখে এলুম, ঐ বাড়ীটার মাঝখানের ফটকের একদিকটা জুড়ে পোষ্ট অফিস, আর একটা দিক জুড়ে এক প্রকাণ্ড ঘর খালি রয়েছে।

ঘরটার সামনে ছ'টা দরজা ১০×৫ ফুট করে আর ভেতরের মেঝের আয়তন প্রায় দেড় কাঠার মতন। পরবর্তীকালে ঘরটাতে মোটর গাড়ীর শো-রুম হয়েছিল।

কালীবাবুর দাদা ছিলেন বিপিনদা'র চেলা এবং অনুকূলদা'র বন্ধু। অনুকূলদাকে সঙ্গে করে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বন্দোবস্ত করে এলুম—ভাড়া সস্তা, ৬০ টাকা মাত্র। ঐ ঘরে ভালো করে দোকান সাজাতে পারলে বিনা খরচে খুব ভাল অ্যাডভারটাইজমেন্ট হয়ে যাবে, কারণ কয়েকটা দিন ধরে সারা সহর ও বাইরেকার কংগ্রেস যাত্রীদের ঐ ঘরের সুমুখ দিয়েই কংগ্রেসে যাতায়াত করতে হবে।

নিজের একটা পার্শোন্যাল লাইব্রেরী গড়ে তোলার সখ ছিল। নীলামে বইএর লটও কিনতুম, এবং ২।৪ খানা করে বাছা বাছা বই রেখে বাকি বই বিক্রীর চেষ্টা করতুম। এমনি করে দোকানে প্রচুর বই জমে গিয়েছিল। একবার প্রকাণ্ড একটা বইয়ের লট নীলামে বিক্রী হয়েছিল, সব মিলিটারী বই, ইসুফ ও নাজিমুদ্দিনের দল সেটা কিনেছিল (কলেজ স্কোয়ারের পুরানো বই এর বড় দোকানদার), আমি তা থেকে বেছে বেছে মিলিটারী শিক্ষার অনেক বই কিনেছিলুম। এমনি করে দুটো বড় বড় ওসেনট্রাঙ্ক বোঝাই হয়ে গিয়েছিল, তেতলার ঘরে সেগুলো রাখতুম। কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার সংগঠনে যখন দাদারা নামলেন, অনুশীলনের রবি সেন একদিন এসে সেগুলো নিয়ে গেলেন। বললুম, কিছু টাকা দেবেন, একেবারে ফাঁকি দেবেন না। তিনি ২৫টা টাকা দিয়েছিলেন। চোরের "রাত্রিবাস" লাভের মতন। কিছু কাজ হল ভেবে খুশীই হলুম।

একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ, একটা বেশ বড় কুমীর, একটা হনুমান, একটা প্রকাণ্ড বীভার, একটা হরিণের মাথাসমেত ডালপালাওয়ালা সিং—মাটিতে খাড়া করলে সিংয়ের ডগায় হাত পৌঁছাতো না—একটা বাঘের মাথা প্রকাণ্ড ধামার মত, এই সব ষ্টাফ্‌ড জন্তু জানোয়ার, একটা বার্ড অফ প্যারাডাইজ প্রভৃতি সংগ্রহ করেছিলুম। কংগ্রেসের আগেই দোকান সাজিয়ে ফেলেছিলুম। অ্যালবার্ট বিল্ডিংএর ঘরে প্রথমে ফার্ণিচার তুলে দিয়ে এক প্রকাণ্ড পুরানো বইএর দোকান সাজিয়েছিলুম। পরে দুটো চালানো সম্ভব নয় দেখে সেটাও পার্কসার্কাসে তুলে নিয়ে গিয়েছিলুম এবং কংগ্রেসের সময় বেশ কিছু বই বিক্রীও হয়ে গিয়েছিল।

এইবার আসল কংগ্রেসের কথা। কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি মতিলাল নেহেরু। সেনগুপ্ত ছিলেন স্বরাজ্যদলের নেতা এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, সুতরাং তিনি হলেন অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান—অল ইণ্ডিয়া লীডারদের কাছে বাংলা-কংগ্রেসের দলাদলির প্রদর্শনী তো ভালো কথা নয়। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ডাঃ বিধান রায়। একজি'বশনের সেক্রেটারী নলিনীরঞ্জন সরকার। ভলান্টিয়ার বাহিনী সংগঠনের ভার দাদাদের হাতে। কলকাতার ময়দানে ময়দানে মিলিটারী প্যারেড শিক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার ছেলে বিপ্লবীদের রিক্রুটিংয়ের টার্গেট।

ভলান্টিয়ার বাহিনীর চীফ G. O. C. (General Officer Commanding) কাকে করা হবে, তা নিয়ে এক রগড় বাধলো। সুভাষ বাবুই নেতাদের মধ্যে বেকার ছিলেন—চীফ হলে সব দিক দিয়েই মানায়। দাদারাও তাঁকে চীফ করার কথাই ভাবছিলেন। কিন্তু পূর্ণ দাসের দল থেকে প্রস্তাব করা হল, G. O. C. করা হোক পূর্ণ

দাসকে। সুতরাং যথাশাস্ত্র অনুশীলনের তরফ থেকে পাল্টা প্রস্তাব হল প্রতুল গাঙ্গুলীর নাম। সঙ্গে সঙ্গে ময়মনসিংএর দল বললে, সুরেন ঘোষ নয় কেন? হঠাৎ প্রায় অচল অবস্থা। শেষ পর্যন্ত, "সোয়ামী যমকে দেওয়া যায়, তো সতীনকে দেওয়া যায় না" এই নীতি অনুসারে সুভাষ বাবুকেই করা হল G. O. C.।

পূর্ণ দাস, হরি চক্রবর্তী প্রভৃতি হলেন লেফ্‌টেন্যান্ট, রবি সেন হলেন G. O. C.র অর্ডালি অফিসার। বিপিনদার দল কোথাও নেই, তাঁরা ক্ষুব্ধ। অ্যামেলগ্যামেশনের এই অবস্থা আমরাও যেমন লক্ষ্য করছিলুম, সুভাষবাবুও অবশ্যই লক্ষ্য করছিলেন। তারপর কংগ্রেসের বিভিন্ন বিভাগে কর্মী বণ্টনের ব্যবস্থা। প্রতুল গাঙ্গুলীকে করা হয়েছিল "হিন্দুস্থানী সেবাদলে" বাংলার বিপ্লবীদের প্রতিনিধি। বিরাট এক্‌জিবিশনে সুরেনদার দলবলই কর্মী। কিচেন কমিটিতে সুরেশ দাস এবং টাঙ্গাইলের অমর ঘোষ (মোক্তার)। পার্কসার্কাস ময়দানের পিছনে নেষ্ট" নামক একটা বাড়ী ছিল,—সেখানে হয়েছিল কিচেন ষ্টোর। সেখানে বসানো হল ময়মনসিংহের আনন্দ মজুমদারকে, সুরেনদার লোক। পূর্ণ দাসের দল সেটা জোর করে দখল করতে গিয়েছিল এবং লড়াই থামাবার জন্যে আপোষে তাদেরও সেখানে জায়গা দেওয়া হয়েছিল।

অনুশীলনের নেতারা ক্ষেপে গেল। বটে! এই তোমাদের অ্যামেলগ্যামেশন? যেখানে টু-পাইস আছে, সেখানেই যুগান্তর, আর যত সব শুকনো আঘাটায় অনুশীলন! অ্যামেলগ্যামেশন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

টু-পাইস ছিল অবশ্যই। এতবড় একটা কংগ্রেসের মধ্যে বিপ্লবী কর্মীদল দিনরাত ভূতের মতন খাটবে, আর পার্টির কিছু অর্থের সংস্থান হবে না, এই বা কেমন কথা! একদিন রাত্রে এক্‌জিবিশনের টিকিট বিক্রীর পর হঠাৎ সমস্ত আলো নিভে গেল, বেশ কিছুক্ষণ হুড়োহুড়ির পর আলো জ্বললো এবং দেখা গেল, একটা ক্যাশ ভর্তি বাক্স উধাও হয়ে গেছে। "নেষ্ট" বাড়ীটার পিছনের দরজা দিয়ে মাল বেরিয়ে গিয়ে ঘুরে এসে আবার সামনের দরজা দিয়ে ঢুকতো, এবং এইভাবে একই মাল দুবার জমা হত, এ গল্পও শুনেছি। এক মালের দুবার বিল হয়েছে এবং অভ্যর্থনা সমিতির অফিসে সেটা ধরা পড়েছে, দুজন জুনিয়ার দাদা সেজন্য তাড়া খেয়েছেন, এ গল্পও শুনেছি। শুনেছি অনুশীলনের লোকের কাছে নয়, আমাদেরই পার্টির লোকের কাছে।

অ্যামেলগ্যামেশন ভেঙ্গে গেল দেখে মনটা খিচড়ে গেল। আমি বলতে শুরু করেছিলুম, এক কুড়ি শিয়াল যদি তিন দিন ধরে যুক্তি করে কিছু স্থির করতো, তাহলে সেই "শিয়ালের যুক্তিও" এই অ্যামেলগ্যামেশনের চেয়ে বেশী দিন টিকতো। ফলত '২৯-'৩০ সালের সুভাষ সেনগুপ্ত লড়াইয়ে অনুশীলন গিয়ে ভিড়েছিল সেনগুপ্তের শিবিরে। নো-চেঞ্জারদের ঘাঁটি নর্থ-ক্যালকাটা কংগ্রেসে সুরেশ মজুমদারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত অমর বসু যুগান্তর দলের লোক হয়েও সেনগুপ্তের শিবিরে ছিলেন। আর ছিলেন অমরদা (চ্যাটার্জি) কংগ্রেস কর্মী-সংঘের প্রেসিডেন্ট।

ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতারা—শৈলেন রায়, শচীন মিত্র, প্রমোদ ঘোষাল, হাওড়ার কৃষ্ণ চ্যাটার্জি প্রভৃতি গান্ধীবাদী নো-চেঞ্জাররাও ছিলেন সেনগুপ্তের শিবিরে। মোটের

ওপর, সে লড়াইয়ে সুভাষ বাবুর দিকে বিগ্ফাইভের সঙ্গে যুগান্তর দল এবং সেনগুপ্তের দিকে বাকি সব বেখাপ্পা পাঁচমিশেলী দল ও ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছিল।

যাই হোক, আবার কংগ্রেসের কথায় ফিরে আসা যাক। ভলান্টিয়ারদের ক্যাম্প হয়েছিল প্রকাণ্ড। শ্রীসংঘের অন্যতম নেতা সত্য গুপ্ত হয়েছিলেন একজন মেজর। তিনি কঠোর সামরিক শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে বাছা বাছা ছেলেদের বিপ্লবের মন্ত্র দিয়ে নিজস্ব এক বিপ্লবী দল খাড়া করার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই দলই পরবর্তী কালের বি. ভি. দল, যারা মেদিনীপুরে পর পর তিনজন ম্যাজিস্ট্রেটকে খুন করেছিল বলে শোনা গিয়েছিল। ভলান্টিয়ার ক্যাম্পের মধ্যেই অপর কোন ভলান্টিয়ার গ্রুপের সঙ্গে কি এক বিবাদ উপলক্ষে মেজর সত্য গুপ্ত তাঁর বাহিনীকে মিলিটারী কায়দায় পরিচালিত করে ঐ প্রতিপক্ষ ভলান্টিয়ার গ্রুপকে মার দিয়ে এসেছিলেন। তার জন্য সুভাষবাবু কোর্ট-মার্শালে বিচার করে তাঁকে একদিনের জন্য কয়েদ করেন। খাঁটী মিলিটারী পথে। সুভাষবাবু রীতিমত গম্ভীরভাবে সেনাপতির ভূমিকায় তালিম দিচ্ছিলেন।

আমার দোকানে হয়েছিল জীবনের দলের আড্ডা। বম্বে থেকে গিরনি কামগর ইউ-নিয়নের নেতা মিরাজকর (পরে বম্বের মেয়র হয়েছিলেন) জীবনের (চ্যাটার্জি) অতিথিরূপে আমার দোকানেই উঠেছিলেন এবং বাস করেছিলেন। জীবনের সম্পর্কে আমিও হয়েছিলুম তাঁর নাবালকদা। এইসব কারণেই গোয়েন্দা বিভাগ বলতো, আমার ব্যবসাটা হচ্ছে ক্যামোফ্লেজ।

কংগ্রেসের সাবজেক্টস্ কমিটিতে সুভাষবাবু এক ইণ্ডিপেণ্ডেন্স প্রস্তাব দাখিল করে-ছিলেন। মহাত্মা তাঁকে বাধা দেন, তুমি নেহেরু রিপোর্টে সই করে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের দাবীর পক্ষে মত দিয়েছ, এখন বৃটিশ সরকারকে একটু সময় না দিয়েই ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের দাবী কি শোভা পায়? অন্তত '২৯ সালটা তাদের বিবেচনার জন্য সময় দাও, তারপর যদি তারা ডোমিনিয়ন-ষ্ট্যাটাস দিতে রাজী না হয়, তাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গে মিলে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স-ওয়ালা হয়ে যাবো। সুভাষবাবু নিরস্ত হলেন।

প্রকাশ্য অধিবেশনের সময় হঠাৎ একটা হুড়োহুড়ি লেগে গেল, হাজার বিশেক (কারো কারো মতে ৫০ হাজার) শ্রমিক মিছিল করে শ্লোগান দিতে দিতে কংগ্রেসে আসছে। কর্তারা G O C'কে নির্দেশ দিলেন, এদের রুখতে হবে। তিনি ভলান্টিয়ার বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, শ্রমিকদের রুখতে হবে।

দেখতে দেখতে বন্যার স্রোতের মত শ্রমিক জনতা কংগ্রেস ক্যাম্প ছাপিয়ে এসে প্যাণ্ডালে ঢুকে পড়লো, তাদের বাধা দেওয়া সম্ভব হলনা, বাধা দিতে গেলে দক্ষযজ্ঞ হয়ে যেত। তারা প্যাণ্ডাল দখল করে দুঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার পর কংগ্রেসের কর্তারা তাদের দাবী পত্র গ্রহণ করলেন এবং সেগুলো বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারা জয়ডঙ্কা বাজিয়ে বেরিয়ে গেল। ভদ্রলোকদের একচেটিয়া কংগ্রেসে আবার ছোট-লোকদের ছোঁয়াচ লাগলো।

যাই হোক, কংগ্রেসের মূল প্রস্তাব গান্ধী-মতিলাল রচিত প্রস্তাব হল, '২৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত যদি বৃটিশ সরকার ভারতকে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি না দেয়, তাহলে আবার অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হবে এবং আইন অমান্য শুরু করা হবে খাজনা বন্ধ করে।

প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

একদিকে বিপ্লবী নওজোয়ানদল, আর একদিকে জঙ্গী শ্রমিক—এই দুর্যোগ দেখে টি. প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের গৌরাঙ্গ সভাপতি বার্ষিক সাধারণ সভার বক্তৃতায় বলেছিলেন,—একমাত্র ভরসা "গ্যাণ্ডি"।

বস্তুত "গ্যাণ্ডি" মহারাজও আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন এবং কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন "দুর্যোগ" ঠেকিয়ে রাখার জন্যে। '২৯ সালের বোধ হয় এপ্রিল মাসে, বড়লাট আরউইনের সঙ্গে দেখা করে স্বাধীনতাবাদীদের ও জঙ্গী শ্রমিকদের প্ল্যান বানচাল করার ব্যবস্থা করার জন্যে মহাত্মা গান্ধী 'Dear friend' বলে এক প্রকাণ্ড চিঠি লেখেন এবং তাঁর তখনকার এক নতুন ভক্ত রেজিন্যাল্ড রেনল্ডস নামক তরুণ ইংরেজের হাত দিয়ে সে চিঠি আরউইনের কাছে পৌছে দেন।

পরবর্তীকালে মহাত্মার কাণ্ডকারখানা দেখে ভক্তি চটে যাওয়ার ফলে ছোকরা দেশে ফিরে যায় এবং রেনল্ডস নিউজ নামক এক সাময়িকপত্র প্রকাশ করে মহাত্মার সমালোচনা লিখতে থাকে।

সরকার বাহাদুরও দুর্যোগ লক্ষ্য করে কোমর বাঁধছিলেন। এখন তাঁরাও আঘাত হানার জন্যে এক Public Safety Bill তৈরী করে "Communist Activities" দমন করার ব্যবস্থা করলেন। তখন স্বরাজ পার্টির নেতা বিঠলভাই ঝাবেরভাই প্যাটেল (সর্দার প্যাটেলের দাদা) কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার স্পীকার নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং স্বয়ং বড়লাটের স্বাক্ষরিত ঐ Bill ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করার জন্য প্রেরিত হলে তিনি তাঁর আইনানুগ ক্ষমতার বলে সে বিল উপস্থাপিত করার অনুমতি দেন নি। এই অঘটন নিয়ে সারা দেশে একটা উল্লাস-উত্তেজনার ঝড় বয়ে যায়। অবশ্য বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা বলে আইনটা চালু করা হয়। ঐ আইনে বাছা বাছা শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করা হতে থাকে এবং তাঁদের নিয়ে মীরাটে এক ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করা হয়। আসামীদের মধ্যে বিলাতী কমিউনিষ্ট হাচিন্সন প্রভৃতিও ছিলেন এবং অ-কমিউনিষ্ট কিশোরী ঘোষও ছিলেন। মামলায় কিশোরী ঘোষ খালাস পেয়েছিলেন, কিন্তু তার আগেই বন্দী অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। আর ফিলিপ স্প্রাট মুক্ত হয়ে সরে পড়েছিলেন, বোধ হয় মামলা শেষ হওয়ার আগেই। তাঁর নামে spy বদনামও রটেছিল।

যাই হোক, কংগ্রেসের ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস-ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের লড়াই বাংলাদেশে, সেনগুপ্ত-সুভাষ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বিরাট আকার ধারণ করলো। সরস্বতী প্রেস থেকে তখন "স্বাধীনতা" নামক সাপ্তাহিক কাগজ বেরিয়েছে। তাতে একবার লেখা হল, আসলে সেনগুপ্ত-সুভাষ লড়াইটা হচ্ছে বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজমের সঙ্গে স্বাধীনতাবাদী কংগ্রেসের লড়াই—সেনগুপ্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির লোক, সুতরাং হাইকম্যাণ্ডের ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের পক্ষপাতী, আর তার মানেই বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজমের বন্ধু; আর সুভাষ বাবু ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের প্রতীক, সুতরাং ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের এবং ফলত বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজমের শত্রু!

সে সময়ে বাংলাদেশের লোক কয়েকটা বছর ধরে বলেছে এবং শুনেছে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস এবং ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক নয়। ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস মানে ব্রাউন বুরোক্রেশী, অর্থাৎ

কালা লাট সাহেব মাত্র, আমরা তা চাই না, খাঁটি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স চাই, বৃটিশ সম্পর্ক বর্জিত স্বাধীনতা।

এই ধুয়োর ওপর আমাদের দাদারা সুভাষ বাবুকে বুঝিয়ে বাড়ী করে ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে লড়াইটা সম্প্রসারিত করে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন সংগঠনে নামলেন। ফলে আলোকার এ বি এস এ এবং এ বি ওয়াই এর মধ্যে ভাঙ্গন ধরলো। এ বি এবং বি পি র লড়াইয়ে ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে লড়াই চললো। এ বি হল সেনগুপ্তের সমর্থক এবং বি পি সুভাষ বাবুর। এই লড়াইয়ে চাটগাঁর একটা ছেলে খুন হল, নাম বোধ হয় সুখেন্দু। আহত হয়ে কলকাতায় ক্যাম্বেল হাসপাতালে মারা যায় এবং আমরা প্রোসেশন করে সংকার করি।

ব্যাপারটা যখন ছেলে নিয়ে টানাটানি এবং সুরেনদা যখন নেতা, তখন যুগান্তর পার্টির ছেলে বাগাবার মতলব বলে অনুশীলনেরও সেনগুপ্তের ক্যাম্পে ভিড়ে গিয়ে ছেলে লাগানোর চেষ্টা করতে হল। পরবর্তী কালে এ বি র নেতা শৈলেন রায় যে ডেটিনিউ হয়েছিলেন, তার মূল কারণ সম্ভবত এইখানে। আর শরৎ বসু বি পি সংগঠনে টাকা দিতেন, এবং সেই কারণেই তিনিও পরে রাজবন্দী হয়েছিলেন।

এই সময়ে বালীর কাছে ডানকুনী ষ্টেশনে এক রাত্রে এক বিরাট ট্রেণ-দুর্ঘটনা হয়। ফরোয়ার্ড কাগজে তার বিবরণে বলা হয়, যত লোক মারা গেছে বলে রেল কর্তৃপক্ষ বলেছে, আসলে লোক মারা গেছে, প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, তার চেয়ে অনেক বেশী; রেল কর্তৃপক্ষ মৃতদেহগুলো গোপনে সরিয়ে ফেলেছে।

ফলে ফরোয়ার্ডের বিরুদ্ধে ই. আই. আর. লাখ টাকার দাবী করে এক মানহানির মামলা করে। মামলার সময়ে যথাশাস্ত্র প্রত্যক্ষদর্শীদের পাত্তা পাওয়া গেল না। প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী সংগ্রহের চেষ্টা হল দাদাদের মারফতে। সতীশদা' (চক্রবর্তী—খুলনা) আমাকে বললেন, কোলিয়ারী এলাকা পর্যন্ত ষ্টেশনে ষ্টেশনে ঘুরে দেখতে হবে, সাক্ষী পাওয়া যায় কি না। আমি সারদাকে ভিড়িয়ে দিলুম। সারদা কয়েক দিন ধরে ঘুরে ফিরে এল, মামলায় সাক্ষী দিতে কেউ চায় না।

সুতরাং মামলায় ই. আই. আর. লাখ টাকার ডিগ্রী পেয়ে গেল এবং প্রেস ক্রোক করার জন্যে কোর্টের লোক নিয়ে ফরিয়াদীর লোক গেল। ফরোয়ার্ড অফিসের গেটে তখন পাহারায় বসে গেছে নলিনীরঞ্জন সরকার ও তুলসী গোসাঁইয়ের লোক। তারা বললে, প্রেস আমাদের সম্পত্তি, ফরোয়ার্ড কাগজের সঙ্গে ছাপার কন্ট্রাক্ট ছাড়া প্রেসের আর কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই প্রেস ক্রোক করা গেল না। পরদিন দেখা গেল, সেই প্রেস থেকে "লিবার্টি" নামে কাগজ বেরিয়েছে, ফরোয়ার্ড উঠে গেছে। উপেনদার "আত্মশক্তি" সাপ্তাহিকখানাও ফরোয়ার্ড কোম্পানি নিয়েছিল। সেটা হল "নবশক্তি"।

সুভাষবাবুর রাজনৈতিক বিকাশের পথে সে সময়টা ছিল একটা সন্ধিস্থল। সুভাষবাবুর ভক্তেরা যেমন মনে করেন, তিনি যেন একটা ready made পাকা নেতাজী হয়েই জন্মেছিলেন, সেটা ভক্তিমার্গের অপসিদ্ধান্ত মাত্র। তিনিও যে মানুষ এবং মানুষের জীবনের সকল স্বাভাবিক নিয়মই যে তার পক্ষে প্রযোজ্য, এটা ভুলে গেলে তাঁর প্রতি অবিচারই করা হয়। দেশের কি জটিল অবস্থার মধ্যে, রাজনীতির কি জটিল আবর্তের

মধ্যে বিভিন্নমুখী বিচিত্র আকর্ষণ-বিকর্ষণের ঘাত-প্রতিঘাতে তিলে তিলে তাঁর বিপ্লবী চেতনার কাযকরী রূপ গড়ে উঠেছে, সে ইতিহাস একটা সমস্যা কণ্টকিত রহস্যোপন্যাসের মতন। একদিকে নির্ভেজাল গান্ধীভক্তি ও কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বস্ততা আর একদিকে তীব্র সাম্রাজ্যবাদ বিদ্বেষ এবং সশস্ত্র বৈপ্লবিক আদর্শ তাঁর চরিত্রকে তখন একটা স্ব-বিরোধী কিংকর্তব্য-বিমূঢ়তার উদাহরণে পরিণত করেছিল। ন্যাশানালিজম, ফ্যাসিজম, সোসিয়ালিজম ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে গিয়ে "ফ্যাসিজম কাম সোসিয়ালিজম" হয়ে উঠছিল তাঁর বক্তৃতার ধুয়ো। কংগ্রেসের সভায় ন্যাশানালিজম, শ্রমিকদের সভায় সোসিয়ালিজম এবং ছাত্র-যুব সভায় ফ্যাসিজম তিনি একসঙ্গে বলতে শুরু করেছিলেন।

একবার ফরোয়ার্ডের প্রেসকর্মচারীরা স্ট্রাইক করে বসেছিল। সুভাষবাবু তখন জেমসেদপুরে শ্রমিকদের সভায় সোসিয়ালিস্টিক বক্তৃতা করছিলেন, এদিকে তাঁর ডেপুটী মেজদা শরৎ বসু ফরোয়ার্ডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ধর্মঘটীদের সঙ্গে ফয়সালা না করে নতুন কর্ম রিক্রুট করেছিলেন এবং এইভাবে ধর্মঘট ভেঙ্গে গিয়েছিল। সুভাষবাবু সরাসরি দায়ী নন, অথচ এই ছিল তাঁর "ঘরের অবস্থা"।

বিপ্লবী দলগুলোর অ্যামেলগ্যামেশনের আগে অনুশীলন ও যুগান্তরের নেতাদের সঙ্গে তাঁর জেলে খাতির জমেছিল, এবং কলকাতা কংগ্রেসের আগে পর্যন্ত দুইদলের দুই দাদা, সুরেন ঘোষ এবং রবি সেন রোজ সকালে তাঁর বাড়ী গিয়ে বসতেন। কংগ্রেসের পর সেটা "দুদিক থেকে তোয়াজের" রূপ নিয়েছিল। তিনি সবই বুঝতেন এবং G. O. C-র মতন গম্ভীর চালে কথা কইতেন Yes no, very well ধরনে। স্বভাবত গম্ভীর প্রকৃতিটা তাঁর এই সময়ে চূড়ান্ত গম্ভীর হয়েছিল। বোধ হয় এই যুগটাতে কেউ তাঁকে হাসতে দেখে নি।

আঠারো

সুভাষবাবুর ভাবগতিক যুগান্তরের দাদাদের পছন্দ হচ্ছিল না, এবং তাঁরা শরৎ চ্যাটার্জীকে নেতা খাড়া করার চেষ্টায় তোয়াজ শুরু করেছিলেন। বোধহয় রংপুরে, এক যুব-সম্মিলনীতে শরৎবাবুকে প্রেসিডেন্ট করা হয়েছিল, এবং "স্বাধীনতায়" তাঁর সমগ্র ভাষণ ছাপা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সুভাষবাবুর এক বক্তৃতার সারাংশমাত্র ছাপা হয়েছিল। সুভাষবাবু হঠাৎ এক ধমক দিয়ে দিলেন, তিনি কংগ্রেস ছেড়ে ছাত্র ও যুব আন্দোলন নিয়ে থাকবেন। দাদাদের পিলে চমকে গিয়েছিল। তাঁর "ঘরের অবস্থার" এও আর একটা দিক।

স্বাধীনতা যখন লিখছে, বাইরে নেতার সর্বেসর্বা ক্ষমতা স্বীকৃত হলেও, ঘরের মধ্যে নেতার উচিত দলের কাছে মাথা নত করা, ঠিক তখনই কুমিল্লায় যুবসম্মেলনে প্রতুল গাঙ্গুলী বক্তৃতা দিচ্ছেন, নেতার আদেশ সেনাপতির আদেশের মতন সর্বদা ও সর্বথা পালনীয়। এদের সকলেরই টার্গেট তখন সুভাষবাবু। তিনি পেকেছেন এমনি করে অনেক পোড় খেয়ে।

১৯২৮-২৯ সাল সময়টা ছিল এমন, যখন বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের অবস্থাটা হয়েছিল যেন একটা প্যাণ্ডিমোনিয়াম, যেন ইংরেজীতে যাকে বলে melting pot, অদ্ভুত

পরস্পরবিরোধী এবং স্ববিরোধী আদর্শ, কর্মপন্থা, সংগঠন প্রচেষ্টার এলোপাতাড়ি হুড়-হাঙ্গামা। ইংরেজ '৩০ সালে যে আর এক কিস্তি স্বরাজ দেবে, তার আগে একটা লড়াই দরকার, যাতে সে স্বরাজটা নেহাৎ ইংরেজের খুশীমত যাচ্ছেতাই না হয়, কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের লক্ষ্য সেই দিকে এবং মহাত্মার নেতৃত্বে তাঁরা ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস আদায়ের চেষ্টায় তদনুযায়ী এক লড়াইয়ের প্ল্যান আঁটছেন। সাধারণ কংগ্রেসীরা আছেন তাঁদের পিছনে। এই হল মূল কংগ্রেসী আন্দোলন।

বিপ্লবী-দাদারা কংগ্রেসের ভিতর দিয়েই স্বাধীনতার দাবীর চেষ্টায় ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের বিরোধিতা করছেন, বাংলায় তার বাস্তব রূপায়ণ হয়েছে সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে সুভাষ বাবুকে খাড়া করা, কিন্তু গান্ধীভক্তির কম্পিটিশনে হেরে গেলে যেহেতু কংগ্রেসের মধ্যেও অংস্থা কাহিল হবে, অতএব গান্ধীভক্তি বাঁচিয়েই তাঁরা স্বাধীনতার দাবী সম্বন্ধে কর্মীদের সচেতন করতে চাইছেন। তার সঙ্গে চলছে স্বাধীনতা এবং সুভাষ বাবুর নামে সবপ্রকার সংস্থা সংগঠন ক্যাপচার করা—ছাত্রসংস্থা যুবসংস্থা থেকে মিউনিসিপ্যালিটী-জেলাবোর্ড ইউনিয়নবোর্ড পর্যন্ত। এ নিয়ে সর্বত্র এমন দলাদলি শুরু হয়েছিল যে, একটা নতুন রাজনৈতিক শব্দ গজিয়েছিল, ক্যাপচারিজম। আনন্দবাজার পত্রিকায় সুভাষ বাবুকে বলা হত খোকা ভগবান, এবং বাবুকে বলা হত কটকী ছোৎকা। দাদাদের কাছে সুভাষ বাবুর জনপ্রিয়তা এমন মাপ থাচ্ছিল যে, কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনে সুভাষ বাবু প্রার্থী হলেন দেখে সেনগুপ্ত যখন সরে দাঁড়ালেন, তখন সুভাষ বাবুকে পরাজিত করে মেয়র নির্বাচিত হলেন জে. কে. বসু।

সেনগুপ্তের অর্থের অনটন ছিল, সে অনটন ঘোচাতে এগিয়ে এসেছিলেন জে. সি. গুপ্ত। পরে তাঁর অর্থানুকূল্যেই Advance কাগজ বেরিয়েছিল।

বিপ্লবের খোঁজ নেই, শুধু স্বাধীনতার নামে ইলেকশন আর ক্যাপচারের দলাদলিতে হাঁপিয়ে গিয়ে বিপ্লবী তরুণেরা ক্রমে দড়ি ছেড়ার উপক্রম করছিল। বছরের পর বছর দাদাদের হুকুমে যত বাজে লোকের জন্যে ভোট সাধা, এই করতে কি আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলুম? এই ছিল তাদের মনোভাব। দাদারা কিছু করবে না, সুতরাং আমাদের নিজেদেরই কিছু করতে হবে, এই মনোভাব থেকে তারা আবার বোমা-রিভলভার সংগ্রহের দিকে ঝুঁকছে। কংগ্রেসে যে হাজার হাজার ছেলে ভলান্টিয়ার হয়েছিল, কোন না কোন বিপ্লবী-দাদা তাদের অনেককেই ঠুকরে দেখেছেন, তারা স্বাধীনতা, বিপ্লব এবং মিলিটারী প্যারেডের লাইনে ভাবতে শুরু করেছে, কোন কোন বিপ্লবীদল জেলা-কংগ্রেস দখল করে, তারই মধ্য দিয়ে কংগ্রেস ভলান্টিয়ার সংগঠন করে, বাছা বাছা ছেলেদের নিয়ে নতুন এক একটা বিপ্লবীদল গড়ে তুলেছে—যেমন বি, ভি বা বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দল, চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা এই ভাবে দলকে সুসংগঠিত করে বাছা বাছা ছেলেদের revolver practice-এর ব্যবস্থাও করেছিল, মুন্সীগঞ্জের জীবন চ্যাটার্জির তরুণ চেলারাও কিছু করার জন্যে ছটফট করছিল, দাদারা তাদের ঠাণ্ডা করেছিলেন একটা অকেজো রিভলভার দিয়ে, আবদালপুর আশ্রম উঠে যাওয়ার পর রসিক দাস কলকাতায় এসে একটা কিছু করার জন্যে ছটফট করছিলেন। তিনি ছিলেন মনোরঞ্জন গুপ্ত এবং ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (সিনিয়র ভূপেনদা) তখন ইউরোপ থেকে দেশে ফিরেছেন এবং সোসিয়্যালিজম-কমিউনিজমের কথা বলতে শুরু করেছেন। সুতরাং একদিকে যেমন কমিউনিষ্টরা তাঁকে খাতির করে, আর একদিকে যুগান্তর দলের (ঘাঁটী সরস্বতী প্রেস) তিনি চক্ষুশূল। কারণ ভূপেনদা' যুগান্তরের আদি নেতাদের অন্যতম এবং তাঁর সম্মান প্রায় সার্বজনীন। তিনি কমিউনিজম প্রচার করলে দলের অনেক ছেলে "বিপথগামী" হতে পারে। সুতরাং তাঁর প্রভাব থেকে ছেলেদের মুক্ত রাখতে হলে তাঁর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাও চাই, আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষার কিছু পরিতৃপ্তির ব্যবস্থাও দরকার।

কিন্তু জেলা কংগ্রেস কমিটিও নিজ হাতে থাকা চাই—না হলে বি পি সি সি তে সেনগুপ্তের সঙ্গে লড়াইয়ে হারতে হবে যে! অনেক দাদাই নিজ নিজ জেলা কংগ্রেসের নেতা, কিন্তু ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস বেহাত হয়ে আছে গোড়া থেকেই।

হরিদা (চক্রবর্তী) যুগান্তরের বিপ্লবী নেতা এবং ২৪ পরগণার লোক হলেও ২৪ পরগণা কংগ্রেসে তাঁর প্রতিষ্ঠা নেই, কথাটা ভাল নয়। ২৪ পরগণা কংগ্রেসটাও 'ক্যাপচার' করা দরকার। আমি বারাকপুর সাবডিভিসনে কাজ করেছি এবং বিপিনদার চেলা লেবার লীডারদেরও কাউকে কাউকে কংগ্রেসে ভিড়িয়েছি। দক্ষিণে সাতকড়ি ব্যানার্জি (সাতুদা) আছেন। সুতরাং হরিদা আমাকে এবং সাতুদাকে নিয়ে পরামর্শ আঁটলেন, ২৪ পরগণা কংগ্রেসের দিকে একটু বিশেষভাবে নজর দেওয়ার জন্যে।

কিন্তু আমরা তখন কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকেছি এতখানি যে, এই সব কাজে বড় উৎসাহ পাই না। তখন সন্তোষকুমারী গুপ্তা হয়েছেন একজন লেবার লীডার, ভাটপাড়ার কালী ভট্টাচার্য, আলমবাজারের বীরেন চ্যাটার্জি প্রভৃতি সন্তোষকুমারীকে নিয়ে লেবার মিটিংয়ে লেকচার দেওয়ান। তিনিও বিপিনদার একজন ভক্ত। শুধু একজন বিপ্লবী-দাদাকে অন্তরঙ্গভাবে দাদা বলেই ইসারায় নিজেকে একজন প্রচ্ছন্ন বিপ্লবী বলে চালিয়ে দেওয়া তখন ব্যাপক ভাবে চালু হয়ে গেছে।

এম. এন. রায় তখন ভারতে এসেছেন, এবং গা-ঢাকা দিয়ে আছেন।

কলকাতায় অ্যালবার্ট হলে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভা হয়েছিল এবং বোধ হয় দেশপাণ্ডের নেতৃত্বে বম্বে থেকে কমিউনিষ্ট কর্মীর একটা বড় দল এসেছিল। তারা সভাটা দখল করে "আন্তর্জাতিক" সঙ্গীত গেয়ে রীতিমত নাটকীয়ভাবে কমিটি ক্যাপচার করেছিল এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের হেড কোয়ার্টার নিয়ে গিয়েছিল বম্বেতে।

হাইকোর্টের জজ এ. চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর লাইব্রেরীটা নিলামে বিক্রী করেছিল ম্যাকেঞ্জি লায়াল। বিরাট বইয়ের পাহাড় এসেছিল নিলামে। উত্তরপাড়ার রমেন ভট্টাচার্য নিলামে চাকরী করতেন, এবং তিনি বইগুলো বাছাই করে "লট" করেছিলেন। তার মধ্যে একখানা বই ছিল কমিউনিজম ইন ইণ্ডিয়া,—এবং মলাটের ওপর ছাপার অক্ষরে লেখা ছিল Issued (by the Director of Intelligence) to the officers of the department only and the officers are responsible for the safe custody of the book. রমেন বাবু বইখানা সরিয়ে রেখেছিলেন। তিনি জানতেন, আমি স্বদেশী হাঙ্গামা করে "জেল খেটেছি"—উত্তরপাড়ার অমরদা'র কাছে যাতায়াত আছে। তিনি আমাকে বললেন, একখানা ভাল বই রেখেছি আপনার জন্যে—কমিউনিজম ইন

ইণ্ডিয়া—হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধানোর সরকারী ষড়যন্ত্র। বইটা দেখে আমার তো চক্ষু স্থির। দরকারী বই বলে আমি বইটা নিয়ে এলুম। রমেন বাবু তখনও কমিউনিজম কথাটা শোনেননি কিন্তু কমিউন্যালিজমটা জানেন।

১৯২০ সালের "স্বরাজের" পর গোয়েন্দা বিভাগের এই একটা পৃথক শাখা খোলা হয়েছিল। '২৩ সাল পর্যন্ত প্রথম Triennial (৩ বছরের) রিপোর্ট বেরোয়। তারপর '২৬ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় (৩ বছরের) রিপোর্ট এই বইটা। এর সঙ্গে প্রথম ৩ বছরের সংক্ষিপ্ত রিপোর্টও সন্নিবিষ্ট ছিল, এবং তৃতীয় একটা অংশ ছিল Who is who in Communism in India বইটা নিয়ে দিনকয়েক মেতে থাকলুম, অনেক গুপ্ত কথা জানতে পারলুম, যার কিছু কিছু '২৩ সালের কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্রের মামলা সম্পর্কে আগে বলেছি। কমিউনিজমের ওপর বৃটিশ সরকার অসীম গুরুত্ব দিয়েছে, সুতরাং আমার পক্ষে সেটা হল একটা সার্টিফিকেট।

যুগান্তর পার্টির মধ্যে থেকেও জীবন কমিউনিজমের দিকেই চলেছিল, এবং তার সঙ্গে আমরাও। নিজেদের প্রয়োজন মত চালাবার জন্যে কিছু অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন, অর্থের অভাব চূড়ান্ত, সুতরাং আমরা ঠিক করেছিলুম, আমরা অর্থের সংস্থানের জন্যে খাটবো এবং জীবনকে কাজ করার জন্যে "ফ্রী" করে দোব।

দোকানটাকে আরো ভাল করে গড়ে তোলবার জন্যে থোক কিছু টাকা দরকার। অমরদা'কে বললাম। তিনি জে. সি. গুপ্তের কাছ থেকে ১০০০।১২০০ টাকা ঋণের ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি মনে করেছিলুম, হ্যাণ্ডনোটের মতন কিছু লিখে দিতে হবে, কিন্তু দেখা গেল এক বিরাট দলিল তৈরী হয়েছে—দোকান মর্টগেজ এবং আষ্টে-পৃষ্ঠে বন্ধন। সই করে দিলুম, কিন্তু মনটা খিচড়ে গেল। যাদের জ্ঞানের মাপ টাকায়, সেই রকম একজন বড় লোকের মুঠোয় বাঁধা পড়লুম, পদে পদে হস্তক্ষেপ করবে, নিজের প্ল্যান অনুসারে কিছুই হয়তো করতে পারবো না। হয়তো অবস্থা দাঁড়াবে, "খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, আপদ করলো এঁড়ে গরু কিনে।"

সে রকম লক্ষণও দেখা গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। দলিল সই করে দিলুম, কিন্তু টাকা পেলুম না। ২০০৲ মাত্র টাকা দিয়ে গুপ্ত সাহেব বললেন, এক সঙ্গে বেশী টাকা নিলে নষ্ট করে ফেলবেন, দরকার মত কিছু কিছু করে নেবেন। ঝগড়া না করে "কিল খেয়ে কিল চুরি" করে ঐ টাকাই নিয়ে এলুম। ভাবলুম, কি করে পান্তা খেয়ে শুধু দুটো মানুষের খাটুনির জোরে দোকানটা খাড়া করেছি, তা যদি জানতেন গুপ্ত সাহেব! এই ভাবে ১২০০ টাকা ঋণ পেতে মাস ছয়েক লেগে গেল।

শান্তিপুরের জিতেন প্রামাণিক (?) ছিলেন ইলেকট্রিক এবং রেডিওর একজন expert mechanic, এবং তাঁর All Bengal Licence ছিল রেডিওর। তিনি তখন বেকার ছিলেন, এবং এক মেসে থাকতেন। তাঁর সঙ্গে ব্যবস্থা হল, তিনি দোকানে থাকবেন এবং খাবেন, আমি পুরানো রেডিও সেট কিনে দোব, দরকার মতন নতুন পার্টস কিনে দোব, তাঁর নির্দেশ মত কাঠের বাক্স প্রভৃতি মিস্ত্রী তৈরী করে দেবে, তিনি যদি সেট তৈরী করতে পারেন, তাহলে বিক্রী হলে আমি লাভের অংশ পাব, যত দিন তা না হয়,

তত দিন তাঁর খরচ আমি চালিয়ে যাব। তিনি এক নতুন বাক্স তৈরী ক'রিয়ে নিয়ে নতুন এক রেডিও সেট তৈরীতে মন দিলেন।

আপনারা হয়তো বিশ্বাস করতে পারবেন না, কিন্তু একদিন সত্যই "পালে বাঘ প'ড়ল।" একদিন বাইরে থেকে এসে দেখি, দোকানের তৈরী নতুন রেডিও বাজছে, ওরা ভিড় করে বসে শুনছে। তখন নতুন বাস সিণ্ডিকেট বাসের মাসিক টিকিট চালিয়েছে, আমরা দুখানা মাসিক টিকিট রেখেছি, একখানা থাকে দোকানে, একখানা আমার কাছে, আমি সারাদিন বাইরে ঘুরি, মাঝে মাঝে দোকানে এসে দপে দপে নির্দেশ দিয়ে যাই।

যাই হোক, এদিকে ৩১শে ডিসেম্বর এগিয়ে আসছে, তার মধ্যে বৃটিশ সরকার যদি ভারতকে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস না দেয়, তাহলে মহাত্মাজি নিজেই ইণ্ডিপেণ্ডেন্সওয়ালা হয়ে যাবেন। একটা লড়াই আশা করে জনগণ তৈরী হচ্ছে। সুতরাং লর্ড আরুইন আগে শ্রমিকনেতাদের গ্রেপ্তার করে মীরাট মামলার পত্তন করে, শ্রমিকদের বেকায়দা করে নিয়ে ভদ্রলোকদের সন্তুষ্ট করার জন্যে দিল্লীতে এক ঘোষণা করলেন, ভারতে বৈধ শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির অন্তিমে তাকে ডোমিনিয়নের পর্যায়ে উন্নীত করাই বৃটেনের নীতি। মহাত্মাজি লড়াই এড়াবার ফাঁক খুঁজছিলেন, সুতরাং তিনি তাঁর দলবল নিয়ে আরুইনের ঘোষণাটাকেই ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বলে ধরে নিয়ে এক বিবৃতি [বিখ্যাত দিল্লী ম্যানিফেষ্টো] প্রচার করে তাতে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস-এর ক্রম তৈরীর জন্যে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব করলেন। তাতে জওহরলাল ও সই দিয়েছিলেন। সারা দেশের মধ্যে তাতে একটা অসন্তোষও প্রকাশ হয়ে পড়লো, কিন্তু মহাত্মাজি আরুইনের সঙ্গে দেখা করার জন্য ছটফট করতে লাগলেন।

লোকের মনের অবস্থা যেমনই হোক, একটা লড়াই যে হবেই এবং তার জন্যে মহাত্মার নেতৃত্বও প্রয়োজন, এই ভেবে তারা মহাত্মাকে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট করার প্রস্তাব করল। কিন্তু নিরপেক্ষ প্রেসিডেণ্ট হয়ে তিনি কি শেষে সত্যি ইণ্ডিপেণ্ডেন্সওয়ালাদের খপ্পরে পড়তে রাজী হতে পারেন? তাছাড়া জহরলালের মতিগতি তো ভাল নয়। তাঁকে মতিলাল ও মহাত্মা দুদিক থেকে ঠেসে ধরে চালাচ্ছিলেন, অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিল্লী ম্যানিফেষ্টোতে সই করাতে হয়েছিল, তাঁর ঘাড় মটকানোর কাজটা পাকাপাকি ভাবে ফিনিস করাও দরকার। তাই তিনি বললেন, আমি নয়, জহরলালকে লাহোর কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট কর।

ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এবং সোসিয়্যালিজমের কথা বলে জহরলালের জনপ্রিয়তা বেড়েছিল, কাজেই সকলে সন্তুষ্ট মনে তাঁকে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত করে খুশীই হল। মহাত্মাজি তখন সফরে বেরোলেন, এবং ইউ, পিতে সফর করলেন ব্যাপক ভাবে, আর সকলকে বলে বেড়াতে লাগলেন, জহরলালের দিকে ভোট দিও। লোকে মনে করল মহাত্মাজি দলে এসে গেছেন। কিন্তু মহাত্মার প্ল্যান ছিল এক ঢিলে দুই পাখী মারা। একদিকে খাঁটি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স-ওয়ালাদের বেকায়দা করার জন্যে তিনি জহরলালকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করবেন, আর একদিকে সরকারকে একটু ভয় দেখানোও হবে, কংগ্রেসের রাশ আর বুঝি তাঁর হাতে রইলো না, চিরপরিচিত রফাপন্থী নেতার হাতে কংগ্রেসের রাশ না থাকাটায় ইংরেজ নিশ্চয়ই স্বস্তিবোধ করবে না।

বস্তুত, এই অবস্থায় আরুইন মহাত্মার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হল, দেখা হলে আগে

থেকেই একটা রফার বন্দোবস্ত হতে পারবে। কিন্তু বিধাতাপুরুষ বাদ সাধলেন, আরুইনের ট্রেনের কামরার নীচে এক বোমা ফাটলো। লোকে বলে, নওজোয়ান দলের কাজ। কাজেই সাক্ষাৎকার হল না।

ইতিমধ্যে ব্যবস্থা পরিষদের মধ্যেও দর্শকদের গ্যালারী থেকে এক বোমা পড়লো, এবং ভগৎ সিং গ্রেপ্তার হল, রাজগুরু এবং শুকদেব নামক আর দুজন যুবকও ধরা পড়লো। ভগৎ সিং বললে, আমি বোমা ফেলেছি কাউকে মারার জন্যে নয়, শুধু সরকারী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্যে। যাই হোক, কেউ না মরলেও বিচারে ভগৎ সিং-এর ফাঁসির হুকুম হল, এবং সারাদেশের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে তাকে ফাঁসি দেওয়াও হল।

লাহোর কংগ্রেসের স্বাধীনতা প্রস্তাব পাশ হয়েছে বলে এবং জহরলালের নেতৃত্বেই তা হয়েছে বলে কংগ্রেসের স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং জহরলালের মহিমার ঢক্কা-নিনাদ সেই থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে।

কিন্তু লাহোর কংগ্রেসে প্রকৃত চিত্র ঢাকা দিয়েই পেশ করা হয়। লাহোরে মহাত্মাজি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স প্রস্তাব নিজে রচনা করেন, এবং তার মুখবন্ধে বড়লাটের স্তুতি এবং হিংসাত্মক কাজের নিন্দা জুড়ে দেওয়া হয়। খাঁটি স্বাধীনতাকামীরা এই দুটো অহেতুক এবং অবান্তর কথা বাদ দেবার প্রস্তাব করলে মহাত্মাজি চ্যালেঞ্জ করে বসেন, আমার প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সুচিন্তিত প্রস্তাব। এ প্রস্তাবের কোন সংশোধন চলবে না। হয় প্রস্তাব যথাযথ ভাবে গ্রহণ করতে হবে, না হয় সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে ; either accept it in toto or reject it in toto. যদি বর্জন করা হয়, তাহলে ওয়ার্কিং কমিটি পদত্যাগ করবে, এবং তোমাদের নতুন ওয়ার্কিং কমিটি তৈরী করে কংগ্রেস চালাতে হবে।

"নিরপেক্ষ" প্রেসিডেণ্ট জহরলাল চুপ করেই থাকলেন। আর সকলেও চুপ করেই থাকলো, কেউ কংগ্রেস চালাবার দায়িত্ব নিতে ভরসা পেলো না। শোনা যায়, বিঠলভাই ঝাবেরভাই প্যাটেল সুভাষ বাবুকে বলেছিলেন, তুমি যদি দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে থাকবো, এস চেষ্টা করে দেখা যাক। সুভাষ বাবু পিছিয়ে গেলেন, বললেন, তাহলে বাংলাদেশে সেনগুপ্ত ও মহাত্মার দলের কাছে আমায় পরাজিত হতে হবে। সুভাষ বাবু মানে যে আমাদের বিপ্লবী দাদারাও, সে কথা কি বলে দিতে হবে?

লাহোরের স্বাধীনতার প্রস্তাব ও সেটা পাশ হওয়ার ইতিহাস এই। খাঁটী স্বাধীনতা বোঝাতে ব্যবহৃত ইণ্ডিপেণ্ডেন্স শব্দটার পরিবর্তে হিন্দী তর্জমা হল পূর্ণ স্বরাজ্য! স্বরাজ্য ঠিকই রইলো,—শুধু বোঝা গেল,—এতদিনকার স্বরাজটা ছিল অপূর্ণ, এখন সেটা হল পূর্ণ। আজকের ভারতের স্বাধীনতার স্বরূপও তাই ডোমিনিয়নের ওপর রিপাবলিকের ওড়না।

যাই হোক, পূর্ণ স্বরাজের আদর্শ গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জন্যে সংগ্রামের প্রস্তুতির কথাও রইলো, অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির ওপর ভার দেওয়া হল, তাঁরা অহিংস আইন অমান্যের কর্মসূচী, খাজনা বন্ধ সমেত, রচনা করবেন, এবং তাঁরা যখন বলবেন তখন সংগ্রাম আরম্ভ করা হবে। এই ভাবে বৈধতার কূটকৌশলের জোরে মহাত্মাজি দৃঢ় হস্তে স্বাধীনতা-সংগ্রামের মত্ত তুরঙ্গের ঝুঁটি চেপে ধরলেন এবং সরকারকে বুঝিয়ে দিলেন, কংগ্রেসের রাশ এখনো আমার হাতে। সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মুখড়ে-পড়া মনকে চাঙ্গা করার

জন্যে গান্ধী-কংগ্রেসের প্রচার হিসেবে '৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী সারা দেশে "স্বাধীনতার শপথ" Independence Pledge গ্রহণের ব্যবস্থা হল। অস্পষ্ট হলেও, একটা সংগ্রামের আশায় লোকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো।

এদিকে সেনগুপ্তের দলের কাগজ Advance প্রকাশের তোড়জোড় চলছিল। হঠাৎ একদিন জে সি. গুপ্ত দোকানে এসে বললেন, আজ আমাদের meeting-এ final decision হয়ে গেল, অমুক দিন কাগজ বেরোবে, আপনাকে সমস্ত furniture দিয়ে অফিস সাজিয়ে দিতে হবে। তাঁর সঙ্গে গিয়ে ৩২ নম্বর চৌরঙ্গী স্ট্রীটের বিরাট বাড়ীটা দেখে এলুম, কোন ঘরে কি হবে, কি কি চাই সব শুনলুম, মাত্র দশ দিনের মধ্যে সব চাই।

প্রায় অসম্ভব কথা। কিন্তু সম্ভব-অসম্ভব ভাবার বালাই না রেখে অবিলম্বে কোমর বেঁধে লেগে গেলুম। দোকানে যা কিছু দরকারী মাল ছিল, বেছে বের করে ফেললুম এবং চালান করলুম। সবগুলো নিলেমে ঘুরে মাল সংগ্রহ করি, রোজ দু তিন গাড়ী করে মাল যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিল করি, গুপ্ত সাহেব কিছু টাকা বাকি রেখে টাকা দেন। হিসেব দেখা হবে পরে।

গুপ্ত সাহেবদের বসবার ঘর সাজিয়ে দেওয়া হল মেহগনি ফার্ণিচার দিয়ে—প্রকাণ্ড বাউণ্ড টেবিল, চেয়ার, সোফা প্রভৃতি, ঘরে ঘরে ছোট বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ফ্ল্যাট রাইটিং টেবিল, টাইপরাইটিং টেবিল এবং ডজন ডজন চেয়ার, বেকর্ডর‍্যাক, হোয়াটনট, ব্লক রাখার জন্যে একটা বিরাট চেষ্ট অফ ড্রয়ার, কবিতের দুখানা ১২ ফুট লম্বা আর্মচেয়ার বেঞ্চ, কতকগুলো আলমারি মনমতন নতুন ক্যাস কাউণ্টারও তৈরী করে দেওয়া হল, তা ছাড়া দুটো গ্লাসকেস আলমারীভরা বই, তার মধ্যে আছে একটা সেট নাইনথ এডিসনের এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা, একগাদা ইণ্ডিয়ান ইয়ারবুক, একগাদা ষ্টেটসম্যান ইয়ার বুক, ৫০ বছরের বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের রিপোর্ট ৫০ ভল্যুম প্রভৃতি। সবসাকুল্যে বিল হয়েছিল মাত্র ১৮০০ টাকার। অর্থাৎ আমার নিজেদের ব্যবসার সবটুকু কেরামতি খরচ করে যদি আমি নিজের কাগজ করতুম, তাহলে যেমনটি হতে পারতো।

কিন্তু ৫০ বার ঘুরে ঘুরে আদায় হল ১৫০০ টাকা, তার পর "হিসেবটা একবার দেখতে হবে' বলে চাললো দিনের পর দিন ঘোরানো। মনে করেছিলুম, গুপ্ত সাহেব সন্তুষ্ট হয়ে তারিফ করবেন, তা চুলোয় যাক, অসঙ্কোচে দিনের পর দিন ঘোরাতে একটু বাধে না, দেখে জীবনে ঘেন্না হয়ে গেল। তারও ওপর বগড় আছে—আমাকে বাইরে বসতে বলে গুপ্ত সাহেব ঘণ্টার পর ঘণ্টা সন্তোষ মিত্রকে নিয়ে অ্যাপায়ন এবং পলিটিক্স করেন, বলেন, সন্তোষ মিত্রের মতন লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়াটা তাঁর সৌভাগ্য।

তখন দোকানে আমরা ১১জন লোক খাটি। বাড়ীর ভিতরের উঠানটাও নেওয়া হয়েছিল ৩০ টাকা ভাড়ায়। এই অবস্থায় কাজ এবং টাকা একসঙ্গে বন্ধ। গুপ্ত সাহেবের ভাবখানা, ব্যবসাটা তাঁর, আমি কর্মচারী, দোকানের খরচটা আমার। মেজাজ তিরিক্ষে হয়েছে, গুপ্ত সাহেবের কিছু না করতে পেরে ঘরে এসে সকলকে বকাবকি করি। ওদিকে কংগ্রেস এবং তার সঙ্গে দাদাদের ওপরও মনটা বিষিয়ে উঠেছে। বড়লোক সম্বন্ধে নতুন ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মনটাকে কমিউনিজমের দিকে আরো জোরে টানছে।

একদিন প্রভাসকে খুব বকাবকি করলুম, সে রাগ করে বাড়ী চলে গেল। সারদার

ধৈর্যের বাঁধও ভাঙলো—সে বললে, আমারও আর এ ঝকমারির মধ্যে থাকতে ইচ্ছে করছে না। রাগ, দুঃখ, অপমান মনটাকে নিষ্পেষিত করছিল, এখন অভিমানে চোখে জল এল। গুপ্ত সাহেবকে এক চিঠি লিখলুম একুশ পৃষ্ঠা। সকলকে বিদায় দিলুম, দোকানে তালা দিয়ে চিঠি ও চাবি গুপ্ত সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে একখানা কাপড় ও কয়েকখানা বই হাতে করে নিয়ে এসে উঠলুম কলেজ স্কোয়ারে আত্মশক্তি লাইব্রেরীতে।

কত কষ্টে গড়া ব্যবসা এমনি করে বিসর্জন দিলুম, "বেনোজল এসে ঘ'রো জল বার করে নিয়ে গেল।" সারদা আমার মুখ চেয়ে যেমন মুখ বুজে খেটেছিল, এখনও তেমনি মুখ বুজে এই বিসর্জন পর্ব দেখলো, একটি কথা বললো না। মুক্তিও পেলুম এক সঙ্গে দুজনেই। পরে অমরদাকে বলে কর্পোরেশনে এক স্কুলমাষ্টারী জুটিয়ে নিয়ে সারদা সরে গেল। আমি দুবেলা মুড়ি খাই এবং আত্মশক্তি লাইব্রেরীর কাউন্টারের ওপর শুই। আর দুপুরবেলা ফরোয়ার্ড অফিসে উপেনদার কাছে গিয়ে আড্ডা মারি। আবার নতুন করে কিছু রোজগারের চিন্তা চলছে। লিখে খাওয়ার কথা ভাবছি।

দাদাদের কংগ্রেসী বিপ্লব প্রচেষ্টার বিশ্লেষণ করতে করতে একটা প্রকাণ্ড কবিতা লিখলুম। আনন্দবাজার অফিসে সুরেশ মজুমদারের কাছে আবার যাতায়াত শুরু করেছিলুম, তাঁকে কবিতাটা দেখালুম। তিনি চক্ষু ছানাবড়া করে মাখন সেনকে ডেকে সেটা পড়তে দিলেন, তিনি পড়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, এ আমি ছাপবো। বলে তিনি অমূল্য সেনকে ডেকে তার হাতে সেটা দিলেন। সুরেশ মজুমদার বললেন, দোহাই তোমাদের, ও ছাপলে আনন্দবাজার অফিসে হামলা হবে। অমূল্য সেন পড়ে বললেন, বেশ, আনন্দবাজারে নয়, আমি অন্য কাগজে ছাপবো। আমি বললুম, নামটা দেবেন না যেন।

তখন মির্জাপুর ষ্ট্রীটে এক কাঠগোলায় অনুশীলনের ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন, এবং সেখান থেকে "হিন্দু" নামক এক সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরুতো। দেখা গেল, কয়েক দিন পরে সেই কাগজে কবিতাটা বেরিয়েছে—নাম দেওয়া হয়েছে শ্রীশ্রীদাদা। কবিতাটা এই : (সবটা মনে নেই)

আমরা নন্দলালের দাদা
আমরা ঘোড়া পিটে গড়ি গাধা
আর বাক্যের জোরে সাদা কার কালো
যত কালো করি সাদা
আমরা ধনীর চরণ চাটি
আর গরীবকে মারি চাঁটি
আর নীড়ারে নীড়ারে বিবাদ বাধিলে
আমরাই ভাড়া খাটি।

* *

আর ডাকাত কি খুনে নয়
ওসব শুধু ইতিহাসে কয়
এখন খোসামুদী আর স্বদেশীর নামে
মন্দটা বা কি হয় !

আমরা ঐক্য মহিমা গাই
সেটা নির্জলা ভাঁওতাই
কারণ সতীনের দলে সহিতে পারি না
ধনীর করুণা চাই।

আমরা জেলায় জেলায় ঘুরি
সদা দলাদলি করে ফিরি
আর সতেরোটা দলে এক একটা ছেলে
টেনে ছেঁড়াছিঁড়ি করি

আমরা ছোট ছেলেদের চরাই
আর বড়দের বড় ডরাই
আর আমাদের সুরে সুর না মেলালে
টিকটিকি নাম ছড়াই

কিন্তু যদি দিতে পারে গুঁতো
আমরা ছেড়ে ছলা-কলা ছুতো
নাকে খৎ দিয়ে শিরে তুলে নিই
তার ছেঁড়া চটি জুতো

আমরা নিজেরা বাজাই নিজেদের ঢোল
খাই ঝিঙে যদি, বলি পটোল
হাতে লয়ে ফিরি তৈলভাণ্ড
মুখে স্বাধীনতা-বোল।

* * *

হ্যাগা মুটে মজুর কি চাষা—
এদের স্বদেশীতে কেন আসা!
এদের যে ব্যাটা আস্কারা দেয়
সে ব্যাটা কর্মনাশা

দেখ ওদের ধর্মঘটে
শুধু বড়লোকগুলো চটে
আমরা মোলায়েম করি তেল দিয়ে, তাই
ভারত-উদ্ধারে পটে

বাবা মুটে-মজুরের মার
সে যে সারা দুনিয়ার বার!
ছি ছি ভদ্রলোকের ভদ্রস্বরাজে
ঠাঁই দিতে আছে তার?

* * *

যত   স্বদেশীতে মরা ছেলে
তারা   ছিল আমাদেরই দলে
শুধু   দিনকয় আগে কুসঙ্গে মিশে
        বিঘোরে প্রাণটা দিলে
নৈলে   আমাদেরই মত সুখে
বসে'   ভারতমাতার বুকে
        উঠিতে বসিতে মরণ বরণ
        করিত যে মুখে মুখে।

কিন্তু   এক একটা যেই খসে
আমরা   কাগজেতে কাঁদি বসে
লোকে   চার গুণ দাম দেয়, আমাদের
        পকেট ভরিয়া আসে।

আহা   এমনটা যদি হ'ত
মাসে   এক আধটা অন্তত
মোদের   পরের মটরে ডেপুটী লীডারী
        এত দিনে ঘুচে যেত।

যত   মিছিলের পুরোভাগে
যেতাম   আমরাই সব আগে
        ডায়াস, চেয়ার, কাউন্সিল হল
        সকলই পেতাম বাগে।

ভায়া   মোদের বসানো ঘানি
তোমরা   চোখে ঠুলি পরে টানি'
        আরো কিছু দিন তৈল জোগাও
        আমরা স্বরাজ আনি।

বুকের মাঝে তিলে তিলে সঞ্চিত বহু দিনের পুঞ্জীভূত বিষবাষ্পের এ যেন বিস্ফোরণ—চিন্তার দ্বিধা সঙ্কোচের বাঁধ যেন ভেঙ্গে গেল।

এই সময়ে একদিন ট্রামে উপেনদার সঙ্গে দেখা অফিসের পথে। কথা কইতে কইতে যাচ্ছি,—হঠাৎ ট্রামে উঠলেন অরুণ গুহ। উপেনদার সঙ্গে তাঁর চাপা দুষ্ট হাসির বিনিময় হল। তিনি উপেনদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ হপ্তার 'স্বাধীনতা' পড়েছেন?

উপেনদা—না, কেন বল দেখি?

অরুণবাবু—একটা আর্টিকেল আছে, ভাল

উপেনদা—হ্যাঁ, কে যেন বলছিল বটে, তা দেখব অখন

অরুণবাবু—আর একটা জবাবও লিখবেন (মুচকি হাসি)

উপেনদাও মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে জানালেন, লিখবেন। তার পরে অরুণবাবু নেমে গেলেন এবং উপেনদা আমাকে বললেন, কিছু বুঝলি?

আমি—না, কি ব্যাপার ?

উপেনদা—ওরা আমার লেখা চায়, আমি লিখি না, এই জবাব উপলক্ষে একটা লেখা পাবার মৎলব।

আমি—তা বেশ তো। আপনিও একটা ভেজাল চালিয়ে দিন না।

উপেনদা—তুই লিখবি ?

আমি—আপনি বললেই লিখতে পারি।

তাই-ই ঠিক হল। আমি "স্বাধীনতাটা" সংগ্রহ করে প্রবন্ধটা পড়লুম—"শতকরা নিরানব্বই জন"। পড়ে একেবারে ক্ষেপে গেলুম—লেখকের নাম দুর্গাপ্রসাদ, কাঁচা লেখা, অপরিণত আইডিয়া এবং যারা সোশ্যালিজম্‌-কমিউনিজম বা জনগণের বিপ্লবের কথা বলে, তাদের অতি অভদ্র ভাষায় গালিগালাজ।

জবাব লিখলুম "নিরানব্বইয়ের ধাক্কা।" লেখাটা বেশ বড় হয়ে গেল বলে তিন অংশে ভাগ করে দিলুম। প্রথম অংশে থাকলো গালাগালের জবাবে পাল্টা গালাগাল; দ্বিতীয় অংশে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের আদর্শ ও কর্মপন্থার বিশ্লেষণ, আর তৃতীয় অংশে গণবিপ্লবের আদর্শ, কর্মপন্থা ও যৌক্তিকতা।

গেলুম লেখা নিয়ে উপেনদার কাছে ফরোয়ার্ড অফিসে। তিনি পড়ে "আত্মশক্তি"র সম্পাদক শচীন সেনগুপ্তকে (নাট্যকার) ডেকে পাঠিয়ে লেখাটা দিয়ে বললেন, ঘরে নিয়ে গিয়ে পড়। তিনি লেখাটা পড়ে ফিরে এসে বললেন, এ তো আমায় ছাপতে হবে। কার লেখা ?

উপেনদা আমাকে দেখিয়ে দিলেন, নামটাও বলে দিলেন। আমি বললুম, নামটা ছাপবেন না। তার পর দেখা গেল নামসুদ্ধ লেখা ছাপা হয়েছে। আমার বিদ্রোহ প্রকাশ হয়ে পড়লো, একটা হৈ হৈ পড়ে গেল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত অরুণবাবু আমার ওপর হাড়ে চটা। উপেনদা বললেন, কিসের "ঢাক ঢাক গুড় গুড়" ? একেবারে কাটছিঁড় হয়ে যাওয়াই ভাল।

শচীন সেনগুপ্তের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপ আমার সেই প্রথম। বন্দোবস্ত হয়ে গেল, হপ্তায় হপ্তায় লিখবো এবং দশ টাকা করে পাব। উপেনদা খুশী হয়ে বললেন, কেমন হল ?

উনিশ

ইতিমধ্যে আরো কতকগুলো ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল যা বলা হয়নি। বেঙ্গল ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছিল—এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর বি. কে. লাহিড়ী এবং ম্যানেজার ভূপেন ব্যানার্জির নামে তহবিল তছরূপের মামলা হয়ে তাঁদের ৮ বছর করে জেল হয়েছিল। বি. কে. লাহিড়ী ছিলেন ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর জামাতা, এবং ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ছিলেন ঐ ব্যাঙ্কের বোর্ড অফ ডিরেকটর্স-এর প্রেসিডেন্ট। তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, এবং সেই পাগল অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

ওঁরা ছিলেন বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলেরও কর্তৃপক্ষ। সেখানেও নানাবিধ চুরি-দুর্নীতি ধরা পড়েছিল, এবং মামলাও হয়েছিল। সুরেশ ভট্টাচার্য ছিলেন সেক্রেটারী, তাঁকেও মামলায়

জড়াবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তিনি বেকসুর খালাস হয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন যুগান্তর দলের লোক।

এদিকে ডাক্তার জে. এম. দাশগুপ্তদের বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স অ্যাণ্ড রিয়্যাল প্রপার্টি ভাল চলছিল না। ডাক্তার দাশগুপ্তেরও যুগান্তর দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁর ভাই মৃন্ময় বাবু ছিলেন দলের লোক। সেই সূত্রে বন্দোবস্ত করে ঐ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সী নিয়েছিলেন অমর ঘোষ, মনোরঞ্জনদা' (গুপ্ত), হরিদা' (চক্রবর্তী) এবং কোম্পানীর সেক্রেটারী এক প্রফুল্ল বাবু।

২৭-২৮ সালে মনোরঞ্জনদা' মাদ্রাজের জেলে রাজবন্দী থাকা কালে সরকারী বেসরকারী অনেক হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় হয়েছিল অনেক বন্দী কংগেসকর্মীর সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। সেই সূত্রে বোধহয়, ৩০ সালের গোড়ার দিকেই তিনি মাদ্রাজে গিয়েছিলেন ঐ বেঙ্গল ইনসিওরেন্সের ব্রাঞ্চ খুলতে।

মনোরঞ্জনদা' মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন ডালহাউসী স্কোয়ারে টেগার্টকে হত্যার চেষ্টার আগে। তার আগেই আমি "নিরেনব্বইয়ের ধাক্কা" লিখে দাদাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করেছি।

এর কিছুদিন পরে ডক্টর ভূপেন দত্ত একদিন বললেন, ওহে, তোমার "নিরেনব্বইয়ের ধাক্কা লেখাটা অনেক ছেলে খুঁজছে, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না, তুমি ওটা একটা ছোট পুস্তিকার আকারে ছেপে বার করে দাও না। আমি শুনে বললুম, বেশ কথা, কিন্তু যদি ওদের 'শতকরা নিরেনব্বই জন' লেখাটা, সঙ্গে ওটা পাশাপাশি ছাপি, ছেলেরা দুটো আইডিয়ার বিচার করে দেখতে পাবে, তাহলে কেমন হয়? তিনি বললেন, খুব ভাল, তাই কর।

আমি তাই করলুম—"স্বাধীনতা" এবং 'নবশক্তি" ("আত্মশক্তি' তখন "নবশক্তি' হয়েছিল) হইতে উদ্ধৃত বলে, এবং প্রভাসচন্দ্র মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত বলে, "নিরেনব্বই বনাম এক" নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করলুম।

২০০০ বই-এর অর্ধেক বিক্রি হয়ে গিয়েছিল, বাকিটা পুলিশের খপ্পরে গিয়েছিল, যখন একবার পুলিস সমগ্র আত্মশক্তি লাইব্রেরীটা তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

পুস্তিকায় "প্রকাশকের নিবেদনে" লিখলুম, আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রথম যুগে, প্রথম বিপ্লবীদের কাজ ছিল 'টেররিজম।' তখন দেশের লোকে ধারণ করতে পারতো না যে, ভারতবাসী ইংরেজের সঙ্গে বোমা বন্দুক নিয়ে লড়তে পারে, বা মারতে এবং মরতে পারে। ক্ষুদিরাম-কানাইলাল দেশের লোকের এ ধারণা বদলে দিয়েছিল

"দ্বিতীয় যুগ ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়টা। এই সময়ে বিপ্লবীদের দৃষ্টি বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছিল। জার্মাণ ষড়যন্ত্র ধরা পড়ার সঙ্গে সে যুগ শেষ হয়।

"তৃতীয় যুগ ১৯২০ সালের পর। বর্তমানে (১৯২৯।৩০) এ যুগ শেষ হচ্ছে।

"ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে অনেক বড় বড় রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষত রুশ-বিপ্লব সারা পৃথিবীর নিপীড়িত জনসাধারণের মনে একটা আশার বাণী বয়ে এনেছে। আমাদের দেশেও সে বাণী এসে পৌঁছেছে, জনসাধারণের শত্রুদলের অবিরাম মিথ্যা প্রচার সত্ত্বেও।

ফলে জাতীয়তার আদর্শমূলক স্বাধীনতাবাদ, এবং ধনসাম্যমূলক গণবিপ্লববাদ, এই দুই আদর্শের বিরোধ বাধলো।

"এ বিরোধ বেড়েই চলবে, একে চাপ দেওয়ার চেষ্টা বৃথ[া]। সুতরাং এ বিরোধটাকে বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। এই পুস্তিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য এই।

*　　*　　*　　*　　*

এখন ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ Veteran বিপ্লবীদের ... মাক্কেলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ "স্বাধীনতার" "শতকরা নিরানব্বই জন" নামক প্রবন্ধ থেকে শুনুন:

"রক্তটা যতদিন সবল সতেজ থাকে, ততদিন বুঝি সহজ বুদ্ধিতে, আর রক্ত যখন ঠাণ্ডা হয়ে আসতে থাকে, তখন সব জিনিসই দেখতে থাকি হিসেবের এঁদো গলির আঁধারপথে, কারণ মুক্তদৃষ্টির আলো তখন চোখ থেকে নিবে গেছে।

"দুর্দ্ধর্ষ স্পর্দ্ধা,—এইটিই মুক্তিপ্রয়াসী জাতির কাছে সব চেয়ে বড় কথা—শতকরা নিরানব্বই জন নয়। আঘাত করব, আঘাত খাব, মরব, আবার আঘাত করব, প্রথমবারের চেয়ে এবারের শক্তি ও সাফল্য দ্বিগুণ হবে, তার পরের বার চতুর্গুণ হবে, এমনি করে পুরুষের পর পুরুষও চলতে পারে, এমনি করে নিরানব্বইজন আসলেও আসতে পারে, না আসলেও ক্ষতি নাই···

"এককালে মোহ ছিল শিক্ষাবিস্তার, এককালে মোহ ছিল সমাজ সংস্কার, ক'দিন আগে মোহ জুটেছিল তাঁত-চরকা আর হিন্দু-মোসলেম মিলন সাধন আর আজ মোহ জুটেছে শ্রেণী-সংঘর্ষ। শ্রমিক আর চাষীই যখন শতকরা নিরানব্বই জন, তখন তাদের পাওয়ার পথ দেখতে হবে। তাদের পাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় তাদের ঘরোয়া স্বার্থ দেখা—তাদের ঘরোয়া স্বার্থ দেখতে গেলেই তাদের স্বার্থের বিরোধী যারা, অর্থাৎ মহাজন আর জমিদার, তাদের সাথে দ্বন্দ্ব লাগাতে হবে। অর্থাৎ জাতীয় স্বাধীনতালাভের প্রথম সোপান শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব লাগানো।

"তবে কি কৃষক শ্রমিকসংঘের প্রয়োজন নেই? আছে বই কি। কৃষকসংঘের চেয়ে বরং শ্রমিকসংঘের প্রয়োজন বেশী করে আছে। শ্রমিকের পরোয়া নেই, আজ এখানে বারো আনা মাইনের চাকরী গেলে গতর খাটিয়ে কাল আর এক জায়গায় দানাপানি জুটিয়ে নেবে। একটা ওলট-পালটের সময় এই রকম বেপরোয়া শ্রমিকদের ধর্মঘাট প্রভৃতি করিয়ে স্বাধীনতাকামীদের পক্ষে অনেকটা জোর দেওয়া চলতে পারবে। তাই শ্রমিকসংঘের বিশেষ প্রয়োজনই আছে, এবং কৃষকসংঘেরও কিছু কিছু আছে। কি রকম? যথা আশ্রয় দিতে—

"বুলির আর অন্ত নেই! শতকরা নিরানব্বইয়ের জন্য যে স্বরাজ হল না, সে স্বরাজ দিয়ে কি হবে?··যারা দেশের স্বাধীনতা আনবে তারাই অপরের জন্য স্বাধীনতার ক্ষেত্র, ভোগের ক্ষেত্র খুলে দিয়ে যাবে, একথাটি আজ শ্রেণীসংঘর্ষের পাণ্ডাদের কাছে ঠাট্টার কথা হয়েছে। এই যে বুর্জোয়া ন্যাশান্যালিষ্টের দল এরা আবার অপরের সুখ-সুবিধা করে দেবে? এই প্রশ্ন যারা তোলে, হয় তাদের ইতিহাসের জ্ঞান অত্যন্ত অগভীর, অথবা তারা বুর্জোয়া ন্যাশান্যালিষ্ট বলে যাদের ঠাট্টা করে, তাদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, নিজেরা নেতৃত্বকামী।

*　　*　　*　　*　　*

"দুর্গাপ্রসাদ"—এই ছদ্ম নামে ওরা প্রবন্ধটা লিখেছিলেন, যেন এক জুনিয়ার এক সিনিয়রকে লক্ষ্য করে লিখছে। বস্তুতঃ লক্ষ্য ছিলেন ডক্টর ভূপেন দত্ত, যিনি বুর্জোয়া ন্যাশানিষ্ট কথাটা বলতেন এবং লিখতেন। সুতরাং আমি জবাবটা লিখলুম, যেন এক সিনিয়র এক জুনিয়রকে লক্ষ্য করে লিখছে। তার কিছু নমুনা এখানে উদ্ধৃত করলুম :

শ্রীমান লিখেছেন, 'আমাদের দেশে বয়সে ভাঁটা পড়ে একটু তাড়াতাড়ি, আর রক্ত ঠাণ্ডা হলে একেবারে সত্যদর্শন করতে না বুঝে সব জিনিসই হিসেবের এঁধোগলির আঁধার পথে দেখতে থাকে।' শ্রীমানকে বলি, 'বাপু, হিসেববোধটা শুধু ব্যক্তির বয়েস বা তার সঙ্গে নয়,—স্বার্থের বয়েস বা তার সঙ্গেও পাকতে থাকে।' এই হিসেববোধ যাদের বেশী, সৈন্যদলের মধ্যে তারা হয় অফিসার, সমাজের মধ্যে তারাই হয় মাথা, রাষ্ট্রীয় জগতেও তারাই হয় শাসক বা রাষ্ট্রনেতা। স্বদেশী হাঙ্গামার মধ্যেও, হিসেববোধ যাদের কম, তারা হয় বন্দী, আর যাদের বেশী, তারা হয় রাজবন্দী। হিসেববোধকে গাল দিতে হলেও সাড়ে তিন-পৃষ্ঠাব্যাপী হিসেব লিখতে হয়। আর রসগোল্লা ভক্ষণের চেয়ে যে ইংরেজ রাজত্ব ভক্ষণের জন্যে একটু বেশী হিসেববোধ দরকার, এটাও আমাদের সত্যি বলেই সন্দেহ হয়। ·

"তারপর সহজ বুদ্ধির কথা। সহজবুদ্ধির আদর্শ হচ্ছে পশুরা। মানুষের বুদ্ধিটা বিচার-বিবেক একেবারে বাদ দিয়ে চলতে পারে না। সে চেষ্টা করতে গেলে আইডিয়াগুলো হয় অসম্পূর্ণ, কথাগুলো হয় অসংলগ্ন, আর কাজগুলো অকাজ হয়েই দাঁড়ায়। ভক্তিভাজনদের টুকরো টাকরা শেখানো বুলির খিচুড়ীই তখন একমাত্র সম্বল হয়। সব কাজেই আক্কেল দরকার, আর স্বাধীনতা অর্জনটাই বে-আক্কেলদের কাজ, একথা মনে করা তখনই সম্ভব হয়।

"শ্রীমানের আকাঙ্ক্ষা, ভদ্রলোকেরা পালা করে আঘাত করতে যাবেন, আর মরবেন। কৃষক ও শ্রমিকেরা এরই মধ্যে, অর্থাৎ তাঁদের আগেই সে কাজ শুরু করে দিয়েছে। শ্রীমান তাদের সংঘ গড়ার অনুমতি দিয়েও উদারতা দেখিয়েছেন, সেটা তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে ধর্মঘট করার জন্যে আর আশ্রয় দেওয়ার জন্যে। Secret Society করে ২৫ জন করে দাদায় মিলে এক একটি সোনার চাঁদকে ১৫ বছর ধরে ভাঁওতা মেরে মেরে সৈন্য করে তুলতে হবে ত। তাতে ওয়ারেন্ট বেরুবেই। কিন্তু ওয়ারেন্টকে জয় করলে ত চলবে না। কাজেই গা ঢাকা দেওয়ার জায়গাও দরকার। সুতরাং স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে এসব দুর্দ্ধর্ষ স্পর্দ্ধা চাইই চাই।

"মানব জীবনের ভার কেন্দ্র অন্নবস্ত্র। এই অন্নবস্ত্রের সংস্থানের উপরই অন্য সর্ববিধ সুখশান্তি এবং উন্নতি নির্ভর করে। · আমাদের দেশে উৎপাদনের অর্থ কাঁচা মাল উৎপাদন, বণ্টনের অর্থ শতকরা নিরেনব্বই জনের অর্দ্ধাহার· এ সব সমস্যা অন্যদেশেও আছে, কিন্তু সে সব দেশের সঙ্গে আমাদের একটা তফাৎ আছে। সে সব দেশে দল হচ্ছে দুটো, এবং দুটো দলই দেশী—একদল লুণ্ঠনকারী, আর এক দল লুণ্ঠিত। কিন্তু আমাদের দেশে তিনটি দল। একদল লুণ্ঠনকারী, একদল লুণ্ঠিত, দেশের শতকরা নিরেনব্বই জন, আর তৃতীয় একটি দল আছেন, যারা বরের ঘরের পিসী আর কনের ঘরের মাসী—দেশের "শতকরা একজনের" দল।

এঁদের স্বার্থ বিদেশীদের স্বার্থের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়ানো।···

"কিন্তু ঐ শতকরা একেদের নিম্ন স্তরেরই একদল যুবক ভাগ বাঁটোয়ারার .ন* কাটিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলে, আর তাদের নজর পড়লো দেশের সর্ব বন স্বার্থের বিরোধী উদ্ধত দণ্ড বিদেশীদের ওপর। মুষ্টিমেয় ঐ.নও দের শিরায় শিরায় ত ন। রক্ত টগবগিয়ে ফুটে উঠলো, আর উন্মত্ত আবেগে তারা স্বাধীনতা দেবীর সামনে উল্কার মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে' সে রক্তের অর্ঘ্য মুক্ত করে দিলে।

"ভাগ বাঁটোয়ারা পন্থার দল গান্ধীর কাছে এককণ্ঠে Raw material for victory দেখে তাদের বাগে বাহবা, সরকারকে বললো দ'চে ত ম' চালাকী করো না, তাড়াতাড়ি রফা কর। সরকার বললে। দাঁড়াও এক ডোজ ওষুধ দিই, কত বড় রোগ, বোঝা যাবে। বলে' একটু নাড়ী টাড়ী দেখে মণ্টেগু চমসফোর্ড রিফর্ম মিকশ্চার এক ডোজ দিতেই রোগীর বাত ফিরে এল। ভাগ বাঁটোয়ারা পন্থার বড দ। 'আশার অনেক ফল" পেয়ে সহকর্মীদের কলা দেখিয়ে বড বড চাকরীর ম ছ দে ছুটে ন

' সরকারও তাঁদের দিকে কলা দখিয়ে মুচকে হাসলেন। দু দিক থেকে কলা দেখে তারা বললেন, বটে ! দাঁড়াও ! দেশ শুদ্ধ লোককে তোমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোমাদের শাসন শোষণ অচল করে তুলবো , দখি আমরা Non co operation করলে তোমাদের পেটে-পকেটে হাত পড়ে কি না।

"প্রথম বছরটা একটু চকচকে ভাবে কাটলো, কিন্তু দ্বিতীয় বছরেই তার স্বরূপ বরিয়ে পড়লো। স্বাধীনতাকামীরা আর একবার নিজেদের মধ্যে 'গ স এল। তাদের ভাবগতিক দেখে সরকার Regulation আর ordinance দিয়ে তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিলে।

'8।৫ বছর নিরুপায় গবেষণার পর জেল থেকে যখন কয়ীরা বেরিয়ে এল, তখন ঐ 'শতকরা একেদের" নিম্নস্তরের আন্দোলনকারীরা তাদের গলায় ফুলের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করলে। একদল কর্মী তাতেই গলে' গিয়ে পুরানো মোহে তাদের আঁকড়ে ধরলেন। আর এক দল দূরে সরে গিয়ে তাঁদের নমস্কার করে বললে, তোমাদের স্বার্থ যখন শতকরা নিরেনব্বইয়ের বিরোধী এবং বিদেশীদের সঙ্গে এক, তখন তামাদের চিরকাল বিশ্বাস করা অসম্ভব। আজ তোমরা যা বলছ, তার সরলার্থ "দশ-আনা ছ আনা ভাগ, আমরা জানি কি।" যেদিন ওরা বলবে, "আজ হতে ভাগ হল সমান সমান সেই দিনই তোমাদের মানভঞ্জন হবে।

"দেশটাকে স্বাধীন করতে পারলে তোমরা এক একজন যে বাকি শতকরা নিরেনব্বই জনের দুঃখ দয়া করে ঘুচিয়ে দেবে, আজ পর্যন্ত তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ আমাদের মনে উদয় হওয়ার কোন অবসরই তো তোমরা দাওনি। সুতরাং তোমাদের স্বাধীনতার আন্দোলন নিয়ে তোমরাই থাক, শতকরা নিরেনব্বই জনের স্বাধীনতা আনবার ভারটা তাদের হাতেই ছেড়ে দাও।

"এই হচ্ছে বর্তমান শ্রেণী সংঘর্ষের মূল কথা। চাকরীর আন্দোলনের স্বাভাবিক পরিণতি যেমন স্বাধীনতার আন্দোলন, স্বাধীনতার আন্দোলনের স্বাভাবিক পরিণতি এই শ্রেণী সংঘর্ষ।

* * *

চাষী-মজুরদের চায় সকলেই। মহাত্মার দল চান সরকারের সঙ্গে রফার উদ্দেশ্যে নিজেদের মত প্রাধান্য দেখাবার জন্য। স্বাধীনতার অবতারও তাদের চান এইজন্য যে, তাঁরা যখন স্বাধীনতা সংগ্রামের অপরিহার্য অঙ্গ পয়াকার সাধন করবেন তখন তারা আশ্রয় দেবে, আর বগতিক দেখে যখন Signal দেবেন, তখন তারা ধর্মঘট করবে। কিন্তু কি মহাত্মার দল, আর কি স্বাধীনতার অবতারগণ, প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনের কথা উঠলে প্রজাদের পিছনে তাদের দুর্ধর্ষ স্পর্ধা বা প্রেমের বুলি নিয়ে না দাঁড়িয়ে জমিদারদের পিছনেই তৈলভাণ্ড নিয়ে হাজির থাকেন।

বৈজ্ঞানিক কলকারখানা সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতির সৃষ্টি ও ব্যবহার যাদের হাত দিয়ে হয়, সেই কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর লোক, যেগুলো অপরে তাদেরই বিরুদ্ধে এতদিন ব্যবহার করে এসেছে। যেদিন তারা নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সেগুলোকে নিজেদের স্বপক্ষে ব্যবহার করতে ইচ্ছা করবে, সেদিন শ্রীমানদের শ্রেণীর নেতৃত্বের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে।

শ্রেণী সংঘর্ষের আতঙ্কে আমরা বিপ্লবটিকে ছেটেচুঁটে বিদ্রোহ বানাতেই চাও, আর Dominion Status টাকে বাগাড়ম্বরে ঢেকে স্বাধীনতা বলেই চালাতে চাও, যদি প্রকৃত স্বাধীনতার সংগ্রাম বলে এদেশে কিছু থাকে, বা কখনো ঘটে, তাহলে তার সঙ্গে শ্রেণী বিরোধও থাকবেই।

শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লবের মনোভাব, স্বাধীনতার আদর্শ এবং সংঘশক্তি গড়ে না উঠলে শ্রীমানদের ফেডারেশনের গভর্ণমেন্টের পত্তন হবেনা. এই কথাটা যারা বোঝে, তারা শ্রমিক আন্দোলনকেই চাঙ্গা করে তুলতে থাকবে।"

* * *

এখন আবার কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথায় ফিরে আসা যাক।

জানুয়ারীর গোড়াতেই মহাত্মাজী এক আমেরিকান পত্রিকায় এক বিবৃতি দিয়ে বললেন, "লাহোরের স্বাধীনতার প্রস্তাবে কারো ভয় করার কিছু নেই।" ২৬শে জানুযারী স্বাধীনতা দিবস পালনের ব্যবস্থা হল। তার আগেই সুভাষ বাবুকে গ্রেপ্তার করা হল, এবং ২৯ সালের শেষ দিকে এক প্রোশেশনের নতৃত্ব করার অজুহাতে তাঁর নামে মামলা করা হল, মামলায় সুভাষ বাবুর বোধহয় ৯ মাস জেল হয়েছিল।

৩০শে জানুয়ারী ইয়ং ইণ্ডিয়াতে মহাত্মাজী ১১ দফা দাবীর এক বিবৃতি প্রকাশ করলেন। আগে বলা হয়েছিল, অবিলম্বে পূর্ণ স্বরাজ না দিলে আইন অমান্য করা হবে। কিন্তু কর্মসূচী কিছুই ঠিক করা হয়নি এবং প্রথমেই বলে দেওয়া হয়েছিল, কোন সত্যাগ্রহী পুলিসের গায়ে হাত দিলে আইন অমান্য বন্ধ করে দেওয়া হবে।

কিন্তু আইন অমান্য আরম্ভ করার আগেই ঐ ১১ দফা সর্ত দিয়ে বলা হল, এই সব দাবী মেনে নিলে আইন অমান্য শুরু করা হবে না। মহাত্মার কর্মসূচীর কোন হদিস না পেয়ে সবরমতীতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁর তখনও কোন পরিষ্কার কর্মসূচী ছিল না। তিনি বলেছিলেন, "ভোরের কুয়াসার মধ্যে দ্রুতগামী মোটরের সামনের পথ যেমন ক্রমশ দেখা যায়, তেমনিভাবে আমাদের কর্মসূচী ক্রমশঃ আপনি দেখা দেবে। সত্যাগ্রহীদের কপালে যেন একটা সার্চলাইট বাঁধা থাকে, সেইটাই কর্মসূচীর পরবর্তী ধাপ দেখিয়ে দেয়।"

ফেব্রুয়ারীতে তিনি স্থির করলেন প্রথমে লবণ আইন অমান্য করা হবে, এবং মার্চ মাসে তাঁর ৭৮ জন শিষ্য সমভিব্যাহারে সবরমতী আশ্রম থেকে পদযাত্রা শুরু করলেন, ৬ই এপ্রিল তারিখে ডাণ্ডীতে বেআইনী ভাবে নুন তৈরী করবেন বলে।

নুনের ট্যাক্স তুলে দেওয়ার দাবীই ছিল ঐ ১১ দফার প্রথম দাবী। অন্যান্য দাবীও এমন যাতে সবগুলো মিলিয়ে সব রকম লোককে ঠাণ্ডা করা যায়, সকলেই বলে বাহবা।

নুনের ট্যাক্স রদ করা, মদ্যবর্জন আইন করা, খাজনা কমানোর দাবীতে গরীব, সাধারণ লোক ও চাষারা সন্তুষ্ট হল; উপকূল বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর সংরক্ষণ ব্যবস্থা, বিলাতী কাপড় আমদানী বন্ধ, টাকার বিনিময় হার কমানোর দাবীতে বড়লোকেরা সন্তুষ্ট হল, গোয়েন্দা বিভাগ ও অস্ত্র আইন তুলে দেওয়া এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে তরুণ স্বাধীনতাবাদীর দল সন্তুষ্ট হল, সিভিলিয়ানদের মাইনে কমানোর দাবীতে সকলেই সন্তুষ্ট হল।

এই রকম অদ্ভুত দাবীর অসম্ভাব্যতার দিকে যেন কারো নজরই পড়লো না। এসব সর্ত মানার অর্থ যে ইংরেজের বাড়ী চলে যাওয়া, এটাই সকলের আনন্দের কারণ। এমন দাবী ইংরেজ মানতে পারে না, সুতরাং স্বাধীনতার সংগ্রামই জোরদার হবে, এও হয়ত কিছু লোক ভাবছিল। আর এরই তলায় মহাত্মা আগে থেকেই রফার আলোচনার একটা ভিত গেড়ে ফেললেন।

তিনি সরকারকে বলে দিলেন, এগুলোর একটা সন্তোষজনক মীমাংসার ব্যবস্থা হলে "the Congress will heartily participate in any conference, where there is a perfect freedom of expression and demand!'

"দাবী"র সন্তোষজনক মীমাংসার ব্যবস্থা হবে এবং "demand"এর freedom থাকবে —এ হলেই কংগ্রেস প্রেমানন্দে সম্মেলনে যাবে! অর্থাৎ higher politicsএর দোহাই দিয়ে যে-কোন রকমের রফার জন্যে একটা রাউণ্ড বা অশ্বডিম্ব টেবিল বৈঠক!

স্বাধীনতা সংগ্রামের এই সব কায়দা লক্ষ্য করছিলুম এবং যখন মহাত্মাজী লবণ আইন ভঙ্গের জন্য একটা বিরাট প্রচার ব্যবস্থারূপে ডাণ্ডীতে পদযাত্রা শুরু করলেন, যখন সারা দেশ আকুল আগ্রহে প্রত্যহ সকালে সংবাদপত্রের পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করে, কবে মহাত্মা কোথায় পৌছালেন, কে কে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল, তখন "নবশক্তিতে" আমি এক প্রবন্ধ লিখলুম "শ্রীভাঁওতা।"

লিখলুম, friendly game শুরু হল, আপোষের ব্যবস্থা হবে এবং তার জন্য দূতীরূপে আসবে মালব্য-জিন্নার মতন নেতা, যারা মডারেটদের মধ্যে এক্সট্রিমিষ্ট এবং এক্সট্রিমিষ্টদের মধ্যে মডারেট। হয়েছিলও ঠিক তাই এবং দূতীরূপে এসেছিলেন জয়াকর ও সাপ্রু। তার বিবরণ পরে বলছি।

৯ই এপ্রিল মহাত্মাজী এক নির্দেশ দিলেন, গ্রামে গ্রামে বে-আইনী নুন তৈরী করতে হবে, মদের এবং বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং চালাতে হবে, সর্বত্র চরকা চালাতে হবে, বিলাতী কাপড় পোড়াতে হবে, অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে হবে, হিন্দু-মুসলমান মিলন করতে হবে, স্কুল-কলেজ ছাড়তে হবে, সরকারী চাকরী ছাড়তে হবে।—১৯২১ সালের অ-পূর্ণ স্বরাজের আন্দোলনের বোটকা গন্ধ!

একটা লড়াইয়ের জন্যে লোকে উদগ্র আগ্রহে অধীর হয়েছিল, এখন এই পচা কর্মসূচী নিয়েই তারা কাজে নেমে পড়লো। সরকারও লাঠি, গুলি, জেল প্রভৃতি সর্ববিধ নির্যাতনের বন্যায় অহিংস আন্দোলনকে ডুবিয়ে দিলে।

ঠিক এই সময়েই চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে চট্টগ্রামে স্বাধীন ভারতের এক নতুন ডিজাইনের পতাকা উড়িয়ে দিলে। এ হল এপ্রিলের শেষে। এবং এ হল যেন একটা সিগন্যাল, সর্বত্র বিপ্লবীরা চঞ্চল হয়ে উঠলো।

চট্টগ্রামের ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতার পুলিস প্রথমেই হানা দিলে সন্তোষ মিত্রের আড্ডায়, অক্রুর দত্ত লেনে, এবং সেখান থেকে তাদের কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। "স্বাধীনতার" তখন উঠে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল, সে অবস্থায় "উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ" বলে ওঁরা "ধন্য চট্টগ্রাম" শীর্ষক এক প্রকাণ্ড অগ্নিবর্ষী প্রবন্ধ লিখে কাগজে তুলে দিলেন।

এদিকে পেশোয়ারে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে গেল। কংগ্রেস-নেতাদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রবল গণবিক্ষোভ দমন করার জন্য সরকার সাঁজোয়া গাড়ী পাঠায়, এবং বিক্ষুব্ধ জনগণ তার একখানা গাড়ী আক্রমণ করে, গাড়ীর লোকজনদের বার করে দিয়ে গাড়ীটাকে পুড়িয়ে দেয়। ফলে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালিয়ে বহু লোক হতাহত করা হয়। এই সময়ে ১৮ নম্বর রয়েল গাড়োয়ালী রাইফেল এর দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের দুই প্ল্যাটুন সৈন্যকে জনতার ওপর গুলি চালাবার আদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু সেই গাড়োয়ালী সৈন্যেরা সে আদেশ অমান্য করে, এবং মুসলমান জনতার সঙ্গে ভিড়ে যায়। ফলে ২৫শে এপ্রিল থেকে ৪ঠা মে পর্যন্ত পেশোয়ারে সরকারী শাসনের চিহ্ন মাত্রও লুপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সৈন্যবাহিনীও এরোপ্লেনের সাহায্যে সহর পুনরুদ্ধার করা হয়। সমগ্র ব্যাপারটা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের সকল দাবী অগ্রাহ্য করে সরকার ঐ গাড়োয়ালী সৈন্যদের সামরিক আদালতে বিচার করে ১৭ জনকে কারাদণ্ড দেয়—৩ বছর, ১০ বছর, ১৫ বছর এবং একজনের যাবজ্জীবন।

অহিংসা ও সত্যের অবতার এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতা মহাত্মাজী কিন্তু ঐ গাড়োয়ালী সৈন্যদের এই বলে নিন্দা করেন যে, কোন সৈন্য যদি গুলি চালাবার আদেশ অমান্য করে, তাহলে তার শপথ ভঙ্গের পাতক হয়।

"যুদ্ধের" শেষে আরুইনের সঙ্গে যে "সন্ধি" হয়, তাতেও এই গাড়োয়ালী সৈন্যদের মুক্তির কথা ছিল না।

আর শ্রীপট্টভি সীতারামাইয়ার লিখিত কংগ্রেসের ইতিহাসেও এই এতবড় ঘটনার উল্লেখ নেই।

যাই হোক, এই ঘটনার পরে ৫ই মে সরকার বাহাদুর মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করলেন। কারণ হল, "যদিও মহাত্মা গান্ধী এই সব হিংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করেন, তবু তাঁর শিষ্যদের এই সব কাজের প্রতিবাদে তাঁর আওয়াজ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে, এবং বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি এদের কায়দা করতে পারছেন না।"

যাই হোক, মহাত্মার গ্রেপ্তারে আবার যথাশাস্ত্র একটা প্রবল বিক্ষোভ সারাদেশকে উদ্বেলিত করে তুললে। শোলাপুরে তার এক নতুন রূপ দেখা গেল। বোম্বাই প্রদেশের এই সহরটার ১৪০০০০ অধিবাসীর মধ্যে ৫০০০০ই হল বস্ত্রশিল্প শ্রমিক। মহাত্মার

্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে সহরটার সমগ্র শ্রমিক সাধারণ ধর্মঘট থেকে শুরু করে সহরটা দখল করে নিজেদের শাসন কায়েম করে ফেললে। এক হপ্তা এই অবস্থা চলার পর ১২ই মে সরকার মার্শাল ল' জারী করে সৈন্যদের সাহায্যে সহর পুনর্দখল করে, এবং তার পরে যথাশাস্ত্র নির্যাতনের চূড়ান্ত করে।

তারপর জুন মাসে সরকার কংগ্রেস এবং তার সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে বেআইনী ঘোষণা করে।

১৪ই জুলাই সরকারী মুখপাত্র ব্যবস্থা পরিষদে হিসাব দিলেন, "১লা এপ্রিল থেকে আজ পর্যন্ত ২৯ বার জনতার ওপর গুলি চালানো হয়েছে, এবং তাতে ১০৩ জন নিহত ও ৪২০ জন আহত হয়েছে।"

পরে ৩১ সালের মে মাসে মহাত্মাজী এক প্রবন্ধে লেখেন, "অহিংসা অক্ষুণ্ণ রেখে আমি চূড়ান্ত ব্যর্থতা বরণ করতেও প্রস্তুত, কিন্তু অনিশ্চিত সাফল্যের লোভে অহিংসা নীতি থেকে চুল পরিমাণে বিচ্যুত হতেও রাজী নই।"

আমি পার্টি ও দাদাদের প্রভাব মুক্ত বিপ্লবীর চোখে স্বাধীনতা সংগ্রামের এই সব অপূর্ব ঘটনা ও বাকচাতুরী লক্ষ্য করে যাচ্ছি, আর অবাক হয়ে ভাবছি, বিপ্লব কোথায়, কতদূরে? কংগ্রেস ও গান্ধী বেঁচে থাকতে কি তার কোন আশা আছে! মনকে প্রবোধ দিই, কৃষক-শ্রমিকদের নিজেদের সংগঠন, নিজেদের বৈপ্লবিক আদর্শ যদি কোনদিন কংগ্রেস ও গান্ধীর প্রভাব কাটিয়ে গড়ে উঠতে পারে!

ফলত গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেসের স্বাধীনতার আন্দোলন সম্পর্কে আমার যেন চোখ খুলে গেছে, আমি সকলের থেকে এক পৃথক দৃষ্টিতে তাকে দেখি, আর তার বিপ্লববিরোধী ধনিকতন্ত্রী আপোষপন্থী রূপ দেখে শিউরে উঠি। তারই ফলে জন্ম হল "শ্রীভাঁওতা" নামক বইয়ের।

কুড়ি

১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে মিলিটারী ধরনের ভলান্টিয়ারবাহিনী সংগঠনের পর সারাদেশে নানা স্থানে সেই ধরনের ভলান্টিয়ার-বাহিনী তৈরী হয়েছিল। "মেজর" সত্যগুপ্তের বি. ভি. দল এবং চট্টগ্রামের ভলান্টিয়ার-বাহিনীর কথা আগে বলেছি। তারা তখন থেকেই "কিছু করবার" গুপ্ত তোড়জোড় শুরু করেছিল। যুগান্তর দলের ছেলেরাও সর্বত্রই অধীর হয়ে উঠেছিল, "কিছু করবার" জন্যে। খাঁটী মিলিটারী প্যারেডের পর কংগ্রেসের নিরামিষ প্রোগ্রাম ছেলেদের বেখাপ্পা লাগছিল। চারিদিক থেকে ছেলেরা দাদাদের তাগিদ দিচ্ছিল, অনেকের "দড়ি ছেঁড়ার" মতন মতিগতি।

চট্টগ্রামের দল রিভলভার যোগাড় করার নানা ভাবের চেষ্টা করছিল, এবং সেজন্যে কলকাতায়ও আসতো। কলকাতার যুগান্তরের দাদাদের কাছেও টোকা মারতো, এবং অনুকূলদার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থাও করেছিল। সন্তোষ মিত্রের দলের "খোকা" (দেবেন দে) ২২ সাল থেকেই গা ঢাকা দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রামে গিয়ে ওদের

আশ্রয়ে ছিল। ওরা নাকি পাহাড়তলী অঞ্চলে এক ডাকাতি (ডাকলুট), করে অর্থসংগ্রহ করেছিল, এবং সেই ডাকাতিতে নাকি দেবেন দেও ছিল। সে তারপরে কলকাতায় পালিয়ে এসে অনুকূলদার আশ্রয়ে ছিল। অনুকূলদার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য দাদাদের সাহায্য ওদের দরকার হয়েছিল, এবং সেই সূত্রেই দাদারা জানতেন, ওরা কিছু করার তোড়জোড় করছে।

এই রকম অবস্থায় দাদারা পরামর্শ করে' স্থির করেছিলেন, কিছু না করলে আর চলে না। কিন্তু যদি কিছু করতেই হয়, তাহলে একটু নতুন কিছুও হওয়া চাই, এবং দেশের লোকের তাকলাগানোর মতনও হওয়া চাই। অহিংস সত্যাগ্রহ করে পড়ে মার খাওয়ার যে-সাধনা স্বরাজ লাভের একমাত্র উপায় বলে সারা দেশ বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছে, সে-সাধনার নিষ্ক্রিয় ক্লৈব্য যখন বিপ্লবী নওজোয়ানদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়নি, তখন সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শকে আর একবার একটু চাঙ্গা করে তোলার মতন কিছু করা, মন্দ কি। তাই তাঁরা স্থির করেছিলেন সাহেব-মারার কর্মসূচী, এক সঙ্গে যত জায়গায় পারা যায়, সাহেবদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাতে হবে। চটগ্রামের বিপ্লবীরা "অভ্যুত্থান" করলে সেটাই হবে সিগন্যাল স্বরূপ।

ঠিক হয়েছিল, ছেলেরা নিজ নিজ ঘাঁটীতে নিজস্ব প্ল্যান তৈরী করবে এবং বাছাই করা ছেলেদের দল নিয়ে তৈরী থাকবে, দাদারা চট্টগ্রামের সিগন্যাল পাওয়ার পর ঘাঁটীতে ঘাঁটীতে আদেশ এবং কিছু মালমশলা পাঠাবেন, তারপর ছেলের দল চারিদিকে আগুন দিগ্‌দিগ লাগিয়ে দেবে, দাদাদের হুকুম না পেয়ে কিছু করবে না।

একটা প্ল্যানের ছক দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। সমগ্র কর্মসূচীর গোড়া কলকাতায় মনোরঞ্জনদা (গুপ্ত) বিভিন্ন জেলার ঘাঁটীগুলোর সঙ্গে যুক্ত, কাজ শুরু করার আদেশ ও মালমশলা সরবরাহ করা তাঁর কাজ। মুন্সীগঞ্জের যে ছেলের দল ক্ষেপেছিল, প্রফুল্ল চ্যাটার্জি (জীবনের ভাই বাদল) তার অন্যতম চাঁই, মনোরঞ্জনদার সঙ্গে তার সরাসরি যোগাযোগ। তার ঘাঁটী নারায়ণগঞ্জ, সেখান থেকে একদিকে বরিশাল, আর একদিকে মৈমনসিংহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষারও ভার তার উপর। তাদের প্ল্যান হল, নারায়ণগঞ্জের ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ। তার দলে আছে জন আষ্টেক ছেলে, তার মধ্যে একজন আছেন, ১২।১৩ বছর বয়েস—মুন্সীগঞ্জের উমাচরণ সেনের নাতি, ধাধুরু,—সে বাড়ী থেকে পালিয়ে ওদের আড্ডায় গিয়ে জুটেছিল, কিছুতেই বাড়ী ফিরে যেতে চায় না—বীণা (বিনয় দত্তগুপ্ত), মনা (দ্বিজেন ব্যানার্জি), "স্বদেশী" (স্বদেশ ঘোষ প্রভৃতি। বেঁচে ফিরে আসা হবে না বলেই যেতে হবে, এই তারা স্থির করেছিল।

চট্টগ্রামের ঘটনার পর এই ছেলের দল অধীর হয়ে উঠেছে, কিন্তু কলকাতা থেকে আদেশ বা মাল আসছে না। বাদলের কাছে কিছু মাল ছিল, ছেলেরা বলে, তুমি চুপ করে বসে থাক, মালগুলো আমাদের দাও। শেষ পর্যন্ত তারা বাদলকে শাসিয়েছিল, তোমাকে খুন করে ফেলবো, যদি মাল না দাও। সে ঘাবড়ায়নি, কিন্তু সেও ছটফট করছিল। বরিশাল ঘাঁটীর খবর নিতে সে বরিশাল গেল। তার ঠিক আগের দিনই সেখানকার ঘাঁটীর ছেলেরা মিটিংয়ে বসেছে, হঠাৎ পুলিস এসে ঘিরে ধরেছে। বাদল যখন বরিশালে পৌছেছে, তখন সেখানে পুলিস এমন ব্যাপক খানাতল্লাসী ও ধরপাকড় চালিয়েছে যে, বাদলকে কেউ আশ্রয়

দিলে না। সে কোনবকমে সেখান থেকে ফিবে এসে মৈমনসিংহে যাবে বলে ঢাকায় গিয়ে সেখানেই ধরা পড়ে গেল।

চট্টগ্রামের ঘটনার পর জেলায় জেলায় পুলিস এমন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, কোথাও কানো ঘাটীই কিছু করতে পারেনি। এর মধ্যে অবশ্য কিছু মজার ক্যাও ছিল। নারায়ণ গঞ্জের ইউরোপীয়ান ক্লাবের সামনের গেটে সশস্ত্র পাহারা বাড়ানো হয়েছিল, কিন্তু কম্প উণ্ডের পিছন দিক দিয়ে চাকর বাকরদের যাতায়াতের যে একটা পথ ছিল, সেটার মুখে কানো পাহারা বসানো হয়নি। বাদলরা সেইদিক দিয়েই হানা দেওয়ার প্ল্যান করেছিল। গুরু আঁটুনী, ফস্কা গেরো!

যে লোক বাদলের কাছে আদেশ ও মাল নিয়ে গিয়েছিল, সে মালগুলো বীণার হাতে দিয়ে মৈমনসিংয়ে গিয়ে ধরা পড়ে গেল। প্ল্যান ভেস্তে যাওয়ার পর বীণারা বিক্রমপুরে উছাপুরা পোষ্ট অফিসে এক ডাকাতির চেষ্টা করে ব্যর্থ হ, এবং পরে পা ঢাকা অবস্থায় বীণা এবং স্বদেশী ধরা পড়ে। তাদের প্রথমে একচোট মার দিয়ে বাটনা বাটা করে ফেলা হয়, এবং পরে জেলে এমন অবস্থায় রাখা হয় যে, স্বদেশীর টি বি হয়, এবং তাতেই সে মারা যায়, আর বীণার অবস্থা হয় এক বৃদ্ধের মতন, চমৎকার স্বাস্থ্য, জোয়ান ছেলে, হাড্ডিসার হয়ে জেল থেকে বেরোয়। পরে ঐ ডাকাতিতে লিপ্ত থাকা সন্দেহে মাখন চ্যাটার্জিও গ্রেপ্তার ও আটক হয়েছিল, যদিও সে লিপ্ত ছিল না।

আমি এসব কথা পরে জেনেছি, কারণ আমি ২৯ সাল থেকেই দাদাদের প্রকাশ্য সমালোচনা করি, ২৯ সালে কংগ্রেসের মেম্বার না হওয়াটাও একটা শৃঙ্খলাভঙ্গের ব্যাপার, তা ছাড়া অনেক নিষিদ্ধ লোকের সঙ্গেই আমার খাতির বেশী, যেমন, উপেনদা, অমরদা, অনুকুলদা প্রভৃতি। মির্জাপুর স্ট্রীটের কাঠগোলায় অনুশীলনের ক্ষিতীশ ব্যানার্জি থাকতেন, আগে বলেছি। জুলু সেনের চেলা রঞ্জিত ব্যানার্জি, আমার জেলের সাথী, সেখানেই থাকতো, আমি সেখানেও যেতুম। তারপর প্রকাশ্য বিদ্রোহ 'নিবেদনমেবের পালা।' সুতরাং ৩০ সালের ঐ সশস্ত্র বিপ্লবের কথা তখন জানতে পারিনি।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন খবর পেলুম, রঞ্জিতের মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। দেখতে গেলুম, কাশির সঙ্গে ঝলকে ঝলকে রক্ত। তিনচারদিনের মধ্যেই খবর এল রঞ্জিত মারা গেছে। ব্যাপারটা এমন যে, বিশ্বাস করতেই পারা যায় না। নিমতলার শ্মশান ঘাটে গেলুম, দেখি অনুকূলদা, সন্তোষ মিত্র প্রভৃতি শব নিয়ে বসে আছেন। ফটো তোলার ব্যবস্থা হল। ফুল দিয়ে সাজানো খাটের চারদিক ঘিরে কোথা থেকে একে একে এমন সব নেতা এসে দাঁড়িয়ে গেলেন, যাঁদের উপস্থিতি অভাবনীয়।

আমি অনুকূলদাকে জিজ্ঞাসা করলুম, মরলে কি ছোট মানুষও বড় হয়? তিনি ভঙ্গী করে বললেন, নিশ্চয়—তুমি মলেও আমরা এমনি করে গ্যাদা ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে তোমার ফটো তুলবো। আমি বললুম, তাহলে একটা কথা বলে রাখি, মনে করে রাখবেন। তিনি বললেন, বল, নিশ্চয় মনে রাখবো। আমি বললুম, দেখবেন, যেন জোচ্চোর ব্যাটারা খবর না পায়, আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে ফটো তোলাতে না পারে। তাহলে কিন্তু আমি খাটের ওপর মোচড় দিয়ে উঠবো।

আমার প্রথম প্রশ্নে কয়েকজন একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ কথাটা শুনে সন্তোষ

মিত্র বললেন, ঠিক, ঠিক, বেশ কথাটা বলেছেন। সন্তোষ মিত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপ সেই প্রথম, তার আগে শুধু মুখচেনাচিনি মাত্র ছিল—আর সেই শেষও বটে, কারণ তার পরই চট্টগামের ব্যাপারে জেলে গিয়ে হিজলীতে পুলিসের গুলিতে তার মৃত্যু হয়।

যাই হোক, চটগ্রামের খবর কলকাতায় পৌছানোর পর শোনা গেল, টেলিগ্রাফের তার কাটা হয়েছে বলে চটগ্রামের সঙ্গে কলকাতার পুলিস-মিলিটারী সংবাদ আদান-প্রদান চলছে ফোর্ট উইলিয়মের ওয়ারলেস টেলিগ্রাফ মারফৎ। গেলাম আমার দোকানের রেডিও এক্সপার্ট জিতেনদার কাছে, ওয়ারলেস জ্যাম করা যায় না? তিনি বললেন, ফোর্ট উইলিয়মের ওয়ারলেসের পাওয়ার জানতে পারলে জ্যাম করার ব্যবস্থা করা যায়। গেলাম গোপাল ভট্টাচার্যের কাছে, ফোর্ট উইলিয়মের ওয়ারলেসের পাওয়ারের খবর জানেন কি না। তিনি বললেন, গেলেই জেনে আসা যায়। আমি বললুম, ওরা ঢুকতে দেবে কেন? তিনি বললেন, আমরা অর্থাৎ বোস ইনষ্টিটিউটের লোকেরা ফোর্ট দেখতে চাইলে ওরা অনুমতি দেবে। ঠিক হল, তিনি সে চেষ্টা করবেন। কিন্তু এ সব প্ল্যান পাকবার আগেই টেলিগ্রাফ চালু হয়ে গেল।

এদিকে আমার এক অভিনব কাজ জুটে গেল। মুন্সীগঞ্জ ন্যাশন্যাল স্কুল উঠে যাওয়ার পর হেড মাষ্টার যতীন দত্ত আবার হ্যারিসন রোডে ফুটবলের দোকানে এসে বসেছিলেন এবং সেখানে আমার যাতায়াত ছিল। তার মেজদাদা ইন্দ্রমোহন দত্তের এক বন্ধু বড়বাজারে মাড়োয়ারী-মহলে ভূষি-মালের দালালী করতেন, এবং মাঝে মাঝে ঐ দোকানে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হত। একদিন তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, বোমা বানাতে জানেন? আমিও ঠাট্টার সুরে বললুম, তা আর জানি না? কত চাই? তিনি বললেন, মশায়, এক মাড়োয়ারী ছোকরা আমায় ধরেছে, একজন বোমার এক্সপার্ট জোগাড় করে দিতে হবে। ওদের একটা ক্লাব আছে, শরীর চর্চা করে, সবই চ্যাংড়া অর্থাৎ ছেলেমানুষ, আর এ ছোকরাই তাদের লীডার। মস্ত বড় ধনী—সকলেই। শুনে বেশ মজা লাগলো, একটু লোভও হল, একটা দুষ্টবুদ্ধিও মাথায় এল। বললুম, বেশ, আলাপ করিয়ে দিন। তিনি আলাপ করিয়ে দিলেন।

হিন্দু হোষ্টেলের পিছন দিকে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের ওপর পাঁচতলা মস্ত বাড়ী, তারই উপর তলায় একখানা বেশ বড় হলের মতন ঘর। বেঁটে, ফরসা জোয়ান ছোকরা বাংলা জানে, ঘরে আলমারীতে বাংলা বইও কিছু আছে। লিলুয়াতে প্রকাণ্ড বাগানবাড়ী আছে মস্ত কম্পাউণ্ড, বাগান-পুকুরের মাঝে বাড়ী। বাড়ীতে বড় রকমের আওয়াজ হলেও বাইরের লোকের কাছ পর্যন্ত সে আওয়াজ পৌছবে না। বাড়ীর কর্তারা সেখানে কচিৎ যায়, ওরাই মাঝে মাঝে পিকনিক করতে যায়। টাকা কড়ি বা ব্যবস্থা, কোন রকমের কোন ঘাটতি হবে না। ওরা একটা বিপ্লবী দল করতে চায়, ইত্যাদি—

আমার সমগ্র বদন মণ্ডল ফেঞ্চ চাপ দাড়ি এবং অঙ্গ আগাগোড়া মোটা পিওর খদ্দর শোভিত দেখে প্রথমেই তার ভক্তি বেড়ে গেল, চমৎকার ক্যামোফ্লেজ। আমি ওকে আত্মশক্তি লাইব্রেরীতে নিয়ে এলুম এবং একগাদা "জাতীয় সাহিত্য" কেনালুম। বললুম, আইডিয়া পরিষ্কার হওয়া দরকার। মনে মনে ঠিক করলুম, ওকে আস্তে আস্তে কমিউনিজম শেখাতে হবে। হলই বা মাড়োয়ারী ব্যবসাদার বড় লোকের ছেলে, তরুণের মন তো।

প্রথম ভাঁওতা দিয়ে ফেঁসে গেলুম নিজেই। গেলুম বোস ইনষ্টিটিউটে গোপাল ভট্টাচার্যের কাছে, আমাকে বোমা তৈরির মত explosive এর শিক্ষা দিতে হবে। তিনি প্রথমে "কন্ কি" বলে একটু বিস্ময় প্রকাশ করলেন, শেষে আমার প্রয়োজনের কথা শুনে বললেন, "সতীশবাবু ভাল কেমিষ্ট, ওঁর সঙ্গে একটু ভাল করে আলাপ জমিয়ে নেন, আমি সুযোগ বুঝে কথা পেড়ে ওঁকে বলে দেবো।" আলাপ আমার ওখানকার সকলের সঙ্গে আগেই হয়েছিল, আমি রোজ যাতায়াত শুরু করলুম। গোপালবাবুর বন্দোবস্তে সতীশবাবু আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে মুখে মুখে শেখাতে শুরু করলেন, নাইট্রো-গ্লিসারিণ এবং নাইট্রো-ক্লোরিণ তৈরী ও ব্যবহারের পদ্ধতি! ওগুলো নিয়ে কাজ করতে গেলে সাধারণত লোকে কি কি ভুল করে থাকে, কি কি রকমের সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, কি কি রকমের দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তার জন্য কি কি precaution নিতে হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি—

আমি গোপাল বাবুকে সে সব কথা বলি। একদিন তিনি বললেন, "ওসব জিনিস অনেকেই জানে, একটা জিনিস ওর চেয়ে অনেক বেশী সাংঘাতিক, সেটা আজ পর্যন্ত কেউ তৈরী করেনি, করতে পারলে একটা নতুন এবং বড় ব্যাপার হয়। আমি অমুকের সঙ্গে আলাপ করেছি, তিনি expert, কিন্তু তিনি আপনার সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ করতে নারাজ, ভয়পান, হ্যাশম্যাশ এইখান পর্যন্ত একদিন পুলিস আইব নাকি? আমি বলেছি, পুলিস যতদূরই আসুক, এইখান পর্যন্ত আইব না। তিনি লিখে দিতে রাজী হয়েছেন।"

এইভাবে শেষ পর্যন্ত তিনপাতা টাইপ করা (TNT) ট্রাইনাইট্রো টোলুনের ফরমুলা, তৈরীর পদ্ধতি, Precaution প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে লেখা কাগজ সংগ্রহ করে রোমাঞ্চিত কলেবরে সারদার কাছে গেলুম। কয়েকটা typed copy করতে হবে ওটার। সারদা গেঙিয়ে গেঙিয়ে টাইপ করতে পারতো, এবং আত্মশক্তি লাইব্রেরীতে একটা টাইপরাইটারও ছিল। রবিবারে তালাবন্ধ আত্মশক্তি লাইব্রেরীতে বসে সারদা ওটার ৩ খানা কপি করে দিলে। এখন, প্রথমে একটা কপি Preserve করার বন্দোবস্ত করতে হবে। একটা ছোট covered envelope case-এ একটা কপি রেখে চাবি বন্ধ করলুম। কোথায় রাখা যায়? ভেবে চিন্তে গেলুম হ্যারিসন রোডের এরিয়ান ফ্যাক্টরী নামক ট্রাঙ্কের দোকানে। মালিক ত্রৈলোক্যবাবু বন্ধু। Envelope caseটা হাতে করে নিয়ে সেখানে বসে দুটো গল্পগাছা করে হঠাৎ উঠে পড়লুম, এবং বললুম, এটা এখানে থাক্, আমি ঘুরে এসে নিয়ে যাব। তারপর চাবিটা তাঁর হাতে দিয়ে বললুম, এটাও রাখেন, হারিয়ে যাবে, যত্ন করে রাখবেন, আমার আসতে দেরী হতে পারে। বলে সেই যে সরে পড়লুম, আর সেমুখো হলুম না।

তারপর তৈরীর ব্যবস্থা। গেলুম উত্তরপাড়ায় চৈতন্যদেবের (চট্টোপাধ্যায়—আর্টিষ্ট, দক্ষিণেশ্বর কেসের ডেটিনিউ) কাছে। তখন বোমার এক্সপার্ট ওদের নেতৃস্থানীয় হরিনারায়ণ চন্দের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ আলাপ ছিল না। চৈতন্যদেবকে ওটা দেখালুম। তিনি বললেন, আমার এখন ওদের সঙ্গে মেলামেশাও নেই, আর আমি ছবি আঁকা ছাড়া আর কিছু করি না। সুতরাং হতাশ হয়ে ফিরে এলুম।

তখন টালার পাটুবাবুর ছোটভাই প্রতাপ এক নওজোয়ান, কলেজ থেকে বেরিয়েছে, পাটুবাবুর কাছে যাতায়াত করতে করতে আমার তার সঙ্গে খাতির হয়েছে, এবং আমি তাকে বিক্রুট করার কথাও ভাবি। বিভলভার দেখিয়ে বিক্রুট করার মতন, আমি তাকে একটা কপি দেখালুম। সে দেখে-শুনে আমাকে কেমিষ্ট্রীর এক লেকচার দিয়ে ছেড়ে দিলে, আমার মতলবের ধার দিয়েও গেল না।

তল্পোর বলে চলে এসে অনেক ভেবে-চিন্তে গেলুম বরানগরে বিশু সেনের ভাই ফণী সেনের কাছে। তিনি ওভারসিয়ারী চাকরী করতেন, বিপিনদার চেলা, এবং আমার কাছে বোমার খোল এবং বোমা তৈরীর কথা তুলে সম্ভবতঃ আমাকে বিক্রুট করতে চাইতেন। তাঁকে একটা কপি দিতে, তিনি দেখে শুনে চোখ কপালে তুলে বললেন, "ও মশায়, আমি মনে করতুম আপনি পিওর গন্ধর্ব বনে গেছেন, এসব আইডিয়া ছেড়ে দিয়েছেন, আপনি এসবও করেন? —যাই হোক, তিনি কপিটা রাখলেন, বললেন, "দেখবো, কিছু করা যায় কি না।" খুশী হলুম

শেষে গেলুম অনুকূলদার কাছে,—কি জানি, হয়ত তার এমন কোথাও যোগাযোগ থাকতে পারে, যারা এ নিয়ে কিছু করতে পারে। বললুম, "একটা ভাল মাল তৈরীর ফর্মুলা এনেছি, দেখুন, যদি কিছু করতে পারেন।" তিনি সেটা নিয়ে বললেন, 'আছে, ভাল লোক আছে, তুমি পরশু খবর পাবে।" পরশু গেলুম, তিনি খুব উৎসাহভরে বললেন, 'ওহে এ একটা নতুন জিনিস, সা ঘাতিক জিনিস, তৈরী করতে পারলে একটা মস্ত কাজ হবে, ধারবে, বলেছে।" মনটা আহ্লাদে ভরে' গেল। তিনি সেটা দিয়েছিলেন এক মেডিক্যাল ষ্টুডেন্ট সীতাংশু সরকারকে।

ওদিকে আমি মশলা যোগাড়ের নাম করে মাড়োয়ারী বন্ধুর কাছে সময় কাটাই, আর পড়াশুনো আর আইডিয়া সম্বন্ধে লেকচার দিয়ে তার মনটাকে সক্রিয় রাখার চেষ্টা করি। পিলুয়ার বাগানবাড়ী সম্বন্ধে নতুন নতুন প্রশ্ন করি জল্পনা-কল্পনা করে মৌতাত করি যে বোঝে, কাজ এগোচ্ছে।

আমাদের যুগান্তর দলের দাদারা অনেকেই প্রচার করে থাকেন, চাটগাঁর দলটা তাঁদেরই দল। কথাটা ডাহা মিথ্যা। সকল দলের লোকই সব দলের পলাতকদের প্রয়োজন হলে আশ্রয় দিয়ে থাকেন, কিন্তু সাধারণত পলাতকেরা নিজেদের দল বা অন্তরঙ্গ সহযোগী দলের কাছেই প্রথমে গিয়ে থাকে। লোকনাথ বলের উত্তর পাড়ায় আগমনও সেই কথারই প্রমাণ। ২৬ সালে সূর্যসেন কলকাতায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন হরিনারায়ণ চন্দের আশ্রয় থেকে, এটাও ঐ কথারই প্রমাণ। তার আর একটা প্রমাণের কথা চন্দননগর গোঁদল পাড়ার নরেনদার (নরেন ব্যানার্জি—১৫।১৬ সালের "বড়দা") লিখিত পুস্তক "রক্ত বিপ্লবের এক অধ্যায়" থেকে তাঁরই ভাষায় শুনুন:

"চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সংক্রান্ত কতিপয় বীর সন্তানকে চন্দননগরে স্থানান্তরিত কর বিশেষ আবশ্যক বোধ হয়। বসন্ত কুমারের অফিসে বসন্ত কুমার (ব্যানার্জি—"মেজদা") ও ফরোয়ার্ড অফিসে নরেন্দ্র নাথের সহিত ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত উক্ত বিষয়ে পরামর্শ করিতে আসেন। সহরের তদানীন্তন অবস্থা বুঝিয়া চন্দননগরে আশ্রয়দান অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। সেই সময়ে বসন্ত কুমার কাশীশ্বরী পাঠশালার সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন,

এবং নবে
একজন
চন্দননগ৷
শিক্ষয়িত্রী
পল্লী মধ্যে
নইবাব প
ছিলেন।
জীবনলাল
মাসকাল।
নরা সেপে
কথা পূর্বে
থাকিলেও
রাখিবাব
পূর্বে অনন্ত
গুলী বর্ষণে
দেখা
অস্ত্রাগাব
তাহলে আ
যাই .
খবরে মনা
করতে না'
পাড়ায় নরে
যদি ওয়াচ্
তাব পর ম
নন, কিন্তু
তাঁর ব
মানকুণ্ডুতে
একটু পায়
১৫।১৬ ব
আসছেন'
লোক এস
ইত্যাদি।
২।১টা প্র
শোে
বাড়ীতে গ
জ্যাহিবাবুর

চিত স শ্লিষ্ট ছিলেন। পবামর্শ ক্রমে পরে স্থির হয়, তাঁহাব
পারিলে, এবং স্বামী স্ত্রীরূপে বাস করিবার অবস্থা থাকিে
সম্ভব। সেই পবামর্শানুসাবে শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী প্রধানা
শধর আচায স্বামী সাজিয়া চন্দননগবে আসেন। সত্যেন্দ্রকুমাব
নী দেবীব নামে এক বাসা ভাড়া কবেন। এই বাসা ভাড়া
াশ ঘোষ ২।১ বাত্রি কাশীশ্বরী পাঠশালা ভবনে অবস্থান কবিয়া
বাসায় অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, মাখন ঘোষাল
গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন সপ্তান আশ্রয় লাভ কবেন। প্রায় চাবি
নির্বিঘ্নে বাস কবেন। কোন রকমে সন্ধান পাওয়া ১৯৩০ সালেব
মিঃ টেগার্ট কর্তৃক সেই বাসা আক্রান্ত হয়। তাঁহাব আগমনেব
ত পাবা যায়, এবং বাসা ত্যাগ কবিয়া অন্যত্র সবিয়া পড়িবাব সময়
কারণে সবিয়া পড়া ঘটিয়া উঠে না তবে সাবা বাত্র পাহাবা
পলাতকেবা আক্রমণেব জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন। কিছু দিন
া ত্যাগ কবিয়াছিলেন। সেই বাসা অবরোধকালে উভয় পক্ষে
লেব দেহাবসান ঘটে এবং অপব সকলে গ্রেপ্তাব হন"
কুমাব দত্ত পলাতকদেব চন্দননগবে রাখাব ব্যবস্থায় লিপ্ত হন
এক মাস পবে। চট্টগ্রামেব দল যদি যুগান্তবদলের শাখা হত,
ননগবে তাদের ভাল আশ্রয়েব বন্দোবস্ত অবশ্যই করা হ'ত।
ার ঘটনা যেদিন ঘটলো, তাব পরেব দিনই কাগজের অসম্পূর্ণ
রতে লাগলো, সব কথা ভালো করে জানাব জন্যে মনটা ছটফট
পর্যন্ত সন্ধ্যাব সময় চন্দননগরে চলে গেলুম। গেলুম গোঁদল
দ্দেশে। কিন্তু গিয়ে সটান তাঁব বাড়ীতে ওঠা ভাল মনে হল না,
ং বাস্তায় একটু ঘুবলুম, জুট মিলেব পাশ দিয়ে গঙ্গাব ধাব পর্যন্ত।
ব এক প্রতিবেশীব কথা, নাম জ্যোতিনাথ মুখোপাধ্যায়, দলেব লোক

খবব নোব মনে কবে তাঁব বাড়ী গেলুম। তিনি বাড়ী নেই,
দাকানে আছেন, ফিরতে বেশী দেরী নেই। শুনে আমি গলিতে
ক বাড়ীব বাইরেব রোয়াকে বসলুম। একজন ছোকরা, বছর
কাথা থেকে এসে জিজ্ঞাসা কবলে, কাকে চান? কোথা থেকে
তারপব সে চলে গেল এবং একটু পবে এক এক করে কয়েকজন
প্রশ্ন শুরু কবলে, কি দবকাব? অনেকক্ষণ ধবে ঘুরছি কেন?
ক হোমরা-চোমরা ভদ্রলোক এলেন এবং আমাকে কড়াভাবে
আপনাকে থানায় যেতে হবে, চলুন।
নে আন্দাজ করে নিলুম, পাড়াটা গরম, সুতরাং হয়ত নরেনদার
গিয়ে ভালই কবেছি। বললুম, থানায় যেতে হয়, যাবো, কিন্তু
সময় হয়েছে, তখন তিনি এলে, তাঁকে সঙ্গে নিয়েই থানায়

যাবো। ভদ্রলোক বললেন, এ পাড়ার আর কেউ আপনাকে চেনে ন হল,
লোকটি নিশ্চয়ই বৃটিশ স্পাই নয়, হ'লে পাড়ার ভেতর প্রকাশ্যে তা না,
হয়ত দলের দরদী, হয়ত আমাকেই বৃটিশ-স্পাই মনে করেছে। বললুম,
নরেন ব্যানার্জিও আমাকে চেনেন।

ভদ্রলোক ছোকরাকে দিয়ে নরেনদাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি দেখে,
একটু মুখ টিপে হেসে বললেন, এ কি? আপনি? তা আমার 'ওখা' বলে
ভদ্রলোককে চুপি চুপি কি বললেন। তখন ভদ্রলোক আমাকে তাঁর
বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে, প্রথমে একচোট হাসাহাসির পর চায়ের ফরমাস লেন,
মাপ করবেন, বৃটিশ স্পাইগুলো খুব ঘোরাঘুরি শুরু করেছে, আ হেসে
ফেললেন)।

তিনি হচ্ছেন ফরাসী পুলিসের ইনস্পেক্টর করালী বাবু (পরব মাদের
বন্ধু। চা খেয়ে বেরোতেই ব্রাহ্মিবাবু এসে হাজির। আমাকে দে নিয়ে
যাবে না কি? করালী বাবু বললেন, সে সব মিটে গেছে। স্থির
করলুম ব্রাহ্মিবাবুর বাড়ী রাতে খাবো এবং থাকবো তারপর সকা। করে
বাড়ী ফিরবো।

সকালে নরেনদা নিয়ে গেলেন বসন্ত ব্যানার্জির বাড়ীতে। বিস্তৃত
বিবরণ শুনলুম।

এই ঘটনার পর ডালহাউসী স্কোয়ারে টেগার্টের গাড়ীতে (টগার্ট
ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়, এবং তার পরই ভারত ত্যাগ করে।

টেগার্টের প্রাণনাশের চেষ্টা করে অনুজা সেনগুপ্ত এবং দীনেশ ম । ছিল
রসিকদাসের চেলা, এবং দীনেশ সাতুদার (সাতকড়ি ব্যানার্জি)। বোজ
নির্দ্দিষ্ট সময়ে যেতো, ওরা দুজনে বোমা এবং বিভলভার নিয়ে াক্রমণ
করেছিল। প্রথমে গাড়ীতে বোমা মারে অনুজা, বোমাটা গাড় া ড়ীটা
ঝাঁকনি খায়, অনুজা বিভলভার নিয়ে গাড়ী আক্রমণ করে, ঠিক তখ থেকে
দীনেশের নিক্ষিপ্ত বোমা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অনুজাকেই আহত করে নুজার
পেটটাই উড়ে যায়। সে ঘুরে স্কোয়ারের রেলিং পর্যন্ত গিয়েই পড়ে তার
মৃত্যু হয়। দীনেশ দৌড়ে পালায় এবং অনেক দূর যাওয়ার পর ধরা

বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু সে জেল (, এবং
অনেকদিন পরে ধরা পড়ে। ধরাপড়ার সময় পুলিসের সঙ্গে একটা য় এবং
সে মামলায় তার ফাঁসী হয়।

যাই হোক, ডালহাউসী স্কোয়ারের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ না ণ রায়ের ডাক্তারখানা-ল্যাবরেটরী সার্চ হল, এবং সেখান থেকে পাওয়া গেল TNT তৈরীর ফরমূলা ও পদ্ধতির টাইপ করা কাগজ।

সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন ডাক্তার নারায়ণ রায়, সীতাংশু সরকার, গৌরীবাড়ী লেনের ব্রজদুলাল (শ্রীমানী?), ডাক্তার ভূপাল বসু, হিমাদ্রি (কিম্বা নীলাদ্রি?) চক্রবর্তী (নাট্যশিল্পী তিনকড়ি চক্রবর্তীর পুত্র) ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের চেলা কালীপদ ঘোষ, রসিক

দাস এবং আরো কয়েকজন। অনুকূলদার নামেও ওয়ারেণ্ট বেরুলো, তিনি গা ঢাকা দিলেন। মনোরঞ্জনদা'তো গা ঢাকা দিয়েই ছিলেন। তাঁরা পরে ধরা পড়েন।

হিমাদ্রি চক্রবর্তীর ঢালাইয়ের কারখানায় নাকি ঢালাই করা বোমার খোল পাওয়া গিয়েছিল। তিনকড়িবাবুর তদ্বিরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মামলায় শীতাংশু এবং ব্রজদুলাল রাজসাক্ষী হয় এবং সরকারী খরচে বিলেত চলে যায়। কালীপদ ঘোষ ছিলেন গোয়েন্দা-কর্তা নলিনী মজুমদারের আত্মীয়। তিনিও সরকারী খরচে বিলেত যান। বাকি সকলের দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। রসিক দাসের বোধ হয় দশ বছর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে আন্দামান যেতে হয়নি। তার বিরুদ্ধে রাজসাক্ষীর সাক্ষ্যমাত্র ছিল, তার সমর্থনে কোন স্বতন্ত্র সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল না। সুতরাং উকীলের পরামর্শ মত আপীল করেন, এবং হাইকোর্ট থেকে রসিকদাস বেকসুর খালাস হন। পরক্ষণেই তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে তিন নম্বর রেগুলেশনে গ্রেপ্তার করে, এবং তাঁকে একা পৃথক ভাবে জেলে বন্দী করে রাখা হয়।

T N T'র ফরমূলা ধরা পড়েছে, এবং যে গৌরীবাড়ীতে গোপালবাবু থাকেন, সেই গৌরীবাড়ী থেকে ব্রজদুলাল ধরা পড়েছে, সুতরাং এদিক ওদিক ঘুর ঘুর করতে লাগলো। বোস ইনষ্টিটিউটে যাওয়াও ঠিক নয়। সুতরাং ডালহাউসী স্কোয়ারের ঘটনার দিনই সন্ধ্যার পর গেলুম গৌরীবাড়ীতে গোপালবাবুর বাসায়। তিনি বললেন, এই সামনের রাস্তা দিয়ে এলেন নাকি? আমি বললুম, হ্যাঁ কেন? তিনি বললেন, রাস্তায় একগাদা স্পাই আছে। তিনি বললেন, আপনিও যা জানেন, আমিও সেইটুকুই জানি। আর কিছু জানি না। শুধু এই পাড়ার এক ছ্যামড়াকে ধরে নিয়ে গেছে, এই মাত্র জানি। বলে, তিনি আমাকে বাড়ীর পিছনের গলি দিয়ে উল্টাডাঙ্গার খাল ধারে পৌঁছে দিলেন।

যাই হোক, দাদাদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচলেও মুন্সীগঞ্জের দলের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ হয়নি। আমি থাকতুম আত্মশক্তি লাইব্রেরীতে, আর ওরা থাকতো ৪৯ নম্বর হ্যারিসন রোডে এক মেস করে। আমার সেখানে যাতায়াত তো ছিলই বরং গল্পগাছায় বেশী রাত হয়ে গেলে ওদের ওখানেই খেয়ে শুয়ে থাকতুম।

চারি দিকে ধরপাকড় আর সার্চ লেগেই ছিল। এক দিন রাত্রে ওখানে থেকে গেছি, সকালে পুলিস এসে বাড়ী ঘিরেছে—সার্চ হবে। সে বোধ হয় অক্টোবর মাস। আমাকে সেখানে দেখে এক পুরানো চেনা আই-বি অফিসার বললেন, আরে, আপনি এখানে? আপনার জন্যে যে ওরা (একদল পুলিস) আত্মশক্তি লাইব্রেরীতে গেছে! আমি বললুম, তাহলে শীঘ্র আমাকে ওখানে নিয়ে চলুন, নইলে হয়তো ওরা তালা ভেঙ্গে বসবে। তিনি বললেন, না তালা ভাঙ্গবে না, ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

সার্চ চলছে, ওদিকে চাও তৈরী হচ্ছে। আমরা চা খেলুম, অফিসারদের বলা হল চা খেতে, তাঁরা খেলেন না, শুধু সুকিয়া ষ্ট্রীটের থানার দারোগা এক কাফ চা খেলেন। তারপর আমাকে নিয়ে আত্মশক্তি লাইব্রেরীতে এসে সার্চ করে বললে, আপনাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। বুঝলুম গ্রেপ্তার হলুম। ইলিসিয়াম রোতে আই-বি অফিসে এসে দেখি ৪৯ নম্বর থেকে মাখন চ্যাটার্জি আর ধীরেন কুণ্ডুকেও নিয়ে এসেছে।

মনটা মুসড়ে গেল। 'বোড্স্ টু ফ্রিডম' বইটার অনুবাদটাকে ছাপার অনুমতি না পেয়ে "অবলম্বনে লিখিত" বলে প্রেস কপি তৈরী করে ফেলেছিলুম, প্রকাশের ব্যবস্থা আটকে

গেল বলে মনটা হায় হায় করতে লাগলো। সারাদিন interogation-এর পর যখন আমি বললুম, এক কথা ৫০ বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, আর আমি আপনার কোন কথার জবাব দোব না, torture-এর জন্যে প্রস্তুত হয়েই বললুম, তখন আমায় lock up-এ পুরলে। তারপর আর সাড়া-শব্দ নেই। শেষে ন' দিনের দিন আমাদের তিনজনকেই কিছু বচন দিয়ে ছেড়ে দিলে। আমি এসেই সরস্বতী লাইব্রেরীর মহেন্দ্র দত্তের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে একটা প্রকাশের বন্দোবস্ত করে ফেললুম। "স্বাধীনতার পথ" নামে বই বেরিয়ে গেল।

তখন মনোরঞ্জনদা, অরুণ গুহ, ভূপেন দত্ত, সবাই জেলে, রাজবন্দী হয়ে গেছেন। সরস্বতী প্রেসে এবং লাইব্রেরীতে আছেন শুধু শৈলেন গুহ রায় এবং মহেন্দ্র দত্ত। প্রেস ও লাইব্রেরীর অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে।

জীবনও জেলে গিয়েছিল, কিন্তু সে আইন-অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে। সুভাষবাবুর তো আগেই জেল হয়েছিল, এর পরে জে এম সেনগুপ্তেরও বোধ হয় ছমাস জেল হয়েছিল বি-পি সি সির Council of Action এর প্রথম ডিরেক্টর হিসাবে। তারপর একে একে হরদয়াল নাগ, অনদাদা' (চ্যাটার্জি) প্রভৃতি নেতারা এবং এ ডিরেক্টর-চেনের মধ্যেই জীবনও জেলে গিয়েছিল। কিন্তু মজা এই যে, একশ্রেণীর নেতাদের কারাদণ্ডের মেয়াদ ফুরোলে ছেড়ে দেয়, আর একশ্রেণীর নেতাদের মেয়াদ ফুরোলে অর্ডিন্যান্স অনুসারে বিনা বিচারে আটক করে। সুভাষবাবু, জীবন প্রভৃতি এই দ্বিতীয় দলের।

নুন তৈরীর হিড়িক লেগে গিয়েছিল। চারদিকে এই বে-আইনী নুন কলকাতার রাস্তায় বিক্রী করে আইন ভঙ্গও চলছিল। বয়কট এবং পিকেটিংও চলছিল। পুলিস বেপরোয়া মারও শুরু করেছিল সর্বত্র। তাদের কায়দা হল, বিশিষ্ট নেতাদের গ্রেপ্তার করা এবং অনুচরদের লাঠিপেটা করে ছত্রভঙ্গ করা। পরিস্থিতি এমনি হয়েছিল যে, এইভাবে ছেড়ে ছেড়ে গ্রেপ্তার করেও জেল ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। দমদম ক্যান্টনমেন্টের ব্যারাকগুলোকে এই সময়েই জেলে পরিণত করা হয় আইন-অমান্যকারীদের রাখার জন্যে।

মহাত্মা গান্ধী যখন প্রথমে ডাণ্ডীতে যান নুন তৈরী করতে, তখন পুলিসদল লাইন বেঁধে পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল যাতে কেউ জলের ধারে না যেতে পারে। পুলিসের গায়ে হাত দেওয়া নিষেধ, সুতরাং অহিংস সত্যাগ্রহীরা পুলিসের লাইনের সামনা-সামনি গিয়ে আটকে গেল। ফলে অবস্থা দাঁড়ালো, দুই দল পরস্পরের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে নিশ্চলভাবে। সুতরাং মহাত্মাজী অহিংসা বাঁচিয়ে পুলিসের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে ফতোয়া দিলেন, দুজন পুলিসের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে চেষ্টা করতে দোষ নেই। সেইভাবে সত্যাগ্রহীরা 'গোঁত্তা' মারার চেষ্টা করে গ্রেপ্তার হলে deadlock কাটলো।

এই ভাবে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ধরসনাতে নুন তৈরীর অভিযানে নেতৃত্ব করেছিলেন। পুলিস দল প্রথমে তাঁদের আটকালো। তারপর নেত্রী দাঁড়িয়ে আছেন দেখে তারা একখানা চেয়ার এনে তাঁকে বসতে দিলে। তিনি বসলেন। আরো কিছুক্ষণ কাটলো। পুলিসের কর্তা জিজ্ঞাসা করলো, "কতক্ষণ এই ভাবে বসে থাকবেন?" তিনি কবি, তিনি জবাব দিলেন, "Till doomsday", কাজেই তখন পুলিস তাঁকে সসম্মানে

গ্রেপ্তার করলে, এবং বাকি সত্যাগ্রহীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠিয়ে ঘাটনাবাটা করে ছেড়ে দিলে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সত্যি ইতিহাসের এই সব মালমশলা সংগ্রহ করি আর ভাবি, এগুলো একটা বই-এর আকারে চিরস্থায়ী এবং স্মরণীয় করে রাখা দরকার। একখানা পুরানো বই পেয়েছিলুম Conventional Lies. বইটা ছেঁড়া, title page ছিল না, কিন্তু Preface-টা ছিল। পাশ্চাত্য সমাজের ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা, ঐতিহ্য, লোকাচার প্রভৃতির মনোহারী মুখোশ। নির্মম ভাবে ছিঁড়ে ফেলে লেখক তাদের কদর্য স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। বইটা ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। লেখক পালিয়েছেন ফ্রান্সে। সেখানে বইটা ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, এবং ফরাসী সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছে। লেখক আবার সরে পড়েছেন।

লেখকের লেখার অনুকরণ সম্ভব হল, এবং আমাদের দেশের কাণ্ডকারখানা নিয়ে ঠিক সেরকম একখানা বই লেখার ইচ্ছে মনকে পেয়ে বসলো। খেটে খুটে লিখে খাড়া করে ফেললুম একটা বই। ছক 'শ্রী ভাঁ···'। কিন্তু বুঝলুম, কোনো প্রকাশকই এটা প্রকাশ করতে চাইবে না, হয়ত কাগজই মারা যাবে। সুতরাং প্রকাশ করতে হবে আমার নিজেকেই। কিন্তু তার কোনো উপায় নেই। একমাত্র ভরসা অমবদা (চ্যাটার্জি), তিনি জেল থেকে বেরুলে দেখা যাবে চেষ্টা করে'।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস ও তার সংশ্লিষ্ট সর্ববিধ সংস্থা বে-আইনী ঘোষিত হয়েছিল, সবত্র অফিস শীলমোহর, ফাণ্ড বাজেয়াপ্ত করা প্রভৃতি চলেছিল। তার ওপর লাঠি গুলী চলেছিল। ঢাকায় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গাও এই সময়ের এক বড় ঘটনা। তখন হাডসন সাহেব ছিলেন পুলিস-সাহেব। তিনি নাকি মুসলমানদের প্রতি বেপরোয়া পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। সে দাঙ্গার এক বিশেষ ঘটনা—ছুটি হিন্দু মেয়ে, স্কুলের ছাত্রী, দুই ভগ্নী লাঠি হাতে বিপুল সংখ্যক মুসলমান আক্রমণকারীকে সফল ভাবে রুখেছিল। পরে বোধ হয় মেয়ে ছুটিকে হিন্দুদের তরফ থেকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করা হয়েছিল।

৩০ সাল শেষ হয়েছে। বিপ্লবীদের সাহেব মারার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। টেগার্টের পলায়নের পর লোম্যান তার পদ পেয়েছেন এবং বিপ্লবীদের লক্ষ্যস্থ হয়েছেন। এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন ঢাকায় মেডিক্যাল স্কুলে লোম্যান এবং হাডসন বিপ্লবী বিনয় বোসের রিভলভারের গুলীতে আহত হল। লোম্যান মারা গেল, কিন্তু হাডসন বেঁচে গেল অনেকদিন হাসপাতালে থাকার পর। তার গুহ্যদ্বারের মধ্যে গুলী প্রবেশ করে' পাশের দিক ভেদ করে আটকে গিয়েছিল। অর্থাৎ সে আহত হয়েছিল পলায়মান অবস্থায়। আততায়ী বিনয় বোস বেমালুম সরে পড়েছিল।

কলকাতায় খবর পৌঁছালে চারিদিকে মহা উত্তেজনা, বিপ্লবী মহলে আনন্দোৎসব লেগে গিয়েছিল। বাংলার জেলের ইন্সপেক্টর-জেনারেল সিম্পসনেরও ওপর স্বদেশীরা খাপ্পা হয়েছিল, তার কড়া জেলশাসনের ব্যক্তিগত উগ্রতায়। লোম্যান-হত্যার কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন কলকাতা তোলপাড়। রাইটার্স বিল্ডিং-এ দোতালায় সিম্পসনের অফিসে তিন বিপ্লবীর সশস্ত্র আক্রমণ এবং সিম্পসন নিহত। আততায়ী বিনয় বোস, বাদল গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্ত!

সিম্পসনকে হত্যা করার পর বিনয় বোস নিজের রিভলভারের গুলীতে আত্মহত্যা করে, বাদল পটাস-সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করে এবং দীনেশগুপ্ত জীবন্ত অবস্থায় ধরা পড়ে যায়। শোনা যায়, আক্রমণের সময় ঘরে উপস্থিত আর এক সাহেবের পাৎলুন খারাপ হয়ে গিয়েছিল এবং বারান্দা থেকে এক তরুণ আমেরিকান পাদ্রী সাহেব কাণ্ড দেখে আলসে টপকে খাঁটি আমেরিকান পদ্ধতিতে rain water pipe বেয়ে রাস্তায় নেমে পালায়।

বিনয় নিজে ডানদিকের রগে গুলী করেছিল, গুলীটা মস্তিষ্ককে জখম করেছিল, কিন্তু অচৈতন্য অবস্থায় তিনদিন পর্যন্ত তার প্রাণের স্পন্দন বন্ধ হয় নি। তারপর তার মৃত্যু হয়।

মুন্সীগঞ্জের মেয়ে আশা গুপ্তা (এখন ব্যানার্জি—সম্পাদার স্ত্রী) ছিল জীবনের দলের মধ্যে এবং তার মাও ছিলেন দলের একজন দরদী বন্ধু। দীনেশ গুপ্তের সঙ্গে তাঁর আত্মীয় সম্পর্ক ছিল, এবং সেই সূত্রে তিনি জেলে দীনেশের সঙ্গে দেখা করেন এবং সংবাদ সংগ্রহ করতেন। পরে বিচারে দীনেশের মৃত্যুদণ্ড—ফাঁসী হয়ে গেল।

একুশ

বিনয় বোসেরা ছিল মেজর সত্যগুপ্তের বি, ভি, (বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স) দলভুক্ত, যাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকায়। আমাদের, অর্থাৎ মুন্সীগঞ্জের জীবন চ্যাটার্জির দলের সঙ্গে ওদের ঘনিষ্ঠতা এবং সহযোগিতা ছিল। জীবনের এক জুনিয়ার চেলা হিমাংশু বোস থাকতো মুন্সীগঞ্জে, এবং বিনয় বোস মুন্সীগঞ্জের নতুন প্রতিষ্ঠিত কলেজের ছেলেদের প্যারেড শেখাতে আসতো। এই হিমাংশু ছিল বিনয় বোসের আত্মীয় এবং তার মারফৎ বিনয় বোসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হ'ত।

বিনয় বোসের মৃত্যুর পর সৎকারের জন্য তার শবদেহ দাবী করা হল, প্রথমে গোয়েন্দা বিভাগ থেকে শবদেহ দিতে চায় নি। কিন্তু পরে পীড়াপীড়ি ও তদ্বিরের ফলে তারা এই সর্তে শবদেহ দিতে রাজী হয়েছিল যে, শ্মশান যাত্রার সময় কোন স্লোগান বা ধ্বনি দেওয়া হবে না, শুধু হরিবোল ধ্বনি দিয়ে নীরবে শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে।

শব মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর মুন্সীগঞ্জ মেস থেকে আমরাই মর্গের কাছে গিয়ে জমায়েত হয়েছিলুম। বাইরের আরো ২।৪ জনও গিয়ে জমেছিল। ব্যাপারটা নিয়ে কোনো সোরগোল হয়নি বলে কলকাতার লোক জানতেই পারেনি।

জীবনের ছেলেবেলার সহপাঠী হরিভূষণ ব্যানার্জি তখন আই বি ইনস্পেক্টর, এবং তাঁর ছোট ভাই হাবান ব্যানার্জি ছিল জীবনের একজন সিনিয়র চেলা ৪৯নং হ্যারিসন রোডের আড্ডার অধিবাসী। এই দুই ব্যানার্জির যোগাযোগেই বিনয়ের শবদেহ আমাদের হাতে দেওয়া হয়, ঐ নীরব শ্মশান যাত্রার সর্তে।

আদেশের আশায় আমরা খাট নিয়ে ফুল দিয়ে সাজিয়ে মর্গের কাছে অপেক্ষা করছিলুম। আদেশ এল, মর্গ থেকে শবদেহ বার করার জন্যে; পুলিসের পিছন পিছন আমি ঢুকে পড়লুম, মর্গের ভিতরটা দেখার জন্যে। ঘরটার মধ্যে যেন একটা হিমবাহ জমাট হয়ে আছে, আর মেঝেয় শায়িত এক গৌরবর্ণ স্বাস্থ্যবান যুবক—যেন ঘুমিয়ে রয়েছে, শুধু একদিকের রগে

একটা রক্তের দাগ। অন্যান্যের সঙ্গে ধরাধরি করে দেহটাকে বার করলুম। খাটে শোয়ানোর পর চারিদিকে ভিড় জমে উঠলো। পুলিসের নির্দেশে অবিলম্বে হরিবোল-ধ্বনি দিয়ে শব নিয়ে রওনা হতে হল। আমি ছিলুম বাহকদের অন্যতম। এসব কথা ভাবতে এবং বলতে আজও একটা রোমাঞ্চ হয়।

শবের পিছনে একটু দূরে থেকে একদল পুলিস চললো শ্মশান পর্যন্ত। তারা ফিরে এল শবের চিতারোহণের পর। একটা ছোট ভিড় শ্মশানে গিয়েছিল, তারাও ২।১ জন করে ফিরে গেল। শবের চিতায় জল দিয়ে ফিরে আসতে সন্ধ্যা দেখা দেয়। আমরা মুন্সীগঞ্জের দিকে যাচ্ছি।

হারান ব্যানার্জির বাসা থেকে ধ্বনিত হল "বন্দেমাতরম"। আমরা ফিরতি পথে রওনা হলুম। সমস্ত চাপা উত্তেজনা ফেটে পড়লো "বিনয় বোস কি জয়" ধ্বনিতে। সারাপথ প্রচণ্ড জোরে ধ্বনি চললো। গলা বসে গেছে, কিন্তু জোর কমেনি। শ্লোগানের আওয়াজে রাস্তা ভাঙছে।

আমরা স্ট্রীটের মোড়ের কাছে বিটের পাহারাওয়ালা চ্যালেঞ্জ করে বসলো, কোন হ্যায় আপলোক? কাঁহাসে আতা? কাঁহা যাতা? থানামে জানে হোগা। তার কথার ধরনে আমরা আবার জোরে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিই, আর সে আরো ঘাবড়ে যায়। শেষে আমরা ঠিক করলুম, থানায় যাওয়াটা মন্দ হবে না। চললুম তার সঙ্গে।

সুকিয়া স্ট্রীট থানায় নিয়ে গেল। সেরেস্তায় ডিউটি দিচ্ছিলেন যে এ এস আই, তিনি চোখ মুছতে মুছতে এসে বিরক্তভাবে ঘটনার বিবরণ শুনে স্বয়ং দারোগাবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনিও চোখ মুছতে মুছতে এসে আমাদের দেখে চিনলেন এবং বললেন, "কি ব্যাপার?" পাহারাওয়ালা জবাব দিলে বাবুরা রাস্তায় চলা করছিল বন্দেমাতরম বলে চেঁচাচ্ছিল।

দারোগা বললেন, "বন্দেমাতরম বোলা? সর্বনাশ কিয়া! আচ্ছা, তুম যাও।" তারপর আমাদের কাছে সব কথা শুনে বললেন, তাইতো, সেদিন আপনাদের ওখানে চা খেয়ে এলুম আজ আপনাদের একটু চা খাওয়াতে পারলে ভাল হত। আমরা দুটো হাসি-ঠাট্টা করে বিদায় নিয়ে চলে এলুম।

এখানে হারানবাবু এবং হিমাংশু সম্বন্ধে ২।১ টা উল্লেখযোগ্য কথা বলে নিতে চাই। হারানবাবু ছিলেন যেমন জোয়ান, হিমাংশু ছিল তেমনি দুর্বল, স্বাস্থ্যহীন। কিন্তু তার বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ এবং সে ছিল গুপ্তসমিতির উপযুক্ত নীরব কর্মী। হারানবাবু তাকে ভালবাসতেন, এবং বরাবরই তার ওপর গার্জেনের মতন অভিভাবকত্ব করতেন।

হারানবাবু মাঝে মাঝে হরিভূষণবাবুর সঙ্গে দেখা করতেন এবং চেষ্টা করতেন, মুন্সীগঞ্জদলের সম্বন্ধে আই বি-র মতিগতি সম্বন্ধে কিছু জানতে পারেন কি না। এ রকম চালাকির চেষ্টা বিপজ্জনক এবং তার ফলও একটু ফলেছিল।

একদিন হরিভূষণবাবু হারানবাবুকে বললেন, হিমাকে সঙ্গে নিয়ে একবার আমাদের অফিসে এসে আমার সঙ্গে দেখা করিস—কিছু কথা আছে। হারানবাবু তদনুসারে হিমাকে নিয়ে গেলেন। ২।১ টা কথাবার্তার পর হরিভূষণবাবু হিমাকে রেখে হারানবাবুকে ছেড়ে দিলেন।

অর্থাৎ হিমাকে গ্রেপ্তার করা হল। হারানবাবু ফিরে এসে অপ্রতিভভাবে ব্যাপারটা বললেন, এবং মনকে প্রবোধ দেবার জন্যে বললেন, "যাই হোক, মারধরটা হবে না। ছোড়দা সে কথা বলেই দিয়েছে।" কিন্তু কিছু মার হলই।

এক সাহেব অফিসার ওকে ধমক দিয়ে বলেছিল coward, ও জবাব দিয়েছিল, আমার মতন একটা ছেলেকে নিজেদের ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে coward বলছো—তোমরা বড় hero! সাহেব ওর পাঁজরে একটা রুলের গুঁতো মেরেছিল।

সেই ব্যথায় কিছুদিন ভোগার পর হিমাংশুর প্লুরিসি হল। ডেটিনিউ অবস্থায় প্লুরিসিতে ভুগতে ভুগতে হল থাইসিস। তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। কারমাইকেল কলেজে রেখে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু কিছু হল না। সেখানেই সে মারা গেল। এখন হারানবাবুও গ্রেপ্তার হয়ে ডেটিনিউ হয়েছেন।

এই ৩০ সালেই ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হয়। দাঙ্গার প্রকৃতি কিন্তু মোটেই সাম্প্রদায়িক নয়। মুসলমান কৃষকরা চিরকালই হিন্দু-মহাজনদের কাছে কর্জ করে এবং সুদ দেয়। অনেক সময় দেখা যায়, পুরুষানুক্রমে সে কর্জ শোধ হয় না, অথচ হয়ত আসলের চেয়ে অনেক বেশী সুদ দেওয়া হয়েছে। এই রকমের কতকগুলো কেস ওখানে ছিল। এখানে একটা ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ হয়েছিল, কৃষক সমিতিও হয়েছিল। ঋণের দায়ে জর্জরিত কৃষকেরা একদিন মরিয়া হয়ে এক হিন্দু-মহাজনের বাড়ী চড়াও হয়ে পুরোনো কাগজপত্র ফেরৎ চায়। বলে, অনেক সুদ দিয়েছি, আসলের চেয়ে অনেক বেশী দেওয়া হয়েছে, আর দেব না। এরকম অসাধারণ দাবী মিষ্টি মুখে করা যায়না—তারা গিয়েছিল সশস্ত্র হয়েই।

মহাজন স্বভাবতঃ সে দাবী প্রত্যাখ্যান করে, এবং উত্তেজিত খাতকদল বাড়ী লুঠ করতে যায়। মহাজনের ঘরে বন্দুক ছিল, তা থেকে গুলী চালিয়ে ওদের হটিয়ে দেয়। কিন্তু গুলী ফুরিয়ে গেলে ওরা আবার বাড়ী চড়াও করে, এবং বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে, কর্তাকে খুন করে লুঠ করে, ঋণের খতেন বাণ্ডিল পুড়িয়ে সেখান থেকে ক্রমে অন্যান্য মহাজনদের বাড়ীও আক্রমণ করে। এইভাবে ঐ রকম কাণ্ড চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

কলকাতার কাগজে এই খবর প্রকাশ হল সাম্প্রদায়িক রং দিয়ে। কিন্তু ক্রমে খবর আসতে লাগলো, দু'একজন মুসলমানও মহাজনী কারবার করতো, এবং তাদের বাড়ীও লুঠ হয়েছে। আবার আক্রমণকারী কৃষক খাতকদলের মধ্যে কিছু হিন্দুও আছে, এখবরও এল। এই অবস্থায় ঢাকা থেকে একদল মোল্লা মৌলবী সেখানে প্রেরিত হল, এবং কাণ্ডটা শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক আকার ধারণ করলো।

শচীন সেনগুপ্ত আত্মশক্তিতে যথাযথ খবরগুলো ছাপতে ছাপতে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছিলেন [illegible]। ম্যানেজিং ডিরেক্টর শরৎ বসু শচীন বাবুকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না লিখে অমন কথা লিখেছেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, যেমন খবর এসেছে, তা থেকে যা বুঝেছি, তাই লিখেছি। অন্য রকম লেখার নির্দেশ যদি আগে দিতেন, তাহলে হয় তা-ই লিখতুম, না হয় চাকরী ছাড়তুম।

এই কথা বলে ফিরে এসে তিনি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি দিনকার খবর সাজিয়ে লিখে দেখিয়ে দিলেন, ব্যাপারটার উৎপত্তি মহাজন খাতক বিরোধ থেকে। কিন্তু কয়েক-

দিনের মধ্যেই শচীনবাবুর চাকরী খতম হল। অজুহাত অবশ্য অন্যান্য নিরীহ ধরনের। একটা অভিযোগ আগে থেকেই জমে উঠছিল, তাঁর সম্পাদনায় কংগ্রেসের নীতি যথাযথ ভাবে অনুসৃত হচ্ছে না। আমার লেখা ছাপাটা যে তার অন্যতম প্রমাণ, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এদিকে জেল ভর্তি হয়ে গিয়েছিল সত্যাগ্রহী বন্দীতে।

সত্যাগ্রহীদের জন্যে জেলে ডিসিপ্লিন একেবারে ভেঙে পড়ছিল। তাদের দিয়ে কিছু কাজ করাবার মতলবে কর্তৃপক্ষ একদল ছেলেকে জেলের সব্জীবাগান সাফ করার কাজে লাগিয়ে দিলেন। তারা এমন সাফই করলো যে, সব্জীবাগান হয়ে গেল এক পরিষ্কার ময়দান। এইরকম কাণ্ডকারখানার পর দমদমে সত্যাগ্রহী রাখার ব্যবস্থা হল।

সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থায় কোন কড়াকড়ি ছিল না। আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে আমিও আলিপুর জেলে জীবনের সঙ্গে দেখা করে এসেছিলুম। একটা ঘরে দেখা করার ব্যবস্থা ছিল। গিয়ে দেখি এক কোণে টেবিল-চেয়ারে সুভাষবাবুর ইন্টারভিউ হচ্ছে—একজন I B অফিসারও আছে। আর এক কোণে এক কম্বল বিছিয়ে জীবন একটি দল নিয়ে বসেছে। গিয়ে বসলুম হঠাৎ পিছন থেকে কে আমার কাঁধে একটা আঙুলের চাপ দিয়েছে। ফিরে দেখি সুভাষবাবু দাঁড়িয়ে মৃদুহাস্য করছেন। আমি জীবনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললুম, আমার মাসতুতো ভাই। সুভাষবাবু মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে চলে গেলেন।

পত্রিকা পত্র-পত্রিকাদিতে বিশেষ বিশেষ লেখকদের লেখায় মাঝে মাঝে দেখা যায়, তাঁদের সঙ্গে সুভাষবাবুর প্রণয় এমন প্রগাঢ় ছিল যে, সুভাষবাবুর ভাবটা ছিল যেন, তোমা বই আর জানি না। আমার সঙ্গে যে সুভাষবাবুর তেমন প্রণয়-টনয় ছিল না, সেটা আপনারা নিশ্চয় বুঝেছেন, কিন্তু সম্পর্ক একটা ছিলই—অনেকদিন ধরে—প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ উভয় ভাবেই।

দুই বিপ্লবীদলের অ্যামেলগ্যামেশন মিটিং যে আমার ঘরেই হয়েছিল, সেটাও সুভাষবাবু জানতেন, আমি যে সেই মিলন ভেঙে যাওয়ায় দাদাদের সমালোচনা করতে আরম্ভ করেছিলুম, তাও তিনি জানতেন। তারপর আমার বদ্রোহ এবং আত্মশক্তি ও নবশক্তিতে বসুবো লেখার কথাও জানতেন।

২৯ সালে মুন্সীগঞ্জে মন্দির-সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলছে। কালীবাড়ীতে সরাসরি পূজো দেওয়ার অধিকারের দাবীতে নমঃশূদ্র সম্প্রদায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাচ্ছিল। জোর করে দল বেঁধে মন্দিরে প্রবেশ ছিল তাদের লক্ষ্য। হিন্দু মিশনের স্বামী সত্যানন্দ তাদের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন। জীবনের দলবল তাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করছিল।

এই সময়ে একদিন বেলা দশটার সময় বি পি সি সির অফিস কর্মী বরদা আমার কাছে এল, সুভাষবাবু ফোনে বলেছেন, আমাকে এখনই তাঁর বাড়ীতে দেখা করতে। কিছু গূঢ় কথা জানা যাবে মনে করে গেলুম। গিয়ে দেখি সুভাষবাবু এক গাদা কাগজপত্র নিয়ে নীরবে কাজ করছেন, আর তফাতে বসে গল্প করছেন কিরণশঙ্কর রায়, সামসুদ্দীন আহম্মদ এবং জালাল-উদ্দীন হাসেমী।

সুভাষবাবু আমাকে বসতে বলে আবার কাগজপত্রে মন দিলেন, আর ওরাও আমাকে

চিনতো, ওরাও টাইট হয়ে বসলো, আমার সঙ্গে সুভাষবাবুর কি কথা হয়, শোনার কৌতূহল নিয়ে। কিন্তু ঠিক এমনি ভাবে কেটে গেল প্রায় ঘণ্টাখানেক। ওরা যখন বুঝলে যে, ওদের সামনে সুভাষবাবু আমার সঙ্গে কথা কইবেন না, তখন নিরাশ হয়ে একে একে সরে পড়লো। তারপর সুভাষবাবু আমাকে বললেন, উনি খরচ দিলে আমি একবার মুন্সীগঞ্জে যেতে পারি কি না। আমি বললুম, পারি। উনি বললেন, জীবনবাবুর কাছ থেকে জেনে আসতে হবে, কংগ্রেস ঐ মন্দির-সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতৃত্ব নিতে পারে কি না—তাঁরা নিচ্ছেন না কেন? চিঠিতে এসব কথা লেখা তিনি ঠিক মনে করছেন না।

অনেকদিন পরে মুন্সীগঞ্জে চললুম। গিয়ে দেখি গোঁড়া হিন্দুরা জীবনের দলের ওপর খেপে চটে গেছে। একটা ক্যাম্প হয়েছে, সেখানে সত্যানন্দ এবং তাঁর দোসর এক ব্রহ্মচারী থাকে এবং জীবন, বাদল, সুরেন মজুমদার প্রভৃতিও থাকে। কালী মন্দিরের দালানের থামের সঙ্গে বেড়া বেঁধে দেওয়া হয়েছে, মন্দিরের সামনের চালায় পুলিস এবং মন্দিরের রক্ষাকর্তাদের লোক পাহারা দেবে। আমি যাওয়ার পর একদিন স্থির হল কয়েকশো নমঃশূদ্র ভলান্টিয়ার প্রোসেসন করে মন্দিরপ্রবেশ করবে যাবে।

জীবনের সঙ্গে কথাবার্তা হল। তার মত হচ্ছে, হিন্দুদের সমাজ সংস্কারের এ আন্দোলনে কংগ্রেসের যোগ দেওয়া ঠিক হবে না, কারণ কংগ্রেস যেহেতু হিন্দু মুসলমানের রাজনৈতিক সংস্থা, অতএব গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায় তাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচারের অনেক বেশী সুযোগ পাবে।

যাই হোক, আমি থাকতে থাকতেই ভিক্ষু উত্তমাকে নিয়ে (বর্মা কংগ্রেস নেতা) ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত মুন্সীগঞ্জ এলেন, ওঁরা নারায়ণগঞ্জে নানাস্থানে বক্তৃতা করবেন এবং সেইদিন বিকালেই রওনা হবেন।

আগের দিন সত্যাগ্রহ সম্পর্কে এক প্রকাণ্ড জনসভা হয়ে গেছে। উত্তমাকে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে সেরকম আর একটা সভা করা সম্ভব হবে না বলে স্থির হল, মহিলাসমিতি এক সভা করে তাঁকে অভ্যর্থনা করবে। তার জন্যে এক ভাষণ লিখতে হবে। মেয়েরা ভূপেনবাবুকে বললে, আপনি গুছিয়ে লিখে দিন। তিনি বললেন, নারানবাবু এখানকার কথা সব জানেন, উনিই লিখুন। সুতরাং আমাকেই লিখতে হল। উত্তমা ছিলেন বর্মার বিপ্লবীদের একজন নেতা।

বিকালে ওঁদের সঙ্গেই আমিও নারায়ণগঞ্জে এলুম এবং পরদিন কলকাতায় চলে এসে সুভাষবাবুর কাছে রিপোর্ট দিলুম। এবারও কথা হল একা একা। ব্যাপারটা এমন নয় যে, আর কেউ জানলে কোন দোষ হতে পারে। মনে হল, সুভাষবাবু আমার সঙ্গে একা-একা কথা বলার একটা Show করলেন, যেন দাদাদের একটু leg-pulling. ভেবে বেশ মজা লাগলো।

যাই হোক, সত্যাগ্রহীদের "জেলখাটার" আর এক নমুনা দেখা গেল দমদম জেলে। শুনেছিলুম, সেখানের ব্যবস্থা ও অবস্থা এমন ঢিলে যে, বাইরের লোক নিঃসাড়ে ভিতরে যেতে এবং বেরিয়ে আসতে পারে। একদিন গেলুম দেখতে।

বাইরের বড় গেটে পুলিস-পাহারা আছে বটে, কিন্তু গেট থাকে খোলা এবং দলে দলে লোক যায় আসে। রোজই ভদ্রলোকের interview থাকে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অফিস

পর্যন্ত সহজেই যাওয়া যায়—গেলুম। কিন্তু অফিসে না ঢুকে পাশের জেলের বন্দীশালার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালুম। সে গেটেও একজন শান্ত্রী আছে যার ডিউটী মনে হল শুধু ঐখানে হাজির থাকা কারণ গেট খোলাই আছে, এবং এক আধজন লোক, সত্যাগ্রহী বন্দী, ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে অফিসে যাচ্ছে বা অফিস থেকে ভিতরে ঢুকছে, শান্ত্রী চুপ করে খাড়াই আছে।

একটু দাঁড়াতেই দেখি, ভিতর থেকে রোহিণী (মুসা ও মুন্সী [illegible]) গেটে আসছে। সে আমাকে দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ে "আরে [illegible] এসেছ" বলে আমাকে ধরে সটান নিয়ে চললো ভিতরে। সম্ভবত শান্ত্রী মনে করল নতুন আমদানি।

ভিতরে গিয়ে খানিক ঘুরে দেখলুম। বিরাট বিরাট ঘর, না গুদাম, না ব্যারাক। তার মধ্যে খাওয়া চলছে, কয়েক সারিতে একসঙ্গে খেতে বসেছে শ-খানেক লোক, যেন মহোৎসব চলছে। আমি অস্বস্তি বোধ করছি, কি করব ভেবে না পেয়ে। রোহিণী বললে, কিছু ভাবনেই [illegible] এসেছ, এখন না খেয়ে যাবে কী [illegible]। সুতরাং তার সঙ্গে খেতে বসে গেলুম।

তারপর সে গেট পর্যন্ত এসে শান্ত্রীকে শুনিয়ে বললে -যাও, অমরদা অফিসে আছেন। ব্যাপারটা হচ্ছে, অমরদা (চট্টোপাধ্যায়) সারাদিন অফিসে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে আড্ডা মারেন, যখন খুশী আসেন যান, আর [illegible] বন্দীরাও যখন প্রয়োজন হয়, তাঁদের কাছে অবাধে যাতায়াত করে। কাজেই শান্ত্রীর সন্দেহ হবার কোন মাথাব্যথা নেই—গেট খুলে দাঁড়িয়ে থাকাই তার ডিউটী। তা ছাড়া সত্যাগ্রহী জেল থেকে পালায় না এটাও সবলোকে জানতো। সুতরাং আমি বেরিয়ে [illegible]।

এই রকম জেল খাটার সার্টিফিকেটের জোরে [illegible] দেশ বিদেশের কর্মী আজও কংগ্রেসী সরকারের বড় বড় চাকরী করছেন। কিন্তু অন্য বিষয়ের [illegible] আছে। অমরদা যখন এই দমদম জেলে বন্দী, তখনই কয়েকদিনের মধ্যে মেনিনজাইটিস রোগে অমরদার মেজ ছেলে দেবু মারা যায়—উনিশ কুড়ি বছরের জোয়ান ছেলে—ছাত্র। দেখবার জন্যে কয়েকদিনের ছুটি চেয়ে অমরদা দরখাস্ত করেছিলেন, কিন্তু ছুটি হওয়ার আগেই সব শেষ হয়ে যায়। আমি সে সময়ে উত্তরপাড়ায় তার বাড়ীতে গেলুম এবং শব সংকারও করেছিলুম।

এদিকে জেলে গান্ধীমহলে আর এক ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গিয়েছিল। মহাত্মার গ্রেপ্তারের পর লবণ আইন অমান্যের সঙ্গে বিলাতী বয়কট এবং পিকেটিংও চলছিল। আগে একচোট লাঠি পেটা করা, তারপর গ্রেপ্তার ও জেল, এই ছিল সরকারী ব্যবস্থা। নিরুপায় অসন্তুষ্ট জনগণ স্বেচ্ছায় বয়কট সমর্থন করছিল। জেল ভরে যাবার চেয়ে বেশী লোক জেলে যায় পিকেটিং করে।

একদিকে এই বয়কটের ফলে ভারতের বিলাতী বণিক সম্প্রদায়ও, বম্বের টাইমস অফ ইণ্ডিয়া পর্যন্ত, ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের ভিত্তিতে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার সুপারিশ করতে আরম্ভ করেছিল, আর একদিকে বিপ্লবীদের সাম্প্রদায়িক হিড়িকে সরকারও মনে মনে অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছিল। সুতরাং সরকার মহাত্মার সাহায্য সংগ্রহের মতলব আঁটলে।

আগষ্ট মাসের শেষ দিকে হঠাৎ মডারেট নেতা তেজবাহাদুর সাপ্রু এবং কংগ্রেস নেতা জয়াকর জেলে মহাত্মার সঙ্গে দেখা করে জানালেন, কংগ্রেস যদি আইন অমান্য ছেড়ে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে যোগ দিতে চায়, বড়লাট তাঁদের মুক্তি দিতে রাজী আছেন।

কংগ্রেস নেতা জয়াকর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ না দিয়ে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্যে হঠাৎ থেমে পড়েছিলেন দেখে বেশ মনে হয়, ব্যাপারটা ষড়যন্ত্র। সাইমন কমিশন বয়কট করার সঙ্গে নেহেরু কমিটির রিপোর্টে যেমন তাদের আলগোছে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কংগ্রেস ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস পেলেই সন্তুষ্ট হবে, তেমনি মহাত্মা জেলে থাকলে কংগ্রেস নেতা জয়াকর রাউণ্ডটেবল কনফারেন্সে যোগ দেবেন, এটা আগে থেকেই ঠিক করা হয়েছিল।

যাই হোক, একচোটে আইন অমান্য ছেড়ে দিয়ে রাউণ্ডটেবল কনফারেন্সে যাওয়া তো যায় না। তাই দেখা গেল মহাত্মাজী তাঁর ১১ দফা থেকে ৪টে রেখে বাকি ৭টা ছেড়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং তখনকার মত দূতীয়ালী ব্যর্থ হল। ওদিকে '৩১ সালের জানুয়ারীতে প্রথম রাউণ্ডটেবল কনফারেন্স শুরু হয়ে গেল।

সে দূতীয়ালীর ভিতরের কথা কখনো প্রকাশ হয়নি, হবে না। কিন্তু মহাত্মার ৭ দফা দাবী ছেড়ে দেওয়ার কারণ আন্দাজ করা যেতে পারে, যা আন্দাজের সঙ্গে পরবর্তী ঘটনার মিল আছে।

সম্ভবতঃ সাপ্রু জয়াকর মহাত্মাকে বুঝিয়েছিলেন, আপনি ইংরেজের বর্তমান প্রস্তাবের সুযোগ নিয়ে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে যাবার জন্যে একটু উদারতা দেখিয়ে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করলে আগামী শাসন সংস্কারে '২০ সালের মতন কংগ্রেসের কোন দাবীর কোন পাওয়া যাবে না।

মহাত্মা একটু নরম হলেন, এবং তাঁর বগলের তলা দিয়ে ৭ দফা গড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্বতন্ত্র আবেদন নিতে রাজী হতে পারবেন না। সুতরাং দ্বিতীয়বার দূতীয়ালী শুরু হল। মহাত্মা বললেন, আবার রাজী হতে হলে একলা আমার ভরসা হয় না, ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে আমার পরামর্শ করা দরকার।

দেখা গেল, বিভিন্ন জেল থেকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নেতাদের মহাত্মার সঙ্গে এক জেলে একত্র করা হল। শেষ পর্যন্ত মহাত্মা চিৎ হয়ে রাজী হলেন, একটি মাত্র দফা রেখে বাকি তিনটি দফাও ছেড়ে দেওয়া হল। স্থির হল, সরকারের হৃদয়ের পরিবর্তনের প্রমাণস্বরূপ অহিংস রাজনৈতিক বন্দীদের ছেড়ে দিলে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে।

কিন্তু এতেও সরকার আগে বন্দীদের মুক্তি দিতে রাজী হল না, তারা চায় একেবারে নাকে খৎ। আগে আন্দোলন প্রত্যাহার করতে হবে। সুতরাং সব দূতীয়ালী পণ্ডশ্রম হল। রাউণ্ডটেবল কনফারেন্স হয়ে গেল। লড়াই চালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

ঘর পোড়ানো, দোকান লুঠ, ফসল নষ্ট করা প্রভৃতি নিত্য নূতন সরকারী অত্যাচারের খবর কাগজে বেরুতে লাগলো। সরকার প্রেস অর্ডিন্যান্স জারী করে কাগজগুলোকে জব্দ করার ব্যবস্থা করলে অনেক কাগজ বন্ধ রাখা হল। Cyclostyle-এ ছেপে সংবাদ প্রচার

হতে লাগলো। সরকার Cyclostyle ধরতে আরম্ভ করলে। যারা Secrecy-র নিন্দায় পঞ্চমুখ ছিল, সেই গান্ধীপন্থী সত্যাগ্রহীরাও Cyclostyle-এর আশ্রয় নিলেন। আর একদিকে বিপ্লবীদের কর্মপ্রচেষ্টাও বেড়ে চললো।

সুতরাং প্রথম রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের ফেরতা সাপ্রু-জয়াকর আর একবার মহাত্মার সঙ্গে সলাপরামর্শ করলেন। তারপরই দেখা গেল, সরকার মহাত্মাকে মুক্তি দিলেন। আর মুক্তি পেয়েই মহাত্মা ছুটলেন আরউইনের সঙ্গে দেখা করতে। আরো দেখা গেল, সাক্ষাতের পরই দুই বন্ধুতে মিল হয়ে গেছে এবং যে একটিমাত্র সর্ত বাকি ছিল - বন্দীমুক্তি—মহাত্মা সে দাবীটিও ছেড়ে দিয়ে আগেই আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন।

বন্দীমুক্তি সরকার শুরু করলেন, গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে ৩১ সালের মার্চ মাসের গোড়ায়। সে বন্দীমুক্তিও হল শুধু আইন অমান্য বন্দীদের মুক্তি। বিনা বিচারে আটক ডেটিনিউরা, হিংসামূলক কাজের চার্জ নেই যে মীরাট মামলার আসামীদের ওপর, তারা, পেশোয়ারে দণ্ডিত গাড়োয়ালী সৈন্যদল, সব বাদ দিয়ে বন্দীমুক্তি।

এই প্যাক্টকে armistice বা যুদ্ধ বিরতি বলে চালানো হল, এবং তাড়াতাড়ি করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশন করে এই প্যাক্টকে পাশ করিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হল এক অভিনব মাহাত্মিক কৌশলে। ওয়ার্কিং কমিটিকে দিয়ে এক হিটলারী ফতোয়া দেওয়া হল, কংগ্রেসের ডেলিগেটদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনকে নির্বাচিত করতে হবে আইন অমান্য আন্দোলনের মুক্ত বন্দীদের মধ্য থেকে। তাদের ভোটের জোরেই কংগ্রেসে প্যাক্ট ratified হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা এইভাবে করে রাখা হল।

কানে কান চুনা দিয়ে ঢাকার জন্যে মহাত্মার ভক্তেরা ঢাক পেটাতে শুরু করলেন, গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট একটা বিরাট জয়, কারণ বড়লাট কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে। কে, এম, মুন্সী তাঁর বইয়ে লিখলেন (I follow the Mahatma)—এ চুক্তি ভারতের ইতিহাসে বহু শতাব্দীর মধ্যে সর্ববৃহৎ ঘটনা।

ওদিকে ৫ই মার্চের লণ্ডনের "টাইমস" লিখলে, আর কোন ভাইসরয়ের ভাগ্যে এই চুক্তির মতন বিরাট বিজয় ঘটেনি।

মহাত্মাজী বাণী দিলেন, তাঁর লক্ষ্য যে স্বরাজ, সে স্বরাজের সংবিধানে সুশৃঙ্খল আত্মশাসন প্রতিফলিত হবে, যে সংবিধান ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জন করবে না।

কিন্তু জনমত ছিল বহুলাংশে প্যাক্টের বিরুদ্ধে। তরুণ নওজোয়ান, কমরেড দল তো মহাত্মার ওপর বেশ খাপ্পাই হয়ে উঠেছিল। এমন কি, কংগ্রেসের অনেক নেতাও এ প্যাক্ট সহজে হজম করতে পারেনি। জহরলাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তাঁর মনটা মুসড়ে গিয়েছিল, এরই জন্যে কি দেশের লোক একটা বছর ধরে এমন বীরের মতন লড়ে এসেছে? কিন্তু তিনি মহাত্মার বিরুদ্ধাচরণ করাটা ব্যক্তিগত "হাম্বড়াই" মনে করে চেপে গিয়েছিলেন। সুভাষবাবুও মনেপ্রাণে প্যাক্ট সমর্থন করতে পারেন নি, কিন্তু কংগ্রেসে এক বামপন্থী সুরের বিবৃতি প্রচার করেই তিনিও ক্ষান্ত হয়েছিলেন। হোমরুসার, যমুনাদাস মেট কংগ্রেসে মহাত্মার বিরুদ্ধে লড়েছিলেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত প্যাক্ট সর্বসম্মতিক্রমেই পাশ হয়ে গেল। শতকরা ৫০ জন সোনা ডেলিগেট ছাড়া এর আরও দুটো কারণ ছিল। প্রথমত, জহরলালের পরামর্শে মহাত্মাজী

প্যাক্ট ratification এর প্রস্তাবের সঙ্গে নতুন করে ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের দাবী জুড়ে দিয়েছিল। আর দ্বিতীয়তঃ সরকারী বে-চাল।

ঠিক কংগ্রেসের আগেই ভগৎসিং, রাজগুরু প্রভৃতির ফাঁসী দিয়ে সরকার তরুণদের আরো খেপিয়ে দিল, যাতে তারা মহাত্মার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং মহাত্মার ধ্বংস সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু তরুণ দল ঐ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের দাবীর সঙ্গে মহাত্মাকে আঁকড়ে ধরলে, প্যাক্ট পাশ হয়ে গেল।

কিন্তু মহাত্মা ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের দাবীর সঙ্গে একটা "adjustment"-এর ফাঁকও রেখে দিতে ভোলেন নি, এবং পাছে সেটা নিয়ে কেউ হৈ চৈ বাধায়, তার জন্যে Subjects Committee-তে খুব জোর দিয়েই বললেন, "I shall get you Swaraj, I promise it" সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজের একটা অস্পষ্ট অথচ শ্রুতিমধুর ব্যাখ্যা শোনালেন, "Equal partnership"।

সুতরাং মহাত্মাকে আবার একটা Chance দেওয়ার ব্যবস্থা হল আর তরুণদের ওপর থেকে কমিউনিষ্ট আদর্শের প্রভাব নষ্ট করার জন্য এবং সোসিয়ালিষ্ট আদর্শের, নরমপন্থী ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট বা বিলাতের লেবার পার্টির আদর্শের, আমদানি করে কংগ্রেস সোসিয়ালিজমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এ বিষয়ে অগ্রণী হলেন জহরলাল। জনগণের মৌলিক অধিকার এবং জাতীয় অর্থনৈতিক কার্যসূচী সম্বন্ধে করাচী কংগ্রেসের প্রস্তাবে ঐ সোসিয়ালিজমের আদর্শ পাওয়া যায়। শ্রমের অধিকার, শ্রমিকদের অধিকারের সম্প্রসারণ, জমি স্বত্বাধিকার প্রভৃতির কথা ছিল। প্রস্তাবটা সম্বন্ধে, কে, এম, মুন্সী তাঁর পরোক্ত বইয়ে লিখেছেন, "এতে ধনিকরা বঞ্চিত হবে, অথচ মার্কসবাদীরা সন্তুষ্ট হবে না। মহাত্মা প্রথমে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জহরলালের মুখ চেয়ে চেয়ে দিয়েছিলেন।"

এই থেকেই সোসিয়ালিজমের বাহার ভালবাসা আরম্ভ হয়েছে,— ৩১ সাল থেকে ৬৫ সাল পর্যন্ত 'ভদ্রে কেন এক কথা' চলছে। আর জহরলাল পরম নিষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদীদের আজ পর্যন্ত সেই গান্ধীবাদকে "সোসিয়ালিষ্ট" বেশে বিভূষিত ক'রে দেশময় বিতোষ প্রকাশ করে আসছে।

যাই হোক, সেবার সরকার যে শান্তির দোহাই দিয়ে কংগ্রেসের আগেই ভগৎসিংকে ফাঁসী দিয়ে, সে কাদি ঘায়ে নুন ছিটে দিতেও তারা কসুর করলে না, নুনের ট্যাক্স বজায় রেখে করাচী কংগ্রেসের বাইরে একটা কৃষ্ণ-পতাকাসহ বিক্ষোভ মিছিলও দেখা গিয়েছিল। জনগণের যুযুৎসু মনোভাব শান্ত হয়নি। প্যাক্ট সই হওয়ার তিন হপ্তার মধ্যে কানপুরে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হল এবং গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী সে দাঙ্গায় নিহত হলেন।

নানাস্থানে যুব সম্মেলন ও ছাত্রসম্মেলন থেকে চুক্তি-বিরোধী প্রস্তাবও পাশ হতে লাগলো, এবং মহাত্মা যখন রাউণ্ডটেবল কনফারেন্সে যাওয়ার জন্যে বম্বে থেকে জাহাজে উঠছেন তখনও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছিল।

এই বিলাতযাত্রার আগে আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। গুজরাটের কায়রা (?) জেলায় অজন্মা হওয়ার ফলে কৃষকেরা জমির খাজনা দিতে পারেনি, এবং সরকার তাদের জমি নিলাম করতে শুরু করেছিল। মহাত্মাজী চুপ করে থাকতে পারেন না, সুতরাং তিনি দাবী করলেন, অবিলম্বে একটা "Impertial Tribunal" গঠন করে'

বন্দীদের অবস্থা ও সরকারী কারাগার সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করতে হবে, না হলে তিনি রাউণ্ডটেবল কনফারেন্সে যোগ দিতে যাবেন না।

লোকের মন তার দিকে আকৃষ্ট হল। গভর্ণমেণ্ট একজন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুসন্ধানের আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাজী তাঁকেই Impartial Tribunal বলে মেনে নিয়ে চট করে জাহাজে চড়ে বসলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জাহাজও ছাড়লো। তাঁর আগেই তাঁর ছাগলটাকে জাহাজে তোলা হয়েছিল।

এই যুদ্ধের হুঙ্কার, যুদ্ধ এবং সন্ধি সম্বন্ধে শ্রীভ... থেকে 'বস্তু উদ্ধার' দিচ্ছি, তা থেকেই আপনারা এগুলোর স্বরূপ এবং এদের মনোভাব উপলব্ধি করতে পারবেন।

(লাহোরে পূর্ণস্বরাজের হুঙ্কার)—এক গুরুঠাকুর শিষ্য বাড়ি গিয়েছেন। শিষ্য গুরুদেবের পায়ের কাছে একটি আধুলি রেখে প্রণাম করলে। আধুলি দেখে গুরুঠাকুর চটে লাল। বললেন, "এক প্রণামী আমি গ্রহণ করি না, এক্ষণ না তুই ষোল আনা প্রণামী দিবি।" শিষ্য কাঁচুমাচু করে অনেক দুঃখের কথা কেঁদে গুরুদেবের অনেক সাধ্যসাধনা করে বিফলমনোরথ হলে, শেষে কোমর বেঁধে রুদ্রমূর্তি ধরে হুঙ্কার দিয়ে বললে, "চরণ দিবি কিনা বল? নইলে আজ তোর গুরুগিরির দফা রফা করবো।" ভাবগতিক দেখে গুরুদেব ধাতস্থ হলেন।

(যুদ্ধ ও সন্ধি—১)—রামচরণ গাঁয়ের মোড়ল। গাঁশুদ্ধ চাষারা তার কথায় উঠে বসে। কারণ এককালে আদালতে সাক্ষী দিয়ে সে বেশ দু'পয়সা রোজগার করেছে, এখন বুড়ো বয়সে তারই উপস্বত্ব থেকে বসে খাওয়া চলে, আর সুকর্মেও মতি হয়েছে।

গাঁয়ে অজন্মা হল, চাষারা জমিদারের কিস্তি দিতে পারলে না। পেয়াদা-বরকন্দাজ এসে আগে ভয় দেখালে, শেষে গালাগালি শুরু করলে। নায়েববাবু মোড়লকে ডেকে পাঠালেন। মোড়ল জোড়হাতে নায়েবের দরবারে হাজির হল। নায়েববাবু স্বয়ং পা থেকে জুতো খুলে মোড়লকে তক্তা করে ছেড়ে দিলেন।

মোড়ল বললে, "বামুনের জুতো, এ তো আমার বাবার ভাগ্যি।" নায়েব তার ঘাড় ধরে এক ধাক্কায় ঘরের বার করে বলে দিলেন, "তিন দিনের মধ্যে যদি সব খাজনা আদায় না হয়, তাহলে তো-শালার ভিটেয় ঘুঘু চরাবো।"

মোড়ল একছুটে গাঁয়ে এসে হাজির। চাষারা চারিদিক থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো।

মোড়ল একটু হাঁফ ছেড়ে নিয়ে বললে, "ওঃ—প্রথমে সে একচোট কী জুতোজুতি। তারপর নায়েববাবু যখন দেখলে, মোড়লের পো সোজাপাত্র নয়, তখন আপোষের কথা পাড়লে। তোরা সব খাজনাটা আগে দিয়ে দে, তারপর আমি জমিদারবাবুর কাছে দরখাস্ত লিখে দোব, আর স্বয়ং নায়েববাবু সুপারিশ করবে। বেচারী মাইনের চাকর বই তো নয়! খাজনা আদায় না হলে, তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে যে!"

(যুদ্ধ ও সন্ধি—২)—পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ এক জাহাজে চলেছেন। জাহাজে একটা লোক সমুদ্রের রুদ্রমূর্তি দেখে ভয়ে চীৎকার শুরু করেছে, কেউ তাকে শান্ত করতে পারছে না। শেষে একজন নাবিক বিরক্ত হয়ে বললে, "ওকে আমার কাছে দাও, আমি ঠাণ্ডা করছি।"

এই বলে সে লোকটার কোমরে একটা কাছি বেঁধে একেবারে ঝপাৎ করে ফেলে দিলে সমুদ্রের জলে। জলে পড়ে' লোণাজলের নাকানি-চোবানি খেয়ে তার চাৎকার পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে গেল। তখন তাকে জল থেকে তুলে নেওয়া হল। জাহাজে উঠে সে মনে করলে "বাপরে!—বাঁচলুম।"

* * *

কাউকে একটা দুঃখ ভোলাতে হলে তার ঘাড়ে আর একটা বড় দুঃখ চাপাতে হয়। তারপর সেই দ্বিতীয় দুঃখটা ঘুচিয়ে দিলেই সে মনে করে, বাপরে! বাঁচলুম! তখন আর তার প্রথম দুঃখটার কথা মনে থাকে না।

স্বরাজের অভাবের দুঃখে যদি কেউ আইন অমান্য করে, তার মাথা ভেঙে, ঘর জ্বালিয়ে, ফসল নষ্ট ক'রে, তাকে জেলে দিয়ে নাস্তানাবুদ করে দাও। তারপর সেইটে বন্ধ করে রফা করো, লোকে হাফ ছেড়ে বাঁচবে, পূর্ণ স্বরাজ্য, আইন অমান্য, দুই-ই ধামাচাপা পড়বে।

এই হল পূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামের রাউণ্ড-টেবল-কনফারেন্সে পর্যবসানের ইতিহাস পরবর্তী ইতিহাস আরো মনোহারী।

বাইশ

উত্তরপাড়ার মানিক ব্যানার্জি। (পরে বন্দ্যোপাধ্যায়—হিন্দুমুসলমান-দাঙ্গায় শান্তি প্রচারের সময় পার্কসার্কাসে শচীন মিত্র সহ নিহত) আত্মশক্তি লাইব্রেরীতে আসতো। সে তখন কলেজে পড়তো (৩০ সাল)। আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে রুশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব, এবং তার নীতি-কর্মসূচী প্রভৃতির তুলনা করে' আমি আলোচনা করতুম, মানিক ছিল আমার উৎসাহী সমর্থক। তখন আমাদের দেশে রুশ-বিরোধী অপপ্রচার চলে প্রচুর, রুশিয়ার সংবাদপত্র আসে না, পাশ্চাত্য লেখকদের কিছু কিছু বই আসে, যার মধ্যে প্রচলিত অপপ্রচারের বিরোধী কিছু কিছু কথা পাওয়া যেত—যেমন ওয়েব-দম্পতির বই, মরিস হিণ্ডাসের বই, জেলদা কোটসের লেখা প্রভৃতি। তা থেকে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য কথা উদ্ধৃত করে' মাঝে মাঝে "মডার্ণ রিভিউ" কিছু লিখতো। আমরা সেই সব লেখা প্রাণপণে খুঁজে পড়তুম।

একদিন সে লণ্ডনের "ইকনমিষ্ট" পত্রিকার এক স্পেশাল সাপ্লিমেণ্ট এনে হাজির। সেটাতে রুশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছরের অদ্ভুত সাফল্যের রিপোর্ট বেরিয়েছিল। ধনবাদী দুনিয়ার অর্থনীতিবিদ পণ্ডিতেরা যে পরিকল্পনাকে অসম্ভব কল্পনা বলে বিদ্রূপ করেছিলেন, তাঁরা একটু গম্ভীর হয়ে গেছেন। সাফল্যের আংশিক স্বীকৃতির সঙ্গে তাঁরা নতুন ধরনের অপপ্রচার শুরু করেছেন, ষ্টেলিন কেমন করে রুশ জনগণকে আধপেটা খাইয়ে চাবকে খাটাচ্ছে! ধনবাদী দুনিয়ায় তখন অবশ্য ২৯-৩৪ সালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট চলছে।

যাই হোক, করাচী কংগ্রেসের আগে অমরদা (চ্যাটার্জি) জেল থেকে মুক্ত হয়ে

এসেছেন। তিনি কংগ্রেসে যাবেন, আমার মনটা ছটফট করতে লাগলো এই বিশিষ্ট কংগ্রেস দেখার জন্যে, তাঁকে বললুম। তার মায়া হল, তিনি আমাকে সঙ্গে নিলেন।

ফেরার পথে সুক্কুর বাঁধ দেখলুম, সুবিস্তীর্ণ সিন্ধু নদের শুষ্ক গর্ভের ওপর বিরাট নির্মাণ কার্য চলছে। একজন বাঙ্গালী ওভারসিয়ারের অতিথি হলুম। ভদ্রলোকের কথাবার্তা অদ্ভুত দো-আঁশলা হয়ে গেছে। খচ্চরের পিঠে বস্তা চাপিয়ে সারি দিয়ে মালবহন চলছে সিন্ধুগর্ভের ভিতর দিয়ে। ভদ্রলোক বললেন, চালু পথের বাইরে অনেক জায়গায় চোরাবালি আছে, সেখানে গিয়ে পড়লে মানুষ হতে হবে, একবার "দো গোলাহা মাটীর ভিতরে ধসে গেল," বাঁচবার উপায় নেই।

তিনিই আমাদের গাড়ী করে নিয়ে গেলেন মহেঞ্জোদাড়ো দেখতে।

তারপর গেলুম "সাধ-বেলা" দেখতে। সিন্ধুর-বিশাল গর্ভের মধ্যে স্বল্প-পরিসর জলধারার পাশে এক ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষকুঞ্জ শোভিত পাহাড়, বেশ উঁচু। তখন বোধ হয় চৈত্রমাস। বর্ষায় যখন সিন্ধুর বিশাল ও প্রবল জলস্রোত এক সমুদ্রের আকার ধারণ করে, তখনও "সাধবেলা" তার মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। শিখ সাধুদের আশ্রম। এক মোহন্ত মহারাজ কিছু লোক লস্কর নিয়ে সেখানে বাস করেন, আর মাঝে মাঝে ২।১ জন উটকো শিখ সাধু সেখানে অতিথি হন। অমরদা পলাতক অবস্থায় কিছুদিন জটাজুটধারী শিখ সাধুবেশ ধারণ করে ভারত পরিক্রমা করেছিলেন এবং সেই অবস্থায় কিছুদিন সেখানে ছিলেন। বৃদ্ধ মোহন্ত মহারাজ তাঁকে ভালবেসে সেখানে থেকে যেতে বলেছিলেন, কিন্তু অমরদা হঠাৎ একদিন সরে পড়েছিলেন, এবং কিছু দিন পরে পুলিশও সেখানে গিয়েছিল তাঁর সন্ধানে।

আমরা যখন গিয়েছিলুম, তখন বৃদ্ধ মোহন্ত মহারাজ মারা গেছেন, তাঁর শিষ্য গদী পেয়েছেন। আশ্রমের বিরাট দেবোত্তর সম্পত্তি এবং নগদ আয় আছে, শিখ রাজারা এবং বড়লোকেরা ভকত্। মহারাজ অমরদার বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বেশ দেখে আগে চিনতে পারেন নি। পরে একা একা কিছু কথাবার্তার পর পরিচয় দিতে তিনি চিনতে পারলেন, এবং একঠোঙ্গা পেস্তা কিসমিস প্রসাদ দিলেন। অমরদাও কিছু নগদ প্রণামী দিয়েছিলেন।

তারপর যাওয়া হল লাহোরে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের অতিথি হয়ে। সেখানে ট্রিবিউনের সম্পাদক বিখ্যাত সাংবাদিক বৃদ্ধ কালীনাথ রায় এসে অমরদার সঙ্গে দেখা করলেন এবং অমরদা তাঁর কাছে আমাকে পরিচিত করে দিলেন, ভবিষ্যতে পরিচয়টা কোন কাজে লাগতে পারে। তারপর সেখান থেকে, দিল্লী, আগ্রা, মথুরা বৃন্দাবন ঘুরে কলকাতায় ফিরে আসা হল।

তখন আমার মনটা নেচেছে, কোন প্রকারে রুশিয়ায় যাওয়া যায় কিনা। করাচীতে সেই চেষ্টায় কাজ শুরু হয়েছিল। পেশোয়ারের কংগ্রেস নেতা ডাক্তার চারু ঘোষ অমরদার সঙ্গে দেখা করতে এলে অমরদা আমার পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি আমার রাশিয়ায় যাওয়ার কোন বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন কিনা, পেশোয়ারী ব্যবসায়ীদের সাহায্যে, যারা মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা করে। চারুবাবু বললেন, পুস্তু ভাষায় ভাল কথাবার্তা বলার মতন শিক্ষা থাকলে তিনি চেষ্টা করতে পারেন। তারপর তিনি কলকাতার বড় বাজারের পেশোয়ারী কংগ্রেসনেতা মোল্লা জান মহম্মদকে ডাকিয়ে এনে আমার সঙ্গে

পরিচয় করিয়ে দিলেন। ব্যবস্থা হল. কলকাতায় ফেরার পর আমি মোল্লা জান মহম্মদের কাছে পুস্তু ভাষা শিখবো. এবং তারপর পেশোয়ারে চারুবাবুর কাছে যাবো। ব্যবস্থা হয়েছিল ভালই, কিন্তু ব্যাপারটা বেশীদূর এগোতে পারেনি। কেন, তা পরে বোঝা যাবে। ঐ সব ব্যবস্থার পর চিন্তাধারা একটু নতুন পথ ধরেছিল। একখানা ঘরের প্রয়োজন বোধ করছিলুম. যেখানে আমার গোপন আস্তানা হবে, বইপত্র থাকবে, লেখাপড়া করবো। প্রকাশ্য আস্তানা অবশ্য আত্মশক্তি লাইব্রেরীতেই থাকবে। মাড়োয়ারী বন্ধুকে বললুম। সে বললে, ভবানী দত্ত লেনে বসন্তলাল মুরারকাদের বাড়ীর নীচে একটা ছোট "বাইরের ঘর" আছে। সেটা প্রায় খালিই থাকে, সেটা হয়ত ওরা ভাড়া দিতে পারে। আমি কোনে জিজ্ঞাসা করে বলবো।

বসন্তবাবু অমরদাকে খাতির করেন, জানতুম। আমি অমরদাকে বললুম। তিনি বসন্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে বসন্তবাবু বললেন, হাঁ, ঘরটা দেওয়া যায়, কিন্তু আমাদের এক মাড়োয়ারী ছোকরা এক বাঙালী বাবুর জন্যে ঘরটা চেয়েছে, আর ঐ ছোকরার একটা দল আছে, তাদের "বোম্ব-ওয়ারিকা খেয়াল" আছে। তাই আমি "না" বলে দিয়েছি।

অমরদা বললেন, সে সব ভয় কিছু নেই, আমার জানা লোক। তখন বসন্তবাবু রাজী হলেন, ঘরটা পেলুম। মাড়োয়ারী বন্ধুকে কাণ্ডটা বললুম। সে কখনো সে ঘরে আসার চেষ্টা করেনি। বস্তুত, আমি ছ'মাসের ওপর সে ঘরে ছিলুম, কেউ জানতেই পারেনি, কাউকেই বলিনি বা আসতে দিইনি। শুধু অমরদাই মাঝে মাঝে আসতেন, আর জানতেন শুধু আত্মশক্তির মোটাদা আর মানিক। মানিককে বলে রেখেছিলুম, আমি যদি জেলে যাই, তাহলে সে যেন আমার সংগৃহীত বইয়ের গাদা থেকে ভাল বইগুলো বেছে নিয়ে নিজের হেপাজতে রাখে, যাতে ফিরে এসে পাই। ভাল বই আবার অনেক জোগাড় করেছিলুম, তার মধ্যে ভারতের উত্তরপূর্ব সীমান্তের মিলিটারী ও অন্যান্য অভিযান সংক্রান্ত বই এবং ম্যাপও অনেকগুলো ছিল।

সেখানে বসেই "শ্রীভাঁওতা" সম্পূর্ণ করি। আর রজনীকান্ত দাসের বইগুলো এবং "মডার্ণ রিভিউ" থেকে পণ্ডিত লক্ষ্মীনন্দরমের প্রবন্ধগুলো নিয়ে একখানা বড় বই লিখতে শুরু করি "ভারতীয় শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন।" দেশ ও বিদেশে ভারতীয় শ্রমিক সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথার ঠাসা বই। ১৯২০ সাল পর্যন্ত লিখে বেশ বড়সড় প্রথম খণ্ড শেষ করে, তার পরের অবস্থায় নতুন ফ্যাক্টরী লেজিসলেশন, কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা প্রভৃতি লেখা হয়েছিল।

তারপর অমরদারই অর্থানুকূল্যে আত্মশক্তি লাইব্রেরী থেকে নিজের নামেই "শ্রীভাঁওতা" প্রকাশ করলুম। ভয় ছিল, বইটা বাজেয়াপ্ত হবে, কিন্তু হল না। কিন্তু বাঙলার রাজনৈতিক সাহিত্যজগতে একটা রীতিমত সোরগোল উঠেছিল। এখানে বলা দরকার, "ভাঁওতা" কথাটার সাহিত্যে প্রচলনের গৌরব বা অগৌরব আমারই। আমার "শ্রীভাঁওতা" প্রকাশের আগে কথাটা সাহিত্যে প্রবেশাধিকার পায়নি, কারণ ওটা নেহাৎ পশ্চিমবঙ্গের একচেটিয়া একটা slang শব্দ। আজ শব্দটা রাজনৈতিক সাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করেছে।

Advance কাগজে বিজন সেনের লেখা এক কলম রিভিউ বেরিয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল, (**Advance 9. 8. 31**)

"The author is well known as a writer of political articles...... The main burden of his thesis is that, political India has now fallen a victim to some false theories.. ...and blurred the vision of the people. Moreover, a set of men, some selfish and some misguided, installed themselves on their shoulders, and are leading, or more appropriately misleading, them from one futility to another...

"The charges are downright, and in setting them forth the author has shown so much analytic skill, courage of conviction, and wealth of language, that even those who will honestly differ, will not be able to withhold word of admiration for them...

"The infusion of so much heat into the discussions is, we believe, partly due to his great sincerity of convictions and partly to the consciousness of the fact that a desperate disease calls for a desperate remedy. We welcome the book as an extremely thought provoking political production."

"অমৃতবাজার পত্রিকাতে রিভিউ বেরিয়েছিল ভাল, কিন্তু ছোট। আর প্রবর্তক এক লম্বা রিভিউ করে শুধু আপশোষ করেছে, এসব সর্বনেশে আইডিয়া দেশে কোথা থেকে এল! ইত্যাদি—

এর পর সেনগুপ্ত এবং অমরদা বেরুলেন পূর্ববঙ্গ সফরে। সঙ্গে চললেন ডক্টর কানাই গাঙ্গুলী, শচীন মিত্র, হাওড়ার কৃষ্ণ চ্যাটার্জী। আমি সঙ্গ নিলুম কিছু "নিবেদনমিতি বনাম এক" এবং কিছু "শ্রীভাংগতা" সঙ্গে নিয়ে। সিলেট, শিলচর, করিমগঞ্জ, কুমিল্লা এবং খুলনা ও বাগেরহাটে কিছু বই ছড়িয়ে এলুম।

শ্রীহট্টে জমিদার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর অতিথি। কুমিল্লায় হরদয়াল নাগের বাড়ীতে একদিন থেকে, এক মিটিং করে অখিল দত্তের বাড়ীতে একদিন নিমন্ত্রণ খেয়ে (অমরদা ও আমি) শ্রীহট্টে এসেছিলুম। সেখানে সেনগুপ্ত প্রভৃতির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল। অমরদা ও আমি একদিন বেশী থেকে গেলুম। এক মিটিংও হল।

জমিদারের অতিথি, দুপুরে খেতে বসেছি তিনজন একসঙ্গে, মাঝে অমরদা, এক পাশে ব্রজেন্দ্র বাবু, এক পাশে আমি। প্রকাণ্ড থালার চারিদিকে গোটা কুড়ি বাটি সাজানো নানা রকমের কাণ্ড, ষোড়শোপচার কোথায় লাগে।

কথাবার্তা চলছে রাজনীতি নিয়ে—ব্রজেন্দ্র বাবু ইউনিভারস্যাল ফ্রাঞ্চাইজমেন্টের কথা তুলেছেন। মনে রাখা দরকার, সেটা '৩১ সাল, '৩৫ সালের শাসনবিধিতে প্রদেশে ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছিল শতকরা মাত্র ১৩ জনের। সুতরাং অনেকেরই মাথায় তখন সার্বজনীন ভোটের অধিকারটা ছিল একটা সুখস্বপ্নের মতন। আমার মাথায় তখন কমিউনিজম গিজগিজ করছে, আর মুখটাও হয়ে গেছে বেশ খানিক ঢিলে। আমি সটান বলে বসেছি, ওটাতো বড় লোকদের জুয়াচুরী মশায়।

বলেই অপ্রতিভ হয়ে গেছি—ষোড়শোপচারে অতিথি সেবার সঙ্গে জমিদার গঙ্গস্বামীর কথার এই জবাব। কিন্তু সামলে নেওয়ার জন্যে তেড়ে ফুঁড়ে বলে চললুম, ক্যাপিট্যালিষ্ট রাজ্যে জনগণের সার্বজনীন ভোটের মোট ফল, ইলেকশনের সময় কোন বড়লোক ক'টা ছলে বলে কত ভোট সংগ্রহ করতে পারে, তারই কম্পিটিশন। ব্রজেন্দ্র বাবুও আমার বাণী শুনে অপ্রতিভ হয়েছিলেন, তিনি আমতা আমতা করে বললেন, তা বটে, তা যা বলেছেন, ঠিকই।

যাই হোক, সেখান থেকে গেলুম শিবচরে, এবং অতিথি হলুম সতীন্দ্র সেনের। (কংগ্রেস নেতা)। তারপর ফরিদপুরে শ্রীশ দত্তের বাড়ী হয়ে, আগাউবা থেকে চাঁদপুরে যেয়ে এসে ষ্টিমারে এলুম একেবারে খুলনায় এবং কংগ্রেস নেতা উকীল নগেন সেনের অতিথি হলুম। দমদম জেলের যে স্থপারিন্টেণ্ডেন্টের কথা আগে বলেছি তিনি ইতমধ্যে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং খুলনাতেই তার স্বগৃহে এসে বসেছেন। তার বাড়ী গিয়ে অমরদা আমার সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। এক এক কপি এই তাকে উপহার দিলুম। বই দিচ্ছিলুম, গান্ধীংগুদের বাদ দিয়ে। বাগেরহাটে গিয়েও কয়েক ঘণ্টা থেকে এক কর্মীদলের আড্ডায় বই দিয়ে এসেছিলুম। পরে তাদেরই একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বহরমপুর বন্দিশালায় ৩৭ সালে

সফরের দলটার মধ্যে সেনগুপ্ত, শচীন মিত্র আর কৃষ্ণ চ্যাটার্জী গান্ধী কংগ্রেসওয়ালা—অমরদা কংগ্রেস লীডার বটে কিন্তু বিপ্লবী চরিত্রও তার অটুট ছিল, আর রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের প্রতিও তাঁর দরদী মনোভাব ছিল। ডক্টর কানাই গাঙ্গুলী কথাবার্তায় এবং বক্তৃতায় সোসিয়্যালিজম কমিউনিজম বলতেন। আর আমি নিজেকে কমিউনিষ্ট মনে করতে শুরু করেছি। একদিন কানাই গাঙ্গুলীকে যাচাই করবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি যে ভাষায় সোসিয়্যালিজম-কমিউনিজমের কথা বলেন, সেগুলো স্পষ্ট করে বলশেভিকদের প্রলেটারিয়ান রেভোলিউশন, ডিক্টেটরশিপ অফ দি প্রোলেটারিয়েট মানেন? বুর্জোয়াদের নিরস্ত্র করা এবং ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া মানেন?

তিনি গাঁইগুঁই করে যা বললেন, তাতে ধরা পড়ে গেলেন যে, তিনি বলশেভিক বিরোধী সোসিয়্যালিষ্ট। কিছু বাণী দিয়ে ছেড়ে দিলুম। তিনি পরে অমরদার কাছে অনুযোগ করে বলেছিলেন, ভূপেন বাবু এ সব radical idea কোথায় পেলেন? অমরদা হাসতে হাসতে কথাটা আমার কাছে বলেছিলেন। "ও বলতে চায়, আমার চলার মতিগতি এমন হল কি করে?"

যাই হোক, ফিরে এসে "ভারতীয় শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন" বইটা ছাপবার কথা অমরদার সঙ্গে আলোচনা হল। নভেম্বর মাসে (ঠিক মনে নেই) বহরমপুরে প্রাদেশিক কনফারেন্সের ব্যবস্থা হচ্ছিল। ঠিক হল, কিছু হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে সেখানে নিয়ে গিয়ে বিলি করতে হবে, তাতে বইটার বিজ্ঞাপনের সঙ্গে advance booking এর ব্যবস্থার কথা থাকবে। বিজ্ঞাপনের খসড়া লেখা হল।

এমন সময় একদিন হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। "শ্রীকৃষ্ণগীতা" সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় নামক এক তরুণ সাংবাদিক তখন Advance কাগজে চাকরী করে, এবং Editor বলে তার নামই ছাপা হয়—জেল

এডিটর—কোন কারণে এডিটরের জেল হলে সে জেলে যাবে। বাবু দেশ প্রেমিক মালিকদের খেল।

কাগজের অফিসে অফিসে সবকারী প্রেস নোট এসেছে, তার মধ্যে খবর "শ্রীভাঁওতা" proscribed. শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় সংবাদ জানা মাত্র ছুটে এসেছে আত্মশক্তি লাইব্রেরীতে খবর দিতে। আমি খবর পেয়ে বইগুলি সরাবার বন্দোবস্ত করে ফেললুম। বাণ্ডিলবাঁধা বইগুলো সরালুম এবং একশ কপি বই লাইব্রেরীর সেলফেই সাজানো থাকলো। বাকি তখন অনেক।

পুলিশ সার্চ করতে আসবেই, এর কুড়ি কপি বই পেলে পেলে পরম পুলকিত হবে, আর বেশী খোঁজাখুঁজি করে আমাকে বিব্রত করবে না। ঠিক তাই। পরদিনই সার্চ হল, এবং একুশ কপি বই পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল। একবার জিজ্ঞাসা করলো আর বই কি হল? আমি বললুম, সব বিক্রী হয়ে গেছে। দপ্তরীর ঠিকানা নিয়ে সেখানে গিয়েছিল, কিন্তু সেখানে বই পায়নি। ল্যাঠা চুকে গেছে।

পরে '৩০ সালে বহরমপুর বন্দিশালায় টাঙ্গাইলের কিরণ ঘোষের (detenu, কমিউনিষ্ট) মুখে শুনেছিলুম, ওরা মোক্তারের কাছ থেকে এক পয়সা এক টাকা দিয়ে বইটা কিনে নিয়ে গিয়ে চার-পাঁচ টাকায় পর্যন্ত বিক্রী করতো।

সাধারণত বই প্রকাশের পরই Proscribed হয়, "শ্রীভাঁওতার" বেলায় দেরী হল কেন? আন্দাজে একটা কারণ খুঁজে নিলুম। সাধারণত বই হাতে পেলে লোকে গোড়াটা এবং শেষটা আগে দেখে নেয়। বিশেষত বইগুলো যাদের দেখাই যাদের চাকরী, তাদের ও কাজটায় আনন্দ থাকে না, তবে তার যতটা পারে সর্টকাট করে। সম্ভবতঃ I. B. বা C. I. D. অফিসারের হাতে কাজটা পড়েছিল, তিনি গোড়াটা এবং শেষটা একটু দেখেই বুঝে নিয়েছিলেন, এটা একটা ব্যঙ্গ-কৌতুক বা ফাজলামি মাত্র। তার কারণ হচ্ছে, প্রথম অধ্যায় সৃষ্টি একটা ভাঁওতা। তাতে লেখা হয়েছিল :

"সৃষ্টির পূর্বে যখন কোথাও কিছু ছিল না, বেদের ভাষার যখন অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল, তখন একদিন স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা হঠাৎ ফট করে আপনি গজিয়ে উঠলেন।...

"সেই নিরবিচ্ছিন্ন, নিবিড়, নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে পড়ে গিয়ে একা একা তিনি বড় ফাঁপরে পড়লেন। কাজেই অনেক ভেবে চিন্তে শেষে প্রকাণ্ড এক ভাঁওতা ঝাড়লেন।

"দেখতে দেখতে অন্ধকারের মধ্যে ক্ষিত্যপতেজমরুদ্ব্যোম গজিয়ে উঠলো। ক্রমে গ্রহ উপগ্রহ, নদ-নদী, পাহাড়, জঙ্গল, মৎস্য-কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি সবই ফটফট করে গজালো। তারপর যেদিন মানুষ গজালো, সেইদিন থেকে ব্রহ্মাবুড়োর মাতব্বরীতে ঘুণ ধরলো।

"ভোজ্যের আগেই উদর গজানোতে, সে গহ্বর পূর্ণ করার জন্য যখন সকলে হাঁ করে ব্রহ্মা বুড়োকেই গিলতে উদ্যত হল, তখন ঘাবড়ে গিয়ে ব্রহ্মা বললেন,—বৎসগণ, স্থিরোভব। আমার গায়ে আর কতটুকুই বা হাড়-মাস, তোমাদের এতগুলি ফাঁড়তো এতে ভরবে না। তা আমি এর উপায় করে দিচ্ছি।

"এই বলে তিনি তাড়াতাড়ি কতকগুলো নখ, দাঁত, হুল, লেজ, কন্‌ট্রাক্ট, ইলেকশান তৈরী করে ভিড়ের মধ্যে ফেলে দিয়ে বললেন, এই সব অস্ত্রশস্ত্র তোমাদের দিলুম, তোমরা যে যার পার পরস্পরের মুণ্ডপাত করে ক্ষুন্নিবৃত্তি কর।

"ব্রহ্মার ভাঁওতা বুঝতে পেরে মানুষও সেই সর্বশক্তিমান শ্রীভাঁওতার সাধনা আরম্ভ করলে। জানোয়ারগুলো সোজাসুজি যে যাকে পারে, ধরে খায়। কিন্তু মানুষ মানুষকে খায় বটে, কিন্তু শ্রীভাঁওতার কৃপায় যে খায় সে-ই টের পায়; যাকে খায়, তার হজম হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত হুঁসই থাকে না।"···

তারপর দ্বিতীয় অধ্যায়—অবতার।

"ভাঁওতায় যিনি যত বড় ওস্তাদ, তিনি তত বড় অবতার, বা আধুনিক ভাষায় লীডার।

"মানুষের মধ্যে প্রথম অবতার যিনি তখনো আড়ে দীর্ঘে মানুষের পুরো অবয়ব পান নি, তিনি ভাঁওতা মেরে বলিরাজাকে পাতালে পাঠালেন।

"পরশুরাম একটু কাটখোট্টা ধরনের ছিলেন, কাজেই ভাঁওতাবাজী তিনি একটু কম জানতেন। তাই মানুষ আজ তাঁর কথা ভুলেই মেরে দিয়েছে।

"রামচন্দ্র রামমাণিক্য হলেই মানাতেন ভাল—ভাঁওতায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন না। কিন্তু ভাঁওতার মহিমা তাঁর হাতে ক্ষুণ্ণ হয় নি। কৈকেয়ীর ভাঁওতায় দশরথ এবং রাবণের ভাঁওতায় রামচন্দ্র না ভুললে রামচন্দ্রকে আজ কে চিনতো?···

"শ্রীকৃষ্ণের ভাঁওতাবাজীর কথা লিখতে গিয়ে মানুষ কত বড় বড় শাস্ত্রই না লিখে ফেলেছে! তাঁর সব চেয়ে বড় ভাঁওতা কুরুক্ষেত্রে মটর-ড্রাইভারি। অর্জ্জুনের পাশে নিরস্ত্র বসে বসে সারা লড়াইটায় তাকে উত্তেজিত করলেন, ক্লৈব্য পরিহার কর! হত্যার পাপ তোমার নয়, কারণ কে কাকে হত্যা করে? তুমি যাকে হত্যা করবে, আমি তাকে আগে থেকেই মেরে রেখেছি। স্বরাজ ভোগের কামনায় নয়, পরন্তু দুষ্টের দমনের জন্য, ভারতে ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য যোগস্থ হয়ে, মায়া-মমতা শূন্য হয়ে শত্রু নিধন কর, যুদ্ধ কর!

"শ্রীকৃষ্ণের পর বুদ্ধদেবের অহিংসার ভাঁওতা। আজ পর্যন্ত কোটি কোটি লোক সে ভাঁওতার চক্রে পড়ে নাকানি চোবানি খাচ্ছে।

"তারপর কলির আমল। এইবার ঘোড়সওয়ার সব কচুকাটা করবে!

চতুর্থ অধ্যায়—ধর্ম। তাতে রুশবিরোধী প্রচলিত অপপ্রচারের জবাবে লেখা হয়েছে,

"এই ধর্মপ্রপীড়িত দুনিয়াটার মধ্যে জনসাধারণের স্বাধীনতা আর সুখ-সুবিধার প্রতিষ্ঠায় যারা অগ্রণী, সেই রুশিয়া সম্প্রতি ধর্মের বিলোপ সাধনের দায়ে ধর্মধ্বজীদের দরবারে অভিযুক্ত হয়েছে। কিন্তু···গত ১৯৩০ সালের ২৫ জানুয়ারীর বিলাতী Forward পত্রে এ বিষয়ে লেখা হয়েছে,—

"The Church of the Tsarist regime was a slave Church in bondage to the now universally admitted corrupt wealthy ruling powers who in Russia formed the state...The Church was left

entirely free to deal with important questions such as whether the raising of two or three fingers should be the sign of the cross; whether the priest should be ordained by a Bishop laying his hands on his head or not, whether oil should be used or not, and whether or not the priest should be forced to shave off their beard In exchange for these holy privileges there were certain duties and obligations. The Metropolitan or the chief leader of the Church had to live near and in close touch with the Grand princes, and he had to give them support in all their wars against all their enemies. The Church leaders had to take their side in suppressing civil disorders and in allaying discontent among the serfs and lower orders." (বামপন্থী ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট লেবার পার্টির কাগজ)।

"সরলার্থ :—ঘণ্টার বাঁটের দৈর্ঘ্য কতখানি হওয়া উচিত, বা কোন দিকে মুখ করে' আঁচানো দরকার, আত্মার সদগতির জন্য এই সব গুরুতর বিষয়ে পাঁতি দেওয়া সম্বন্ধে পুরুতরা স্বাধীন। তবে এই স্বাধীনতার বিনিময়ে বড় পুরুতঠাকুর কয়েকটা ছোটখাটো ব্যাপারে বাধ্য থাকবেন। যথা—তিনি রাজপ্রাসাদের কাছেই বাস করবেন, সকলপ্রকার যুদ্ধব্যাপারে সম্রাটকে সমর্থন করবেন এবং অন্তর্বিদ্রোহ বা ছোটলোকদের অসন্তোষ দমনে তাকে সাহায্য করবেন (এবং প্রত্যহ তাঁদের সাতগুষ্টির জয়কামনা করবেন)।

"১৯১৪ সালে রুশিয়ার চার্চের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল নগদ প্রায় ২৫ কোটি টাকা। চার্চের কর্মচারী বা পুরুতদের হাতে নগদ টাকা ছিল প্রায় সওয়া বারো কোটি। এ ছাড়া দেবোত্তরের পরিমাণ ছিল ৫৬ লক্ষ একর বা দেড় কোটি বিঘার উপর জমি। তার খাজনা আদায় হত তিন কোটি টাকারও বেশী।

'বিপ্লবের পর এই সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে' জনসাধারণের হিতার্থে ব্যয় করা হচ্ছে। কাজেই চীৎকার করছে পুরুতের দল এবং 'সম্পত্তিহারা' কয়েকজন ধনী।

"ঘুষ দিয়ে ধর্ম পোষা রুশিয়া ছেড়ে দিয়েছে। এখন সেখানে যার যা ইচ্ছে সে সেই রকম বিশ্বাস বা ধর্ম আচরণ করতে পারে।…"

যাই হোক, শ্রীভাঁওতা বন্ধ হওয়ার পর আরো বেশী সতর্ক হয়ে চলছিলুম গ্রেপ্তার ও বন্ধনদশার আশঙ্কায়। অবশেষে সত্যিই একদিন পালে বাঘ পড়ল—নভেম্বরে একদিন হঠাৎ গ্রেপ্তার হয়ে detenu হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে ঢুকলুম এবং অনেক ঘাটের জল খেয়ে মুক্ত হয়ে কলকাতায় ফিরলুম '৩৭ সালের শেষে।

এই ছ'বছরে জেল, বন্দিশালা, অন্তরীণের অপূর্ব বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমান্তরালে বাইরে চলছিল অপূর্ব বিচিত্র রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, '৩৫ সালের শাসন সংস্কার, প্রদেশে কংগ্রেসী শাসন এবং গণআন্দোলনের মধ্যে কমিউনিষ্ট মতাদর্শের প্রসার। বিপ্লবান্দোলনের ধারা বইতে শুরু করলো এক নতুন খাতে।

তেইশ

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর [illegible] পলাতকদের ধরবার জন্যে পুলিস যে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল, তারই সঙ্গে চলেছিল চট্টগ্রাম থেকে মিলিটারী বাহিনীর গ্রামাঞ্চলে রুটমার্চ। তারা এক একটা গ্রামে যায়, এক একটা স্কুলে ঢুকে শিক্ষকদের সটান ঠেঙাতে শুরু করে, জোর করে লোকের বাড়ী ঢুকে ছাগল-মুরগী কেড়ে এনে খায়. এমনি করে গ্রামের পর গ্রামে চলে রুটমার্চ। তখন গবর্ণর অ্যাণ্ডারসনের রাজত্ব, আয়ার্ল্যাণ্ডে সিনফিন দমনের (Black and Tan) সন্ত্রাসবাদী শাসনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি বাংলায় এসেছেন। আজও লোকে অ্যাণ্ডারসনী শাসন বলে' সরকারী সন্ত্রাসবাদী শাসনের নামোল্লেখ করে' থাকে।

সুতরাং বিপ্লবীদের সাহেব মারার প্রোগ্রামও এগিয়ে চলেছিল সমান্তরালভাবে। হুগলী বিদ্যামন্দিরের কংগ্রেসকর্মী সিরাজুল হক (হামিদুল হকের ভাই) ৩২ সালে কলকাতায় পটুয়াটোলা লেনে এক সাবানের কারখানা খুলে বসেছিল এবং ডক এলাকায় জাহাজের খালাসীদের সঙ্গে গুপ্ত যোগাযোগ করে' রিভলভার সংগ্রহের চেষ্টা করতো। আত্মশক্তি লাইব্রেরীতেও সে আসতো। আমার সঙ্গে বিদ্যামন্দিরেই আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আমি তার কাছ থেকে দুটো ভাল "গুপ্তি" কিনেছিলুম এবং লাইব্রেরীতেই বইএর দুই সারি বাণ্ডিলের মাঝে লুকিয়ে রেখেছিলুম। মজবুদ Walking Stick—বাঁটের কাছের একটা পিনের মাথায় চাপ দিলে ভিতর থেকে সরু লম্বা কিরীচ বেরিয়ে আসে, তা দিয়ে অতি সহজেই মানুষের দেহকে ফুঁড়ে ভেদ করে' দেওয়া যায়। সে দুটো অন্যত্র সরাবার আগেই পুলিস এসে আমাকে গ্রেপ্তার করলে। পরে এক রিভলভার সহ ধরা পড়ে' সিরাজের জেল হয়েছিল।

শ্রীভঁাওতার জন্যে আত্মশক্তি লাইব্রেরী সার্চ করতে এসে পুলিস অফিসাররা বই ঘাটতে সুরু করতেই আমি একটু রাগতভাবে বললুম, আপনারা বসুন, আমি সবই আপনাদের দেখাবো. আর তা না হলে আমি এই বসলুম, আপনারা সব লণ্ডভণ্ড করুন। সুতরাং তাঁরাই বসতে রাজি হলেন, আমি পটাপট এক দিক থেকে এক এক গোছা বই নামিয়ে তাঁদের দেখিয়ে আবার যথাস্থানে রেখে দিই, খানিকক্ষণ এমনি চলার পর "আসল" সেলফে হাত পড়লো। দুটো লম্বা তাক বোঝাই দু'সারি করে' চার সারি একই রকমের বাণ্ডিল— তারই এক তাকে আছে গুপ্তি।

আমি এক দিক থেকে একটা বাণ্ডিল টেনে কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দেখালুম উপেনদার "Memoirs of a revolutionary" বই। নিরীহ তাকটার মাঝখান থেকে আর একটা বাণ্ডিল এবং আর এক কিনারার আর একটা বাণ্ডিল টেনে দেখালুম। বললুম উপেনদার "নির্বাসিতের আত্মকথা" সব বিক্রী হয়ে গেছে, ইংরাজী বইটা কিছু বিক্রী হওয়ার পর সবই রয়ে গেছে। অফিসাররা বললেন, থাক্ থাক্, আর দেখার দরকার নেই।

ঘরে আমার কোন জিনিসপত্র পাওয়া গেল না দেখে আই বি অফিসার বললেন আপনার জিনিসপত্র কৈ? আমি দাঁত বার করে বললুম কিছুই নেই। তিনি বললেন, কাপড় চোপড়? আমি পকেট থেকে ড্রাইং ক্লিনিং এর এক রসিদ বার করে দেখিয়ে বললুম এক সেট ওই, আর এক সেট দেখছেন অঙ্গে। তিনি বললেন, গামছা? আমি লজ্জিত হয়ে বললুম, দরকার হয় না। রুমালেই চলে, কারণ আমি স্নানই করি না। তিনি বললেন, বিছানা? আমি বললুম নেই, কাউন্টারে শুই, হাত বা বই মাথায় দিয়ে। তিনি বললেন, সেবারে যে একটা বড় ট্রাঙ্ক দেখেছিলুম? আমি আবার দাঁত বার করে বললুম, সেটাকে বেচে খেয়েছি।

তবেও ওদের কোন সন্দেহ হয়নি কারণ ওরা বেশ জানতো, আত্মশক্তি লাইব্রেরী ছাড়া আমার আর কোন আশ্রয় নেই।

সে রাতে পুলিশ আসার কথা দাদার কাছেও গোপন করেছিলুম, মনে একটা দুশ্চিন্তা নিয়ে চলে গেলুম। যাবার সময় লাইব্রেরীর চাবিটা রেখে গেলুম শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের কমলা আর্টপ্রেসের মালিক অতুল ঘোষের কাছে (যশোরের লোক এবং ছাত্র নেতা)— আর তার আলোয়ানখানা চেয়ে নিলুম। বললুম, মোটাদা'কে বলবেন, তিনি যেন আমার কাপড় চোপড় দিয়ে আসবেন এবং আপনার আলোয়ান নিয়ে আসবেন। আশা করেছিলুম মোটাদাকে পুলিশের খবরটা জানিয়ে দিতে পারবে কিন্তু তার কোনো সুযোগ হয় নি।

আমি দশটার সময় লাইব্রেরী খোলার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস এসেছিল। মোটাদা একটু দেরীতে আসতেন। এক হিসাবে ভালই হয়েছিল। একা বলে আমি ম্যানেজ করেছিলুম ভালই।

আমাকে প্রথমে ইলিসিয়াম রো র S B Office এ নিয়ে গেল। ভিতরের লম্বা বারান্দায় কয়েকখানা টেবিল-চেয়ার ছড়ানো আছে। এক টেবিলে এক ছোকরা বসে আছে আর এক টেবিলে আমাকে বসালে। এক অফিসার আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ছোকরাকে দেখিয়ে আমার দিকে চেয়ে একটু দুষ্টুহাসি হেসে জিজ্ঞাস করলে, চেনেন নাকি ছোকরাকে? আপনাদেরই দেশের। আমি বললুম, কোথায় বাড়ী? তিনি বললেন, বিক্রমপুরের। আমি যথাশাস্ত্র 'চিনিনা' বলে চেয়ে গেলুম। বুঝলুম, অফিসার জানেন, আমি বিক্রমপুরের লোক।—মন্দ নয়।

একটু পরে এক সিনিয়র ইনস্পেক্টর সুরেন ঘোষ এসে আমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসলেন এবং প্রথমেই ভণিতা শুরু করলেন, হুঃ—হাতী ঘোড়া গেল তল ভেড়া বলে কত জল! আমি বললুম, কি হল? তিনি বললেন, সেবার গিরিজাবাবুই কিছু করতে পারলেন না, আর এবার আমাকে পাঠিয়েছে, আপনাকে tackle করতে।

মনে করলুম, যে রকম ফোলানো কথা বলছেন, হয়ত এখনই মারবেন। কিন্তু দেখলুম, তিনি কথাটা বলেছেন আন্তরিকভাবেই। কাগজ কলম নিয়ে বললেন, এখন বলুন তো, আপনার দেশ কোথায়? আমি বললুম, সবইতো আপনাদের সেরেস্তায় আছে। তিনি বললেন, তা হলেও আমাকে লিখতে হবে, duty — কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখা গেল কলমে কালি নেই। আমার কলমটা চাইলেন, দেখা গেল, তাতেও কালি নেই। দুত্তোর

বলে পেন্সিলেই লিখতে শুরু করলেন। বললেন, পরে কালিতে লিখে নোব'খন। এরই মধ্যে একজন অফিসার এসে তাগাদা দিলেন hurry up, van ready.

দেশ কোথায়, বাপের নাম কি, বর্তমান ঠিকানা, কি পেশা ইত্যাদি লেখা হল। পূর্বোক্ত অফিসার আর একবার তাগাদা দিয়ে বললেন, তিনি আর দেরী করতে পারেন না। সুরেনবাবু লেখা বন্ধ করে' বললেন, মরুকগে যাক্. আপনি এইখানেই একটা সই করে দিন। আমিও সর্টকাট করে একটা সই করে দিয়ে প্রিজন ভ্যানে গিয়ে উঠলুম। দেখলুম, আর কয়েকজন অচেনা যাত্রী।

ভ্যান প্রেসিডেন্সি জেলের ফটকে পৌছালো। সন্ধ্যা হয় হয়। ঘরে ঘরে বিজলী বাতি জ্বলেছে, বাইরে দিনের আলোর রেশ আছে। গেটের ভিতরে ভিড় জমেছে. "স্বদেশী বাবুরা" এসেছেন দলের লোকদের receive করতে।

সুরেশ দাস, হরিদা এবং ভূপতিদা এসেছেন, মুন্সীগঞ্জের দলের কয়েকজন ছেলেও এসেছে, অন্যান্য দলেরও কিছু লোক আছে। তখন রোজই সন্ধ্যায় এক গাড়ী করে' নতুন মাল আমদানী হয়। বিভিন্ন দলের লোক নিজ নিজ দলের লোকদের ধরে নিয়ে যায় নিজেদের আড্ডায়। যারা বেশী মাল পায়, তাদের ভারি ফুর্তি, আর যারা কিছু পায় না, তারা মুখ চুণ করে ফিরে যায়। অদ্ভুত মনোবৃত্তি! যেন যারা যত বেশী ধরা পড়ে তারাই ততবড় পার্টি!

ভূপতিদা গবাদের কাছে এগিয়ে এসেছিলেন, আমাকে দেখে পিছিয়ে গিয়ে হরিদাকে সংবাদ দিলেন, নারাণ এসেছে। তারপর একটু পরামর্শ করে' তিনজনে কেটে পড়লেন। আমি ভেতরে ঢুকতেই মুন্সীগঞ্জের দল—বাদল, মাখন, বীরেন কুশারী (জিতেন কুশারীর ভাই) প্রভৃতি আমাকে টানতে টানতে নিয়ে চললো, তাদের কাছে থাকতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করে জানলুম অনুকুলদাও আছেন, বললুম, আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তারপর স্থির করবো। ওরা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল। আমি তাঁকে চুপি চুপি বললুম, আপনার কাছে থাকবো, খাট আনান।

তারপর মুন্সীগঞ্জের ছেলেরা আমাকে তাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে জেদ ধরে বসলো, তাদের সঙ্গেই থাকতে হবে। কাজেই শেষ পর্যন্ত বললুম, আমি অনুকুলদাকে বলে এসেছি, ওখানেই থাকবো। তারা বলে, আমরা অনুকুলদাকে গিয়ে বলে আসছি। আমি বললুম, তার চেয়ে তোমরা সকলেও আমার সঙ্গে চল, অনুকুলদার কাছে থাকবে। তারা বললে, আমাদের অন্য আপত্তি ছিল না. কিন্তু সেটা সম্ভব নয়, কারণ সে হবে একটা রীতিমত ওলটপালটের ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত তারা রাগ মানলো। বললে, দাদারা যে আমাদেরই খুব পছন্দ করেন, তা নয়।

ব্যাপার হচ্ছে, জেলে ডেটিনিউদের তিনটে "কিচেন" বা পৃথক তিনটে "হাঁড়ি।" বড়দল যুগান্তর পার্টি ও তাদের সহযোগীরা। তারা যে ওয়ার্ডে থাকে, সেটার নাম "সাতখাতা"—দাদারা ও তাঁদের চেলারা, মুন্সীগঞ্জের ছেলেরা, শ্রীসংঘের অনিল রায় প্রভৃতি থাকেন। অনুশীলন পার্টির ওয়ার্ড পৃথক। আর "থার্ড কিচেন" হচ্ছে পাটমিশেলী। তার মধ্যে একদল কমিউনিষ্ট বা কমিউনিষ্টিক, কিছু যুগান্তরের "revolt", কিছু অনুশীলনের "revolt" ২।৪ জন "ছুটকো" এবং অনুকুলদার মতন ২।১ জন "বিশিষ্ট" ব্যক্তি। দিনের বেলা

ওয়ার্ডের ঘরগুলো খোলা থাকে, সকলে সব ঘরে আসা-যাওয়া এবং মেলামেশা করে। রাত ৯টায় সব ঘরের দরজায় তালা পড়ে।

পরদিন বিকেলে মাঠে বেড়াচ্ছি, ভূপতিদা এসে বললেন, দেখ, তোমাকে একটা কথা বলি। এখানে তুমি ছেলেদের কাছে দাদাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগ্যাণ্ডা চালিয়ো না। আমি বললুম, বেশ, আপনিও ছেলেদের একটু বলে দেবেন, আমাকে যেন না ঘাঁটায়। এইভাবে এক শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান চুক্তি হয়ে গেল।

তারপর রোজই দেখি ২।৩ জন করে ডেটিনিউকে ইন্টারভিউ দেওয়ার নামে নিয়ে যায়, ৩।৪ ঘণ্টা বসিয়ে রেখে কিছু গল্পগাছা করে ফেরত দিয়ে যায়। প্রয়োজনীয় সংবাদ বা হদিস সংগ্রহের নতুন প্ল্যান।

একদিন বরিশালের শঙ্কর মঠের আত্মানন্দ ব্রহ্মচারীকে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি ফিরে এসে নলিনী মজুমদারকে (I B Chief) এক চিঠি লিখে আমাকে দেখাতে এনেছেন। দেখি, চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "আমি মনু মানি না,—কিন্তু আপনি মানেন। মনু বলছেন, শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্মোপদেশ দেয়, তাহলে তার জিহ্বা কর্তন করা বিধেয়। সুতরাং মনুর কথা অনুসারে আপনার জিহ্বা কর্তন করা বিধেয়।" চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "আমার সঙ্গে ধর্ম-আলোচনা করতে আসে বেটা শয়তান।"

একদিন হঠাৎ ডাক পড়ল—তিনজনের—আমি, হরিদা এবং অমর ঘোষ (অতুলদার ভাই)। মোটাদাকে খ[illegible]ওয়ার কোন সুবিধে করতে না পেরে মনে মনে অনেক জল্পনা-কল্পনা করছিলুম, এখন একটা চান্স নেওয়ার চেষ্টা করলুম। ৮ ইঞ্চি লম্বা এবং আধ ইঞ্চি চওড়া একটা কাগজে আত্মশক্তি লাইব্রেরীর বই-এর বাণ্ডিলগুলো ভাল করে গুছিয়ে রাখতে লিখলুম, কাগজটাকে পাকিয়ে মুড়ির মতন করে বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর ডগায় টিপে ধরে নিয়ে গেলুম যদি পাচার করার কোন সুযোগ জুটে যায়।

সুযোগ জুটে গেল ভালই। পূর্ণদাসের একজন লেফ্‌টন্যান্ট সুরেন সাহা এক ছোকরার জন্যে তদ্বির করতে গিয়ে I B Office-এ বসে আছেন আমাকে নিয়ে গিয়ে বসালে সেই ঘরেরই আর এক টেবিলে। হরিদা'রা একবার আড়চোখে সুরেনসা'র দিকে চেয়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন। আমার অফিসার ভিতরে গেছেন, দরজায় আছে এক কনষ্টেবল পাহারা। খানিকক্ষণ বসে থাকার পর অফিসার আসছে না দেখে কনষ্টেবল দরজার বাইরে গিয়ে উঁকি মেরে দেখছে, ঠিক এই অবসরে আমি বাঁ হাতটা সুরেনসা'র দিকে বাড়িয়ে দিলুম, তিনিও হাতটা বাড়িয়ে দিলেন, 'মুড়ি'টা পাশ হয়ে গেল, আমি শুধু আস্তে বললুম—'মোটাদা, আত্মশক্তি লাইব্রেরী।'

জেলে ফিরে এসে শুনি, হরিদা'রা প্রচার করে দিয়েছেন, সুরেনসা'টা স্পাই হয়ে গেছে। প্রমাণ, সে গ্রেপ্তার না হয়ে I. B. Office-এ বসে আছে। অবাক কাণ্ড। আমার চিঠি কিন্তু ঠিক মোটাদা'র কাছে পৌঁছেছিল এবং মোটাদা' গুপ্তিদুটো পেয়েছিলেন এবং সরিয়ে ফেলেছিলেন।

যাই হোক, এর মধ্যে হঠাৎ একদিন জেলে একটা সাড়া পড়ে গেল, বীণা দাস অ্যাণ্ডারসনের ওপর গুলী চালিয়ে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে এসেছে। চারিদিকে ছুটোছুটি, তাকে দেখবার জন্যে, কিন্তু সে তো চলে গেছে ফিমেল ইয়ার্ডে। আমি ঘরে ঘরে গিয়ে বলে

এলুম 'আমাদের দলের মেয়ে।' বড়াই করে বেড়াবার জন্যে যাদের মুখ চুলকে উঠছিলো, তাদের মুখ বন্ধ হল। মুখ দেখে আমার প্রতি মনোভাবটাও বোঝা গেল।

খবর পেলুম, অজিত মৈত্র প্রেসিডেন্সি জেলেই কয়েদী হয়ে জেল খাটছে—জেলের তাঁতের কারখানায় কাজ করছে। কারখানা দেখার অজুহাতে গেলুম। দেখি অজিত কয়েদী পোষাক পরে সতরঞ্চি বুনছে। জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি? সে হাসিমুখে বলে, ১১০ ধারা (no ostensible means of livelihood), ১ বছর। বুঝলুম, গোয়েন্দা বিভাগের ২৬ সালের বাগ্‌ ঝাড়ছে।

জেলের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব কারখানা দেখেন এবং তার নীচে কাজকর্ম তদারক করে এক একজন কয়েদী মেট, এক এক বিভাগে। তাতঘরের তদারক করেন তখন ব্যারিষ্টার বি, কে লাহিড়ী, বি ডিভিশন কয়েদী মেট। তাঁর সঙ্গে আলাপ করলুম। তিনি দুঃখ করে বললেন, "যে সব স্বদেশী বাবুদের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা দিয়ে ব্যবসায়ে সাহায্য করেছি, তারা অনেকে রাজবন্দী হয়েছেন আর আমিই হয়েছি 'চোর।'" কথাটা ভাববার মতন।

আমি একখানা সতরঞ্চির অর্ডার দিয়ে তাঁর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এলুম, অজিত বুনে দেবে আমার পছন্দমত ডিজাইন অনুসারে। ৮×৫ মাপের চমৎকার মজবুত সতরঞ্চি, ওজন ৮ বা ৫ সের, দাম বোধ হয় লেগেছিল ১৪ টাকা। এই উপলক্ষে অনেকদিন কারখানায় যাতায়াত চলেছিল। একখানা "নিবেদনমিতি বনাম এক" এবং একখানা "ভাঁওতা" গোপনে আনানোর জন্যে ওয়ার্ডারদের সঙ্গে গল্পসল্প করে ভাব করতুম। একজন লড়াই-ফেরত শিখ এবং একজন হিন্দুস্থানী ওয়ার্ডারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে বই দুটো আনতেও পেরেছিলুম। বই দুটো বি, কে লাহিড়ীকেও পড়তে দিয়েছিলুম। আরো অনেকেও পড়েছিল রীতিমত গোপনে।

আমাদের "কিচেনে' তখন দিবাকর পাত্রও ছিল, চন্দননগরের কালীচরণ ঘোষও (বর্তমান কমিউনিষ্ট নেতা) ছিলেন। আমি ওয়ার্ডারদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি অত কথা কই তিনি জানতে চাইলেন। আমি বললুম, আমি আগে ওদের বাড়ীর অবস্থা নিয়ে শুরু করি, তারপর গরীব আর বড়লোকদের জীবন এবং মারি মালিকদের শোষণের কথা পাড়ি। বলি গরীবের এ গরীবী ঘুচতে পারে, যেমন রুশিয়ায় হয়েছে। সবই ওরা বেশ মন দিয়ে শোনে এবং সায় দেয়। কিন্তু যখন বলি কপালের লেখা, ভগবানের বিধান এইগুলো যতদিন গরীবদের মাথা থেকে না মুছে যাবে, ততদিন কিছু হবে না, তখনই ওরা তর্ক শুরু করে দেয়। একজন ওয়ার্ডারের এ বিষয়ে মহা উৎসাহ, মহা আস্তিক বেটা। তাকে বোঝানোর জন্যে সেদিন এক লম্বা বক্তৃতা করেছি।

শুনে কালীবাবুরও উৎসাহ বেড়ে গেল। তিনি বললেন, আমার মুস্কিল হচ্ছে, আমি মোটেই হিন্দী বলতে পারি না। আপনার ঐ বক্তৃতাটা আমাকে বাংলা হরফে লিখে দিন, আমি মুখস্থ করবো।" মন্দ নয়। দিলুম লিখে হিন্দী বক্তৃতা বাংলা হরফে।

আমাদের "কিচেনে"র ম্যানেজার ছিলেন খুলনার নির্মল দাশ, কমিউনিষ্ট। প্রায় ত্রিশজন ডেটিনিউয়ের daily allowance প্রায় ৪০ টাকা। রোজ বাজার হয় এই টাকার, অথচ খাওয়া-দাওয়া যাচ্ছেতাই। নির্মল দাশের পৃথক ঘরে টেবিলে মজুদ থাকে নানা

রকমের খাদ্যবস্তুর টিন প্রভৃতি, যে সব মাল কেউ পায় না। উনি বলেন, ওর কি-সব ব্যাধি আছে, তার জন্যে উনি মেডিকাল গ্রাউণ্ডে ঐসব জিনিসের extra supply পান। একটা চাপা গুঞ্জরণ চলে ... আমরা শুনেছিলুম, তিনি নাকি কিছু কিছু টাকা পাঠিয়ে বাইরে পাঠান পার্টির জন্য। যাই হোক শেষ পর্যন্ত একদিন মিটিং বসলো এবং অনেক ক্যাচালের পর ঠিক হ'ল, পালা করে এক এক মাস এক একজন ম্যানেজার হবে। প্রথম নূতন ম্যানেজার করা হ'ল দিবাকর পাত্রকে। প্রথম দিন থেকেই খানার সুস্পষ্ট উন্নতি দেখা গেল।

ইতিমধ্যে জেলে সরস্বতী পূজা হয়ে গেছে ... অগ্রণী দাঁড়ার অনিল রায় প্রধান উদ্যোগী, ভূপতিদা প্রভৃতিও আছেন। ওরা আর দুই 'কিচেন'কে নিমন্ত্রণ করলেন উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্যে। আমাদের থার্ড কিচেনে মিটিং বসলো কি করা হবে। কমিউনিষ্টরা বললেন ঠাকুর পূজো আমরা মানি না, আমরা যোগ দিতে পারি না। পূজো ... সকল উৎসব আমরা বর্জন করবো। অন্য অনেকে বর্জন করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন। আলোচনা গরম হয়ে উঠলো আমার মত জিজ্ঞাসা করলে আমি বললুম, বর্জনের পলিসি ভুল, ওতে ফল হয় বিপরীত। প্রথমতঃ, আপনাদের সঙ্গে কমিউনিজমের ওপরে ওদের মন আরো বিরূপ হবে, আর দ্বিতীয়তঃ, পূজোর ওপর ওদের আরো জেদ চড়ে যাবে। সুতরাং আর কেউ যোগ না দিলেও আমি যোগ দাব। অঞ্জলিতে নয়, উৎসব-আনন্দে। অঞ্জলিতে যোগ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য নয়। ফলতঃ গোঁড়া কটর কমিউনিষ্টরা ছাড়া বাকি সকলেই যোগ দিলে। থিয়েটার হ'ল, বঙ্কুরাম রচিত 'বিরিঞ্চি বাবা'। আমি বিরিঞ্চিবাবার পার্ট করলুম। অনিল রায়ই আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, হয়ত ভূপতিদার পরামর্শে।

হঠাৎ একদিন এক আই-বি অফিসার হাজির—ডেটিনিউদের সঙ্গে আলোচনা করে সরকার family allowance দেবেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার family-তে আপনার dependant কে কে আছেন?" আমি বললুম, "আমার dependant কেউ নেই, non-dependant-ও কেউ নেই, family-ই নেই।" তিনি বললেন, "আহা-হা, বুঝতে পারছেন না। সরকার family allowance দেবে বলেই এই এনকোয়ারী হচ্ছে।" আমিও বললুম, "আহা হা, বুঝতে পারছেন না, আমার কেউই নেই।" শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝলেন না এবং আমাকেও বোঝাতে না পেরে বিদায় হলেন।

তিনি চলে যাওয়ার পর খুলনার এক ছোকরা ডেটিনিউ, সরস্বতী লাইব্রেরীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আমাকে এসে ধরলেন, আমার দোস্ত ওয়ার্ডারকে দিয়ে বাইরে একখানা চিঠি পোষ্ট করাতে হবে এবং চিঠিখানাও গুছিয়ে লিখে দিতে হবে। তিনি অফিসারের কাছে বলেছেন, তিনি প্রতিমাসে বাড়ীতে ৪০ টাকা করে পাঠাতেন। বাড়ীতে যদি পুলিস এনকোয়ারীতে যায়, বাড়ীর লোকেরা যেন সেই কথাই বলে। 'না হলে—বোঝেন না?' বুঝলুম, চিঠি লিখে দিলুম এবং পোষ্ট করিয়ে দিলুম।

৩১ সালের শেষে আমি যখন জেলে যাই, তখন ডেটিনিউদের allowance fix করা হয়ে গেছে কিন্তু যখন থেকে জেলে ডেটিনিউ রাখা শুরু হয়েছে, তখন থেকে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত কোনো fixed allowance ছিল না। শুধু একটা ঢালোয়া হুকুম দেওয়া ছিল,

ডেটিনিউদের যা যা প্রয়োজন সবই দেওয়া হবে। প্রয়োজনটাও যখন স্থির করে দেওয়া হয়নি, তখন স্বভাবতই প্রয়োজন-মানে ডেটিনিউরা যা প্রয়োজন মনে করবে, অর্থাৎ চাইবে। এ জন করিৎকর্মা ডেপুটী জেলার ছিলেন, ডেটিনিউদের সংক্রান্ত সকল ব্যাপার দেখাশোনা করতেন, এবং প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করতেন।

প্রথমে ব্যবস্থা ছিল ডেটিনিউরা একটা Requisition বইয়ে order লিখে দিত এবং Office থেকে সব জিনিসের একটা list করে দেওয়া হ'ত কনট্রাক্টরের হাতে। ডেপুটী জেলারবাবু কাজ সংক্ষেপ করবার জন্যে পরে ব্যবস্থা করেছিলেন, কনট্রাক্টর একটা লরী বোঝাই করে নানাবিধ ব্যবহার্য দ্রব্য একেবারে জেলের মধ্যে ডেটিনিউদের ইয়ার্ডের দরজায় নিয়ে হাজির করে আর ডেটিনিউরা হরির লুটের মতন যার যা পছন্দ বা যে যা পারে হাতিয়ে নিয়ে ঘরে চলে যায়, আর তারপর কনট্রাক্টর একটা Cash Memo বই এবং একটা খাতা নিয়ে ডেটিনিউদের ঘরে ঘরে গিয়ে বসে জিনিস মিলিয়ে নামে নামে খাতায় লিখে Cash Memo লিখে নেয়। তারপর আবার ডেটিনিউরা বলে দিতে, আমার জন্যে একটা অমুক জিনিস আনবেন। দামী দামী চামড়ার স্যুটকেশ ছোট বড় ৩।৪টে পর্যন্ত এক একজন নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ২।৪ জন গ্রামোফোন পর্যন্ত কিনেছে।

বোধ হয় আপনাদের মনে হচ্ছে আষাঢে গল্প—এও নাকি হয়। হয়—এবং গড়ায়ও অনেক দূর পর্যন্ত। যখন allowance fix করা হল, তখন কে কত টাকার জিনিস নিয়েছে, তার একটা হিসেব করা হল। দেখা গেল, অনেকেই অনেক বেশী টাকার জিনিস নিয়েছে এবং তার ব্যবস্থাও হল, মাসে মাসে allowance এর অর্ধেক টাকা কেটে নেওয়া হবে। ডেটিনিউরা বললে, ব'য়ে গেল।

কিন্তু আষাঢে গল্পটা এখানেই শেষ নয়। ডেপুটী জেলারবাবুর নামে ৪৬ (বা ৪৮ হাজার টাকা তছরূপের চার্জ দিয়ে তাঁকে Suspend করা হল। তিনিও বললেন ব'য়ে গেল।

কনট্রাক্টরের কনট্রাক্টরীও গেল। তিনি 'ব'য়ে গেল' বলেছেন কি না জানিনা।

এই সময়ে বোধ হয়, ১৯৩২ সালের এপ্রিলে গভর্ণমেণ্ট এক ব্যয়সঙ্কোচের প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়। সরকারী কর্মচারীদের বেতন সাময়িকভাবে কিছু কিছু কমিয়ে দেওয়া হয়—নীচের গ্রেড বাদ দিয়ে কিছু উপরের গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীদের বেতনের শতকরা দশভাগ, তার উপরে শেষ ধাপ পর্যন্ত শতকরা ১৫ ভাগ এবং স্বয়ং লাটসাহেব স্বেচ্ছায় বেতন কম নেবেন শতকরা ২০ ভাগ, এই রকম ব্যবস্থা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ডেটিনিউদের daily (food) allowance এক টাকা ছ'আনা থেকে এক টাকায় নামিয়ে দেওয়া হয়। নতুন সমস্যা, আমাদের মিটিং বসলো, লড়তে হবে প্রথমে দরখাস্ত করা হবে, তারপর দরখাস্ত না মঞ্জুর হলে hunger strike প্রথমে প্রস্তাব উঠলো আমাদের allowance কমানো চলবে না বলে দরখাস্ত করতে হবে কারণ আমরাতো সরকারের কর্মচারী নয়।

আমি বললুম, ওরা ব্যয় সঙ্কোচের যে ব্যবস্থা করেছে, তাতে আমাদের ব্যয় সঙ্কোচের প্রয়োজনের নীতিটি মেনে নেওয়া দরকার, কিন্তু শতকরা হিসাবে আমাদের allowanceটা যে সর্বোচ্চহারে কাটা হয়েছে, সেটার কোন যুক্তি ওরাও দিতে পারে না। সুতরাং ওদের হিসাব মতই আমাদের allowance ছ'আনা কমানো হলে আমরা রাজী আছি, অন্যথা

লড়াই করবো, এইভাবে দরখাস্ত করা হোক। অনুকূলদা আমাকে সমর্থন করলেন, কিন্তু অনেকেই চুপ করে থাকলো এবং প্রথম প্রস্তাবই পাশ হয়ে গেল।

দরখাস্ত করা হল এবং কয়েকদিন পরে দরখাস্ত নামঞ্জুর হওয়ার খবর এল। আবার মিটিং বসলো। Hunger Strike-এর নোটিশ দেওয়ার প্রস্তাব হল। অনেকেই বললেন, একচোটে ঐ নোটিশ না দিয়ে, আমরা নিজেরা Catering চালাতে পারবো না বলে Catering ছেড়ে দেওয়া হোক। তাই হল।

জেল কর্তৃপক্ষ প্রায় কয়েদীদের মতন খানা নিয়ে এল বেলা দেড়টার সময়। মুখে তাদের ওপর হম্বিতম্বি করতে করতে একদল চালাক ডেটিনিউ হুড়োহুড়ি করে সার দিয়ে খেতে বসে গেল এবং তাড়াতাড়ি বেশী করে খেয়ে ভাত ডাল ফুরিয়ে ছেড়ে দিলে। বাকি লোকের খাওয়া হলনা। ওরা আবার ভাত আনলে তবে খাওয়া হবে। সব ডেটিনিউদের তো উপোস করিয়ে রাখা চলবে না, সুতরাং ভাত আনতেই হবে।

কিন্তু সারাদিন কেটে গেল, দফায় দফায় অফিসে খাবারের জন্যে তাগাদা গেল, কিন্তু কর্তাদের কলাটি। হিসেব করে রেঁধেছে, না কুলোলো তো বয়েই গেল। আবার খাবার এল রাত্রে। কে খেলো বা কে খেলোনা, কেউ দেখলে না।

ওদের জব্দ করবার এই পদ্ধতিতে অনেকে ক্ষেপে গেল। যারা প্রথমেই ঠেসে খেয়ে ওদের জব্দ করবার প্ল্যান করেছিল, তাদেরও উপোস করানোর জেদ নিয়ে উপোসীরাই জোরের সঙ্গে Hunger Strike declare করার প্রস্তাব করলে। অনেককেই সেটা সমর্থন করতে হল। প্রস্তাব পাশ হল। Hunger Strike-এর নোটিশ দেওয়া হল।

অনুকূলদা চুপচাপ সব দেখছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি কিন্তু Hunger Strikeএ যোগ দেবো না, একবার চাল-ডাল আনিয়ে নিজে রেঁধে খাবো। ভরসা পেয়ে আমি বললুম, আমি থাকবো আপনার সঙ্গে। অনুকূলদা বললেন, বেশ, আর কাউকে কিন্তু নেওয়া হবে না। কিন্তু হাওড়ার ধীরেন মুখুজ্যে জানতে পেরে এসে অনুকূলদাকে ধরলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকেও সঙ্গে নেওয়া হল। তিন জনের নামে অফিসে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল এবং বাজারের ফর্দ পাঠিয়ে মাল আনিয়ে একজন "ফালতু" (কয়েদী attendant) নিয়ে আমাদের তিন জনের এক "কিচেন" হল। দাদারা বোধ হয় তখন বদলী হয়ে গেছেন।

নোটিশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনশন শুরু করে দেওয়া হয়েছিল, কয়েকজন উগ্র বীরের প্ররোচনায়, যারা বেশী ভাত খেয়ে কর্তৃপক্ষকে জব্দ করেছিলেন। অনেকেই অনশন শুরু করেছিল একটা দ্বিধা নিয়ে। দু একদিন উপোস করার পরই যখন নোটিশের জবাব এল, সরকার তার নীতি বদলাবে না এবং দরকার মত ব্যবস্থা করবে, তখন পেটের ক্ষুধা এবং মনের দ্বিধা মিলে অনেককেই বেহাল করে ফেলেছে। তারা ধড়ফড় করছে Hunger Strike ছাড়বার জন্যে।

জেলার ছিল ছোট রায়ান সাহেব—১৯২৬ সালের আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের জেলার রায়ান সাহেবের ছোট ভাই, প্রায় দাদার মতনই নিরীহ মানুষ। আমার সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল দুজনের নাম উপলক্ষে। দুদিন কথাবার্তায় আমার নাম জিজ্ঞাসা করেছিল বলে আমি বলে দিয়েছিলুম,—"তোমাকে একটা ফরমুলা বলে দিই, তাহলে আমার নাম মনে

থাকবে। তোমার নাম তো বায়ান? আর আমার নাম ন-বায়ান—তুমি Positive আর আমি Negetive. সেই থেকে সে আমার নামতো ভুল করেই নি, দেখা হ'লে দুটো কথা না কয়ে যেতো না। সে একদিন বললে, "অনেকেই বলছে, তারা Hunger strike ছাড়তে রাজী, কিন্তু পারছে না for others আমি ওদের বোঝাচ্ছি যে, allowance কাটা হয়েছে temporarily, আবার বাড়িয়ে দেওয়া হবে কিছুদিন পরে।"

তারই দু' একদিন পরে strike মিটে গেল। সকল দলই নিজ নিজ "কিচেন" হাতে নিলে। আমরা কিন্তু আমাদের "কিচেন" ভাঙ্গলুম না। আমাদের তিন জনের একটা "ফোর্থ কিচেন" বজায় রইলো। সব-কিচেনের চেয়ে আমাদের কিচেনে খাওয়া ভাল— অনুকূলদা যেমন গোছালো গিন্নী, তেমনি রাঁধিয়ে।

একদিন আমাদের থার্ড কিচেনে feast হল, আমাদের ফোর্থ কিচেনের তিনজনকে 'নিমন্ত্রণ করে' ওরা মাংসের পোলাও খাইয়ে দিলে। ওরা ২৭ জন, আমরা তিন জন আমি অনুকূলদা'কে বললুম, এটা ভাল হবে। একদিন আমাদের কিচেনে ওদের নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দেওয়া যায় না? অনুকূলদা বললেন, পোলাও করেই খাইয়ে দেওয়া যায় কিন্তু নিরিমিষ্যি পোলাও। সে সবশ্য ওদের পোলাওয়ের চেয়ে খেতে ভাল ছাড়া মন্দ হবে না। লাগাতে চাও একদিন? ২১৪ দিন নিজেদের একটু সাদামাটা খেতে হবে

তাইই স্থির করা হল এবং নিঃসাড়ে কয়েকদিন ধরে, কিছু পোলাওয়ের চাল আর ঘি আনিয়ে জমানো হল। তাছাড়া কিছু কিছু বিড়ি আর তামাকপাতা আনিয়ে মালতুদের দিয়ে চড়া দামে বিক্রি করিয়ে কিছু নগদ পয়সাও জমানো হল। তারপর হঠাৎ একদিন ওদের নিমন্ত্রণ করা হল। যে ওয়ার্ডার আমাদের বাজার করে দিতো তার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে, নগদ টাকা, এবং দলের allowance এবং পরের দিনের allowance-এর পরিমাণ টাকা তার কাছে ধার নেওয়ার বন্দোবস্ত করে' দই আর মিষ্টি আনিয়ে নেওয়া হল। অনুকূলদা কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। আমাদের তিনজনের কিচেনে ওদের ২৭ জনকে বাদাম পেস্তা-কিসমিস দেওয়া চমৎকার নিরামিষ পোলাওয়ের নিমন্ত্রণ খাইয়ে দেওয়া হ ওদের তাক লেগে গেল।

জেলের মধ্যে যখন এই সব রকমারি খেলা চলছে, তখন বিলাতে আর একরকম খেলা — রাউণ্ড টেবিল কেন্দ্র করে। মহাত্মাজী ছিলেন কংগ্রেসের Sole delegate, plenipotentiary, সর্বক্ষমতাসম্পন্ন একক প্রতিনিধি, তাঁর কথাই কংগ্রেসের কথা। সরোজিনী নাইডু এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও গিয়েছিলেন, কিন্তু সে নিজ নিজ ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্বের আবকাশে। মুসলিম লীগ দল বেঁধে গিয়েছিল। হিন্দু-মহাসভার তরফ থেকেও এন এন. সরকার, বি. সি. চ্যাটার্জী প্রভৃতি একটা দল গিয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ফয়সালার একটা সবসম্মত ফরমুলা আবিষ্কার করার দুশ্চেষ্টা দুনিয়ার লোকের সামনে ব্যর্থ হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী তথাকথিত সোসিয়ালিস্ট শ্রমিক নেতা র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের হাতে সকল দল মিলে ফয়সালার ভার ছেড়ে দিলে —তিনি যা যা ফতোয়া দেবেন, তাই হবে শেষ কথা।

স্বরাজকে লাহোরে Complete Independence করে তাকে আবার 'পূর্ণ স্বরাজ' ক'রে বিলাতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধী আবার নেহেরু রিপোর্টে ফিরে গিয়ে বললেন,

ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস পেলেই ভারত সন্তুষ্ট হবে। লাহোর-উত্তর কংগ্রেসের Sole delegate plenipotentiary!

ভূতপূর্ব বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ মহাত্মাজীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কংগ্রেসের Creed হল independence, আর আপনি বলছেন, ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস পেলেই ভারত সন্তুষ্ট হবে,—কেমন করে' হবে? মহাত্মাজী বললেন, "মানে, আমরা স্বাধীন হয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো, ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তই থাকবে। লয়েড জর্জ চোখ কপালে তুলে বলেছিলেন, "অ!" (Oh I see)

বেচারা লয়েড জর্জের মাথায় ঢোকেনি, সব সন্দেহেরই নিরসন করে দিচ্ছিলাম। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার ষড়যন্ত্রের গোড়া এইখানে। যাই হোক মহাত্মাজী ফিরে এলেন খালি হাতে। ভারতবাসী আবার সংগ্রামের জন্য উন্মুখ। বোম্বাই পৌঁছেই তিনি এক বিবৃতি দিলেন মহাত্মাজী বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিসে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বললেন, তিনি শান্তির জন্য তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন। বোম্বেতে পৌঁছেই তিনি এক সংবাদ বচন করে ছিলেন, আবার সংগ্রাম শুরু করা হবে না বলে'। ৩১ সালের শেষ, লর্ড আরউইন চলে গেছেন, এবং নতুন বড়লাট এসেছেন উইলিংডন। তিনি তৈরী হচ্ছিলেন, রাউণ্ড টেবিলের অবসরে, আক্রমণ শুরু করবার জন্য। সে সুযোগও এসে গেল।

এইখানে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের সময়কার আর একটু ছোট ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। গত ১৫।৮।৬৬র ষ্টেটসম্যানে বি শিবরাওয়ের এক বিশেষ প্রবন্ধে (Road to Partition paved with good intentions) তিনি লিখেছেন,

"Mr Jinnah was a late and almost reluctant convert to the scheme for Indian's partition"—তিনি আরো বলেন,—৩২ সালে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের সময় কেমব্রিজের এক মুসলমান ছাত্র সর্বপ্রথম দেশ বিভাগ পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটা অপরিণত খসড়া তৈরি করে মোসলেম লীগের প্রতিনিধিদের হাতে দেয়। মিঃ জিন্না, জাফরুল্লা খাঁ প্রভৃতি সকল নেতাই সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেন।

মহাত্মাজীর বোম্বে পৌঁছানোর কয়েকদিন আগেই উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি খাজনা বন্ধের নীতি ঘোষণা করে এক প্রস্তাব পাশ করে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত জবাহরলাল, সেরওয়ানী প্রভৃতি নেতাদের ধরে জেলে পুরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খাদ্দেরকোতা আন্দোলনের সংগঠক ও নেতা খাঁ আবদুল গফুর খাঁ এবং তাঁর ভাই ডক্টর খাঁ সাহেবকেও জেলে পোরা হল। বাংলায়ও আবার নেতাদের গ্রেপ্তার করা হতে লাগলো জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে। ঠিক মনে নেই, বোধ হয় এই সময়েই শরৎ বসু এবং জে. এম. সেনগুপ্তকেও আডভান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক করা হয়।

শরৎ বসুকে বোধ হয় বাশিয়া যে রাখা হয়েছিল। উপযুক্ত family allowance ছাড়াও তাঁর Insurance primium ও সরকার দিতে বাধ্য হয়েছিল—১০০০ টাকা হিসাবে। সেনগুপ্তকে রাখা হয়েছিল রাঁচিতে—এবং বোধ হয় ৩২ সালে, সেখানেই বন্দী অবস্থাতেই তাঁর দেহাবসান ঘটে।

জেলে সুভাষবাবুর স্বাস্থ্য আবার খারাপ হয়েছিল এবং তাঁকে মুক্ত করবার চেষ্টা চলছিল। সরকার শেষ পর্যন্ত তাঁকে মুক্তি দেন এই সর্তে যে, তিনি সরাসরি সুইজারল্যাণ্ডে

চলে যাবেন চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে। সেই সর্তে মুক্ত হয়ে তিনি ইউরোপে চলে গিয়েছিলেন।

১৯৩২ সালের ৪ঠা জানুয়ারী মহাত্মাজীকেও গ্রেপ্তার করা হল। তার আগে তিনি সরকার কর্তৃক চুক্তিভঙ্গের নানা অভিযোগ শুনে বড়লাট উইলিংডনের সঙ্গে দেখা করার জন্য এক চিঠি লেখেন, কিন্তু বড়লাট তাঁর দেখা করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মহাত্মাজী এ ব্যাপারটাকে সরকারের নূতন নীতি বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

মহাত্মাজীর গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে আর একবার সারা দেশে কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হয়, সর্বত্র নেতাদের গ্রেপ্তারও করা হয়, কংগ্রেসের সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার সংস্থাও বে-আইনী ঘোষিত হয়, সর্বত্র কংগ্রেসের অফিস, ছাপাখানা, তহবিল প্রভৃতিও বন্ধ, দখল বা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৯৩২ সালের ২রা মে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের রিপোর্টে জানা যায়, প্রথম চার মাসের মধ্যেই ৮০০০০ লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

চব্বিশ

ম. ম [illegible] মধ্যে Prince Kropotkin এর "Conquest of Bread" বই [illegible] [illegible]য়েছিলেন। এতদিন পর মনে হল বইটা বাংলায় প্রকাশ হওয়া দরকার। গোপনে বাংলা করতে শুরু করলুম।

মার্কসের নীতি ও আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়া এবং বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদের প্রয়োগ-কৌশল বিধিবদ্ধ করা, মার্কসবাদকে বিকশিত করা, এগুলো যেমন লেনিন করেছিলেন, ঠিক তেমনি প্রিন্স কপটকিন ও বাকুনিনের অ্যানার্কিজম বা নৈরাজ্য বাদের নীতি ও আদর্শকে বিধিবদ্ধভাবে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের কৌশল তাঁর রচিত কয়েক খানা বই মারফৎ (Anarchist Communism, Conquest of Bread, Field Factories and Workshop প্রভৃতি) প্রচার করেছিলেন।

তাছাড়া, মার্কসের সময়ে গণবিপ্লব ও কমিউনিষ্ট সমাজ গঠন সম্পর্কে আদর্শ, নীতি ও কর্মপ্রণালী নিয়ে বাকুনিনই তার সঙ্গে সবচেয়ে জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং পরাস্ত হয়েছিলেন। সুতরাং ক্রপটকিনের বইগুলো না পড়লে মার্কসবাদ বোঝা পাকা-পোক্ত হয় না।

কিন্তু আমার কাজটা শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ একদিন আমার অন্তরীণের আদেশ এসে গেল, চললুম জলপাইগুড়ি ডুয়ার্সে ফালাকাটা থানায়।

অন্তরীণ অবস্থায় সম্ভাব্য প্রয়োজনের কথা ভেবে জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছ থেকে আমার চোখের অবস্থা সম্বন্ধে, আমার যে আবার গ্লকোমার আক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা আছে, এই মর্মে একটা সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিলুম। তখন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন অনুপ সিং নামক এক পাঞ্জাবী।

রাত্রে রওনা হয়ে ভোরে জলপাইগুড়িতে পৌঁছে সরাসরি গিয়ে উঠলুম পুলিস ক্লাবে, এবং সেখানে লটবহর রেখে এস পির অফিসে গেলুম। সেখানে ডি-আই-বি ইনস্পেক্টর

আমার ভার নিলেন। এস পি হডসন সাহেব, যিনি ঢাকায় বিনয় বোসের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন, দেখে মনে হল বেশ কাজের লোক। শুনলুম, ভয়ানক কড়া, সমস্ত পুলিসবাহিনী সর্বদা "তটস্থ" থাকে, ভয় করে, একটু এদিক ওদিক হলেই শাস্তি পায়, কারো রেহাই নেই। আমার সঙ্গে ২।১টা কথা বলেই ছেড়ে দিলেন।

আমি কিন্তু ভাবছিলুম, এত তাড়াতাড়ি অন্তর্ধান করার অর্থ প্রথমত লেখা ছাড়া আমার বিরুদ্ধে অন্য কোন চার্জ নেই, আর [illegible] অপরাধে পরের অবস্থাই মুক্তি, সুতরাং কিছুদিন নিরাপদে কাটাতে পারলেই ছেড়ে দেবে।

যাই হোক, পরদিন সকালে মোটর এল [illegible] একজন [illegible] সাব ইন্সপেক্টরের সঙ্গে রওনা হলুম। এত মোটর পার করা [illegible] চমক [illegible]।

জলপাইগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ি ৩৮ মাইল। সারা ভরন আলিপুর ডুয়ার্স ৩০ মাইল। কুচবিহার ২৪ মাইল। ফালাকাটা থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী রেল স্টেশন জঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ে টার্মিনাস মাদারীহাট ১৫ মাইল। বেদিক দিয়ে যাও, বেশ কয়েক ঘণ্টা গরুর গাড়ী চড়তে হয়। তাই মোটরের ব্যবস্থা হয়েছিল।

সহরের সামানা পার হওয়ার পরই মোটর সটান গড়গড়িয়ে নেমে গেল তিস্তা নদীর গর্ভে জলের মধ্যে এবং বেশ কিছুদূর সেই অগভীর জলের মধ্য দিয়ে দৌড়ে মোটরটা উঠলো চড়ার উপর। আবার চড়ার উপর দিয়ে দৌড়। তারপর তিস্তার মাঝের প্রধান ধারা রীতিমত নদী। সেখানে চড়ার ধারে অপেক্ষা করছিল প্রকাণ্ড একজোড়া মাচা বাঁধা নৌকো। মোটর উঠলো সেই নৌকার উপর, নৌকা ছাড়লো। তারপর বেশ কিছুক্ষণ যাওয়ার পর সে নৌকা গিয়ে ভিড়লো আর এক চড়ায়। আবার মোটর চড়ায় নেমে দৌড় দিলো। তারপর আর এক দফা অগভীর নদীগর্ভে নেমে জলের মধ্য দিয়ে চলে মোটর গিয়ে উঠলো তিস্তার অপর পারের বার্নেশ জংশনে। ছোট রেল বি ডি-আর সেখান থেকে গেছে মাদারীহাটে। বর্ষাকালে তিস্তার এই তিন ধারা মিলে নদীর রূপ হয় বিরাট ও ভয়ঙ্কর।

বার্নেশ থেকে বেশ প্রশস্ত এক পিচ ঢালা পাকা সড়ক সিধে চলে গেছে চা-বাগান অঞ্চলে, আমাদের মোটর সেই সড়ক ধরে চললো। কিছু পরেই জলঢাকা নদী, বেশ বড় নদী, তার উপর নতুন পুল তৈরী হয়েছে ঐ পিচঢালা রাস্তার সঙ্গে। শুনলুম দু'লাখ টাকা খরচ হয়েছে। প্রায় সিকি মাইল লম্বা সুন্দর পুল। এখনকার দিন হলে সাত্য খরচ হতো ১০ লাখ এবং বিল হতো ২০ লাখ।

পুল পার হয়ে কিছুদূর গিয়ে ময়নাগুড়ি থানা ও বাজার।

ময়নাগুড়ির পর ধূপগুড়ি থানায় পৌছালুম। ধূপগুড়ি ছাড়ার পরই আমাদের মোটর পিচ ঢালা সড়ক ছেড়ে ডাইনে ঘুরে পড়লো কাঁচা রাস্তায়। দু দিকে মাঠ, ক্ষেতভুঁই এবং দূরে জঙ্গল, মাঝে মাঝে বেশ বড় নিবিড় জঙ্গল। জঙ্গলে বাঘ তো থাকেই, একটা জঙ্গল নাকি ভাল্লুকের আড্ডা। পথে অনবরত একটার পর একটা ছোট ছোট পুল বা কালভার্ট।

এরই মধ্যে হঠাৎ এল তোরসা নদী—স্বল্পপরিসর গভীর পার্বত্য নদী, একটানা প্রবল স্রোত। উঁচু পাড়ের মাঝে খানিকটা পাড় ভেঙ্গে খেয়াঘাট তৈরী হয়েছে। আমাদের মোটর হুড়মুড় করে নামলো সেই খেয়াঘাটে এবং আবার এক মাচা বাঁধা জোড়া নৌকোয় গিয়ে উঠলো। মাঝিরা লগি ঠেলে খানিক উজানে গিয়ে এমন এক কৌশলে নৌকোটাকে

বাইরের দিকে ঠেলে দিলে যে নৌকোখানা এক চোটে খানিক ভাঁটিতে অপর পারের ঘাটে গিয়ে লাগলো। মোটর আবার পাড় ভেঙ্গে উঠে ছুটলো মেঠো পথে। অনেকক্ষণ অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে ঝাঁকানি খেতে খেতে দুপুর পার হওয়ার পর পৌঁছালুম ফালাকাটার সীমানায়। একটা জঙ্গল-ভরা খালের পুল, শুনলুম সেখানে বাঘ থাকে।

পুল থেকে সিধে আধমাইলটাক পথ এলেই ফালাকাটার কেন্দ্রবিন্দু একটা তেমাথা। ঐ আধ মাইলের মধ্যে তহশীলদারের অফিস ও কোয়ার্টার, একটা ছোট আমলা পাড়া, একটা মাইনর স্কুল, পোষ্ট অফিস প্রভৃতি। আর তেমাথার এক দিকে কয়েকখানা বাড়ী ও দোকান এবং তার পর হাটখোলা, আর অন্যদিকে থানা। তারপর একটা কালীবাড়ী এবং তারপর এক জোতদার, কনট্রাক্টরের বাসা। থানার পেছন দিয়ে একটা ছোট রাস্তা হাটখোলার আর একদিকে গিয়েছে, সেখানে এক বড় জোতদারের বাড়ী, নাম বংশীধর তেওয়ারী, কানপুরের লোক, দারোগাকে দেখলেই আগে সেলাম করেন এবং তিনিই আমার একজন non-official visitor। আর একজন non official visitor এক মুসলমান বড় জোতদার, হাটখোলার পথে বড় বাড়ী। তিনি থানার এক্কালোক, মামলার তদ্বির ও ঘুষঘাষের permanent tout, আমার সঙ্গে তার খুব খাতির হয়েছিল, তিনি বলতেন, detenu বাবুর সঙ্গে মেলামেশায় আমার কোন ভয় নেই, আমাকে তো স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেটই বলে দিয়েছেন দেখাশুনা করতে। তিনি বুঝেছিলেন, আমার চাকর না থাকলে চাকর খুঁজে দেওয়া, কাঠ না থাকলে কাঠ যোগাড় করে দেওয়া, এই সব হল তাঁর সরকারী ডিউটি!—মন্দ নয়।

ফালাকাটা ডুয়ার্সের খাসমহালের অন্তর্গত। ডুয়ার্স হচ্ছে ভোটানের তরাই অঞ্চল, আগে ভোটানের অন্তর্ভুক্ত ছিল, ইংরেজ এই তরাই অঞ্চলটা কেড়ে নিয়ে ভোটানকে পাহাড়ের উপর আটকে দিয়েছে। ডুয়ার্স unregulated territory, খাসমহাল, একজন Deputy Commissioner-এর শাসনাধীন, জলপাইগুড়ির জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এলাকার বহির্ভূত। Deputy Commissioner সাহেবের ভাল লোক বলে সুনাম আছে।

হিমালয়ের তরাই ডুয়ার্স ম্যালেরিয়ার ডিপো। এ এক সাংঘাতিক ধরনের ম্যালেরিয়া। প্রথমে এক বা দেড় দিন সমস্ত শরীরটা গামছা নিংড়ানোর মতন মোচড়াতে থাকে, রোগী হো হো শব্দে হাঁপাতে থাকে, তার পর জ্বর ওঠে ১০৫।৬ ডিগ্রী। যদি কয়েকদিনের মধ্যে রোগী সুস্থ না হয়, তাহলে প্রস্রাব রাঙা হয় এবং শেষ পর্যন্ত কালো হয়ে যায়। তখন প্রায়শঃই রোগীর মৃত্যু হয়। এই জন্যে রোগটাকে বলে Black water fever. এ রোগের একমাত্র নিদেনের ওষুধ ডাবের জল। ডাব এক টাকায় একটা পর্যন্ত বিক্রি হয় তখনকার দিনেই।

ডুয়ার্সের উত্তর অংশ গভীর বনজঙ্গল। বাঘ, ভাল্লুক, হাতী প্রভৃতি বন্যজন্তু প্রচুর। আর প্রচুর নানা রকমের সাপ, বড় বড় ময়াল সাপ পর্যন্ত। দক্ষিণ অংশেই মাঝে মাঝে লোকালয় আছে। বাঘের উৎপাত সর্বত্র বারোমাস—চিতাবাঘ। সময় সময় হাতীর দলও হানা দেয় জঙ্গল সংলগ্ন লোকালয়ে, এবং বড় অজগর সাপও মাঝে মাঝে আসে এবং মারা পড়ে।

সাধারণ অধিবাসী প্রধানত রাজবংশী এবং মেচ প্রভৃতি আর দু-একটা অনুন্নত জাত। মাঝে মাঝে ২।১০ জন সাঁওতালও আছে। লোক ক্রমশ বাড়ছে এবং ক্রমশ জঙ্গল অঞ্চলে চাষের জমি বাড়ছে। এর জন্যে সরকারী ব্যবস্থা চমৎকার। প্রথমে তিন বছর পর্যন্ত খাজনা দিতে হয় না, তারপর সামান্য খাজনা। ঐ সব অনুন্নত জাতের অনেক লোক বিনা খাজনায় জমি পাবে বলে অনেক খেটে খুটে জঙ্গল সাফ করে সাপ বাঘের সঙ্গে লড়াই করে' চাষের জমি তৈরী করে, এবং তিন বছরে যখন রীতিমত ফসল হয়, তখন সামান্য খাজনা কবুল করেই থেকে যায়। আর এক ধরনের লোক আছে, নির্বোধ, তারা তিন বছর পরে ঐ তৈরী জমি ছেড়ে দিয়ে আরো জংলা জায়গায় চলে যায়, ঐ বিনা খাজনায় জমি ভোগ করার জন্যে। তৈরী জমি যখন অন্য লোকে নেয়, তখন খাজনা একটু বেশী হয়। এমনি করে লোকবসতি এবং চাষবাস ক্রমশ উত্তর অঞ্চলে বেড়ে চলেছে, সরকারী আয়ও বাড়ছে।

অনেকে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের জাত হিসাবে "বাহে" বলে জানেন, কিন্তু "বাহে" কথাটা ওদের কথার মাত্রা—জাতটা রাজবংশী। দরিদ্র অজ্ঞ অনুন্নত জাত বলে তথাকথিত উন্নত জাতের লোকেরা ওদের নীচু চোখে দেখতো। একজন রাজবংশী লেখাপড়া শিখে উকীল হয়েছিলেন, কিন্তু বার লাইব্রেরীতে অন্যান্য উকীলেরা তাঁর সঙ্গে বসতেন না। সেই লোকই রাজবংশীদের মধ্যে আন্দোলন করে "রাজবংশী ক্ষত্রিয়" বলে সকল রাজবংশীর উপাধি প্রচলন করেন "বর্মণ"—এবং সকল রাজবংশীর উপবীত ধারণেরও প্রবর্তন করেন। এখন সকলেরই গলায় উপবীত, সকলেই বর্মণ—হুম্পটু বম্মোন, ঝম্পটু বম্মোন, খোট্ট বম্মোন প্রভৃতি। অবশ্য তার সঙ্গে যুধিষ্ঠির-দুর্যোধনও আছে।

রাজবংশী, মেচ প্রভৃতি ও দেশীয় লোকদের পোশাক বড় মজার, কাপড়-জামা পরার চলনই যেন নেই। মেয়েরা একখানা পাঁচ হাতি কাপড়ের টুকরো বুকের ওপর থেকে লুঙ্গীর মতন পরে। আর পুরুষদের অঙ্গে মোটমাট একটা ছ'ইঞ্চি চওড়া ও ফুট দুই লম্বা ন্যাকড়ার ফালি, কোমরের ঘুনসির সঙ্গে একটা মুড়ো পিছন দিকে বেঁধে কপনীর মতন ঘুরিয়ে সামনের দিকে এনে ঘুনসির মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে আর একটা মুড়ো কোলের সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া। এঁটে বাঁধার গরজটুকুও নেই। মাঠে দেখা যায় চাষী এই বেশেই জমিতে হাল দিচ্ছে, বাড়ীতেও এই বেশ। হাটে বাজারে আসার জন্যে একখানা সাত হাতি কাপড় অনেকে রাখে। হাট থেকে ফিরে বাড়ীর কাছে যেতে না যেতেই সেটা খুলে ফেলতে পারলে বাঁচে—বলে, গরম লাগে!

জোয়ান ছেলেরা ক্রমে মডার্ণ হচ্ছে, ঘাড়ের চুল মিহি করে ছাঁটে, তার উপর দিয়ে একটি টিকিও হয়ত ঝোলে, সামনে তেল চুকচুকে টেরি। ঠিক এমনি একটি জোয়ানকে হাটে আসতে দেখলুম—কাঁধে 'বাঁক' দুদিকে দুঝুড়ি তরকারী, তারই একটার ওপর ছোট একখানা কাপড় জড়ো করা আছে, কর্তা চলছেন ঐ ছ'ইঞ্চি চওড়া ন্যাকড়ার ফালি পরে। হাটের কাছে গিয়ে কাপড়খানা পরবেন! সহর বন্দরে কাপড় না পরলে চলে না, তাই।

ভাষার বাহার চমৎকার। "আপনি" কথাটা স্রেফ জানেই না, কিন্তু "তুমি" বা "তুই" এর সঙ্গে বেমালুম আসেন, যান, কন, বসেন বলে। কথার মাত্রা বাহে কিম্বা

বারেহে—আমরা যেমন বলি বাপু রে কিম্বা বাপু হে। আমি-তুমি গুলো বহুবচনেই বলে হামড়া বা তোমড়া। তার সঙ্গে একটা লা (গুলা) জুড়ে দিয়ে হামাল্লা বা তোমাল্লাও বলে। মনিব যখন চাকরকে হাঁক দিয়ে ডেকে বলে "এত্তি আসেন রে" অর্থাৎ "এ দিকে আয়"—তখন অদ্ভুত ঠাট্টা মনে হয়। তারপর যখন শুনবেন, চাষা গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং গরুটা কিছু এদিক-ওদিক চলছে দেখে চাষা এক ঘা ডাণ্ডা মেরে রেগে বলছে, শালাড় গড়ু, ওত্তি কোটে যান? এত্তি ঘাটা দেখেন না?" (ওদিকে কোথায় যাস? এদিকে পথ দেখতে পাস না?) তখন হেসে না ফেলে উপায় আছে?

মানুষগুলো কিন্তু অদ্ভুত সরল। নিজের বয়েস অনেকে বলতে পারে না। এক বুড়ো চৌকিদারকে বয়েস জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, কাঁয় জানে এলা, কত বা হৈল,—তোমরা পছন্দ করি ন্যান্ কেনে।" বলল সেই যখন বড় ভূমিকম্প হয়েছিল (ভূমিকম্পকে কি বলেছিল, ভুলে গেছি) "স্থালায় মুই গাবুর হচুঁ" অর্থাৎ তখন আমি জোয়ান। ঠাট্টা করে বলা হল, তবু একটা একটা আন্দাজ করে বলনা, ১২।১৩ বছর হবে? সে একটু বিপন্ন ভাবে বলল, "কাঁয় জানে, তা হবার পারে!"

এমন রেওয়াজও নাকি আগে ছিল, থানায় এজাহার লেখাতে এলেই যে টাকা দিতে হয়, এটা সর্ববাদীসম্মত। আর আসামীর বিরুদ্ধে মামলা হবে যত (নম্বর) ধারায়, ফরিয়াদী দারোগাকে তত টাকা দেবে। আবার, ওদের ধারণা, ধারার নম্বর যত বেশী, মামলা ততই কড়া। ৩০২ ধারার মামলায় (খুন) ৩০২ টাকা, আর ৩২৬ ধারায় (সাংঘাতিক আঘাত) ৩২৬ টাকা। ২৪টা টাকা বেশী পাবার জন্যে দারোগারা নাকি ৩০২ এর মামলাকে ৩২৬ করে দিয়ে বলতো দিয়েছি ঠুকে ৩২৬। ফরিয়াদী সন্তুষ্ট হয়ে ৩২৬ টাকা দিয়ে যেত।

যাই হোক, ফালাকাটা থানায় নাম লিখিয়ে আমার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে জিনিসপত্র রেখে একজন কনষ্টেবল সঙ্গে নিয়ে হাট দেখতে চললুম, সেদিন হাটবার। বেশ বড় হাট। দারোগা এক চাকরও জোগাড় করে রেখেছিলেন, ডান হাতটা প্রায় কনুয়ের কাছ পর্যন্ত কাটা। দেখে কেমন পুলক লাগলো, তা বলা বাহুল্য। সেও সঙ্গে গেল।

বাজারে প্রচুর চাল বিক্রি হচ্ছে মোটা, বেঁটে, বিশ্রী। বিক্রি হচ্ছে, ১৯।২০ হিসেবে টাকায় ১৩ থেকে ১৬ সের দরে। খোঁজ নিয়ে আবিষ্কার করলুম ভোগ ধানের আতপ খুব সরু ও ছোট এবং চমৎকার সুগন্ধ—৬ টাকা মণ। তা-ই কিছু সংগ্রহ করলুম। মোটা চালের চিঁড়েও বিক্রী হচ্ছে প্রচুর। সেই চিঁড়ে নাকি বাহেরা আধসের খায় একবারে। গুড়ের নাগরীর মতন ছোট কলসীতে দই বিক্রী হচ্ছে—পচা টকো দই, বুদ্‌বুদ্ উঠছে। শুনলুম, জ্বরে বাহেদের পথ্য হ'চ্ছে আধসেরটাক ঐ মোটা চিঁড়ে এবং আধসেরটাক ঐ টকো দই। চিঁড়ের ওপর দই ঢেলে খাবলা খাবলা করে খেয়ে ফেলে!

হাটে মাছ প্রায় নেই, শুনলুম শীতকালে ভাল মাছ পাওয়া যাবে। শীতকালে ভাল মাছ যা পাওয়া যায় দেখেছি, সত্যিই ভাল চমৎকার চওড়া কই মাছ ।৶টায় একসের, যা আর কোথাও দেখিনি। অন্যান্য মাছও কিছু আসে, মামুলী। আর বুড়ী তোরসার ইলিস, সে এক অপূর্ব জিনিস। গোবর-মাটি চটকে ছাঁচে ফেলে রং করে দিলে যেমন হয়। ইলিস-কুল-কলঙ্ক !

চাকর ছোকরা না কি অনেক একক অফিসারের কাছে কাজ করেছে, combined hand, ঠাকুর-চাকর। দেখলুম, সত্যিই চমৎকার, তার ঐ একটা মাত্র হাতে যেন ভেল্কী খেলে। হাতা-খুন্তি-চামচ চালায় অবিরাম ও নিপুণভাবে। রান্নায়ও ওস্তাদ এবং অসম্ভব চটপটে। দেখতে দেখতে ঐ দেড়টা হাতে কাঠের উনুনে ভাতে ভাত নামিয়ে খাইয়ে দিলে। খেয়ে তৃপ্তি হল আশাতীত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও আশাতীত।

রাত্রে কি ব্যবস্থা হবে? সে জিজ্ঞাসা করলে মুরগী খান? আমি সংশয়িত চিত্তে বললুম খাই। সন্ধ্যা বেলা সে এক বাচ্ছা মুরগী, কাটা ও ছাড়ানো, নিয়ে এল। কত দাম? সে বললে চৌদ্দ পয়সা। ১০।১২ পয়সায়ও পাওয়া যায়, আমি একটু বড় দেখে আনলুম!

সুতরাং পাকা ব্যবস্থা হয়ে গেল—দিনের বেলা নিরিমিষ্যি, আর রাত্রে মুরগী। এমনি চললো প্রায় তিন মাস। তারপরে মাঝে মাঝে ভাল মাছ চললো। এত সস্তায় এত ভাল খাওয়া আর কোথাও হয়নি।

যে দারোগা প্রথমে আমাকে জমা নিয়েছিলেন, তিনি কয়েকদিন পরেই বদলী হয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন মুসলমান, এখন এলেন এক হিন্দু দারোগা, উমাচরণ বিশ্বাস, জাতিতে সূত্রধর। দুজনেই লোক ভাল। উমাচরণবাবু একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, "গিরীনদাকে চেনেন? গিরীন বন্দ্যোপাধ্যায়? '১৬ সালে আমি যখন পচাগড়ে ছিলুম, তিনি সেখানে ডেটিনিউ ছিলেন। আমাকে খুব স্নেহ করতেন।" সুতরাং তাঁর সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। কিন্তু তিনিও কিছু দিন পরে বদলী হয়ে গেলেন! এলেন এক মুসলমান দারোগা—পাজির পা-ঝাড়া, কিন্তু ভীতু। সুতরাং আমিও কোমর বাঁধলুম।

আমার ঘরটা ছিল ভাল, থানার মতনই পাঁচফুট উঁচু প্ল্যাটফরমের ওপর টিনের চালের ঘর। মোটা শালের থাম্বার ওপর চওড়া মোটা তক্তার প্ল্যাটফরম। তৈরী হয়েছিল ইনস্পেকটিং অফিসারদের সাময়িক বাসের জন্যে। বাঘ ও সাপের উৎপাত এড়ানোর জন্যেই এমন ব্যবস্থা। রাত দশটার পর লোক রাস্তায় বেরোয় না, বেরুলে অন্তত দুজনে বেরোয় লণ্ঠন নিয়ে। বাঘ অবশ্য চিতা—মানুষখেগো নয়, কিন্তু মানুষকে থাবাথুবি মেরে পালায়। লোকের বাড়ী থেকে ছাগল, বাছুর, এমনকি কুকুর পর্যন্ত ধরে নিয়ে যায়। তহশীল অফিসের একজন কর্মচারী ভাল শিকারী, একদিন পুলের জঙ্গল থেকে এক বাঘ মেরে আনলেন। দেখলুম, মাথা থেকে ল্যাজের ডগাপর্যন্ত ফুট আষ্টেক লম্বা। স্কুলে বাংলা পড়ান এক মুসলমান যুবক "পণ্ডিত সাহেব"—তিনিও শিকারী। দুজনেরই বন্দুক আছে।

আমার ঘর এবং কালীবাড়ীর মাঝে আমার non official visitor মুসলমান জোতদার সাহেবের একটা বড় টিনের গুদাম আছে ধান বোঝাই। তার পিছনে ছোট্ট মেথর পাড়া। তার পাশে কালীবাড়ী সংলগ্ন একটা আনারসের ক্ষেত। একদিন দুপুর বেলা সেখানে এক হৈ হৈ কাণ্ড। সেখানে একটা ছাগল চরছিল, হঠাৎ তার পরিত্রাহি চিৎকার শুনে মেথররা গিয়ে দেখে, এক অজগর সাপ ছাগলটাকে পিছন থেকে কামড়ে ধরে তার পিছনের পা সমেত পেটটাকে জড়িয়েছে। তারা ঢিল মেরে চেঁচামেচি করতে সাপটা ছাগলটাকে ছেড়ে দিয়ে পিছনের খানার জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেছে। ব্যাপারটা শুনে দারোগা বন্দুক নিয়ে গেলেন, মেঘনাদ নামক এক কনষ্টেবল ছুটলো একটা কাঁচা নিয়ে।

আমরা আরো অনেকে গেলুম। সকলে যখন হতাশ হয়েছে, মেঘু বলে, শালাকে খুঁজে বার করবোই। এখানেই কোনো গর্তে ঢুকেছে।

মেথররা দা-কোদাল-খন্তা নিয়ে থানার জঙ্গল কাটতে শুরু করলো। একটু সাফ হতেই একপাশের পাড়ে একটা ফাটল দেখা গেল। মেঘুর উৎসাহে মাটি কাটা শুরু হল এবং একটু পরেই তেল চুকচুকে বিচিত্র নক্সা দেখা গেল। এক মেথর এক কোদালের কোপ দিলে এবং মেঘু কঁ্যাচা দিয়ে তাকে গিঁথে ফেললে। তারপর মাটি কেটে বার করা হল অপরূপ বিচিত্র বর্ণ প্রকাণ্ড সাপ, ফুট দশেক লম্বা, মাঝখানটা আমার উরুর মত মোটা। সাপটার গলার খানিক নিচেই কোদালের কোপ লেগে একপাশের অর্ধেকটা কেটে গেছে। তার গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে মেথু আর মেথররা টানতে টানতে তহশীল অফিস এবং জোতদার বাবুদের বাড়ী বাড়ী দেখিয়ে কিছু বখশিস পেল। তারপর সেটাকে ফেলে দিয়ে এল পুলের নীচের জঙ্গলে।

এরই মধ্যে একদিন থানায় গিয়ে দেখি নতুন S. D. O. এসেছেন—বেশ লম্বা সৌম্যমূর্তি এক সাহেব, নাম বোধ হয় Baker, আমার মনে হল হিজলীতে গুলী চলার সময় সেখানে এই নামের Commandant ছিলেন। আমি একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করলুম, তিনিই কি হিজলীতে ছিলেন? সাহেব বললেন, হ্যাঁ, তুমিও কি হিজলীতে ছিলে? আমি বললুম, না, আমি নামটা শুনেছিলুম। Baker সাহেবেরও ভদ্রলোক বলে সুনাম আছে।

আবার তার কিছুদিন পরে এক ছোকরা-সাহেব এলেন, নতুন S. D. P. O. নাম বোধ হয় জর্জ, মেদিনীপুর থেকে বদলী হয়ে এসেছেন। পরে শুনলুম, ইনিই মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জ সাহেবের হত্যাকারী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যকে পিছন থেকে দৌড়ে গিয়ে ধরেছিলেন। বুঝলুম, Backward অঞ্চল বলে এখানেই বাছা বাছা মাল পাঠানো হচ্ছে।

'৩২ সালের শেষ এবং '৩৩ সালের গোড়া এই সময়টার মধ্যেই মেদিনীপুরে পর পর তিনজন ম্যাজিষ্ট্রেট বিপ্লবীদের (বি ভি দল) হাতে খুন হয়েছে। তার পর আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট গার্লিক খুন হয়েছে এক ১৬।১৭ বছরের তরুণের হাতে। সব কথা ঠিক ঠিক মনে নেই এবং সময় সম্বন্ধে আগু পিছু গণ্ডগোল হয়ে গেছে। যতদূর মনে আছে, মেদিনীপুরে কৃষ্ণজীবন ঘোষ এবং প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ফাঁসী হয়েছিল, আর একজনের কথা মনে নেই। আর গার্লিকের আততায়ী কোর্টের মধ্যে গুলী করার পরই বোধ হয় পটাসিয়াম সায়েনাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তার নাম বা পরিচয় কেউই জানতে পারেনি অনেক-দিন পর্যন্ত। শেষে জানা গেছে, তার নাম কানাই ভট্টাচার্য, জয়নগরে বাড়ী, যুগান্তর দলের সাতুদার চেলা। পুলিস তার নামে হুলিয়া করে তার ফটো সমস্ত রেলষ্টেশনে টাঙিয়ে রেখেছিল, কিন্তু জয়নগরের কোন লোকও সে ফটো সনাক্ত করেনি।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর সরকার যে সন্ত্রাসবাদ চালিয়েছিল, তাতে বিপ্লবীদের সাহেব মারার কর্মসূচীও একটা "মরিয়া" জেদে পরিণত হয়েছিল। আবার তার জবাবে শেষ পর্যন্ত সরকার বাহাদুর Suppression of Terrorism Act নামে এক অদ্ভুত কালাকানুন তৈরী করেছিলেন। এতদিন পুলিস রিপোর্টে শুধু বিনা বিচারে আটক চলতো, এবং মামলা ও জেল-ফাঁসি হত খুন-ডাকাতির সম্পর্কে। নতুন কালাকানুনে পুলিস রিপোর্টের

উপর নির্ভর করেই যাকে তাকে ধরে মামলার ঢং করে ছ'মাস কারাদণ্ড দেওয়া হতে লাগলো। কারো ওপর সন্দেহ হলেই পুলিস অবাধে তার বাড়ী সার্চ করে, এবং বেআইনী কিছুই না পেলেও, একখানা স্বদেশী বই মাত্র, যেটা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত বইও নয়, পেলেই "undesirable book" বলে মালিককে ঐ আইনে জেল দিত।

নিরুপায় ক্রোধে জেলে এবং বাইরে বিপ্লবীরা বলতো, আর একটা যুদ্ধে ইংরাজ জড়িয়ে পড়লে আমরা এর শোধ নেবো। পরে আর একটা যুদ্ধ সত্যিই যখন এল, তখন দুই বৃহত্তম বিপ্লবী দল—যুগান্তর এবং অনুশীলন গান্ধী কংগ্রেসে ডুবে গলে' মিশিয়ে গেছে। চেষ্টা করেছিলেন একমাত্র সুভাষবাবু।

এই সময়ে ('৩২-'৩৩ সাল) সুভাষবাবু ইউরোপে ছিলেন। ভারতে কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃতি ও পরিণতি দেখে তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন, কংগ্রেস অহিংসা নীতি ছেড়ে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ধরতে পারে কি না। এই প্রশ্ন নিয়ে তিনি বিশ্ব-বিখ্যাত ফরাসী মনীষী রোমা রোলাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে যদি অহিংসা নীতির অযোগ্যতা প্রমাণিত হয়, যদি অহিংসা নীতি স্বাধীনতা অর্জনে ব্যর্থ হয়, তাহলে আমাদের পক্ষে অন্য পন্থা অবলম্বন করা কি অন্যায় হবে? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, না, অন্যায় হবে না।

সুভাষবাবু সশস্ত্র বিপ্লবের কথা ভাবেন অথচ কংগ্রেসের নামেই সেটা করতে চান, মহাত্মার আশীর্বাদের মোহ কিছুতে ত্যাগ করতে পারেন না, তাঁর ব্যর্থতার মূল এইখানে। পরবর্তীকালে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখা গেছে। সে সব কথা যথাসময়ে আসবে।

যাই হোক, ইতিমধ্যে ফালাকাটায় আর একজন ডেটিনিউ রাখার ব্যবস্থা হল, একটা নতুন ঘর তৈরী হল, বাঁশের উঁচু মাচার উপর খড়ের চাল ও দরমার বেড়া দেওয়া বেশ বড় ঘর। নতুন ডেটিনিউ এলেন বরিশালের এক তরুণ জীবন গুহঠাকুরতা, অনুশীলন দলের লোক। আমি অনুশীলন দলের নয় দেখে তিনি একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হল আমার সঙ্গেই Joint mess.

পড়াশুনার বইটই বিশেষ কিছু ছিল না, একখানা Pears' Cyclopedia ছিল, সেখানাকেই পড়ে শেষ করেছিলুম। এর Agarpara is also called Barrackpore এটা দেখে মনে হল, এই রকম কত নির্ভুল তথ্যই না আমরা ঐসব বই থেকে পেয়ে থাকি।

অমরদার (চ্যাটার্জি) কাছে কিছু বই চেয়ে চিঠি লিখেছিলুম, এবং তিনি পাঠিয়েছিলেন Book of Knowledge-এর ১২টা ভল্যুমের মধ্যে ৬টা, আরগুলো নাকি কে কে পড়তে নিয়ে গিয়ে আর ফেরৎ দেয়নি। যাই হোক, তাতে আমার লেখাপড়ার খোরাক ছিল যথেষ্ট। কিছু কিছু অনুবাদও করতুম, এবং "বিড়ির ধোঁয়ায়" নাম দিয়ে একটা ডায়েরীর মতন লিখতুম, তার মধ্যে আমার চিন্তাধারাও গেঁথে রাখতুম।

হঠাৎ একদিন বিনা নোটিশে হডসন (S. P) এসে হাজির। থানার হাতায় একটা অশ্বত্থ গাছের গোড়া মাটি দিয়ে বাঁধিয়ে সেখানে 'হিন্দু কনষ্টবলেরা একটা নুড়ি শিব রেখে পূজো করতো। একজন সেটার চারিদিকে খানিক জায়গা নিয়ে একটা বেড়া দিয়েছে। সাহেব বোধ হয় খবর পেয়েছিলেন, এবং বোধ হয় মুসলমান পুলিসদের কাছ থেকেই। হডসন হুড়মুড় করে সটান সেই বেড়ার কাছে উপস্থিত। কে বেড়া দিয়েছে?

একজনকে গিয়ে দাঁড়াতেই হল; সাহেব তার কিছু জরিমানা করে বেড়া ভাজিয়ে দিয়ে, তবে ঠাণ্ডা হলেন।

তার পর নতুন ডেটিনিউয়ের ঘর হয়ে আমার ঘরে এসে উঠলেন। আমি একটা নতুন রকমের কথা পাড়লুম, "জেল থেকে internment-এ পাঠায়, এবং তার পরের ধাপে release করে দেয়, এই তো রেওয়াজ। আমি এখানে ছ' মাসের ওপর কাটালুম নির্বিবাদে, সুতরাং এখন আমার release due হয়েছে। আমি একটা দরখাস্ত করবো, তুমি কি recommend করবে?"

সাহেব বললেন, "তুমি দরখাস্ত করে দেখ, আমি duly forward করবো।"

সাহেব চলে যাওয়ার পরই আমি গুছিয়ে-গাছিয়ে এক দরখাস্ত লিখে দারোগার কাছে দিয়ে এলুম—মুক্তি প্রার্থনা করে নয়, আমার কেসের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিছুদিন অপেক্ষা করার পর জবাব এলনা দেখে একবার জলপাইগুড়ি যাওয়ার চেষ্টা শুরু করলুম। ম্যালেরিয়ায় ধরেছে এবং মাথাধরা লেগেই আছে, সুতরাং চোখের জন্যে আমার দুর্ভাবনা হয়েছে। হ্যারিকেনের আলোর দিকে তাকালে একটা আলোর ঝাঁটার মতন দেখি সুতরাং একবার চোখ পরীক্ষা করা দরকার। দরখাস্ত করলুম।

সে দরখাস্তের জবাব এল। জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে যাওয়ার অনুমতি পেলুম। দু'জন কনষ্টবল সঙ্গে দিয়ে আমাকে সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তখন জলপাইগুড়ির সিভিল সার্জন Dr. Young, যিনি '২৪ সালে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন, আমার চেনা লোক।

২।১ দিন হাসপাতালে রাখার ব্যবস্থা করে প্রস্রাব পরীক্ষা করে ক্যালসিয়াম অক্সালেট পাওয়া গেল প্রচুর। অ্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জন রিপোর্ট দিলেন অক্সালুরিয়া চোখের পক্ষে খারাপ। Dr. Young-এর সঙ্গে '২৪ সালের সুবাদে আলাপ হল। তিনি বললেন, হাসপাতালে opthalmoscopic examination-এর ব্যবস্থা নেই। কিন্তু চোখ দুটো একটু টিপে টুপে পরীক্ষা করে বললেন ভয় নেই।

হাসপাতাল থেকে ফেরার সময় S. P.-র সঙ্গে দেখা করলুম। তিনি বললেন, তোমার release এর দরখাস্ত আমি recommend করে পাঠিয়েছিলুম, আমি তো তোমার সম্বন্ধে কিছু জানতাম না। কিন্তু Calcutta I. B. তোমার যা history পাঠিয়েছে, তা দেখে I felt embarrassed. তোমার release-এর আশা নেই। তবে যদি তুমি একটা undertaking দাও, আমি আর একবার বলে দেখতে পারি।

বুঝলুম, এটুকুও Calcutta I. B.র instruction! বললুম আমি সরকারী undertaking-এর terms জানি, আমি তাতে সই করতে রাজী নই। সাহেব বললেন, কেন? তুমি তো বল, তুমি terrorism সমর্থন কর না? আমি বললুম, আমি একথা লিখে দিতে পারি যে, আমি terrorist movement-এর সঙ্গে সম্পর্ক আগেও যেমন রাখিনি, ভবিষ্যতেও রাখবো না। কিন্তু সরকারী গৎএর একটা সর্ত হচ্ছে, আমাকে যদি কেউ terrorism-এর দিকে টানতে চায়, আমি পুলিসকে সে কথা জানাবো। সে সর্তে আমি কিছুতেই রাজী নই on principle. সাহেব একটু উষ্মার সঙ্গে বললেন,—then remain here on principle.

পঁচিশ

শীঘ্র মুক্তির আশা নেই বুঝে মনটা খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু সে চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেললুম, What cannot be cured, must be endured.

একদিন বিকেলে বেড়িয়ে ফেরার পথে আম পথে কিনে ফিরছি, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দেখি, থানার বারাণ্ডায় দারোগা সাহেবের সঙ্গে বসে আছেন এক চা বাগানের বাঙ্গালী ম্যানেজার। দারোগা সাহেব একটু মুখ টিপে হেসে বললেন, ৬টা বেজে গেছে। অর্থাৎ Govt order violate করেছি। আমি "হুঁ" বলে চলে এলুম এবং কতকগুলো আম কেটে, কিছু নিজেদের জন্যে রেখে কিছু ওদের পাঠিয়ে দিলুম।

কয়েকদিন পরে ঠিক এইভাবে আর একদিন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ওঁরা দুই মূর্তি বসে আছেন, দারোগা সাহেব আবার মুখ টিপে হেসে বললেন, সেদিন তো আম খাওয়ালেন, আজ কি খাওয়াবেন ?

ইঙ্গিতটা ভাল লাগলো না—বললুম, এইবার একদিন কানমলা খাওয়াতে হবে। বাইরের একজন ভদ্রলোকের সামনে চাল মারছিলেন, এখন আমার কথায় অপ্রতিভ হয়ে কাষ্ঠহাসি হেসেই বললেন, তা আপনারা পারেন।

দুর্গোৎসব এল, বারোয়ারী দুর্গা পূজা হল। বিসর্জনের দিন বিকালে দারোগা সাহেব ও জোতদার সাহেবের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি, প্রতিমা নিয়ে মিছিল চলেছে, প্রতিমা দেখে জোতদার সাহেব বললেন, "হুঃ, হিন্দুদের কি কাণ্ড—ভগবানের আবার বউ, ছেলে, মেয়ে !"

আমি একটু শ্লেষের সুরে বললুম, "হাঁ"—আল্লার একজন পিওন থাকলেই চলে, (মহম্মদের কাছে দেবদূত) সেটা চাই-ই।"

দারোগা সাহেব চোখ টিপে দিলেন, জোতদার সাহেব চেপে গেলেন। তারপর বাসায় ফেরা পর্যন্ত সবাই গম্ভীর। এমনি করে আমার ওপর দারোগা সাহেবের বিরাগ দানা বাঁধছিল।

আমিও একটা লড়াইয়ের জন্যে তৈরী হতে লাগলুম। কারুরই কাজকর্ম নেই, অফুরন্ত সময়, দারোগা সাহেবের তাসের নেশাও আছে, ব্রে খেলার। একটা তাসের আড্ডাও গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। ওদের আড্ডা, আমি পরে যোগ দিয়েছিলুন। আমাকে নেওয়ার পর দারোগা সাহেব একটা নতুন খাতা কেড়েছিলেন, এক ইঞ্চি মোটা, পেজ নম্বর দেওয়া একটা জেনারেল ডায়েরী বুক। দারোগা সাহেবের নেশা বেশী, কাজেই উনিই পয়েন্ট লিখতেন। নিয়মিত খেলোয়াড় দারোগা সাহেব, জমাদার বাবু, আমি এবং জোতদার সাহেব।

দারোগা সাহেব খাতায় আমাদের তিনজনের, নাম লিখতেন এবং নিজের নামের একটা ইনিসিয়্যাল লিখতেন, ঠিক যেমন ইনিসিয়্যাল তিনি অফিসিয়্যাল কাগজপত্রে দিয়ে থাকেন।

আমি সেই জেনারেল ডায়েরীর দুটো পেজ-নম্বর দেওয়া পাতা, দারোগার হাতের লেখা এবং ইনিসিয়্যাল দেওয়া ব্রে খেলার পয়েন্ট লেখা পাতা, একদিন লুকিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে

রেখে দিলুম, দারোগা আমায় কোনোদিন ল্যাং মারতে এলে সেই কাগজ দুটো হবে আমার মোক্ষম ল্যাং।

পূজোর পর থেকে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়ে। আমাকেও ধরলো ভাল করেই। কলকাতায় বদলীর জন্যে লেখালেখি শুরু করলুম। বাজারে তখনো মাছের আমদানী নেই। অসুখের পর পথ্যের জন্যে জাওলা মাছ খুঁজে পেতে যোগাড় করতে হয়।

একবার অসুখের পর হাটে গিয়ে কিছু শিঙিমাছ পেয়ে, দর করে দাম দিয়ে চলে এসেছি, চাকর গিয়ে নিয়ে আসবে। চাকর ফিরে এসে বললে, মাছ হাটবাবু নিয়ে গেছে, জেলে পয়সা ফেরৎ দিয়েছে। আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো, দারোগার কাছে গিয়ে নালিশ করলুম।

দারোগা আমাকে নিয়ে হাটে গিয়ে জোতদার সাহেবের আড়তে বসে জেলেকে ডেকে পাঠালেন, এবং হাটবাবুকেও। হাটবাবু বললেন, আমি আগে ওকে দাম দিয়ে গিয়েছিলুম। জেলেকে দারোগা সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে? হাটবাবু আগে দাম দিয়েছিল?" জেলে মাটির দিকে চেয়ে বললে "হ্যা"।

আমি হাটের মাঝে চীৎকার করে দারোগা সাহেবকে ধমক দিয়ে বললুম, "আমাকে এখানে কোর্ট দেখাতে এনেছেন? হাটবাবু জিনিস নেওয়ার আগে দাম দিয়ে জিনিস ফেলে রেখে যাবে, সাক্ষী দিয়ে বোঝাতে চান?" বলে' রেগে এবং বেগে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলুম।

কিন্তু এমন করে আমাকে বেকুফ বানিয়ে চাল মেরে চলে যেতে দিলে চলবে না, দিনে দিনে জীবন দুর্বহ করে তুলবে। সুতরাং পাল্টা আঘাত একটা দিতেই হবে। ভেবে চিন্তে ডেপুটী কমিশনারের কাছে একটা নালিশের দরখাস্ত লিখে থানায় দিয়ে এলুম, মাছের মামলা নয়, তার চেয়ে বড় অন্য এক মামলা। দরখাস্ত দিয়ে এসে দেখি, চাকর মাছগুলো নিয়ে এসেছে।

আমরা অনেকদিন ধরে অস্পৃশ্যতা বর্জনের অনেক ঘটা করে এসেছি, কিন্তু ফানাকাটায় এসে যে সহজ ও সর্বাত্মক অস্পৃশ্যতা বর্জন দেখেছি তা অভাবনীয়।

গ্রামে অনেক খাটা পায়খানা আছে, এবং আমার ঘরের পাশেই মেথরদের পাড়া। তারা সকালে ময়লার টিন মাথায় করে নিয়ে যায়, সন্ধ্যাবেলায় হুকাহাতে অফিসের বাবুদের বাড়ী বাড়ী গল্পগুজব খেটে বেড়ায়। কারো বাড়ী গরুর জাবনা দেয়, মুসলমান বাবুদের বাড়ী গরুর দুধও দুয়ে দেয়, দোকান থেকে জিনিসপত্তরও কিনে এনে দেয়।

হাটবারে কাণ্ডটা হয় অদ্ভুত। হাটবাবুর আইনসঙ্গত কাজটা যে কি, তা জানতে পারিনি কিন্তু প্রত্যক্ষ, বেআইনী কাজ হচ্ছে হাট থেকে "তোলা" তোলা। তাঁর বাহিনী ঐ মেথরের দল। তারা ধামা নিয়ে হাটে ঘুরে প্রত্যেকের বিক্রেয় মালের এক এক খাবলা তুলে নেয় যদৃচ্ছভাবে। শুধু তরি-তরকারী নয়, চাল ডালও, এমন কি, চিঁড়ে-মুড়ি পর্যন্ত। সেইসব মাল নিয়ে গিয়ে জড়ো করা হয় ঐ মেথর-পাড়ারই উঠানে। তারপর বাঁকে করে' ভারে ভারে তারাই নিজেদের খরচা রেখে তহশীল অফিসের বাবুদের বাড়ী বাড়ী বণ্টন করে' আসে। স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতুম না। যখন প্রথম দেখি, তখন চমক লেগেছিল, পরে ক্রমে গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল।

এখন ডেপুটী কমিশনারের কাছে এই বেআইনী কাণ্ডের বিবরণ দিয়ে লিখলুম, "এই

অস্পৃশ্যতা বর্জনের আন্দোলনের যুগে আমি এসব কথা লিখতে সঙ্কোচ বোধ করছি, কিন্তু এইভাবে "তোলা" তোলাটা শুধু বেআইনী অত্যাচার নয়, স্বাস্থ্যসম্মত পরিচ্ছন্নতার একেবারে বিপরীত।"

ফল হল আশাতীত। তিন দিনের মধ্যে ডেপুটী কমিশনার আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে এক চিঠি লিখলেন, আর তহশীলদারের ওপর এমন কড়া এক হুকুম জারী করলেন যে, হাটে "তোলা" তোলা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

তহশীল অফিসের সংশ্লিষ্ট ২।১ জন লোক যেমন চুপি চুপি আমাকে বলে গেল ডেপুটী কমিশনারের কড়া হুকুমের কথা, তেমনিভাবে চাপা গুঞ্জরণে আমার রিপোর্টের কথাটাও "চাউড়" হয়ে গিয়েছিল। "জাগ্রত দেবতার" মতন আমার দরখাস্তের জোরের কথাটা প্রচার হয়ে গিয়েছিল। কনষ্টেবলরা আমাকে দিয়ে দরখাস্ত লেখাতে শুরু করেছিল।

শীতকালে নতুন ধান উঠলো, আমার ঘরের পাশে জোতদার সাহেবের গুদামে গাড়ী গাড়ী ধান উঠতে শুরু করলো। বাজারে নতুন ধানের দর ।।৵০ দশ আনা মণ!

জোতদার সাহেবের নিজের জমির ধান ছাড়াও খাতকদের কাছ থেকে আসছে প্রচুর ধান, গত বছরের, অর্থাৎ কয়েক মাস মাত্র আগের কর্জ দেওয়া ধানের হিসাবের আদায়ী ধান ।।০ আট আনা মণ হিসাবে!

এই অভাবনীয় ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারলুম না। পরে অনুসন্ধান করে যা জানলুম, তাতে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। দারিদ্র্যের চাপে নতুন ধান ওঠা মাত্র চাষারা কিছু কিছু ধান হাটে নিয়ে আসে, এবং আড়তদারেরা মহাজনেরাই এককাট্টা হয়ে যথেচ্ছ দামে সেগুলো কিনতে থাকে, তারাই দরটা দাবিয়ে রাখে। সাধারণ খরিদ্দার তখন থাকে না।

মহাজনেরা ওৎ পেতে বসে থাকে, খাতকের ঘরে ধান ওঠা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ে, গত বছরের "কর্জা" ধান আদায়ের জন্যে। হাটে যখন ।।৵০ দশ আনা মণ, এবং খাতকের বাড়ী থেকে বা জমি থেকে ধান নিয়ে আসার খরচটা যখন মহাজনকেই বহন করতে হবে, তখন ধানের দর ।।০ আট আনা মণ না হলে চলবে কেন? কিন্তু কতটা "কর্জার" পরিবর্তে কতটা আদায়?

অনুসন্ধান করে' একটা হিসাব পাওয়া গেল। মহাজনের পাওনা আদায় দিয়ে এবং কিছু বীজধান রেখে চাষাদের ঘরে যা থাকে তাতে মাত্র কয়েকমাস চলে, অনেকেরই এই অবস্থা। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে তাদের ধান কর্জ করে' খেতে হয়। জোতদাররাই সাধারণতঃ মহাজন। অন্য মহাজনও আছে। যে চাষা যে জোতদারের জমি চষে, সে কর্জ করতে আসে ঐ জোতাদারেরই কাছে। অন্যের কাছে যাওয়ার হুকুম নেই, গেলে নানাভাবে তাকে জব্দ করা হবে। কাজেই জোতদার মহাজনদের কাছে অনেক চাষাই চিরকাল বাঁধা থাকে। যাদের নিজেদের সামান্য জমি আছে, তাদের অনেককেও এমনিভাবে মহাজনের কাছে যেতে হয় এবং কারো না কারো কাছে বাঁধাও পড়তে হয়। চাষাদের এ জীবনে বিড়ম্বনা যেন চিরন্তন।

ধরুন সামনের আষাঢ় মাস নাগাদ হাটে ধানের দর চড়তে চড়তে দেড় টাকা মণ হল। আমার বন্ধু জোতদার সাহেবের প্রজা তাঁর কাছে এল ধান কর্জা নিতে। এখনো মাস পাঁচেক খেতে হবে, ৭।৮ মণ না হলে চলবে না। জোতদার ধম্‌কে-ধাম্‌কে ঠিক করলেন ৫

মণ দেবেন। হাটে ৫ মণের দাম ৭৷৷৹ সাড়ে সাত টাকা। মুসলমান হয়ে সুদ নিয়ে ধর্ম খোয়াতেতো পাবেন না! তাই ঠিক হল তিন টাকা মন হিসাব করে খৎ লিখে দিতে হবে ১৫৲ পনেরো টাকার! সামনের বছর নতুন ধান উঠলে হাটের দরে ধান নিয়ে খতের দেনা শোধ করতে হবে! অর্থাৎ ৩০ মণ ধানই হয়ত লাগবে ১৫৲ টাকার জন্যে।

সুতরাং সব কর্জা শোধ হবে না, হাতে পায়ে ধরে কিছু বাকি রাখতেই হবে, এবং তার জন্যে খৎ যেমন ছিল তেমনিই থাকবে! আবার কয়েকমাস পরে কর্জা, আবার আর এক দফা এই দুপুরে ডাকাতির পুনবাবৃত্তি!

বিশ্বাস হল না। বললুম, ধান ওঠার পর সব ধান তুলে নিয়ে এলেও তো শেষ পর্যন্ত সব কর্জা শোধ হবে না। ব্যাখ্যাকার বললে, মোট কথা, চাষাদের কয়েক মাসের খাওয়ার মতন ধান রেখে বাকিটা তুলে আনা হয়, খতের ওপর খৎ জমতে থাকে, এমনি চলে বছরের পর বছর। জোতদার-মহাজন যদি কোনদিন কারো উপর বেশী চটে যান, তাহলে তার মারণাস্ত্র সব সময়েই তাঁর হাতে মজুদ থাকে। হয়ত কারো জমি কেড়ে নেন, হয়ত কাউকে "গোলাম" করে রাখেন, এমনি ভাবেই চাষাদের একটা স্তরের জীবন চলে!

সারা দেশে কৃষকদের এই স্তরটাই যে সব চেয়ে বড, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বেঙ্গল ডুয়ার্সের খাসমহলে হয়ত অবস্থা অপেক্ষাকৃত ঘোরালো, কিন্তু সর্বনিম্ন স্তরের কৃষকদের অবস্থা সর্বত্রই মোটামুটি এই রকম।

সারা ভারতে কৃষকদের ঘাড়ে ঋণের বোঝার মোট পরিমাণ শোনা যেত ১২০০ কোটি টাকা। বলা হত, ঋণের ভারে তাদের মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে। আধ্যাত্মিক মেরুদণ্ডও যে বেঁকেই গিয়েছিল, তা রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে চমৎকার ভাবে:

"... শুধু দুটি অন্ন খুঁটি' কোন মতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
জানেনা সে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।"

তারপর এ সমস্যার সমাধানের পথের ইঙ্গিত দিয়ে তিনি লিখেছেন:

"এই সব মৌন ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা
এই সব দীর্ণ ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা,
ডাকিয়া বলিতে হবে,
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি, তখনই সে পলাইবে ধেয়ে
পথ কুক্কুরের মত।..."

ভাবাবেগে কবি সংঘবদ্ধ কৃষক-বিদ্রোহের কথাই বলে ফেলেছেন। কমিউনিষ্টিক আইডিয়া! তাই আজ সারা দেশে রবীন্দ্র জয়ন্তীতে ভদ্রলোকেরা রবীন্দ্রনাথের এ কবিতাটা বর্জন করেই তাঁর শ্রাদ্ধ করেন।

আমাদের বাংলার বিপ্লবী দলগুলোর আদি ও অকৃত্রিম বিপ্লবপ্রচেষ্টার মধ্যেও এটা হারাম। গান্ধী-কংগ্রেসের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শাস্ত্রেও এটা হারাম। বিপ্লব বা স্বাধীনতা কাদের জন্যে? এ প্রশ্ন তোলাটাও হারাম।

ভারত মাতা আসলে ভারতের ম্যাপ-মাতা। মানুষের কথা মাত্র একটা কথায় পর্যবসিত—ভারতবাসী। দেশের শতকরা ৮০ ভাগ চাষী এবং ১২।১৩ ভাগ মজুর মূক। বাকি ৭।৮ শতাংশের নিচের স্তরের নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মুখর স্বাধীনতা সংগ্রামে ভদ্রলোকের ছেলেরা, যুবক ও ছাত্ররাই সৈন্য ও সেনাপতি। তার উপরের স্তরটা, উচ্চ-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা। তার ওপরে রাজা জমিদার, ধনিক বণিক বিপ্লব বিরোধী।

দেশের এই ৯২।৯৩ শতাংশ চাষী ও মজুরের শ্রমের ফলের অধিকাংশ বসে বাকি ৭।৮ শতাংশ পরগাছাকে পুষ্ট করতে চলে যায়। নিম্ন মধ্যবিত্ত বিপ্লবীরা এ ৯২।৯৩ শতাংশের কথা ভাবেনি। কে বিপ্লব করবে কাদের জন্যে? কাদের নিয়ে? তাই আমাদের বিপ্লবপ্রচেষ্টা হয়েছে একটা Smuggling affair, এবং তার ফলও হয়েছে শূন্য।

রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন চাষার নমুনাও কালাকাটা। দেখলুম। একদিন দেখি, হাট থেকে দুজন গেরুয়া-পরা সাঁওতাল চাষী, দুই ভাই, আমার বাসার সামনে মাঠে এসে বসে আছে আমাকে দেখবার জন্যে—গান্ধীবাবার এমন উচ্চস্তরের চেলা যে, সরকার নজরবন্দী করে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে। ওরা দুই ভাই চরখা কাটে, এ ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল ও মিটিং করে, কিম্বা হয়ত বে-আইনী কংগ্রেস ভলান্টিয়ার হয়ে, ছ'মাস জেল খেটে এসেছে।

আমি হাট থেকে এলে আমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করলে, এবং গান্ধীবাবার কিছু গুণগান শোনালে। আমি বললুম, আমরা মহাত্মাজীর কংগ্রেসের লোক, তার কাজও করেছি, কিন্তু আমরা তাঁর অহিংসার কথাটা মানি না। আমরা বলি, ইংরেজকে মেরে তাড়াতে না পারলে ভারতমাতা স্বাধীন হবে না।

তারা একটু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে যেন চক্ষু-লজ্জার খাতিরে নিষ্প্রাণভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে, কিন্তু আমার বেশ মনে হল, যে উৎসাহ নিয়ে ওরা এসেছিল, সেটা নিভে গেছে। ওরা আবার নমস্কার করে বিদায় নিল যেন একটু মনঃক্ষুণ্ণভাবে।

চুলোয় যাক্। বিপ্লব ভাবলেই বলশেভিক বিপ্লবের কথা মনে পড়ে। লেনিন বিপ্লবের পরের দিনই ঘোষণা করেছিলেন, অতঃপর সমস্ত চাষের জমির মালিক বলে গণ্য হবে চাষারাই, যারা নিজেরা চাষ করে। জমিদার, মোহন্ত জমিদার, জারের গোষ্ঠী এবং রাজপুরুষেরা, যারা জমি চাষ করে না, কোন জমির ওপর তাদের কোনো অধিকারই থাকবে না। বিপ্লবী বলশেভিক সরকারের এই ঘোষণার সঙ্গে সারা দেশে চাষারা নিজেদের এলাকায় জমিগুলোর দখল নিতে শুরু করে দিয়েছিল। শ্রমিকদের বিপ্লবী সরকার এক চোটে সারা দেশে কৃষকদের সমর্থন অর্জন করে দৃঢ়ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছিল।

'৩২ সালে তাদের প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার কাজ নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সম্পূর্ণ ও সফল হয়েছে। গুরুশিল্পের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বড় বড় বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রেলওয়ে প্রভৃতি যানবাহন, যা প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিল, তার পুনর্গঠন

হয়েছে, দেশরক্ষার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম উৎপাদন হয়েছে প্রচুর, চাষের জন্য ট্র্যাক্টরও তৈরী হয়েছে প্রচুর, এবং বড় বড় সমবায় ও রাষ্ট্রীয় খামারে সে সব ট্র্যাক্টর চলছে, জলহীন অথচ উর্বর কালোমাটির বিশাল ভূখণ্ডে বড় বড় সেচ ব্যবস্থা হয়েছে, এবং এই সব কাজের নতুন কেন্দ্রগুলোতে নতুন নতুন বড় বড় সহর গজিয়ে উঠেছে, পুরোনো ও নতুন সহরে শত শত স্কুল ও হাসপাতাল হয়েছে।

নিত্যব্যবহার্য পণ্যের উৎপাদন সর্বনিম্ন প্রয়োজনের স্তরে রয়ে গেছে, কারণ আগের কাজ করতে গিয়ে সর্বপ্রকার অর্থ ও শ্রমশক্তি ব্যয়িত হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনায় নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের উৎপাদন অগ্রাধিকার পাবে। সহরে বেকার নেই এবং সকলেই খেতে পায়। সকলে মিলে শ্রমোন্মাদে মাতোয়ারা।

যে ধনবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো গোড়ায় তাদের পিষে মারতে চেয়েছিল, তারপরে অর্থনৈতিকভাবে সঙ্কট বরেছিল এবং রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়নি, এবং তারপর তাদের দেশ-গঠনের কাজে মোটা মাইনের বিশেষজ্ঞরূপে দলে দলে কাজ করতে গিয়েছিল, তারা এই সময়ে কলকারখানার নির্মাণস্থলে ধ্বংসাত্মক কাজ চালাতে শুরু করেছিল। বিলাতের মেট্রোপলিটান ভিকার্স নামক ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর ভাড়াটে বিশেষজ্ঞদের এই রকম ধ্বংসাত্মক কাজ ধরা পড়ে। তাদের বিরুদ্ধে '৩৪ সালে মামলা হয়েছিল, এবং অপরাধ প্রমাণিত হয়েছিল। তবু তাদের শাস্তিদান সম্বন্ধে বলশেভিক সরকার রীতিমত উদারতা দেখিয়েছিল। এ সব খবর এক ইংরাজ কর্তৃক লিখিত পুস্তকের বিভিন্ন থেকে (ষ্টেটসম্যান কতৃক) পরে আমরা জানতে পারি।

ধনবাদী দুনিয়ায় আর্থিক অবস্থা চলছিল এর বিপরীত। '২৯ সাল থেকে '৩৩ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী আর্থিক সঙ্কট চলেছিল। এই আর্থিক সঙ্কট হচ্ছে বাড়তি উৎপাদন থেকে উদ্ভূত Crisis of over-production. আবার ধনবাদী দেশের এই over production কথাটার অর্থও চমৎকার। দেশের লোকের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন, সকলের সকল জিনিসের অভাব মিটে গিয়েও উদ্বৃত্ত হয়েছে, সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, তারই নাম over production,—এবং কথাটার ন্যায্য অর্থ এই হওয়াই উচিত। কিন্তু ধনবাদী শাস্ত্রে over-prodaction-এর অর্থ "effective demand"-এর অভাবে উৎপন্ন মাল জমে যাওয়া, আর "effective damand"-এর অভাবের অর্থ খরিদ্দারের অভাব। অর্থাৎ উৎপন্ন মাল খরিদ্দারের অভাবে জমে গেলে যে উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ বা সংকোচ করতে হয়, কাজ কারবারে মন্দা, বেকার বৃদ্ধি প্রভৃতি দেখা দেয়, এই অবস্থার নামই economic crisis বা আর্থিক সঙ্কট। '২৯ সাল থেকে '৩৩ সাল পর্যন্ত সমগ্র ধনবাদী দুনিয়ায় এই আর্থিক সঙ্কট চলেছিল।

অর্থাৎ শিল্পোন্নত দেশগুলোর উৎপন্ন মালের কাটতি কমে গিয়ে মাল জমে গিয়েছিল, উৎপাদন সঙ্কোচ করতে হয়েছিল, বেকারী এবং জনগণের দুর্দশা বাড়ছিল। এর মূল হচ্ছে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের আর্থিক অবস্থা। শিল্পপণ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী দেশ-গুলোতে যুদ্ধের সময়ে পশ্চিমী যুদ্ধ-লিপ্ত দেশগুলো থেকে শিল্পপণ্য আমদানি কমে যাওয়ায় বা বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়েছিল, লোকের দুর্দশার অন্ত ছিল না। একমাত্র শিল্পোন্নত প্রাচ্য দেশ জাপান যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ায়, এবং যুদ্ধটা ইউরোপে সীমা-

বন্ধ থাকায় প্রাচ্যের শিল্পপণ্যের বাজার, প্রধানত বৃটিশ মালের বাজার, রীতিমত দখল করে ফেলেছিল!

যুদ্ধের পর এই সব অনুন্নত দেশে আত্মবিশ্বস্তর economic nationalism বা অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের মনোভাব বা আন্দোলনও দেখা দিয়েছিল এবং নিজেদের শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টায় বিদেশী মালের উপর সংরক্ষণ শুল্ক বসানো শুরু হয়েছিল। এই অবস্থার সঙ্গে বৃটেনকে জাপানী মালের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ফলে তার প্রাক্‌যুদ্ধকালের বাজার পুনর্দখল করা কঠিন হয়ে উঠেছিল, এবং তার ফলে রপ্তানি হ্রাস এবং over-production, উৎপাদন সংকোচ ও বেকারী বৃদ্ধি ক্রমে ঘটেছিল।

বৃটিশ বামপন্থী শ্রমিক-নেতা ফেনার ব্রকওয়ে '৩২ সালে বৃটেনের নানা শহর এবং দুর্দশাগ্রস্ত শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিক বস্তিতে বেকার শ্রমিকদের ঘরে ঘরে গিয়ে সর্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করে একখানা বই লিখেছিলেন Hungry Britain—বস্তির এবং বেকার শ্রমিকদের দুর্দশার সে চিত্র অভাবনীয়রূপে ভয়াবহ।

এ অবস্থার প্রতিকার ধনবাদী অর্থনীতি-শাস্ত্রে নেই, তাই সনাতনের অনুশাসন কিছু কিছু সংশোধন করে একটু আধটু সমাজতান্ত্রিক রং চড়িয়ে বিখ্যাত বৃটিশ অর্থনীতিবিদ্ লর্ড কীন্‌স এক "নূতন" অর্থনৈতিক মতবাদ প্রকাশ করলেন, লোকে যার নাম দিয়েছিল New Economics। আমেরিকায়ও এই আর্থিক সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট "New Deal" নামে কিছু কিছু নূতন ব্যবস্থা চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। কানাডার এক মেজর ডগ্‌লাস "Social Credit" নামক এক নূতন ব্যবস্থা আবিষ্কার এবং চালু করার চেষ্টা করেছিলেন। এই সব নূতন নূতন প্ল্যানের একটাও কার্যকরী হয় নি। কয়েক বছরের উৎপাদন সংকোচের পর জমা মাল কেটে যাওয়ার পর স্বভাবতই আর্থিক সঙ্কটের অবসান হয়, অর্থাৎ সাধারণ উৎপাদন আবার চালু হয়।

আমাদের দেশে তখন প্রাক্‌যুদ্ধের বিনিময় হার ১৲ = ১ শিঃ ৪ পেঃ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলন শুরু হয়েছে এবং ভারতের বৃটিশ অর্থসচিব ১ শিঃ ৬ পেঃ বিনিময় হার পর্যন্ত নামতে রাজী, তার নিচে নয়—এই নিয়ে অর্থাৎ ভারতের প্রয়োজনের সঙ্গে বৃটেনের রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজনের লড়াই শুরু হয়েছে।

ওদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরাট বিরাট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও ভাঙ্গাগড়া চলছে। যুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধিচুক্তিতে জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থায় জার্মানীর ঘাড়ে বিপুল ঋণের বোঝা চাপানো হয়েছিল। সে সময়ে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান বিখ্যাত বৃটিশ অর্থনীতিবিদ নরম্যান অ্যাঞ্জেল্‌স Great Illusion নামক এক বই লিখে বলেছিলেন, মিত্রশক্তি এবং জার্মান অর্থনীতিবিদ সন্ধিসভার প্রতিনিধিরা নির্বোধের মতন যে বিরাট বিরাট অঙ্কের ঋণের বোঝা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছেন, সেটার কোনো মানে হয় না, কারণ এই বিরাট ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রকৃত পক্ষে আদায়ই হয় না। জার্মানীর যে শিল্পশক্তি তার সামরিক শক্তির উৎস, খেসারতের বিপুল অর্থ আদায় করতে হলে সেই শিল্পশক্তির পুনর্গঠনে সাহায্য করতে হয়, আর জার্মান শিল্পজাত মাল মুফতে আমদানি করে খেসারত আদায় করতে গিয়ে দেশের শিল্পোৎপাদন সংকোচ করতে হয়, বেকারী ও জনগণের অসন্তোষ বৃদ্ধি হয়, তার জন্যে Social Insurance-এর

খরচ বাড়াতে হয়। এ কথাগুলো পরবর্তীকালে বাস্তবে মোটামুটিভাবে প্রমাণিত হয়েছিল।

জার্মানার কয়লা শিল্পকেন্দ্র সার প্রদেশটার শাসন এক ইন্টারন্যাশান্যাল কমিশনের হাতে দেওয়া হল ১৫ বছরের জন্যে এবং সেখানকার উৎপন্ন কয়লা সবটাই ক্ষতিপূরণ বাবদ ফ্রান্স পাবে স্থির হয়। এর ফলাফল বড় মজার। ফ্রান্সের হাতে প্রচুর কয়লা আসায় ফ্রান্স আন্তর্জাতিক কয়লার বাজারে বৃটেনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো এবং বৃটেনের কয়লাশিল্প প্রচণ্ড মার খেলো।

যখন ভার্সাইয়ের সভায় জার্মানী পুনরস্ত্রসজ্জার দাবী পেশ করলে, ফ্রান্স করলো তার প্রবল বিরোধিতা, বৃটেন করলে সমর্থন। মিত্রশক্তির মধ্যে এই দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে জার্মানী একে একে ভার্সাই চুক্তির সব আগাম ধারা ভাঙতে শুরু করলো। ক্ষতিপূরণ আদায়ের নতুন নতুন প্ল্যান—ইয়ং প্ল্যান, ডস প্ল্যান প্রভৃতি একে একে অকেজো হতে লাগলো। সর্বশ্রেণীর জার্মানদের মনেই ভার্সাই-চুক্তি একটা জগদ্দলের মত চেপে বসেছিল, এবং ভার্সাই চুক্তির বিরোধিতার উপরই একটা রাজনৈতিক দল গড়ে উঠলো—হিটলারের ন্যাশান্যাল সোসিয়ালিস্ট পার্টি বা নাৎসী দল।

সংগঠনটা হল সোম্যালিস্টবিরোধী এবং তার প্রকৃতি হল সন্ত্রাসবাদী। টাকা জোগাতে লাগলো ক্রোড়পতি থাইসেন, ক্রাজেনবার্গ প্রভৃতি। যেমন, যেমন আমাদের দেশে নলিনী সরকার মহারাজা সূর্যকান্ত টাকা জোগাচ্ছেন; এবং 'আমাদের মধুদা' (সুরেন ঘোষ) দল গড়ছেন। ইটালীতে মুসোলিনী কর্তৃক যে ফ্যাসিজম্ প্রবর্তিত হয়েছিল, জার্মান নাৎসীদলও গঠিত হল সেই আদর্শে। মুসোলিনী তখন দাদা, হিটলার ছোট ভাইটি।

ভার্সাই চুক্তির পর জাতিসংঘ গঠিত হয় এবং তার প্ল্যানটা তৈরী করেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন। আমেরিকা ইউরোপের ব্যাপারে জড়িত থাকবে না বলে জাতিসংঘে যোগ দেয় না, এবং পরাজিত জার্মানীকে জাতিসংঘে আসন দেওয়া হয় না।

এখানে ভারত সম্বন্ধে একটু মজাদার ইতিহাস এসে পড়ছে। ভারত যে একটা Self Governing Country, এই অজুহাতে বৃটেন ভার্সাই সন্ধি সভায় তার এক মাইনে করা "ভারতীয় প্রতিনিধি" নিয়ে গিয়েছিল। প্রেসিডেন্ট উইলসন বললেন, ওটাকে এনেছ কেন? বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ আমতা আমতা করে জবাব দেন, ওরা লড়াইয়ে অনেক খেটেছে এবং মরেছে, তাই। উইলসন বলেন, বেশ, বসে থাকুক, ভোট দিতে পারবে না। সেই ব্যবস্থাই বৃটেন মেনে নেয়।

যুদ্ধে ইটালী মিত্রশক্তির পক্ষে লড়েছিল, কিন্তু ভার্সাইয়ের লুটের যথোচিত বখরা পায়নি বলে চটেছিল। ইটালীর কমিউনিষ্ট আন্দোলনও বেড়ে চলেছিল, গভর্ণমেন্ট রাশ মানাতে পারছিল না। এই অবস্থায় মুসোলিনী তার কমিউনিষ্ট-বিরোধী দলবল নিয়ে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করে এবং রাজা মুসোলিনীকে সরকারী কর্তৃত্ব দেন। এই ভাবে মুসোলিনী ও ফ্যাসিজমের প্রতিষ্ঠা হয়। সন্ত্রাসবাদী ব্যবস্থার সাহায্যে মুসোলিনী কমিউনিষ্টদের দমন করে ডিক্টেটরী শাসনের প্রবর্তন করেন, এবং প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের গৌরব পুনরুদ্ধার করার ধুয়ো তুলে আবিসিনিয়া দখলের প্ল্যান এঁটে নৌ-বহরকে শক্তিশালী করতে থাকেন। এ বিষয়ে ফ্রান্স ইটালীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। ওদিকে

জাতিসংঘের আদর্শ নিরস্ত্রীকরণ, এবং তার জন্যে সভা এবং আলোচনাও চলে—ফ্রান্স-ইটালীর এই প্রতিযোগিতা রুখতে পারে না। '৩১।৩২ সালে ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ ও দখল করে।

এশিয়ায় জাপানও '৩১ সালে মাঞ্চুরিয়া দখল করে পু-ই নামক এক ছোকরাকে রাজা সাজিয়ে বসায় এবং অন্তর্মোঙ্গোলিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে। জাতিসংঘ সে বিষয়েও কিছুই করতে পারে না।

ফলতঃ ধনবাদী দুনিয়ায় আর্থিক সংকট, জাতিসংঘের ব্যর্থতা, ইটালী ও জাপানের সাম্রাজ্য বিস্তার প্রভৃতি মিলে জার্মানীতে হিটলারের সাফল্য চূড়ান্ত আকার ধারণ করে, এবং হিটলার '৩৩ সালে জার্মান রাষ্ট্রের কর্ণধার চ্যান্সেলার হন। সুতরাং এই সময়টা থেকেই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোড় ঘুরে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংগঠনের দিকে।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই সময়কার চিত্র অপরূপ। রাউণ্ড-টেবিল কনফারেন্সে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভার প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোন্যাল্ডের হাতে ছেড়ে দিয়ে ভারতে আসার পর '৩২ সালের গোড়াতেই মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সারা দেশে অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়, কংগ্রেস ও তার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল সংস্থা বে-আইনী ঘোষণা করে তাদের ছাপাখানা, তহবিল, অফিস প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করা হয়, এবং '৩২ সালে মে মাসে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের রিপোর্টে জানা যায়, মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা হয়েছে ৮০ হাজার—এ সব কথা আগে বলা হয়েছে।

তারপর এল ম্যাকডোন্যাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ। তার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যার অনুপাতের চেয়ে বেশী প্রতিনিধি (ব্যবস্থা পরিষদে) দেওয়ার সঙ্গে অনুন্নত সম্প্রদায়ের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর ফলে হিন্দু সমাজ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যাবে—এই অজুহাতে মহাত্মাজী '৩২ সালের সেপ্টেম্বরে "আমৃত্যু অনশন" ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যেই তিনি জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামের দিক থেকে হরিজন সেবার দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন এবং সেটা ঘোষণা করেছিলেন। এখন তাঁর "আমৃত্যু অনশন" শুরু হওয়ায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতারা, ডাঃ আম্বেদকর পর্যন্ত, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন এবং তার ফলে হল 'পুণা প্যাক্ট'—তাদের প্রতিনিধি সংখ্যা কিছু বাড়িয়ে দিয়ে "জয়েণ্ট ইলেক্টোরেট" ব্যবস্থায় রাজী করা হল। এই পুণা প্যাক্ট এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে এক বিচিত্র ইতিহাস আছে, যা অনেকেই জানেন না। সে কথা পরে হবে। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিচিত্র পরিণতির কথাই আপাতত চলুক।

১৯৩৩ সালের এপ্রিলে বেআইনী কংগ্রেসের এক অধিবেশন বসলো কলকাতায়, ময়দানে, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে (ঠিক মনে নেই)। পুলিশ লাঠি চার্জ করে' সে কংগ্রেস ভেঙ্গে দেয়। মালব্যের হিসাব অনুসারে তখন গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২০০০০। সারা দেশে পুলিশ-মিলিটারীর তাণ্ডব চলছে, লাঠি-গুলীর সঙ্গে পিটুনী-পুলিশ অভিযান, পাইকারী জরিমানা, জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, সবই চলছে। নেতৃহীন জনগণও অহিংসভাবে লড়ে' চলেছে। এই অবস্থার মধ্যেও গোপনীয়তার আশ্রয় নেওয়া যে কংগ্রেসের শাস্ত্রে মহাপাপ, জেল থেকে মহাত্মাজীরা এই অনুশাসন প্রচার করছেন।

'৩৩ সালের মে মাসে মহাত্মাজী আর এক অনশন শুরু করলেন—উদ্দেশ্য নিজের এবং সাঙ্গোপাঙ্গদের পাপমোচন (purification) এবং হরিজন (depressed class, অস্পৃশ্য) সেবার দিকে অধিকতর ঘনিষ্টভাবে আত্মনিয়োগের জন্যে উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং উদ্বুদ্ধ করা।

পাপমোচন হলও। সরকার মহাত্মাজীকে বিনাসর্তে মুক্তি দিলে। এবং কংগ্রেসের অ্যাক্‌টিং প্রেসিডেন্ট তাঁর সঙ্গে পরমার্শ করে' ছয় সপ্তাহের জন্যে আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত করলেন।

অবস্থা দেখে ইউরোপ থেকে বিঠলভাই ঝাঝেরভাই প্যাটেল (সর্দার প্যাটেলের দাদা) এবং সুভাষচন্দ্র বসু এক যুক্ত বিবৃতি প্রচার করে বললেন, আইন-অমান্য আন্দোলনরূপ স্বাধীনতা-সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে, সুতরাং নূতন নেতৃত্বে কংগ্রেসকে ঢেলে সাজা প্রয়োজন।

কিন্তু ইচ্ছা করলেই তো বাস্তব অবস্থা বদলায় না। মহাত্মাজীই কংগ্রেসের কর্ণধারণ করে রইলেন এবং বড়লাটের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইলেন (জুলাই, ১৯৩৩)। বড়লাট অনুমতি দিলেন না। কিন্তু তবু তারপরেই কংগ্রেস নেতারা "গণসত্যগ্রহ" বন্ধ করে দিলেন, এবং পিত্তিরক্ষার জন্যে ব্যক্তিগত সত্যগ্রহ চালু রাখলেন।

সরকার এসব পরিবর্তন গ্রাহ্য করলে না, ব্যক্তিগত সত্যগ্রহীদের ওপর অত্যাচার সমানে চালিয়ে চললো। আগষ্ট মাসে আবার মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করলো, এবং মাস কাবার হওয়ার আগেই ছেড়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাজীও রাজনীতি ছেড়ে "হরিজন সফরে" বেরিয়ে পড়লেন। '৩৩ সাল শেষ হল। আমি ম্যালেরিয়ায় ভুগছি—সাত মাস ধরে' বদলীর জন্যে লেখালেখি করছি। হঠাৎ একদিন আমার বদলীর খবর এসে হাজির—কলকাতায় নয়, বহরমপুর বন্দীশালায়। চললুম বহরমপুরে।

ছাব্বিশ

বদলী কলকাতায় না হওয়ায় মনটা একটু মুষড়ে গেল। বিশেষত বন্দীশালায় পাঠানো মানে যে শীঘ্র মুক্তির আশা নেই, একথা ভেবে মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু বন্দীশালার নতুন জীবনের কল্পনা শীঘ্রই মনটাকে নানা সম্ভব-অসম্ভব বিচিত্র চিত্রে আচ্ছন্ন করে ফেললে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ খেয়াল হল, ফটকের অফিসে তল্লাসীর সময় সমস্ত লেখাগুলো হয়ত আটক করবে, সুতরাং এখানকার সমস্ত লেখাগুলো এখানেই dump করে' যেতে হবে।

ভেবে চিন্তে একটা নতুন ছোট টিনের সুটকেশ কিনে আনিয়ে প্রায় ২০০০ পৃষ্ঠা লেখা exercise book তার মধ্যে ভরে' চাবি লাগিয়ে হাটের এক সাহা আড়তদারের বাসায় নিয়ে গিয়ে বৃদ্ধের হাতে দিয়ে বললুম, আমার লেখাগুলো আপনার কাছে রেখে যেতে চাই, মুক্তির পর এসে নিয়ে যাবো। বৃদ্ধ সব শুনে সুটকেসটা হাতে করে নিলে, আমি চাবিটাও দিলুম, এবং বললুম, আমার ছেলে রইলো আপনার কাছে। (পরে সে সুটকেস আর পাই নি)।

তারপর খাওয়াদাওয়া করে রওনা হলুম গরুর গাড়ীতে, সঙ্গে escort চললেন জমাদার বাবু। জলপাইগুড়ি থেকে যে সশস্ত্র পুলিশ দু'জন বদলীর অর্ডার নিয়ে এসেছিল, তারাও সঙ্গে চললো।

গাড়ীতে জমাদার বাবুর সঙ্গে গল্প-আপ্যায়নের মধ্যে ব্রে খেলার রেকর্ড ডায়েরীবুকের পাতা দুখানা জমাদারবাবুর হাতে দিয়ে বললুম, ফিরে গিয়ে দারোগা সাহেবকে দেবেন। তিনি কাগজ দুখানা দেখে চমকে উঠে বললেন, ও মশায়, আপনি তো সর্বনেশে লোক, আমাদের সকলেরই চাকরী খেতেন। আমি হেসে বললুম, চাকরী যেতো দারোগার, আপনাকে ধমকে ছেড়ে দিতো। জমাদারবাবুর রসবোধ আছে, তিনি বুঝলেন এবং ফাঁড়া কেটে গেছে দেখেই সন্তুষ্ট হলেন।

বহরমপুর ক্যাম্পে পৌছেই দেখলুম, যা ভেবেছিলুম, তাই। গেটে একজন পাঠান সুবেদার তল্লাসী নেয়, লেপ-বালিসগুলো পর্যন্ত টিপে টিপে দেখে। একটা ঘরের ভিতর একান্তে নিয়ে গিয়ে একটু সলজ্জভাবে বললে, কাপড়খানা একটু খুলে একবার একটু ঝাড়া দিন। এই হচ্ছে নিয়ম, কড়া হুকুম। আমাদের দোষ নেই, বাবুরা বাঁধানো ছবির পিছনে ভরে চিঠি, নোট প্রভৃতি নিয়ে আসে এবং ধরা পড়ে।

বুঝলুম, আমার কাছে ব্যবহার্য জিনিস ছাড়া আর কিছুই ছিল না দেখে আমার সঙ্গে একটু ভদ্রতা করেছে, নৈলে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করতো এবং দরকার হলে জোর করেই করতো। ক্যাম্পের শাসন মিলিটারী শাসন। নমুনা দেখে অনেক কিছু আন্দাজ করলুম।

নতুন মাল এসেছে খবর পেয়ে ভিতরকার ফটকের ভিতর কয়েক জন পাণ্ডা এসেছিলেন, তার মধ্যে ছিলেন সরস্বতী লাইব্রেরীর ভূতপূর্ব কর্মী বিপিন চক্রবর্তী—যেন গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার সংক্রান্তি ঠাকুর। তিনি একগাল হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন এবং তুললেন থার্ড কিচেনে—নিজেদের যুগান্তর-কিচেনে নয়। বলা বাহুল্য, আমিও স্বস্তি বোধ করলুম।

বিরাট ক্যাম্প, ভূতপূর্ব পাগলাগারদ, প্রকৃত পক্ষে পাগলা জুনিয়রদের ক্যাম্প। আমাদের পর্যায়ের ২।৪ জন আছেন, যাঁরা সিনিয়র।

ওল্ড আর নিউ, দুটো ভাগে বিভক্ত ক্যাম্প, মাঝে এক উঁচু দেওয়াল, তার মধ্যের এক প্রকাণ্ড ফটক দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা। আমাদের ওল্ড ক্যাম্পে ৩০০ ডেটিনিউ, আর নিউ ক্যাম্পে ২০০ জন. মোট প্রায় ৫০০ ডেটিনিউ। দুই ক্যাম্পেই তিনটে করে কিচেন, একটা যুগান্তর, একটা অনুশীলন, এবং তৃতীয় পাঁচ মিশেলী—কিছু কিছু 'রিভোল্ট', কিছু কিছু কমিউনিষ্ট (পার্টিসভ্য নয়), এবং কিছু কিছু বে-ওয়ারিশ non-descript অজানা মাল।

পার্টিগুলোর মধ্যে আবার গ্রুপ হিসেবে sub-division আছে একটু চাপা, চোরাগোপ্তা ভাবে।

থার্ড কিচেনেও গ্রুপ আছে, যদিও সবাই কমিউনিষ্টিক। কমিউনিষ্টিক 'রিভোল্ট' হলেও যুগান্তর-অনুশীলন চেতনা বজায় আছে, পূর্ণদাসের গ্রুপ, পঞ্চানন চক্রবর্তীর দল বেশ পৃথক ও compact, বিশেষত তারাই বরাবর থার্ড কিচেনের ম্যানেজারী প্রায় জোর করে দখল করে রেখেছে বলে সকলেই তাদের একটু পৃথক চোখে দেখে। আর কমিউনিষ্ট বলে নিজেদের পরিচয় দেয় যে এক পাঁচ মিশেলী দল, তারাও সকলের থেকেই নিজেদের একটু পৃথক করে রেখে জাত বাঁচিয়ে চলে।

এর মধ্যে আমি গিয়ে পড়লুম, কমিউনিষ্ট বলেই পরিচিত, কিন্তু একা এক পার্টি।

সব পার্টি ও গ্রুপেই বন্ধু আছে বলে সকলের সঙ্গেই সদ্ভাব, অথচ সব পার্টি ও গ্রুপের মতনই কমিউনিষ্ট গ্রুপের থেকেও একটু পৃথক থাকি।

আগে দুই ক্যাম্পের মাঝের ফটক খোলা থাকতো এবং দুই ক্যাম্পের ডেটিনিউরাই দুই ক্যাম্পে যাতায়াত করতে পারতো। আমি যাওয়ার আগে সেটা বন্ধ করে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সকালে এবং বিকালে দুবার দেড় ও দু ঘণ্টার জন্যে ফটক খুলে ওল্ড ক্যাম্পের (আমাদের) ডেটিনিউদের নিউক্যাম্পে বেড়াতে যেতে দেওয়া হত, কিন্তু নিউ ক্যাম্পের ডেটিনিউদের ওল্ড ক্যাম্পে আসতে দেওয়া হত না।

যাতায়াতের জন্যে মিনিট দশেক করে গেট খোলা রেখে আবার বন্ধ করে দেওয়া হত হুইসল বাজিয়ে।

আমি গিয়ে '৩৩ সালের দুটি গল্প শুনলুম চমৎকার। একটি হল, '৩৩ সালে বহরমপুর বন্দীশালা থেকে যে সব ডেটিনিউ বি. এ. একজামিন দিয়েছিল, তারা প্রায় সকলেই ভালভাবে পাশ করেছিল, যা নিয়ে বাংলা দেশে "flowers of Bengal" বলে ধন্য ধন্য রব উঠেছিল, সেই একজামিনের বাহার। আর একটি হল, সুবেদার-হাবিলদারদের নেতৃত্বে শান্ত্রীবাহিনী কর্তৃক সন্ধ্যার পর ঘরে ঘরে তালা খুলে ডেটিনিউদের গো-বেড়েন করে ঠেঙ্গানো।

একজামিনের হলে বিভিন্ন থানা থেকে দারোগাদের এনে বসানো হয়েছিল invigilator করে এবং পরীক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে তাঁদের ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন প্রভৃতি ঘুষ দিয়ে বই প্রভৃতি থেকে "টুকুনিফাই" করে প্রশ্নের উত্তর লিখেছে। প্রশ্নপত্রগুলো জল পরিবেশক "ফালতু"দের হাত দিয়ে ক্যাম্পের ঘরে ঘরে বন্ধুদের (এম-এ, প্রোফেসর প্রভৃতি) কাছে চলে গেল, তাঁরা হুড়মুড় করে উত্তরগুলো লিখে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার copy করে ফেললে আরো অনেকে মিলে, এবং সেগুলো আবার ফালতুদের হাতে পরীক্ষার্থীদের কাছে চলে গেল!

'৩৩ সালের দ্বিতীয় গল্পও চমৎকার। একজন মেজাজী ডেটিনিউ এক ফালতুকে একদিন প্রহার করেন ওল্ড ক্যাম্পে। তার জবাবে ফালতুরা দল বেঁধে বাবুদের আক্রমণ করতে যায়, এবং বাবুরা হকি ষ্টিক প্রভৃতি নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করেন। কাজেই পাগলা ঘণ্টি পড়ে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শান্ত্রীবাহিনী এসে বাবুদের আক্রমণ করে। লাঠির ঘায়ে কারো হাত, কারো মাথা ভাঙ্গে, একজনের "দাস্ত খোলসা" হয়ে যায়। ওল্ড ক্যাম্পের দিনের বেলার কাণ্ড।

পরদিন নিউ ক্যাম্পের বাবুরা সেই ফালতুকে এমন মার দেন যে, তাকে হাসপাতালে যেতে হয়। সুতরাং আবার শান্ত্রীবাহিনী এসে পড়ে। বাবুরা পাগলাঘণ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঘরে পালিয়ে যান এবং ঘরে ঘরে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এটা হয় বিকেলে। কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যার সময় সুবেদার ও হাবিলদারদের নেতৃত্বে বিরাট শান্ত্রীবাহিনী এসে ঘরে তালা খুলে বাবুদের লাঠিপেটা শুরু করে।

একটা ব্যারাকে একলাইনে ১৫টা ঘর—তার তিন নম্বর ঘরে থাকতেন বীরেন ঘোষ (International football player, Aryan Club) এবং ১৫ নম্বর ঘরে থাকতেন ডক্টর ত্রিগুণা সেন। এক নম্বর ঘর থেকে মার শুরু হয়েছিল এবং ১৫ নম্বর পর্যন্ত

যা ওবার আগেই মার বন্ধ করে শান্ত্রীরা ফিরে গিয়েছিল, সুতরাং ত্রিগুণাবাবুকে লাঠিপেটা হতে হয় নি।

কিন্তু বীরেন ঘোষের ওপর লাঠির বহর চলেছিল সব চেয়ে বেশী। অন্য ব্যারাক এবং পাশের ঘরে বাবুদের পরিত্রাহি চীৎকারে তিনি তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁদের ঘর খুলে মার শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক শয়তান পাঠান সুবেদারকে একঘুষিতে ধরাশায়ী করেছিলেন। ফলে সমস্ত আক্রোশটা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল তাঁরই ওপর এবং তিনি চারিদিকের লাঠির আঘাত থেকে মাথাটা বাঁচাবার জন্যে হাত দুটোকে প্রায় Sacrifice করে ফেলেছিলেন। মাথার ওপর হাত দুটো ভাঁজ করা এবং তার ওপর দমাদম লাঠি, হাত দুখানার হাড় ভাঙেনি নেহাৎ শক্ত হাড় বলে। অনেকদিন পর্যন্ত ফুলো, কালশিরে দাগ এবং ব্যথা ছিল।

ছাত্র-যুব নেতা শৈলেন রায় প্রভৃতি তখন সে ঘরে ছিলেন। তাঁরা প্রথমে খাট, টেবিলের নীচে গিয়ে ঢুকেছিলেন। পরে বীরেন ঘোষের অবস্থা দেখে তাঁরা কাকুতি-মিনতি শুরু করেছিলেন, বহুত হুয়া, আউর মৎ মারো, মর যায়েগা। বীরেন বাবু বলেন, ডেটিনিউ দেখলুম বটে! "ছোড় দেও বাবা" বলে' জোড় হাত করে হাঁপালে, কেউ একটা লাঠি চেপে ধরবার চেষ্টা করলে না। যাদের ওপর লাঠি পড়ছে, তারা তো "বাপরে" "মা'রে" "মেরে ফেল্লেরে" বলে চীৎকার করে কাঁদলে।

এত বড় মারের খবর কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশ হতে পারে নি। ক্যাম্পের নিয়ম কানুনে কড়াকড়ি হওয়া ছাড়াও, শান্ত্রীদের সঙ্গে ডেটিনিউদের সম্পর্ক হয়েছিল এমন যে, সুবেদার এক শান্ত্রীর ওপর ভীষণ চটে গিয়ে তাকে গাল দিচ্ছে, "শালা, ডেটিনিউকা বাচ্ছা!" (শুয়ারকা বাচ্ছার বদলে!)—আমি স্বকর্ণে শুনেছি।

আর দেখেছি, বীরেন ঘোষকে দেখেই সুবেদার হাত তুলে সেলাম করে নিঃশব্দে চলে যায়। তাকেই বীরেন ঘোষ ঘুষি মেরে ধরাশায়ী করেছিলেন। তারা অনেকেই বলতো, ডেটিনিউমে ঐ একঠো হায় শের, আউর সব বিল্লী হায়।

বীরেন ঘোষের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় '২৮ সালে হুগলী বিদ্যামন্দিরে, যখন মনোরঞ্জনদা (গুপ্ত) সেখানে ছিলেন এবং আমি তাঁর কাছে যেতুম। বীরেন ঘোষ তখন এরিয়ান ক্লাবের ফুটবল খেলোয়াড় এবং হুগলী বিদ্যামন্দিরে তরুণদের বক্সিং শেখান। তার পরে '২৯।৩০ সালে তিনি ভূপতিদার সঙ্গে মিলে এক পিওর ফুড সাপ্লাইয়ের দোকান করেন, এবং সেখানে করেন এক গুপ্ত বোমা পিস্তলের কেন্দ্র। পরে তিনি '৩৭ নম্বর মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের বিখ্যাত ব্যারাকবাড়ী থেকে গ্রেপ্তার হয়ে বহরমপুর বন্দীশালায় আসেন।

নিউ ক্যাম্পে তিন দিকে লম্বা লম্বা ব্যারাক এবং একদিকে ওল্ড ক্যাম্পের দেওয়াল—মাঝখানে প্রকাণ্ড খেলার মাঠ।

ওল্ড ক্যাম্পে জায়গা অনেক বেশী। একদিকে বিরাট ময়দান—ফুটবল খেলা এবং বেড়ানোর জায়গা। আর এক দিকেও টেনিস কোর্ট প্রভৃতি আছে, এবং তার পর গেটের দিকে বাগান। এক প্রান্তে একটা বেশ বড় টালীর ছাউনীর হলঘর আছে, Common room, তার এক দিকে indoor game-এর সবরকম ব্যবস্থা আছে, মাঝে মাঝে সভাও

হয়। আর একদিকে Reading room—প্রশস্ত টেবিলে সংবাদপত্র ও বিদেশী Journal এর গাদা, অনেকে নিয়মিতভাবে সেখানে পড়াশুনা করে। এমন চমৎকার Reading room আমি কখনো কোথাও পাইনি। নিউক্যাম্পেও এমনি একটা Common room ছিল, এর চেয়ে ছোট।

প্রচুর পাঠ্যবস্তু পেয়ে আমার উপোসী মন নেচে উঠেছিল। আমি হলুম Reading room-এর সব চেয়ে নিয়মিত পাঠক। রোজ সকালে এবং বিকেলে পড়তুম, নোট করতুম, ২।১টা ভাল মাল অনুবাদও করে রাখতুম। যেমন মুসোলিনীর লেখা "ফ্যাসিজম"।

সবচেয়ে ভাল একখানা ম্যাগাজিন ছিল আমেরিকার এক প্রগতিশীল মাসিক Living Age. এত ভাল বিদেশী ম্যাগাজিন আমি তখন পর্যন্ত আর দেখিনি। ফ্যাসিষ্ট ইটালীতে "এনসাইক্লোপিডিয়া ইটালিয়ানা" নামক যে এক নতুন অভিধানকোষ প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে "ফ্যাসিজম"-এর ব্যাখ্যা লিখিত হয়েছিল স্বয়ং মুসোলিনী কর্তৃক। লণ্ডনের "পলিটিক্যাল কোয়ার্টারলি" কাগজে তার authoritative translation (ইংরাজী) বেরিয়েছিল, এবং Living Age-এ সেটা পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। আমি সেটা বাংলায় অনুবাদ করে রেখে দিলুম।

আমি বহরমপুর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিউ ক্যাম্পের ডেটিনিউ বরিশালের অতুল গুপ্ত আর বিক্রমপুরের (পঞ্চসারের) জিতেন দত্ত বলেছিল, তারা পড়াশুনা করতে চায়, আমাকে পড়াতে হবে মার্কসিজম সংক্রান্ত পাঠ্য। তদনুসারে ব্যবস্থা হয়েছিল, সকালে নিউ ক্যাম্পে গিয়ে ক্লাশ করতুম। ওদের সঙ্গে ২৪ পরগণার শান্তি নামক এক তরুণ এবং গাইবাঁধার ব্রজমাধব দাসও (তিনি বি, এল!) যোগ দিয়েছিল। প্রথম পাঠ্য নির্বাচন করেছিলুম বিনয় সরকারের "পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" (তখনও এঙ্গেলসের বইটা এদেশে চালু হয়নি)। মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় ধারণা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বইখানা কারো কাছে ছিলনা, অর্ডার দিয়ে কিনে আনা হল। তারপর কমনরুমের এক পাশে মাদুর পেতে সেই বইটাই পড়া হল প্রায় এক মাস ধরে। বিশদ আলোচনা ও ব্যাখ্যায় সময় লাগতো।

এদিকে ষ্টেলিনের "লেনিনিজম" বইটা ('২৬ সালে প্রকাশিত) পেয়েছিলুম এবং পড়ে, আনন্দে নেচে উঠেছিলুম, বাংলায় অনুবাদ শুরু করে দিয়েছিলুম গোপনে মশারির মধ্যে। পাঁচ মাস মশারিটা দিনরাত ফেলাই থাকতো, তার মধ্যে বিড়ির তোড়-জোড় এবং বই খাতা নিয়ে আমি রাত্রে এবং ভোরে অনুবাদ করে চলি। পাঁচ মাসে, exercise book-এর সাড়ে ছ'শো পাতা ঠাসা লেখায় সেটা সম্পূর্ণ হল, এবং নিউক্যাম্পের ক্লাশে সেটা পড়া এবং revise করা হয়ে গেল। তারপর চললো সেই সাড়ে ছ'শো পৃষ্ঠা লেখা কপি করা—৫টা গ্রুপের ছেলেরা নিজেদের জন্যে এক একটা কপি করে নিতে লাগলো। লেখাপড়া সম্পর্কে এই উৎসাহ এবং পরিশ্রম ক্যাম্পে একটা নতুন জিনিস—অবশ্য ইউনিভারসিটির পরীক্ষার পড়াশুনা ছাড়া।

বুখারিনের Historical Materialism বইখানাও ক্যাম্পে পাওয়া গেল। সেটা আমার পড়া ছিল না, কিন্তু সেটা পড়ানোর তাগিদ এলো। আমি রোজ খানিক করে পড়ে

রাখি, এবং নিউ ক্যাম্পের ক্লাশে সেইটুকু পড়াই, এমনি করে একসঙ্গে পড়া এবং পড়ানো হয়ে গেল। সারা ক্যাম্পে বই ছিল মাত্র একখানা—গোড়ার দিকটা ময়লা হয়ে "লাট" হয়েছে, আর শেষের দিকটা নতুন আছে। অর্থাৎ কেউই শেষ পর্যন্ত পড়ে উঠতে পারে নি। এ বইটা পড়ার পর ওরা ক্ষেপলো, অন্য পার্টির বই, আমাদের নেই, সুতরাং বইটারই একটা কপি করে নেওয়া যাক। এত বড় খাটুনীর কাজও সারা হয়ে গেল। পাঁচ হাতের লেখায় মোটা মোটা exercise book বোঝাই করে কাজটা সাঙ্গ হল।

'মে' ডে উপলক্ষে হাতে লেখা প্রাচার পত্রে আমি এক বাণী লিখলুম। কমিউনিষ্টরা অন্যান্য দলের লোকদের এড়িয়ে চলে, বলে, ওরা বুর্জোয়াদের ভাড়াটে গুণ্ডা। আমি লিখলুম, এ মনোভাব ঠিক নয়। বিপ্লবের পথে যারা এসেছে, শেষ পর্যন্ত যদি তারা টিকে থাকে, তাহলে তারা কমিউনিজমের পথই ধরবে। এই নতুন সুর অনেকেরই ভাল লেগেছিল।

আমাদের ঘরেও একটা ক্লাস শুরু হয়েছিল, তার মধ্যে নর্থ বেঙ্গল যুগান্তর দলের কয়েক জন ছিল। রংপুরের অবনী বাবু'র হয়েছিল ভারি রাগ, আমি নাকি intellectual superiorityর advantage নিয়ে ছেলে খারাপ করছি। মুক্তির পর '৩৮ সালে দেখি তিনি একজন কমিউনিষ্ট এবং কৃষক-নেতা।

তাঁদের ঘরে ছিলেন তাঁদের দলের নরেশ চৌধুরী। একদিন তিনি লেনিনিজম বইখানা নিয়ে এসে একটা জায়গা দেখিয়ে আমাকে বললেন, 'এই দেখুন, আপনি যা বলেন, লেনিন তার উল্টো কথা বলেছেন।" আমি আর খানিক পড়ে তাঁকে দেখিয়ে দিলুম, তিনিই ভুল বুঝেছেন, আমিই লেনিনের কথা ঠিক ঠিক বলি। এমনি ব্যাপার আরো অনেকবার হয়েছে।

অনুশীলনের সুধীর ঘোষের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছিল, লেনিনের কথা নিয়ে। একদিন তিনি লেনিনের "On Religion" বইটা নিয়ে এসে বললেন, "এই দেখুন, লেনিন কি রকম সাংঘাতিক কথা বলছেন।" আমি সে-বইটা আগে পড়িনি। আমি বললুম, লেনিনের বক্তব্য নিশ্চয়ই আপনি ভুল বুঝেছেন। তারপর বইটা নিয়ে পড়লুম, মনে মনে হাসলুম, একখানা exercise book নিয়ে তাতে সারা বইটা থেকে (ছোট বই) পর পর গোটা ২০।২৫ কোটেশন সাজিয়ে লিখে বইটা সমেত সেটা তাঁকে দিলুম। তিনি পড়ে দেখে (বই এর সঙ্গে মিলিয়ে) নিজের ভুল বুঝে লজ্জা পেলেন এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলেন।

মাঝে মাঝে কমন রুমে সভা করে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হ'ত। সকল দলের লোকই সভায় যোগ দিত। এমনি এক সভায় হয়েছিল গোপেন মুখার্জির বক্তৃতা ফ্রয়েড সম্বন্ধে। একদিন ধীরেন দাশগুপ্ত (বর্তমানে হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের নিউজ এডিটর) আমার কাছে এসে বললেন, ক্যাপিট্যালিজম বনাম কমিউনিজম এক বিতর্ক সভা হচ্ছে, আপনাকে কমিউনিজম সম্বন্ধে বলতে হবে। আমি বললুম, "আমি সভায় বলতে পারি না, গলা কেঁপে, ঘেমে, সব ভুলে গিয়ে একাকার করবো, বেইজ্জৎ হব।" তিনি নাছোড়বান্দা। বললেন, আপনার লেখা প্রবন্ধ পড়ার জন্যে আমরা একটা পৃথক সভা একদিন করবো, কিন্তু এ সভায় আপনাকে বলতেই হবে। সুতরাং গেলুম।

দেখলুম, লেনিনিজম প্রচারের ফলে অ্যান্টি-কমিউনিষ্ট বাবুরা এককাট্টা হয়েছে।

কমিউনিজমের বিপক্ষে এবং স্বপক্ষে কয়েকজনের বক্তৃতা শুনলুম। তারপর এল আমার পালা। আমি দেখলুম, উভয়দলের কথার মধ্যেই যুক্তির অস্পষ্টতা এবং উদাহরণের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে আগাগোড়া। যে প্রশ্নের formulation wrong, সেই প্রশ্নের গম্ভীর ভাবে জবাব দেওয়ার চেষ্টাও ভুল হতে বাধ্য। কয়েকটা প্রশ্নের ভুল এবং জবাবের দুশ্চেষ্টা ও ঘাটতি দেখিয়ে দিলুম।

তারপর একদিন আমার প্রবন্ধ পড়ার ব্যবস্থা হল। প্রবন্ধটা লিখতে বসে প্রকাণ্ড হয়ে গেল। ক্রমে ক্রমে সভা বসেছে, ২৫।৩০ জন ডেটিনিউ এসেছে। পড়া শুরু হল। একটু পরেই ২।৪ জন উঠে গেল। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেশ বড় একটা দল নিয়ে তারা ফিরে এলো। তারপর দফায় দফায় দলে দলে লোক এসে ঘর ভরতি হয়ে গেল। আড়াই ঘণ্টা ঝড়ের মতন হুড়মুড় করে পড়ে' শেষ করলুম।

এত সব কাণ্ডের মধ্যে কিন্তু মাঝে মাঝে দাবা খেলা চলতো এক-নাগাড়ে ৮।১০ ঘণ্টা পর্যন্ত! পুরানো বন্ধু ঢাকার সুরেন দাস (অনুশীলন দলের) ছিলেন একজন দাবাড়ু। দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে এক এক দিন তাঁর ঘরে গিয়ে দাবায় বসতুম এবং বিকালে তাঁর ঘরেই টিফিন খেয়ে রাত ৯টায় তালাবন্দী হওয়ার ঘণ্টা বাজা পর্যন্ত দাবা খেলতুম।

আমার প্রবন্ধ পড়ার পর অনেকের নজর পড়লো আমার ওপর। কারণ প্রবন্ধটা হয়েছিল নতুন রকমের। হেগেলের ডায়লেকটিক্সের সঙ্গে মার্কসের ডায়লেকটিক্সের সম্পর্ক ও তুলনা, হেগেলের কথা "মানব সমাজের সংঘবদ্ধতার চূড়ান্তরূপ national state," এই বুর্জোয়া আদর্শের সামনে মার্কসের আদর্শ "মানব সমাজের সংঘবদ্ধতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি আন্তর্জাতিক জগৎজোড়া কমিউনিষ্ট সমাজ" খাড়া করা প্রভৃতিতো ছিলই, উপরন্তু কংকগুলো অ-মার্কসীয় বই থেকে কতকগুলো উদ্ধৃতিও ছিল চমৎকার। এম, সেনের Civics (পাঠ্য) এর মধ্যে একটা কথা ছিল, "জনগণের আর্থিক স্বাধীনতা বোধ হয় শুধু রাশিয়াতেই আছে"—সেটা তুলে দিয়েছিলুম। Encyclopaedia Britanica থেকে উদ্ধৃত করেছিলুম, "খাঁটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংস্থার উদাহরণ Third International" B. A-র পাঠ্য Politics-এ Gilchrist ভুল বকেছে "মার্কসের সোসিয়ালিজমটা হচ্ছে evolutionary. revolutionary নয়"। আমি লিখলুম, ওটা Fabian Socialist-দের কথা, মার্কসের বিরোধীদের কথা। এই সব কথায় অনেকে আমাকে রীতিমত পণ্ডিত ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল।

পূজো এল, ক্যাম্পে পূজো এবং উৎসবের ঘটা লেগে গেল। যাত্রা এবং থিয়েটারও হবে, ডেটিনিউবাবুরাই করবেন। থিয়েটারের ষ্টেজ-ড্রেসও এল। হঠাৎ দেখি, একদল মেয়ে ভাল ভাল শাড়ী পরে, কুলো ডালা মাথায় করে শাঁখ বাজিয়ে "জল সইতে" বেরিয়েছে, যেন একটা প্রোসেশন।

সুনীল মুখার্জি যুবক, ফরসা ভাল চেহারা জোয়ান ছেলে, পড়তো এবং টেনিস খেলতো, সে বোম্বাই শাড়ী পরে' মাথার চুল এলিয়ে দ্রিমে চলেছে—হৈ হৈ ব্যাপার। '৩৭ সালে বেরিয়ে দেখি সেই সুনীল বিহার প্রাদেশিক কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী! আমাকে দেখে যেন চিনতেই পারলে না,—যেমন অবনী বাকচি করেছিল। কমিউনিষ্ট পার্টির standard সম্বন্ধে একটা ধারণা হল।

পূজোর আগে সুশান্ত মাইতি নিমন্ত্রণের চিঠি বিলি করতে এলেন আমার কাছে—লাল কাগজে সোনার জলে ছাপা চিঠি, নৃত্য পর্যন্ত আছে কর্মসূচীর মধ্যে। বললেন, এক হাজার চিঠি ছাপানো হয়েছে, প্রত্যেক ডেটিনিউকে তিনখানা করে দেওয়া হচ্ছে, তাঁরা বাড়ীতে আত্মীয় স্বজনকে পাঠাবেন নিমন্ত্রণ, আমাদের পূজা উৎসবে যোগ দিয়ে আনন্দ বর্ধন করবেন বলে!

আমি বললুম, সত্যেন মিত্র কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় ডেটিনিউদের দুঃখের কথা তুললে হোম মেম্বার যাতে এই সোনার জলে নৃত্য ছাপা একখানা চিঠি ফেলে দিয়ে বলতে পারে—Here is how the detenues are kept in Jail and Camps?

তিনি বললেন, কেন? দমদম জেলেওতো আমরা করেছি। সুরেন দাস শুনে বলেছিলেন,—"ঐ C D-গুলি B D হইয়াই যাইচে।"

যাই হোক, থিয়েটার হল শরৎ চাটুজ্যের "রমা" (পল্লীসমাজ) এবং বোধ হয় "বামুনের মেয়ে"। আমি পার্ট করেছিলুম বেণী ঘোষাল এবং গোলক চাটুজ্যের।

সাতাশ

পূজোর আমোদ-প্রমোদের মধ্যে অনুশীলন পার্টির কানাই রুদ্রের সেতার-বাদন শুনলুম চমৎকার। চমৎকার স্বাস্থ্য, জোয়ান ছেলে, দুবেলা রীতিমত ব্যায়াম করে, আর সেতার সাধনা করে, পড়াশুনোয় মন নেই। আমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তার সাথীদের সঙ্গে কয়েকদিন আমার ক্লাসে যোগ দিয়েছিল। তারপর আর আসে না দেখে আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললে, "আমার বোঝা হইয়া গেছে, আর কাম নাই, আমি এবার জিগামু …গো, বিপ্লব-স্বাধীনতা যে করবা, সে কাগো লেইগ্যা?" বড় ভাল লাগলো। মুক্তির পর অন্নচিন্তা নিয়ে ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেছে, সেতার হয়ত শিকেয় উঠেছে। কিন্তু ভাবলে মনটা পীড়িত হয়, সেভাবে সে ওস্তাদ হতে পারলো। একজন সত্যিকারের শিল্পীর প্রতিভা অন্নচিন্তায় চাপা পড়ে গেল।

এই ৩৪ সালেই বিখ্যাত ভূমিকম্প হয়, যাতে বিহার প্রদেশটা সব চেয়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল বলে বলা হয় বিহার-ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের ব্যাপক ধ্বংসলীলার পর জাতিধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে ব্যাপক সংযুক্ত রিলিফ ব্যবস্থা হয়েছিল, তবুও তার মধ্যে অস্পৃশ্যদের প্রতি অবহেলা প্রকাশ পেয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী তদুপলক্ষে এক বিবৃতিতে বলেন, অস্পৃশ্যতারূপ মহাপাপের জন্য ভগবানের দেওয়া শাস্তি এই ভূমিকম্প! (আমরা মাঠে বেরিয়ে পড়ে ক্যাম্পের নাচন দেখেছিলুম)।

মহাত্মার বিবৃতি পড়ে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে এমনভাবে বাড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। "গুরুদেবকে" বিচলিত দেখে ঘাবড়ানো দূরে থাক, মহাত্মাজী আরো জোরে আরো গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি, এ ভূমিকম্প অস্পৃশ্যতার পাপের জন্য ভগবানের দেওয়া শাস্তি।

তিনি সত্যের অবতার, সত্য নিয়ে পরীক্ষা করেন, তিনি সত্যিই কথাটা বিশ্বাস করতেন? অনেকে হয়ত তা স্বীকার করবেন না এবং বলবেন এটা সুবিধাবাদের একটা

প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু সে কথাই কি ঠিক? তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম মানতেন এবং প্রচারও করতেন, পায়খানায় বসেও গীতা পড়তেন, আত্মশুদ্ধির জন্যে অনশন এবং প্রার্থনা করতেন, দিশেহারা হলে অনশন ও প্রার্থনার দ্বারা অন্তরে ভগবানের প্রত্যাদেশ পেয়ে কর্তব্য নির্ধারণ করতেন, এসব কথা তো ভুলে গেলে চলবে না!

অস্পৃশ্যদের নেতারা, মহাত্মাজীর ভক্ত রাও-বাহাদুর এম সি রাজা থেকে মহাত্মাজীর বিরোধী ডক্টর আম্বেদকর পর্যন্ত সবাই বলতেন, বর্ণাশ্রম বা চাতুর্বর্ণ মেনে অস্পৃশ্যতা বর্জন হয় না, cast থাকলেই outcast-ও থাকবেই স্তরাং মহাত্মাজীর অস্পৃশ্যতা বর্জনের প্ল্যানটা হচ্ছে নোঙর ফেলে নৌকো বাওয়া।

বস্তুত সেই কারণেই তাঁর সব প্রোপাগ্যাণ্ডা এবং বড় বড় stunt এতকাল ব্যর্থই হয়ে এসেছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি বলেছিলেন অস্পৃশ্যতা বর্জন না করলে স্বরাজ হবে না। তাঁর বর্ণহিন্দু ভক্তেরা সেকথা তো গ্রাহ্য করেই নি, ৩১ সালেও তারা, বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ এবং গুজরাটের বেনেরা খদ্দর পরে' "মহাত্মা কি জয়" বলে অস্পৃশ্যদের মিছিলের ওপর লাঠি চালিয়েছে। খদ্দরের ব্লাউস-শাড়ী পরে গাছকোমর বেঁধে গান্ধীভক্ত লেডি মাথায় বিঁড়ে বেঁধে ময়লার টব মাথায় নিয়ে চলেছেন, কাগজে ছবি ছাপা হয়েছে, কিন্তু এত বড় stuntও ব্যর্থ হয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের ১০ বছর পরে মহাত্মাজী সুর পালটে বলতে শুরু করেছেন, স্বরাজ পেলেই আমরা এ সমস্যার সমাধান করে' ফেলতে পারবো।

'৩১ সালে বিলেতে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতায় যখন মহাত্মাজী ঐ কথা বলছেন, তখন আম্বেদকর শ্রীনিবাসন প্রভৃতি অস্পৃশ্য নেতারা (রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের প্রতিনিধি) বলছেন, যখন হিন্দুরাজ্য স্বাধীন ছিল, তখন যারা আমাদের কুকুরেরও অধম করে রাখার পাকা ব্যবস্থা করেছে, তারা স্বরাজ পেলে আমাদের মানুষের অধিকার দেবে, এত বড় ধাপ্পাবাজীতে অস্পৃশ্যেরা ভুলতে পারে না।

সে সময় ভারতের, বিশেষত বম্বে-মহারাষ্ট্র-গুজরাটের বিভিন্ন কাগজ, টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, সোস্যাল রিফর্মার প্রভৃতিতে অস্পৃশ্যদের উপর বর্ণহিন্দুদের দৈনন্দিন রকমারি অত্যাচারের ফিরিস্তি ছাপা হ'ত এবং সেগুলো আবার বিলেতের কাগজে পুনর্মুদ্রিত হ'ত। মহাত্মা বলতেন, বিলেতের কাগজগুলো ভারতের সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার করছে এবং তার প্রতিবাদে অস্পৃশ্য নেতারা এবং ভারতের ঐ সব কাগজ বলতো মহাত্মাজীই অস্পৃশ্যদের সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার করছেন বিলেতে।

অস্পৃশ্যদের ওপর বর্ণহিন্দুদের অত্যাচারের দোহাই দিয়ে খৃষ্টান মিশনারীরা অস্পৃশ্যদের খৃষ্টান হতে বলতো, মুসলমানেরা বলতো, মুসলমানধর্ম গ্রহণ কর। বর্ণহিন্দুরা বলতো, অস্পৃশ্যতা নিছক হিন্দুদের সমাজিক ব্যাপার, তার মধ্যে কংগ্রেসের নাক ঢোকাবার কোন অধিকার নেই, কারণ কংগ্রেস নানা ধর্মাবলম্বীদের যৌথ সংগঠন। বম্বে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি তখন ছিলেন পার্শী নেতা মিষ্টার নরীম্যান। তিনি সৎ ও বিবেকবান, তিনি সত্যিই গণ্ডগোলের মধ্যে নাক গলাতে আসতেন না, যদিও মানবিক ও নাগরিক অধিকারের কথা তাঁকে বলতেই হত। অস্পৃশ্যদের ওপর বর্ণহিন্দুদের অত্যাচারের বিরাট ফিরিস্তি আছে জে ই সানজানা (পার্শী) কর্তৃক লিখিত Cast and outcast

নামক বইয়ে (কংগ্রেসের এবং গান্ধীর অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনের স্বরূপ এবং বিশদ বিরবণ)।

বিলেতে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের সময়েই '৩১ সালে ভারতে সেন্সাস বা লোকগণনা চলছে। বর্ণহিন্দুরা বলছেন, লোকগণনায় হিন্দুদের "জাত" লেখা বন্ধ করে শুধু "হিন্দু" লেখার ব্যবস্থা করা হোক। তার প্রতিবাদে আম্বেদকর প্রভৃতি অস্পৃশ্য নেতারা বলছেন, অস্পৃশ্যদের সেন্সাস থেকে উড়িয়ে দিয়ে সমস্যা সমাধানের এই জুয়াচুরি প্ল্যান অস্পৃশ্যদের সর্বনাশের জন্যই করা হয়েছে। এ জুয়াচুরি চলবে না। অস্পৃশ্যদের প্রত্যেকটি মানুষের "জাত" সেন্সাসে লিখতে হবে, যাতে অস্পৃশ্যদের সেন্সাস সঠিকভাবে হয়। তাদের সংখ্যা কেউ বলেন চার কোটি, কেউ বলেন ছয় কোটি। সেন্সাসে এ সব বিবাদের অবসান হওয়া চাই এবং তাদের সংখ্যার অনুপাতে আগামী শাসন সংস্কারে তাদের পৃথক নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধি-সংখ্যা ব্যবস্থাপক সভায় থাকা চাই।

বিলাতে মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যদের এই দাবী বানচাল করার জন্যে মুসলমানদের বলেছিলেন, তোমরা পৃথক নির্বাচনের দাবী ছেড়ে joint electorate-এর পক্ষে দাঁড়াও, আমি তোমাদের (জিন্নার) ১৪ দফা দাবী মেনে নোব। তারা রাজী হয়নি। এরই পর ম্যাকডোন্যাল্ডের কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড প্রকাশিত হয় এবং অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। তারই ফলে হিন্দুদের "সংহতি" নাশের অজুহাতে, অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে মহাত্মাজি শুরু করেন আমরণ অনশন।

এ অজুহাত মুসলমানদের ক্ষেত্রে খাটে না বলে 'কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড' নিঃসাড়ে মেনে নেওয়ার মৎলবে কংগ্রেস ঘোষণা করলে তার "না গ্রহণ, না বর্জন" নীতি। কার্যত গ্রহণ করার ক্ষেত্র তখন ছিল না, সুতরাং নিখরচায় "না গ্রহণ" নীতি ঘোষিত হল। "না বর্জন" নীতি ঘোষণা করে ভবিষ্যতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখা হল। ভবিষ্যতের নির্বাচনে দেখা গেল, ম্যাকডোন্যাল্ডের রোয়েদাদ কংগ্রেস বেমালুম গ্রহণ করেছে।

যাই হোক, অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতিবাদে মহাত্মাজি যখন আমরণ অনশন শুরু করলেন, তখন সারাদেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো এবং সকল বড় বড় নেতা তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়ে তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু তিনি সঙ্কল্পে অটল। এবার তিনি না মরে ছাড়বেন না বুঝে অস্পৃশ্য নেতারাও, এম সি রাজা, আম্বেদকর প্রভৃতি তাঁর কাছে ছুটে এলেন। বিলাতে যখন অস্পৃশ্যদের সম্পর্কে ক্যাচাল চলছিল, তখন গান্ধীভক্ত এম সি রাজা বলেছিলেন, মহাত্মাজি চমৎকার লোক, কিন্তু "Beware of Gandhi the politician" রাজনৈতিক নেতা গান্ধী সম্বন্ধে হুঁসিয়ার থাকো। আম্বেদকর বলেছিলেন, গান্ধীজি অস্পৃশ্যদের প্রকৃত বন্ধুর কাজ করা দূরে থাক, সৎ শত্রুর কাজও করেন নি। "He was not even an honest foe." সেই রাজা এবং সেই আম্বেদকর পুণা প্যাক্টে রাজী হয়ে মহাত্মাজিকে মরণপণ থেকে বাঁচালেন। অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধি-সংখ্যা গোটাকয়েক বাড়িয়ে দিয়ে যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থায় তাদের রাজী করানো, এই হল পুণা প্যাক্টের মোদ্দা কথা।

কিন্তু প্যাক্টের ফলাফল দেখে এই সব অস্পৃশ্য নেতাদের আক্কেল গুড়ুম হতে বেশী দেরী লাগলো না। সারা দেশে সর্বত্রই স্থানীয় নির্বাচনে অস্পৃশ্যদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পুরাতন,

অভিজ্ঞ অস্পৃশ্য নেতাদের বাদ দিয়ে অর্বাচীন অস্পৃশ্য কংগ্রেসীদের প্রার্থিরূপে মনোনীত করা হতে লাগলো। রাজা, আম্বেদকর প্রভৃতি নেতারা এ দেখে নিজেদের দুর্বলতা ও বেকুফিকে ধিক্কার দিয়ে অনেক আফশোষ করেছেন, এবং রাজা আফশোষ করতে করতেই মরেছেন।

পুণা প্যাক্টের এই ইতিহাস ও পরিণতির কথা আম্বেদকরের মুখেই শোনা যায় ১৯৪৪ সালে যখন কলকাতায় তফসিলীজাতি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আম্বেদকরকে অভিনন্দন জানানো হয় (বড়লাটের পরিষদের সদস্য মনোনীত হওয়ার জন্য ?), যে সভায় বাংলার মন্ত্রী যোগেন্দ্র মণ্ডল সভাপতিত্ব করেছিলেন। (Cast and Outcast, Sanjana—Page 7)

পুণা প্যাক্টের ফলাফল সম্বন্ধে রাও বাহাদুর এম সি রাজার মুখ থেকেও এক মনোহারী গল্প শুনা গেছে। ১৯৪২ সালে স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রুর নেতৃত্বে এক নো-পার্টি কনফারেন্স আহূত হয় এবং রাজাসাহেব সাপ্রু কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। কিন্তু রাজাসাহেব সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে লেখেন, (ঐ—৭৮ পৃঃ)

"যে সম্মেলনে চতুর মহাত্মা রাজাগোপালাচারী নিমন্ত্রিত হয়েছেন, সে সম্মেলনে আমি যোগ দিতে পারি না। অন্যান্য সম্প্রদায় ও পার্টির নেতাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে এই যে, এঁরা আমাদের সহযোগিতা চান নিজেদের কোনো মৎলব হাসিল করার জন্যে এবং তারপর আমাদের বর্জন করেন, এমন কি আমাদের প্রগতির পথে কাঁটা দেন। পুণা প্যাক্টের কথাই ধরুন। আমরা যুক্ত নির্বাচনে রাজী হলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস আমাদের সমাজের নেতাদের বাদ দিয়ে ইলেকসনের জন্যে আমাদের সমাজের সাধারণ লোকদের কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্যে ডাক দিলেন এবং লোভ দেখালেন, তাদের মধ্যে থেকেই নির্বাচনপ্রার্থী মনোনীত হবে এবং তারা বর্ণহিন্দুদের ভোট পাবে। এর ফলে আমাদের নিজেদের রাজনৈতিক পার্টি দুর্বল হয়ে গেল।

"কংগ্রেসের এই অপকর্মের ফল ১৯৩৮ সালে কদর্যরূপে প্রকাশ হয়ে পড়লো। তখন রাজাগোপালাচারী মাদ্রাজে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী। তখনও বর্ণহিন্দুরা আমাদের মন্দির প্রবেশের অধিকার দেয় নি। আমি কংগ্রেসী ব্যবস্থাপক সভায় এক টেম্পল-এন্ট্রি বিল উপস্থাপিত করি। কিন্তু ভোটাভুটির সময় দেখা গেল, মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক পার্টিশৃঙ্খলার নামে নির্দেশ দেওয়ার ফলে ৩০ জন অস্পৃশ্য সদস্যের মধ্যে ২৮ জনই বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে, যদিও আমি বিল উপস্থাপিত করার আগে মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতি এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলুম। মহাত্মাজির কাছে ব্যাপারটা বললে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, রাজাগোপালাচারীর ওপর বিশ্বাস রাখুন—তাঁর মতন বন্ধু অস্পৃশ্যদের আর কেউ নেই।"

(৬০।৬১ সালেও মন্ত্রী জগজীবন রাম হিন্দুদের অস্পৃশ্যতা বর্জনে আহ্বান করেছেন।)

'২১-৩০'৩৫ সালে আমরা এসব কথা জানতুমও না বুঝতুমও না। কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাণ্ডকারখানার মধ্যে কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ডের অমোঘ শক্তি দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলুম এবং বারবার মনে হচ্ছিল, কমিউনিজম ছাড়া আমাদের দেশের, সমাজের জীবনের বিপুল সমস্যার সমাধানের আর কোনো পথ নেই।

যাই হোক, ইতিমধ্যে ভারতে কিষাণ-মজুর আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো বড় বড় ঘটনা ঘটে গেছে। মস্কোর তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রেসিডিয়ামের ১১ জন সদস্যের অন্যতম

এম এন রায়কে চীনের কমিউনিষ্টদের '২৭ সালের বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার এবং সাংহাইয়ে জেনারেল চিয়াং কাইশেক কর্তৃক হাজার হাজার শ্রমিক নিহত হওয়ার জন্য দায়ী করে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল। কারণ তিনি ছিলেন তৃতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যে সমগ্র প্রাচ্যের প্রতিনিধি। তৃতীয় আন্তর্জাতিক কর্তৃক বহিষ্কৃত হওয়ায় ভারতের কমিউনিষ্টরাও এম এন রায়কে বর্জন করেছিল। তিনি বোধ হয় '২৮ সালে ভারতে এসেছিলেন গোপনে, কারণ, '২৪ সালের কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর আসামীরূপে তখনও তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ঝুলছিল। বোধ হয় '৩০ সালে তিনি ধরা পড়েন এবং তাঁর বিরুদ্ধে কানপুরে মামলা হয় এবং বোধ হয় '৩২ সালে তিনি ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

অনেকে বলেন, '২৮ সালের কলকাতার অ্যালবার্ট হলে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভগ্নদশা এবং বিলাতের রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে মহাত্মাজী কর্তৃক ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের দরবার দেশে এমন নিরুৎসাহের সৃষ্টি করেছিল যে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের গুপ্ত সংগঠক এম এন রায়ের ডিফেন্সের জন্যে যেন সারাদেশে একটা নতুন উৎসাহের জোয়ার এসেছিল। খাঁটি স্বাধীনতাপন্থী হজরৎ মোহানীকে প্রেসিডেন্ট করে এক ডিফেন্স কমিটি গঠিত হয়েছিল, এবং নানাস্থানের বহু বড় বড় আইনজীবী কানপুরে জড়ো হয়েছিলেন। কিন্তু এম এন রায় তাঁদের কাছ থেকে বিশেষ বিশেষ কংকগুলো আইনের বই চেয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোন সাহায্য নেননি এবং নিজেই নিজের ডিফেন্স করেছিলেন। তাঁর তর্ক-যুক্তি এবং সওয়াল-জবাব সংবাদপত্রে প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়েছিল, এবং তিনি মুক্তির পর সেই ডিফেন্সের বিবরণ এক ক্ষুদ্র পুস্তিকারূপে প্রকাশ করেছিলেন।

ইতিমধ্যে মীরাটের কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্রের মামলা শেষ হয়েছিল এবং অনেক আসামীর জেল হয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় '৩৩ সালে কলকাতায় কমিউনিষ্টদের এক সারা ভারত কনভেনশন হয়েছিল এবং সেখানেই প্রথম বিধিবদ্ধভাবে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি সংগঠিত হয়, '৩৪ সালে নিখিল ভারত কিষাণসভাও সংগঠিত হয়, বোধ হয় বিহারের কিষাণ নেতা স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী (?) প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন।

'৩৪ সালে বিলাতে জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটিতে '৩৫ সালের শাসনবিধির প্রাথমিক খসড়া আলোচিত এবং গৃহীত হয়। কয়েকজন ভারতীয় "প্রতিনিধি" সাক্ষীগোপালরূপে উপস্থিত থাকেন মাত্র। বেসাড়ু আগা খাঁ এবং স্যর তেজ বাহাদুর সাপ্রু খসড়ার কিছু কিছু পরিবর্তন দাবী করে' এক দরখাস্ত পেশ করেন, কিন্তু সেগুলোকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়। জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটি খসড়াটাকে প্রায় যথাযথভাবেই পাশ করে! যদি বা ২।১ জায়গায় সামান্য পরিবর্তন করে, সেগুলো হয় আরো বেশী প্রতিক্রিয়াশীল। আর চার্চিল এবং প্রধানমন্ত্রী বলডুইন থিয়েটার করে চলেন। চার্চিল বলেন, সব ক্ষমতা ভারত সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে আর বলডুইন বলেন, আমরা যে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, না দিয়ে উপায় কি?

এদিকে পাটনায় অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভায় কংগ্রেসের ভাঙ্গাহাটে নতুন উৎসাহ সঞ্চারের আর কোন উপায় না দেখে পার্লামেন্টারী কার্যকলাপ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

বোধ হয় ডক্টর আনসারীর নেতৃত্বে '৩৪ সালের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু সে নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ('২০ সালের মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন সংস্কারের ব্যবস্থা অনুযায়ী) ছিল দেশের জনসংখ্যার শতকরা একজন মাত্র। তখন সারাদেশে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যাও কমতে কমতে সাড়ে চার লাখে নেমেছে।

'৩৪ সালের জুন মাসে কংগ্রেসের উপর থেকে সর্বপ্রকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। এবং জুলাই মাসে কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হয়।

অক্টোবরে বম্বেতে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন বসে। কংগ্রেসের অধিবেশনের পর সেই প্যাণ্ডালে প্রথম কিষাণ সভার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। মহাত্মাজী শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়ে হরিজনসেবায় মনোনিবেশ করেন।

ওদিকে হিটলার ভার্সাই চুক্তি অমান্য করতে শুরু করে দিয়েছে। রাইন নদীর তীরে খানিকটা জায়গা সামরিক-বাহিনীবিহীন (de-militarised) করে' রাখার ব্যবস্থা ছিল ভার্সাই চুক্তিতে, যাতে জার্মানী হঠাৎ কোনো দিন আবার ফ্রান্সের ওপর চড়াও করতে না পারে। '৩৪ সালে হিটলার হঠাৎ একদিন সেই রাইনল্যাণ্ডে সসৈন্য অভিযান করে দখল করে বসলো। এটা তার পরবর্তী প্ল্যানের প্রস্তুতি। ভার্সাই চুক্তিতে সার প্রদেশের শাসনভার ১৫ বছরের জন্যে এক আন্তর্জাতিক কমিশনের হাতে দেওয়া হয়েছিল, এবং বলা হয়েছিল, '৩৫ সালে এক গণভোটের মারফৎ সারের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা নির্ধারিত হবে, জনগণ ইচ্ছা করলে সারের শাসনভার আবার জার্মানীর হাতেই চলে যেতে পারবে। রাইনল্যাণ্ড দখল তারই প্রস্তুতি। '৩৫ সালের গণভোটে সার আবার জার্মানীর হাতেই চলে যায়।

জাতিসংঘের ব্যবস্থায় ভবিষ্যতে যুদ্ধ এড়ানোর পন্থারূপে নিরস্ত্রীকরণের একটা নামকে-ওয়াস্তে চেষ্টা চলেছিল, মাঝে মাঝে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনও বসছিল, অথচ কোনো কাজ হচ্ছিল না। '৩৪ সালের শেষে বৃটিশ প্রতিনিধি হেণ্ডারসনের সভাপতিত্বে শেষ নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বসে, এবং নিঃশেষে বানচাল হয়ে যায় হিটলারের মতিগতি দেখেই। সুতরাং '৩৫ সালে বৃটেনে নতুন সশস্ত্রীকরণের (armament programme) কর্মসূচী গৃহীত হয়—৫ বছরের কর্মসূচী।

হিটলারের পার্টির নাম নাজি বা নাৎসী—National Socialist। জার্মানীর সোসিয়ালিষ্ট পার্টি কমিউনিষ্ট বিরোধী, সকল দেশেরই মতন, কিন্তু তারাও সব দেশের সোসিয়্যালিষ্ট পার্টির মতন ধনিকদের বিরুদ্ধ-সমালোচনা করে, এবং বলে, অন্তত প্রধান শিল্পগুলোর ওপর ব্যক্তিগত মালিকদের কব্জা থাকা ঠিক নয়, সেগুলোর মালিকানি রাষ্ট্রের হাতেই থাকা উচিত। এ সোসিয়্যালিজমের ওপরও হিটলারের সমান বিরাগ। তাঁর সোসিয়্যালিজমটা ন্যাশান্যাল। তাঁর স্বরূপ প্রকট হল তাঁর লেবার ডিগ্রীতে। তাতে বলা হল, অতঃপর তাঁর রাজ্যে কলকারখানার মালিকরাই হবেন শ্রমিকদের লীডার, মালিকের আদেশ মজুরদের নেতার আদেশরূপেই মেনে চলতে হবে!

অর্থাৎ ন্যাশান্যালিজম মানেই কমিউনিজমের সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শ। তাই কমিউনিষ্ট শাস্ত্রেও বুর্জোয়া ন্যাশান্যালিজম সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য। সারা দুনিয়ার শোষিত শ্রমিক প্রকৃতপক্ষে একজাতি, শোষিত জাতি। এই হল প্রোলেটারিয়্যান ইন্টার ন্যাশান্যালিজমের মোদ্দা কথা।

স্থতরাং হিটলার সোসিয়্যালিষ্ট, কমিউনিষ্ট, প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিরোধীদেব মেরে, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী কবে বেখে, সমগ্রজাতির তরুণদেব তাঁব নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত করে, সমগ্র জার্মানজাতির ভার্সাই-সন্ধিব প্রতি স্বাভাবিক বিবাগেব ওপব সমগ্র জাতিটাকেই নাজী বানিয়ে ফেলেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ যুদ্ধেব প্রস্তুতিব দিকেও নজর দিয়েছিলেন।

নাজী-পর্যটক পৃথিবীব দিকে দিকে ধাওয়া করেছিল, তাদের লক্ষ্য ছিল প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ এবং সম্ভাব্য শত্রু ও মিত্রদেব অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন। আমেরিকার Living Age পত্রিকায় এমনি তিনজন নাজীব সফরের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল, ক্যাম্পে আমি সেটা পেয়েছিলুম। তাতে তাঁরা মস্কো-ভ্লাডিভোস্টক বেলভ্রমণ উপলক্ষে লিখেছিলেন, ৬০০০ মাইল দীর্ঘ এই single line বেলপথ তখন double line হয়ে গেছে, এবং তাব দুধাবে মাঝে মাঝে সাইবিরিয়াতে নতুন নতুন শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। ২১১টা শিল্পকেন্দ্র এত বড সহরে পরিণত হয়েছে, এত বড বড বাড়ী তৈবী হয়েছে, "যার তুলনা চলে নিউইয়র্ক সহবের সঙ্গে!"

আব একটা ম্যাগাজিন থেকে খবব পেলুম, মস্কো-ভ্লাডিভোস্টক রেলেব যে শাখা মাঞ্চুরিয়ার মধ্যে দিয়ে ডাইবেনে গেছে, সেই Chinese Eastern Railwayটা ছিল রুশিয়াব জাব এবং চীন সবকাবেব যৌথ সম্পত্তি, সোভিয়েট সবকার নামমাত্র মূল্য নিয়ে রুশিয়াব অধিকাবটা চীনেব কাছে বিক্রী কবে দিয়েছে। এতে তাদের লাভই হয়েছে, কারণ প্রথমত ঐ রেলওয়েব লাইন এবং Rolling stock পুরোনো হয়ে ঝড়্‌ঝড়ে হয়ে গেছে, আর দ্বিতীয়ত, এতে চীন-জাপানের গণ্ডগোলে তাদেব জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাটাও এড়ানো হয়েছে।

আব একটা কাগজে পেলুম, হিটলার ইউক্রেনেব দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ কবে' বলছেন, আমাদেব হাতে পড়লে আমরা ওদেশে সোনা ফলাতে পারতুম। আর ষ্টেলিন বলছেন, আমাদের Potato patchএ নাক ঢোকাতে এলে আমরা ডাণ্ডা মেরে Swinish Snout থেঁতো করে দোব। তখন হিটলার "লেবেনস্রাম" বা (হাত-পা ছড়ানোর জায়গার) দাবী শুরু করেছেন। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাব প্রাক্তন জার্মাণ কলোনিগুলোর কথাও তুলেছেন।

মার্কসেব Capital বইখানার একটা পপুলার এডিসন বেবিয়েছিল, ছোট্ট সাইজের দুটো ভল্যুম, অনেকেই সেটা কিনেছিল, আমিও কিনেছিলুম। ক্যাম্পের পণ্ডিত অফিসাবদের বোঝানো হয়েছিল, ওটা ইকনমিক্সের বই। পরে কলকাতার আই বি অফিস থেকে বইটা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়।

হঠাৎ একদিন দেখি, আমাদের ঘরের পাগলা বীরেন ব্যানার্জি সন্ধ্যাবেলা সেজেগুজে একখানা একসারসাইজ বুক হাতে করে গম্ভীরভাবে বেরুচ্ছে। পড়তে যাচ্ছে। কয়েকদিন একভাবে যায় আসে দেখে জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি? একটু সবিনয় লজ্জার ঢংয়ে বললে, পিটুবাবু অমল মিত্রের ঘরে ক্যাপিট্যালের ক্লাস করেন, আমি জয়েন করেছি!

ক্যাপিট্যালের ক্লাসে জয়েন করলে কমিউনিষ্ট হতে হয়, স্থতরাং বীরেন কমিউনিষ্ট হয়েছে। আর কমিউনিষ্ট হওয়ার ফল শ্রমিকপ্রেম, স্থতরাং বীরেন মধু অভাবে গুড়ের মতন ফালতুদের নিয়ে পড়েছে। ঘরের ফালতুরা বাবুদের কাছ থেকে সব জিনিসই পায়, স্থতরাং বীরেনের টার্গেট হল বাহিরের এক ফালতু, যে জিনিসপত্রের সাপ্লাই নিয়ে আমাদের ঘরে আসতো।

বেশ লম্বাচওড়া জোয়ান, পাঞ্জাবী হিন্দু গোয়ালা। কলকাতার সওদাগর পট্টিতে খাটালে চাকবি করতো, কি এক মারামারির মামলায় জেল হয়েছে। লোকটা বে পরোয়া সাহসী, স্পষ্টবাদী এবং মারকুটে। ধর্মনিষ্ঠও বটে। ফলে জেলে সে বহুবার মারামারি করে' সবরকম শাস্তি পেয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পে এসে পড়েছে।

বীরেন তাকে পিসিমার মতন স্নেহে বাবা-বাছা বলে ডাকে, তার জন্যে খাবার রেখে দেয় রোজই,—নিষ্ঠার সহিত নতুন কমিউনিষ্ট-ধর্ম পালন করে চলে। একদিন আমাদের ঘরের অরুণ চৌধুরী (রংপুর যুগান্তর দল) তাকে নিয়ে পড়লেন, যখন বীরেন ঘরে নেই। কোন্ বাবু কেমন লোক? আমি অরুণবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করতে বললে,—"একদম ঠাণ্ডা,—গৌ কা মাফিক।" কাজেই প্রেমানন্দে অরুণবাবু আমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এবং সে বেমালুম বলে দিল, "ভঁইস কা মাফিক, হরবখত লড়াইকা ওয়াস্তে তৈয়ার হায়।" বোধ হয় সে আমাকে চেঁচামেচি করে' তর্ক করতেই দেখতো।

তারপর দুজনে যখন বীরেনের কথা জিজ্ঞাসা করলুম, সে বেমালুম বলল, "দেখ্, পড়তা তো আচ্ছা ই, বাকি কেয়া মালুম, দিলমে কেয়া হায়।" বোঝা গেল, আদিখ্যেতাটা তার মালুম হয়েছে।

'৩৪ সাল শেষ হয়ে গেছে। সরস্বতী পূজার হুড-হাঙ্গামাও কেটে গেছে, দোল এল—আমাদের ওল্ড ক্যাম্পেই কম সে কম দুশো নওজোয়ান তাণ্ডব নৃত্যে মেতেছে সকাল বেলা থেকেই, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চৌবাচ্চায় রং গোলা হয়েছে, লাল-নীল আবীর, সোনালী-রূপালী তেল রং, বড় বড় আলু কেটে গাধার ছাপ গাদা গাদা সংগ্রহ করা হয়েছে, দল বেঁধে বেঁধে হুড়োহুড়ি, দাপাদাপি, হল্লা চলছে, পাগলা গারদ নাম সার্থক হয়েছে।

এর পর হঠাৎ একদিন দুপুরে ফরিদপুরের ডেটিনিউ স্বরাজ বাবু এসে মৃদু হাস্য সহকারে খবর দিলেন, ফরিদপুরের আই বি ইনস্পেক্টর প্রবোধ মজুমদারের সঙ্গে তার ইন্টারভিউ হয়েছে, এবং মজুমদার জিজ্ঞাসা করেছে, মার্কসিজমের ক্লাস কেমন চলছে? বললেন, ওরা সব খবরই রাখে।

বিকালে নিউ ক্যাম্পে যেতে সুধীর সেন বললেন, আপনি দেউলী যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আপনার কাছেই খবরটা আগে এল? তিনি বললেন, তামসা নয়, ফরিদপুরের আই বি ইন্টারভিউ করতে আসছিল, মার্কসিজমের ক্লাস সম্বন্ধে কইয়া গেছে। আমি বললুম, তাহলে দেউলী নয়, সম্ভবত ফরিদপুরেই যাচ্ছি। মার্কসিজমের ক্লাসের খবর ফরিদপুরের আগে নিশ্চয়ই কলকাতায় গেছে, এবং ওরা সম্ভবত তাদেরই কাছ থেকে কিছু নির্দেশ পেয়েছে। না হলে ওরা interested হ'ত না!

আমার আন্দাজই ঠিক হল। কয়েক দিন পরেই অর্ডার এল, আমায় ফরিদপুরের বালিয়াকান্দি থানায় অন্তরীণে যেতে হবে। সে এক ম্যালেরিয়ার ডিপো, আমাকে শাস্তি দেওয়া!

লেনিনিজমের অনুবাদ এবং নোটের খাতাগুলো বাইরে নিয়ে যাওয়ার কথা বললে, আমি বললুম, আমি ওগুলো গেটে বিসর্জন দেওয়ার দায়িত্ব নোব না, ওগুলো এখানেই থাক্। যারা পড়বে, তারাতো এখানেই এসে জমেছে এবং আরো আসবে। এত পাঠক

বাইরে কোথায় পাব? বইটাতো ছাপা হবে না! এত বড় বই, কে ছাপবে? কে এত টাকার ঝুঁকি নেবে?

সুধীর সেন বললে, যাওয়ার সময় একটা বাণী লিখে দিয়ে যান। বললুম, মন্দ নয়। তার খাতা নিয়ে লিখে দিলুম, "ভারতের কোটি কোটি গোলামের মুক্তি চাই বলেই আমি বিপ্লবী এবং কমিউনিষ্ট—কমিউনিজমই একমাত্র পন্থা। অন্য পন্থা নেই।" নাম সই করলুম নখিঝেডফ্ (knock his head off)।

আঠাশ

Internment Order এর বয়ান এমন যে পুলিস ইচ্ছা করলেই Order violate করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করতে পারে। কিন্তু এতদিন সরকারী নীতিই এতটা প্রতিহিংসা পরায়ণ ছিল না, যাতে পুলিস খুশীমত সুযোগ নিতে পাবে। কিন্তু '৩৪ সালের Suppression of Terrorism এর যুগে গভর্ণমেণ্টও যেমন কড়া হয়েছে, পুলিসও তেমনি খুশীমত সুযোগ নিতে শুরু করেছে। অনেক জায়গায় অনেক ডেটিনিউ ঐ Order violate করার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে জেল খাটছে, কাগজে প্রায়শই এরকম নতুন নতুন কেসের খবর দেখা যায়।

তার ওপর ফরিদপুরের পুলিস সুপার তখন কুখ্যাত দোহা সাহেব। দারোগা একটু ভদ্রলোক বা ভাল হলে অবস্থাটা সহনীয় হবে, না হলে সব সময় কোমর বেঁধে সাবধান হয়ে চলতে হবে। সে এক যন্ত্রণা বিশেষ।

যাই হোক, ফরিদপুরে এসে S. P.র অফিসে হাজির হলুম। S. P.র দেখাই পেলুম না, মনে হল ওরা দেখাদেখির ধারই ধারে না। তাঁর Confidential Clerk এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, মিঃ গ্রেসার, তিনিই কাগজপত্র ঠিক করে দেন, এবং সব কাজই মুখস্থ মত চলে। আমার সঙ্গে বাক্যালাপে প্রথমেই তিনি বললেন, "আমিও কমিউনিষ্ট!" আমি বললুম, "তাই নাকি? Good news!" লোকটা কিন্তু পাজি নয়, পরে দেখেছি। তিনি আমাকে "জমা" করে নিয়ে পুলিস ক্লাবে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। ইন্সপেক্টরও দেখা দিলেন না।

সেখানে দুদিন থাকতে হল, যে ছোট দারোগা আমাকে বেলেকাঁদিতে নিয়ে যাবেন, তিনি মফঃস্বলে তদন্তে গিয়েছেন।

দুদিন বাদে ছোট দারোগা অমিয় গুহ এসে আমাকে নিয়ে চললেন বেলেকাঁদিতে, দুজন কনেষ্টবলও চললো। ট্রেনে রাজবাড়ী পর্যন্ত এসে "দেড় মাইলটাক" মেঠো পথে হেঁটে যেতে হবে! গরুর গাড়ীতে গেলে ঘুরে যেতে দেরিও হবে, আর যন্ত্রণাও কম হবে না। তাই এই ব্যবস্থা হয়েছে। সম্ভবত এই যাত্রাপথের একটা ভালোরকম T. A. Bill দারোগাবাবু মারবেন। এ লোকটা পাজি টাইপের। বললে, "ওখানেও নেহাৎ জামাই আদরে থাকবেন না।" ঝগড়াঝাঁটির ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে সর্টকাটই করলুম।

মাঠের মধ্য দিয়ে আল ধরে চলেছি, পথ আর ফুরোয় না, তিন মাইলের কম মনে হল না। লটবহর বয়ে নিয়ে চলেছে কয়েকটা লোক, গাড়ী-রাস্তায়, তারা আমাদের আগেই

পৌঁছে গেল। সন্ধ্যার আগে মাঠে নেমেছি, গ্রামে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। সীমানায় এক বড় খালের মতন মরা নদী চন্দনা, সামান্য জল আছে। শুনলুম বর্ষাকালে নদী রীতিমত নদীতে পরিণত হয়, বড় বড় নৌকো যায়। কয়েকখানা বাঁশ-বাঁধা অস্থায়ী পুলের উপর দিয়ে টলমল করতে করতে নদী পার হয়ে ঠিকানায় পৌঁছে গেলুম। কাছেই নদীর ধারেই আমার ডেরা এবং আর একটু তফাতে নদীর ধারেই থানা।

থানায় জমা লিখিয়ে বাসায় এলুম। একটু নাবাল জমির ওপর এক হাত উঁচু পোতার উপর ৭ ফুট টিনের দোচালা এবং দর্মার বেড়া দেওয়া পাশাপাশি তিন কামরা ঘর। একটাতে চট্টগ্রামের ননী চৌধুরী আগেই এসে আস্তানা গেড়েছে, দ্বিতীয় কামরা আমার। ঘরে একটা তক্তপোষ, একটা টেবিল ও চেয়ার আছে, আর একদিকে বাঁশের মাচা, জিনিসপত্র রাখার জন্যে। পাশের দিকে আর একটু উঁচু পোতার উপর ঐ রকম টিনের তিন খুপরী রান্নাঘর। পিছন দিকের কোণায় সমতল জমির ওপর মাচা বেঁধে টিনের খুপরী, পায়খানা। নীচে একটু কুয়ো কাটাও হয়নি। জলে স্থলে একটি ছোট নরক হয়ে আছে। ঘরের বাইরে রোয়াক নেই, বাসার চৌহদ্দির বেড়াও নেই। অবাক কাণ্ড। তবু ননীকে পেয়ে একটু স্বস্তি বোধ করলুম। চাটগাঁর ছেলে। ননীর কাছে শুনলুম, ঘরের জন্যে সরকারী বাজেট ছিল ৮০০ টাকা। স্থানীয় লোকেরা বলে ৩০০ টাকা খরচ করে কনট্রাক্টর (রাজবাড়ীর লোক) পেয়েছে ৪০০ টাকা, বাকি অর্ধেক টাকা দারোগা মেরেছে। এই নাকি মফঃস্বলের সরকারী কনট্রাক্টরদের বেওয়াজ।

পায়খানার পাশে একটা প্রকাণ্ড উঁচু ঢিপি আছে। সেটাকে কেটে ঘরের পোতা করলে ভালই হত, কিন্তু তাতে হাত বিশেক দূর থেকে মাটি বইতে হবে বলে, তা না করে ঘরেরই সুমুখ এবং পিছন থেকে এক এক কোদাল মাটি কেটে ঘরের পোতা তৈরী করা হয়েছে। ফলে ঘরের চারপাশের জায়গাটা নদীর ধারের রাস্তার চেয়ে নীচু হয়ে গেছে, বর্ষাকালে জল জমবে। এক চোটেই বুঝতে পারলুম, কেমন বাসায় এসে পড়েছি।

দারোগা আহমদ হোসেন সেকেলে দারোগা, মূর্খ, ভীতু, ধূর্ত এবং পাড় ঘুষখোর। পাঁচটি মেয়ের পর সম্প্রতি একটি খোকা হয়েছে। এক কিশোর আছে চাচাতো ভাই, প্রকৃতপক্ষে চাকরের মতন। এক বৃদ্ধ মৌলবী সাহেব আছেন মামাশ্বশুর, অন্নদাস, মেয়েদের পড়ান। বড় মেয়েদের ইংরাজী পড়ায় ননী। দারোগা তাকে একটু স্নেহ করে, সে দারোগার বাসা থেকে আনন্দবাজার পত্রিকা নিয়ে পড়ে আসে। তাতেই সন্তুষ্ট—চোরের রাত্রিবাস লাভের মতন।

ছেলেটি ভাল, চেহারাও সুন্দর, স্বভাবও সুন্দর, হাসিমুখ অথচ ধীর ও গম্ভীর। বাইরে আই এ পড়তো, পড়াশুনোয় মনও আছে, কিন্তু উপায় নেই। আমার কাছে কিছু বই আছে দেখে বললে, আপনার কাছে পড়বো। তার কাছে একখানা ছেঁড়া বঙ্কিম গ্রন্থাবলী ছিল—ধর্মতত্ত্ব, বিবিধ প্রবন্ধ ও কমলাকান্ত। সেটা চেয়ে নিয়ে আমি দিনকতকের খোরাক সংগ্রহ করলুম। খাওয়ার ব্যবস্থাও হল একসঙ্গে। গাঁয়ের এক কায়স্থ বৃদ্ধ আছে combined hand ঠাকুর চাকর। ননী allowance-এর পঁচিশ টাকার প্রায় সবটাই তার হাতে তুলে দেয়, তার বদলে সে ওকে দুবেলা দুটো ভাত আর চা খাওয়ায় তার খুশী অনুসারে। ননী কিছু দেখেও না, বলেও না। লোকটা পাজি ও নোংরা। রান্নাঘরের

সামনেই বাসন মাজে এবং ঘরের সামনেটাই একটা নোংরা আঁস্তাকুড় করে রেখেছে। দু-একদিন পরেই আমার সঙ্গে খেচাখেচি লাগলো।

কয়েক দিন পরে একদিন তাকে ধমক দিয়েছি, সে তেড়ে-ফুড়ে বললে আমি কাজ করবো না। আমিও বললুম, এক্ষুণি বিদেয় হও। বলে সত্যিই তাকে বিদেয় করে দিলুম। ননী ঘাবড়ে গিয়ে বললে, রান্নার কি হবে? চাকরতো পাওয়া যায় না। আমি বললুম, তুমি জলটা এনে দিলে আমিই সব করবো।

খোঁজ নিয়ে জানলুম, আগে ছিল এক মুসলমান চাকর, তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ লোকে বলে তার থাইসিস আছে। সে সব কাজ করতো এবং রাঁধতো।

তাকে ডাকলুম, সে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো, দারিদ্র্যের প্রতিমূর্ত্তি। রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল, ময়লা 'চিরকুট" কাপড় পরা, এবং একটা ময়লা পাতলা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে জড়ানো। জিজ্ঞাসা করলুম, লোকে যে বলে তোমার থাইসিস আছে, সত্যি? সে নিঃশব্দেই ঘাড় নেড়ে জানালে, না। বললুম, কাজ করতে পারবে? আবার সে নিঃশব্দেই ঘাড় নেড়ে জানালে, হ্যা পারবে। নাম তার ইব্রাহিম।

মনে হল, খেতে না পেয়েই লোকটার এই দশা হয়েছে। বললুম, বেশ, আজ থেকেই কাজে লেগে যাও। বলে তাকে একখানা কাপড় ও একটা গেঞ্জি দিয়ে বললুম, এইগুলো পরে ময়লা কাপড় ছেড়ে ফেল। একটা সাবান দিয়ে বললুম বাড়ী গিয়ে ওগুলো কেচে দিও। সে সেগুলো নিয়ে "বাড়ী থেকে ঘুরে আসছি" বলে চলে গেল এবং মিনিট পনেরোর মধ্যে ফিরে এলো, মাথায় একটু তেল-জলও দিয়েছে। আর মুখ-চোখের ভাবে অদ্ভুত পরিবর্তন, যেন আশা আর উৎসাহে তাজা হয়ে উঠেছে। একটি ঝকঝকে বদনাও নিয়ে এসেছে। দেখে মনে হল যেন পরিষ্কার স্বভাবের প্রতীক।

কায়েত বুড়ো রান্নাঘরটাকে সবরকমে নোংরা করে রেখেছিল, আমি কাজ চালিয়ে নিচ্ছিলুম। ইব্রাহিম চট করে কিছু মাটি মেখে নিয়ে উনুন মেরামত করে ফেললে এবং সারা ঘরটা নিকিয়ে পরিষ্কার করে ফেললে। আমার আন্দাজই ঠিক, স্বভাব পরিষ্কার না হলে, আমার বলার অপেক্ষা না রেখে নিজে থেকেই এটা করতো না। তার পর রান্নার কড়া এবং সব বাসন নদী থেকে মেজে পরিষ্কার করে নিয়ে এল, এবং কুটনো-বাটনা রান্নায় লেগে গেল। মাইনে ঠিক হল, পাঁচ টাকা।

আমার ভরসায় ননীরও ভরসা হয়েছিল, কিন্তু পাশেই পোষ্ট অফিস এবং মুসলমান পোষ্ট মাষ্টারের বাসা। তিনি দেখে বললেন, "সর্বনাশ! ওর যে থাইসিস আছে।" আমি হেসে বললুম, "আমার ওষুধে ভাল হয়ে যাবে।" তিনি চলে গেলেন।

দেখতে দেখতে ইব্রাহিম রেঁধে খাইয়ে দিলে। একটু দূরের টিউবওয়েল থেকে বালতি করে স্নানের জলও এনে দিয়েছে, মানা শোনেনি। কাজের লোকও বটে, রাঁধেও মন্দ নয়।

আমার অবাক লাগলো। ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করলুম, লোকে কেন বলে, তোমার থাইসিস আছে? সে আস্তে আস্তে মাটির দিকে চেয়ে বললে, "বাবু,—গাঁয়ের লোক কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না। একটু জমি আছে, তা থেকে যা পাই, খেতে কুলোয় না। একটা মেয়ে আছে, বছর দশেকের, তার মাও আছে। এখানে কাজ করে একটু ভাল ছিলুম, লোকের পছন্দ হয় না। একটু জরজ্বাড়ি হলেই বলে থাইসিস।

বুঝলুম। আমাদের খাইয়ে দাইয়ে সে বাসন মেজে, ঘর নিকিয়ে, খেয়ে বাড়ী যায়, মেয়ের জন্য একটু-একটু তরকারি নিয়ে যেতে বলে দিয়েছি, ভারি আনন্দ তার। ২।৩ ঘণ্টা পরেই আবার এসে চা খাওয়ায়, রান্না করে, রাত্রে আমাদের শোওয়ার পরে বাড়ী যায়, আবার ভোরেই আসে। একেবারে নিশ্চিন্ত হলুম।

বেলেকাঁদি গ্রামটা দুই অংশে বিভক্ত। এক অংশে লোক বসতি, আর এক অংশে হাই স্কুল, খেলার মাঠ, জমিদারের নায়েবের দপ্তর ও বাড়ী, সাবরেজেষ্ট্রী অফিস, পোষ্ট অফিস, থানা ও হাটখোলা। গ্রামের এই দুই অংশের মাঝে আছে একটা খাল,—তার ওপরে ছোট কাঠের পুল আছে। প্রথম অংশটাতে আমাদের প্রবেশ নিষেধ। আমাদের দিনের বেলার চৌহদ্দী ঐ দ্বিতীয় অংশ, এবং রাত্রে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত বাসার চৌহদ্দীর মধ্যে আটক।

পোষ্ট অফিস ও থানার মধ্যে হাটখোলা আমাদের বাসা থেকে ২০০ হাতের মধ্যে। হাটের দু দিন (সপ্তাহে) হাটে যাওয়া এবং রোজ দুবেলা থানায় হাজিরা দেওয়া ছাড়া আমি প্রায় ঘর ছেড়ে বার হই না। ননী একটু ঘোরাফেরা করে, বিকালে খেলার মাঠে বেড়াতে যায়। একটুখানি খোলা জায়গার তিন দিকে মোট ৮।১০ খানা মুদী, ময়রা, দর্জির দোকান —এই হচ্ছে হাটখোলা। ভাল খাবার স্রেফ পাওয়া যায় না। হাটে কিন্তু মাছ, ডিম, দুধ বেশ সস্তা, বিশেষত ডিম আর দুধ। ডিম পয়সা পয়সা, এবং দুধ তিন বা চার পয়সা সের। পালে-পার্বণে পাঁচ পয়সাও হয়। আমি হাটের দিন ৫।৭ সের দুধ কিনে ঘরে ছানা কাটিয়ে একটু চিনি দিয়ে পাক করে রেখে দিতুম, চায়ের সঙ্গে তাই খেতুম দুজনে। ইব্রাহিমও একটু বাড়ী নিয়ে যেত।

যাই হোক, ননীর বাড়ি থেকে চেষ্টা চলছিল, অল্প দিনের মধ্যেই তার Home internment-এর order এসে গেল, সে চলে গেল। তার বঙ্কিম গ্রন্থাবলীখানা চেয়ে রেখে দিলুম।

একা একা লেখাপড়াই বা কি করা যায়। Capital বইটা বাংলায় অনুবাদ করতে শুরু করেছিলুম। বড কঠিন কাজ, কেউ কখনো চেষ্টা করেনি। প্রায় ১০০ পৃষ্ঠা অনুবাদ করে হাঁপিয়ে গিয়েছিলুম। কাজকর্ম কিছুই নেই, কোণার ঢিবিটার মাটি কেটে ঘরের চারপাশে ফেলা শুরু করলুম। মানা না শুনে ইব্রাহিমও ঝুড়ি নিয়ে এল মাটি বইতে। বলে, আমি এখন গায়ে বেশ জোর পেয়েছি! কিছুদিনের মধ্যে বাসার চারিদিক চৌরস করে ফেললুম।

এর মধ্যে হঠাৎ আর এক ডেটিনিউ এসে পড়লো, বহরমপুর ক্যাম্প থেকেই, বিমল গুহ, ২২।২৩ বছরের জোয়ান, ননীর চেয়ে একটু বড। অনুশীলন, "কিচেনের" লোক। দুজনের সংসার দিনকতক বেশ চললো। ষ্টেটস্‌ম্যান (দৈনিক) এবং সঞ্জীবনীর (সাপ্তাহিক) গ্রাহক হয়েছিলুম, তাই নিয়ে পড়া এবং আলোচনায় বেশ খানিক সময় কাটতো। সে এক বেহালা এনেছিল, সকাল-সন্ধ্যায় সাধতো। বিকালে দারোগা এবং পোষ্টমাষ্টারের বাসার ছেলেদের সঙ্গে দাঁড়িবাঁধা খেলাও করতো। আমার মাঝে মাঝে রাস্তায় এক চক্র ঘুরে আসা ছাড়া diversion-এর আর কোন উপায় ছিল না।

হাওলদার সাহেব হিন্দুস্থানী, আধা-বাংলায় কথা কয়, বেশ মানুষ। আমাদের সম্বন্ধে একদিন বললে, "আরে ভাই, এ লোক তো সন্ত হায়। আরে হাঁ, ইনকা তপস্যা হায় দেশকা সুধার।" গৌরবর্ণ, মাথায় টাক, যেন গৃহস্থবাড়ীর বুড়ো কর্তা।

জমাদার সুশীল মণ্ডল উকীল যোগেন মণ্ডলের জ্ঞাতি-ভাই, যিনি পরবর্তী কালে পাকিস্থানের আইনমন্ত্রী হয়েছিলেন। সুশীল মণ্ডল লোকটা ছিল অহঙ্কারী এবং একটু পাজি টাইপ। সে মাঝে মাঝে আমাদের ওপর ছড়ি ঘোরাবার চেষ্টা করতো, ইসারায় বুঝিয়ে দিত, দারোগা মফঃস্বলে গেলে সে থাকতো থানার বড় হাকিম, যেন সে ইচ্ছা করলেই আমাদের নামে ডায়েরী লিখে আমাদের জব্দ করতে পারে। আমি মনে মনে ভাবতুম, সবুর কর ঠাকুর, তোমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করার ব্যবস্থা আমিই করবো।

আসার পরই আমি পায়খানার কুয়ো সম্বন্ধে রাজবাড়ীতে ইনস্পেক্টরের কাছে কন্‌ট্রাক-টরের নামে রিপোর্ট করেছিলুম। ফলে হঠাৎ একদিন দারোগা সাহেব একদল মেথর নিয়ে এসে একটা কুয়ো খুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভাল দরখাস্ত লেখার বিদ্যে দেখলে লোকে একটু সমীহ করে।

ঘরের বারাণ্ডা এবং চালের সম্বন্ধেও লেখালেখি শুরু করেছিলুম। একদিন ইনস্পেক্টর এলেন এবং আমার সঙ্গে আলাপ করে কাজটার ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেন। একদিন থানায় ছিলেন, বেশীর ভাগ সময়টাই আমার ঘরে আড্ডা মেরে কাটালেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক, মানুষ ভাল, মনে হল দারোগা সাহেবকে কিছু মিঠে-কড়া বচন শুনিয়েছেন। কয়েক দিনের মধ্যেই কনট্রাকটরকে সঙ্গে নিয়ে দারোগা সাহেব এলেন। মাল-মশলার ফর্দ তৈরী হল এবং কয়েক দিন পরেই আমাদের দু'ঘরের সামনে বারাণ্ডা এবং চাল তৈরী হয়ে গেল।

দু জনের ৫০ টাকার সংসার, সচ্ছল অবস্থা, সুতরাং ইণ্ডিয়ান রিভিউ (মাসিক) এর গ্রাহক হলুম। কাগজপত্রগুলো পড়ার সময় প্রধান ও জ্ঞাতব্য কথাগুলোতে টিক মারি, কিছু কিছু কোটেশন একটা খাতায় লিখে রাখি, একটা খাতায় ২।১টা বিষয় অনুবাদও করে রাখি, আর একটা খাতায় ভাল প্রবন্ধগুলোর নাম ও তারিখ লিখে রাখি, বুক রিভিউ পড়ে' ভাল বইয়ের নাম প্রভৃতিও লিখে রাখি। এমনি করে বেশ খানিক সময় কাটাই।

বিমল গুহকে বলে দিয়েছিলুম, দারোগার সঙ্গে কখনো হেসে কথা ব'লো না। ভদ্র ভাবে কথা ব'লো, কিন্তু গম্ভীর থেকো। জোয়ান ছোকরা ডেটিনিউদের গম্ভীর মুখকে ওরা ভয় করে। আমি বয়স্ক বলে আমিই আমাদের তরফ থেকে কথা কই, লেখালিখি করি, তবু ওরা ভরসা রাখে, আমি বেতালা বা সাংঘাতিক কিছু করে বসবো না, এবং ছোকরা ডেটিনিউকেও একটু কন্‌ট্রোলে রাখবো। ফলে ওরা নিজেরাও একটু বিবেচনা করে চলে।

চলছিল এমনি ভাবেই, কিন্তু বিমলচন্দ্রের মতিগতি একদম বদলাতে শুরু করলো। দারোগার এক জ্ঞাতিভাই ছোকরা এল,—ম্যাট্রিক পড়ে। দারোগার অনুরোধে বিমল বাবু তাকে পড়াতে শুরু করলে। পারত পক্ষে আমার কাছেই আসে না।

এপ্রিল মাস এল। হঠাৎ এক অর্ডার এল, আমাদের দিনের বেলার area কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছিল মোট সিকি বর্গ মাইলের মতন, এখন হল ৩০০—১০০ গজের মতন। নদীর ধারের এক ফালি জায়গা। বাঁশের পুলের একদিকে মুসলমানদের নমাজের জায়গা ও মসজিদ, আর একদিকে সাবরেজেষ্ট্রী অফিস, আমাদের বাসা, পোষ্ট অফিস, হাটখোলা এবং থানা আর একদিকের সীমানা নদী এবং অপর দিকে হাটখোলার পিছন দিকের রাস্তা।

শুধু তাই নয়। রাত্রে কনেষ্টবল এসে ঘুম ভাঙিয়ে সাড়া নিয়ে যাওয়া শুরু করলো দাগী দেখার মতন। অভাবনীয় কাণ্ড। সুতরাং বিমল বাবু আবার আমার দিকে একটু ফিরলো।

দুজনে অনেক জল্পনা-কল্পনা করে' স্থির করে ফেললুম, পঞ্চম জর্জের রাজত্বের সিলভার জুবিলী আসছে, কাগজে তার তোড়জোড়ের খবর বেরুচ্ছে, সম্ভবতঃ কিছু ডেটিনিউ ছাড়বে, এবং তারই পরীক্ষা শুরু করেছে। এই উৎপাতগুলো মুখ বুজে সয়ে যেতে পারলেই হয়ত ছাড়া পাবো।

কিন্তু দেখতে দেখতে জুবিলী পার হয়ে গেল। কাগজে খুঁজি, কোথাও ডেটিনিউ ছাড়ার কোন খবরই নেই। সুতরাং এই আশা ভঙ্গের পর প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। একটা লড়াইয়ের জন্যে কোমর বাঁধতে লাগলুম। এমন সময় হঠাৎ একদিন থানায় দারোগার কাছে শুনলুম গোয়ালন্দের ডেটিনিউ রোহিণী বড়ুয়া দারোগাকে এক দা'য়ের কোপে সাবাড় করেছে!

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অবস্থা বদলে গেল, দারোগার বজ্জাতি বন্ধ হল। রোহিণী বড়ুয়া এক দা'য়ের কোপে অনেক ডেটিনিউয়ের অনেক যন্ত্রণার অবসান করে দিয়ে হাসতে হাসতে ফাঁসি গেল। আজ তার কথা ক'জনের মনে আছে?

রাজবাড়ী থেকে ইনস্পেক্টর বাবু এলেন। গোয়ালন্দের ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করলুম। তিনি বললেন, "মাথা গরম ছোকরা, দারোগা তার একটা দরখাস্ত ফেলে রেখেছিল, মা'র অসুখ, দেখতে যাবার ছুটী চাই। আরে বাবা, ছুটী কি দেয় গভর্নমেণ্ট? চাটগাঁর ছোকরা, ক্ষেপে গিয়ে দারোগার ওপরই গায়ের জ্বালা মেটালো।"

আমি বললুম, "হয়ত It was the last straw on the camel's back, দিনের পর দিন হয়ত তার জীবন দুর্বহ করে' তোলা হয়েছিল। সেটা আমরা আন্দাজ করতে পারি। আমাদের এই দারোগা সাহেবের কথাই ধরুন না কেন? আমি বহুকাল থেকে বহুবার বহু জায়গায় ডেটিনিউ হয়ে বাস করেছি। এমন কাণ্ড কখনো শুনিনি যে, রাত্রে দাগী দেখার মতন করে কনেষ্টবলেরা ডেটিনিউয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়ে সাড়া নিয়ে যায়। উনি একগাদা ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করেন, ওনার সেটা বিবেচনা করে চলা উচিত নয়?" দারোগা চুপ্‌সে গেল।

তারপর areaর কথা তুললুম। দারোগা সাহেব তখন মুখ খুললেন—বললেন, "কি করবো, ওপরের হুকুম।" আমি বললুম, "ওপরের তারা চেনে, আগের আর পরের চৌহদ্দী? কতটুকু বা ছিল, আর কতটুকু হল? সবই আপনার কেরামতী।" ইন্‌স্পেক্টর বাবু বললেন, "আমি গিয়ে former area restore করতে লিখে দোব, সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাববেন না।" কিছু দিন পরে পূর্বচৌহদ্দী আবার মঞ্জুর হয়েছিল।

এর পর রাত্রের অত্যাচার বন্ধ হল, দারোগা সাহেব হেসে কথা শুরু করলেন, এবং ক্রমে প্রায় "My dear" হয়ে উঠলেন। বিমল বাবুর মতিগতিও আবার বদলে গেল। আমার সঙ্গে যেন সম্পর্কই নেই। এই ভাবে কাটলো অক্টোবর মাস পর্যন্ত। এর চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক থাকা ভাল। সুতরাং একদিন নির্বিবাদে দুজনের হাঁড়িও পৃথক করা হল।

ইতিমধ্যে বর্ষাকাল পার হয়ে গেছে। বিশ্রী বর্ষায় চারি দিকে জল-কাদার মধ্যে ঐ ঘরে প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন কাটতো কেমন করে' তা গদ্যে না শুনে পদ্যেই শুনুন।

বর্ষা-মঙ্গল—বর্ষা+অমঙ্গল

শ্রাবণের প্রায় শেষ, ভরা বরষা
আকাশ না হতে চায় মোটে ফরসা।
হরদম ঝমঝম বৃষ্টির ধুম
থেকে থেকে মেঘ ডাকে গুড়ুম গুড়ুম।
ষাঁড়ের নতন গলা যত কোলা ব্যাঙ
দল বেঁধে ডাক ছাড়ে গ্যাঙগোর গ্যাং।
শিয়ালের আস্তানা ডুবেছে জলে—
ঝোপে ঝাপে ঘোরে তারা সদলবলে।
দিনের বেলায় ডাকে হুক্কা-হুয়া।
ভিজে কাঠ, জ্বলেনাকো, কেবলি ধুঁয়া।
মাঠঘাট জলে ডোবা, উঠোনে কাদা
গরুগুলো দিন রাত গোয়ালে বাঁধা।
মাছ তরকারি হাটে কিছু না পেয়ে
পেট ভরে অঢাক খিচুড়ী খেয়ে।
ঘরের কানাচ ঘিরে হল জঙ্গল
বড় বড় জোঁক ফেরে বেঁধে দঙ্গল।
পথে ঘাটে ঘোরে ফেরে বড় বড় সাপ
রূপ দেখে আত্মারাম করে বাপ বাপ।
কেঁচো আর কেন্নোয় বারাণ্ডা ভরা
চিমটের চিমটিতে ফুরোয় না তারা।
কুনো ব্যাঙ ঘরে আছে গোটা দুই চারি
কখন বা ঢোকে সাপ, সেই ভয়ে মরি।
খাটের পায়াটা ঘিরে ধরিয়াছে উই
এই ঘরে দিনরাত উঠি-বসি শুই।
কাপড় শুকোয় নাকো ঘরের ভেতর
জুতোগুলো ভিজে ভিজে হয়েছে গোবর।
বাদলায় গলে' জল হয়ে গেছে নুন
সিলিংয়ের কাঁচা বাঁশ থেকে ঝরে ঘুণ।
দেশলাই জ্বলেনাকো, এ বড় বালাই
বিড়িগুলো নিভে যায়, যতই ধরাই।
মুরগীর পাল আর বেড়াল-কুকুরে
পাত-ফেলা ভাত খায় ভাগাভাগি করে'।
সবার দুঃখ বুঝি বুঝেছে সবাই
নেহাৎ ঝগড়া-ঝাঁটি করেনাকো তাই।

চাষার আনন্দ বটে মাঠ পানে চেয়ে
ঘরে বসে ভেজে কিন্তু তার ছেলেমেয়ে।
ছোট না'য়ে একা নেয়ে ছেঁড়া পাল তুলে
ভিজে আর জল ছেঁচে নিভয়ে চলে।
চলিষ্ণু জল ছাড়া বাঁচে না জীবন
তাই ভেবে আপাতত শান্ত আছে মন।
সুখেদুখে গড়া এই জগৎটা দাদা
গোলাপেতে কাঁটা, আর বর্ষায় কাদা।

যাই হোক, অক্টোবরেই খবর পাওয়া গেল, আর একজন ডেটিনিউ আসছে। বিমল বাবু মাঝের রান্নাঘরে পৃথক হাঁড়ি কেড়েছিল, এবং এক পৃথক ছোকরা চাকর রেখেছিল। সে খবর শুনে সডাক করে তৃতীয় খুপরীতে বা'স্ন র সরিয়ে নিয়ে গেল, কিজানি, যদি বে-পার্টির লোক আসে, এক পাশে সরে' থাকাই ভাল!

এর পর একদিন রাত দশটায় হিজলী ক্যাম্পের এক মূর্তিমান বিপ্লবী বেলেকাঁদি পৌঁছে গেলেন। নাম অনিল বাক্চি। বিমল বাবু তখন ঘুমিয়েছে, আমি জেগে আছি, ইব্রাহিমও আছে। সুতরাং আমি উঠে কর্তার এবং escort officer এর খাওয়ার ব্যবস্থা করলুম। ইতিমধ্যে বিমল বাবু উঠেছে এবং দুই কর্তায় আলাপ শুরু করেছে।

ওদের খাওয়াদাওয়ার পর আবার দুজনে আলাপ শুরু হল, এবং রাত দুটো পর্যন্ত আলাপ চললো। এক পার্টির লোক!

অনিল বাবুর বাপ ছিল পুলিস—নর্থবেঙ্গলের লোক—এখন তিনি মৃত। ওর এক ভাই সম্প্রতি এই ফরিদপুরেই I. B. Training নিয়ে গেছে। এ হেন অনিল বাবুর স্বদেশী হাঙ্গামায় আসা, এ যেন দেবতার ছলনা।

দ্বিতীয় দিন সকালেও অনিল বাবু আমার কাছেই খেলে এবং রাত্রে বিমলবাবুর সঙ্গে আর এক দফা পরামর্শ করে' আমার কাছে একসঙ্গে Joint messing এর প্রস্তাব করলে। আমি চক্ষুলজ্জায় আর "না" বলতে পারলুম না। দুই চাকর নিয়ে Joint messing এর ব্যবস্থাই হল।

আসল ব্যাপার এই যে, এই কয়দিনে বিমল বাবু সংসারের ঝঞ্ঝাট খানিক বুঝেছে। অনিল বাকচি বাবু লোক, চেহারা এবং পোষাক ফিটফাট করতেই তার মনোযোগ এবং সময়ের সবখানিই খরচ করতে হয়। এ অবস্থায় সকল-ঝক্কি আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ানো আর কানাকানি কথা নিয়েই ওরা থাকতে চায়। সেটা দুদিনেই বোঝা গেল।

আমার একাই দিন কাটে, শুধু সন্ধ্যার পর বাইরে একটু বসলে ওদের সঙ্গে একটু গল্পসল্প হয়। অনিলের মুখে ফ্রয়েড ছাড়া প্রায় কথাই নেই। আর আছে বেহিসেবী চালিয়াতী। বিদ্যের দৌড়, ক্যাম্পে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ফেল মেরেছে, বয়েস ২৭।২৮। '২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে ভল্যান্টিয়ারী করেছে, সেই বোধহয় স্বদেশী হাঙ্গামায় হাতে খড়ি। তারপর দমদম জেল এবং ক্যাম্পে বিভিন্ন দলের দাদারা টিপেটুপে তেএঁটে

করে ছেড়ে দিয়েছে। অনুশীলন দলের কথাটাই হয়ত মিথ্যে, বিমল বাবু অনুশীলন দলের লোক, এটা বুঝেই হয়ত তাকে ভোগা দিয়েছে, তার ওপর দাদাগিরী খাটবে বলে।

তার কথাবার্তা শুনে হাসবো কি কাঁদবো, ভেবে পাই না। "সাত বছর জেলে কাটলো —বাড়ীর খবর জানি না। '২৮ সালে arrest করে জলপাইগুড়ীর আই. বি. অফিসার জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা অনিলবাবু, আপনি ২১ সালে কেন অন্য Provinceএ গিয়েছিলেন বলুন তো?" ভাবখানা হচ্ছে, তিনি এমন একজন important লোক যে অনুশীলন পার্টি ২১ সালেই তাঁকে অন্য provinceএ কাজে পাঠিয়েছিল। অথচ তখন তাঁর বয়েস, হিসেবমত ১৬।১৭ বছর!

কথায় কথায় অনুশীলন দলের লীডারদের নাম করে' সে বিমল বাবুকে বলে, আমি যদি এটা করি, অমুক কি বলবে, যদি ওটা করি তমুক কি ভাববে? অর্থাৎ উনিও একজন লীডার এবং বিমল বাবুর দাদা-স্থানীয়।

সে যে একজন বড় গাইয়ে-বাজিয়ে লোক, সেটা দু-এক দিনের মধ্যেই আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে। গান শুনে দেখা গেল, আজও তার তালমাত্রা জ্ঞান হয়নি। গান সম্বন্ধে আমি যে আনাড়ী, এটা সে "কমনসেন্সের" জোরেই ধরে নিয়েছিল, আর বিমল বাবুকে সাগরেদ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল। বিমল বাবুও মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। একদিন বেহালা নিয়ে প্রাণপণে তার সব চেয়ে রপ্ত একটা ভাল গৎ বাজিয়ে ওকে বুঝিয়ে দিলে যে, সেও নেহাৎ আনাড়ী নয়। এমনি করে লজ্জা ভাঙ্গার পর ক্রমে বিমল বাবু ওকে নিয়ে নির্মমভাবে রগড় সুরু করলে। বেহালায় একটা করে সুর বাজায়, আর ওকে জিজ্ঞাসা করে, কি সুর? ও বলতে পারে না, না হয় ভুল বলে। তখন বিমল বাবু বলে দেয়, আর ও নিজের জানা একটা সুর ভেঁজে লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করে। আমি মজা দেখি।

একদিন মস্কো-ভলাডিভোষ্টক রেল লাইনের দৈর্ঘের কথায় অনিল বললে, "চার হাজার মাইল, আমরা কয়েকজন বন্ধুমিলে বাড়ী থেকে পালাবার মৎলব করেছিলুম, তখন ম্যাপে দেখেছিলুম!"

সেই দিন থেকে আমি ওর নাম রাখলুম বিরিঞ্চি বাবা। বিমল বাবুও হেসে সায় দিলে।

এক টুকরো ভাল গল্প বলতে ভুলে গেছি। অক্টোবরের (৩১) আগে যখন দারোগা সাহেব হয়েছেন "My dear" এবং বিমল বাবুর সঙ্গে আমি "ভিন্ন" হয়েছি, তখন একদিন হঠাৎ দারোগাসাহেব এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে আমার ঘরে এসে একগাল হেসে বললেন, "আমার নতুন জামাই। বি-এ-তে স্কলারশিপ পেয়ে এখন এম-এ পড়ছে। সৈয়দ বংশের ছেলে। পড়ার খরচ আমিই দিচ্ছি। আপনারা আছেন শুনে দেখতে চাইলে, তাই নিয়ে এসেছি আলাপ করিয়ে দিতে। ইকনমিক্সের ছাত্র, নাম আবদুল হালিম।

দারোগা সাহেব বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, টেরই পাইনি, এখন চিড়িয়াখানা দেখাতে এনেছেন জামাইকে। তিনি বিদ্যায় এবং বংশে জামাইয়ের চেয়ে নীচু সুতরাং ভাল বংশের বিদ্বান জামাই পেয়ে এত খুশী হয়েছেন যে, হুঁসই নেই, কত বড় আইনবিরুদ্ধ কাজ করছেন। ডেটিনিউরা স্কুল কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে পারবে না, এদিকে দারোগা

নজর রাখবে, এই হল সরকারী হুকুম। মনে মনে হাসলুম, তাঁকে ঘাল করার একটা অস্ত্র হাতে রইলো।

যাই হোক, আদর করে বসিয়ে একটু চা খাওয়ালুম এবং আলাপ সুরু করলুম। দারোগা সাহেব তাকে রেখেই ফিরে গেলেন। পড়াশুনোর কথা থেকে অর্থনীতির আলোচনা সুরু হল। হালিম বললে, 'পলিটিক্যাল ইকনমি হচ্ছে ক্যাপিট্যালিষ্ট ইকনমি—মার্কসের থিওরী তার মৌলিক ভিত্তিই উড়িয়ে দিয়েছে। আজকাল ইউনিভারসিটির এম, এর অর্থনীতিতে মার্কসের "ক্যাপিট্যাল" একটা রেকমেণ্ডেড বই, পড়তে হয়।'

বলতে বলতে সে উৎসাহ সহকারে আমাকে মার্কসের অর্থনীতির মূল কথা বোঝা'তে সুরু করে দিলে। বুঝলুম, ছোকরা মার্কসের ভক্ত, এবং চুপ করে তার কথা শুনে বুঝলুম, তার ধারণা এখনো পরিষ্কার হয়নি। শেষে আমি মুখ খুললুম, এবং তার বোঝার ঘাটতি কিছু দেখিয়ে দিলুম।

ছেলেটা সত্যিই ভাল। সে বুঝলো, মানলো, এবং বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, "আমি আরো ২।১ জায়গায় ডেটিনিউ দেখেছি, আমার নানাও দারোগা। মার্কসিজম বোঝে, এমন ডেটিনিউ দেখিনি।" কথাটা বেশ লাগলো। রাত্রে আবার আসবে বলে চলে গেল, কিন্তু এল না। শেষে অনেক রাতে দরজায় টোকা শুনে উঠে দেখি মূর্তিমান হাজির! বলে, বউকে বলে এসেছি, কেউ জানবে না, এখানেই গল্প করবো সারারাত, তারপর ভোর রাতে উঠে চলে যাবো!

অবাক কাণ্ড! এবং সত্যিই আমাকে অবাক করলে। আমার ভক্ত হয়ে গেছে। সারারাত আমার বিছানায় শুয়ে হাজারো রকমের গুরুতর বিষয়ের খুঁটিনাটি আলোচনা। আমিও বহুকাল এত আনন্দ পাইনি।

ভারতের ভূতপূর্ব অর্থসচিব John Strachyর বিখ্যাত বই Theory and practice of socialism তখন নতুন বেরিয়েছে, এবং প্রথম চালান ভারতে আসার পরই "custom ban" করা হয়েছে। সে বইখানা আমি হালিমের কাছেই পেয়ে পড়ে' নিয়েছিলুম।

যাই হোক,—বিরিঞ্চি বাবার কল্যাণে বেলেকাঁদি এক চমৎকার চিড়িয়াখানা হয়ে উঠেছিল। সরকারী আজব চিড়িয়াও পরে এসে জুটেছিল। সুতরাং আমি নিয়মিত ভাবে ডায়েরী লেখা শুরু করলুম—"চিড়িয়াখানার ডায়েরী।" তার ভূমিকায় লিখলুম—

চিড়িয়াখানায় নানা প্রকারের জীবের সংগ্রহ থাকে,—কোনোটা চমৎকার, কোনোটা বা চমকপ্রদ—কোনোটা হাস্যরস, কোনোটা বা বীভৎস রসের উদ্রেক করে। পারিপার্শ্বিক নানা ভাবোদ্দীপক জীবের সমাবেশের মধ্যে বীভৎস জীবগুলোর বীভৎসতা সহনাতীত হয়ে উঠতে পারে না। এমন কি, সমগ্র পরিবেশের harmonyর মধ্যে তার অবদানটুকুও উপভোগ্য হয়।

আমাদের Detention campগুলোকে এমনি স্বদেশী চিড়িয়াখানা বলা চলে।

আর এক রকমের ছোট ছোট যাযাবর চিড়িয়াখানা নিয়ে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মেলায় মেলায় ঘোরে। তাতে থাকে দু'-চারটে অদ্ভুত বা ভয়ঙ্কর জীব মাত্র। লোকে শুধু ভয়ে বা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখে। হয়ত একটা মাত্র কিম্ভুতকিমাকার জানোয়ার দেখার জন্যেই লোকে পয়সা খরচ করা সার্থক মনে করে।

আমাদের Village Internment campগুলোকে অনেক সময় এই রকম ছোট চিড়িয়াখানার সঙ্গে তুলনা করা চলে।

বালিয়াকান্দি এমনি একটা চমৎকার ছোট চিড়িয়াখানা। এর চমৎকারিত্ব দিন দিন এমনভাবে বেড়ে চলেছে যে, এর বর্ণনা ইতিহাসে স্থান পাওয়ার যোগ্য। অধীন এই চিড়িয়াখানার একটি সামান্য জীব।

* * * *

এই চিড়িয়াখানার ডায়েরী লিখতে লিখতে আমার মন-মেজাজের অবস্থা কেমন হয়েছিল, শেষাংশে ২।৪ লাইনে তার পরিচয় আছে।

"মেজাজ ঠিক রাখতে পারলে স্রেফ খগড় দেখ আর আনন্দ কর, ব্যস্। চলুক যেমন চলছে, যতদিন না সব 'মাঠময়' হয়। সচ্চিদানন্দ রূপস্বরূপ আমি যেন সর্বদা চিং হয়ে পড়ে থেকেই এ আনন্দ উপভোগ করতে পারি। উঠছিও না, নড়ছিও না, যতদিন না বিধাতা-পুরুষেরা পশ্চাদ্দেশে পাদপদ্মাঘাত সহকারে বিদায় দিয়ে বলে, ভাগ শালা!"

ঊনত্রিংশ



আমাদের বেলেকাঁদির চিড়িয়াখানায় যখন সরকারী বেসরকারী আজব চিড়িয়াদের ঝটাপটি চলছে, তখন বহির্জগতের বৃহত্তর চিড়িয়াখানায় সরকারী-বেসরকারী ভালুক নাচ সুরু হয়ে গেছে। '৩৫ সালের ১লা এপ্রিল "all fool's day" তে '৩৫ সালের কুখ্যাত নতুন শাসনবিধি চালু করা হয়েছে, এবং তা নিয়ে ভারতের আকাশ-বাতাস তোলপাড় সুরু হয়েছে।

শাসনবিধির দুটো অংশ—প্রদেশগুলোতে "অটোনমি,"—এবং কেন্দ্রে "ফেডারেশন" প্ল্যান। স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্বতের এই মূষিক প্রসব দেখে ২।৪ জন তৃতীয় শ্রেণীর হুকুম-বরদার এবং হিন্দু মহাসভা ছাড়া সারা দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও সংস্থা, এবং রবীন্দ্রনাথ বা ওয়াজির হাসানের মতন প্রথম শ্রেণীর বিশিষ্ট নির্দলীয় নাগরিকেরা এক বাক্যে বিস্ময় ও হতাশা প্রকাশ করে নিন্দা করলে। স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল।

প্রদেশে অটোনমির দৌড়টাই পরীক্ষা করা যাক। চলতি ('২০ সালের) শাসনবিধিতে যে সব বিভাগ "রিজার্ভড্ সাবজেক্ট" বলে সরকার নিজ হাতে রেখেছিল, মন্ত্রীদের হাতে দেয়নি, নতুন শাসনবিধিতে সে বিভাগগুলোও "রিজার্ভড্ সাবজেক্ট" নাম তুলে দিয়ে স্বদেশী মন্ত্রীদের হাতেই দেওয়া হল, অর্থাৎ নেতাদের মধ্যে কয়েকটা নতুন বড় চাকরী বিলি করার ব্যবস্থা হল। ওপর ওপর দেখতে মন্দ নয়, কিন্তু তলাটা একটু উল্টে দেখলেই দেখা যাবে যে, সর্ব প্রকারের প্রকৃত ক্ষমতা থেকে মন্ত্রীদের একেবারে নস্যাৎ করার বন্দোবস্তও করা হয়েছে।

শাসনবিধিতে বলা হয়েছে,—প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব স্বয়ং বৃটিশ সম্রাটের হাতে ন্যস্ত হল, শাসন কার্য পরিচালিত হবে তাঁর প্রতিনিধি গভর্ণরের দ্বারা তাঁর অধীনস্থ রাজ-

কর্মচারীদের মারফৎ, এবং শাসন সংক্রান্ত সর্ববিধ আদেশ-নির্দেশই গভর্ণরের নিজ আদেশ-নির্দেশ রূপে গণ্য হবে।

গভর্ণর নিজে মন্ত্রিমণ্ডলী নির্বাচন বা গঠন করবেন, এবং মন্ত্রিমণ্ডলীর অস্তিত্ব বা স্থায়িত্ব নির্ভর করবে তাঁর মর্জির উপর। অর্থাৎ গভর্ণর যাকে খুসী মন্ত্রী করতে পারেন, যখন খুসী মন্ত্রীদের বরখাস্ত করতে পারবেন, ব্যবস্থাপক সভার কিছু বলবার নেই, কারণ মন্ত্রীরা ব্যবস্থাপক সভার কাছে দায়ী নন, তাঁরা দায়ী গভর্ণরের কাছে।

তারপর, চলতি ('২০ সালের) শাসনবিধিতে গভর্ণরদের হাতে যে "ভেটো" এবং "সার্টিফিকেশন" ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভার রায়কে উল্টে দেওয়ার যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল (ব্যবস্থাপক সভা যে প্রস্তাব পাশ করেছে, সেটা নাকচ করার নাম "ভেটো," আর ব্যবস্থাপক সভা যে প্রস্তাব বাতিল করেছে, সেটা বহাল করার নাম "সার্টিফিকেশন") নতুন শাসনবিধিতে গভর্ণরদের সেই প্রত্যক্ষ স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু তাঁর অপ্রত্যক্ষ স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, গভর্ণরদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলোর একটা তালিকা তৈরী করে দিয়ে। তালিকাটা প্রকাণ্ড, তাই সেটাকে তিন ভাগে ভাগ করে তিন নামে চালানো হয়েছে, special power, special responsibility, এবং personal discretion। Power মানে ক্ষমতা, যা তিনি ইচ্ছে করলে প্রয়োগ করতে পারেন। Responsibility মানে দায়িত্ব, অর্থাৎ যেখানে তাঁকে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতেই হবে। আর Personal discretion মানে, একাধিক সম্ভাব্য বিকল্প ব্যবস্থার মধ্যে তিনি যেটা ভাল মনে করবেন, সেটাই চালাতে পারবেন।

এখন এই বিশেষ ক্ষেত্র ও ক্ষমতার তালিকাটার একটু পরিচয় নেওয়া যাক।

(১) শান্তি-শৃঙ্খলার গুরুতর হানি নিবারণ (অর্থাৎ পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগের ওপর সর্বকর্তৃত্ব তাঁর হাতেই থাকবে)।

(২) সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলোর ন্যায্য অধিকার রক্ষা (অর্থাৎ বৃটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব তাঁর হাতে থাকবে, কারণ সংখ্যায় লঘিষ্ঠ অথচ স্বার্থে সবচেয়ে বড় যে ভারতের বৃটিশ সম্প্রদায়, এটা আমাদের চেয়ে ওরা বেশী বোঝে)।

(৩) জাতিগত বা বাণিজ্যগত ভেদাভেদ নিবারণ (অর্থাৎ বৃটিশ কোম্পানীগুলোর তুলনায় ভারতীয় কোম্পানীগুলোকে বিশেষ সুবিধা দান নিবারণের আইন কানুন প্রণয়নের ক্ষমতা)।

(৪) বড়লাটের নির্দেশ পালনের ব্যবস্থা (অর্থাৎ প্রদেশের গণ্ডীর বহির্ভূত আন্তঃপ্রাদেশিক বা সর্বভারতীয় বৃটিশ স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব)।

(৫) সর্বপ্রকারের পুলিসসংক্রান্ত আইনকানুন প্রণয়ন ও পরিবর্তন (অর্থাৎ গণবিক্ষোভ দমনের ব্যবস্থা)।

(৬) সরকারের গোপন তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থার গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা (অর্থাৎ গোয়েন্দা বিভাগকে আদালতের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত রাখার আইন)।

(৭) ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন সম্পর্কে সর্ব কর্তৃত্ব (কখন্ বসবে, কখন্ বসবে না, কখন্ শেষ করতে হবে, সবই গভর্ণরের মর্জি)।

(৮) ব্যবস্থাপক সভায় কোনো বিল পাশ হলে গভর্ণর ইচ্ছামত সেটাকে নাকচ করতে, বা বড়লাটের সম্মতির অপেক্ষায় স্থগিত রাখতে কিম্বা সেটাকে পুনর্বিবেচনার জন্যে বা সংশোধনের জন্য আবার ব্যবস্থাপক সভায় ফেরৎ পাঠাতে পারবেন (অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভাটা একটা প্রহসন মাত্র, ছেলে খেলা)।

(৯) গভর্ণরের নিজ আদেশে প্রবর্তিত কোন আইন বা অর্ডিন্যান্স কিম্বা পুলিস সংক্রান্ত কোনো আইন কানুনের কোন সংশোধন, প্রত্যাহার বা হস্তক্ষেপ করে যদি কেউ ব্যবস্থাপক সভায় কোন বিল পেশ করতে চায়, তাহলে তাকে আগে সেটাকে গভর্ণরের কাছে পাঠাতে হবে, এবং তিনি ইচ্ছা করলে সেটাকে বাতিল করতে পারবেন (অর্থাৎ গভর্ণরের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা অপ্রতিহত)।

(১০) ব্যবসা বাণিজ্য ও পেশা সম্পর্কে ভেদাভেদ নিবারণের জন্যে যে সব বিধি-ব্যবস্থা চালু আছে, তার বিরোধী বলে মনে হলে গভর্ণর যে-কোন বিল ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করতে না দিতে পারেন (অর্থাৎ এ ক্ষেত্রেও গভর্ণরের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা অপ্রতিহত)।

(১১) প্রদেশের আয়ের টাকার কতটা কি খাতে খরচ হবে, সেটা গভর্ণর নিজে স্থির করে দেবেন। ব্যবস্থাপক সভা তার আলোচনা করতে পারবে, কিন্তু ভোটের জোরে তা উল্টে দিতে পারবে না। (অর্থাৎ চলতি ২০ সালের শাসনবিধির প্রধান "রিজার্ভড্ সাবজেক্টগুলো" কার্যত নতুন শাসনবিধিতেও রিজার্ভই থাকবে)।

(১২) গভর্ণরের সুপারিশ ব্যতীত মন্ত্রীরা বা ব্যবস্থাপক সভা কোন খাতেই কিছু খরচের বরাদ্দ করতে পারবেন না। ব্যবস্থাপক সভা যদি কোনো খাতের কোনো খরচ কমাতে বা না-মঞ্জুর করতে বলে, গভর্ণর সে রায় উল্টে দিতে পারবেন। (অর্থাৎ আগেকার রিজার্ভ ও হস্তান্তরিত সকল বিভাগেরই অর্থ ব্যবস্থা সম্বন্ধে গভর্ণর সর্বেসর্বা)।

(১৩) কোন নতুন ট্যাক্স বসাতে, বা কোন চলতি ট্যাক্স বাড়াতে হলে, কিম্বা কোন ঋণ তোলার প্রয়োজন হলে যে সব নতুন বিধি ব্যবস্থা বা আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়, কিম্বা কোন পূর্বকৃত ঋণ সম্বন্ধে যে সব বিধি ব্যবস্থা আছে, তার কোন সংশোধন প্রয়োজন হলে আইন কানুনের যে পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, সে সকলের কোনো বিল গভর্ণরের সুপারিশ ছাড়া ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা চলবে না। (অর্থাৎ শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতির মতন জাতিগঠন সংক্রান্ত যে বিভাগগুলো আগের শাসনবিধিতে হস্তান্তরিত বিভাগ বলে পরিচিত ছিল, নতুন শাসনবিধিতে সেগুলোর ব্যয় নির্বাহের জন্যে প্রয়োজনমত ট্যাক্স বসানো বা বাড়ানো কিম্বা ঋণ তোলার জন্য মন্ত্রীরা যাতে বৃটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটাতে না পারেন, সেটাও গভর্ণর দেখবেন)।

(১৪) যখন ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন চলছে না, তখন প্রয়োজনমত গভর্ণর নিজেই আইন পাশ করতে পারবেন। যখন ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন চলছে, তখনও গভর্ণর প্রয়োজন মনে করলে বড়লাটের সঙ্গে পরামর্শ করে নিজেই অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারবেন। যে-কোন সময়ে গভর্ণর প্রয়োজন মনে করলে বড়লাটের সঙ্গে পরামর্শ করে "গভর্ণরের আইন" পাশ করতে পারবেন। (অর্থাৎ কতকগুলো বড় চাকরী ঘুষ দিয়ে একটা মন্ত্রিমণ্ডলী

খাড়া করে গণতান্ত্রিক ঢংয়ের ব্যবস্থাপক সভার মুখোস পরে বৃটিশ স্বেচ্ছাচারতন্ত্রই রাজত্ব করবে)।

তারপর নতুন শাসনবিধিতে বলা হয়েছে, গভর্ণরের ব্যক্তিগত মর্জি অনুসারে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের পিছনে বড়লাটের সমর্থন থাকা চাই। (অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভার বদলে জনস্বার্থের রক্ষক বড়লাট), এবং বড়লাট সে সমর্থন দেবেন নিজ ব্যক্তিগত মর্জি অনুসারে (অর্থাৎ বড়লাট যে বিষয়ে তাঁর ব্যবস্থাপরিষদ বা শাসনপরিষদের ধার ধারবেন না)।

আবার, বড়লাট যখন তার ব্যক্তিগত মর্জি অনুসারে কোন বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন, তখন তার পিছনে ভারত সচিবের সমর্থন মারফৎ স্বয়ং রাজার সমর্থন থাকা চাই (অর্থাৎ অন্তিমে স্বয়ং বৃটিশ রাজাই তাঁর ভারতীয় প্রজাদের একচ্ছত্র ও দয়াময় রক্ষক)।

এসব বুজরুকীর আসল উদ্দেশ্য, বড়লাট দেখবেন, গভর্ণর যেন ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে গিয়ে আন্তঃপ্রাদেশিক বা সর্বভারতীয় কোন বৃটিশ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে না বসেন, এবং ভারতসচিব দেখবেন, বড়লাট যেন ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে এমন কিছু না করে বসেন, যাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যিক স্বার্থ কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হয়।

* * * * *

এর নাম প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন, প্রভিন্সিয়্যাল অটোনমি। এও যেমন দুপুরে ডাকাতি, তেমনি মোটা মাইনে ঘুষ খেয়ে ধড়াচুড়ো পরে' মন্ত্রী সেজে ডিপার্টমেন্টের নৈর্বিত্তির ওপর সন্দেশের মত বসে গণতন্ত্রের ঢংয়ে বৃটিশ স্বেচ্ছাচার ঢাকা দেওয়াটাও একটা ঘৃণ্যতম দেশদ্রোহিতা।

কংগ্রেস তীব্র ভাষায় এই শাসন সংস্কারের নিন্দা করে বললে, তারা এর বিরোধিতা করবে। মোসলেম লীগ, লিবারেল ফেডারেশন প্রভৃতিও নিন্দা করলে (হিন্দু মহাসভা বাদে—তারা এটাকে অভিনন্দন সহকারে গ্রহণ করলে), অন্যান্য দল এবং বিশিষ্ট নেতারাও একবাক্যে বললে, আমাদের হাতে বিন্দুমাত্র ক্ষমতা তো দেওয়া হয়নি-ই, বরং লাট সাহেবদের স্বেচ্ছাচারী শাসনের এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে গণতন্ত্রের বিকাশের সকল পথও রুদ্ধ হয়েছে। জহরলাল বললেন, ভারতের ভবিষ্যৎ বন্ধক দেওয়া হয়েছে। (স্বাধীন হয়ে জহরলাল নতুন করে সে কাজ চূড়ান্তভাবে নিজেই সম্পূর্ণ করেছেন !)

বম্বেতে মোসলেম লীগের অধিবেশনে সভাপতি সার ওয়াজির হাসান বলেন, "কয়েক বছর ধরে কমিটি-কমিশন কনফারেন্স রিপোর্ট প্রভৃতির ঘটা করে এক দানবীয় কাণ্ড উদ্ভাবন করা হয়েছে, এবং শাসন সংস্কারের নামে সেটা আমাদের ঘাড়ে জোর করে চাপানো হচ্ছে।"

সার চিমনলাল বলেন, "আগে বরাবর যেসব আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, হোয়াইট পেপারে দেখা গেল, তার কোন পাত্তা নেই! তারপর জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটি যে সব সুপারিশ করলেন, সেগুলো আরো প্রতিক্রিয়াশীল। তারপর যখন ইণ্ডিয়া বিল রচিত হল, তখন দেখা গেল, কর্তারা আরো পিছু হটেছেন। তারপর হাউস অফ কমন্স কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আরো খানিক পিছিয়ে গেল। মোট কথা, ইণ্ডিয়ান প্রতিনিধিদের কোনো কথাতেই বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করা হয়নি!"—(ইণ্ডিয়ান রিভিউ, জুন ১৯৩৫)।

এন এস শ্রীনিবাসন বলেন, "শাসন বিধির ১১৩, ১১৪ এবং ১১৫ ধারায় বলা হয়েছে,

বিলেতে গঠিত কোম্পানীগুলোকে ভারতের ফেডারাল বা প্রাদেশিক আইন অনুসারে গঠিত কোম্পানী হিসাবে গণ্য করতে হবে, বিলেতে রেজিস্ট্রীকৃত জাহাজগুলোকেও স্বদেশী জাহাজ রূপেই গণ্য করতে হবে। এই সব উপায়ে ভারতের আর্থিক ভবিষ্যৎকে বন্ধক দেওয়া হয়েছে।" (ইণ্ডিয়ান রিভিউ, জুলাই ১৯৩৫)।

স্যার শিবস্বামী আয়ার বলেন, "সাইমন কমিশন এমন কৌশলে এ পরিকল্পনা রচনা করেছে, যাতে ভারত চিরকাল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের রথচক্রে বাঁধা থাকবে।" —(ইণ্ডিয়ান রিভিউ, ডিসেম্বর ১৯৩৫)।

লর্ড জেটল্যাণ্ড বললেন,—"এ শাসন সংস্কারের গুরুত্ব অসীম, একে কো-অপারেটিভ ইম্পিরিয়্যালিজম বলা যেতে পারে, আর এটা হচ্ছে বৃটিশ জাতির শাসন প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয়।"—(ঐ)।

*   *   *   *

এই প্রাদেশিক বজ্জাতির পর এখন কেন্দ্রীয় বজ্জাতির একটু খবর নেওয়া যাক। কেন্দ্রীয় সরকারের গঠনের প্ল্যান হয়েছে ফেডারাল। বিভিন্ন ইউনিট নিয়ে গঠিত সংযুক্ত রাষ্ট্রের ঢং, এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলোকে টেনে নেওয়ার ষড়যন্ত্র। দেশীয় রাজ্যগুলোকে জোর করে বৃটিশ ইণ্ডিয়ার আওতায় আনা যায় না, সুতরাং তারা যাতে স্বেচ্ছায় আসে, তার জন্যেও নানা কৌশল তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু সাহেবরা চশেরর ওপর দেশীয় রাজ্যের স্বেচ্ছায় যোগ দেওয়ার ওপর নির্ভর করলে অনন্ত কালেও তা হয়ে উঠবে না। সুতরাং ব্যবস্থা হয়েছে, হয় অর্ধেক সংখ্যক দেশীয় রাজ্য, না হয় এমন কতকগুলো দেশীয় রাজ্য, যাদের লোক সংখ্যা দেশীয় রাজ্যের সমগ্র লোক সংখ্যার অর্ধেক, ফেডারেশনে যোগ দিলেই ফেডারেশন হবে। আসলে উদ্দেশ্যটা এই যে, বড় বড় দেশীয় রাজ্যগুলো যোগ দিলেই কাজ হয়ে যাবে।

তার জন্যে তাদের কিছু তোয়াজ করা, লাভ দেখানোর ব্যবস্থা হল। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের একটা বড় বন্দরের দাবী ছিল, সেটা মেটানোর লোভ দেখানো হল। মহীশূর রাজ্য বৃটিশ ইণ্ডিয়ার সরকারকে চুক্তি অনুসারে বাৎসরিক ৩০ লক্ষ টাকা দিত, সেটা মুকুব করার লোভ দেখান হল। হায়দরাবাদের নিজামের বেরারের দাবী মেটানো হল, নিজাম হলেন বেরারেরও নিজাম, এবং প্রিন্স আলি হলেন প্রিন্স অফ বেরার। এই ভাবে বড় বড় রাজ্যগুলোকে টানার চেষ্টা চলতে লাগলো।

সঙ্গে সঙ্গে ফেডার্যাল লেজিসলেচরে দেশীয় রাজাদের প্রতিনিধি সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়েছিল শতকরা ৪০ জন। অর্থাৎ দেশীয় রাজারা বৃটিশ ইণ্ডিয়ার ব্যাপারে রীতিমত প্রভাব বিস্তার করতে পারবে, অথচ বৃটিশ ইণ্ডিয়া তাদের রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

কিন্তু এত সত্বেও দেশীয় রাজারা বেঁকে বসলো। তারা চেম্বার অফ প্রিন্সেস এর মিটিং করে স্থির করলে, তারা ফেডারেশনে যোগ দেবে না, কারণ তাতে তাদের স্বাধীন দেশের মর্য্যাদার হানি হবে, খাস বিলেতের সঙ্গে যে সন্ধিচুক্তির বলে তারা স্বাধীন দেশ বলে গণ্য, তার হানি হবে, এবং তারা বৃটিশ ইণ্ডিয়ার প্রদেশগুলোর পর্য্যায়ে নেমে পড়বে।

সুতরাং তাদের রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদার প্রকৃত প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্যে বৃটিশ সরকার এক রয়েল

কমিশন (বাটলার কমিশন) নিযুক্ত করলে, এবং সে কমিশন রাজাদের কাগজপত্র পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিলে যে, দেশীয় রাজারা তাদের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে স্বাধীন বা সভারেন বটে, কিন্তু তাদের ওপরে বৃটিশ সরকারের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব বা প্যারামাউন্সি বর্তমান।

এসব নিয়ে দেরী হতে লাগলো, বিশেষত কেন্দ্রীয় ফেডারেশন প্ল্যানের বিরোধিতায় কংগ্রেস এবং সারা দেশ এককাট্টা হয়েছে। সুতরাং কেন্দ্রের প্ল্যান স্থগিত রাখা হল, '২০ সালের শাসনবিধি অনুসারেই কেন্দ্রীয় সরকার চলতে লাগলো, এবং প্রদেশগুলোতে শাসন-বিধি চালু করা হল এবং নির্বাচনের তোড়জোড় সুরু হল।

পাছে খয়ের খাঁয়ের দল দেশের প্রতিনিধি সেজে ব্যবস্থাপক সভায় ঢোকে, এই অজুহাতে '৩৬ সালের এপ্রিলে লকনৌ কংগ্রেসে জহরলালের সভাপতিত্বে স্থির হল, নির্বাচনে কংগ্রেস যোগ দেবে। তারপর ফৈজপুর কংগ্রেসে কংগ্রেসী নির্বাচনী ইস্তাহার রচিত ও গৃহীত হল, এবং সারা দেশে এই বলে প্রচারিত হল যে, কংগ্রেস তার পূর্ব সঙ্কল্পের পুনর্ঘোষণা করছে যে, তারা এ শাসনবিধির কাছে কিছুতেই মাথা নত করবে না, এর সঙ্গে সহযোগিতা করবে না, ব্যবস্থাপক সভার মধ্যে এবং বাইরে থেকে এর ধ্বংসের জন্যেই সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। কংগ্রেস ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গঠন সম্পর্কে কোন বিদেশী শক্তির কর্তৃত্ব বা অধিকার স্বীকার করবে না।'

নির্বাচনের পর মন্ত্রিত্ব নেওয়া হবে কিনা, এ নিয়ে ফৈজপুর কংগ্রেসে আলোচনা এবং ভোটাভুটি করে স্থির করা হল যে, আপাতত এ প্রশ্ন স্থগিত থাকবে, এবং নির্বাচনের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হবে।

তারপর নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করা হল, নির্বাচনে জয়লাভের পর তাঁরা মন্ত্রিত্ব নেবেন না, এবং তাহলেই শাসনবিধি বানচাল হয়ে যাবে। তার সঙ্গে একথাও বলতে ভুললেন না, যদি ওঁদের হাতে সত্যিকারের ক্ষমতা আসে তাহলে তাঁরা জনগণের সদ্গতির জন্যে কি কি কাজ করবেন। কিন্তু শাসন সংস্কার বানচাল করার জন্যে উৎসাহিত হয়েই লোকে কংগ্রেসকে ভোট দিলে এবং মাদ্রাজ, বম্বে, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যাতে কংগ্রেস একক-সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রূপে নির্বাচনে জয়ী হল। আর বংলা ও আসামে কংগ্রেস হল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল।

এর মধ্যে একটু মজা হল কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ডের কল্যাণে। কংগ্রেসকে বেমালুম কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ডের ভিত্তিতেই জেনারেল বা অমুসলমান কেন্দ্রগুলোর ওপরই নির্ভর করতে হয়েছিল। সারা ভারতে ৪৮২টা মুসলমান প্রতিনিধির মধ্যে কংগ্রেস ৫৮ জন প্রতিনিধি মাত্র খাড়া করেছিল, এবং তার মধ্যে মাত্র ২৬ জন নির্বাচিত হয়েছিল—সীমান্তগান্ধী আবদুল গফুর খাঁর দেশেই ১৫ জন, আর বাকি সারা ভারতে মাত্র ১১ জন। লকনৌ কংগ্রেসে মুসলমান গণসংযোগের পরিকল্পনা হয়েছিল, কিন্তু সেদিকে কাজ বিশেষ কিছু করা হয়নি, সীমান্ত প্রদেশে ছাড়া।

যাই হোক, নির্বাচনের পর স্বভাবতই মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রশ্ন সামনে এসে পড়লো। আগে যখন কেউ বলতো, "কাউন্সিলে যাবো এবং শাসনতন্ত্রটাকে ভাঙবো" এ এক অযৌক্তিক মনোভাব, তখন কংগ্রেস নেতারা বলতেন, "নিয়মতান্ত্রিকতার যুক্তি অনুসারে ওটা অযৌক্তিক বটে, কিন্তু বৈপ্লবিক যুক্তি এরকম অসামঞ্জস্য গ্রাহ্য করে না।" কিন্তু এখন অনেক নেতার

আওয়াজ নরম হয়ে এলো। কংগ্রেস বললে, লাটসাহেব যদি কথা দেন যে,' তিনি তাঁর বিশেষ ক্ষমতার বলে আমাদের কাজকর্মে বাধা দেবেন না, তাহলে আমরা মন্ত্রিত্ব নিতে পারি। গভর্ণর বললেন, এমন কথা আমি কেমন করে দিতে পারি? তা হয় না। সুতরাং কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব নিতে অস্বীকার করলে এবং একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হল।

কিন্তু কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে সকলের মতিগতি একরকম নয়। কেউ মন্ত্রিত্ব নেওয়ার বিরোধী, কেউ নেওয়ার পক্ষপাতী, আর কারো বা মন টানছে একদিকে, আর চক্ষুলজ্জা আর এক দিকে। '৩৭ সালে মন্ত্রিত্ব নেওয়ার আগে পর্যন্ত এক বছর ধরে যে ধ্বস্তাধ্বস্তি চললো, সেটা কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক মনোহারী অধ্যায়। সেকথার আগে একবার বেলেকাঁদির চিড়িয়াখানায় ফিরে আসা যাক।

* * *

আমি একা একা কাগজ পড়ি, নোট করি, ডায়েরী লিখি, আর বিমল গুহ ও অনিল বাগচি দিনরাত কানাকানি করে, আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, আবার মাঝে মাঝে দু'জনে ঝগড়া করে, বাগচির যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে বিমল গুহ আমার কাছে এসে তার দুঃখের কথা উজাড় করে, আমি দেখে এবং শুনে সব কথাই জানতে পারি। তাছাড়া ২১ জন কনেষ্টবলের কাছ থেকে এবং ইব্রাহিমের কাছ থেকেও কিছু কিছু জানতে পারি। কনেষ্টবলেরা নিজেদের শুড়শুড়ি ভাঙ্গার জন্যে আপনা হতে আমার কাছে এমন ভাবে কথা পাড়ে, যাতে আমি বুঝতে পারি, কারো কাছে কিছু না বলতে পেরে ওদের পেট ফুলে উঠেছে। ইব্রাহিমকে না জিজ্ঞেস করলে কিছু বলে না, শুধু দেখে যায়। লোকটার চমৎকার স্বভাব।

তার স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে, তেল চুকচুকে বাবরি চুল এবং চমৎকার পেশীবহুল দেহ। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কি বরাবরই গ্রামে থাক? সে বললে, না, আগে বিদেশে চাকরী করেছি। কোথায়? জিজ্ঞাসা করতে বললে, নানা জায়গায় যেতে হত, কাজ করতুম সার্কাসের দলে।

লোকটা এমন সৎ প্রকৃতির যে, আমি তেমনটি আর দেখিনি। সে বোঝেই না যে সে কত honest? ছেলে মানুষদের মতন একটু আধটু চালাকি করে কথা বলা তার কাছে adventureএর মতন। তার অবস্থা ও স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে দেখে গাঁয়ের একদল লোক তার পিছনে লাগলো। একদিন মসজিদে নমাজ পড়ে ফিরে এসে ইব্রাহিম বললে, আজ নমাজের পর সকলে মিলে ঘোঁট পাকিয়েছিল, আমাকে একঘরে করবে, আমি হিঁদুর বাড়ী ভাত খাই বলে। তা আমি বললুম, আমি নিজে রাঁধি, বাবুর রাঁধা ভাত তো খাই না! বরং বাবুরই জাত গিয়েছে, আমার রাঁধা ভাত খেয়ে। তখন অনেকে বললে, তা বটে।

ইব্রাহিম আমাকে এমন সঠিক ভাবে বুঝে নিয়েছে যে, আমার সামনে অসঙ্কোচে ঐ কথাগুলো বলতে পারলে, এ দেখে সেদিন আমার মন অনেকদিন পরে সত্যিই একটা বিমল আনন্দের স্বাদ পেয়েছিল। ও যদি স্বদেশী বাবু হত' তাহলে এমন হতে পারতো না।

ম্যালেরিয়ায় ধরেছে, ভুগছি, তার ওপর মনটা সর্বদাই বাগচিদের যন্ত্রণায় পীড়িত— একদিন ইব্রাহিমের ওপর সব ঝাল ঝেড়ে তাকে স্রেফ তাড়িয়েই দিলুম, বললুম আর কাজ

করতে হবে না। সে নিঃশব্দে চলে গেল। বাগচিরা দেখলে, কিছু বললে না। একবার আমার খোঁজও নিলে না। সারাদিন কাটলো। সন্ধ্যার পরে অসহায়ভাবে ভাবছি, কেমন করে চলবে, দেখি দরজা দিয়ে উঁকি মারছে ইব্রাহিম। রাগ হয়ে গেল, বললুম, আবার এসেছো কেন? সে বললে, এ বিদেশে দেখবার আর কে আছে? তাই এসেছি। আমার চোখে জল এল।

কিন্তু চিড়িয়াখানা আরো মনোহারী হয়ে উঠলো। দারোগা আহমদ হোসেন গোপালগঞ্জে বদলী হলেন এবং পাংশা থেকে এলেন অন্নদা ভাদুড়ী। আসার পর প্রথম দিনেই তিনি অনিল বাগচির ঘরে এসে বসলেন। অনেকক্ষণ আলাপ চলছে দেখে আমি গিয়ে বসলুম এবং জিজ্ঞাসা করলুম, বারেন্দ্র বামুন কলমির ঝাড়, কোনো সম্পর্ক টম্পর্ক খুঁজে পেলেন? তিনি বললেন, সেই কথাই হচ্ছিল, ছোকরা সম্পর্কে আমার শ্যালক হয়।

বাঁচলুম। এইবার অনিল বাগচির দৌরাত্ম্যে দু-মাস কালি হবে।

আমাদের মুসলমান চাকর দেখে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, "অন্তত nationalityর দিক থেকে মুসলমানের হাতে খাওয়া উচিত নয়।"

ন্যাশান্যালিজমের বহর দেখে হাসি পেল, বললুম পরে এ বিষয়ে আলাপ করবো। আমার লজ্জা হচ্ছিল পাছে তিনি টের পান যে, আমাদের হাঁড়ি আলাদা। মনে করলুম, চোখ কান বুজে আবার জয়েন্ট মেসিং করতে পারলে লজ্জা বাঁচে। কিন্তু, হরি হরি! কর্তারা সব ফাঁস করে দিয়েছিল এবং আমার কিছু নিন্দাও অবশ্য হয়েছিল। কারণ তারপর থেকে অন্নদা বাবু ওদের ঘরে এসে বসে আলাপ করে চলে যেতেন, আমার সঙ্গে আলাপ করতেন না। আমি স্বাভাবিক সদ্ভাব বজায় রাখার জন্যে মাঝে মাঝে গিয়ে বসতুম, যেন কিছুই হয়নি বা কিছুই বুঝিনি।

আহমদ হোসেন চলে যাওয়ার আগেই অন্নদা বাবু পরিবার এনে জাবরখোলের সুরেন সান্ন্যালের বাড়ীতে রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন পাংশার ষ্টেশন মাষ্টার, রিটায়ার করেছেন। প্রথম দিনই বাগচি রাত আটটায় বাসায় ফিরলো। জাবরখোলে গিয়েছিল। তারপর যখন অন্নদা বাবুর পরিবার থানার কোয়ার্টারে এল, তখন থেকে বাগচি রাত্রে কয়েক ঘণ্টা ছাড়া সেখানেই পড়ে থাকে।

বিমল গুহকে প্রায় আমার সঙ্গেই একা থাকতে হয়। ক্রমে সেও দারোগার বাসায় যাতায়াত শুরু করলে। বাগচি দুবেলা চা খেতে বাসায় আসে, সঙ্গে আসে দারোগার একগাদা ছেলেমেয়ে। ১৩।১৪ বছরের মেয়ে লক্ষ্মীও সেজেগুজে রোজ চা খেতে আসে।

একদিন ওদের বাসায় বিমল বাবুরও নিমন্ত্রণ হল, আমি বাদ। থানার বক্সী এক জোয়ান ছোকরা, তারও নিমন্ত্রণ। দুজন বুড়ো কনেষ্টবল আমাকে বুড়োবাবু বলে মুখ টিপে হাসলো। ওরা লক্ষ্য করেছে। আমার লজ্জা হল।

ক্রমে বাগচি লক্ষ্মীকে গান শেখায়, ছেলেপিলেরা গণ্ডগোল করে বলে গিন্নি তাদের নিয়ে এক ঘরে থাকেন, ওরা আর এক ঘরে দরজা বন্ধ করে গান শেখাশিখি করে, লক্ষ্মী নাচও দেখায়, আর জমাদারের মেয়ে আড়ি পাতে এবং গেজেট করে।

বাগচি লক্ষ্মীকে সঙ্গীত বিজ্ঞানের গ্রাহক করে দিয়েছে, স্নো-পাউডার কিনে দিয়েছে, একদিন গ্রাম থেকে এক হাঁড়ি রসগোল্লা "প্রেজেন্ট" করেছে। বিমল বাবুর কাছে খায়,

টাকা দেয় না, নিজের অ্যালাউন্স ঐভাবে খরচ করে, তার ওপর হাটের দোকানে দেনা জমেছে। তারা আমার কাছে তাগাদা করে! আর বিমলবাবুর তো প্রাণ যায়।

ওরা মামা ভাগ্নীতে নদীর ঘাটে স্নান করে, পরস্পরের পিঠে সাবান মাখিয়ে দেয়, মডার্ণ গিন্নি আস্কারা দেন,—কনেষ্টবলগুলো গুঞ্জরণ করে। ক্রমে ব্যাপার এতদূর গড়ালো যে, একদিন এক কনেষ্টবল হঠাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করে বসলো, আচ্ছা বাবু, যদি কোন লোক মা ও মেয়ে দুজনের সঙ্গেই অ-ব্যবহার করে, সে কি রকমের লোক?

আমি বুঝলুম। ঐ কনেষ্টবলই দারোগার বাসায় যাতায়াত করতো। বিরক্ত হয়ে বললুম, তোমার এ সব নিয়ে মাথাব্যথার দরকার কি বাপু? সে দাবড়ালো না, বললে, উনি মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেল্লেই পারেন! আবার শুনতে পাই, বোন-ভাগ্নী! আমি সরে পড়লুম।

ভাদুড়ী গিন্নি মডার্ণ। কিন্তু ফ্যাসানও নেই, ছা পোষা, আর সম্ভ্রম বোধেরও বালাই নেই। নাকে-মুখে-চোখে যেন খৈ ফুটছে, গোড়া থেকেই চেঁচিয়ে হেসে হৈ চৈ করে একাকার। একটা তুলনা দিই, ছেলেবেলায় দেখা বায়স্কোপের এক কমিক ফিল্ম: একটা মেম ঝি অসম্ভব কুড়ে, সর্বদাই যেন আধ ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন। রান্নাঘর থেকে খানা টেবিলে পরিবেশনের জন্যে খাবার আনছে, পাত্র কাৎ হতে হতে খাবার পড়তে পড়তে অর্ধেক এসে পৌঁছলো টেবিলে। অতিষ্ঠ হয়ে কর্তা তাকে এক ডাক্তারখানায় নিয়ে গেল। ডাক্তার এক ডোজ এমন ওষুধ খাইয়ে দিলেন যে, ঝি মুহূর্তের মধ্যে চটপটে এবং ক্রমে ছটফটে হয়ে গেল। হাত পা চোখ মুখ সর্বদাই অস্থির, চলতে ফিরতে ধাক্কা লাগিয়ে জিনিসপত্র উল্টে ফেলে ভেঙ্গেচুরে একাকার! ভাদুড়ী গিন্নিকে দেখলে মনে হয়, সেই ওষুধ খেয়েছে।

হৈ চৈ করে ছেলের এক "ব্যামো"র বিবরণ দিলেন, তার উরুর একটা শির ফুলে উঠেছিল, নিজের উরুর কাপড় সরিয়ে দেখিয়ে দিলেন, এই হাটুর ওপর থেকে কুঁচকি পর্যন্ত।

পাংশায় থাকতে ডেটিনিউ শিশিরের সঙ্গে স্নান করতে জলে নেমে সাঁতার কাটতে কাটতে জোঁক দেখে কেমন চীৎকার করেছিলেন, চেঁচামেচি করে তা বুঝিয়ে দিয়ে শোনালেন, কেমন করে শিশির ওঁকে সাঁতার কেটে টেনে এনে তুলেছিল।—চিড়িয়াখানা!

এইবার ভাদুড়ী মশায়ের একটু খবর নেওয়া যাক। বাংলানবীশ মুসলমান সরকারী ডাক্তার সাহেবও আগে পাংশায় ছিলেন, তাঁকে ভাদুড়ী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলুম। তিনি বললেন, লোক মন্দও নয়, আহা-মরিও নয়। আণ্ডার গ্রাজুয়েট, কিন্তু ফিলজফি ভাল জানেন। দারোগা হিসেবে কম্পিটেণ্ট নয়, ঘুষ-টুষ বেশী খান না, অর্থাৎ খেতে জানেন না, দালালরাই প্রায় সব মেরে দেয়, উনি ২।৪ টাকা পেলেই ড্যাম গ্ল্যাড। পাংশায় এক তেলী ছিল ওঁর দালাল। তার যন্ত্রণায় অন্য অফিসাররা অস্থির থাকতো। এখন তারা আর তেলীকে থানায় ঢুকতে দেয় না।

আসার পরই একদিন রাত্রে ভাদুড়ী লক্ষ্মীকে সাজিয়ে গুজিয়ে আমাদের বাসায় নিয়ে এসে মেয়েকে একটু তামাসার ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখ দেখি, কোন ডেটিনিউ বাবুকে পছন্দ হয়, কার কাছে পড়বি! মেয়ে ভঙ্গী করে বললে, যান!

ক্রমে দেখা গেল, একটি মূর্তিমান অষ্টাদশ শতাব্দী, কিন্তু কথায় কথায় ইংরেজী এবং সংস্কৃত বচন আওড়ানো দেখে মফঃস্বলের পুলিশ মহলে পণ্ডিত বলে খ্যাতি আছে।

একদিন বিমলবাবুর ঘরে বসে লেকচার দিচ্ছিলেন, একটু নেড়ে চেড়ে দেখার ইচ্ছে হল। গিয়ে বসলুম, তিনি তখন বলছেন, ফরিদপুরে মেয়েদের বোর্ডিংএ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল, শতকরা এতজন pregnant! লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আছে, কড়াকড়ি আছে, কিন্তু তিনিও তো ঐ তন্ত্রের! বলে, কি করে হল? আরে বাবা, চাকর দারোয়ানতো আছে!

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। বললুম, ভাগ্যে পুরুষ মানুষ পোয়াতি হয় না, হলে সব ব্যাটার সতীপনা বেরিয়ে পড়তো।

ভাদুড়ী—কিন্তু পুরুষ কি সবাই খারাপ? আর nature বলছে, পুরুষ একাধিক স্ত্রী সম্ভোগ করতে পারে, কিন্তু মেয়েরা তা করতে গেলে সন্তান জননের পক্ষে, এবং ওদের স্বাস্থ্যের পক্ষেও হানি হয়।

আমি—সেই জন্যেই তো ওরা মার্গারেট স্যাঙ্গারের আমদানী করেছে। (গর্ভনিরোধ বিশেষজ্ঞ—ভারতে বক্তৃতা সফর করে গেছেন)। পুরুষেরা বেপরোয়া যা খুশী করে বেড়াবে, আর মেয়েরা একবার একটু এদিক-ওদিক হলেই সমাজের কাছে এবং নিজের কাছেও জব্দ হয়ে যাবে, এমন দিন আর থাকবে না।

ভাদুড়ী—কি সাংঘাতিক কথা! সতীত্ব ছিল হিন্দুনারীর আদর্শ, আজ সেই আদর্শ তো গেছেই, গর্ভনিরোধে যে মেয়েদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, সেটাও কেউ দেখছে না।

আমি—কে বলে, দেখছে না? স্বাস্থ্যটা বিজ্ঞানের এলাকা, বিজ্ঞানই স্বাস্থ্য অটুট রেখে জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করবে। সেটা পাশ্চাত্ত্য দেশে চালু হয়ে গেছে, এখানেও হবে।

ভাদুড়ী—ঐ পাশ্চাত্ত্য কাণ্ডগুলো যে আমাদের প্রাচ্যের পক্ষে বিষতুল্য, তা না বুঝেই তো আমরা আমাদের পূর্বগৌরব হারিয়েছি!

আমি—পৃথিবীটা গোল, পূব-পশ্চিম আপেক্ষিক কথা। মেদিনীপুরীরা বর্ধমেনেদের বলে পূব্যাগুলা! মানুষ সর্বত্রই এক, এবং তাদের সুখ দুঃখ এবং প্রয়োজনও একই ধরনের। যৌন ক্ষুধাও মেয়ে-পুরুষের সমান। নীতিকথায় তা ঠাণ্ডা হয় না। আর অশিক্ষিত সমাজে যে ভ্রূণহত্যা হয়, শিক্ষিত সমাজে সেটা এড়িয়ে চলা গেলে মন্দটা কি হবে?

ভাদুড়ী হতাশ ভাবে বললে, লোকটা দেখছি পাশ্চাত্ত্য ভাব নিয়ে মশগুল হয়ে আছে।

আমি আর একটু মজা দেখার জন্যে বললুম,—তাহলে তো বিয়েই মানতুম!

ভাদুড়ী—বলেন কি! বিয়েও মানেন না? তাহলে কি সব ছাগলের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বেড়াবে?

এবার আমারও একটু রাগ হল। বললুম, প্রথমতঃ this is bad taste, দ্বিতীয়তঃ, খোকা-খোপাও আমার কথার এই জবাব দিতে পারতো। আমি আশা করেছিলুম, আপনি তার চেয়ে ভাল কথা, যুক্তিসঙ্গত কথা কিছু বলতে চেষ্টা করবেন। আপনারাই "মাতৃজাতি" কথাটা যখন-তখন বলে থাকেন, কিন্তু মাতৃজাতির সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা অতি উচ্চ! ছাগলগুলোর জন্যেই তাঁরা তৈরী হয়ে বসে আছেন!

এতক্ষণে ভাদুড়ী overwhelmed হলেন। তিনি যে বিশেষ পণ্ডিত নন, এটা তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি সরে পড়লুম!

আবার কয়েক দিন পরে একদিন ভাদুড়ী বিমলবাবুর ঘরে আড্ডা জমিয়েছে। পাশের ঘর থেকে আমি কিছু কিছু শুনতে পাচ্ছি। হিন্দুত্ব, ঋষিবাক্য, যোগশক্তি, মন্ত্রশক্তি প্রভৃতি শুনে আর থাকতে পারলুম না। চুপ করে গিয়ে বসলুম। উনি তখন বলছেন, আজকাল বিশ্বাস জিনিসটাই আর নেই, দু'পাতা ইংরেজী পড়ে' লোকে আর কিছু মানতে চায় না। বাপ যে বাপ, তারও প্রমাণ চায়।

মনে করেছিলুম, কথা কইবো না, শুধু শুনে যাবো, কিন্তু থাকতে পারলুম না। বললুম, একদল জগদ্বিখ্যাত সোসিওলজিষ্ট পণ্ডিতদের মতে, সম্পূর্ণ স্বাধীন দুই স্ত্রীপুরুষের স্বেচ্ছা-মিলনের স্থল ভিন্ন সন্তানের পিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। তাই একসময়ে, সম্ভবত কোড নেপোলিয়নে, প্রথম এক আইন করা হয়েছিল, অতঃপর স্ত্রীলোকের বিবাহিত স্বামীই তার সন্তানদের পিতা বলে গণ্য হবে। সেই আইনই আজ পর্যন্ত সর্বত্র বলবৎ রয়েছে। সুতরাং যিনি যতই লম্ফঝম্প করুন, position সব মিঞাবই সমান।

ভাদুড়ী তর্কে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে বললে, আপনার মত তো মশাই সর্বনেশে।

আমি—যুক্তিতর্কে না কুলোলেই লোকে গালাগাল আর দিব্যি দেয়। বাঁকুড়া জেলে আমাদের একজন attendant বলতো,—আমারবস্থা রাত্তিরে কাকের ঠ্যাং এনে দেন, আমি তালা খুলে দোব। আমরা তাকে ঠাট্টা করতুম। সে যদি attendant না হয়ে দারোগা হত, তাহলে নিশ্চয় এই বাপ সম্বন্ধে অবিশ্বাসের দিব্যি দিয়ে আমাদের জব্দ করে দিতো। বলে, হো হোহো করে একচোট হেসে নিলুম। ভাদুড়ী চুপ্‌সে গেল এবং সরে পড়লো।

এরপর একদিন কথায় কথায় বললে, আমার তো পুলিশ লাইনে আসার কথা নয়, নেহাৎ ভাগ্য বা দুর্ভাগ্য এদিকে টেনে এনেছে। নইলে এতদিন—

আমি Suggestionটা লুফে নিয়ে বললুম, নইলে ডেটিনিউ হতে পারতেন, না—হয়ত আন্দামান যেতেন। তা, আন্দামানে না গিয়ে বেলেকাঁদিতে এসে ভালই করেছেন, আমরা দেখতে পেলুম দারোগা রূপে একজন দাদাকে।

তিনি উৎসাহিত হয়ে বলে চললেন, পাংশায় থাকতে শিশির তো একরকম আমার বাসাতেই থাকতো। গোঁসাইর হাটে থাকতে একদিন A. S. I. একটা ছোকরাকে ধরে এনেছে, সে বলে কিনা, মুটেগিরি করে খেতে পারেন না? আমি তাকে ২।১টা কথা জিজ্ঞাসা করতে গেছি, আমাকেও বলে বসলো, পুলিসের চাকরী না করে মুটেগিরি করুনগে যান, সেও ঢের ভাল। আমার রাগ হল, কিন্তু তবু কিছু না করে দুটো বকুনি দিয়ে ছেড়ে দিলুম।

আমি—ওখানে তো মিলিটারী ক্যাম্প আছে, গোলমাল খুব বেশী নাকি?

ভাদুড়ী—ঠিক ওখানে গোলমাল বেশী নেই, তবে জেলার ঐ দিকটাতে, no upper class Hindu girl is untouched.

আমি—তাহলে তো any reasonable man should expect every young man to be a fire-eater.

ভাদুড়ী চেপে গেল। এরপর একদিন সকালে রামদিয়া থেকে এক ডাকাতির সংবাদ নিয়ে লোক এসেছে থানায় এজাহার দিতে। তারা সকল প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি বলে

কর্তা তাদের ফিরিয়ে দিলেন সব কথা জেনে আসার জন্যে। তারা ফিরে গেল এবং সব জেনে দুপুরের পর আবার এলো। কর্তা এজাহার নিতে সন্ধ্যা পার করলেন এবং রাত দশটার ট্রেনে রামদিয়া রওনা হলেন সুরেন সান্যালকে সঙ্গে নিয়ে।

ওদিকে পার্টি সকালেই থানার সঙ্গে সঙ্গে সাবডিভিশন রাজবাড়ীতেও খবর দিয়েছিল এবং নতুন ইনস্পেক্টর সুরেন সরকার বিকালেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং দারোগাকে না পেয়ে নিজেই তদন্ত শুরু করে কোথায় সার্চ করতে হবে, কাকে গ্রেপ্তার করতে হবে ইত্যাদি স্থির করে ফেলেছিলেন। তারপর অনেক রাত্রে যখন ভাদুড়ী-সান্যাল যুগলমূর্তি সেখানে উপস্থিত হলেন তখন তিনি ভাদুড়ীকে শুধু মারতে বাকি রাখলেন এবং তদন্তে হাত না দিতে দিয়ে বসিয়ে রেখে দিলেন এবং তার নামে proceedings লিখলেন। ফলত সেই কেসেই ভাদুড়ী থানার কাজের অনুপযুক্ত বলে পুলিশ সাহেব তাঁকে ফরিদপুরে কোর্ট সাব-ইনস্পেক্টররূপে বদলী করলেন।

ফিরে এসে তিনি লজ্জা ঢাকা দেওয়ার জন্যে মখসাপুটি করে বললেন, তার "শাপে বর" হল, এতদিনে তিনি বক্তৃতার বহর দেখাবার একটা scope পেলেন। কিন্তু পরে এমনি কয়েকটা pending case মিলে তাঁর চাকরী খতম হয়েছিল।

যাই হোক, বাগচি একটু দমে গেল। রাত্রে ভাদুড়ী গিন্নী তার ঘরে এসে ঢুকেছে। হঠাৎ আমি গিয়ে হাজির হলুম। গিন্নী তখন বলছিলেন, এখানে তিনজন ডেটিনিউ আছে শুনে উনি বলেছিলেন বেশ হবে, আমার পৌনে দুশো টাকার সংসার হবে, কিন্তু ভগবানের মর্জি, সব উল্টেপাল্টে গেল। —অবাক কাণ্ড।

যাই হোক, ভাদুড়ীর জায়গায় গোঁসাইর হাট থেকে এলেন বিপিন দাস। তিনি চাকরকে রান্না করাচ্ছেন দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলুম ব্যাপার কি? ভাদুড়ীর বাসায় খেলেন না কেন?

তিনি বললেন, সেটা তো আমি নিজে বলতে পারি না! খটকা লাগলো।

ভাদুড়ীকে জিজ্ঞাসা করলুম ব্যাপার কি? লোক বুঝি সুবিধের নয়?

তিনি বললেন,—পাজি, একটা moral wreck, bastard, কায়স্থ বলে পরিচয় দেয়, ব্যাটা জাত-বোষ্টম। The woman, with whom he used to live as husband and wife, had a 7 year old daughter. পরে সেই মেয়েটাকে ও বিয়ে করেছে—বিয়ে, মানে কণ্ঠিবদল। মাগী এখনো ওর কাছেই আছে, আর সেই মেয়েটার গর্ভের ছেলেমেয়ে নিয়ে ওর family.

ত্রিশ

ভাদুড়ীর মুখে বিপিন বাবুর বেত্তান্ত শুনে ভাবলুম এইবার বিপিন বাবুর মুখে ভাদুড়ীর সম্বন্ধে কিছু শোনা গেলে ষোলকলা পূর্ণ হবে। কিন্তু দেখা গেল এ বিষয়ে বিপিন বাবু ভদ্রলোক।

সরকার তখন ডেটিনিউদের হিল্লের এক স্কীম করেছে। কিছু কিছু ছোট শিল্প ও কিছু কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। যারা এই সব ট্রেনিং নিতে যাবে, তাদের ট্রেনিং শেষ হলে

মুক্তি দিয়ে ঐ সব শিল্প কারখানা এবং কৃষি ফার্মগুলো এক এক দল ডেটিনিউ-এর হাতে ছেড়ে দেবে, যাতে তারা রোজগার করে খেতে পাবে, আর স্বদেশী উৎপাত না করে। বিমল গুহ এমনি এক কৃষি ট্রেণিং ক্ষেত্রে চলে গেল। যেন পালিয়ে বাঁচলো।

এদিকে ভাদুড়ী মশাই পরিবার রেখেই ফরিদপুরে চলে গেলেন এবং বাড়ী ঠিক করে খবর দিলেন। কিন্তু গিন্নী যেতে দেরি করতে লাগলেন, গরুর গাড়ী পাওয়া যায় না।

শেষে যখন থানায় গুঞ্জরণ বাড়লো তখন অগত্যা গরুর গাড়ী ঠিক হয়ে গেল। যাওয়ার আগের দিন রাত্রে আঁচাতে বেরিয়েছি, দেখি ভাদুড়ীর অন্ধকার ঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে ভাদুড়ী গিন্নী বলছেন, কাল যাচ্ছি, তাই দেখা করতে এলুম।

ঘরের সামনে রাস্তায় একজন লোক এসে দাঁড়ালো। আমি বললুম কে ওখানে? লোকটা নিঃশব্দে এগিয়ে এল। তেওয়ারী। ভাদুড়ী গিন্নী বললেন, তেওয়ারী? কাল যাচ্ছি বাবা। তাই বাবুদের সঙ্গে একটু দেখা করতে এলুম।" তেওয়ারী স্তম্ভ হয়ে রইলো।

রাত্রে বাকচি বিমল বাবুর ঘরে এসে শুলো, বিছানাটা ভাগ-ভাগি করে অনেক রাত্রে এনেছিল। চাকরকে বললে ওঘরে চাবি লাগিয়ে চাবিটা আমাকে দাও।

একটু খটকা লাগলো, কিন্তু জেগে থাকতে পারলুম না। সকালে উঠে ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করলুম, রাত্রের কোন খবর রাখে কি না। সে বললে সন্ধ্যের পর দারোগার মেয়ে এসে বাবুর ঘরে ঢুকেছিল, আর গিন্নি এসে রান্না ঘরে ঢুকেছিলেন, রোবাদেরের রান্না দেখছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—আর কিছু জান না? সে বললে, এরা দিত বলছিল, "কি রকম ভাগ্নী? আমরা সকালে ওঠার আগে এসে বাবুর ঘরের দরজায় টোকা মারে, বাবু দরজা খুলে দেয়, আর মেয়েটা মশারীর ভেতর গিয়ে ঢোকে।"

বাঁচা গেল! আমি মেয়েটাকে যেতেই দেখতুম, আসতে দেখতুম না, মনে করতুম সকাল হতে না হতেই চা খেতে আসে।

ভাদুড়ী-গিন্নী সুরেন সান্ন্যালকে বাকচির গার্জেন করে দিয়ে গেছে, বিপিন বাবু ক্যাজুয়াল ছুটি পাননি বলে সান্ন্যালকে পাঠিয়ে ফ্যামিলি আনিয়েছেন, সুতরাং ওরা তিন জনে একটা মিত্রজোট হয়ে পড়েছে—বিপিন দারোগা, সুরেন সান্ন্যাল, অনিল বাকচি।

কিন্তু তবু বাকচি জব্দ হয়ে গেছে। একে বিরহ, তার ওপর দুটো প্রাণের কথা বলার মতন একটা লোকও নেই। কাজেই সে আবার আমার ওপরই ভর করলো। বিরহের দ্বিতীয় দিনেই তার আবেগ উথলে উঠলো, বললে, "আমি জীবনে কখনো কাঁদিনি, কিন্তু কাল মন এত খারাপ হয়েছিল যে, অনেকক্ষণ কেঁদেছি।"

আমি হেসে বললুম, "কান্নার একটা চান্স পাও। মাঝে মাঝে কাঁদতে থাকলে, কত কাঁদতে হবে, কে জানে। আর ভারতমাতাই বা কি মনে করবে?"

ও একবার একটু থমকে গেল মাত্র। কিন্তু তখন ফ্রয়েডের ঠেলায় ওর কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়ে উঠেছে, ও হুড়মুড় করে প্রাণের সব রাবিশ উজাড় করে ঢেলে দিলে। অসংলগ্ন, অসংযত, অবাস্তব, বেকুফের মত কথা। কাণ ভরে' যতটা পারলুম, শুনলুম। তারপর জিজ্ঞাসা করলুম, বিপিন বাবুর কানে কিছু উঠেছে নাকি?

ও বললে, "তা এখনো জানি না। এখানকার পুলিশগুলো মানুষ নয়, সব শুয়োরের বাচ্ছা। পাংশায় ডেটিনিউ সর্বদাই দারোগার বাসায় পড়ে থাকতো, সবাই বলত, ভালই তো! আর এখানে এরা সবাই কানাকানি করে, নজর রাখে আমি কখন যাই আসি, আবার আড়ি পাতে! ডাক্তারও শুয়োরের বাচ্ছা, সেদিন আমায় যা-তা ঠাট্টা করলে।"

তারপরই টপ করে বললে, "লক্ষ্মী আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আমি আগের দারোগার মেয়েদের গান শেখাতুম কি না। কেন জিজ্ঞাসা করলে?"

আমি বললুম, "কেমন করে জানবো? তবে একটা থিওরী খাড়া করতে পারি। আপনি আহমদ হোসেনের বাসায় একদিন গান শুনিয়েছিলেন। লক্ষ্মী হয়ত পোষ্টমাষ্টারের মেয়ের কাছে সেটা শুনেছে। আর হয়ত ওর আপনার ওপর একটু লভ-টভ হয়েছে, এবং তাই একটু jealousy হয়েছে।"

বাকচি একটু গদগদ ভাবে বললে,—"তাই হবে। আমি একদিন ওকে যাচাই করার জন্যে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, ও আমাকে ভালবাসে কি না। ও বলেছিল, বাসে।"

আমি তখন একটু ঠোকবার লোভ সামলাতে পারলুম না, বললুম, "এখন একবার বিবেচনা করুন, আপনি ভাগ্নী জেনে এবং স্বীকার করে' যদি তার সঙ্গে লভ করতে পারেন, তাহলে যাদের গালাগালি দিচ্ছিলেন, তাদের দোষ কি?" ও চুপ করে থাকলো।

একদিন হঠাৎ শুরু করলে, "পাংশায় শিশির বাবুতো অর্ধেক দিন ওদের বাসায় খেতো। এমনি করে সে অনেক টাকা জমিয়ে ফেলেছিল। লোকটা বোকা, পোষ্ট অফিসে টাকা রাখতো। জানতে পেরে দিদি বলে, করেছ কি! I B জানতে পারলে যে allowance কমিয়ে দেবে। তাগাদা দিয়ে টাকাগুলো আনিয়ে দিদি নিজের কাছে রেখেছিল। শিশির বাবু ক্যাম্পে যাবার সময় দিদিকে বলে গেছে, যদি কখনো টাকা রোজগার করতে পারি, তবেই আপনার সঙ্গে দেখা করবো, নইলে এই পর্যন্ত।"

আক্কেল দেখে অবাক হয়ে গেলুম। এসব কথার অর্থ কি, একটুও বোঝে না! ভারত উদ্ধারের কোন্ আড়কাঠি এমন মাল সংগ্রহ করেছিল, ভেবে তারই ওপর মনটা বিষিয়ে উঠলো।

তার পরদিনই ফুর্তি করে খবর দিলে, "আজ একটা মজা হয়েছে। রেকর্ডে গান দেয় এক অনিলভূষণ বাকচি আছে না? দারোগা মনে করেছে আমি সেই অনিল বাকচি। আমায় বললে, আপনার গান রেকর্ডে শুনেছি। আপনারা গুণী লোক, এইভাবে আটকে থেকে গুণটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বড় দুঃখের কথা।"

বিপিন বাবু গাইয়ে-বাজিয়ে লোক, তবলা বাজান, বন দেশের শিয়াল রাজা। একদিন হারমোনিয়াম আর তবলা নিয়ে বাকচির ঘরে এসে মজলিস করলেন। বাকচির গানের সঙ্গে উনি তবলার সঙ্গত করলেন। শেষে ওঁকে একখানা গান গাইতে বলা হল, উনি গাইলেন, তনয়ে তার তারিণী!

জমিদার কাছারীর সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বা সার্কেল অফিসার, নাম বোধ হয় বিনোদ নাগ, দেড় মাস অন্তর ১৫ দিন করে এখানে থাকেন, তিনিও একজন গাইয়ে লোক, রোজ রাত্রে ঘণ্টা কয়েক চেঁচান। তাঁকে নিয়ে এক দিন থানায় মজলিস হল, রাত ৮টা থেকে এগারোটা এবং সেখানে নিমন্ত্রিত হলেন স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক এবং অনিল বাকচি ও আর

একজন নতুন ডেটিনিউ, সম্প্রতি আমদানী। আমাকেও ডেকেছিল, আমি যাইনি। যাদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা নিষিদ্ধ, একদিন দারোগার খেয়াল চরিতার্থ করতে তাদের মধ্যে দ্রষ্টব্য-বিশেষ হয়ে বসা এবং দারোগার ভাড়া করা খেমটাওয়ালীর মতন তার নির্দেশে গান ধরা, এমন লজ্জা আর নেই।

বিমল গুহ কৃষি ট্রেণিং-এ মসলন্দপুর ফার্মে চলে যাওয়ার মাসখানেক পরে নতুন ডেটিনিউ এলেন সুশীলচন্দ্র নারায়ণ-চৌধুরী। নামটার আড়ম্বরী গড়ন দেখে আমার ভুল বলে মনে করবেন না, নামটা ঠিক ঐ। বাড়ী কুমিল্লা, গাইয়ে বিনোদ নাগের বাড়ীর কাছে। মজলিসে চেনাচিনি হয়ে গেল। সুতরাং নতুন রগড় শুরু হল।

সুশীলবাবু এসেছেন বোধ হয় মে মাসে (৩৮ সাল)—হিজলী বন্দীনিবাস থেকে। অনিল বাকচি যথাশাস্ত্র "আগবাড়িয়ে" পরিচয় নিলে—দলের লোক, অর্থাৎ অনুশীলনের এবং বিমল গুহেরই মতন রাতারাতি কানাকানি করে "দাদা" হয়ে গেল এবং আমাকে দ্বিতীয় দফা কর্ণার করার চেষ্টা শুরু করলে। সুশীল বাবু এর সঙ্গে কথা কয়েই প্রথম দিন থেকেই আমার সঙ্গে কথা কয় Yes, no, very well ধরনে, আর বাকচি "ফুসুর ফুসুর" চালায় দিন রাত। Joint messing-এর সুযোগ পেয়ে সে বেঁচে গেল।

কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই সুশীল বাবুর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল। একদিন আমার কাছে এসে দুঃখের কথা শুরু করলে। বললে, "আমি প্রথমে যা কিছু শুনেছিলাম, এখন দেখি সবই উল্টা।" আমি হাসতে হাসতে বললুম, "আপনিও তো আমার ওপর অর্ডিনেন্স চালিয়েছিলেন, condemn without hearing!" সুশীল লজ্জিত হলো এবং অনেক দুঃখের কথা বললে। এক পয়সায় দুইটা ডিম (তখন ছোট হাঁসের ডিম ঐ দর) "দুই বেলা ডিম খাইতে খাইতে মারা গেলাম। আবার, চাকরটাকে বকে, আধপোয়া তেলে মাত্র তিন বেলা হয়, তবু তরকারীতে তেলের দিশা পাওয়া যায় না।" বলতে বলতে হেসে ফেললে।

কিন্তু আমিও বিশেষ আমল দিলুম না, আর ওর বাকচির কবল থেকে মুক্তির উপায়ও ছিল না। একদিকে বাকচি সুরেন সান্যাল আর বিপিন দারোগার বন্ধু, আর একদিকে বিনোদ নাগ বিপিন দারোগার বন্ধু এবং সুশীলের বন্ধু, সুতরাং বাকচি সুশীলের বন্ধু এবং গাইয়ে রূপে বিনোদ নাগের সঙ্গেও জমিয়ে নিয়েছে। এমন চক্র থেকে বেরিয়ে আসা সুশীলের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং তার "কিল খেয়ে কিল চুরির" অবস্থাই চললো।

এদিকে বাকচি প্রথমে সুরেন সান্যালকে দিয়ে ফরিদপুরে চিঠি পাঠাতে শুরু করলে, পরে রিক্রুট করে নিলে বিপিন বাবুর বড় ছেলেকে। সে ফরিদপুরে স্কুলে ফার্ষ্টক্লাসে পড়ে, এবং ভাদুড়ীর বাসায় যায়।

সম্ভবতঃ চিঠি যায় লক্ষ্মীর কাছেই, এবং ছোকরা মনে করে লক্ষ্মীও তারই মতন বাকচির রিক্রুট।

সুশীল বাবু কিন্তু মর‍্যালিষ্ট—তাঁর ধান্দা শুধু গ্যারিবল্ডী তৈরী করা। তিনি দারোগার মেজো ছেলেটাকে নিয়ে পড়েছেন।

আমি দিনরাত কাগজপত্র পড়ি, নোট করি, আর মজা দেখি আর ভাবি, এরাই বিপ্লবী—ভারতমাতার আশা-ভরসা। মনটা দমে যায়, এমন মাল যারা বিপ্লবীদলে সংগ্রহ করেছে, তাদের ওপর রাগ হয়, বিপ্লবী দলের ওপর মানুষের ঘেন্না হয়ে যায়, এদের দেখেই।

ইতিমধ্যে একবার বাকচির দাঁতের অসুখ হল, কনকনানি বাড়ে-কমে, কিন্তু একেবারে বন্ধ হয় না, ডাক্তার ওষুধ দেয়, কিছুই হয় না, ফরিদপুরে গিয়ে ডেণ্টিষ্ট-এর কাছে চিকিৎসা করানো দরকার। I Bর সুরেশ চক্রবর্তী দেখতে এলেন এবং গম্ভীর ভাবে বাকচিকে বেশ কিছুক্ষণ হাঁ করিয়ে রেখে ঠাউরে দেখে গম্ভীর ভাবে বললেন দুটো cavity হয়েছে মনে হচ্ছে।—রসিক লোক!

বাকচি উৎসাহিত হয়ে বললে, বোধ হয় sinus হয়েছে। সুরেশ বাবু বললেন, ডাক্তারের সুপারিশসহ একখানা দরখাস্ত দিন, আমিও দারোগা সাহেবকে বলে যাচ্ছি।

দরখাস্ত লিখে দিলুম, কিন্তু ডাক্তার যা নোট দিলে, তাতেই সব ভেস্তে গেল। বাকচি বললে, আমি জানি, শালা মানুষ নয়, শুয়োরের বাচ্ছা, ক্যাম্পে হলে শালাকে জুতো-পেটা করতুম। বহরমপুর ক্যাম্পের কথা মনে হল।

কিন্তু অগত্যা বাকচির দাঁতের অসুখ ভালো হয়ে গেল, cavity, sinus, বেদনা, সব একদিনেই আরাম! চিড়িয়াখানা!

জুলাই মাসে I Bর দুর্গাপদ ঘটক এলেন বাকচির সঙ্গে দেখা করতে। ভাদুড়ী-গিন্নী কলকাতায় গিয়ে তাঁর এক সম্পোষদা'র (I B Officer) সঙ্গে দেখা করে নিজের জামিনে বাকচিকে release করানোর চেষ্টা করেছেন এবং সেই সূত্রে দুর্গাপদ এসেছেন। দুপুরে বাকচি থানায় গেল তার সঙ্গে কথা কইতে। বিকেলে আমি থানায় যেতে তিনি ডেকে আলাপ করলেন।

তারপর রাত্রে আমাদের বাসায় এলেন আড্ডা মারতে। বললেন, "আপনারা রয়েছেন, আপনাদের সম্বন্ধেও কিছু রিপোর্ট দিতেই হবে, সুতরাং আপনাদের সঙ্গে কথা কইতে চাই —দুদিন থাকবো।"

সুশীল বাবুর সঙ্গে রাত্রে একা একা কথা হল। তারপর আমার ঘরে আমার সঙ্গে কথা। পরিষ্কার বললেন, এ ভাবে কথা বলে, (অর্থাৎ tackle করে) ঠিক মনোভাব বোঝা শক্ত, বরং গল্প সল্প করলে মনোভাব আরো ভাল বোঝা যায়।

আমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাপলো, আমার মুক্তির কথা চুলোয় যাক, কর্তাকে কিছু নতুন কথা শিক্ষা দেব এবং ডেটিনিউ সম্বন্ধে ধারণা খুলিয়ে দেব। সুতরাং সাহিত্য-দর্শন থেকে শুরু করে ইংরেজের বজ্জাতির ফিরিস্তি, যায় ১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কারের বজ্জাতি, বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিলুম, আর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, হিটলার, সোভিয়েট, কমিউনিজম প্রভৃতি সম্বন্ধেও এক লম্বা লেকচার দিলুম। শেষে বললুম, একটা বিশ্বযুদ্ধ পাকছে, বিপ্লবীরাও হয়ত কোথাও কোথাও ঘাপটি মেরে কিছু প্ল্যান করছে, কমিউনিষ্ট পার্টিরও হয়ত কিছু প্ল্যান আছে এবং কেউই আমার আশা পথ চেয়ে নেই। আমারও বেলেকাঁদি ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। আমার এক মাত্র সমস্যা ম্যালেরিয়ার ভোগান্তি।

আমি যখন গভর্ণমেণ্টের বজ্জাতির তথ্য তালিকা আওড়াচ্ছি, তখন দুর্গাপদ বাবু মাঝে মাঝে বলছেন, না না, এ হ'তে পারে না, আর আমি সঙ্গে সঙ্গে দাগ-দেওয়া ষ্টেটসম্যান বার করে পড়ে শোনাচ্ছি আর ব্যাখ্যা করছি। পরের দিনও এমনি চললো।

অনেক শোনার পর দুর্গাপদ বাবু ভোল বদলালেন, অতি চিন্তিতভাবে দিকচক্রবালের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গম্ভীরভাবে বললেন, "বাস্তবিকই নারান বাবু, আমিও মাঝে মাঝে

ভাবি, এত বড় দেশ, এত রকমের সমস্যা, ভেবে কূল পাই না কেমন করে এসব বিরাট জটিল সমস্যার সমাধান হবে।"

আমি বললুম, "আমি মনে মনে একটা শেষ সান্ত্বনার কথা কল্পনা করে আনন্দ পাই।"

দুর্গাপদ উৎসাহিত হয়ে আগ্রহ সহকারে বললেন,—"কি সে কথা?" আমি বললুম, একদিন ভূগর্ভের এক প্রচণ্ড প্রাকৃতিক বিস্ফোরণে পৃথিবীটা তার কক্ষপথচ্যুত হবে, আর বিরাট সোঁ সোঁ শব্দ করে সূর্যের দিকে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ ফ্যাঁশ করে গ্যাস হয়ে যাবে, আপনি, আমি, ভারতমাতা, তার সমস্যা, সব গ্যাস্"—

দুর্গাপদ বাবু যেন হতাশায় এলিয়ে পড়ে বললেন, "ওঃ আপনি ঠাট্টা করছেন!"—বোঝাবুঝির পালা সাঙ্গ হল।

ম্যালেরিয়া বেশ ভালো করেই ধরেছে। ইব্রাহিমেরও মাঝে মাঝে জ্বর শুরু হয়েছে। শামুকের মতন নিজেকে বহির্জগতের সংস্রব থেকে যতদূর সম্ভব একটা কঠিন নিরাসক্ত গাম্ভীর্যের আবরণের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছি। ওদের দৈনন্দিন বে-আদবী, বে-আক্কেলেমি এবং দুর্ব্যবহার লক্ষ্য করি এবং ডায়েরীতে লিখে রাখি। সে রামায়ণ-মহাভারতের কথায় আর কাজ নেই। এখন কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথায় ফিরে আসা যাক।

'৩৬ সালের ডিসেম্বরে ফৈজপুর কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী কমিটির সভায় আলোচনা চলছে, নির্বাচনে জয়লাভ করলে মন্ত্রিত্ব নেওয়া হবে কিনা। তখন তরুণদের মধ্যে কমিউনিজমের কথা এবং মার্কসের ওপর ভক্তি বাড়ছে। মাদ্রাজের নেতা টি প্রকাশম এক সভায় বললেন, "কার্লমার্কস রুশিয়ায় সোসিয়্যালিজমের প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি বুঝেছিলেন, মন্ত্রিত্ব নেওয়া দরকার। "He felt that offices should be accepted." (!)

—(ষ্টেটসম্যান ২৭।১২।৩৬)

এর ঠিক আগে, অযোধ্যার তালুকদারদের এক সভায় বড়লাট বলেছেন (ষ্টেটসম্যান, ১৯।১২।৩৩), "আপনারা আমাকে একজন ব্রাদার ল্যাণ্ডলর্ড বলে অভিনন্দন করেছেন। আমাদের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলেই আমি জমিদারশ্রেণীর বিশেষ অসুবিধাগুলো সম্পর্কে আপনাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। নতুন শাসনতন্ত্রে আপনাদের শ্রেণীর সব সুযোগ সুবিধারই রক্ষাকবচ আছে এবং শুধু যে শাসনবিধির মধ্যেই আপনাদের বিশেষ মর্য্যাদা স্বীকৃত হয়েছে, তাই নয়, সকল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় আপনাদের জন্যে বরাবরকার মতনই বিশেষ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

ন্যাশান্যাল লিবারেল ফেডারেশনের বার্ষিক সভায় জমায়েত হলেন, তালুকদার, অবসর-প্রাপ্ত বড় বড় সরকারী কর্মচারী, দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রী প্রভৃতির দল। রাজা স্যর রামপাল সিং বক্তৃতায় বললেন, (ইণ্ডিয়ান অবজারভার, ষ্টেটসম্যান, ৪।১।৩৭), "আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, লিবারেল পার্টিই একমাত্র পার্টি, যাদের সঙ্গে জমিদারেরা যোগ দিতে পারে। কমিউনিজমের বিপদ লিবারেল ও জমিদারদের নিকটতম করেছে, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতাদের এ অবস্থায় সুযোগ গ্রহণ করা উচিত।"

ঐ সময়েই ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড ঘোষণা করলেন, যথেষ্ট সংখ্যক ইউরোপীয় আই-সি-এস পাওয়া যায় না বলে '৩৭ সালেও '৩৬ সালেরই মতন লিখিত প্রতিযোগিতামূলক

পরীক্ষা ব্যবস্থা বাদ দিয়েই কিছু সংখ্যক আই-সি-এস অফিসার বিলেত থেকেই সংগ্রহ করা হবে। —(ষ্টেটসম্যান ১২।১।৩৭)

এই সব অবস্থার মধ্যে নির্বাচনে জয়লাভ করে শাসনতন্ত্র ভেঙ্গে দেওয়ার ঘোষণার পর মন্ত্রিত্ব নিয়ে তাকে কাযকরী করা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বড় মুস্কিলের কথা। যাঁরা মন্ত্রিত্ব নেওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে পট্টভী সীতারামাইয়া বলেছিলেন (ইণ্ডিয়ান রিভিউ—আগষ্ট '৩৬) মন্ত্রিত্ব নেওয়া বা শক্তি দখল করা কথাগুলোই ভুল। মন্ত্রিত্ব নেওয়ার অর্থ, শক্তি বা কর্তৃত্বশূন্য চাকরী দখল করা। দখল করা কথাটাও ঠিক নয়, কারণ শক্তি বা কর্তৃত্ব, কিছুই যেখানে নেই, সেখানে দখল করার কথাটাই ওঠে না।

"ট্রিবিউন" পরামর্শ দিলে (ষ্টেটসম্যান ১৭।২।৩৭), "কংগ্রেস যদি ব্যবস্থাপক সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই হয়, তাহলে নিজেরা মন্ত্রিত্ব না নিলেও মন্ত্রিত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যদি কোন প্রগতিশীল পার্টির সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তাদের মন্ত্রিত্ব নিতে দিয়ে তাদের দ্বারা জনগণের স্বার্থ ও কল্যাণ সাধনের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তারা ঠিকভাবে কাজ না করলে ভোটের জোরে তাদের হটিয়েও দেওয়া যায়। অর্থাৎ কংগ্রেস যদি মন্ত্রিত্ব না নিয়ে বিরোধী দল হিসেবেই থাকে তাহলেই তারা দেশের মঙ্গল আরো বেশী করতে পারে।"

ট্রিবিউনের হুঁস নেই, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা তাদের ভোটের ওপর মন্ত্রিত্বের সৃষ্টি, স্থিতি বা লয়, কোনোটাই নির্ভর করে না, তার সবখানিই লাটসাহেবের মুঠোর অন্তর্গত। কিন্তু ট্রিবিউনের কথার এ জবাব কেউ দিলে না। কংগ্রেস চাইলে, লাটসাহেব তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর কাজে বাধা দেবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিলেই কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে পারে।

লাটসাহেব বললেন, "তা কেমন করে হয়, আমাকে তো শাসনবিধি অনুসারেই চলতে হবে!" সুতরাং নির্বাচনের পর মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন স্থগিত রইলো, তখনকার মতন একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হল।

ট্রিবিউন আবার লিখলে, "লাটসাহেবরা যে কখনও কোন কারণেই বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগ করবেন না, এমন প্রতিশ্রুতি তো কংগ্রেস চায়নি, কংগ্রেস চায়, তাদের বৈধ কাযকলাপে যেন বাধা দেওয়া না হয়।" —(ষ্টেটসম্যান ৩১।৩।৩৭)

লর্ড লোথিয়ান তার জবাবে বলেন, "তা যদি হয়, তাহলে তো মীমাংসার কোন বাধাই নেই। কারণ বৈধ কার্যকলাপে কোন বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা তো শাসনবিধিতে নেই।" বৃটেনের উদ্দেশে তিনি বলেন, "মীমাংসার এ সুযোগ হারালে ভারতে বিপ্লবের অবস্থা আসবে।" —(ষ্টেটসম্যান ১০।৪।৩৭)

ঐ দিনেরই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ষ্টেটসম্যান লিখলে, "লর্ড জেটল্যাণ্ড কতকগুলো কাল্পনিক অবস্থার উদাহরণ দিয়ে লাটসাহেবদের বিশেষ ক্ষমতার ব্যবহারের প্রয়োজন দেখিয়ে কংগ্রেসের কাছে প্রতিশ্রুতি না দেওয়া সমর্থন করেছেন। ভারতের দারিদ্র্য অসহনীয়, তার জমিসংক্রান্ত আইন-কানুন বর্তমান জগতের অন্যতম কলঙ্ক স্বরূপ, ভারতের ৩৫ কোটি লোকের অবস্থার কিছু উন্নতি হলে সেটা ইংরেজের বাণিজ্যিক স্বার্থের পক্ষেও ভাল কথা। নতুন শাসনবিধিতে যে কংগ্রেসকে "এ সম্বন্ধে কোন কাজের সুযোগ দেওয়া যাবে না, আইনটা যদি এমনই অসার হয়, তাহলে আমরাও আইনটাকে ঠিক বুঝিনি।

আর তা যদি না হয়, তাহলে সেকথা পরিষ্কার ভাবে বলতে এবং কংগ্রেসকে প্রতিশ্রুতি দিতে দোষ কি ?"

জহরলাল বললেন, "লর্ড জেটল্যাণ্ড পরিষ্কার রূপে সরকারের মনোভাব ব্যক্ত করায় আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের বলা হয়েছে, এই শাসন সংস্কার, হয় নাও, না হয় ছেড়ে দাও। আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে বলছি, আমরা এ শাসন সংস্কার বাতিল করলুম। আমাদের নীতিও এই, আর কোটি কোটি ভারতবাসীর কাছ থেকে আমরা এই নির্দেশই পেয়েছি।— —(ষ্টেটসম্যান ১০।৪।৩৭)

মহাত্মাজী বললেন, "লর্ড জেটল্যাণ্ডের বিবৃতির পেছন থেকে তরবারির জোর উঁকি মারছে। আমার মনে হচ্ছে, মাত্র গোটাকতক লোককে ভোটের অধিকার দিয়েই যেন বৃটিশ রাজনীতিকদের আফশোষ হয়েছে।" —(ষ্টেটসম্যান ২৬৪ ৩৭)

বিলেতের কাছে ভারতের পক্ষে আবেদন নিবেদনে বিরক্ত হয়ে চার্চিল বললেন,— "দু'-তিন বছর আগের মতন বিলেতের শান্তিবাদের দিন আর নেই,— এখন বিলেতের মেজাজ গরম।" —(ষ্টেটসম্যান ১৮ ৪।৩৭)

১৯ তারিখে "ষ্টেটসম্যান" ঠাট্টা করে লিখলে, "বিলেতের মেজাজ গরম? এই তো মাত্র সেদিন মিঃ চার্চিল স্পেন সম্বন্ধে খুব সতর্ক বক্তৃতা করেছেন। ফ্রাঙ্কো কটমট করে তাকালেই যে-তলোয়ার লুকোতে হয়, সে-তলোয়ার নাড়া দিয়ে বীরত্ব জাহির না করাই ভাল।"

যাই হোক, এই অচল অবস্থায় গভর্ণরেরা ঘাবড়ালেন না। তারা "কংগ্রেসী" প্রদেশগুলোতে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে মন্ত্রী নিয়োগ করে অস্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করে কাজ চালাতে লাগলেন।

অস্থায়ী মন্ত্রিমণ্ডলী বে-আইনী, এই মর্মে মিঃ ভক্তরাম এক প্রস্তাব লিখে ব্যবস্থা পরিষদে পাঠান। লাটসাহেব সে প্রস্তাব বাতিল করেন, কারণ বিষয়টা তাঁর ব্যক্তিগত বিবেচনার এলাকা। —(ষ্টেটসম্যান ১৭।৪।৩৭)

মধ্যপ্রদেশের ডক্টর খারে ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনের ব্যবস্থা করার জন্যে লাট সাহেবের কাছে দাবী করলে লাট সাহেব জবাব দিলেন, এ বিষয়টা আমার খাস এলাকা, এবং সম্প্রতি ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আমি প্রয়োজন মনে করছি না।

—(ষ্টেটসম্যান ২০।৪।৩৭)

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলেন, —"মন্ত্রিত্ব নেওয়া একটা অপকর্ম— মহাপাপের কাজ" —(sin)—(মডার্ণ রিভিউ এপ্রিল '৩৭)

অল ইণ্ডিয়া ন্যাশান্যাল কনভেনশনের সভাপতির ভাষণে জহরলাল বললেন, "এই শাসন-বিধিটাকে দাহ করা বা কবর দেওয়া ছাড়া আর কোন নীতি যদি তাঁরা গ্রহণ করেন, তাহলে পরবর্তী নির্বাচনে তাঁদের দেশদ্রোহী বলে লাথি মেরে তাড়ানো হবে।"

—(মডার্ণ রিভিউ এপ্রিল' ৩৭)

সিন্ধুদেশ ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ সিন্ধু ইউনাইটেড পার্টিকে বলেছিলেন, "মন্ত্রিত্বের চাকচিক্য দেখে ভুললে, সেটা হবে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। ওদিকে যারা যাবে, তারা খাঁটী লোক নয়।" —(ষ্টেটসম্যান মে '৩৭)

আই সি এস দের চাকরীর অবস্থা সম্বন্ধে যাঁরা চিন্তিত হয়েছিলেন, তাঁদের আশ্বস্ত করার জন্যে "ষ্টেটসম্যান" লিখলে (সাপ্লিমেণ্ট ১৪।৪।৩৭) "আগেকার নীতি সবই ঠিক আছে। বিলেতের যে সব যুবক বা তাদের পিতা মাতারা ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রত্যাশা করতেন, তাঁদের ঘাবড়াবার কিছু নেই। আগে সিভিলিয়ানরা নিজেরাই হুকুম করত, অতঃপর তাদের হুকুম নিয়ে কাজ করতে হবে, কিন্তু হুকুম সম্বন্ধে তাঁরাই নতুন হুকুম-দাতাদের পরামর্শ দেবেন। নতুন শাসনতন্ত্রকে সফল করতে পারে শুধু আই সি এস-রাই, এবং তার মধ্যে ইংরেজের প্রাধান্যটাও বজায় থাকা চাই। বৃটিশ পার্লামেণ্ট ছাড়া কেউ তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"

এই সময়ে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের পুনর্গঠন সম্বন্ধে নতুন এক ব্যবস্থা করা হয় যে, ইংরেজ সিভিল সার্জনদের সংখ্যা ঠিক রেখে ভারতীয় সিভিল সার্জনদের সংখ্যা কমানো হবে এবং তাদের মূল বেতনও কমানো হবে।

ডক্টর দেশমুখ চটে গিয়ে বলেন, "কমিউনিকটা একটা জুয়াচোর কোম্পানীর রিপোর্টের মতন। লড়াইয়ের বিপদের সময় যখন হাজার হাজার ভারতীয় যুবক বৃটিশ সাম্রাজ্যকে বাঁচাবার জন্যে এগিয়ে গিয়েছিল, তখন যোদ্ধাজাতি এবং অ-যোদ্ধাজাতি বলে কোন ভেদাভেদের কথা শোনা যায়নি, কিন্তু আজ সে বিপদ নেই, কাজেই কর্তাদের সেদিনকার কথাও স্মরণ নেই।"

টটেনহাম বলেন, প্রদেশগুলো যত ইচ্ছে সিভিল সার্জন নিয়োগ করতে পারে, কিন্তু বৃটিশ সিভিল সার্জনদের একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা তাদের রাখতেই হবে, কমিউনিকটার মর্ম এই মাত্র।

পণ্ডিত কুঞ্জরু বলেন, "রয়েল আর্মি মেডিক্যাল কোরের ডাক্তারদের ভারতবর্ষ তার মেডিক্যাল সার্ভিসে রাখবে কেন?"

টটেনহাম বলেন,—"প্রতিযোগিতায় যথেষ্ট সংখ্যক বৃটিশ ডাক্তার পাওয়া যায় না বলে এই ভাবে মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।" —(ষ্টেটসম্যান ৩।৪।৩৭)

একদিকে এই সব যথেচ্ছাচার চলছে, আর একদিকে "মর্ণিংপোষ্ট" কংগ্রেসকে ধমক দিচ্ছে, "বৃটিশ সরকারের কংগ্রেসকে বলে দেওয়া দরকার, তারা যদি রাজভক্ত প্রজার মতন এই শাসনতন্ত্রকে কাযকরী না করতে চায়, তাহলে আগের শাসনতন্ত্রই আবার চালু করা হবে।" —(ষ্টেটসম্যান ৩।৪।৩৭)

এই সময়ে সিংহলে গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা সংক্রান্ত এক চমৎকার ঘটনা ঘটে। গভর্ণর তাঁর সেক্রেটারীর পরামর্শে এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই ব্রেসগার্ডল নামক এক ইংরাজ যুবককে নির্বাসিত করেন। তিনি ছিলেন চরমপন্থী শ্রমিক কর্মী। তাঁর বন্ধুরা তাঁর নির্বাসন রদ করার জন্যে হেবিয়াস কর্পাস আইনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিচারের সময় এটর্নী জেনারেল আদালতে বলেন, "যেহেতু গভর্ণর আইনের আমলে আসতে পারেন না, অতএব বিচারকদের এ বিষয়ের বিচারের অধিকারই নেই।"

এই ঘটনার উল্লেখ করে একজন ইংরাজ ২৪।৫।৩৭এর "ষ্টেটসম্যানে" লেখেন, "যখন ভারতে গভর্ণরেরা বিশেষ ক্ষমতা সম্পর্কে নিজেদের সদিচ্ছা ঘোষণা করছেন, ঠিক এই সময়ে একই আইনে শাসিত সিংহলে এইরকম ঘটনা দুঃখের কথা।"

এই সময়েই, বিলাতী ষ্টার্লিং কোম্পানীগুলোর মুনাফার যে অংশ ট্যাক্স থেকে রেহাই পেতো, তার ওপর ট্যাক্স বসানোর কথা ওঠে। আসাম ডিনার সভায় স্তর মাইকেল কীন বলেন, "এই ট্যাক্স সম্প্রদায় বিশেষের সম্পর্কে ভেদনীতির পরিচায়ক, সুতরাং নতুন শাসন আইন অনুসারে এটা চলতে পারে না।" —(ষ্টেটসম্যান ৩।৬।৩৭)

এই সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে বড় লাটের বেতন (মাসিক ২১,৩৩৩ টাকা) ছাড়াও নিম্নলিখিত বার্ষিক ভাতার হিসাব সরকারীভাবে দেওয়া হয়।

—(ইণ্ডিয়ান রিভিউ মে' ৩৭)

সাম্পচুয়ারী অ্যালাউয়েন্স	৪০,০০০	টাকা
কনট্রাক্ট অ্যালাউয়েন্স	১,৪১,৮০০	"
গাড়ী ও মোটর	৪৩,০০০	"
উপহার ও দান	১০,০০০	"
আমদানী জিনিসের শুল্ক	৮,০০০	"
বাসন, ঢাকনা, ঝাড়ন প্রভৃতি	১৬,০০০	"
ভ্রমণ	৪,৭০,০০০	"
মোট	৭,২৮,৮০০	টাকা

প্রদেশে প্রদেশে গভর্ণরদেরও মোটা বেতন ছাড়া নানা রকম অ্যালাউয়েন্স আছে।

যাই হোক, '৩৭ সালের "অল ফুলস ডে" ১লা এপ্রিল নতুন শাসনবিধি প্রবর্তনের পর তিন মাস কেটে গেছে, অস্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। যদি আর তিন মাস এই ভাবেই চলে, তাহলে লাটসাহেবদের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন ডাকতেই হবে, এবং তখন কংগ্রেসী প্রদেশের অস্থায়ী মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে যাবে, তখন হয়ত ৯৩ ধারা অনুসারে বিনা মন্ত্রীতেই লাটসাহেবের শাসন চলবে। তখন আর একটা সংগ্রাম করা ছাড়া কংগ্রেসের আর উপায় থাকবে না।

সুতরাং কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড ধড়ফড় করতে লাগলেন এবং '৩৭ সালের জুলাইয়ে ওয়ার্ধাতে ওয়াকিং কমিটির মিটিং হল। তাতে প্রস্তাব পাশ হল, পূর্ববর্তী মিটিংয়ের (২৮।৪।৩৭) পরে অদ্যাবধি যে সব ঘটনা ঘটেছে, তাতে ওয়ার্কিং কমিটি মনে করে যে, লাটসাহেবদের পক্ষে বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করা সহজ হবে না। —(মডার্ণ রিভিউ আগষ্ট '৩৭)

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নির্দেশ না নিয়েই ওয়ার্কিং কমিটি কেন সিদ্ধান্ত করলে' জিজ্ঞাসা করায় জবাব দেওয়া হল, "এ সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করাটা দেশের স্বার্থের বিরোধী।" —খাঁটি সরকারী সুর!

ইতিমধ্যে জহরলাল মালয়, ব্রহ্ম সফর করে এসে "মডার্ণ রিভিউ"-তে (জুলাই ৩৭) এক প্রবন্ধে বলেছেন, "আমার চেয়ে যাঁরা অনেক বেশী জানেন, সেই জ্ঞানী মহাজনদের অনেকেই বলছেন, শীঘ্রই ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং হবে। তাঁরা মনে করেন মন্ত্রিত্বের চিন্তাই আমাদের সব চেয়ে বড় চিন্তা। কিন্তু তাঁরা দেখে আশ্চর্য হবেন, আমরা ও ব্যাপারটাকে কত তুচ্ছ মনে করি, এবং আরো কত বড় বড় কাজ আমাদের আছে।"

তখন এম এন রায় কারাদণ্ড ভোগ করার পর মুক্তি পেয়েছেন। ইউ পি ইউথ

কনফারেন্সে সভাপতিরূপে তিনি বলেছিলেন, "নির্বাচনে জয় একটা নূতন সংগ্রামের সূত্রপাত হতে পারতো—ক্ষমতা অধিকারের সংগ্রাম। সাধারণ কংগ্রেসসেবীরা এই দুষ্ট শাসনতন্ত্রটাকে চুরমার করে দেওয়াটাই দেখবে বলে আশা করেছিল, কিন্তু আজ সে কথা চাপা পড়ে গেছে, আজ আমাদের নেতারা গভর্ণরদের "অবৈধ" কাজের সমালোচনা করে প্রকারান্তরে এই শাসনবিধি সমর্থনই করছেন।"

ওয়ার্ধা প্রস্তাবের পর কংগ্রেস গভর্ণরদের প্রাণপণে বোঝাতে লাগলো, বিশেষ ক্ষমতা সম্বন্ধে যা-হয় একটা প্রতিশ্রুতি দিলেই তাঁরা মন্ত্রিত্ব নেবেন। মহাত্মাজী বললেন, "আমরা এমন প্রতিশ্রুতি চাই না, যেটা গভর্ণরেরা এই শাসনবিধি অনুসারেই দিতে না পারেন।"

যাই হোক, অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর গভর্ণরেরা প্রতিশ্রুতি দিলেন, তাঁরা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের "day to day administration"-এ বাধা দেবেন না। আর একেই বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার না করার প্রতিশ্রুতি বলে মেনে নিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব নিয়ে চেপে বসলো।

স্বনামধন্য কংগ্রেস নেতা রফি আহম্মদ কিদোয়াই ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, "বৃটিশ কূটনীতিরই জয় হয়েছে। যাঁরা ভারতকে বৃটিশ কবল থেকে মুক্ত করার জন্যে কোমর বেঁধেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁরা বৃটিশ শাসন রজ্জুতে বাঁধা পড়তে সম্মত হয়েছেন। শাসনতন্ত্রটাকে ধ্বংস করার বচনগুলো নেহাৎ বাকচাতুরী বলেই প্রমাণিত হয়েছে। ওয়ার্ধার প্রস্তাব সংগ্রামের পথ ছেড়ে সংস্কারের পথ ধরেছে। আমরা পরাজয়ই মেনে নিলুম।" —(ষ্টেটসম্যান ১১।৭।৩৭)

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে মহাত্মাজী ব্যাখ্যা করলেন (ষ্টেটসম্যান, ১৯।৭।৩৭) শাসন সংস্কার কার্যকরী করার জন্যে মন্ত্রিত্ব নেওয়া হচ্ছে না। কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌছানোর পথের একদিকে রক্ত-কলঙ্কিত বিপ্লব, আর একদিকে এক অভূতপূর্ব সার্বজনীন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, এই দুই বিপদ এড়ানোর জন্যেই মন্ত্রিত্ব নেওয়া হচ্ছে।"

একত্রিশ

এখন আর একবার বেলেকাঁদিতে ফিরে এসে চিড়িয়াখানার ইতিহাসের ইতি করা যাক। '৩৬ সালের বর্ষার পর ম্যালেরিয়ার মরশুমে জরে জরে আমার 'তনু জরজর" হয়েছে। ব্রাহিমকেও ম্যালেরিয়ায় ধরেছে। তাকে বিদায় দিয়ে তার জামাই এবাদতকে রাখলুমই। ক্রমে তারও জর হতে শুরু করলো।

সে জর হয়ে বাড়ী গেল। আমিও জরে শয্যাশায়ী। পাশের ঘরের ওরা দেখেও না, খবরও রাখে না। দরকার হলেই অবশ্য তারা এমন ভাবে আসে, যেন কিছুই হয়নি বা জানেনা, দরখাস্ত লিখিয়ে নেয়, পরামর্শ নেয়, আবার তারপরই নিঃসম্পর্ক।

এবাদত যেদিন চলে গেছে, সন্ধ্যাবেলা শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছি, দেখি ইব্রাহিম এসেছে। সেদিন একটু ভাল আছে। বললে,.কেমন আছেন, খবর নিতে এলুম। যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলুম। চট করে মনস্থির করে বললুম, তুমি যদি এখানে থেকে ঘরে বসে কাজ কর, আর এবাদত এক একবার এসে কিছু কাজ করে দিয়ে তোমায় সাহায্য করে, কেমন হয়? পারবে?

সে রাজী হল—যেন বেঁচে গেলুম। আমার ঘরের মাচায় ইব্রাহিমের বিছানা করে দিলুম, একটা মশারিও দিলুম। কিছু বেশী খরচ হবে। তা হোক, ২।৪ টাকা যা বাঁচিয়ে রেখেছিলুম সেগুলো কাজে লাগবে। বুড়োকে বিনা চিকিৎসা-পথ্যে মরতে দোব না।

ইতিমধ্যে বাবুরা একদিন থানায় "আনন্দবাজার" পড়ে এসে খবর দিলে, গোপালগঞ্জে ডেটিনিউ নবজীবন ঘোষ গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সে ছিল কৃষ্ণজীবন ঘোষের ছোট ভাই, বছর ২০ বয়েস, যে-কৃষ্ণজীবনের মেদিনীপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট খুন করার দায়ে ফাঁসি হয়েছিল।

১০ই আগষ্ট (৩৬) রাজবাড়ী থেকে এস ডি ও এলেন আমাদের দেখতে। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কোন "Complaint" আছে কি না। আমি বললুম, ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কোন কমপ্লেন্ট নেই। এখানে ২১ মাস আছি শুনে দারোগাকে বললেন "he should be transferred to some healthier place!" সে কথা Inspection book-এ লিখেও গেলেন। আমি ভাবলুম, এতদিনে এই প্রথম এসেই এত সদাশয় ভাব, ব্যাপারটা কি?

দিন দুই পরে বাকচি হঠাৎ এল, তার release-এর দরখাস্ত লিখে দিতে হবে। বললে, বিপিন বাবু ফরিদপুর থেকে জেনে এসেছেন, আপনি শীগগিরই release হবেন। মনে হল, হবেও বা। হয়ত তাই শুনেই ওর দরখাস্ত করার ইচ্ছে হয়েছে, যদিও ওর জন্যে ভাদুড়ীগিন্নী চেষ্টা করছেন, এবং ওর I B interview-ও হয়ে গেছে। তবু একটা দরখাস্ত লিখে দিলুম।

সুশীলবাবুর সঙ্গে বাকচির আবার মনকষাকষি হয়েছে। কয়েকদিন পরে একদিন সন্ধ্যার পর আমি ঘরে বসে লিখছি, হঠাৎ বিপিনবাবু এসে হাজির, সঙ্গে বাকচি। তখনও সুশীল বেড়িয়ে ফেরেনি। দেখে বিপিনবাবু আমাকে বললেন, "See the fun. রাত পর্যন্ত বেড়ানো।" আমি বললুম, "এত দেরি তো কোনদিন হয় না, হয়ত ডাক্তারের সঙ্গে জমে গেছে, খেয়াল নেই।" বলতে বলতে সুশীলবাবু এসে পড়লো। বিপিনবাবু রাত পর্যন্ত বেড়ানো বে-আইনী বলে একটু ধমকের সুরে বললেন, "জানেন, আমি prosecute করতে পারি?"

বিশ্রী লাগলো। বললুম, বে-আইনী ঠিকই, কিন্তু ঢিল দিতে দিতে এমনই হয়। আপনি অনিলবাবুকে নিয়ে থানায় রাত ১১টা পর্যন্ত গানবাজনা করবেন, আর এরা একটু ঢিলে হলে ধমক দেবেন "prosecute করতে পারি," এটা কেমন কথা?

Hint পেয়েও বিপিনবাবু বুঝলেন না, তাঁর দারোগা-প্রকৃতি বিকট ভাবে ফেটে বেরুলো। তিনি চীৎকার করে বললেন, "prosecute তো আমিই করবো, আমি রাত্রে থানায় যেতে দিতে পারি, তাই বলে আপনারা যা-খুশী করবেন?"

কাজেই আমাকেও স্পষ্ট করে বলতে হল, "আপনার খুসী হলেই আপনি Government order violate করতে পারেন, বলতে চান? আবার ধমক দেন? prosecute করতে পারেন করুন গে যান, ধমক দেবেন না।"

যেন জোঁকের মুখে নুন পড়লো। বিপিনবাবু থতমত খেয়ে সুর নামিয়ে বললেন,

"আপনারা আমার goodness-এর advantage নিচ্ছেন।" আমি—"আপনার goodness-এর অনেক কথাই জানি, দরকার হলে বলবো, এখন নয়।"

বিপিনবাবু পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন। সুশীল গরুচোরের মতন চুপ করেছিল, এখন বললে, "বেশ হয়েছে, সম্পর্কটা যেমন হওয়া উচিত, আজ থেকে তাই হল।" বাকচিও খানিক তড়পালে, "মুখের মতন জবাব হয়েছে।" তারপর তার জল্পনা-কল্পনা সুরু হল, দারোগা তার release ভেস্তে দিতে পারে, কি না।

কিন্তু, হরিবোল হরি! পরদিনই দেখা গেল, বাকচি সকালেই গিয়ে থানায় বসলো এবং দুপুরে ফিরলো। আবার বিকেলে আগে আগে একলাই থানায় গিয়ে বসলো। আমরা গিয়ে দেখি সুরেন সান্যালও ওর সঙ্গে বসে আছে। বাসায় ফিরে সুশীল বললে, "বোঝা গেছে, ঐ release-এর কথা, ও দারোগারে বুঝাতে চায়, ঝগড়াটা আমাদের দুই-জনের, তার সাথে দারোগার ভাব ঠিকই আছে। সুরেন সান্যালের পরামর্শ।"

দেখলুম, সুশীলের নজর সাফ হয়েছে, ওকে চিনেছে। কিন্তু একটা হপ্তা পার না হতেই দেখা গেল, সুশীলও ধীরে ধীরে বাকচির সঙ্গে ভিড়ে গেছে! সম্ভবত কাছারীর নায়েবের পরামর্শ। সুতরাং আবার আমি একা পড়লুম, আমারও নজর সাফ হল, সুশীলকে ভাল করে চিনলুম।

এক কনষ্টবল ছিল বরিশালের লোক, বয়স বেশী নয়, নাম আবদুল কাদের, একটু একটু দাবা খেলা জানতো, তাকে নিয়ে মাঝে মাঝে দাবায় বসতুম। সে ছুটি নিয়ে বাড়ী গিয়েছিল, ফিরে এসেই আমার ঘরে হাজির, দারোগার সঙ্গে আমার ঝগড়ার কথা তখনও শোনেনি। বাড়ীর গল্প, বউয়ের গল্প, নানীর গল্প, একগাদা কথা বলে ফেললে। শেষ পর্যন্ত বলে বসলো, "আমারে একটা কবিতা লিখে দিতে হবে।" বললুম, দোব। তার সলজ্জ হাসি দেখে আমিও হাসলুম।

তারপর তাকে দারোগার সঙ্গে ঝগড়ার কথা বলে বললুম, এখন আর যখন-তখন আমার এখানে আসা চলবে না, রাত্রিতে তো নয়ই। তার হাসিমুখটা ম্লান হয়ে গেল।

সেদিন রাত্রে অনেক দিনের নিরবচ্ছিন্ন গদ্যের পর কবিতা লিখতে বসলুম। কিন্তু কি লিখবো, ভেবে পাই না। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি করে এক কবিতার ইঞ্জিনিয়ারী খাড়া করলুম—

আসি বলে যবে বিদায় মাগিল
নানী গো তোমার নাতিন-জামাই
বলিলাম, কেন? এমন বয়সে
করে না কি কেউ চাকরী কামাই?
দুটো দিন আর থেকে গেলে কার
কতটুকুই বা আসিয়া যাবে?
লয়ে মোর নাম বুঝাইয়া বোলো
শুনিলে সাহেব খুশীই হবে।
কা'র কথা কেবা শোনে!
গেল বুকে শেল হেনে!

দেখি কত দিন বাঁদীরে ছাড়িয়া
থাকিতে পারে সে বিদেশে পড়ে'—
রহিত কি নানী তোব এ বয়সে
নানা জ্ঞান কভু তোমাবে ছেড়ে ?

কয়েক দিন পরে দারোগা মফঃস্বলে গেছে দেখে দুপুরবেলা সে এল। তাকে কবিতা দিলুম। পড়ে দেখে তার হাসিমুখে ভ্যাবাচ্যাকা ভাব—এমন কবিতা সে কল্পনা বা আশা করেনি। কিন্তু প্রত্যেক লাইনেব গোড়াব অক্ষর জুড়ে যে আবদুল কাদের নাম হয়েছে, তা দেখে তাব আব সন্দেহ রইলো না যে, আমি একজন মস্ত কবি। বললে, "বৌ'র ধারে পাঠাইয়া দিমু—বেশ লগর হইবে।"

অনেকদিন পবে একটু হালকা স্বচ্ছ আনন্দ পেলুম। কিন্তু আবার জ্বরও আসছে! তাকে বিদেয় দিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম। কুইনাইন খেয়েছিলুম, সুতরাং কুইনাইনে আব জ্বরে ক্রমে যেন শরীরটার মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল।

এমনি করে দিন কাটে। হঠাৎ ১৬ই অক্টোবর সকালে ফরিদপুর থেকে D I B Inspector সুরেশ চক্রবর্তী এলেন। থানা থেকে বাকচি আব সুশীলকে ডাকতে এল, Statement নেবে। ওদেব জল্পনা-কল্পনাব হুড়োহুড়ি লেগে গেল। প্রথমে গেল বাকচি। দেরি হচ্ছে দেখে সুশীল কাগজ আনাব ছল করে দেখতে গেল, ব্যাপারটা কেমন চলছে। খানিক পরে কাগজ নিয়ে ফিরে এসে আমায় বললে, "আপনি চললেন, transferred, এই জেলাতেই, কোটালীপাড়া হয়ে যেতে হয়। কোথায় তা বললে না, ও-সির সঙ্গে রুটের কথা হচ্ছিল। বোধ হয় আপনি যেখানে যাচ্ছেন, সেখান থেকেই একজন এখানে আসছে। তাকে যে নিয়ে আসছে, সেই আপনাকে নিয়ে যাবে। বোধ হয় আজই আসবে।"

আমি তো অবাক, চিড়িয়াখানাব ডায়েরী লেখা শেষ। বুঝলুম, বিপিন দারোগা আমার হাত এড়ালো। ঝগড়ার পব থেকে তাব দুশ্চিন্তা হয়েছিল, কবে বা এক ফ্যাঁসাদ বাধিয়ে বসি এবং সব মাঠময় করে দিই। তাই জেনারেল ডায়েরীতে হবদম আমাব জ্বরের কথা লিখে এসেছে।

অনিল বাকচি তিন পাতা statement দিয়ে ফিরলো, আমায় বললে, "আপনি গোপাল-গঞ্জে যাচ্ছেন আমাকে গোপনে বলেছে।" ভাবলুম, • যদি হয়, মন্দ হবে না, সেখানে ও-সি আহমদ হোসেন।

তারপব ক্রমে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হল। নবজীবন আত্মহত্যা করার পর তার ঘরের জন্যে নতুন মাল চাই। ছেলে-ছোকরা নয়, একটু বয়স্ক। আহমদ হোসেনই হয়ত পছন্দ করে আমার নাম suggest করেছে! আব এদিক থেকে বিপিন দারোগাও আমার বদলাব চেষ্টা করছে। এই ওদিক থেকে টানা এবং এদিক থেকে ঠেলা মিলে গিয়ে কাণ্ডটা ঘটেছে। নবজীবনের ঘরে আমাকে পোরাব জন্যেই আমার স্বাস্থ্যের জন্যে কর্তাদের এত মাথা ব্যথা।

আর যত-যা হোক, চিড়িয়াখানার খাঁচা থেকে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে অকস্মাৎ মুক্তি, যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। সে দিন আব কেউ এল না। পরের দিন সকালে মাখন মহিন্তা এল আমার বদলীর অর্ডার নিয়ে এবং সে-ই আমাকে জানালো informally, থানা থেকে

কেউ কিছু বললে না। তবু, যখন জানলুম বিকেলের গাড়ীতে যেতেই হবে, তখন খেয়ে দেয়ে জিনিস-পত্র গুছিয়ে ফেললুম। এখন সরকারী জিনিসগুলো ফেরৎ দেওয়ার পালা। তিনটে বেজে গেল আমি তৈরী হলুম, কিন্তু থানার বাবুদের খোঁজ নেই। শেষে পৌনে চারটের সময় বিপিন বাবু এসে order serve করলেন। বললেন, S Pর instruction হচ্ছে, order serve করতে হবে immediately before departure.

দোহা সাহেবের efficiency! আমাদের রান্নার কড়া ফুটো হয়ে গেলে সেটা যখন বদলে দেওয়া হয়েছিল, তখন দোহা সাহেবের হুকুমে থানা থেকে লোক দিয়ে ফুটো কড়াটা ফরিদপুরে পাঠান হয়েছিল "destroy" করার জন্যে!

যাই হোক, জিনিস-পত্র ফেরৎ দিয়ে ইব্রাহিমের কাছে বিদায় নেওয়ার পালা। সে কাঁদতে লাগলো। তার খাজনা বাকি পড়ায় কাছারি থেকে মামলার ভয় দেখিয়েছিল, আমি খাজনার টাকা দিয়ে দিলুম। তারপর তার মাইনে চুকিয়ে দিয়ে বাড়তি পাঁচটা টাকা দিয়ে বললুম, "তুমি সন্দেশ বানাতে শিখেছো, এই টাকায় ঐ কাজ করতে পারলে তোমার চলে যাবে, মুসলমান বাবুদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেচতে পারবে।" পরে খবর পেয়েছিলুম, সে ঐ কাজ করেই খাচ্ছে।

এই সব বিদায়ের পালা সাঙ্গ করে বেরুতে ৪টে বেজে গেল। তারপর সুরু হল হাঁটার পালা। খানিক হেঁটেই হাঁপিয়ে গেলুম। মুটেরা অনেক এগিয়ে গেল, মাখন বাবুও এগিয়ে গেলেন, পোষ্ট্যাল রাণার পিছন থেকে এসে এগিয়ে চলে গেল, মাখনবাবু মাঝে মাঝে দাঁড়ান এবং তাড়া লাগান। এমনি করে শেষ পর্যন্ত ষ্টেশনের কাছে যেতে যেতে গাড়ী ছাড়ার সময় হয়ে গেল। মাখন বাবু ছুটে গিয়ে গাড়ী আটকালেন, আমিও প্রাণপণে ছুটে গিয়ে গাড়ীতে উঠলুম, গাড়ী ছাড়লো।

আমার পায়ে ফোস্কা পড়েছে, কোমর থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। বেহাল হয়ে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগলুম। ভাটিয়া পাড়ায় নেমে ষ্টিমার ধরতে হবে। শেষ রাত্রে গোপালগঞ্জ পৌঁছে যাবো। কিন্তু আর কিছু ভাবতেও ভাল লাগছিল না। মনটার অবস্থা হয়েছে যেন একটা শূন্য, ভ্যাকুয়াম।

এইভাবে কতক্ষণ পড়েছিলুম হুঁস ছিল না, হঠাৎ "ভাটিয়াপাড়া" শুনে উঠে পড়লুম। ট্রেন নাকি লেট করেছে। নদীতে ষ্টিমার দাঁড়িয়ে, জেটি নেই, নৌকোয় করে গিয়ে ষ্টিমারে উঠতে হবে। ষ্টেশনে কুলি কম, তা নিয়ে লাগলো আর এক ঝঞ্চাট। সব প্যাসেঞ্জার চলে গেলে কুলিরা আমার মাল নিয়ে চললো। খোঁড়াতে খোঁড়াতে তাদের পিছন পিছন গিয়ে নৌকোয় উঠলুম। সঙ্গে সঙ্গে ষ্টিমার ছেড়ে দিলে, আমাদের ফেলে রেখেই।

সুতরাং অগত্যা ঠিক হল নৌকোতেই গোপালগঞ্জ যাওয়া হবে। মাঝিরা বললো, বিলের পথে গেলে ভোরের আগেই পৌঁছে যাব, আর নদী ধরে গেলে পৌঁছতে একটু বেলা হবে। মাখনবাবু বললেন, "না রে বাপু, বিল-বাদের কাম নাই, ডাকাতের হাতে মরুম নাকি? সোজা নদীর পথে চল।"

সুতরাং তাই ঠিক হল। নৌকোয় উঠলেই আমার মাথা ঘোরে, সারারাত সেই নৌকোয় থাকতে হবে। কাজেই আর কথাটি না কয়ে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লুম। মাখনবাবু আর খানিকক্ষণ মাঝিদের সঙ্গে ভ্যাজর ভ্যাজর করে, তারপর শুলেন। কিন্তু তিনি

সজাগ থেকে খানিকক্ষণ অন্তর খবর নিতে লাগলেন, "কৈ আইলো ?" মাঝিরা বলে অমুক জায়গায়। আমিও আধ-ঘুম আধ-জাগা অবস্থায় শুনছি।

এমনি করে সারা রাত কাটলো। সকাল হতে হতেই গোপালগঞ্জ দেখা গেল। মধুমতী নদী, গোপালগঞ্জের কাছে দেখলুম বেশ বড় নদী, বেশ চওড়া। নৌকো চলছে কিনার থেকে অনেক দূর দিয়ে। থানা পার হয়ে খালের মুখে থানারই ঘাটে নৌকো ভিড়বে। কিন্তু মাঝিরা দূর দিয়েই আরো এগিয়ে চললো। মাখনবাবু বললেন, "আরে কৈ লইয়া যাস্ বেটা ?" মাঝিরা মুখ টিপে হেসে বলে, "দেখেন না কর্তা।"

দেখা গেল, দূর দিয়ে খালের মুখ পার হয়ে গিয়ে নৌকো কিনারামুখী হল। তারপর খালের মুখের কাছাকাছি এসে এমনভাবে হাল ঘুরিয়ে প্রাণপণে চেপে ধরলো যে, নৌকোখানা বেশ একটা বড় পাল্লার about turn করে সজোরে খালের ঠিক মুখটাই পার হয়ে ফিরে থানার ঘাটে গিয়ে পড়লো। তখন মাঝিরা লগির ঠেকা দিয়ে প্রাণপণে ধাক্কা বাঁচিয়ে একজন লাফ দিয়ে পড়ে দড়ি টেনে ধরলো। নৌকো ভিড়লো।

দেখা গেল, খালের মুখে প্রবল স্রোতে অতবড় নদীর জল ঢুকছে, একটা হুড়মুড় আওয়াজ যেন জলপ্রপাত। কোথায় যাচ্ছে এ জল ? মাঝিরা বললে, বিলের মধ্যে। বিলের বর্ণনা শুনলুম, মাইল-মাইলব্যাপী জলাভূমি, তার মাঝে মাঝে কিছু জঙ্গল, কিছু লোকবসতি, ছোট-বড় খালের জাল, আবার মাঝে মাঝে বিস্তৃত বিল। বুঝলুম, ঐ খাল বিল পার হয়েই আমাদের নৌকো এই খাল দিয়ে থানায় আসতো সারা রাত ধরে।

শুনলুম ও সি আহমদ হোসেন কি এক মামলা উপলক্ষে খুলনায় গেছেন, সুতরাং সেকেণ্ড অফিসার মালামাল বিসিভ করলেন। মাখনবাবু আমায় বললেন, "আপনার জিনিস-পত্র যে ঠিকমত পৌঁচেছে, তার একটা রসিদ লিখে দেন।" আমি বললুম, "আপনি কি কাউকে রসিদ দিয়ে আমার মালের চার্জ নিয়েছিলেন ? মাল সব ঠিকমত পেয়েছি, থানা অফিসারের সামনেই বলছি, রসিদ দোব কেন ?" ভদ্রলোক বলে, "আমার ওপর রসিদ নেবার অর্ডার আছে।" আবার বলে কিনা, "আপনি না বুইজ্যা তর্ক করেন ক্যান ?" আমার হাসি পেলো—বেশ মজার লোক। বললুম, কর্তাদের বলবেন, নারাণবাবু রসিদ দিলে না। থানা অফিসারও হাসলেন, বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে।" মহিলা গজর গজর করতে লাগলো।

ওখানকার আর এক ডেটিনিউ মণি শ্রীমানী, তাঁরও বয়স বেশী নয়, মাখনবাবু তাঁকেই বেলেকাঁদিতে নিয়ে আসবেন। তাঁর সঙ্গে দোকানে গিয়ে কিছু খাবার এবং চা খেলুম। তাঁরা দুই ডেটিনিউ হোটেল থেকে ভাত আনিয়ে খেতেন। আমি দুপুরে তাঁর সঙ্গে হোটেলের ভাতও খেয়ে নিলুম। সারাটা দিন তাঁর সঙ্গে গল্প করে কাটলো। রাত্রেও হোটেলের ভাত খেলুম।

ঘরটা বেশ ভাল, একখানা বড় লম্বা ঘর—মাঝে ফুট ছ'য়েক উঁচু দরমার ঝাঁপ বেঁধে দুখানা ঘর করা হয়েছিল, নবজীবনের আত্মহত্যার পর ঝাঁপটা তুলে দেওয়া হয়েছে, আর এই ঘরে শ্রীমানী ২৫।২৬ দিন একা থেকেছে।

প্রথমে সে বিছানাপত্র নিয়ে কনেষ্টবলদের ব্যারাকে গিয়ে একখানা খাট দখল করেছিল, বলে, আমি কিছুতেই ওঘরে একলা শুতে পারবো না। তারপর একজন কনেষ্টবল ওর

ঘরে গিয়ে শুতো। তার গণ্ডগোলেই ঠিক করা হয়েছিল, তাকে অন্যত্র বদলী করা হবে এবং এখানে নতুন একসেট ডেটিনিউ আমদানী করা হবে। আমিও গিয়েই তাগাদা দিলুম, যত শীঘ্র সম্ভব আর একজন ডেটিনিউ আনাবার জন্যে। ওরা বললে, সে ব্যবস্থা হচ্ছে।

রাত্রে শ্রীমানীকে নিয়ে মহিস্তা বেলেকাঁদি রওনা হল। আমি কিছু বলতেও পারি না, লজ্জা করে, অথচ ঐ ঘরে একা শুতে মন চায় না। শেষে কনেষ্টবলদের ধরে বোঝালুম, প্রথম রাতটা তোমরা কেউ আমার সঙ্গে ওঘরে থাক। তারা দু'জন বিছানা নিয়ে এসে বারাণ্ডায় শুলো। বেশ চওড়া সিমেন্ট করা বারাণ্ডা।

ঘরটা চমৎকার, সিমেন্টের মেঝে, মুলীবাঁশের দরমার ভাল বুনুনীর বেড়া, বড় বড় দরজা জানালা, টিনের চাল। রান্নাঘরটা ছোট, নীচু, খড়ের চাল, তার মধ্যে দুটো খোপ, বেড়ার নীচের দিকটা ভেঙ্গে চুরে গেছে, কুকুর ঢুকতে পারে। ওরা রান্নার ব্যবস্থা করেনি বলে প'ড়ো হয়ে আছে। মেরামত না করালে রান্না করা চলবে না। হয়ত ওটা আগেকার, নতুন ঘরের সঙ্গে তৈরী নয়।

মাঝে প্রকাণ্ড উঠোনের মতন মাঠ, তার একদিকে বেশ বড় "বিল্ডিং" খানা, পাশের দিকে রাস্তার ধারে আমাদের ঘর এবং তার বিপরীত দিকে একটা লম্বা-চওড়া খানার ধারে পায়খানা, দুটো। বড়টা পুরানো এবং সেটা কনেষ্টবলদের জন্যে, আর ছোটটা নতুন, আমাদের। চারটে খুঁটির ওপর এক টিনের খোপ, ২ ফুট স্কোয়ার মেঝে, আর উঁচু, দরজার কাছে ৬ ফুট, পিছন দিকটা ৫ ফুট। তার ভেতরে ঢুকে ঘুরে বসা যেন এক সার্কাসের কসরৎ। বুঝলুম, গোলমাল না করলে এর সুরাহা হবে না। রাগ হতে লাগলো।

ডেটিনিউদের ঘরের জন্যে সরকারী বরাদ্দ ৪০০৲ টাকা করে। দুজনের ঘরের ৮০০৲ টাকায় আমাদের ঐ ঘর হয়েছে। যে দারোগার আমলে ঐ ঘর হয়, তিনি ছিলেন জাতিতে রজক। কিন্তু লোকটা সৎ এবং আক্কেলওয়ালা। কনট্রাক্টর দিয়ে দুটো পৃথক ঘর করালে ঘর হতো প্রায় বেলেকাঁদিরই মতন। তা না করে ভদ্রলোক নিজের প্ল্যানে, নিজের তদারকে সব টাকাটা খরচ করে ঐ ঘর তৈরী করেছেন, তাই ঘরটা হয়েছে চমৎকার! আর সম্ভবত ঘরেই প্রায় সব টাকা খরচ করে অগত্যা পায়খানাটা সেরেছেন নম নম করে। ভেবে রাগটা নরম হয়ে এলো।

মামলার দৌলতেই হোটেলগুলো চলে, পূজোর ছুটিতে হোটেল বন্ধ হয়েছে। আমার জন্যে চাকরের কোনো বন্দোবস্ত হয়নি। আমার চৌহদ্দী বা day area আমাকে দেখিয়ে দেওয়া হয়নি। দুবেলা বাজারে গিয়ে চা এবং খাবার খেয়েই আমার দিন কাটছে। কাগজ বেলেকাঁদি থেকে redirect করার জন্যে পোষ্টমাষ্টারকে লিখে দিয়ে এসেছিলুম, কিন্তু কাগজের কোনো পাত্তা নেই। এখানে Stateshian কেউ নেয় না, S. D. O. ছাড়া। Officerদের মধ্যেও আনন্দবাজার চলে, যেটা আমার পক্ষে নিষিদ্ধ। ক'দিনেই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে।

তক্তপোষ-টেবিল-চেয়ার ছাড়া সরকারী অন্য জিনিসগুলোও পাইনি। চাকর পেলে রান্নার ব্যবস্থা হলে, তবে সেগুলো লাগবে—আপাতত তাই অসুবিধে নেই। শ্রীমানীর রদ্দী হ্যারিকেনটা আমায় দেওয়া হয়েছে। সেইটাকে জ্বালিয়ে রেখে রাত্রে একাই শুচ্ছি।

ঘুম হয় না, থেকে থেকে ওদিককার আভাটার দিকে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে, যেখানে নবজীবন ফাঁসি লাগিয়ে ঝুলেছিল। এ এক মহা ঝকমারি।

ক'দিন পরে দারোগা সাহেব ফিরলেন, সব শুনলেন এবং দেখলেন। বললেন, চাকর দেখছি। শ্রীমানীর বন্দী জিনিসগুলো আমাকে দেওয়া হল—ইতিমধ্যেই কনেষ্টবলেরা তাদের বন্দী জিনিসগুলো গুছিয়ে শ্রীমানীর ভাল জিনিসগুলো নিয়ে নিয়েছে। আমি যে বন্দী হ্যারিকেন পেয়েছি, সেটা আসলে শ্রীমানীর নয়, কনেষ্টবলদের। নবজীবনের জিনিস-গুলোরও ঠিক অমনি দশাই ওরা করে রেখেছে। কারো সাধ্য নেই, কিছু করে। লেখালেখি করে কিছু সুরাহার চেষ্টা পাহাড় নড়ানোর চেয়ে কঠিন কাজ। সয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

বিনা অন্নে দিন কাটছে, তার ওপর পাতলা দাস্ত শুরু হয়েছে। শুনলুম, গোপালগঞ্জের এক চিরকেলে বৈশিষ্ট্য, বাইরের লোক এসে বাস করলেই প্রথম ২।৪ দিন তার পাতলা দাস্ত হবেই। শুনলুম বিলের জলের গুণ।

বাধ্যে দারোগা সাহেবের বাসা থেকে ভাত পাঠিয়ে দিচ্ছে। ফেরৎ দিতে ইচ্ছে হলেও পারিনি, লজ্জা করে। পরদিন দুপুরেও ভাত এল, দুপুর গেলা করে গেলুম।

একটা Temporary চাকরের ব্যবস্থাও হল। পারো। ঘরের দোরের নীচে ইট দিয়ে ফাঁক বন্ধ করে উনুন গড়ে' নিকিয়ে সবটাকে চমৎকার করে নিলে দেখে মনে হল বেশ কাজের লোকই হবে। মুসলমান ছোকরা, পাশের গাঁয়ে বাড়ী। কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই বোঝা গেল, যেমন দায়িত্বজ্ঞান বাড়ন্ত, তেমনি চোর।

পাঁচ সের কাঠ কিনে এনে একবেলা বেঁধেছে, খেয়ে দেয়ে বাড়ী গেল, বিছানা নিয়ে আসবে বলে, কিন্তু সেফ এলো না। সকালে এসে সটান বললে, জ্বর হয়েছিল এবং বাজার করে এনে আবার পাঁচ সের কাঠের হিসেব দিলে। সুতরাং দারোগা সাহেবকে বলে ডাকাতটাকে বিদেয় দিলুম।

থানার পাশের থানার ওপারে খৃষ্টানপাড়া। সেখানকার এক গোপালের মা দারোগা সাহেবের বাড়ী রাঁধতো। তার এক ভাইপো আছে, কিশোর বয়স, নাম অনিল। গোপালের মা বললে, সে "ভাঙর" হয়েছে, রাঁধতেও জানে। তাকেই রাখা হল। ছোকরা রাঁধলে ভালই, কিন্তু খেয়ে দেয়ে সবে পড়লো এবং রাত্রে আবার ফিরলো। একটু চঞ্চল, কিন্তু মনে হল সব ঠিক হয়ে যাবে।

তার পিসি বেশ হিন্দুঘরের প্রৌঢ়া গিন্নীবান্নীর মতন, অথচ মুরগী, গরু, শুয়োর সবই খায়, ভাবতে ভারি মজা লাগে। অনিল বলে, "আমি গরুর মাংস খাই না, ঘেন্না করে, কিন্তু শুয়োরের মাংসটা খুব ভাল।" তার কাছে তাদের সমাজের গল্প শুনি, তারও ভাল লাগে, আমারও সব জানা কথা হলেও বেশ লাগে, ২।১টা নতুন কথাও শুনি। একটা সমস্যা আপাতত মিটলো।

কিন্তু ডেটিনিউ আসবে আসবে করেও আসছে না, ভাল লাগছে না, আর কাগজ অভাবে যেন আমার অশৌচ চলছে। ইণ্ডিয়ান রিভিউ আর সঞ্জীবনীর ঠিকানা পরিবর্তন করে চিঠি দিয়েছি এবং ইতিমধ্যে বেলেকাঁদিতে যা আসবে, পোষ্টমাষ্টারকে বলে এসেছি, সেগুলো এখানে redirect করতে। কিন্তু কাগজ আসছে না। Statesman ও আমার

নামেই subscribe করা হ'ত, কিন্তু চাঁদা দিতুম তিনজনে। সুতরাং ডেটিনিউদের বলে এসেছিলুম, কাগজ পড়ে এখানে পাঠিয়ে দিতে। পোষ্টমাষ্টারকেও বলেছিলুম, কিন্তু কাগজের পাত্তা নেই। কারো কোন মাথাব্যথা নেই। ভাবি আর রাগ হয়। রাগ হতে হতে ঠিক করলুম, বেলেকাঁদিওয়ালাদের এইবার একটু রুদ্রমূর্তি দেখাতে হবে।

প্রথমে বিপিন দারোগাকে লিখবো ভেবে পেছিয়ে এলুম, কারণ তাকে লিখতে হলে এমন সব কথা লিখতে হয়, যার নাম ঘুঘুর বাসা ভেঙ্গে দেওয়া। সেটা বাঞ্ছনীয় নয় মনে করে পোষ্টমাষ্টারকে লিখলুম, "আমার নামের কাগজগুলো তিনি এখানে redirect করছেন না কেন? কাগজগুলো তিনি কি করছেন? যদি একটা reasonable time এর মধ্যে কাগজ না পাই, তাহলে এমন সব বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর দিয়ে গভর্ণমেণ্টের কাছে enquiryর জন্যে লিখবো যে, সেটা কারো পক্ষেই উপাদেয় হবে না।"

ভাবলুম পোষ্টমাষ্টার নিশ্চয় চিঠি পেয়ে দারোগাকে দেখাবে এবং তা হলেই আমার কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু মনে মনে তড়পে এবং লিখে গ্যাস বেরিয়ে গেল, আবার চুপসে চুপ হয়ে গেলুম। শেষ পর্যন্ত Statesman-এও চিঠি লিখে ঠিকানা বদলে দিলুম, এখন ওরাই বেকুফ হয়ে খানিক তড়পাক।

অনিল ছেলেটা বেশ interesting, "ডাক্তার"ও বটে, বেশ বাড়ন্ত গড়ন, রাঁধেও মন্দ নয়। রাত্রে থাকতে চায় না, কিন্তু ওর বাপ এসে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ম্যানেজ করে গেছে। আমিও মিষ্টি কথা বলি আর গল্প করি, যাতে ওর মন বসে।

এরা তিনপুরুষে খৃষ্টান। এদের পাড়ায় ৬০ ঘর খৃষ্টান আছে। জাতে ছিল জেলে, গরীব, এখনো অনেকেই গরীব এবং পেশায় জেলের। নতুন খৃষ্টান হওয়ার পর জাতের খেয়ালটা হঠাৎ একেবারে ভুলতে পারে না। এদের মিশনের "হেড" পাদরী হচ্ছেন এন, জি, বোস। এরা প্রোটেষ্টাণ্ট। এদের গীর্জা এবং হাইস্কুল আছে। গোপালগঞ্জ শহরের মাঝখান দিয়ে যে পাকা সড়ক আছে, তার একদিকে বাজার, আর একদিকে খৃষ্টানপাড়া।

খালের ওপারে আর একদল খৃষ্টানের বাস আছে, তাদের গীর্জা, স্কুল, গৃহশিল্প-শিক্ষালয়, চাষের জমি প্রভৃতি আছে, অবস্থা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ। বড় পাদরী হাণ্টার সাহেব। স্কুলে পড়ে শতখানেক ছেলে-মেয়ে, তাদের পৃথক পৃথক বোর্ডিংয়ে থেকে। ছাত্রেরাই জমি চাষ করে, কৃষি শেখে।

অনিল বললে, "ওটা হল 'শনি মিশন'—ওরা শনিবারে গীর্জেয় যায়।" মনে করলুম, রোমান ক্যাথলিক, কিন্তু তা নয়। দুই মিশনই দেশী খৃষ্টান এবং গরীব মেহনতী মানুষ কিন্তু এদের সঙ্গে ওদের বিয়ে হতে পারে না। শুনে জিজ্ঞাসা করলুম, "তাহলে তোমাদের মধ্যে জাতিভেদও আছে দেখছি!" অনিল সলজ্জভাবে বললে—"হ্যাঁ।"

বিয়ের রীতি মোটামুটি আমাদের সমাজেরই মতন, বিয়ে ঠিক করে বাপ-মা। পাত্র ও পাত্রী পরে একবার পরস্পরকে দেখতে পায় মাত্র। লাভ-ম্যারেজের রেওয়াজ নেই। তবে যদি কোনো ছেলেমেয়ে বিয়ের আগে পরস্পরকে পছন্দ করে বসে এবং বাপ-মায়ের কথা না মানতে চায়, তাহলে অগত্যা বাপ-মা বিয়েটা দিয়ে দেয়।

তারপর ধর্মের কথায় অনিল বললে, আমরা হিন্দুদের ধর্মের গল্প অনেক জানি,

আমাদের ধর্মের গল্পও জানি, শুধু মুসলমানদের ধর্মের গল্প জানি না। হিন্দুদের যাত্রাগান আমরা খুব দেখি, বেশ ভাল লাগে। তাতে দোষ কি? সে-ও তো ভগবানেরই কথা!

বিধবা বিবাহের কথায় বললে, "ছোট বয়সে বিধবা হলে তার আবার বিয়ে হয়, কিন্তু ২৫।৩০ বছর বয়সের বিধবাদের কেউ বিয়ে করতেই চায় না। আর ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে থাকলেও বিধবার বিয়ে হয়, কিন্তু বড় ছেলে-মেয়ে থাকলে কেউ বিয়ে বসতে চায় না, তাতে নিন্দে হয়।"

তারপর পরদার কথায় বললে, "চেনাশোনা লোকদের মধ্যে মেয়ে পুরুষ মেলামেশা হয়, কিন্তু অচেনা লোকের সামনে মেয়েরা বেরোয় না। তাতে নিন্দেও হয়, আর তাদের লজ্জাও করে।"

আমি বললুম, "তাহলে তো হিন্দুদের মতনই তোমরা পরদা মানো, সাহেবদের মতন স্ত্রীস্বাধীনতা মানো না।"

সে হেসে বললে, "মেম সাহেবদের যে লজ্জাসরম নেই। আমরা যে বাঙ্গালী, আমাদের মেয়েদের যে লজ্জাসরম আছে!"

অশিক্ষিত গরীব গ্রাম্য কিশোর। কিন্তু তাদের সমাজের এমন চমৎকার চিত্র এমন অনাড়ম্বর সহজ সরল কথায় ক'জন পণ্ডিত দিতে পারেন? ভেবে ভারি ভাল লাগলো।

তারপর ভূত এবং ভগবানের কথায় তার ভেতরকার সরল বিশ্বাসী ছেলেমানুষীটা আরো সুন্দরভাবে প্রকাশ হল। বললে "ভূতটা শুধু মনের ভয়, যা দেখা যায় না তা আমি মানি না। কিন্তু ভগবান, আত্মা, এগুলো সত্যি। ধর্মে কি মিথ্যে কথা বলে? মথুর বাবুর কাছে দেবদূত আসতো। লোকে দেখেছে! যারা দেখেছে, তারাই বলেছে।"

শুনে আমিও হেসে ফেললুম, সেও একটু অপ্রতিভের হাসি হাসলো। মনটা আমার অনেক হাল্কা হয়ে গেল।

এদিকে ক্রমে কাগজও আসতে শুরু করলো এবং আর এক নতুন ডেটিনিউও এলেন, হাওড়া শিবপুরের অগম দত্ত। আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, কিন্তু একেবারে তরুণ নন। তিনি ছিলেন বিপিনদার চেলা এবং সন্তোষ মিত্রের দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রথমে হাওড়া জেলে ছিলেন এবং সেখানে ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের চেলা কালীপদ ঘোষকে মুখ-ঢাকা অবস্থায় দেখতে পান, অর্থাৎ কালীপদ তখন পুলিসের কাছে দলের সব কথা বলে দিয়েছে। অগম বাবুর কাছেই আমি পরে এ খবর পাই।

তারপর অগম বাবু বক্সা বন্দিনিবাসে যান এবং পরে Village internment এ গিয়ে কি এক গণ্ডগোল করে এক বড় অফিসারকে একটি থাপ্পড় কসিয়ে prosecuted হয়ে এক মাস কারাদণ্ড ভোগ করে' এখানে বদলী হয়েছেন। এই হল আর এক টাইপের ডেটিনিউ, চিড়িয়াখানা-টাইপ নয়, সুতরাং নিশ্চিন্ত হলুম।

কিন্তু একটা গরমিল হল। এঁরা রাধা-স্বামী সম্প্রদায়ের লোক, মাছ-মাংস খান না, ছেলেবেলা থেকেই নিরামিষাশী। সুতরাং তাঁর খাওয়ার ব্যবস্থা হল মাছের বদলে একটু আলুর দম এবং একটু ঘন করে জাল দেওয়া দুধ। তাতেই তিনি ড্যাম-গ্ল্যাড। এলাউন্সের টাকাটি সই করে নিয়েই তিনি আমার হাতে দিয়ে দিতেন, বলতেন,

"আমি ম্যানেজারী বা হিসেব রাখাব ঝক্কী পোয়াতে পারবো না। আপনিই যা খুশী করবেন, আমার দুটো খেতে পেলেই হল।"

কিন্তু অনিল দড়ি ছিঁড়লো। ছাড়া গরু বাঁধা পড়লে যা হয়, সর্বদা দড়ি ছেঁড়াব মতলব, এবং ভাবটা ছিল সেই রকম। একদিন সকালেই সরে পড়লো, কোথায় কারা জাল ফেলে মাছ ধরবে, দেখতে গেল। এবং দেখতে গিয়েই জমে গেল, আমার কথা যেন স্রেফ ভুলে গেল। অনেক বেলায় ফিরলো, আমি বকলুম, সে রেগে বসলো কাজ করবে না। সুতরাং তাকে বাগ মানাবার আশা ছেড়ে অন্য চাকরের সন্ধান করা হল, এবং পাওয়াও গেল এক পাকা জাতকাট চাকর এক নমঃশূদ্র জোয়ান। সে-ই টিকে গেল।

পায়খানার অবস্থা দেখে অগম বাবুর চক্ষু চড়কগাছ। আমার চেয়ে মোটা মানুষ, আমাদের পায়খানার খোপে তাঁর দেহটা ঢোকাই মুস্কিল। তিনি রোগতিক দেখে কনেষ্টবলদের বড় পায়খানা ব্যবহার করতে লাগলেন। একটা লেখালেখি শুরু করার পরামর্শ হল।

কোনো সাবডিভিসন্যাল টাউনে D I B Office থাকে না, কিন্তু গোপালগঞ্জে আছে, কারণ সাবডিভিসন এবং থানাও বড়, এবং স্বদেশী হাঙ্গামার জন্যে বদনামও আছে। '৩৪ সালের Suppression of terrorism Act এর কল্যাণে ওখানে D I B Office খোলা হয়। একজন এ, এস, আই, বঙ্গালীতে নাম করেছিলেন এবং এখন তিনিই অ্যাক্টিং এস, আই, হয়ে বর্তমানে এখানকার হাকিম হয়েছেন।

আমি আসার পর তিনি চুপি চুপি দেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু অগম বাবু আসার পর একদিন আমাদের ঘরে ঢুকে জেঁকে বসলেন। একটু মূর্খ এবং অভদ্র টাইপের লোক। কথাবার্তাই চালমারা ধরণের। যাই হোক, আমাদের পায়খানার অসুবিধের কথা বলা হল। তিনি বলে বসলেন, কমপ্লেনই যদি না থাকলো, তাহলে ডেটিনিউ কিসের?"

অগম বাবু চটে আগুন হয়ে কতকগুলো কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন এবং কর্তা বেগতিক দেখে সরে পড়লেন। তারপর আমরা পরামর্শ করে DIB Office এর নামে রিপোর্ট করে পায়খানা সম্বন্ধে চ্যালেঞ্জ করে SPকে লিখলুম personal inspection এর জন্যে, এবং বলা হল, local officerদের কাছে নালিশ করে করে আমরা হার মেনেছি। সুতরাং SP যদি কোন ব্যবস্থা না করেন, তাহলে আমরা hunger strike করবো।

আমি জানতুম দারোগা সাহেব আহমদ হোসেন এ দরখাস্ত পেলেই নিজে কিছু ব্যবস্থা করে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এবং দরখাস্ত ফেরৎ নেওয়ার জন্যে আমার কাছে আসবেন এবং আমাকে অনুরোধ করবেন, অগম বাবুকে ঠাণ্ডা করতে। বেলেকাঁদির অভিজ্ঞতা এবং খাতির।

কাজেও ঠিক তাই হল। দরখাস্ত পেয়ে দারোগা সাহেব আমাদের ঘরে এসে বসে, অগম বাবুর সঙ্গে বন্ধুর মত আলাপ করে বললেন, 'ও লোকটা ঐ রকম বুদ্ধি-বিবেচনা তো নেই, শুধু লোকের ক্ষতি করতেই জানে। আমি ওকে বলে দোব ও আর কখনো আপনাদের ঘরে আসবে না। এটাতো ওর ডিউটিই নয়। আমি আজই পায়খানার কথা লিখছি এবং কথা দিচ্ছি, পায়খানা বড় করে দেওয়া হবে।" লোকটা ভীতু, গণ্ডগোলকে

ভয় করে, বিশেষত ভেটিনিউ সম্পর্কে। সুতরাং গণ্ডগোল মিটলো এবং কিছুদিনের মধ্যে বড় পায়খানা হয়ে গেল।

সাব-ডিভিসন্যাল অফিসার হাকিমও বদলী হয়ে গেলেন। তাঁর স্থলে এলেন একজন মুসলমান সাব ইন্সপেক্টর, বয়স বেশী নয়, শিক্ষিত এবং কাদিয়ানী, অর্থাৎ আহমদীয়া সম্প্রদায়ের লোক। এরা ধর্ম বিষয়ে সংস্কারবাদী এবং গোঁড়া মুসলমানেরা এঁদের কাফের বলে। আমার সঙ্গে আলাপ জমে গেল।

বত্রিশ

"শ্রীভাঁওতার" কল্যাণে ছ'বছর "বসে খাচ্ছি"—প্রাণ ওষ্ঠাগত। কবে এ ঝকমারি শেষ হবে ভেবে পাই না। কিছুকাল আগে অনেকেই মনে করতো, ইংরেজ আর একটা যুদ্ধে জড়ালে আমরা "দেখে নোব" কিন্তু ক্যাম্প-জেল অন্তরীণের অভিজ্ঞতা বলে, বিপ্লবীদের সংগঠন প্রকৃতপক্ষে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি, কি করতে পারবে তারা? এই অবস্থার সঙ্গে বিপ্লবের আদর্শও বদলাচ্ছে, একটা পর্যায়ের শেষ দেখার পর যেন আর একটা পর্যায়ে প্রবেশ করছে, সর্বত্রই সকল পার্টি ও গ্রুপের মধ্যে দু'চার জন করে কমিউনিষ্ট গজাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিজমের আদর্শের বিরোধিতা উপলক্ষে মাঝে মাঝে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের শতধাবিচ্ছিন্ন দলগুলো বাচনিক সংগ্রামে এক জোটা হয়ে ওঠে। লড়াই বাধলে ইংরেজকে দেখে নেওয়ার কথাটা এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা ঠাট্টার মতন শোনায়।

গুপ্ত আন্দোলন ও সংগঠন যখন এই ভাবে প্রায় ধ্বংসীভূত, তখন প্রকাশ্য গণ-আন্দোলন ও স্বাধীনতার সংগ্রামের দিকে দৃষ্টি স্বতঃই প্রসারিত হয় এবং সে ক্ষেত্রে কংগ্রেস এবং কমিউনিষ্ট আন্দোলনের আদর্শের সংঘর্ষই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর কমিউনিজমের আদর্শের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা কংগ্রেসের শিবিরেই আশ্রয় নেয়। এই প্রসেস, এই পরিণতি, জেল-ক্যাম্পগুলোতে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল।

আবার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক জগতে কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের বিশ্বব্যাপী দ্বন্দ্বও পেকে উঠছিল বলে, কমিউনিষ্ট-বিরোধী জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা ফ্যাসিজমের আদর্শের দিকেও সুস্পষ্ট ভাবে ঝুঁকছিল। এদের অবস্থা ক্রমে দাঁড়াচ্ছিল কাজে কংগ্রেসী, আদর্শে ফ্যাসিষ্ট।

আর একটা দিকের দৃশ্যও চমৎকার, যদিও সেদিকে অনেকেরই নজর পড়েনি। বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম যুগে তার ঘাঁটীস্বরূপ সমিতিগুলোকে যেমন বে-আইনী করা হয়েছিল, এ যুগে তেমনি ইংরেজ সরকার কমিউনিষ্ট পার্টিটাকেও বে-আইনী করলে। অর্থাৎ এ যুগের গুপ্তবিপ্লবী দল হল কমিউনিষ্ট পার্টি। আর জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা এদিক দিয়ে ইংরেজ সরকারের সগোত্র হয়ে দাঁড়ালো। ফলত সারা পৃথিবীর কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে একশিবিরে সমবেত হল মুসোলিনী, হিটলার, গান্ধী, ইংরেজ সরকার ও জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা। অবস্থাটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকট তখনো হয়নি, কারণ কমিউনিষ্ট আন্দোলন তখনো প্রাথমিক অবস্থার ওপরে ওঠেনি।

যাই হোক, আর একটা যুদ্ধ যে পাকছে, তা বৃটেনের কার্যকলাপ দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। বৃটেনে সামরিক কারখানায় ভিড় করা বিপজ্জনক, কারণ বিমান আক্রমণে সহজেই বিধ্বস্ত হওয়ার ভয় আছে, সুতরাং সামরিক কারখানা কানাডা প্রভৃতি নিরাপদ ডোমিনিয়নে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

যুদ্ধ বাধলে যত ইস্পাতের প্রয়োজন, তার সংস্থান হওয়া কঠিন বলে, ইস্পাতের কাজ যতটা পারা যায় কাঠ দিয়ে চালাবার জন্যে ভারতের বনবিভাগ ডেরাডুনে মজবুত এবং দীর্ঘস্থায়ী কাঠ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে,-এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে "ট্রিটেড টিম্বার" মজুত করছে। তার জন্যে রেলওয়েতে কাঠের স্লিপারের বদলে লোহার স্লিপার ব্যবহারের পরীক্ষা শুরু করেছে। এই পরীক্ষা করতে গিয়েই বিহিটায় প্রকাণ্ড ট্রেণ-দুর্ঘটনা হয়ে গেছে। এই সময়ে লক্ষ্ণৌয়ে এক একজিবিসনে ৮০ ফুট স্প্যানের এক কাঠের পুল দেখানো হয়েছিল।

কয়লার খনি বন্ধ হয়ে দক্ষিণ ওয়েলসের খনি এলাকায় বেকার সমস্যা ভয়াবহ হয়েছিল, ক্রোরপতি নিউফিল্ড এক ট্রাষ্ট করে খনিগুলো চালু করেছে। সে কয়লার পশ্চিম ইউরোপের বাজারে জায়গা করতে দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লাকে ভারতের দিকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। বাংলা বা বিহারের কয়লা রেলে বম্বেতে নিয়ে যেতে যা খরচ লাগে, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে জাহাজে বম্বেতে কয়লা নিতে যে তার চেয়ে খরচ কম হয়, একথাও এই প্রথম শোনা গেল। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে এও শোনা গেল যে বাংলা-বিহারের কয়লা যেরকম নির্মম ভাবে তোলা হচ্ছে, তাতে মাত্র ৩০০ বছরের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে, সুতরাং কয়লার উৎপাদন কমানো দরকার। উঠলো কোল কনজারভেশনের ধুয়ো। স্কীমও হল। এসব হল "লণ্ড রেঞ্জ প্ল্যান।"

ওদিকে ইউরোপে ফ্যাসিজমের জয়যাত্রা চলেছে। ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ ও দখল করেছে। স্পেনের রিপাবলিকান সরকারের বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট জেনারেল ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহ করেছে। ইটালী ও জার্মাণী তাকে প্রকাশ্যে সাহায্য দিচ্ছে। জার্মাণী তার আগামী যুদ্ধের তোড়জোড় নিয়ে স্পেনে "ড্রেস রিহার্স্যাল" দিচ্ছে, নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাঙ্ক-বিমান-বোমার পরীক্ষা চালিয়েছে।

হিটলার অষ্ট্রিয়া দখল করেছে। লীগ অফ নেশনকে কেউ আর মানে না। এর পর হিটলার হয়ত তার প্রাক্তন কলোনী দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার দাবী করে বসবে। তার কলোনীর ক্ষিদে মেটাবার জন্যে ইংরেজ তাকে চায়নীজ ইষ্টার্ণ টার্কিস্তান দখল করার লোভ দেখাচ্ছে। বৃটিশ সাংবাদিক পিটার ফ্লেমিং পিকিং থেকে ভারত পর্যন্ত হাঁটা পথে এসে তার বিবরণ লিখেছেন। এক জার্মাণ বৈজ্ঞানিক ডক্টর ফ্লেচনার (নামটা ঠিক মনে নেই) ল্যানচাউ থেকে কাশগড় পর্যন্ত হাঁটা রাস্তা গোপনে সার্ভে করে' ৮০০টা ম্যাগনেটিক ষ্টেশন বসিয়ে কানস্যু-চিংঘাইয়ের চীনা মুসলমান নেতা মা-চান কর্তৃক গ্রেপ্তার ও বন্দী হয়েছিলেন, কাশগড়ের বৃটিশ বাণিজ্যদূতের তদ্বিরে মুক্ত হয়ে তিনি ভারতে এসে ভারত সরকারের ব্যবস্থায় সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার সহযোগে ঐ পথের ম্যাপ প্রস্তুত করছেন। নোবেল প্রাইজের মতন একটা ন্যাশান্যাল প্রাইজের প্রবর্তন করে' হিটলার তাঁকে ঐ প্রাইজ দিয়েছেন। আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্ব কোণে জার্মাণী এক বিমানঘাঁটী বানিয়েছে। জার্মাণ পর্বতারোহী দল নাঙ্গা পর্বত অভিযান করেছেন। হিটলারের কলোনীর ক্ষিধে মেটাবার সঙ্গে সঙ্গে

রুশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় জার্মাণীকে বসিয়ে ভারতের সীমান্ত নিরাপদ করাও ছিল বৃটেনের উদ্দেশ্য।

কিন্তু হিটলারের আসল লক্ষ্য ছিল ইউক্রেণ। হিটলার ইউক্রেণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন, ঐ দেশটাকে কমিউনিষ্টদের হাত থেকে মুক্ত করে আমরা সোনা ফলাতে পারি। উত্তরে ষ্টেলিন বক্তৃতা করেন, আমাদের আলুক্ষেতে শূয়োরে নাক ঢোকালে আমরা তার থোব্‌না ভেঙ্গে দোব।

'৩৬ সালে নতুন শাসনবিধিতে রুশিয়ায় প্রোলেটারিয়ান ডিক্টেটরশিপের প্রত্যক্ষ শাসন ব্যবস্থার স্থলে সর্বাঙ্গসুন্দর খাঁটী পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। তার তৃতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার কাজ প্রচণ্ড বেগে চলেছে। মস্কো-ব্লাডিভোষ্টক রেলের সমান্তরাল ডবল লাইন গ্রেট-নদার্ণ রেলওয়ে তৈরী হয়ে গেছে। ফিনল্যাণ্ডের পাশ দিয়ে বাল্টিক ও হোয়াইট সীকে সংযুক্ত করে ষ্টেলিন ক্যানাল তৈরী হয়েছে। নাবসামর্থের বহর হয়েছে দুনিয়ার সেরা। বিমান বহরও হয়েছে বিরাট।

রুশিয়াকে ধ্বংস করে কমিউনিজমের মূলোৎপাটনের সখ ধনবাদী সাম্রাজ্যবাদী মাত্রেরই আছে, বৃটেন চায় জার্মাণীকে দিয়ে সে কাজ সারতে, নিজের সাধ্যের ওপর তার ভরসা ছিল না। রুশিয়া তার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে তার ইউরোপীয় সীমান্তের সকল দেশের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করেছে। বৃটেনের ঘোষিত নীতি ফ্যাসিজমের বিরোধী এবং গণতান্ত্রিক। ফ্যাসিজমের অভ্যুত্থানের পর হিটলারের হাতে তার উৎকট পরিণতি দেখে রুশিয়া বার বার বৃটেন ও ফ্রান্সের কাছে কালেক্‌টিভ সিকিউরিটি বা যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছে, আর বৃটেন বরাবরই বলে এসেছে এখনও সে প্রয়োজন জরুরী হয়নি এখনো তার সময় আসেনি।

প্রাচ্যে জার্মাণীর সঙ্গে জাপানের অ্যান্টি কমিউনিষ্ট প্যাক্ট হয়েছে। রুশিয়া তার পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে সাইবিরিয়া সুরক্ষিত করেছে, পৃথক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, আর জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত চীন সরকারের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করেছে এবং তাকে সাহায্য করছে।

আমেরিকা জাপানের দিকে লক্ষ্য রেখেছে, কিন্তু সর্বত্রই অস্ত্রশস্ত্র বিক্রীর সুযোগ পুরো মাত্রায় নিচ্ছে, আমেরিকার ক্রোরপতি মালিকদের কারবারের ধুম লেগে গেছে।

* * *

কাগজ পড়ি, নোট করি, অগম দত্তের সঙ্গে আলোচনা করি।

নতুন আই-বি অফিসারও যেন আমার সঙ্গে আড্ডা মারা নিয়মিত রুটিন করেছেন। আই-বি অফিসার হিসাবে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন তো বটেই, সাধারণ পুলিসও তাদের ভাল চোখে দেখে না। মুসলমান বলে হিন্দুদের পর, অথচ মুসলমানরাও তাদের কাদিয়ানী বা আহমদিয়া বলে, কাফের বলে। লোকটা নতুন দারোগা, শিক্ষিত এবং বয়েস কম। সম্ভবত একটু পড়াশুনোর অভ্যাসও আছে। আর ধর্মের ব্যাপারে এরা গোঁড়া মুসলমানদের বিরোধী সংস্কারপন্থী, প্রগতিশীল। হয়ত কালচার্ড ভদ্রলোকদের সঙ্গে সম্পর্ক বাৰ্জত জীবনে আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটু সুখ পায়।

হিন্দুদের মধ্যে যেমন ব্রাহ্ম বা রিফর্মড হিন্দুরা গোঁড়ামির বিরোধী এবং প্রগতিশীল,

মুসলমানদের মধ্যে ওরা ঠিক তেমনি। গোঁড়ারা বলে, হজরৎ মহম্মদ শেষ নবী, তাঁর পরে আর কোন ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ আসবেন না। ওরা বলে, যুগে যুগে আরো ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ আসবে। বস্তুত কাদিয়ানী হজরৎ আহম্মদ, হজরৎ মহম্মদের পরবর্তী নবী।

আমার সঙ্গে ওঁর আলাপ জমলো এই সব ধর্মকথা নিয়ে। উনি বলেন, পৌত্তলিকতাটা জ্ঞানের অনুন্নত অবস্থার পরিচায়ক, আর উন্নততর জ্ঞান হচ্ছে একেশ্বরবাদ। আমি বলি, তার চেয়ে উন্নত, পরিপূর্ণ জ্ঞানের পরিচয় নিরীশ্বরবাদে।

তিনি বলেন ধর্মের কথা, আমি বলি বিজ্ঞান ও বস্তুবাদের কথা। তাঁকে নিয়েও সময় কাটে মন্দ নয়।

কিছুদিন এমনি একটু শান্তিতে কাটছে, হঠাৎ একদিন অগম দত্তের বদলীর অর্ডার এসে হাজির, অন্যত্র ভিলেজ ইন্টার্ণমেণ্ট। কিছু টাকা জমিয়ে ফেলেছিলুম, ভাগ করে অর্ধেক অগম বাবুকে দিলুম। তিনি চোখ কপালে তুলে বলেন, এতগুলো টাকা কেমন করে জমালেন? আমি বলি, সংসারধর্ম করবেন না, কেমন করে জানবেন?

যাই হোক, দু'চার দিন পরেই জানা গেল, আর এক গোলমেলে মাল আমার ঘাড়ে চাপানোর জন্যেই অগম বাবুকে সরানো হয়েছে। তাঁর জায়গায় এলেন শর্বরী ভট্টাচার্য। মেদিনীপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট খুন করে ফাঁসি গিয়েছিলেন যে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, ইনি তাঁর ভাই! শীর্ণকায় তরুণ, হরদম সিগারেট ফোঁকে, কথা প্রায় কয় না, একটু মুখ টিপে হাসে। ভাত-টাত কিছুই খেতে চায় না, একটু চা খায়, আর সিগারেট চায়।

বুঝিয়ে শুঝিয়ে দুটো ভাত খাওয়ানো আর সিগারেট যোগানো, এই এক নতুন কাজ আমার জুটলো, আর সর্বদা চোখে চোখে রাখা এবং রাত্রে দুশ্চিন্তা, পাছে নবজীবনের মতন গলায় ফাঁস লাগায়। আমার শান্তি আবার শিকেয় উঠলো।

আমি দারোগা সাহেবকে বললুম, এই পাগলকে এখানে পাঠানো হয়েছে কি নবজীবনের মতন করে মারবার জন্যে? যদি তেমন একটা কিছু ঘটে, আমার চেয়ে যে আপনার অবস্থা কাহিল হবে, সেটা বুঝছেন?

দারোগা সাহেব ভীতু লোক, আমার অভিজ্ঞতা এবং সদিচ্ছার ওপর তাঁর বিশ্বাসও আছে। সুতরাং তিনি ওর সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে শুরু করলেন, ম্রিয়মান এবং abnormal behaviour।

আমি ওকে বোঝাতে লাগলুম, তোমার পাগলামীটা ভাণ, বাড়ী যাওয়ার মতলব। কিন্তু পুলিশের সামনে পাগলামী কর ক্ষতি নেই, আমাকে ধোঁকা দিও না। আমি দারোগা সাহেবকে দিয়ে রিপোর্ট দেওয়াচ্ছি পাগল বলে', এ সময় যদি তোমার বাড়ী থেকে একটু চেষ্টা করে "অন্তত home internment" চেয়ে, তাহলে হয়ত বাড়ী যেতে পারবে। ইতিমধ্যে একটু খাওয়া দাওয়ার দিকে মন দাও, সিগারেট কমাও, নইলে সত্যিই পাগল হয়ে যাবে।

ও একটু মৃদু হাস্য সহকারে বললে, বাড়ী থেকে চেষ্টা করছে। ব্যাপারটা বুঝলুম এবং মনে মনে একটু আশ্বস্ত হলুম। ইতিমধ্যে কাদিয়ানী আই-বি অফিসারও বদলী হয়ে গেছেন। নতুন আই-বি অফিসার আমাদের এখানে আসেন না। দারোগা সাহেবকে বলে দিয়েছি তাঁকে বুঝিয়ে দিতে যে, নতুন ডেটিনিউ-এর জন্যে তাঁরও দুশ্চিন্তা হয়েছে।

কিছুদিন এইভাবে চলার পর হঠাৎ আমার মতিগতি বোঝার জন্যে কলকাতা থেকে

সিনিয়র আই-বি ইন্সপেক্টর হেম সেন গোপালগঞ্জে হাজির। আমার সম্বন্ধে সাধারণ মামুলী কিছু কথাবার্তা হল। আমি তাঁকে সরাসরি চার্জ করলুম, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ভাইকে এখানে পাঠানো হয়েছে তাকে মারবার মৎলবে। তিনি সব সম্বন্ধে সব কথা নোট করে নিলেন, দারোগা সাহেবের সঙ্গেও আলোচনা করে গেলেন। কিছুদিন পরেই শর্বরীর হোম ইন্টার্ণমেন্টের অর্ডার এসে গেল। নিঃশব্দে একগাল হেসে ও বিদায় নিলে। আমার মনটাও একটু হালকা হল।

*　　　*　　　*

এখন একবার কংগ্রেসী মন্ত্রীদের একটু খবর নেওয়া যাক। মন্ত্রিত্ব নেওয়ার পর কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পরামর্শে পুলিসের ইউনিফর্ম করা হয়েছিল খদ্দরের। তাতে লোকের চোখে খদ্দর চাপা দেওয়া হল বটে, কিন্তু পুলিসের লাঠি তাতে ঢাকা পড়লো না। কোট্টাপটমে একটা "সামার স্কুল" হয়েছিল, সেটা পুলিস লাঠি চালিয়ে ভেঙ্গে দিলে। জহরলাল আর্তস্বরে বলে উঠলেন, "এই লাঠিই গভর্ণমেন্টের প্রতীক। এই লাঠি চার্জ বিদ্যুৎ চমকের মতন এক মুহূর্তে বুঝিয়ে দিয়েছে, এ শাসনতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ কেমন, আর মাদ্রাজের মন্ত্রিমণ্ডলীর অবস্থাই বা কেমন।" (ইণ্ডিয়ান রিভিউ– জুলাই '৩৭)।

দিন দিন লোককে বাক্য-বোঝানোর প্রয়োজন বাড়তে লাগলো। একটা নতুন বিভাগ খুলে মিষ্টার রামনাথনকে করা হল মিনিষ্টার অফ ইনফরমেশন। ১৭।৭।৩৭ তারিখের "ষ্টেটসম্যানে" বলা হল,—এ রকম মন্ত্রী জার্মানীতে গোয়েবল্‌সের বিভাগ ছাড়া আর কোথাও নেই।" অবশ্য লর্ড রীডিংয়ের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত অনেক দেশেই এরকম মন্ত্রী আছে,—আজকের ভারতেও।

বিহারের লীগনেতা ইউনাস ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকারকে অভিনন্দন করে বললেন, "এ অভিনন্দন মামুলী 'কেতা' নয়, কারণ আপনাদের এবং আমাদের পার্টির লক্ষ্য একই রকম। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, ইংরেজরা চায় ভারত স্বাধীন হোক এবং স্বশাসনের কাজে তাদের সঙ্গে প্রেম, বিশ্বাস ও সদিচ্ছার বন্ধনে আবদ্ধ অংশীদাররূপে কাজ করুক। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করাতে বৃটিশের এই সদিচ্ছা এবং বিশ্বস্ততাই প্রমাণিত হয়েছে।' (ঐ— ২৭।৭।৩৭)।

বস্তুত বৃটিশ স্বেচ্ছাচারতন্ত্র যে গণতান্ত্রিক মুখোস পরে শাসন চালায়, মোটা মাইনে ঘুষ খেয়ে যারা সেই মুখোস রচনায় সাহায্য করে, লর্ড মার্লের ভাষায়, তারাই 'বিশ্বাসযোগ্য' লোক, যাদের ওপর "নির্ভর" করা যায়, যাদের সঙ্গে "বন্দোবস্ত" করা যায়।

এই কদর্যতা ঢাকা দেওয়ার জন্যে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বেতন করা হল ৫০০ টাকা এবং জহরলাল এক বক্তৃতায় বললেন, "এক দিকে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পূর্বতন মন্ত্রীদের বেতনের একটা ভগ্নাংশ মাত্র গ্রহণ করছেন, আর এক দিকে বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা বিরাট বেতন নিচ্ছেন। প্রোফেসর, ভাইসচ্যান্সেলারেরা পর্যন্ত মোটা বেতনটাকেই তাঁদের জ্ঞানের বহরের মাপকাঠিরূপে দেখেন।

"যাদের লজ্জা সরম আছে, তারা এই গরীবের দেশে মোটা মাইনে নেওয়া বা গরীব মজুর খাটিয়ে মোটা মুনাফা করার মতন ব্যাপারগুলোকে নোংরা ব্যাপার মনে করে।

একজন গরীব বৈজ্ঞানিক বা শিক্ষকের সামাজিক মূল্য একজন ধনী ব্যবসায়ী বা মোটা বেতনের কর্মচারীর চেয়ে অনেক বেশী। একজন জমিদার বা তালুকদারের মোটা আয় থাকতে পারে, কিন্তু তার সামাজিক মূল্য কতটুকু?"

কিন্তু বিদেশী ইংরেজ এবং তাদের দিশী অনুগৃহীত গোলামদের মোটা মাইনের তুলনায় কংগ্রেসী মন্ত্রীদের ৫০০্ টাকা বেতনটার চমৎকারিত্ব অন্যান্য দেশের মন্ত্রীদের বেতনের তুলনায় মোটেই চমৎকার নয়।

লিওনার্ড এম শিফের লেখা "দি প্রেজেন্ট কণ্ডিশন অফ ইণ্ডিয়া" নামক বই থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করে '৩৯ সালের মার্চ মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' "গরুর গাড়ীর দেশে রোলস রয়েস শাসন" নাম দিয়ে যে বিবরণ প্রকাশ করেছিল, তাতে প্রকাশ, "জাপানের প্রধান মন্ত্রীর বেতন ৮০২্ টাকা এবং মন্ত্রীদের বেতন ৪৪০্ টাকা।" (সুতরাং ভারতের প্রাদেশিক মন্ত্রীদের ৫০০্ টাকা বেতন মোটেই চমকপ্রদ নয়)

অন্যান্য সরকারী চাকরীর বেতনের তুলনা অবশ্য সত্যিই চমকপ্রদ।

"আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মাসিক বেতন ১৭,০৬২্ টাকা।

ভারতের বড়লাটের মাসিক বেতন ২১,৩৩৩্ টাকা।

আমেরিকার মন্ত্রীদের বেতন মাসিক ৩,৪১২্ টাকা।

ভারতের বড়লাটের পারিষদদের মাসিক বেতন ৬,৬৬৭্ টাকা।

নিউইয়র্কের গভর্ণরের মাসিক বেতন ৫,৬৮৭্ টাকা।

ভারতের মধ্যপ্রদেশের গভর্ণরের মাসিক বেতন ৬,০০০্ টাকা।

পাঞ্জাবের গভর্ণরের মাসিক বেতন ৮,৩৩৩্ টাকা।

আমেরিকার প্রধান বিচারপতির বেতন ৪,৫৫০্ টাকা।

বাঙ্গালাদেশের প্রধান বিচারপতির বেতন ৬,০০০্ টাকা।

জাপানের সেক্রেটারীদের মাসিক বেতন ৩৭৫্ টাকা।

ইণ্ডিয়ার চীফ সেক্রেটারীর মাসিক বেতন ২,১৫০্ টাকা।

বাঙ্গালাদেশের চীফ সেক্রেটারীর মাসিক বেতন ৫,৩৩৩্ টাকা।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বেতন ভারতের বড়লাটের বেতনের অর্ধেক।"

২০।৭।৩৭ তারিখের "ষ্টেটসম্যানে" লর্ড উইলিংডন বলছেন, "ভালো ভালো বৃটিশ যুবকদের ভারতে যাওয়া উচিত। কারণ আমাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে বড় বড় চাকুরী এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে উন্নতি ভারতে যেমন সহজ, তেমন আর কোথাও নয়।"

সিমলা ১৬।৭।৩৭ তারিখের "ষ্টেটসম্যান" একটা খবর দিয়েছিল, "সিংহলে ষ্টেট কাউন্সিলের স্পীকার গভর্ণরের এক বাণী পাঠ করে ব্যবস্থা পরিষদকে জানালেন যে, পুলিসের কোন কোন গ্রেডের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি গভর্ণর বাহাদুর খুব দরকার মনে করেন। অতএব এই বাণীটি পাঠ করবার পর গভর্ণরের বিলটি ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক পাশ হয়েছে বলেই ধরতে হবে।"

কংগ্রেসী মন্ত্রীরা নিঃশব্দে ঐ সব অবস্থা গলাধঃকরণ করে "ডে টু ডে অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন" চালিয়ে চললেন, কারণ তা ছাড়া তাঁদের উপায় ছিল না। তা ছাড়া মন্ত্রিত্ব নেওয়ার পর তাঁরা গভর্ণরের বিশ্বাসও অর্জন করেছিলেন! তাঁদের '৩১ সালের করাচীর "জনগণের

মৌলিক অধিকার" সংক্রান্ত প্রস্তাব তাঁরা শিকেয় তুলেছিলেন, যদিও নির্বাচনী ইস্তাহারে সেটা রাখা হয়েছিল।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন, "বর্তমান অবস্থায় কোন চরমপন্থী কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভবও নয়, যুক্তিযুক্তও নয়। বর্তমান শাসনবিধির আওতায় কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কিছু সেবাধর্ম ছাড়া (ameliorative measure) আর কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আর চরমপন্থী কর্মসূচী গ্রহণ করতে গেলে কংগ্রেস ঘরই ডেকে আনা হবে, [illegible] পক্ষ তার সুযোগ নেবে।" (অর্থাৎ তার চেয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় পন্থা [illegible], [illegible] ভাল।)

যাই হোক, ক্রমে [illegible] শাসনবিধির অনেক গুণ। [illegible] মন্ত্রিসভা সম্পর্কে মহাত্মাজি বললেন,—"স্বাধীনতার দিক থেকে শাসনবিধিটা মোটেই সন্তোষজনক নয়, কিন্তু এতে স্বৈরাচারের শাসনের স্থলে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়েছে। [illegible] লোকের ভোটাধিকার এবং তাদের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা দান [illegible] ব্যাপারটাকে ও ছাড়া অন্য কিছু বলা চলে না।

ইতিমধ্যে আসামে এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন মন্ত্রিসভা [illegible] ভাঙাচুটিতে [illegible] হয়েছে, কিন্তু মন্ত্রিত্বের গায়ে আঁচড় লাগেনি। দলবদল দেখে বিরক্ত হয়ে "স্টেটসম্যান" সম্পাদক ২৮।৮।৩৭ তারিখে লিখলেন, "হয় সরকার নেতাদের সমর্থকদের চিট করবার ব্যবস্থা করুক, না-হয় ইস্তফা দিক।"

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিলিটারী বাজেট আলোচনা উপলক্ষে আসফ আলি বলেন,—"বৃটিশ সৈন্যের জন্যে ভারত যে বছরে মাত্র বারো কোটি টাকা ব্যয় করে, অর্থসচিবের এই কথা ঠিক নয়। ভারতে তাদের বেতন প্রভৃতিতে ব্যয় হয় ১৯ কোটি টাকা এবং বিলাতে তাদের পেন্সন প্রভৃতিতে ভারত সরকারকে আরো ১১ কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়। হেড কোয়ার্টারে ১৯১৪ সালে ছিল ৯৪ জন বড় সাহেব, আর বর্তমানে (১৯৩৭) তাদের সংখ্যা হয়েছে ১৭৪। সারা ভারতবর্ষে এমন বড় সাহেবদের সংখ্যা [illegible] ৭০০০।" (স্টেটসম্যান—৫।৯।৩৭)।

সর্দার সন্ত সিং বলেন, "যে কাজে একজন ইউরোপীয় কর্মচারীর বেতন [illegible] মাসিক ৭২০্ টাকা, ঠিক সেই কাজে নিযুক্ত একজন ভারতবাসীর বেতন মাত্র ৫০্ টাকা।"

যাই হোক, নতুন শাসনবিধি প্রবর্তনের এক বছর পরে তার ফলাফল বিশ্লেষণ করে প্রোফেসর শ্রীরাম শর্মা '৩৮ সালের "মডার্ণ রিভিউয়ে" এক প্রবন্ধ লেখেন। তাতে অন্যান্য কথার মধ্যে বলা হয়,

"রুল্‌স অফ বিজনেস অনুসারে গভর্ণরই মন্ত্রিমণ্ডলীর সভাপতি। তিনি দপ্তরহীন মন্ত্রী নন, কিন্তু বিশেষ মন্ত্রী। (minister extraordinary) পুলিস বিভাগের সংগঠন ও শৃঙ্খলা, রাজদ্রোহ দমন, প্রদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা প্রভৃতি সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনিই চূড়ান্ত নির্দেশ দেন। তাঁর সুপারিশ ভিন্ন গোয়েন্দা বিভাগ কাউকেই কোন কথা জানাতে পারে না (অর্থাৎ মন্ত্রীদেরও)। ভারতীয় সার্ভিসে অফিসারদের সম্পর্কেও চূড়ান্ত ক্ষমতা তাঁর হাতেই। এ সব ব্যাপার ছাড়াও, মন্ত্রীদের যেটুকু কাজকর্মের স্বাধীনতা আছে, সে ক্ষেত্রেও তিনিই বৈধ কর্তা—সকল বিষয়েই মন্ত্রীদের পরামর্শ দেন।

"গভর্ণর যতদিন চান, মন্ত্রীরা কাজ করবেন ততদিন মাত্র এবং গভর্ণর যতদিনই মন্ত্র দেন

রাখবেন, যতদিন তারা দেখবেন, মন্ত্রীদের কাজকর্মের ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কোন ক্ষতি বা দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বিপন্ন হবে না।"—(সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বলতে আমরা মুসলমানই বুঝি, কিন্তু সব চেয়ে ছোট সম্প্রদায়, অথচ সব চেয়ে বড় কায়েমী স্বার্থ, বৃটিশ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার কথাটা যে "সংখ্যালঘিষ্ঠ" নামেই চলে, এটা বুঝি না—না. র.)।

"মন্ত্রীরা তাঁদের কাজকর্মের জন্যে দায়ী নন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যদি মন্ত্রীদের কাজকর্মের ফলে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিপন্ন হয়, তা হলে গভর্ণর স্বয়ং সে ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব গ্রহণ করবেন, আর মন্ত্রীরা "বহাল তবিয়তে" অন্যান্য বিভাগের শোভা বর্ধন করবেন"—('৪৬ সালের দাঙ্গার সময়ে এই '৩৫ সালের শাসনতন্ত্রের রাজত্ব চলছে 'র' এই কথা মনে থাকলেই গভর্ণর বারোজের নিস্ক্রিয়তা বুঝতে পারা যাবে—দায়ী সুরাবর্দী নন, বারোজ—না. র.)।

"গভর্ণর যা খুশী আদেশ করবেন, যা খুশী অর্ডার করবেন, মন্ত্রীদের কোন কথা বলার অধিকার নেই, ব্যবস্থা পরিষদেরও কোন প্রশ্ন করার অধিকার নেই।"

'৩৭ সালের শেষে যখন ফেডারেশন (কেন্দ্রীয় সরকার) প্ল্যান নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছে তখন কথা ওঠে যে, বাংলাদেশের শাসন পরিষদটাকে ১০ জন মন্ত্রী নিয়োগ করে এবার নতুন রূপ দেওয়া হবে। ঐ সম্পর্কে "ত্রিবেণীতে" ডাঃ ভ সীতারামিয়া এক প্রবন্ধ লেখেন এবং '৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মডার্ণ রিভিউ তা থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করে। তাতে সীতারামিয়া বলছেন,

'দশজন মন্ত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা একটা সাময়িক উত্তেজনার ব্যাপার। কংগ্রেসের নজর কোনদিকে যাও যে কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে স্থাপিত করার জল্পনা-কল্পনা চলছে না, তা আমরা জোর করে বলতে পারি না। কিন্তু আমরা যদি ওদিকে যাই, দু দিন পরেই দেখতে পাব যে, আমরা 'পাওয়ার" হস্তগত করতে পারিনি, "পাওয়ারই" আমাদের হস্তগত করেছে।

যুক্ত প্রদেশের মন্ত্রী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত "অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের" প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ কালে বলেছিলেন, 'আমার এগারো মাসের মন্ত্রিজীবনের অভিজ্ঞতার ফলে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি যে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আগে আমার যে সংশয় ছিল, সত্যি। কিন্তু। কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী কিছু খুচরো কাজ করতে পেরেছে, যাতে লোকের হতাশ প্রাণে একটু আশার সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু মূল ব্যাপারটা ঠিক আগের মতই আছে। বর্তমান শাসনবিধির আওতায় কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী সে বিষয়ে কিছুই করতে পারবে না।" (মডার্ণ রিভিউ, নোট, জুলাই, '৩৮)।

মোট কথা, দোর্দণ্ডপ্রতাপে বৃটিশ শাসনই চললো। বিভাগীয় আই-সি-এস কর্তারাই সকল বিষয়ে মন্ত্রীদের "পরামর্শ" দেন, আর মন্ত্রীরা তাঁদের লিখিত কাগজগুলোতে সই করে "অর্ডার" পাশ করেন। শাসনসংক্রান্ত সকল "অর্ডার"ই গভর্ণরের আদেশ বলে গণ্য করাই হচ্ছে আইন। শাসনবিধির ৯৩ ধারা অনুসারে গভর্ণরের প্রত্যক্ষ শাসনে তফাৎ এই মাত্র যে, তখন আর বিভাগীয় কর্তাদের লেখা কাগজগুলোতে সই করার জন্যে মোটা মাইনের ঘুষখোর মন্ত্রী থাকে না।

*   *   *   *   *

এদিকে শর্বরী ভট্টাচার্যের হোম ইন্টার্নমেন্টের পর ক্রমে দু' এক জন করে ডেটিনিউ ছাড়ার খবর কাগজে বেরোতে শুরু করেছে। আমারও ইন্টারভিউ হয়ে গেছে, সুতরাং মনটা উতলা হয়েছে। '৩৭ সাল শেষ হয়ে আসছে। ছ'বছর পার হল,—আর কত দিন।

সামনের বহুকালের জমা ঘন অন্ধকার যেন পাতলা হয়ে আসছে আর মুক্ত জীবনের একটা কাল্পনিক 'ছক' ধীরে ধীরে মনের পটে রূপ নিচ্ছে। নিরবচ্ছিন্ন বন্ধ্যা চিন্তার অবসান, শ্রমবহুল জীবন-সংগ্রামের আনন্দময় ক্লান্তি, সে যেন এক নবজীবনের কাল্পনিক আবিষ্কার।

পাগল মন দুর্দমনীয় বেগে ছুটে চলেছে — বর্তমান পেছনে পড়ে রয়েছে।

ক'বছর ষ্টেটসম্যান নিয়ে ডুবে আছি — দেশে প্রোপাগাণ্ডার চাহিদা চলা হয়ে গেছে। দেশী কাগজওয়ালারা ক'জন ওদের আমার মতন চেনে? এক পয়সা দামের একখানা ছোট্ট কাগজ (Layman) প্রত্যহ ষ্টেটসম্যানের দোপাট্টা ফাঁস করে দিতে পারবে। হকাররা 'লে' 'লে" বলে হেঁকে ফাঁক করে বসবে, কল্পনা করে আমার এখনই অগ্রিম ফূর্তি হয়ে গেল।

এই সব পরিকল্পনা নিয়ে দিন কাটছে বেশ একা। অবশেষে সত্যিই একদিন "পালে বাঘ পড়ল" —হঠাৎ একদিন আমার মুক্তির আদেশ এসে গেল। নিশ্চিন্ত কলকাতায় এসে দেখলুম নতুন কলকাতা — আমার সব পরিকল্পনা হঠাৎ যেন যেচে চটে একাকার হয়ে গেল।

লটবহর নিয়ে শিয়ালদা ষ্টেশনের প্লাটফরমে নেমে দিশেহারা হয়ে ভাবছি কোথায় গিয়ে ওঠা যায়, এমন সময়ে হঠাৎ পাশ থেকে এক "সাহেব" জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাবেন? বললুম, তাই ভাবছি। তিনি বললেন, তাহলে চলুন আপাতত আমাদের হোটেলে। মনে হল স্বয়ং ভগবান হোটেলের গাইডরূপে এসে আমার ছিদ্রে রবে দিলেন। বললুম, চলুন।

গাইড নিজেই কুলি ডেকে মাল তুলে নিয়ে আগে আগে চললেন—আমি পতিব্রতা স্ত্রীর মতন নীরবে অনুগমন করলুম এবং গিয়ে উঠলুম, কাছেই, "শান্ত নবাস" হোটেলে। একবেলা থাকা খাওয়ার চার্জ এক টাকা। বললুম, কেবল কিন্তু কাল সকালে চলে যাবো একটা "বাসা" ঠিক করে। "বাসা" অর্থাৎ একটা আশ্রয় খুঁজে বার করতে হবে।

আমার সঙ্গে ও কারণ একজন এ-এস-আই 'Escort' দিয়েছিল। মুক্তির সঙ্গে আমার উপর আর এক অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, যেখানে থাকবে, স্থানীয় থানায় ঠিকানা জানাতে হবে এবং সপ্তাহে একবার হাজিরা দিতে হবে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করতে হলে আই-বি'র ডি-আই-জির অনুমতি নিতে হবে—ইত্যাদি। Escort-এর সঙ্গে স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশ-অফিসে গেলুম আমার আগমনবার্তা জানাতে। নতুন অর্ডার সম্বন্ধে অসুবিধের কথা বললুম। তাঁরা বললেন, টেকনিক্যালিটি নিয়ে কোন গণ্ডগোল হবে না। যদি কোন কুমৎলব না করি, তাহলে দরকার হলেই অসুবিধে ঘুচিয়ে দেওয়া হবে।

ফিরে এসে খেয়ে দেয়ে আশ্রয় খুঁজতে বেরোলুম। এরিয়ান ফ্যাক্টরী নামক ট্রাঙ্কের দোকানে ত্রৈলোক্য বাবুর কাছে গেলুম, যাঁর কাছে ছ'বছর আগে একটা envelope case-এ চাবি বন্ধ করে T N T-র ফরমুলা ও প্রস্তুত প্রণালীর টাইপ-করা কপি রেখে, আসছি বলে সরে পড়েছিলুম। সেটা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে তিনি তৎক্ষণাৎ সেটা র‍্যাকের মাথা

থেকে পেড়ে দিলেন। চাবি খুলে কাগজটা বার করে তাঁকে দেখিয়ে সেইখানেই পুড়িয়ে ফেললুম। তিনি বললেন, এই রকম কিছু আন্দাজ করেই আমি সরিয়ে রেখেছিলুম।

তারপর অবস্থা শুনে তিনি এক মেসে এক ঘর ঠিক করে এলেন, পরের দিন সকালে আসতে হবে। পরদিন সকালে লটবহর নিয়ে যেতেই মেসের বাবুর জোড় হাত করে বলে কিনা, আমরা গরীব মানুষ, মাপ করবেন। আমার পরিচয় জেনে ওরা ঘাবড়েছে।

মুস্কিল মন্দ নয়। ত্রৈলোক্য বাবুর দোকানেই লটবহর রাখা হল, এবং তিনি হ্যারিসন রোড পটুয়াটোলার মোড়ে এক তেতলা খালি বাড়ীর—বাড়ীটা মেরামত হচ্ছিল—দরোয়ানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তেতলার এক ১৫ ডিগ্রি কোণওয়ালা তেকোণা ছোট্ট ঘরে আমাকে তুলে দিলেন। টেম্পোরারী, ভাড়া মাসিক ৭৲ টাকা। মন্দ হল না।

কিন্তু ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কল্যাণে অনেক রাস্তা চিনতে পারি না, হাতড়ে বেড়াতে হচ্ছে। পাড়াড়া, যাদের কাছে যেতে চাই, তারা কে কোথায় আছে জানি না, কে আছে, কে নেই তাও জানি না। বেশ এক হাসি কান্নার মেশামিশি লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। দু'এক জায়গায় ঘুরে দেখলুম, নতুন দলাদলি এবং স্লিপ-সিষ্টেম গড়িয়েছে। অবশ্য, স্বদেশী হাঙ্গামার অফিসগুলোতে যাইনি, আর কন্যাদায় বা বন্যাদায়ের মত যাঁরা ডেটিনিউদের নিয়ে যেসব নেতা ঘটা শুরু করেছেন, তাদের কাছেও যাইনি।

তেত্রিশ

ঘটনাগুলোর কোনটা আগে, কোনটা পরে, সাল-তারিখ সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে। আমি শুধু ঘটনাগুলো সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি। আমাদের ছাড়ার অল্প দিন পরেই লীডারদের চেষ্টায় একসঙ্গে ১১০০ ডেটিনিউ ছাড়া হল এবং তাদের ছ'মাসের জন্যে একটা সরকারী ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হল, যাতে তারা ঐ সময়ের মধ্যে নিজেদের রুজি রোজগারের একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারে।

শরৎ বসুর বাড়ীতে একটা "রিসেপশনের" ঘটা করা হয়েছিল, এবং সবাইকে ভালো-রকম জলযোগ করানো হয়েছিল। তারপর থেকে তাঁর বাড়ীতে রোজই ডেটিনিউদের গতায়াত এবং জলযোগ চলতে লাগলো। ডেটিনিউদের হিল্লে করার জন্যে শরৎবাবু যে সোসাইটি তুলেছিলেন, তার পরিণতি হল "খ্যাতির বিড়ম্বনায়।" কিছু ডেটিনিউর কিছু ব্যবস্থা করার পর বেশ কিছু টাকা জলযোগে খরচ করে তাঁকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে হয়েছিল

দেবেনদা তখন কর্পোরেশনে ডেপুটি লাইসেন্স অফিসার, গরুর গাড়ীর লাইসেন্সের মালিক। সার্কাসের মোড়ে তাঁর অফিসে গিয়ে দেখা করলুম। তিনি তখন সিঁথিতে নতুন বাড়ী করেছেন। আমাকে নিজের মোটরে নিয়ে গিয়ে বাড়ী দেখিয়ে ছেড়ে দিলেন একটা মাঠের ধারে নিয়ে এসে বললেন, মাঠ পার হলেই দমদম রোডের বাসের রাস্তা পাবে। আমার সমস্যার কথা যেন তাঁর মাথায় ঢুকলো না, যেন আমি কলকাতায় তাঁর বাবার জমিদারীতে এসে উঠেছি। মনটা খিচড়ে গেল

ক্যাম্বিসের জুতোজোড়া চাকরকে দিয়ে এসেছিলুম, বাকি পুরোনো জুতোজোড়া রাস্তায় এমনভাবে ছিঁড়ে গিয়েছিল যে, তাকে রাস্তাতেই পরিত্যাগ করে এবং চড়া রবারের জুতো

কিনে পরে নিয়েছিলুম। রবারের জুতো আমার কপালে এই প্রথম। কিন্তু কপালে সইলেও পায়ে সইলো না, ফোস্কা পড়েছে এবং সে ফোস্কা ছিঁড়েছে। সেই জুতো নিয়ে মাঠের মধ্যে সুবিস্তৃত কাদার আড্ডায় গিয়ে পড়লুম। জুতোসুদ্ধ পা কাদার মধ্যে অন্তর্হিত হল। জুতোর ভেতর জল ও কাদা পদদলিত হয়ে আর্তনাদ করতে লাগলো। আমারও কান্না পেলো। কাঁকরও ঢুকেছে এক কুড়ি—"wearer best knows"

মাঠ পার হয়ে গলি রাস্তা দিয়ে ঘুরে-ফিরে মাইল দেড়েক হেঁটে দমদম রোডে বাস ধরে ঝাঁকানি খেয়ে হাঁপিয়ে শ্যামবাজারে পৌঁছে ট্রাম ধরলুম। কিন্তু হ্যারিসন রোডে এসে রবারের দুর্ভাগ্য-জোড়াকে বগলে না পুরে আর হাঁটতে পারলুম না।

তারপর গেলুম সুরেশ মজুমদারের সঙ্গে দেখা করতে,—বর্মণ স্ট্রীটে "আনন্দবাজার" অফিসে। তাঁর ঘরে ঢুকে অপ্রতিভ হয়ে বেরিয়ে এলুম। তিনি দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে টেলিফোনে কারো সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে কথা কইছেন, এবং টেবিলের অপরদিকে দুই ভদ্রলোক ঠোঁটে কামড় মারছেন।

আগে হলে এমন অবস্থায় পিছিয়ে আসতুম না, কিন্তু গত ৮'টা বছরে বোধ হয় মনের শিরদাঁড়াটা একটু "তেউড়ে" গেছে। তা ছাড়া, শুনেছি সুরেশবাবু এখন মস্ত বড়লোক। তার ওপর সেখানে বেকার চাকরীর-উমেদারের ভিড়ও আছে। সম্ভ্রমুক্ত বেকার ডেটিনিউকে চিনতে না পারলেও দোষ হয় না।

সাত-পাঁচ ভেবে বাইরে থেকে একটা স্লিপে নামটা লিখে এক ভদ্রলোককে অনুরোধ করলুম, সেটা সুরেশবাবুর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে। তিনি রুক্ষ ভাবে বললেন ঘরে অন্যলোক রয়েছে—অপেক্ষা করুন। আমি লাঙ্গুল সংগ্রহপূর্বক বাইরে উঠোনে এসে দাঁড়ালুম।

খানিক পরে ভদ্রলোক আমাকে ডেকে স্লিপ ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনার কি দরকার, লিখে দিন।" আমি অপ্রতিভ হয়ে বললুম, "আচ্ছা, আজ থাক, আমি আর একদিন আসবো।' বলে চলে আসছি, ভদ্রলোক কি ভেবে আবার ডেকে বললেন,—একটু দাঁড়ান। আদেশ মনে করেই দাঁড়ালুম। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

এমন সময় হঠাৎ বাইরে থেকে এক পাক্কা সাহেব জোয়ান হুড়মুড় করে এসে ঢুকলেন, এবং আমাকে দেখে চশমার ভেতর থেকে চোখ দুটো কপালে তুলে চাপা গলায় প্রায় চীৎকার করে উঠলেন "একি। নারানদা? কোথা থেকে এলেন? কবে এলেন?" বলতে বলতে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন। আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললুম, "স্লিপ দিয়েছি।" শুনে তিনি এমন ভাবে "আচ্ছা" বলে খটখট করে ভেতরে ঢুকলেন, মনে হল, আজ আর তিনি সুরেশবাবুকে আস্ত রাখবেন না। টালার স্বর্গীয় সাম্যবাজ্য পার্টির কমরেড বাদল গাঙ্গুলী!

আধ মিনিট পরেই সুরেশ বাবু বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে সত্যিই খুশী হয়ে অনুযোগের সুরে বললেন, "অমন করে স্লিপ দিলে' কেন? আমি বলি, কে না কে।" আমি মৃদু হাস্য সহকারে বললুম, "আমি কিন্তু চাকরীর জন্যে আসিনি।" তিনি আমার হাতে একটা অন্তরটিপুনী দিয়ে বললেন, "জানি জানি!" ব্যাপারটা দাঁড়ালো প্রায় একটা লভ্ অ্যাফেয়ার। একটু আনন্দ হল।

তারপর আমাকে চা-টা খাইয়ে বসিয়ে রেখে গল্প-সল্প করে বাড়ী ফেরার পথে আমাকে গাড়ী করে হ্যারিসন রোডের বাসায় নামিয়ে দিয়ে গেলেন। লিখে খাওয়ার কথা শুনে বললেন, "বড় কঠিন ব্যাপার, দেখুন চেষ্টা করে। রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে একটু ব্যঙ্গাত্মক রস-রচনা এক-দেড় কলম করে' লিখতে পারলে, আনন্দবাজার" থেকে হয়ত মাসে দুটো লেখায় গোটা কুড়ি টাকা রোজগার হতে পারে।"

তখন "যুগান্তর" নতুন বেরিয়েছে, ওয়েলিংটন স্ট্রীটে অফিস। যতীন ভট্টাচার্য এডিটর, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বোধ হয় 'অ্যাসিষ্ট্যান্ট' এডিটর এবং প্রবোধ সান্যাল যোগ দিয়েছেন, রবিবারের সাহিত্য বিভাগে।

একদিন সেখানে হানা দিলুম। সিঁড়িতে দেখা হল প্রবোধ সান্যালের সঙ্গে। তিনি বললেন, "আমি এখানে আছি, লেখা টেখা দিতে পারেন।" আমি বললুম, "পকেটেই কিছু লেখা রয়েছে।" তিনি বললেন, বেশ, দিয়ে যান, দেখবো অখন।" খুশী মনে দুটো লেখা দিয়ে এলুম। তার একটা "সিঁদুরে গোবরে' নামে বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটা ছোট ছোট প্যারা। এই নামে "ফিচার" লেখা এই প্রথম।

রবিবারের কাগজে সেটা ছাপা হয়ে গেছে দেখে আনন্দ হল। সোমবারে অফিসে গেলুম। প্রবোধবাবুর সঙ্গে দেখা হলে হাসিমুখে বললুম, "এরকম তো কথা ছিল না।" তিনি টাকার বন্দোবস্তের কথা বলছি মনে করে' বললেন, "লেখাটা আমার ভালো লাগলো বলে ছেপে দিয়েছি।" বুঝলুম, তাঁর টাকা দেওয়ার হাত নেই। অন্য লেখাটা ফিরিয়ে নিয়ে চলে এলুম। আশা নিরাশার দোটানায় মনটা যেন কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

যে কটা টাকা ছিল, ফুরিয়ে আসছে, ভয়ে তাড়াতাড়ি দশ টাকা দিয়ে একখানা ট্রামের মান্থলী টিকেট কিনে ফেলেছি। ভোজন হচ্ছে "যত্রতত্র" পাইস হোটেলে। অল্পদিনের মধ্যে পেটব্যথা শুরু হল, এবং দেখা গেল রীতিমত "কলিক পেন।" একদিন হ্যারিসন রোডের তেতলার ঠোটার মধ্যে যন্ত্রণায় ধড়ফড় করছি, হঠাৎ যতীন দত্ত এবং ত্রৈলোক্য বসু খোঁজ নিতে এসেছেন। আমার অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে তাঁরা এক ট্যাক্সি ডেকে আমাকে তুলে নিয়ে হাজির করলেন মেডিক্যাল কলেজে। সেখানে অনেক চেঁচামেচি করে মরফিয়া ইঞ্জেকসন নিয়ে ফিরে এলুম।

যতীন দত্তের সঙ্গে সুরেশ মজুমদারের কংগ্রেস অফিসে দেখা হত—তিনি সুরেশবাবুকে আমার কথা বলেছেন। সুরেশবাবু শুনে আমার কাছে এসে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমায় নিয়ে গিয়ে তুললেন তাঁর গৌরাঙ্গ প্রেসের চিন্তামণি দাস লেনের তেতলা বাড়ীর ওপরকার হল-ঘরে। সেখানে মাছের ঝোল ভাত বাড়ী থেকে এনে খাওয়াতে লাগলেন। পাঁচদিন ভালোই থাকলুম, এবং "ভাল হয়ে গেছি" বলে চলে এলুম। সুরেশ বাবু হাতের চেটো দুটো চিৎ করে বললেন 'Hopeless !" আমি বললুম, "আবার অসুখ হলে আসবো।

আবার একদিন উপেনদার কাছে গেলুম, সব বললুম। তিনি বললেন, "ঊনপঞ্চাশী লেখ।" আমি বললুম, "আপনার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?" তিনি খিঁচিয়ে উঠে বললেন, "লেখো না, যা লিখবে তাতেই হবে।"

আমি—"কি হবে?"

উপেনদা—"টাকা পাবে।"

আমি—"কে দেবে?"

উপেনদা—"আমি।"

আমি—"তাহলে তো আজই লিখবো।"

উপেনদা—"যাও, লিখে নিয়ে এস।"

ব্যাপারটা কি, জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, "অক্ষয় সরকার (সুভাষবাবুর ভাগ্নে) পিছনে লেগেছে, তার 'খেয়ালী'র (সাপ্তাহিক) জন্যে উনপঞ্চাশী লিখতে হবে। বলে, টাকা বেশী দিতে পারবো না, সামান্য দেব, মাসে চারটে ছোট উনপঞ্চাশী লিখতে হবে—নাছোড়বান্দা।"

আমার পকেটে একটা ছোট নোটবুক প্যাড থাকতো। আমি কলেজ স্কোয়ারের স্কুল কলেজের পিছনে ঘাস বনে বসে এক উনপঞ্চাশী লিখে নিয়ে বিকেলেই আবার তাঁর অফিসে গিয়ে দিলুম। হপ্তাখানেক পরে আবার যেতেই আমাকে দশটা টাকা দিলেন। লেখাটা খেয়ালীতে বেরিয়েছে উনপঞ্চাশী নামে, হবনাথ স কান্ত অক্ষুণ্ণ অবস্থায় প্রকাশ করে লেখা। লেখকের নাম উপেনদার দেওয়া, 'হলাহলানন্দ উপবাসনবীশ'।

আমার লেখা—তিনি নিজহাতে কপি করে ঐরকম ছদ্মনাম দিয়ে অক্ষয় সরকারকে দেন, আর তিনি উপেনদার লেখা বলে ছাপেন এবং টাকা দেন,—উপেনদা সে টাকা আমাকে দেন। এমনি এক মাস চললো। একটা অভাবনীয় অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

এই হল উপেনদার মনের আসল পরিচয়। আমার সমস্যার কথাটা যে তাঁর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল, সেটা এমনি করে বুঝে অবাক হয়ে গেলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, "অক্ষয়বাবু যেদিন জানতে পারবেনই, তখন কেমন হবে?" তিনি বললেন, "বেশ হবে, আর আমাকে লিখতে বলবে না, আমি বাঁচবো।"

যাই হোক, এমনি ভাবে পাঁচটা লেখা বেরোবার পর ষষ্ঠটা আর যথাসময়ে নিতে এলো না দেখে উপেনদা বললেন, "টের পেয়েছে। তুই বুঝি লোকের কাছে বলে বেড়িয়েছিস?"

আমি বললুম "এমন কাণ্ডটা দু'-এক জন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে না বলে পারা যায়?" বস্তুত আমার এমন স্ফূর্তি হয়েছিল যে, দু' এক জন করে' অনেক বন্ধুর কাছেই বলেছিলুম। আবার একবার সুরেশ বাবুর কাছেই গেলুম, "আনন্দবাজারে" লেখার ব্যবস্থার চেষ্টায়। তিনি বললেন, "ও চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে যদি আমার কথা শোনেন, আনন্দবাজারে যোগ দিন, আপনার জায়গা হবে। প্রথমে যত কমই দিক, আপনার খরচ চলে যাবে।" তখন মাখন বাবু (সেন) ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা কার্যত সর্বেসর্বা।

ভেবে চিন্তে ভিড়ে গেলুম। কিন্তু মাস দেড়েক পরে এক চিঠি লিখে দিলুম, "আর যাবো না, আমাকে যা দেবার, সেটা পাঠিয়ে দেবেন।" রাজনীতির যে সব আলোচনা ওখানে চলতো, মুখ বুজে শুনতে শুনতে অসহ্য হয়েছিল। কিছু দিনের সংস্থান সংগ্রহ হয়েছে, এই যথেষ্ট। লেখা পড়ার চেষ্টা ছেড়ে দিলেমেই আবার ঘুরতে হবে।

এর পর একদিন D I G, I. Bর কাছে চিঠি লিখে অনুমতি নিয়ে উত্তরপাড়ায় গিয়ে অমরদা'র (চট্টোপাধ্যায়) সঙ্গে দেখা করলুম। চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় তখন একজন বিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকলাবিদ। তিনি কলকাতায় আর্টিষ্ট সুধাংশু চৌধুরীর সহযোগে এক

আড্ডা খুলেছেন। তাঁর সঙ্গে কথায় কথায় বললুম, বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে ক'বছর গবেষণা করে তাঁর শিক্ষার এক নতুন পরিচয় আবিষ্কার করেছি—তিনি বস্তুবাদী, সমাজতন্ত্রবাদী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী—এবং একটা খসড়া লিখে রেখেছি, যেটা একটা পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু উপায় নেই।

তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে সব শুনে বললেন, এ বোধ হয় সজনীবাবু "শনিবারের চিঠি'তে' ধারাবাহিক প্রবন্ধ রূপে ছাপতে পারেন। তখন সেখানে ওর রীতিমত যাতায়াত ছিল, উনি আমাকে নিয়ে গিয়ে সজনীবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। বঙ্কিমবাবুর কিছু কোটেশন আওড়ালুম, শুনে তিনিও interested হলেন। বন্দোবস্ত হয়ে গেল, এবং ১৯৩৮ সালের গোড়ার দিকে বা ১৩৪৪ সালের শেষ দিকে "শনিবারের চিঠি"তে পরপর তিনটে প্রবন্ধ প্রকাশিত হল, "বন্দেমাতরম্ ও বঙ্কিমচন্দ্র', বস্তুবাদী বঙ্কিমচন্দ্র", "সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতাবাদী বঙ্কিমচন্দ্র।"

তখন আমি বৌবাজার ষ্ট্রীটে এক "মেস" নামক বোর্ডিং এর নীচের তলায় একটা অন্ধকার ঘর ভাড়া নিয়ে আছি, এবং মুচিপাড়া থানায় সাপ্তাহিক হাজিরাও দিই। সুতরাং সজনীবাবুকে বললুম, প্রবন্ধে আমার নাম থাকলে, কি জানি যদি restriction orderটা তাড়াতাড়ি উঠে যাওয়ার পক্ষে বাধা হয়, অতএব লেখকের নাম তিনি যা-খুশী একটা বসিয়ে দেবেন। তিনি নাম দিয়ে দিলেন "বস্তুতান্ত্রিক"।

আর আমার টাকার প্রয়োজনের কথাও বলেছিলুম, এবং তিনি তিনটা প্রবন্ধের জন্যে দশ টাকা করে ত্রিশটা টাকাও দিয়েছিলেন। তখন আমি নিলামেও ঘুরি, এবং খুব সাবধানে এক-আধটা অল্পদামের জিনিসও কেনাবেচা শুরু করেছি। এই ভাবে ক্রমে আবার এক ফার্ণিচারের ব্যবসা গড়ে উঠলো এবং লেখ টেখা শিকেয় উঠলো। প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত।

* * * *

'৩৭ সালে একদিকে মুসলমানদের কোন দাবী না মেনে জহরলাল বলছেন, দেশে মাত্র দুটো পার্টি আছে,—কংগ্রেস আর বৃটিশ সরকার, এবং তার ফলে মোসলেম লীগের শক্তি বাড়ছে, কংগ্রেসী মুসলমানরাও লীগে যোগ দিচ্ছে,—আর এক দিকে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মন জোগানোর জন্যে কংগ্রেস বন্দেমাতরম গানটাকে ছেটেছুঁটে একটা শ্লোগানমাত্রে পরিণত করার চেষ্টা করছে।

এইখানে কংগ্রেস নেতা দেওয়ান চমনলালের এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতি থেকে একটু পুরানো ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। '৩৭ সালে তিনি এলাহাবাদে গেলে জিন্না ও ফতিমা জিন্না কর্তৃক পুরাতন বন্ধুরূপে সস্ত্রীক নিমন্ত্রিত হন। খানা টেবিলে কথায় কথায় জিন্না বলেন, কংগ্রেস যদি লীগকে ৩৩% প্রতিনিধিত্ব দিতে রাজী হয়, তাহলেই তিনি জয়েণ্ট ইলেকটোরেট মেনে নেবেন। চমনলাল চমকিত হয়ে বলে ওঠেন, আপনি যদি জয়েণ্ট ইলেকট্রোরেট মানতে রাজী থাকেন, তাহলে কংগ্রেস আপনাকে ৩৩% কেন, ৫০% প্রতিনিধিত্ব দিতে পারে।

তারপর তিনি জিন্নার কথাটা প্রস্তাবাকারে লিখিয়ে নিয়ে মহাত্মাজীর কাছে সেটা দেন। তিনি মনে করেছিলেন মহাত্মাজী সেটা উৎসাহভরে গ্রহণ করবেন কিন্তু দেখলেন, মহাত্মাজী নীরবে সেটা পড়ে রেখে দিলেন এবং বললেন, পরে তিনি জবাব দেবেন।

তারপর মহাত্মাজী সেটা নেহেরুর কাছে দেন, এবং নেহেরু পত্রপাঠ সেটা প্রত্যাখ্যান করেন।

এর ওপর একদিকে '৩৭ সালে মোসলেম লীগের অধিবেশনে লীগের আদর্শরূপে গৃহীত হল ভারতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব—এবং বলা হল স্বাধীন ভারত হবে স্বশাসিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র, যার সংবিধানে মুসলমান এবং অন্যান্য সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সকল স্বার্থ ও অধিকার সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে '৩১ সালের করাচী কংগ্রেসে গৃহীত এবং '৩৭ সালের কংগ্রেস কর্তৃক স্বীকৃত জনগণের মৌলিক অধিকার সমূহও লীগ কর্তৃক গৃহীত হল। এতে লীগের ক্রমশঃ আরো শক্তি বৃদ্ধি হতে লাগলো।

আর একদিকে কংগ্রেসী শাসনের সমর্থকরূপে কিন্তু পৃথক ভাবে কৃষক ও শ্রমিকরা যে ক্রমশই জঙ্গী ও সংঘবদ্ধ হয়ে উঠছে, এ ব্যাপারটা কংগ্রেস হাইকমাণ্ড মহলের চক্ষুশূল হয়ে উঠছে। তারা তাদের রুজির লড়াইয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের ও কংগ্রেসের সাহায্য ও সমর্থন আশা করে।ফল হচ্ছে, ১৪৪ ধারা ও ১২৪ এ ধারার ব্যাপক প্রয়োগ তাদের ওপর চলছে। '৩৭ সালের ধর্মঘটে মোট ৬,৪৭,০০০ শ্রমিক যোগ দিয়েছিল, এবং মোট "কাজের রোজ" বন্ধ হয়েছিল ৯০ লক্ষ।

'৩৮ সালে বম্বেতে শিল্প-বিরোধ আইন বিধিবদ্ধ হয়,—তাতে শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার প্রায় নস্যাৎ করার জন্যে ব্যবস্থা হয়, মালিক-মজুর বিরোধ বাধলে এক সালিশী আদালতের মারফৎ মীমাংসার জন্যে চার মাস অপেক্ষা করতে হবে, এর মধ্যে ধর্মঘট করলে সেটা হবে বে-আইনী। বম্বে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে হরতাল ও প্রতিবাদ-সভা করে। পুলিস গুলী চালিয়ে সে সভা ভেঙ্গে দেয়, ১ জন নিহত ও বহু শ্রমিক আহত হয়। কংগ্রেসের তরফ থেকে কোনো নেতাই এর বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেন নি। তখন সুভাষবাবু কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট এবং সর্দার প্যাটেল কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের চেয়ারম্যান। সম্ভবত সর্দারজীর ভয়ে প্রেসিডেন্ট সুভাষবাবুও নীরব দর্শকই ছিলেন।

এখানে সুভাষবাবুর কথা অপরিহার্য রূপে এসে পড়ছে। বস্তুতঃ '৩৮।৩৯ সালের কংগ্রেসের ইতিহাসে সুভাষবাবুই ছিলেন কেন্দ্র বিন্দু। তার আগেকার পটভূমিকায় একটু বিশদ পর্যালোচনা প্রয়োজন।

রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স ও গান্ধী-আরুইন প্যাক্টের যুগে যখন কংগ্রেসের তথাকথিত স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভাঁটার টান শুরু হয়েছে, তখন সুভাষবাবু ইউরোপে ছিলেন। সেখানে তিনি বিখ্যাত ফরাসী ভারতবন্ধু মনীষী রোমা রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা করে তার বিবরণ '৩৫ সালের সেপ্টেম্বরে "মডার্ণ রিভিউ"তে লে[illegible]

সুভাষ বাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হলে [illegible] সংগ্রামে আপনার আগ্রহ কি শেষ হয়ে যাবে?"

রোলাঁ—"যে পদ্ধতিতেই হোক মুক্তি-সংগ্রাম চালিয়ে[illegible]

সুভাষবাবু—"কিন্তু কোন কোন ইউরোপীয় ভারত[illegible] বলেছেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে তাঁদের কৌতূহলের একমাত্র কারণ গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রাম পদ্ধতি।"

রোলাঁ—"আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হলে আমি দুঃখিত হব, কিন্তু তা'হলে কঠোর বাস্তব সত্যকে উড়িয়ে না দিয়ে নতুন পদ্ধতিতে সংগ্রাম অবশ্যই চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

কথাবার্তার এই বিবরণ দিয়ে সুভাষ বাবু বলছেন, "এই তো একজন আদর্শবাদী, যিনি আকাশে দুর্গ নির্মাণ করে বসে নেই, যার পা দুনিয়ার মাটিতে সংলগ্ন। এঁর কথায় আমার মনও সায় দেয়।"

তারপর সর্বজন নিন্দিত '৩৫ সালের শাসনবিধি প্রবর্তিত হল। সে শাসনবিধির প্রতি সুভাষবাবুর মনোভাব সহজেই অনুমেয়। তারপর সে শাসনবিধিকে কবর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস দেশে এক নতুন উৎসাহের সঞ্চার করেছিল, নির্বাচনে জয়লাভ করে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে পদাসন বরণ করে কংগ্রেস আবার সে উৎসাহ ব্যাহত করেছিল। তখনও কংগ্রেস কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করছিল, কেন্দ্রীয় সরকার সংক্রান্ত ফেডারেশন প্ল্যানটাই এ শাসনবিধির মধ্যে সবচেয়ে বড় শয়তানী, এবং সেটাকে বানচাল করার পক্ষে প্রদেশের কংগ্রেসী শাসন সাহায্য করতে পারবে।

কিন্তু ক্রমে যখন দেখা গেল কংগ্রেস কর্তাদের কেন্দ্রীয় গদী দখলের ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে, এবং লাটসাহেবের সেই স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়ে তারা সর্বতোভাবেই আগেকার সরকারের মতন লাঠি, গুলী এবং গাঁড়ার রাস্তাই নিয়েছেন, তখন জনগণের ক্ষুব্ধ রোষ আবার ধূমায়িত হতে শুরু করেছে। এই অবস্থায় দেশে ফিরে সর্বজনপ্রিয় নেতারূপে আসরে অবতীর্ণ হলেন সুভাষবাবু।

সুতরাং মহাত্মাজী '২৯ সালে লাহোরে জওহরলালকে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট করে যেমন ট্যাঁকে গুঁজেছিলেন, তেমনি সুভাষবাবুকেও ট্যাঁকে গোঁজবার মতলব করেই তাঁকে '৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট করেন। কিন্তু তাঁর সে মতলব যে ব্যর্থ হয়েছে, সেটা অচিরেই বোঝা গেল ফেডারেশন সম্পর্কিত ব্যাপারে।

মাদ্রাজ প্রদেশের একজন উচ্চতম স্তরের কংগ্রেস নেতা ফেডারাল প্ল্যান গ্রহণ করার পক্ষে প্রকাশ্য ভাবেই প্রচার শুরু করেছিলেন (বোধ হয় সত্যমূর্তি), এবং সুভাষবাবুও তাঁকে ধমক দিয়েছিলেন প্রকাশ্য ভাবেই।

কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের এবং মহাত্মাজীর ঘনিষ্ঠ মিলনধর ব্যারিস্টার কংগ্রেস নেতা ভুলাভাই দেশাই '৩৮ সালে বিলাতে স্যার ফ্রেডরিক হোয়াইটের সঙ্গে এই ফেডার্যাল প্ল্যান গ্রহণ সম্পর্কে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন বলে কাগজে এক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য কংগ্রেসের তরফ থেকে তার দায়িত্ব অস্বীকার করা হয়েছিল কিন্তু সেটার মূল্য বুঝতে কারো বাকি ছিল না।

'৩৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে রয়টারের খবর অনুসারে স্যার রাসব্রুক উইলিয়মস ম্যানচেস্টার গার্জিয়ানে লেখেন, "গত কয়েক মাসের মধ্যে কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের দক্ষিণপন্থী নেতাদের মনোভাব এতটা পরিবর্তিত হয়েছে, যাতে মনে হয় মহাত্মা গান্ধী এই ফেডারাল প্ল্যানটাকেও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মতই কার্যকরী করার জন্যে এগিয়ে আসবেন।"

তারপর সহকারী ভারতসচিব মুইরাণ্ডের সঙ্গে মহাত্মাজীর দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা চলে। এবং সেখানে মহাত্মাজীর খাস প্রাইভেট সেক্রেটারীর উপস্থিতি পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়।

সে গোপন আলোচনা সম্বন্ধে কখনো কেউ কিছু জানতে পারেনি, ঠিক যেমন ১৯৪৪ সালের গান্ধী-কেসী ষড়যন্ত্রের সাতদিনব্যাপী গোপন আলোচনার সম্বন্ধেও অদ্যাবধি কেউ কিছু জানে না।

এ অবস্থায় সুভাষবাবুর মতিগতির কথাটা যে মহাত্মাজীর মহা অস্বস্তির কারণ হয়েছিল, সেকথা বলাই বাহুল্য, যদিও সুভাষবাবু কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টরূপেও মহাত্মাজীর সুপার-নেতৃত্ব মেনেই চলছিলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে আর এক অভিনব ঘটনায় সুভাষবাবুর উপর মহাত্মাজীর প্রায় সকল আশাই ধূলিসাৎ হয়ে যায়। বিলেত থেকে একদল ভারত-বন্ধুর এক লিখিত আপোষ প্রস্তাব পত্রাকারে মহাত্মাজীর কাছে আসে, এবং মহাত্মাজী সে পত্র প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্রের হাতে দেন। কিন্তু সে পত্র কলকাতার এক কংগ্রেসী সংবাদপত্রে ছাপা হয়ে যায় (কোন্ কাগজে, তা মনে নেই) এবং মহাত্মাজী সুভাষবাবুর কাছে কৈফিয়ৎ চান। সুভাষবাবু বলেন, তাঁর টেবিলের ড্রয়ার থেকে চিঠিটা চুরি হয়ে গিয়েছিল। এতবড় গুরুত্বপূর্ণ চিঠি সম্বন্ধে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বিত হয়নি বলে মহাত্মাজী আগুন হয়ে ওঠেন।

যাই হোক্, কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের মতিগতির এই অধোগতি দেখে লোক যখন হতাশ হয়ে পড়ছিল, তখন হরিপুরা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টরূপে একমাত্র সুভাষবাবুই বামপন্থী প্রগতিশীল আওয়াজ বজায় রেখেছিলেন এবং ঠিক এই জন্যেই পরের বছর ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টরূপে বামপন্থীরা, কংগ্রেসী এবং কমিউনিষ্টিক কিষাণ-মজুরপন্থী কর্মীরা, যেমন সুভাষবাবুকেই মনোনীত করলে, ঠিক তেমনি মহাত্মা গান্ধী তার বিরোধিতা করে, পট্টভীসীতারামাইয়াকে দাঁড় করালেন।

কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই প্রথম, এবং তার ফলও হল অভাবনীয়। সুভাষবাবু (১৫৭৫ ভোট) পট্টভীকে (১৩৭৬ ভোট) পরাজিত করে ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। মহাত্মাজী মাহাত্ম্যের পরিচয় দিয়ে বললেন, "পট্টভীর পরাজয় আমার পরাজয়।"

সুভাষবাবুও মাহাত্ম্যের পরিচয় দিয়ে বামপন্থী সমর্থক ভোটারদের অভিনন্দিত করতে ভুলে গিয়ে ছুটলেন মহাত্মাজীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে—"মহাত্মাজীর আশীর্বাদ না পেলে এ জয়ে আমার আনন্দ নেই।" এই ভাব-বিহ্বলতাই পরবর্তী কালে হয়েছিল তাঁর সকল ব্যর্থতার মূল।

'৩৯ সালের ফেব্রুয়ারীতেই সুভাষবাবুর কর্মসূচী প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে—(১) ফেডারেশন গঠনকে বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা ; (২) দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলনকে প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব দেওয়া ; (৩) দরকার হলে যাতে ব্যাপক আইন অমান্য শুরু করা যায়, সেজন্যে একটা ভলাণ্টিয়ার বাহিনী তৈরী করে রাখা।

(এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে বলে দেওয়া দরকার, যেটা ভারতের অনেক রাজনৈতিক পণ্ডিতও জানেন না। সে হচ্ছে এই যে, "ইণ্ডিয়ান ন্যাশান্যাল কংগ্রেস" নামক *কাণ্ডটা চিরকালই বৃটিশ ইণ্ডিয়ার ব্যাপার, দেশীয় ইণ্ডিয়া বা নেটিভ ষ্টেটগুলোর সঙ্গে তার* কোনো সম্পর্ক নেই। *নেটিভ ষ্টেটের কংগ্রেসগুলো একথা না বুঝে "ইণ্ডিয়ান ন্যাশান্যাল* কংগ্রেসে"র অন্তর্ভুক্তির জন্যে যখনই দরখাস্ত করেছে, তখনই কংগ্রেস থেকে তাদের বলা

হয়েছে, আমাদের ও তোমাদের আন্দোলন এক নয়, আমাদের লড়াই স্বরাজের জন্যে, আর তোমাদের লড়াই প্রাথমিক নাগরিক অধিকারের জন্যে, যেটা আজও তোমরা পাওনি। আমাদের কিছু গণতান্ত্রিক অধিকার করায়ত্ত হয়েছে, কিন্তু তোমরা রাজাদের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী শাসনের অধীন। সুতরাং আমাদের কংগ্রেসে তোমাদের কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্তি চলবে না।)

ত্রিপুরী কংগ্রেসের অভিভাষণেই সুভাষবাবু বলেছিলেন, "আমাদের উচিত হবে, সরকারকে একটা চরমপত্র দেওয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাদের জাতীয় দাবী পূরণ করা না হলে সারা দেশ জুড়ে আইন অমান্য শুরু করা।...সকল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংঘ-প্রতিষ্ঠান, কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন, সকল চরমপন্থী দল মিলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ওপর একযোগে চরম আঘাত হানতে হবে।"

এদিকে তখন কংগ্রেসী-সরকার হয়ে উঠেছে একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর অল ইণ্ডিয়া ন্যাশান্যাল গ্যাড়াকল। ১০।৪৩৯ তারিখে সুভাষবাবু মহাত্মাজীকে এক চিঠিতে লিখলেন, "যতই আমরা বৈধতার স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে ভেসে চলবো, আর যতই আমাদের কর্মীরা সরকারী চাকরীর মজার লোভে মসগুল হয়ে থাকবেন দুর্নীতি ততই বেড়ে চলবে। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে ত্যাগ, সংগ্রাম ও দুঃখ বরণের ডাকই এর একমাত্র প্রতিষেধক। এই ডাক দিলেই যাচাই হয়ে যাবে, কে সাচ্চা, কে ঝুঁটো।"

'৩৯ সালের ২৭শে মে'র হরিজন পত্রিকায় মহাত্মাজী সুভাষবাবুর সঙ্গে তাঁর মতভেদ প্রকাশ করে লিখলেন,--"আমি মনে করি, আজ আর আমাদের ব্যাপক ভাবে অহিংস সংগ্রাম চালাবার ক্ষমতা নেই। হিংসাবাদীদের ওপর আমাদের প্রভাব নেই, অ-কংগ্রেসীদের ওপরও কোন হাত নেই, এমন কি, সকল কংগ্রেসীর ওপরও আমাদের হাত নেই...আর দুর্নীতির সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, যে রকম ব্যাপক দুর্নীতি চলছে, তা সহ্য করার চেয়ে আমার মতে, কংগ্রেসটাকে একেবারে কবর দেওয়াও ভাল।"

মহাত্মাজীর এই স্বীকারোক্তিও যেমন চমকপ্রদ, কার্যত কংগ্রেস থেকে সুভাষবাবুকে তাড়াবার প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রও ততোধিক চমকপ্রদ।

কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত করে থাকেন। পট্টভীকে পরাজিত করে মহাত্মাজীকে চ্যালেঞ্জ করে প্রেসিডেন্ট হওয়ায় সুভাষবাবু সম্পর্কে কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড সতর্কতা অবলম্বন করার জন্যে কোমর বেঁধেছিলেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসে গোবিন্দবল্লভ পন্থ এক প্রস্তাব আনলেন, "প্রেসিডেন্টের মনোনীত ওয়ার্কিং কমিটি মহাত্মাজী কর্তৃক সমর্থিত হওয়া চাই।" নির্বাচিত ডেলিগেটদের মধ্যে হাইকম্যাণ্ডের মেজরিটি ছিল, কাজেই এত বড় স্বেচ্ছাচারী প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

মহাত্মাজী তখন অন্যত্র কর্মব্যস্ত। সুভাষ-নিধনের ভার চেলাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি গিয়েছেন রাজকোটে অনশন করতে। রাজকোটের প্রজাদের শাসন সংস্কারের দাবী সম্পর্কে ঠাকুর সাহেব কয়েকটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেগুলো পালন করেননি। তাই তাঁর হৃদয় দ্রবীভূত করে প্রজাদের সদ্গতি করার জন্যে মহাত্মাজী আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন।

তবু যখন ঠাকুর সাহেবের হৃদয় দ্রবীভূত হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, কারণ প্রতিশ্রুতিগুলোর অর্থ সম্বন্ধে মহাত্মাজীর সঙ্গে ঠাকুর সাহেবের মতভেদ হল, তখন বড়লাট

লর্ড লিন্‌লিথগো প্রস্তাব করলেন, মতভেদের মীমাংসার ভার ফেডার‍্যাল কোর্টের চীফ জাষ্টিসের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। মহাত্মাজী এই টোপ গিলে অনশন ত্যাগ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসারায় লিন্‌লিথগোর সঙ্গে মহাত্মাজীর বোঝাপড়া হয়ে গেল, ফেডার‍্যাল প্ল্যান কার্যকরী করতে কংগ্রেসের আপত্তি নেই।

ওদিকে সুভাষবাবু ১৫ জন সদস্য মনোনীত করে ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করলেন। তার মধ্যে ১২ জন পুরানো এবং তিন জন নতুন। সুভাষবাবু তিন জন তরুণ বামপন্থী নেতাকে ওয়ার্কিং কমিটিতে গ্রহণ করে কমিটির মধ্যে কিছু "নতুন প্রাণ" ঢোকাতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু মহাত্মাজীর সমর্থন বা অসমর্থন নিয়ে ঘোঁট না পাকিয়ে, মহাত্মাজীর গা বাঁচিয়ে, হাই কম্যাণ্ডের দলের বারো জন পুরানো ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য একযোগে পদত্যাগ করলেন, "যাতে সুভাষবাবু সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে সম্পূর্ণ নতুন ওয়ার্কিং কমিটি তৈরী করে কাজ করতে পারেন।' মহাত্মাজী সাতেও নেই, পাঁচেও নেই।

সুভাষবাবু শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারলেন না, অভিমান করে প্রেসিডেণ্ট পদে ইস্তফা দিয়ে বসলেন। বড় লোকের ছেলে, ছোট ছেলে, চিরকালই সকলের আদর পেয়ে এসেছেন, অভিমান জিনিসটা অস্থি মজ্জায় শক্ত হয়ে বসেছে। সেই অভিমান তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিলে, আর কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড এ সুযোগ তাকে কদর্য ভাবে আঁকড়ে ধরে কাজ হাসিল্ করে নিলে।

যে মাসে কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মিটিংয়ে সভাপতির পদত্যাগপত্র বিবেচিত হল। সাধারণ লোকের বিক্ষোভ হচ্ছে, সভাপতির পুনর্বিবেচনার জন্যে পদত্যাগ পত্রটা ফেরৎ পাঠানো। সুভাষবাবুকে সে চান্স না দিয়েই পদত্যাগ পত্রটা গৃহীত হয়ে গেল।

শুধু তাই নয়, পাছে নূতন সভাপতি নির্বাচন নিয়ে হাইকম্যাণ্ডের চান্স ফসকে যায়, সে জন্যে সম্পূর্ণ অবৈধ ভাবে ঐ মিটিংয়ে নূতন সভাপতিরূপে রাজেন্দ্রপ্রসাদের নাম প্রস্তাবিত এবং গৃহীত হয়ে গেল। সরোজিনী নাইডু ছিলেন ঐ সভার সভানেত্রী। লজ্জার মাথা খেয়ে তিনি বললেন, "অবৈধতার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার দায়িত্ব নিয়েই আমি এই নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে অনুমতি দিলুম, কারণ প্রেসিডেণ্টের পদ একদিনও খালি রাখা উচিত হবে না।"

কেউ জিজ্ঞাসা করলো না, প্রেসিডেণ্টের পদ খালি রাখতেই বা হবে কেন?—নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হওয়ার আগে পর্যন্ত সুভাষবাবুকেই তো কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করা যেতে পারতো এবং পুরানো ওয়ার্কিং কমিটিও সেই ভাবেই ততদিন বহাল থাকতে পারতো। কিন্তু "চান্স" যখন পাওয়া গেছে, তখন তার পূর্ণ সুযোগ নেওয়ার জন্যে সকল বৈধতা, সকল শোভনতা, সকল রেওয়াজ বা নজির বিসর্জন দিয়েই কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড সুভাষবাবুকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করে সটকাট করলেন।

কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টের দায়িত্ব ছেড়ে সুভাষবাবু "ফরোয়ার্ড ব্লক" সংগঠন করে আসন্ন যুদ্ধের সুযোগে কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের আপোষ প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়ার বন্দোবস্ত করলেন। জুলাই মাসে তিনি এক "লেফট কনসোলিডেশন কমিটির" প্রকাশ্য বিক্ষোভ প্রদর্শনে নেতৃত্ব

করে কংগ্রেসের "মাস্ অ্যাকসন" বর্জনের চেষ্টার বিরোধিতা করলেন। কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের অনুমতি ব্যতীত কেউ কোন গণ-আন্দোলন করতে পারবে না, এমনি একটা প্রস্তাব কংগ্রেসের কর্তারা পাশ করেছিলেন, বিক্ষোভ তারই বিরুদ্ধে। সুতরাং শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সুভাষবাবুকে তিন বছরের জন্যে কংগ্রেসের "অফিস" বা কর্তৃপক্ষীয় পদ গ্রহণের অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হল।

তিনি তখনও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন, এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গের শাস্তি মেনে নিয়ে সে পদ পরিত্যাগ করতে সম্মত হলেন না। সুতরাং কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড বাংলায় এক "এড হক" কংগ্রেস কমিটি গঠন করে পট্টভী সীতারামাইয়াকে করলেন তার প্রেসিডেন্ট, এবং সেক্রেটারী হলেন সুভাষবাবুর পরম বন্ধু বিপ্লবী নেতা সুরেন ঘোষ। অর্থাৎ "যুগান্তর" বিপ্লবী দলও সুভাষবাবুকে বর্জন করলেন।

সুভাষবাবু কিন্তু তাঁর প্রাদেশিক কমিটি চালিয়েই চললেন। ফলে বাংলায় দুটো কংগ্রেস কমিটিই চললো। কোন রকম গণ সংগ্রাম আর চলতেই পারে না, কংগ্রেসের এই হাল হল। সারা ভারতের কংগ্রেস অবস্থা এই রকমই। কংগ্রেসও নতুন কিছুই করবে না, ফরোয়ার্ড ব্লকেরও কিছু করার ক্ষমতা নেই, একমাত্র হাইকম্যাণ্ডের আপোষ নীতির বিরুদ্ধে প্রচার ছাড়া।

এদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আসন্ন। হরিপুরা কংগ্রেসেই সুভাষবাবুর নেতৃত্বে এক প্রস্তাব পাশ হয়েছিল, বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারত তো অংশ গ্রহণ করবেই না,—উপরন্তু ভারতের জনবল ও সম্পদ ঐ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে নিয়োজিত করায় সর্বপ্রকারে বাধা দেবে।

কিন্তু যুদ্ধ যখন এসেই পড়লো, তখন কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড বৃটিশ গভর্ণমেন্টের আপোষের গরজ বুঝে মহা সুযোগ উপস্থিত মনে করে আপোষের জন্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন, এবং সুভাষবাবুও তাতে বাধা দেওয়ার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন। রামগড়ে সুভাষবাবুর নেতৃত্বে আপোষ-বিরোধী কংগ্রেস এই চেষ্টারই ফল।

'৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃটেন হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পক্ষ থেকে বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে। প্রাদেশিক মন্ত্রীদের কথা কোন্ ছার, কংগ্রেসের কোন মাতব্বর, স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত পূর্বাহ্ণে জানতেই পারলেন না। কারো সঙ্গে কোন পরামর্শ করার কোন প্রয়োজন বা গরজ বড়লাটের নেই, তিনিই সর্বে-সর্বা, কংগ্রেসী-মন্ত্রীরা যাত্রার দলের ভীম, প্রমাণ হয়ে গেল।

যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যথাশাস্ত্র "ভারত-রক্ষার" নামে অর্ডিন্যান্সও জারি হয়ে গেল। কংগ্রেস মানে যেমন গান্ধী, তেমনি ভারত মানে বড়লাট, প্রমাণ হয়ে গেল। ওদিকে বৃটিশ পার্লামেন্টেও চট করে এক আইন পাশ করে ফেলা হল—"গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যামেণ্ডমেন্ট অ্যাক্ট"—যাতে ভারতের বড়লাটের হাতে শাসনবিধি-নির্বিশেষ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হল, তিনি যদৃচ্ছভাবে শাসনবিধি-বিরোধী আদেশ-নির্দেশ চালাতে পারবেন। নানাবিধ নতুন বিশেষ ক্ষমতাও তাঁর হাতে দেওয়া হল। ভারত সরকারের গণতান্ত্রিক ওড়না উড়ে গিয়ে বে-আব্রু স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের কদর্য মূর্তি প্রকট হল। কংগ্রেস বেকুফ বনে গেল।

বড় বিপ্লবী দল জুটো তখন "গান্ধীবাদের বৈপ্লবিক ভূমিকা" হৃদয়ঙ্গম করে তার মধ্যে লীন হয়ে গিয়েছে। যুগান্তর দলের নেতা ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এক [illegible] ঘোষণা দ্বারা বিপ্লবী দল ভেঙ্গে দিয়েছেন। যুদ্ধ এল, কিন্তু বিপ্লব [illegible]?

চৌত্রিশ

যুদ্ধ আসছে, কাজেই কংগ্রেসকে [illegible] হবে, বিপ্লব দেশ স্বাধীনতার সংগ্রামে [illegible] কংগ্রেসের [illegible] বিপ্লবীদের পৃথক অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই, যুগান্তরের বৈপ্লবিক [illegible] দলের [illegible] কংগ্রেসী আন্দোলনে" পর্যবসান, অনুশীলন বা বিপ্লবী দলে [illegible] অনুশীলন দলের অবসরপ্রাপ্ত নেতা নরেন সেন সুভাষবাবুকে [illegible], দেশের বাইরে থেকে তিনি আর কিছু করতে পারবেন না, বরং বিদেশে [illegible] চেষ্টা করতে [illegible] কিছু করতে পারবেন। (অনুশীলন [illegible] ঘোষণা করে ভেঙ্গে দেন। [illegible] যেমন [illegible] ঘোষণা করে যুগান্তর দল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন)।

সুভাষবাবু তখন অনুশীলন [illegible] ফরোয়ার্ড ব্লক [illegible] পার্টির আদর্শ প্রচার করছেন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক প্রকাণ্ড জনসভায় সুভাষবাবু [illegible] — দল [illegible] জন্যে প্রস্তুত—আপনারা কি বলেন?—[illegible] অর্থাৎ দল যে বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত [illegible]।

[illegible] বিপ্লবের [illegible] গুপ্ত সংগঠন [illegible], [illegible] গুপ্ত কর্মপ্রচেষ্টা [illegible]। এই [illegible] লেনিনের এক [illegible] গুরুত্বপূর্ণ [illegible] দরকার। [illegible] দল [illegible] বিরোধী [illegible] 'মাস্ পার্টি' গঠনের [illegible] প্রচার করলেন [illegible] গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন ভেঙ্গে দিয়ে বিপ্লবের কথা বলা, [illegible] প্রকৃতপক্ষে [illegible] বিরোধী। কারণ গুপ্ত বিপ্লবী [illegible] আইনী কর্মচেষ্টা বাদে [illegible] বলুক, বিপ্লবী পার্টি নয়। কারণ বিপ্লবী [illegible] প্রকাশ্যে [illegible], সংকট [illegible] দেয় না। গণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ্য বিপ্লব প্রচার [illegible]। গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন অবশ্যই থাকা চাই না হলে [illegible] আন্দোলনে বিপ্লব প্রচার, না শুধু গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন ও [illegible], একক [illegible] বিপ্লব হতে পারে [illegible]।

লেনিনের এই কথা অনুসারে বিচার করলে দেখা যায়, আমাদের বিপ্লব আন্দোলনে গুপ্ত সংগঠন ও প্রচারের পিছনে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশ্য বিপ্লব প্রচার, বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলন ছিল না। বিপ্লবী দলগুলো যখন গোপনে বিপ্লব প্রচার করে, তখন তারাই প্রকাশ্য গণ-আন্দোলনে, কংগ্রেসী বিপ্লববিরোধী অহিংসা প্রচার করে। আবার সুভাষবাবু যখন ফরোয়ার্ড ব্লক করে' প্রকাশ্যে বিপ্লব প্রচার করেন, তখন সেই গণ-আন্দোলনের পিছনে কোন গুপ্ত বৈপ্লবিক সংগঠনের বালাই নেই।

ফলও অনুরূপই হয়েছে। '৩৪।'৩৫ সালে সরকারী সন্ত্রাসবাদে পর্যুদস্ত হয়ে যারা বলতো, আর একবার ইংরেজ যুদ্ধে জড়ালে দেখে নেবো, সত্যিই যখন আর একবার ইংরেজ

যুদ্ধে জড়িত হল, তখন কে কাকে দেখে নেয়, তার দিশা নেই, শুধু এ বলে আমায় দেখ, ও-বলে আমায় দেখ।

বাঙলা' লিখেছেন,—"যুদ্ধ লাগবার পর বড়লাটের সঙ্গে কথোপকথনের জন্য সর্বপ্রথম যে ভারতবাসী আহূত হন, তিনি মহাত্মা গান্ধী। (একটা পরম সান্ত্বনা ও গৌরবের কথা।) লাটপ্রাসাদ থেকে ফিরে এসে তিনি প্রথম ঘোষণা করেন যে, বিলাতের বড় গীর্জা, রাজ-প্রাসাদ, পার্লামেণ্ট বা ধ্বংস হয়ে যাবে, এ কল্পনা অসহনীয়। তিনি বিনা সর্তে ইংলণ্ডকে সাহায্যদানের পক্ষপাতী।"

এঁদের নেতৃত্বে স্বাধীনতার সংগ্রাম রূপে যে অভূতপূর্ব আন্দোলনের সম্ভাবনা অনুমান করে বিপ্লবী নেতৃত্ব ভেঙ্গে দেওয়া হল, তার পরিচয় দেবার আগে যুদ্ধটার প্রকৃতি ও তার পশ্চাদপটের একটু খোঁজ নেওয়া যাক, যাতে বুঝতে পারা যাবে "ইংরেজ যুদ্ধে জড়ালেই আমরা দেখে নোব" ব্যাপারটা এত সহজ এবং সরল নয়। ফাঁকতাল করে দেখে নেওয়ার চেয়ে বেশী কিছু ক্ষমতা আমাদের কারো ছিল না।

'৩৭ সালে ইটালীর সঙ্গে রুশিয়ার মৈত্রী সম্পর্ক ছিল, এবং ফ্রান্সের সঙ্গে তার পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তির কথাবার্তা শুরু হয়েছিল। ঐ সময়ে ফ্রান্সের প্রস্তাবে লীগ অফ নেশনস্ কর্তৃক আহূত হয়ে রুশিয়া লীগে যোগ দেয়। পারস্পরিক সাহায্য চুক্তিতে সকল রাষ্ট্রকেই, জার্মেনীকেও, যোগ দিতে ডাকা হয়। বৃটেন এই 'ইষ্টার্ণ লোকার্ণো" ব্যাপারটাকে আমলই দিলো না, এবং '৩৫ সালে ফ্রান্স-রুশ চুক্তি হলে বললো, পূর্ব ইউরোপ সম্বন্ধে তাদের মাথাব্যথা নেই। বলা বাহুল্য, সমগ্র ব্যাপারটা হিটলারের অভ্যুত্থান সম্পর্কে কার কি মনোভাব, তারই পরিচয়।

রুশিয়া লীগে ঢুকেছিল লীগকে পরীক্ষা করবার জন্যে, কাজেই সে তার নিজের ব্যবহারে কোন খুঁৎ রাখেনি। '৩৫ সালে ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করলে শুধু রুশিয়াই তার প্রতিবাদ করেছিল। তারপর স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জেনারেল ফ্রাঙ্কোর অভ্যুত্থানের সময়ে ইটালী ও জার্মেনী ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করে, এবং বৃটেন "নন ইন্টারভেনশন কমিটি" গঠন করে স্পেনের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার অজুহাতে প্রকারান্তরে ফ্রাঙ্কোকেই সাহায্য করে। কিন্তু রুশিয়া এদের মুখোশ ছিঁড়ে দেয়। তারপর জাপান মাঞ্চুরিয়া থেকে আবার খাস চীনকে আক্রমণ করে, এবং বৃটেন জাপানীদের পক্ষেই ওকালতী করে। '৩৮ সালে বৃটেন ও আমেরিকা জাপানকে তার প্রয়োজনীয় যুদ্ধ সংক্রান্ত সবপ্রকার মালমশলার শতকরা ৭৮ ভাগ সরবরাহ করেছে। রুশিয়া কিন্তু সাহায্য করেছে চীনকেই।

তারপর হিটলার অষ্ট্রিয়ার ওপর চড়াও করলে লিট্ভিনফ (রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী) বলেন, এইবার চেকোশ্লোভাকিয়ার পালা। এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিণতি মহাযুদ্ধ পর্যন্ত গড়াতে পারে। এর বিরুদ্ধে যে কোন সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা হলে আমরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

বৃটেন সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো। আবার '৩৮ সালের মে এবং আগষ্ট মাসে রুশিয়া ঐ রকম প্রস্তাব করে, কিন্তু সে প্রস্তাব কেউ গ্রাহ্য করে না। চেকোশ্লোভাকিয়াকে সাহায্য করবার জন্যে রুশিয়া তারপরও বারবার নানা প্রস্তাব করেছে,

সবই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে—শেষ পর্যন্ত পশ্চিমীরা মিউনিকে রুশিয়াকেই "একঘরে" করে জার্মেণীর সঙ্গেই পৃথক চুক্তি করলে। লর্ড লণ্ডনডেরী বললেন, "কমিউনিজমের বিরুদ্ধে আমরা যে কেন জার্মেণীর সঙ্গে চুক্তি করতে পারবো না, তা আমি বুঝতে পারি না।"

ঠিক এই সময়েই গান্ধী-কংগ্রেস বৃটেনের সঙ্গে গোপনে আপোষ বন্দোবস্ত করে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করছে, সুভাষবাবু আপোষ বানচালের মহড়া করছেন, আর বিপ্লবী দল গান্ধীবাদের বৈপ্লবিক ভূমিকা দেখছে।

তারপর '৩৯ সালের ১৫ই মার্চ জার্মেণী চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করলে রুশিয়া আবার যৌথ প্রতিরোধের প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হল। তারপর হিটলার মেমেল দখল করলো। পোল্যাণ্ড বললে, সে রুশিয়ার সঙ্গে একযোগে কাজ চালাতে সম্মত নয়। বৃটেন পোল্যাণ্ডকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলো। ওদিকে মুসোলিনী আলবেনিয়া দখল করলে। বৃটেন তখন রুমেনিয়া ও গ্রীসকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলো।

তারপর হিটলার প্রাগে চড়াও হল। রুশিয়া আবার যৌথ প্রতিরোধের প্রস্তাব করে ব্যর্থ হল। শেষ পর্যন্ত যখন পোল সরকার বললো, তারা কিছুতেই পোল্যাণ্ডের সীমানার মধ্যে রুশ সৈন্য ঢুকতে দিতে রাজী নয়, তখন রুশিয়া যৌথ প্রচেষ্টা ছেড়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় মন দিলে। রুশ-জার্মাণ অনাক্রমণ চুক্তি হয়ে গেল। পশ্চিমীরা চীৎকার করে উঠলো, এটা গণতন্ত্রের প্রতি রুশিয়ার বিশ্বাসঘাতকতা। যতদিন কিন্তু এরা কখনো রুশিয়াকে গণতান্ত্রিক বলে স্বীকার করেনি। এই রুশ-জার্মাণ অনাক্রমণ চুক্তি '৩৯ সালের আগষ্টের কথা।

তারপর সেপ্টেম্বরের প্রথমেই হিটলার যখন পোল্যাণ্ডের ঘাড়ে চেপে পড়লো, তখন বৃটেন জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ না ঘোষণা করে আর পারলো না। কারণ হিটলার একে একে ভার্সাই সন্ধির সব বাধন কেটে ফেলেছে এবং রুশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেছে, অর্থাৎ পশ্চিমাদেরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, সুতরাং এরপর তার শেষ দাবী হবে কলোনিগুলো ফিরে পাওয়া, এবং তার জন্যে বৃটেনের গায়েই হাত দেওয়া। কাজেই পোল্যাণ্ডকে রক্ষার নামে তাকে জার্মেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হতে হল।

এ পরিণতি তারা আশা করেনি। তারা মনে করেছিল, হিটলার তাদের সমর্থন, সাহায্য ও উৎসাহের "নুন খেয়ে" বুঝি তাদেরই "গুণ গাবে", তাদের লক্ষ্যস্থল সোভিয়েত আক্রমণ করে তাদের ডেপুটিরূপে তাদের মৎলবই হাসিল করবে। কিন্তু হিটলারের হিসেবটা ছিল অন্য রকম। পিছনে পশ্চিমাদের মারের শক্তি অটুট রেখে রুশিয়ায় গিয়ে বলক্ষয় করতে সে রাজী নয়। রুশিয়ার দিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কার নিরসন করে আগে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঘায়েল করে' মুঠোর ভেতর এনে, তারপরে রুশিয়ার যুয়াখেলায় নামা যেতে পারে, এই ছিল তার হিসেব।

আবার রুশিয়াও অনাক্রমণ চুক্তির ওপর ভরসা করে হিটলারকে বিশ্বাস করে বসে ছিল না, পোল্যাণ্ডের সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে অপেক্ষা করছিল, দরকার হলে হিটলারকে বাধা দেবে। সে দরকার শীঘ্রই দেখা দিলে, যখন বৃটেনের পোল্যাণ্ডকে সাহায্য করার বহরের ফলে পাঁচ দিনের মধ্যেই পোল সরকার দেশত্যাগ করে লণ্ডনে আশ্রয় নিলে, এবং হিটলারের নাৎসী বাহিনী পূর্ব পোল্যাণ্ডের "কার্জন লাইন" পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

তখন রুশিয়ার লালফৌজ পূর্ব পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করে ঐ 'কুর্জন লাইনে" এসে নাজীদের রুখলো--ব্যস, এই পর্যন্ত আর না। নাজীরাও থেমে গেল, এবং তারপর শুরু হল ওদের পশ্চিমে অভিযান। বৃটেন প্রচার শুরু করলে, গুপ্ত চুক্তি অনুসারে জার্মেণী ও রুশিয়া পোল্যাণ্ডকে ভাগাভাগি করে নিলে, এবং সে কথাটা আমাদের দেশেও চালু হয়ে গেল।

অনেকে বলতে লাগলো, লালফৌজ পোল্যাণ্ডে প্রবেশের পর পোল্য ও যুদ্ধে হেরেছে, -কিন্তু কথাটা ডাহা মিথ্যা। '৩৯ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বরের টাইমস" লিখলো, 'পোলিশ যুদ্ধক্ষেত্র সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।", রুশসৈন্য পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করেছে তার পরে।

১৯শে সেপ্টেম্বর এ কাগজেই লেখা হল, "গত সপ্তাহে যারা পোল্যাণ্ডে ভ্রমণ করেছে, তারা সবাই বলছে যে তারা দেখেছে, পোল সামরিক কর্মচারীরা তাদের পরিবার সহ ট্যাক্সি ও মোটর গাড়ীতে পালাচ্ছে। এটা সামরিক শক্তির অবঃপতনের চড়ান্ত নিদর্শন।"

২রা অক্টোবর ঐ কাগজ আবার লিখছে, 'রুশসৈন্য য এই পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে, এটা রুশিয়ার নিরাপত্তার জন্যে দরকার।"

এ তারিখের "ডেলি হেরাল্ড' লিখছে, "যুদ্ধের পঞ্চম দিনেই পোলিশ গভর্ণমেন্ট ওয়ারশ' থেকে পালাতে শুরু করে। সরকারের সমর্থকদলের লোকসহ সকল দলের আশ্রয়প্রার্থীরা বলছে, যদি গভর্ণমেন্ট না পালাতো, যদি সেনাপতিরা দেশে থাকতো, তাহলে হয়ত রুশিয়া এগিয়ে আসতো না।"

২৬শে অক্টোবর লর্ড হ্যালিফাক্স হাউস অব লর্ডস্ এ বলেন, ভার্সাই সন্ধি সভায় তৎকালীন বৈদেশিক সচিব লর্ড কুর্জন রুশ পোল সামানার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, রুশিয়া প্রায় সেই পর্যন্তই এগিয়েছে।" এ সীমানাই কুর্জন লাইন।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, ঐ লাইনের পূর্ব দিকের যে অংশটা পোল সরকার দখল করে রেখেছিল, সেখানকার বাসিন্দারা জাতিতে বেলোরুশ এবং ইউক্রেনীয়। তাদের বরাবরই দাবী ছিল রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়া, ঠিক যেমন আলসাস লোরেণের বাসিন্দাদের দাবী ছিল জার্মাণদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হওয়া।

জার্মাণ রণনীতির একটা বড় কথা হচ্ছে বাল্টিক সাগরের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা তাই হোর বেলিশা তখন বলেছিলেন, রুশিয়ার কাজটার অর্থ হিটলারের একটা বড় রকমের পরাজয়। তাই এস্তোনিয়ার সরকারও রুশিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল।

* * * * *

এখন দেখা যাক, '৩৯ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবরে আমাদের কংগ্রেস এবং কংগ্রেসী লীন বিপ্লবীরা কি করছেন।

ভারত রক্ষা ও সাধারণ নিরাপত্তার নামে আডিন্যান্স জারি হয়েছিল তরা সেপ্টেম্বর এবং নাগরিক স্বাধীনতার উপর হামলাও শুরু হয়েছিল নানা ক্ষেত্রে। এই অবস্থায় ১৪ই সেপ্টেম্বরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং থেকে ফতোয়া দেওয়া হল, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সদস্যেরা যেন আগামী অধিবেশনে যোগদান না করেন। কমিটির প্রস্তাবে বলা হল, 'বৃটেন ও ফ্রান্স ঘোষণা করেছে যে তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষা, এবং পরদেশ আক্রমণের অবসান ঘটানোর জন্যে, কিন্তু কথা ও কাজের অসঙ্গতির দৃষ্টান্ত ইদানীং প্রচুর দেখা যাচ্ছে। আমাদের দাবী হল আত্মনিয়ন্ত্রণের

অধিকার। আমরা চাই, বাহিরের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত এক গণপরিষদের মাধ্যমে নিজেদের শাসনবিধি নিজেরা তৈরী করবো। বৃটিশ সরকার পরিষ্কার ভাষায় তাদের যুদ্ধের লক্ষ্য ঘোষণা করুক—বলুক, তাদের সে লক্ষ্য ভারত সম্বন্ধে কি করতে চায়। তাদের সে লক্ষ্য কি ভারতে সাম্রাজ্যবাদের অবসান করে' ভারতকে স্বাধীনতা দেবে ?"

বড়লাট জবাব দিলেন, "যথা সময়ে ভারতকে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস দেওয়া হবে, আর আপাততঃ বড়লাটকে যুদ্ধের কাজে সাহায্য করার জন্যে ভারতীয়দের নিয়ে একটা পরামর্শ কমিটি গঠন করা হবে।" তারপর থেকে চললো বড়লাট এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে সুদীর্ঘ চিঠি চালাচালি, কিন্তু ফল কিছুই হলো না—বরং হানি ঘটল।

শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ভারতের সম্মতি না নিয়ে ভারতের নামে যুদ্ধ ঘোষণার প্রতিবাদ করে প্রদেশে প্রদেশে মন্ত্রিত্বে ইস্তাফা দিলো, কিন্তু আর কিছু করলো না, কারণ তারা "বৃটেনকে অসুবিধায় ফেলতে চায় না, কারণ ইংরেজের বিপদের সুযোগ নেওয়াটা অহিংসা ধর্মের বিরোধী।" এটা '৩৯ সালের ১২ই ডিসেম্বরের কথা।

ইতিমধ্যে বড়লাটের সঙ্গে আপোষের চেষ্টায় মহাত্মাজী বড়লাটকে যখন বিনিয়ে বিনিয়ে চিঠি লিখছেন, তখন জনগণ ক্রমশঃ অধীর হয়ে উঠছে, তারা চায় একটা সংগ্রাম। যুদ্ধ এবং সরকারী হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ২রা অক্টোবর বম্বের ৯০,০০০ শ্রমিক একদিনের প্রতীক ধর্মঘট করে। তারপর কামগার ময়দানের সমাবেশ থেকে ঘোষণা করা হয়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো সারা পৃথিবীর মেহনতী মানুষকে যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞে জড়াতে চাইছে, আমরা তাদের সকলের সঙ্গে ঐক্য ঘোষণা করছি। আমরা মনে করি, বর্তমান যুদ্ধ সারা পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতির পক্ষে একটা চ্যালেঞ্জ। তাই আমরা ঘোষণা করছি, সকল দেশের শ্রমিক ও জনগণের কর্তব্য হচ্ছে মানবজাতির বিরুদ্ধে এই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করা। ---এমন ধর্মঘট আরো নানাস্থানে হয়েছিল।

এই অবস্থায় ১৯৪০ সালের জানুয়ারীতে "হরিজন" পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী লিখলেন, 'একজন মস্ত প্রভাবশালী কংগ্রেসনেতা আমাকে বলেছেন, আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলে এবার আমি সঙ্গে সঙ্গে সাংঘাতিক রকমের সাড়া পাবো। তিনি বলেন, সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী এবং নানা স্থানের কিষাণরাও একযোগে ধর্মঘট ঘোষণা করবে। আমি তাঁকে বললুম, তা যদি হয়, তাহলে আমি ভারি অপদস্থ হব এবং আমার সব প্ল্যান উলট পালট হয়ে যাবে। এটা নিশ্চয়ই কেউ আশা করবেন না যে, যে সংগ্রামের শেষ পরিণতি অরাজকতা ও ধ্বংস (red ruin), আমি জেনে শুনে তা শুরু করতে যাবো।"

তাঁর স্বপ্ন অহিংস সংগ্রামের সাহায্যে রামরাজ্য স্থাপন, যে রামরাজ্যের স্বরূপ তিনি ১৯৩৪ সালেই উত্তর প্রদেশের জমিদারদের এক প্রতিনিধি দলের কাছে প্রকাশ্যে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জমিদারদের সম্পত্তির অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ হলে তিনি তাদেরই পক্ষে লড়বেন। আমার স্বপ্নের রামরাজ্যে রাজা থেকে ভিখারী পর্যন্ত সকলের অধিকারই অক্ষুণ্ণ থাকবে। (The Ram Rajya of my dream ensures the rights alike of prince and pauper).

এই স্বপ্নময় রামরাজ্যের সুমুখ দিকে যখন বৃটিশ রাবণের দোর্দণ্ড শাসন চলছে, তখন

পিছন দিকে ধীরে আর একটা কঠোর বাস্তব নতুন রাজ্যের উদ্বোধন পর্ব শুরু হয়ে গেছে—মোসলেম লীগের পাকিস্থানের দাবী এবং নবযুগের সূচনা।

সুতরাং কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডের পর থেকে কংগ্রেস অ-কংগ্রেসী মুসলমানদের বাদ দিয়ে দেশশাসনের দাবী, সংগ্রাম এবং মন্ত্রিত্ব করে আসছিল, অ-কংগ্রেসী এবং কংগ্রেসী মুসলমানেরাও ক্রমে লীগের দিকে বেশী করে ঝুঁকছিল। কংগ্রেসী-মন্ত্রিত্বের আমলে '৩৮ সালে লীগ "পীরপুর রিপোর্ট' প্রচার করে মুসলমানদের ওপর কংগ্রেসী দুঃশাসনের অত্যাচারের এক ফিরিস্তি প্রকাশ করেছিল।

তারপর যুদ্ধ বাধার পর যখন কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ছাড়লো, তখন মোসলেম লীগ সারা ভারতে এক "মুক্তি দিবস" পালন করেছিল। তারা প্রচার করেছিল, কংগ্রেস যে শুধু মুসলমানবিরোধী সংস্থা, তাই নয়, এর রাজনৈতিক নীতিও পৌরুষহীন। স্বাধীনতা সম্পর্কে গান্ধীবাদের দোটানা নীতির জন্যেই বিরক্ত হয়ে মহম্মদ আলী, হজরত মোহানী প্রভৃতির মত লোক কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। কংগ্রেস চায় বৃটেনের সঙ্গে একটা বনিয়াদী রাজনৈতিক সমঝোতা করে মুসলমানদের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে। কথাগুলো মুসলমান তরুণদের এবং ক্ষুদে বুর্জোয়াদের মনে প্রভাব বিস্তার করছিল, আর তার ওপর যুদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেসের কাণ্ড দেখে মোসলেম লীগেই ঝাঁকে ঝাঁকে যোগ দিচ্ছিল।

এই অবস্থায় '৪০ সালের মার্চ মাসে জিন্নার সভাপতিত্বে মোসলেম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্থানের দাবী নিয়ে প্রস্তাব পাশ হল। প্রস্তাবের মধ্যে কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই—ভারতের উত্তর পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের মতন যেখানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে সব অঞ্চলে এক একটা পৃথক স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করতে হবে, এবং তার মধ্যেকার প্রদেশ বা অংশগুলোর আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থাকবে।

সভাপতির অভিভাষণে জিন্না বললেন, লীগের লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা, কিন্তু হিন্দু এবং মুসলমান যে দুই পৃথক জাতি, একথা মেনে নিয়ে এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থার আদর্শ নিয়েই ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালিত করতে হবে।

১৯২৫ সালে লালা লাজপৎ রায় কর্তৃক সি আর দাশের নিকট লিখিত এক পত্রের কথা সভায় উপস্থিত করে তিনি দেখালেন, সে চিঠিতে লাজপৎ রায় লিখছেন, মুসলমানদের ইতিহাস এবং আইন কানুন, সর্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক ভারতীয় মুসলমানেরাও যে মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসনের প্রতি কি রকম ভক্তি-পরায়ণ, এ সব বিবেচনা করলে মনে হয়, হিন্দু মুসলমান ঐক্য বা মিলন একটা অবাস্তব কল্পনা।

তারপর, জিন্না বললেন, "আমি বুঝতে পারি না, আমাদের হিন্দু বন্ধুরা হিন্দুত্ব ও ইসলামের প্রকৃত প্রকৃতির পার্থক্যটা কেন বুঝতে পারেন না। বস্তুত এ দুটো কথায় দুটো ধর্ম বোঝায় না, বোঝায় দুটো বিভিন্ন সমাজ-পদ্ধতি। সুতরাং এ দুটোকে মিলিয়ে একটা জাতি গঠন করার চেষ্টা ভুল এবং সেইজন্যেই সে চেষ্টা এতদিন ব্যর্থ হয়ে এসেছে।

"হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম, দর্শন, সামাজিক রীতিনীতি, কাব্যসাহিত্য সবই আলাদা। দুই সমাজে এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া বা বৈবাহিক আদান-প্রদান নিষিদ্ধ। তাদের জীবনই দু'রকমের। যে ইতিহাস থেকে মানুষ অনুপ্রেরণা পায়, সে ইতিহাসও উভয় জাতির পৃথক। তাদের মহাকাব্য, তার নায়ক এবং ঘটনা পৃথক, যুদ্ধ এবং জয় পরাজয়ের প্রভাবও পৃথক।"

এতবড় নতুন দুর্বিপাকের সম্বন্ধে কংগ্রেস কি করবে? কংগ্রেসের সব চেয়ে ঝুনো রাজনীতিজ্ঞ রাজাগোপালাচারী পাকিস্থানের মূল নীতিটা মেনে নিয়ে মোসলেম লীগের সঙ্গে সমঝোতার প্রস্তাব করে সমগ্র কংগ্রেস থেকে এমন ধিক্কৃত হলেন যে, তাঁকে কংগ্রেস থেকে সাময়িক ভাবে অবসর গ্রহণ করতে হয়েছিল।

পাকিস্থানের দাবীর বিরোধিতার জন্যে কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের অন্যতম নেতা কে এম মুন্সী মহাত্মাজীর অনুমতি নিয়ে কংগ্রেস ছেড়ে "অখণ্ড হিন্দুস্থান" প্রচারে বেরুলেন। প্রত্যক্ষভাবে অতদূর না গিয়ে কংগ্রেস সারা ৮০ ৭১ সাল ধরে দিল্লী, ওয়ার্ধা, পুণা প্রভৃতি স্থানের ওয়ার্কিং কমিটির সভা থেকে লীগের সঙ্গে সমঝোতার কথা একেবারে বাদ দিয়ে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষ করে "কেন্দ্রে জাতীয় সরকার" গঠনের চেষ্টা করে কাটালে। ফলে লীগও আরো টাইট হল।

কংগ্রেসের এই প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু স্বাধীনতা [illegible]। ৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর, বড়লাটের মন্ত্রিসভার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন [illegible] হয়ে মহাত্মাজী বড়লাটকে এক পত্রে লিখলেন, "আমাদের আলাপ আলোচনায় আমি আপনাকে পরিষ্কার ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছি যে, যে-কোন ইংরাজের মত কংগ্রেসও নাৎসীবাদের বিজয়ের বিরোধী। কিন্তু তার সে বিরোধিতা তাকে যুদ্ধোদ্যমে সহযোগিতা করা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারে না। আর যেহেতু আপনি এবং ভারত সচিব ঘোষণা করেছেন যে সমগ্র ভারত স্বেচ্ছায় যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য করছে, অতএব আমাদের এ কথা স্পষ্ট বলা প্রয়োজন হয়েছে যে, অধিকাংশ ভারতবাসীর এ যুদ্ধে কোন আগ্রহ নেই। [illegible]—স্বেচ্ছাচার ভারতে শাসন করে, তার সঙ্গে নাৎসীবাদের কোন পার্থক্য দেখতে পায় না।"—এই চিঠির পর সংগ্রাম শুরু হল।

চমৎকার চিঠি। কিন্তু এই বাক্যবাণের তুলনায় সংগ্রামটা হল একেবারে ভোঁতা। মহাত্মাজী স্বয়ং কিছু সত্যাগ্রহী নির্বাচন করলেন এবং নির্দেশ দিলেন, তাঁরা প্রথমে সরকারকে নোটিশ দিয়ে জানাবেন যে তাঁরা আইন অমান্য করার সিদ্ধান্ত করেছেন, তারপর পাছে পুলিশকে তাঁদের খুঁজে হয়রাণ হতে হয়, তাই তাঁরা দিন ক্ষণ ও স্থান ঘোষণা করে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে যুদ্ধ-বিরোধী ধ্বনি দিয়ে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যাবেন। এ সংগ্রামে তারা একে একে ব্যক্তিগতভাবে এমনি করে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদান করবেন। সংগ্রামও হবে, সরকারও ব্যতিব্যস্ত হবে না—আত্মদানও হবে, সঙ্গে সঙ্গে সকল দায়িত্ব এড়িয়ে কিছুদিন বসে খাওয়াও হবে!

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এ পর্যায় সত্যিই অপূর্ব ও অভিনব। অ-কংগ্রেসী হিন্দু বা ভারতবাসী, কিম্বা জঙ্গী চাষী মজুর, যে-যা খুশী মনে করুক, আমরা লিনলিথগোর চাপা হাসি এবং জিন্নার নাসিকাকুঞ্চন আজ আন্দাজ করতে পারলেও, সেদিন পারিনি। তাই দেখা গেল, এই অপূর্ব সংগ্রামেও কয়েক হাজার সত্যাগ্রহী জেলে গেল। বড় বড় কংগ্রেস নেতারাও এমনি করে শহীদ হলেন।

এরই সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাজীর পরম ভক্ত এবং সেবক বিরলার দল যুদ্ধের মাল-মশলার কোটি কোটি টাকার কনট্রাক্ট নিয়ে মোটা দামে মাল সরবরাহ করে মোটা মুনাফা পিটতে লাগলো। বৃটিশ সরকার সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হল। ইনফ্লেশন পার্মানেন্ট হল।

আর বিপ্লবীরা কি করলেন ? সে-সম্বন্ধে যাদুদা তাঁর বইয়ে লিখছেন : "১৯৪০ সালে মহাত্মাজী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের আহ্বান দিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (আমাদের মধুদা) কারাবরণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আমার কাছে আশীর্বাদ চাইলেন। আশীর্বাদ দিলাম। এ যুদ্ধের পর ভারত স্বাধীনতার নিকটবর্তী হবেই, এ বিশ্বাস আমার এত দৃঢ় ছিল যে, মধুকে তারও ইঙ্গিত পত্রে দিলাম। বললাম, তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, সকলই মনের ভ্রম।

"১৯৪১ সাল। ভূপেনের (ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত) চিঠি এল, একবার কলকাতায় যেতে হবে। আমি পৌঁছবার যে তারিখ ঠিক করেছিলাম, তার ঠিক দু'দিন পূর্বে ভূপেনরা গ্রেপ্তার হয়ে গেল। বুঝলাম বাংলার গোয়েন্দা বিভাগ চায় না যে আমাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ এবং বুদ্ধি পরামর্শের বৈঠক বসে। ওরা চিন্তিত হয়েছিল। কারণ ঐ সময় আফ্রিকায় জার্মাণরা জয়ের পর জয় লাভ করছিল। গোয়েন্দা বিভাগ সজাগ, পাছে আমরা একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করে বসি। যাই হোক, আমার যাওয়া হল না। কলকাতা ও বাহিরে বহু বন্ধু গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন।"

যাদুদার কথায় মনে হয়, তাঁর কলকাতায় যাওয়ার খবরটা কেউ গোয়েন্দা বিভাগে পৌঁছে দিয়েছিল। আর মনে হয়, তারা ওঁদের মুখ রক্ষা, ইজ্জৎ রক্ষা করেছিল। আর মনে হয়, তারা তখনও ওদের অবিশ্বাস করতো। আর মনে হয়, ধরে নিলে, তাই, তা না হলে ওরা দেখে নিতেন। আর মনে হয়, কিছু দিন আগে শ্রীনেহেরু যে বলেছেন, চিন্তার বিপ্লবই সব চেয়ে বড় বিপ্লব, সে কথাটা ঠিকই। আর মনে হয়, যাদুদা ভবিষ্যৎ দর্শী কারণ যুদ্ধের পরও সত্যিই কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের ইংরেজের সঙ্গে স্বাধীনতার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল এবং ভারত স্বাধীনতার নিকটবর্তী হয়েছিল।

* * * *

যুদ্ধের আগে যেমন বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মাণীর সামরিক শক্তি ও সমরযন্ত্র গড়ে তোলবার সাহায্যই বরাবর করে এসেছিল, এবং আশা করেছিল, তাদের ডেপুটী রূপে হিটলার এক চোটেই রুশিয়া আক্রমণ করবে, এবং তাদের ভাষায়, কমিউনিজমের হাত থেকে খৃষ্টান সভ্যতাকে বাচাবে,—হিটলার যখন রুশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করে আগে পশ্চিমাদের ঘাড়েই চেপে পড়লো, এবং বৃটেন-ফ্রান্স জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে বাধ্য হল, তখনও কিন্তু বৃটেন ফ্রান্স তাদের আগেকার প্ল্যান ছাড়েনি, রুশিয়া এবং কমিউনিজম ধ্বংস করার মানে তখনও তারা হিটলারকে ঘুরিয়ে রুশিয়ার ঘাড়ে চেপে পড়তে রাজী করবার দুরাশা পোষণ করছিল।

এর জন্যে তারা যা করেছে, তাতে তাদের "নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ"ই করা হয়েছে। একদিকে তারা হিটলারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কারচুপি করেছে, এবং তার ফলে হুড়া হুড়ায় পশ্চিম ইউরোপের এক একটা দেশ হিটলারের পদানত হয়েছে, আর একদিকে তার বাল্টিক সাগরে রুশিয়ার রক্ষা ব্যবস্থাকে বিপন্ন করবার জন্যে ফিনল্যাণ্ডের ফ্যাসিষ্ট সেনাপতি ম্যানারহাইমের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে, তাকে সাহায্য করেছে, এবং রুশিয়া আক্রমণের জন্যে হিটলারের পক্ষে একটা সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে, ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে রুশিয়ার যুদ্ধ গড়ে তুলেছে, নিরপরাধ গো-বেচারী ক্ষুদ্র ফিনল্যাণ্ডকে দৈত্যকায় শয়তান রুশিয়ার গ্রাস থেকে বাঁচানোর জন্যে" এক লাখ সুসজ্জিত ভলাণ্টিয়ার সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করেছে।

এই রুশ-ফিন যুদ্ধ '৩৯ সালের শেষ এবং '৪০ সালের গোড়ার কথা, যখন পশ্চিমীরা হিটলারের হাতে প্রচণ্ড মার খেতে শুরু করেছে। এ এক অদ্ভুত ইতিহাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলতে যে আজ লোকে রুশ জার্মাণ যুদ্ধের কথাই বলে, তার কারণ ঐ যুদ্ধে রুশিয়ার ভূমিকা এবং যুদ্ধোত্তর জগতে বিজয়ী রুশিয়ার যুগান্তকারী প্রভাব। আমাদের দেশের যুদ্ধোত্তর কালের ইতিহাসও ঐ রুশ-বিজয়ের প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই যুদ্ধে রুশিয়ার ভূমিকার কথাটা এখানে মোটেই অবান্তর নয়, সেটা ভাল করে জানা ও বোঝা প্রয়োজন।

যাই হোক, ঠিক যুদ্ধের গোড়া থেকেই, ১১ই অক্টোবর, প্যারিসের সংবাদপত্রগুলো বলতে লাগলো, রুশ-ফিন যুদ্ধ বাধলে বৃটেন ফ্রান্স আর রুশিয়ার নিরপেক্ষতার খাতির করবে না।

আমেরিকার বৃটিশ প্রচারক ডাফ কুপার গদগদ হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, শীঘ্রই বৃটেন রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে। ৩১শে অক্টোবর "নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন" লেখালো, যুদ্ধের উদ্দেশ্য জার্মেণীকে পরাজিত করা নয়, পরন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতাকে রুশিয়ার কবল থেকে রক্ষা করা। ১লা নভেম্বর আমেরিকা মস্কো থেকে তার রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করলো। মুসোলিনী ফিনল্যাণ্ডে ভলান্টিয়ার ও বিমান পাঠালো। ম্যানারহাইম হিটলারের সাহায্যও আশা করছিল।

আর যে লীগ অফ নেশনস একটা কোন ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে একটি অঙ্গুলি হেলন করেনি, রুশ-ফিন যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে তারা টপ করে এক মিটিং করে রুশিয়াকে লীগ থেকে বহিষ্কৃত করে দিলে।

এখন রুশ ফিন যুদ্ধের একটু খবর নেওয়া যাক। ফিনল্যাণ্ড এবং বৃটেন-ফ্রান্সের কার্য কলাপ দেখে রুশিয়া বল্টিক সাগরের প্রান্তে লেনিনগ্রাড খাড়ির মুখ সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করছিল। সেই খাড়ির মুখের অনতিদূরে একটা ছোট দ্বীপ, ফিনল্যাণ্ডের অধিকারভুক্ত মাত্র, কিন্তু ফিনল্যাণ্ডের প্রতিরক্ষার পক্ষে তার কোন গুরুত্বই নেই, অথচ লেনিনগ্রাডের প্রতিরক্ষার জন্যে তার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল।

রুশিয়া এই কথা জানিয়ে ফিনল্যাণ্ডের কাছে প্রস্তাব করেছিল, ঐ দ্বীপটুকু রুশিয়াকে ইজারা দেওয়া হোক, তার পরিবর্তে রুশিয়া কারেলিয়ার অনেকখানি জায়গা ফিনল্যাণ্ডকে দেবে, এবং ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করে রুশিয়ার তরফ থেকে ফিনল্যাণ্ডের বিপদের আশঙ্কার সম্পূর্ণ নিরসন করবে। কিন্তু বৃটেন ফ্রান্সের প্ররোচনায় ফিনল্যাণ্ড তো তাতে রাজী হলই না, উপরন্তু রুশিয়া আক্রমণের সংকল্প চালাতে লাগলো।

'৩৯ সালের ২৮শে নভেম্বর বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন হাউস অফ কমন্সে বললেন, এ যুদ্ধ (জার্মাণীর বিরুদ্ধে) কতদিন চলবে, এর গতি কোনদিকে মোড় ফিরবে, কবে শেষ হবে, বা কারা আমাদের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে থাকবে, তা কেউ বলতে পারে না।

কতকগুলো অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী উপহার পেয়ে যুদ্ধমন্ত্রী বললেন, এ গাড়ীগুলো কোথায় যাবে, তা আমি জানি না, তারা এমন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে পারে যা আজ কেউ জানে না।

এই অবস্থায় রুশিয়া হঠাৎ একদিন ঐ ফিনিশ দ্বীপটা দখল করে নিয়ে সেখানে এক নৌ-ঘাঁটি তৈরী করে ফেললে। ফিনল্যাণ্ড সে ঘাঁটী আক্রমণ করতে এলে যুদ্ধ বাধলো। '৩৯ সালের শেষ ও '৪০ সালের গোড়ার কথা, তিন মাসেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। ফিনল্যাণ্ড রুশিয়ার বন্দোবস্ত মেনে নিলে, বৃটেন ফ্রান্সের চক্রান্ত বানচাল হয়ে গেল।

রুশিয়া যে ফিনল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলতে পারতো, এ কথা কে না জানে? কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সে রকম হয়নি। রাশিয়া জানতো ফিন জনগণ রুশিয়ার শত্রু নয়, শত্রু হচ্ছে ফিন ফ্যাসিষ্ট দল। সুতরাং ম্যানারহাইম লাইন ভেঙ্গে দেওয়া ছাড়া রুশিয়া আর কিছু ধ্বংস করেনি, এরোপ্লেন থেকে যত বোমা বর্ষণ করেছে তার শতগুণ প্রচারপত্র বৃষ্টি করে জনগণের কাছে রুশিয়ার আসন্ন বিপদ ও প্রয়োজন, এবং ফিনল্যাণ্ডের প্রকৃত স্বার্থের কথা প্রচার করেছে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে ফিন জনগণের চেষ্টায় এবং ফ্যাসিষ্টদের পরাজয়ে, জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। আজ ফিনল্যাণ্ড স্বাধীন, উন্নতিশীল রুশ মিত্র।

ঠিক যখন ফিনল্যাণ্ডের দুঃখে বৃটেন দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বর্ষণ করছে, তখনই ভারতে লিনলিথগো কর্তৃক মহাত্মাজীর সকল আবেদন নিবেদন ও সংগ্রাম সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে, এবং নিরলাদি প্রগেসিভ ইণ্ডিয়ালিষ্টদের সহায়তায় ভারতের জনমত পদদলিত করে দার্দিণ্ড প্রতাপে ভারতের সম্পদ বৃটেনের যুদ্ধের প্রয়োজনে উৎসর্গ করা চলছে।

আবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্ব একদিকে মুসলমানদের বাদ দিয়ে কেন্দ্রে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী করে চলেছে, আর একদিকে লীগের পাকিস্থানের দাবীর বিপদ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সে দাবীকে আরো জোরদার করে তোলার প্রবোচনা দিয়ে চলেছে, সে বিপদকে আরো ঘনীভূত ও সংহত করে তুলছে।

ফলে ভারতের চরম শত্রু বৃটেন divide and rule নীতির কল্যাণেই ভারতের শাসন শোষণ চালাতে পারছে সোজা বারো। হিন্দু মুসলমানের সভীনের মনোভাবকে তারা আরো প্রশ্রয় দিয়ে জোরদার করবার নানা নতুন নতুন কৌশল ও ব্যবস্থা চালিয়ে চলেছে। বৃটেনের নিজেদের সুযোগ নেওয়া যেমন শাস্ত্রদের ধর্ম নয়, তেমনি ভুধা রাজ্যদের কর্মও নয়। চূড়ান্ত বৃটেন যত পয়ুদস্ত হোক ভারতে তার সাফল্য হল অবিসংবাদিত

পঁয়ত্রিশ

বৃটেনের যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে লিনলিথগোর ভারতে জার্মেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যখন "ভারত রক্ষার এলাহি" স্থাপন করলে এবং ভারতের চাষী মজুর-জনগণ একটা সংগ্রাম দেওয়ার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠলো, তখন মহাত্মাজীকে নেগোশিয়েশন কনসিলিয়েশন সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে অহিংসা প্রচারের নতুন কসরতের দিকে ও বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হয়েছিল। তার সে প্রচেষ্টা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকার যোগ্য।

তিনি বৃটেন ও অন্যান্য মিত্রশক্তির উদ্দেশে আবেদন প্রচার করেছিলেন, তারা যেন নাজি নেতাদের সামরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করবার পরিবর্তে অহিংস উপায়ে সে আক্রমণের প্রতিরোধের পথ অবলম্বন করেন।

বম্বের শ্রমিকদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণসংগ্রামের ডাক এবং কামডানষ্টদের "প্রোলেটারিয়ান পাথ" প্রচারের কথা উল্লেখ করে যাঁরা বলেন, কমিউনিষ্টরাই সঠিক সংগ্রামের পথ নির্দেশ করেছিল, কিন্তু তারা তখন ছোট পার্টি বলে তাদের ডাক দেশের

সর্বত্র পৌছায়নি, তাঁরা মিথ্যা কথা বলেন। কারণ গান্ধীভক্তি প্রচারে তার আগে থেকেই, এবং আজ পর্যন্ত, কমিউনিষ্টদের অবদান কারো থেকে কম নয়।

১৯৪০ সালের এপ্রিলে ইউরোপে যখন হিটলারের হাতে মিত্রশক্তি প্রচণ্ড মার খেতে শুরু করেছে এবং বৃটেনে যখন চেম্বারলেন গদীচ্যুত হয়েছেন এবং চার্চিল প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন, তখন কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড আর একবার আশা করলেন, এইবার ইংরেজ নিশ্চয় একটা আপোষ-মীমাংসায় রাজি হবে। তদনুসারে মহাত্মাজী এক ঘোষণায় বললেন, পশ্চিমে যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিরাম নরহত্যা এবং শান্তিপূর্ণ গৃহসংসার ধ্বংস হচ্ছে, তখন আমি ভারতের বর্তমান অচলাবস্থার অবসানের জন্যে কোন চেষ্টার ত্রুটী করবো না।

তখন অহিংসা নীতি এবং তার প্রয়োগ নিয়ে মহাত্মাজীর সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটির সূক্ষ্ম বিচার এবং সূক্ষ্মতর মতভেদ চলছে। মহাত্মাজী সুনীতির বিচারে 'মিত্রশক্তিকে নৈতিকভাবে' সমর্থন জানিয়েও অহিংসা-নীতির দোহাই দিয়ে বলেছেন, তাদের যুদ্ধ কার্যে সক্রিয় সহযোগিতা করবেন না। ওয়ার্কিং কমিটির বক্তব্য হল, যুদ্ধকার্যে সক্রিয় সাহায্যই যদি "হারাম" হয়, তাহলে অন্য যে প্রকারেই সমর্থন জানানো হোক, তার মূল্য কতটুকু? অতএব ইংরেজকে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, যদি তারা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতকে স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে কংগ্রেস "বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার জন্যে জাতীয় সরকারে যোগ দিতে প্রস্তুত।"

চাপ দিয়ে প্রতিশ্রুতি আদায় করে বৃটেনের যুদ্ধে সক্রিয় সাহায্য করার এই নীতিটা লিনলিথগোকে মানাবার দুশ্চেষ্টায় মহাত্মাজী ও ওয়ার্কিং কমিটির অনেক সলা পরামর্শ হল এবং শেষ পর্যন্ত তদনুসারে একটা ঘোষণা প্রচার করা হল (Poona offer)। এবং পরে বলা হল, মহাত্মাজী চান, কংগ্রেস যেন অহিংসা-নীতির পূর্ণ মর্যাদা রক্ষার জন্যে ঘোষণা করে যে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষা বা অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমনের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী রাখতে চায় না।

এ সব কথা কিসের ইঙ্গিত? স্বাধীন ভারতের সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী জাতীয় সরকারের হাতে না থেকে ইংরেজের হাতে থাকবে বলে আশ্বাস দিয়ে ইংরেজকে আপোষে রাজী করানো? অথবা মহাত্মাজী যতদূর চান, কংগ্রেস ততদূর যেতে রাজী নাও পারে, তাহলেও মহাত্মাজী কি চান, সেটা ঘোষণা করে ইংরেজকে প্রকারান্তরে আশ্বাস দান করা যে, কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবীটা নিছক আপোষের কথা, তার মধ্যে বৃটেনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতির জমি তৈরীর কোন পরিকল্পনা বা সম্ভাবনা নেই।

যা-ই হোক, গান্ধী-কংগ্রেসের এই সব সুনীতি, অহিংসানীতি এবং অভিনব রাজনীতির মাধ্যমে ইংরেজের সঙ্গে আপোষ বন্দোবস্তের সংগ্রামে কংগ্রেসের দুই পার্শ্বরক্ষক বাহিনী ছিল, বিপ্লবীদল এবং কমিউনিষ্ট পার্টি। কমিউনিষ্ট পার্টির কমিউনিজমের পরিচয় ছিল এই মাত্র যে, বুর্জোয়া প্যাট্রিয়টিজমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা তখন থেকেই বিক্ষুব্ধ চাষা-মজুরকে "জাতীয় সরকারের" মহিমায় অনুপ্রাণিত করছিল। অথচ সেই "জাতীয় সরকারের" নেতৃত্ব বিপ্লব বিরোধী, বুর্জোয়া, সংস্কারপন্থী, আপোষপন্থী। এই নেতৃত্বের পিছনে চলা এবং মাঝে মাঝে প্রোলেটারিয়ান পথের কথা বলা, জনগণের বিক্ষুব্ধ, সংগ্রামোন্মুখ মনোভাবকে দিশেহারা করা ছাড়া আর কিইবা করতে পারে? করেছেও ঠিক তাই।

কংগ্রেস যখন যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য করবে না বলে লিনলিথগোকে ভয় দেখাবার ঢংয়ে নোটিশ দিয়ে দিয়ে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ নামক রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাচ্ছে, তখন বিড়লা-টাটা প্রমুখ কংগ্রেসভক্তদের নেতৃত্বে সারাদেশের হাজার হাজার কংগ্রেসভক্ত, জাতীয়তাবাদী প্যাট্রিয়ট কণ্ট্রাক্টর, সাব কণ্ট্রাক্টর, সাব-ডেপুটী কনট্রাক্টর যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার মাল সরবরাহের ধুম লাগিয়ে দিয়েছেন, মোসলেম লীগের ভক্ত মুসলমান ধনিক-বণিকরাও সমানে সহযোগিতা করছে, সারাদেশে কর্মোন্মাদ, কাজ-কারবারের ধুম, বেকারদের কর্মসংস্থান, জিনিসপত্রের দরবৃদ্ধির সঙ্গে, মজুরদের কিছু মজুরীবৃদ্ধি প্রভৃতির মারফতে লিনলিথগোর যুদ্ধোদ্যম অবাধে সফল হয়ে চলেছে। এবং মাসে হাজার পঞ্চাশেক করে লোকও যুদ্ধের জন্য বিক্রি করা চলেছে।

সুতরাং কংগ্রেসের যুদ্ধোদ্যমে বিরোধিতাটা হয়েছে একটা তামাসা মাত্র। লিনলিথগোও তাই দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন চালিয়েছে ও কংগ্রেসের সকল সর্ত ও সহযোগিতার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে চলেছে। কংগ্রেসের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের অন্তর টিপুনী সত্ত্বেও যখন সারাদেশে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ জেলে গেল, তখন মহাত্মাজী আর একবার যে বাণী দিয়েছিলেন, সে বাণীও ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকার যোগ্য। তিনি বলেছিলেন :

"আপাততঃ আমাদের বাক-স্বাধীনতা এবং লেখার স্বাধীনতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে (anti-war slogan), এ সংগ্রাম শীঘ্র শেষ হবার নয়। আমরা এমন এক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি, যারা নিজেরাই এক প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচন সংগ্রামে লিপ্ত। আমাদের সংগ্রাম শেষ হবে তাদের ঐ সংগ্রাম শেষ হবার সঙ্গে। আজ স্বাধীনতার জন্যে আইন-অমান্য সংগ্রাম একটা আজগুবি কথা। যাদের নিজেদের স্বাধীনতাই নিতান্ত বিপন্ন, তাদের বিরুদ্ধে আমরা কেমন করে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করবো? এক জাতি যদি আর এক জাতিকে স্বাধীনতা দিতে পারেও, তাহলেও আজ ইংরেজের পক্ষে তা সম্ভব নয়।"

'যারা নিজেরাই ডুবছে, তারা অপরকে বাঁচাতে পারে না। কিন্তু তারা যদি নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে জীবনপণ করে লড়তে পারে এবং যদি তারা যুক্তি-বিচারের মর্যাদা দেয়, তাহলে তারা অবশ্যই আমাদের বাক-স্বাধীনতার অধিকারও মানবে।"

বিশ্বাস করতে যদি প্রবৃত্তি না হয়, ইংরেজী বয়ানটা শুনুন। "For the time being we should be satisfied with complete freedom of speech and pen

This is not a struggle which can be ended quickly We are resisting an authority that is itself struggling to fight for life against a stubborn foe. Our struggle must be co-terminous at least with the European.

'It is absurd to launch civil disobedience today for independence. How are we to fight for independence with those whose own independence is in grave peril? Even if independence can be given by one nation to another it is not possible for the English. Those who are themselves in peril cannot save others. But if they

fight unto death for their freedom and they are at all reasonable, they must recognise our right of free speech". তারা এখন জার্মেণীর সঙ্গে প্রাণপণে লড়ছে, এখন আমাদের স্বাধীনতা দেবে কি করে? এখন আইন অমান্য সংগ্রাম করলেও তারা আমাদের স্বাধীনতা দিতে পারবে না। ওদিকে তারা যুদ্ধ করুক, এদিকে আমরা ততদিন বাক্-স্বাধীনতা দাবী করি। তাদের যদি আক্কেল থাকে, তাহলে আমাদের এই বাক্-স্বাধীনতার অধিকার তারা অবশ্যই স্বীকার করবে। তারপর তাদের ইউরোপের লড়াই শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন আমাদের বাক্-স্বাধীনতার লড়াইও শেষ হবে, তখন তাদের "হাত-অবসর" হলে তবে না তারা আমাদের স্বাধীনতা দিতে পারে। ('৪০ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর এ-আই-সি-সির মিটিংয়ের কথা। Gandhiji, by Hiren Mukherjee Page 134)।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই দার্শনিক তত্ত্ব এবং কর্মসূচীর জন্যেই নিপীড়িতরা গান্ধীবাদের বৈপ্লবিক ভূমিকা দেখে তার মধ্যে লীন হয়েছিলেন। কমিউনিষ্টরা সারা পৃথিবীতে পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের, বৈপ্লবিক সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের, ন্যাশন্যাল লিবারেশন মুভমেণ্টের পুরোধারূপে কাজ করে, নেতৃত্ব দেয় বলে শোনা যায়। কিন্তু ভারতে যখন বিপ্লবের অবস্থা এবং সুযোগ এল, তখন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গিরণি কামগর ইউ-নিয়নের সমাবেশ এবং প্রস্তাব দেখিয়ে প্রোলেটারিয়ান পথের বচন দিয়ে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা ঘোষণা করে গান্ধী কংগ্রেসের ঐ মহান দার্শনিক সংগ্রাম হজম করে ফেললে। মোটকথা, বিপ্লবের অবস্থা সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ হয়েছিল, পেকেছিল, কিন্তু গান্ধী চক্রের কারসাজিতে সে সুযোগ বানচাল হয়ে গেল।

আর গান্ধী কংগ্রেসের কাণ্ড দেখে মুসলমানদের, মোসলেম লীগের, কায়েদে আজম জিন্নার মনোভাব কেমন হচ্ছিল? জনগণের সংগ্রামী মনোভাব সংগ্রামের সুযোগ না পেয়ে সাম্প্রদায়িক বিরোধের দিকে ঝুঁকছে, লীগের পাকিস্থান প্ল্যানে দলে দলে মুসলমান সামিল হচ্ছে, কংগ্রেসী মুসলমানরাও কংগ্রেস ছেড়ে লীগে যোগ দিচ্ছে, লীগের শক্তি বাড়ছে। তখনও জিন্না প্রাণপণে কংগ্রেসের সঙ্গে রফার চেষ্টা করছেন, বলছেন, পাকিস্থান-নীতিটা মেনে নিয়ে লীগের সঙ্গে আলোচনা করে একটা আপোষ বন্দোবস্ত কর এবং তারপর এস, কংগ্রেস-লীগ মিলে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে মোকাবিলা করি।

১৯৪১ সালের ২রা মার্চ পাঞ্জাব মুসলিম ষ্টুডেণ্টস্ ফেডারেশনের বিশেষ "পাকিস্থান" অধিবেশনে জিন্না হিন্দুদের তরফের এই তর্কের জবাব দেন যে, ভারতের মুসলমানরা এক-কালে হিন্দু ছিল, তারা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে, সুতরাং ধর্মান্তরিত হয়েছে বলেই যে তারা একটা পৃথক জাতিতে পরিণত হয়েছে এ এক আজগুবী দাবী।

তিনি বলেন, তোমরা কি চোখে দেখতে পাও না, এটুকু বোঝবার মতন মগজও কি তোমাদের মাথায় নেই যে, যখন ইংলণ্ডে কোন ইংরেজ ধর্মান্তর গ্রহণ করে, তার জন্যে সে জাতিচ্যুত হয় না, তার সমাজ-জীবন, সামাজিক মর্যাদা, সংস্কৃতি প্রভৃতি সবই আগের মতই থাকে, কোনক্রমে ক্ষুণ্ণ হয় না। আর এ দেশে কি হয়? ধরে নেওয়া যাক্, হাজার বছর আগে এখনকার অধিকাংশ মুসলমানই হিন্দু ছিল। কিন্তু তোমাদের হিন্দু ধর্ম ও শাস্ত্রমতে, ধর্মান্তরিত হওয়ায় তারা জাতিচ্যুত হয়েছে, ম্লেচ্ছ হয়েছে, ধর্ম, সমাজ, কৃষ্টি, কোন দিক

দিয়েই তারা আর হিন্দুদের সংস্পর্শে আসতে পারে না। আর এইভাবে এই মুসলমান সমাজ এতকাল হিন্দুদের থেকে এক পৃথক জগতে বাস করে এসেছে। এরপরও পাকিস্থানের দাবীটার ভিত্তি নেহাৎ ধর্মান্তর গ্রহণের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে উড়িয়ে দেওয়া কি একটা বাজে তর্ক নয়?

রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পাকিস্থান পরিকল্পনাটা কখনও বিবেচনা বা আলোচনা করে দেখেনি, কারণ লীগ কখনও তার কাছে সে প্রস্তাব করেনি। '৪১ সালের এপ্রিল মাসে লীগের মাদ্রাজ অধিবেশনে জিন্না তার জবাবে বলেন,

"কংগেস-ওয়ার্কিং-কমিটি যে পাকিস্থান পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেনি, একথা তোমরা বিশ্বাস কর? '৪০ সালের মার্চ থেকে এই পাকিস্থান পরিকল্পনা ভূতের বিভীষিকার মতন তাদের পিছনে লেগে আছে। এ কেমনতর সত্যবাদিতা? গান্ধী থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি কংগেস-নেতা পাকিস্থান পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছেন, বিবৃতি দিয়েছেন, গাদা গাদা লিখেছেন। স্বয়ং রাজেন্দ্রপ্রসাদই পাকিস্থান পরিকল্পনা সম্বন্ধে এক পুস্তিকা লিখেছেন এবং তাঁর নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। আমি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বলি, যদি আপনাদের ওয়ার্কিং কমিটি এ নিয়ে অদ্যাবধি আলোচনা না করে থাকেন, তাঁদের বলুন আলোচনা করতে। শুধু আলোচনা নয়, যদি এখনো কংগ্রেস নেতৃত্বের কিছুমাত্র রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞান অবশিষ্ট থেকে থাকে, তাহলে তাঁরা নির্বোধ ভাবপ্রবণতা ছেড়ে খোলা মনে সদ্ভাব সহিত বিষয়টার ওপর মনোযোগ দিয়ে বিচার করে দেখুন।"

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, '৪১ সালে জিন্না যে কংগ্রেসের সঙ্গে পাকিস্থান সম্পর্কে সমঝোতার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন, সেটাকে যদি সুষ্ঠু মনোভাব নিয়ে কার্যকরী করার চেষ্টা হ'ত তাহলে আজকের মতন দেশবিভাগ বা আজকের মতন পাকিস্থান হ'ত না, হ'ত একটা নিছক প্রশাসনিক বিভাগ মাত্র।

"ইংরেজ এখন বিপন্ন, এখন স্বাধীনতা দেবে কি করে?" এ কথার অর্থ কি এই নয় যে, আগে তার বিপদ কেটে যাক, লড়াই শেষ হ'ক, লড়াইয়ে জিতে নিরাপদ হক, তারপর সে আমাদের স্বাধীনতা দেবে? সুতরাং ইংরেজই যখন স্বাধীনতা দেবে, তখন কংগ্রেস-লীগ সমঝোতার ফলে একটা প্রশাসনিক বিভাগ ছাড়া আর কিছু হত না, যেমন '৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যানে এ বি-সি গ্রুপ অফ ষ্টেটস্ গঠন পরিকল্পিত হয়েছিল। অর্থাৎ কতকগুলো প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা, কতকগুলো প্রদেশে লীগ-মন্ত্রিসভা, এবং বাংলা ও পাঞ্জাবে মিশ্র মন্ত্রিসভা, এই ধরনের প্রশাসনিক বিভাগই হ'ত। কোটি কোটি লোকের ধন, প্রাণ, সংসার ছারখার হ'ত না। বাংলার এই অখণ্ড পৃথক ভারত-পাকিস্থান-বহির্ভূত স্বাধীন সত্তার সম্ভাবনা ছিল বলেই শরৎ বসু এবং সুরাবর্দী একসঙ্গে মিলে বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। সুরাবর্দী যদি সবখানি বাংলা পাকিস্থানের জন্যে চাইতেন, তাহলে বলতেই হয় যে শরৎ বসু সবখানি বাংলা ভারতের জন্যে চেয়েছিলেন, এবং তাহলে সুরাবর্দী শরৎ বসু একজোট হতে পারতেন না।

সুতরাং গান্ধী-কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার একজোট প্রচেষ্টায় যখন বাংলা দ্বিখণ্ডিত হল, তখন এই কথাই প্রমাণ হল যে, আধখানা বাংলা পাবার জন্যে হিন্দুরাই আধখানা বাংলা পাকিস্থানের হাতে তুলে দিলে।

যেদিন ভোটাভুটিতে সিদ্ধান্ত হল বাংলা দ্বিখণ্ডিত হবে, সেদিন যুগান্তর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিল, সে যেন উন্মত্ত উল্লাসে খ্যাংটো হয়ে নাচা। '৬৪ সালে যুগান্তর সম্পাদক বঙ্গ বিভাগকে মহাপাপ বলে আর্তনাদ ও অনুশোচনা করেছেন, কিন্তু সে মহাপাপ ঠিক কেমন ও কতখানি তা যদি তিনি বুঝতেন, তাহলে এই বলেই আফশোষ করতেন যে, আমরাই পূর্ববঙ্গকে পাকিস্থানের হাতে তুলে দিয়েছি।

'৪১ সালে যখন জার্মান বোমারু-বিমানের আক্রমণে বৃটেন এমনভাবে বিধ্বস্ত হচ্ছে যে, চার্চিল পরে বলেছিলেন, আর এক সপ্তাহ সেরকম চললে হয়ত বৃটিশ সরকারকে দেশ ছেড়ে পালাতে হ'ত, ঠিক তখনই ভারতে মহাত্মা গান্ধী আইন-অমান্য সংগ্রাম উচিত নয় বলে ঘোষণা করছেন, কোটি কোটি কংগ্রেস ভক্ত ওয়ার-কন্ট্রাক্টের দৌলতে মোটা হয়ে উঠছেন, আর জনগণের সংগ্রামী উৎসাহ দাবিয়ে দেওয়ার সঙ্গে কংগ্রেস লীগপন্থী মুসলমানদের আরো দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন, আর 'আমরাই ভারতের হিন্দু-মুসলমানের প্রতিভূ' বলে দাবী করে লীগকে বাদ দিয়ে বৃটেনের সঙ্গে সমঝোতার মতলব ভাঁজছেন। কিন্তু বৃটেনই যদি স্বাধীনতা দেওয়ার মালিক হয়, তাহলে লীগকে বাদ দিয়ে শুধু কংগ্রেসকে স্বাধীনতা দেবে কেন? গবজে অন্ধ কংগ্রেস এবং কংগ্রেসী হিন্দুদের মাথায় এ প্রশ্নটা একেবারেই না।

এই '৪১ সালেই হিটলার পশ্চিম-ইউরোপ জয় করে' পরম শত্রু কমিউনিস্ট রুশিয়াকে আক্রমণের প্ল্যান আঁটলো এবং বৃটেনকে দলে টানবার জন্যে হেসকে গোপনে বিলেতে পাঠালো সমঝোতার আশায়। কিন্তু চার্চিলের বৃটেন কমিউনিস্ট শত্রু হলেও হিটলারের ডেপুটী হয়ে বেঁচে থাকতে রাজী নয়। পক্ষান্তরে হিটলারের সারা ইউরোপের ওপর ডিক্টেটরীর বিরুদ্ধেও দাঁড়ানো দরকার। সুতরাং হিটলার রুশিয়া আক্রমণ করলে দুই শত্রুর সমরযন্ত্র একসঙ্গে চুরমার হওয়ার, দুই শত্রু একসঙ্গে নিপাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে ভেবে বৃটেন আশ্বস্ত হল।

হিটলার তখন বৃটেনকে ইউরোপের বাইরে কোণঠাসা করে রাখার জন্যে পশ্চিম ফ্রন্টে ডিফেন্সিভ ব্যবস্থামাত্র রেখে সর্বশক্তি নিয়ে অকস্মাৎ রুশিয়ার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো, '৪১ সালের ২২শে জুন। যুদ্ধের মোড় ফিরলো এবং প্রকৃতিও বদলে গেল।

হিটলারের সমর-কৌশল ব্লিজ ক্রীগ, বর্ষাফলকের মত তীব্রগতিতে শত্রুর লাইন ভেদ করে এগিয়ে যাওয়া, রুশিয়ায় প্রথমদিকে এমন সফল হল, রেড আর্মি এমনভাবে পিছু হটতে লাগলো যে, চার্চিল টাইম টেবল বেঁধে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, রুশিয়ার পতন হতে ছয় সপ্তাহের বেশী লাগবে না। প্রথম ছয় সপ্তাহ পার হলে তিনি দয়া করে আর ছয় সপ্তাহ সময় দিলেন। কিন্তু রুশিয়ার সমগ্র পশ্চিম অংশটা হিটলারের নাজীবাহিনীর কবলে এলেও রুশিয়ার পতন হল না। শীত এসে পড়লো, পাইপের জল জমে বরফ হয়ে পাইপ ফাটে, মোটরের ট্যাঙ্কে পেট্রোল জমে যায়, সুতরাং জার্মান অগ্রগতি বন্ধ হল।

আমাদের দেশে একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ভগ্নদশা এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রসার আর একদিকে ওয়ার সাপ্লাইয়ের হিড়িকের মধ্যে জার্মানীর প্রতি ভক্তি বেড়ে চলছিল, কারণ আমাদের শত্রু ইংরেজ জার্মানীর হাতে প্রচুর মার খাচ্ছিল, আর একদিকে এতদিনকার বৃটিশ সূত্রের সংবাদের অপপ্রচারে যে সাধারণ রুশবিরোধী মনোভাব মনের অজ্ঞাতে গড়ে' উঠছিল, এবং জার্মেনীর সঙ্গে পোল্যাণ্ড ভাগাভাগির ষড়যন্ত্র, নিরীহ

ফিনল্যাণ্ডের ওপর আক্রমণ প্রভৃতি মিথ্যা প্রচারের দৌলতে সেই রুশ-বিরোধের মনোভাব বেড়ে চলছিল। বলেও রুশিয়ায় জার্মেনীর সাফল্যে লোকের জার্মান-ভক্তি বাড়ছিল। রুশিয়া জার্মেনীর হাতে মার খাচ্ছে, বেশ হচ্ছে।

তার ওপর কমিউনিষ্ট পার্টি হঠাৎ পিপল্স ওয়ার বলে সোরগোল তোলাতে লোকের মনোভাব আরো রুশ বিরোধী এবং জার্মান ভক্ত হয়ে উঠছিল, পিপল্স ওয়ার কথাটা যেন এবিষয়ে একটা প্ররোচনাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আবার এই '৪১ সালেই সুভাষবাবু গোপনে ভারত ত্যাগ করে জার্মানীতে যান, ভারতে বিপ্লব ঘটানোর জন্যে আমাদের শত্রুর "শত্রুর" সাহায্যের আশায়। শরৎবসুর 'নেশন" পত্রিকায় মোহিত মৈত্রের সম্পাদনে সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হল, হিটলার সুভাষবাবুকে দর্শন দিয়েছেন এবং তাঁর পারিষদদের কাছে সুভাষবাবুর পরিচয় দিয়েছেন "ইণ্ডিয়ান ফুয়েরার" বলে। জার্মানভক্তি প্রচারে "নেশনের" অবদানও কম নয়।

আবার রুশিয়ার এই প্রাথমিক পরাজয়ের কারণ প্রচার করা হল ষ্টেলিনের বেকুফী ও শয়তানী। তিনি নাকি একদিকে হিটলারকে বিশ্বাস করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেননি, আর একদিকে রুশিয়ায় নিজের প্রভুত্ব নিরঙ্কুশ করার জন্যে তার বিরোধী খাঁটি বলশেভিক নেতৃগোষ্ঠীকে নির্মূল করার কাজেই সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। যুদ্ধের ঠিক আগে, '৩৬ '৩৭ '৩৮ সালের বিখ্যাত মস্কো মামলায় সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে [illegible] থেকে অপসারিত করার কথা কে না জানে? ষ্টেলিনের সে সব পাপের আজ প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে, বেশ হচ্ছে। ৪১ সালে এই ছিল ভারতবাসীর সাধারণ মনোভাব।

অথচ এর প্রত্যেকটি কথা হয় ভুল, না হয় সজ্ঞান মিথ্যাপ্রচার, এবং কমিউনিষ্ট পার্টি এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সত্য কথা প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি, শুধু পেটেন্ট মুখস্থ কথা, ফ্যাসিবাদ বিরোধী জনযুদ্ধ বলে সোরগোল তুলে লোকের মনকে শিক্ষা না দিয়ে আরো বিগড়ে দেওয়ার কাজই করছে।

ষ্টেলিন সম্বন্ধে আসল কথা হচ্ছে এই যে, প্রথমত হিটলার রুশিয়া আক্রমণ করেছিল একযোগে ১৫০০ মাইল লাইন জুড়ে, যে ১৫০০ মাইল জুড়ে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার এবং এভাবে আক্রমণ একটা অভাবনীয় ব্যাপার। এত বিরাট ও বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ সরঞ্জাম, বিশাল সৈন্যবাহিনী এবং তার খাদ্য বস্ত্রাদি, যানবাহন, হাসপাতাল ১৫০০ মাইল জুড়ে সমাবেশ করার মত উৎপাদন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে সময় প্রয়োজন, সে সময় ষ্টেলিন পেয়েছিলেন কি?

২০ সালে একটা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত দেশ, তিন বছরের যুদ্ধ এবং তিন বছরের গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক আক্রমণে বিধ্বস্ত দেশ যার উৎপাদনের পরিমাণ ১৯১৩ সালের সিকি মাত্র, তার ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে আর একটা মরণ বাঁচন লড়াই,— এই নিয়ে তো লেনিনের সরকার?

'২৭ সালে সেই রুশিয়ার উৎপাদন, এত ঘা খেয়ে আবার '১৩ সালের সমান হল, এ যেন এক ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার। কিন্তু অর্থনীতি সম্বন্ধে একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকলেই বোঝা যায় যে, '২৭ সালের উৎপাদনের মোট মূল্য '১৩ সালের সমান হলেও সে উৎপাদনের

প্রধান অংশ ছিল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে গুরুশিল্পের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা, যানবাহন ব্যবস্থার পুনর্গঠন, যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের সংগঠন, বাঁধ ও জলসেচ ব্যবস্থা এবং ট্রাক্টর নির্মাণ প্রভৃতি।

এরপর '২৮—'৩২ সালের প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনায় এ সব বিভাগের উন্নয়নের ব্যবস্থা সফল হল। '৩৩—'৩৭ সালে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনের দিকে নজর দেওয়ার সময় পাওয়া গেল, উৎপাদন বাড়লো, ভোগ্যপণ্যের চরম অভাব সহ্য করে জনগণ এতদিন কোমর বেঁধে খেটেছে, এখন তাদের [illegible] মিটলো।

এরই মধ্যে হিটলারের অভ্যুত্থান এবং যুদ্ধের আসন্ন সম্ভাবনা, পশ্চিমাদের মিউনিকের শয়তানী এবং তার কাটান রুশ জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি। কিন্তু নাৎসীবাদী সাম্রাজ্যবাদী শত্রুশিবিরে কমিউনিষ্ট রুশিয়াই চরম শত্রু ফ্যাসিষ্টদের। তারা একদিন রুশিয়া আক্রমণ করবেই, এটা ষ্টালিন এমন নিঃসংশয়ভাবে বুঝেছিলেন যে [illegible] এবং সুদীর্ঘকালব্যাপী ধ্বংসশক্তি হিসেব করে কয়েকটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিতে পেরেছিলেন, সকল অপপ্রচার এবং নিন্দা অগ্রাহ্য করে কাজ করে চলেছিলেন। এই সময় তৃতীয় পরিকল্পনার ভোগপণ্যের উৎপাদনের ব্যবস্থার সঙ্গেই অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম নির্মাণের প্রয়োজন [illegible] উপর এসে পড়েছে। ১৫০০ মাইল জুড়ে ২৮০ ডিভিশন সৈন্য (৬০ লক্ষ) একচোটে রুখে দেওয়ার মত তোড়জোড়ের সময় পাওয়া গিয়েছিল কি?

ষ্টালিনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং তার সাফল্যই রুশিয়াকে ঐ প্রাথমিক পরাজয় ও ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও তাকে বাঁচিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত হিটলারের অত বড় সমরযন্ত্রকে চূর্ণবিচূর্ণ করে বার্লিন দখল করে বিজয় অর্জন সম্ভব হয়েছে।

সকলেই জানেন, আক্রমণের আগে দেশে দেশে পঞ্চম বাহিনী সংগঠন ছিল হিটলারের এক প্রধান রণনীতি। পশ্চিম ইউরোপের সকল দেশেই হিটলারের পঞ্চমবাহিনী গঠিত হয়েছিল, রুশিয়ায়ও সে চেষ্টা অনেকদিন আগেই শুরু হয়েছিল, এবং এক বিরাট পঞ্চমবাহিনী চক্রও গড়ে উঠেছিল '৩৬ সালের আগেই। তার বিশদ বিবরণ আছে Great conspiracy against Russia নামক বইয়ে অকমিউনিষ্ট বিখ্যাত আমেরিকান সাংবাদিকদের লেখা, সরকারী দলিলপত্রের নজিরের ভিত্তিতে।

সেই পঞ্চমবাহিনী চক্রের মধ্যে ছিলেন ট্রটস্কি, জিনোভিয়েফ, রাডেক, কামেনেফ, বুখারিন প্রভৃতি বড় বড় নেতারা এবং রেড আর্মির একদল উচ্চ বড় অফিসার। ষ্টালিনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মধ্যে প্রথম ও প্রধান কাজ হল এই পঞ্চমবাহিনী চক্রকে সমূলে নির্মূল করা। গুপ্ত পুলিসের সাহায্যে এই চক্রের সমগ্র ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে '৩৬ '৩৭-'৩৮ সাল জুড়ে মস্কো মামলায়, যখন ষ্টালিন এ চক্রের সকল শয়তানী উদঘাটন করে তাদের নির্মূল করার ব্যবস্থা করছেন, তখন এ চক্রের দালালরা প্রচার করছেন যে ষ্টালিন তাঁর নেতৃত্ব নিরঙ্কুশ করার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃকুল নির্মূল করছেন, আর আমাদের দেশের লোক গোগ্রাসে সেই অপপ্রচার গিলছে।

আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ঠিক ঐ তিনটে বছর মস্কোয় থেকে মামলা দেখেছেন এবং আমেরিকায় রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, মামলা নির্দোষভাবেই চলছে, ষড়যন্ত্র নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হয়েছে, এবং শেষে মন্তব্য করছেন, ষ্টালিন রুশিয়ায় হিটলারের পঞ্চমবাহিনী

সমূলে নির্মূল করলেন। এ সব কথা অ্যাম্বাসাডার ডেভিসের Mission to Moscow নামক বইয়ে দেখা যাবে।

স্টালিনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আর একটা হল রণনীতি ও রণ-কৌশল সম্পর্কে। মাদ্রাজের "হিন্দু" পত্রিকায় Nazi strategy v.s. Red strategy নামক এক প্রবন্ধে তার বিবরণ বেরিয়েছিল। তার মোদ্দা কথা হচ্ছে, ব্লিজক্রীগ ছোট দেশের ওপর যেমন কার্যকরী হয়, বড় দেশের ওপর তেমন হয় না। তীব্রগতিতে বর্শাফলকের মতন একস্থান ভেদ করে শত্রু সৈন্য ছোট দেশের এমুড়ো থেকে ওমুড়ো পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে, কিন্তু বড় দেশে তা হয় না। বর্শাফলক যত জোরে যত এগোয়, তার মূল ঘাটীর সঙ্গে যোগাযোগের লাইন ততই দীর্ঘ হয়, পিছন থেকে সে লাইন কেটে দেওয়ার সুযোগ তত বাড়ে। পক্ষান্তরে ভেতো দিগদিগ ন্তের "কোট" ছেড়ে খেলার মতন আক্রান্ত দেশ পিছিয়ে এসেও দাঁড়াবার জায়গাতো পায়ই, বরং দেওয়ালে পিঠ রেখে লড়ার সুযোগ পেয়ে আত্মরক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

তদনুসারে রেড আর্মিকে তৈরী করা হয়েছিল। বর্শাফলকের মুখে দাঁড়িয়ে বাধা দিয়ে লোকক্ষয় না করে দুপাশে সরে গিয়ে তাদের এগোতে দেবে এবং দুপাশ দিয়ে বর্শাফলকের পিছনে চলে গিয়ে তাদের লাইন কেটে দেওয়ার চেষ্টা করবে। এই নীতিই রেড আর্মি লড়াইয়ের প্রথমদিকে অনুসরণ করেছিল, এবং তার ফলে যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনের নাজী-অধিকৃত এলাকায় নাজীরা একদিনের জন্যেও স্বস্তি পায়নি, অজস্র নাজী সৈন্য ঐ সব এলাকাতেই মরেছে। ২।১ জায়গায় রেড আর্মি এ নীতি না মেনে দাঁড়িয়ে লড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, এবং তার জন্যে স্টালিনকে দায়ী করে, শত্রুরা অপপ্রচার করেছিল, স্টেলিন হিটলারকে বিশ্বাস করে প্রতিরক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থা করতে গাফিলতি করেছেন।

স্টালিনের তৃতীয় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হল উরালের ওপারে পশ্চিম সাইবিরিয়ায় একটা নতুন বৃহৎ গুরু শিল্পকেন্দ্র সংগঠন। ম্যাগনিটোগোরস্ক লৌহশিল্পকেন্দ্র এবং কুজনেটস্ক কয়লা শিল্পকেন্দ্র শুধু রুশিয়ার নয়,—সারা দুনিয়ার সর্ববৃহৎ শিল্পকেন্দ্রগুলির অন্যতম। পশ্চিম রুশিয়ার শিল্পোন্নত এলাকা জার্মান আক্রমণে বিধ্বস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে জেনেই তিনি সে ব্যবস্থা করেছিলেন। এবং তার সঙ্গে পশ্চিম রাশিয়ায় কতকগুলো নতুন অভাবনীয় ব্যবস্থা করেছিলেন। একটা নতুন লৌহশিল্প কারখানা দেখতে গিয়ে অ্যাম্বাসাডার ডেভিস দেখেন, কারখানার বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রপাতি কনক্রিটের মেঝের ওপর আলগা বসানো রয়েছে মেঝের সঙ্গে মজবুদ করে গেঁথে দেওয়া হয়নি। এই রেওয়াজ-বহির্ভূত ব্যবস্থা দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে ইঞ্জিনীয়াররা সহাস্যবদনে জবাব দিয়েছিল, ভবিষ্যতে এর প্রয়োজন বোঝা যাবে।

প্রাথমিক নাজী অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, এসব কারখানা স্টীম ট্রেন বোঝাই হয়ে পূব মুখে পাড়ি দিয়েছে, এবং তার সঙ্গে শ্রমিকরাও চলেছে। উরল পার হয়ে রেল লাইনের ধারে মাঠের মাঝে তারা নামলো এবং অল্পদিনের মধ্যেই ঐ সব কারখানা সেখানেই অস্থায়ীভাবে খাড়া করা হল, এবং উৎপাদনের কাজও চালু হয়ে গেল। এসব না হলে যুদ্ধের পরিণতি অন্যরকম হত। স্টেলিন কোনো দিকেই কোনো গাফিলতী করেননি। মরিস হিণ্ডাস তাঁর "Mothör Russia" বইয়ে লিখেছেন, রুশিয়ার সর্বত্র

লোকে বলে, ভাগ্যে স্টালিন ছিল, তা না হলে আজ রুশিয়া হিটলারের [illegible] পরিণত হত।

স্টেলিনের চতুর্থ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, সম্ভাব্য জাপানী আক্রমণের প্রতিরোধ [illegible]। [illegible]র জন্যে তিনি পূর্ব-সাইবিরিয়ায় একটা পৃথক বৃহৎ সামরিক ব্যবস্থার সংগঠন করেছিলেন, যাতে পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে পূর্ব রণাঙ্গনে সৈন্য ও সমরসম্ভার চালান দেওয়ার প্রয়োজন না হয়। এই ব্যবস্থার প্রথম সুফল জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিম মহাসাগরের দিকে অভিযান, এবং দ্বিতীয় সুফল যুদ্ধের শেষ [illegible] বাহিনী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রবেশ।

যাই হোক, ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে যখন জাপান অকস্মাৎ পার্ল হারবার অ[illegible] দখল করে নিল, তখন আমেরিকাও যুদ্ধে নেমে পড়তে বাধ্য হল। [illegible] [illegible] [illegible]টলার আর একবার নতুন জোরে আক্রমণ শুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়ার দিকে, [illegible]লেনগ্রাড-ককেশাস-গ্রজনির দিকে। এদিকে জাপানও দক্ষিণে চীন, ইন্দোচায়না, [illegible]াপুরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো, যেন সাঁড়াশীর দুই দাঁড়ার মতন জার্মানী ও জাপান [illegible]ক দিকে এগিয়ে আসছে।

এই অবস্থায় ১৯৪২ সালের মে মাসে মহাত্মাজী এক সাক্ষাৎকার উপলক্ষে বললেন, "আমার সহানুভূতি অবশ্য রুশিয়া ও চীনের দিকে। আমি আগে বলতুম, আমার নৈতিক সমর্থন সম্পূর্ণরূপে বৃটেনের দিকে, কিন্তু আজ বৃটেনের সঙ্গে স্বীকার করছি, আজ [illegible] মন [illegible] বৃটেনকে নৈতিক সমর্থন দিতে চায় না। ভারতের প্রতি বৃটেনের ব্যবহারে আমি আজ মর্মাহত। অবশ্য আমি চাই না যে বৃটেন অবমানিত হোক বা যুদ্ধে পরাজিত হোক, কিন্তু আমার মন আর তাকে নৈতিক সমর্থন দিতে চায় না।"

ওদিকে বৃটিশ শ্রমিকদলের চাপে এবং আমেরিকারও এ রকম চাপে, বৃটেন [illegible] কা রুশিয়ার প্রতি শত্রুতা সম্বরণ করে তার সঙ্গে ইউরোপে হিটলার-বিরোধী জোট গঠন করতে বাধ্য হয়েছে এবং '৪২ সালেই পশ্চিমে দ্বিতীয় যুদ্ধ ফ্রন্ট খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। [illegible]ন হিটলার গ্রজনিতে (ককেশাস) আটকে গেছে, রেড আর্মি '২১ সালের চুক্তির জোরে উত্তর ইরানে ঢুকে হিটলারের অগ্রগতির পথ সীল করে দিয়েছে।

এ দিকে '৪২ সালের প্রথম দিকে জাপান ইন্দোচীন দখল করে এগিয়ে আসছে। [illegible]য়েক সপ্তাহ মাত্র লড়াইয়ে সিঙ্গাপুরের তথাকথিত দুর্ভেদ্য বৃটিশ নৌ-ঘাঁটির পতন হয়েছে, বৃটেন মালয় থেকে বিতাড়িত হয়ে ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়ে পাৎলুন ফেলে ছুটে পালাচ্ছে। ৭ই মার্চ রেঙ্গুনের পতন হল, বৃটেন পালিয়ে এসে উঠলো চাটগাঁয়, এবং ভারতে জাপানী আক্রমণ ঠেকাবার অন্য কোন উপায় না দেখে পূর্ববঙ্গে উপস্থিত জাপানী বাহিনী যাতে যাতায়াতের নৌকা না পায় এবং তাদের প্রধান খাদ্য চাল না পায়, সে জন্যে বাংলার গভর্নরের আদেশে সমস্ত নৌকা সরকার দখল করে নিলে, জেলেরা না খেয়ে মরলো, আর [illegible]লের ভাণ্ডার নিয়ন্ত্রণ করে দুর্ভিক্ষও গড়ে তোলা হল। জাপানী আক্রমণের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বিদ্রোহ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রবীণ বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী [illegible] জাপানীদের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে আই এন এ সংগঠিত করলেন। কিন্তু ভারতের জনগণ থেকে তিনি বহুকালাবধি বিচ্ছিন্ন। পক্ষান্তরে সুভাষবাবু কংগ্রেসের

ভূতপূর্ব সভাপতিরূপে এবং নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতারূপে ভারতের জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত এবং বিদ্রোহের আদর্শ নিয়ে তিনিও জার্মেনীতে অনুরূপ কাজ শুরু করেছিলেন। সুতরাং রাসবিহারী সুভাষবাবুকে ইউরোপ থেকে আনিয়ে তাকেই আই-এন-এর নেতারূপে খাড়া করলেন। ভারতীয় জনগণের বৃটিশ-বিরোধী সাধারণ মনোভাব স্বভাবতই জাপানী ফৌজ এবং আই-এন-এর দিকে ঝুঁকলো।

'৪২ সালের ১২ই এপ্রিল জওহরলাল নেহরু বললেন,—বাইরে থেকে যে-কোন সৈন্যদলই ভারত আক্রমণ করুক তারা প্রকৃতপক্ষে জাপানীদেরই হাতের পুতুল। আমিই সর্বপ্রথম তাদের বাধা দোব—তলোয়ার হাতে নিয়ে। মহাত্মাজী বলেছিলেন, বৃটেন যদি ভারত ত্যাগ করে, তাহলে জাপানীরা ভারত আক্রমণ করবে না—(বিখ্যাত "কুইট ইণ্ডিয়া" প্রস্তাবের মূল কথা এইটেই)। কিন্তু জুন মাসের ২১শে তারিখের 'হরিজনে' তিনি লিখলেন, "অ্যাক্সিস শক্তির মিত্রজনোচিত বচনের ওপর আমি কখনো কোন গুরুত্ব দিই নি, তারা যদি ভারতে উপস্থিত হতে পারে, তাহলে অন্যদের মুক্তিদাতারূপে আসবে না, আসবে লুঠের বখরা নিতেই। সুতরাং সুভাষবাবুর নীতি সমর্থন করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।"

বৃটেনের লুঠের বখরা নিতে দেওয়া যে ঠিক না, বৃটেনের লুঠ অক্ষুণ্ণ রাখলে যে তারা যুদ্ধে জিতে নিশ্চিন্ত হয়ে আমাদের স্বাধীনতা দিতে পারবে, এটা বোঝা গেল।

কমিউনিষ্ট পার্টিও ধুয়ো তুললো, জাপানকে রুখতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুভাষবাবুর নামকরণ করলো ট্রেটর বোস। তখন জনযুদ্ধের নামে ভারতে বৃটেনের যুদ্ধোদ্যম সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টি আবার "আইনী" হয়েছে।

ছত্রিশ

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে কমিউনিষ্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। তার আগেই তাদের তরফ থেকে একখানা বই প্রকাশিত হয়েছিল Forward to Freedom, এবং তাতে বলা হয়েছিল, সাম্রাজ্যবাদ আজ দর্শায় এবং বন্ধুহীন, মালয়ের মত অসম্ভব ব্যর্থতা তাদের অপদার্থতার চূড়ান্ত নিদর্শন, কোন দেশপ্রেমিক ভারতবাসীরই এ সম্বন্ধে কোন মোহ বা ভ্রান্তি নেই, এখন আমাদের কর্তব্য হল সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া এবং ভারতের একতাবদ্ধ শক্তিকে সাম্রাজ্যবাদী স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা।

'এ যুদ্ধকে আমরা জনযুদ্ধ বলি এই কারণে যে, বর্তমান নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কল্যাণে জনগণই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠিকে পরাজিত করবে—এ যুদ্ধের শেষে চার্চিলের মত সাম্রাজ্যবাদী দলের মাতব্বরীর অবসান হবে। এ যুদ্ধ সমর্থন করার অর্থ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের গোলামী নয়, পরন্তু গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন এবং জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।'

কমিউনিষ্ট লীডার হীরেন মুখার্জি তাঁর India struggles for Freedom নামক বইয়ে "Forward to Freedom" থেকে উপরোক্ত উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন—"ভারত অ্যাক্সিস শক্তি জোটের বিজয়ও চায় না, বৃটিশ শাসনের যন্ত্রণাকেও ঘৃণা করে, যে শাসন

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ভারতের জনগণের সর্বশক্তি প্রয়োগের পথেরও বাধা স্বরূপ, এই উভয় সঙ্কট থেকে মুক্তির পথ খুঁজে না পেয়ে আমাদের নেতারা যখন দিশেহারা তখন একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিই দেশের সম্মুখে একটা কার্যকরী অপরাজিত মনোভাবসুলভ দৃঢ় প্রত্যয়শীল কর্মসূচী উপস্থিত করেছিল, যার ফলে অচল অবস্থার অবসান, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং দেশরক্ষা কাযে জনগণকে সংগঠিত করা সম্ভব হতে পারে।”

এতখানি বাগাড়ম্বরের মর্মোদ্ধার করলে আসল কথাটুকু হল এই যে, এখন আমাদের যুদ্ধে ক্রমে সহযোগিতা ও সাহায্য করাই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য এবং এই নতুন নীতির কাজেই কমিউনিষ্ট পার্টির আত্মনিয়োগ করতে হল।

এম এন রায় যখন যুদ্ধের গোড়া থেকেই যুদ্ধটাকে ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের যুদ্ধোদ্যমে সহযোগিতার পথ ধরেছিলেন এবং জাপানী আক্রমণের আসন্ন সম্ভাবনা দেখে ভারত সরকারের কাছে জনগণের দাবী ও পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন,—তখন কমিউনিষ্টরা আগাগোড়া এর বিরোধিতা করেছে।

ইংরেজকে ভোগা দিয়ে কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠার কমিউনিষ্ট নীতি, এবং ইংরেজকে ভাগা দিয়ে জনগণের হাতে অস্ত্র দেওয়ানোর বঙ্কিম নীতি, গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতাদের নীতির মতই ব্যর্থ হল। কংগ্রেসের ভক্ত মুরুব্বী, যাদের পরামর্শানুযায়ী কংগ্রেসের সংসার চলে, সেই বিড়লা, টাটা প্রমুখ শিল্প ব্যবসায়ী ধনিকগোষ্ঠি এবং যাদের পাশাপাশি কংগ্রেস এক অনুচরের সহযোগিতা ও সাহায্যেই ইংরেজদের যুদ্ধোদ্যম সমানে চলতে লাগলো। নতুন যোগাযোগ হল এইটুকু মাত্র যে, কলকারখানায় ধর্মঘট নিবারণের কাজে কমিউনিষ্ট পার্টিও তাদের "কাটা" পরণ করতে নামলো পৃথকভাবে।

সরকার তাঁদের প্ল্যান নিয়ে কাজ করে চলেছে। জাপানের যুদ্ধে নামার সঙ্গে আমেরিকার প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পর ভারত সরকার সত্যাগ্রহী কংগ্রেস নেতাদের জেল থেকে মুক্তি দিয়েছিল। তার পিছনে ছিল কংগ্রেসের সহযোগিতা পাওয়ার জন্যে বিলেতের লেবার পার্টির তাগিদ। কিন্তু চার্চিল লিনলিথগোর প্ল্যানের কোন পরিবর্তন হল না। তারপর সিঙ্গাপুরের পতনের পর তারা বাংলাদেশকে খরচের খাতায় লেখে 'ইষ্টার্ণ কম্যাণ্ডের" মূল ঘাঁটি কলকাতা থেকে রাঁচিতে নিয়ে যায়। কারণ তারা ধরে নিয়েছিল জাপানের কলকাতা দখল ঠেকানো যাবে না, এবং তাদের ডিফেন্স লাইন হবে বিহার। তাই তারা পূর্ববঙ্গ থেকে নৌকা এবং চাল সরিয়ে নিয়ে জাপানীদের বেকায়দা করবার প্ল্যানের সঙ্গে দেশে দুর্ভিক্ষের গোড়া পত্তন করেছিল। তারপর কলকাতায় জাপানী বোমা পড়ার পর কলকাতা ছেড়ে সাধারণ মানুষ যখন পালাতে শুরু করেছে, তখন ইংরেজ সরকারও কলকাতা ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হয়ে "Scorched Earth Policy" অনুসারে বড় বড় কল কারখানা, হাওড়া ব্রিজ, পাওয়ার হাউস প্রভৃতি ভেঙ্গে দিয়ে যাওয়ার জন্যে সবত্র "মাইন" বসায়।

"এই শয়তানী চক্রান্তের ফলে দেশ যাতে রসাতলে না যায়, সেইজন্য ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ আসে ব্যাপক সংগঠন গড়ে তোলার, যাতে সুশৃঙ্খলায় এবং সজ্ঞানে জাপানীদের সঙ্গে আলোচনা করে অধিকার বদল (Transference of Control) করবার সম্ভাবনা জেগে ওঠে। দিনের পর দিন দারুণ দুর্ভাবনার ভিতর দিয়ে, B. P. C. C.-র কর্তৃপক্ষকে কাজ করতে হয়। দেশে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গিয়েছিল এবং দেশের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা

রক্ষার জন্য সকল স্তরের লোক এগিয়ে এসেছিল।" (বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ৫৫১ পৃষ্ঠা)।

"তখন মৌলানা আজাদ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। আমরাও কংগ্রেসী ছিলাম। পরামর্শ স্থির হল, মৌলানা সাহেবের সম্মতি নিয়ে বাংলায় 'নাগরিক রক্ষা সমিতি' (Citizens' Protection Committee) যেমন গড়ে' তোলা যাবে, তেমন অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ সমিতি গড়ে' তোলার সম্মতি মৌলানা সাহেব যেন দেন। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে' উঠলে তাদের সাহায্যে দেশের বহু জায়গায় সময় বুঝে স্বাধীনতা ঘোষণা করা সম্ভব হবে।

"কলকাতায় কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ মতো কংগ্রেস ও কংগ্রেসের বাহিরের লোক নিয়ে Bengal Civil Protection Committee গড়া হয়। ভূপতি (মজুমদার) সেক্রেটারী, ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় মেডিক্যাল বিভাগের চেয়ারম্যান ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সভাপতি নির্বাচিত হন।...মূল কেন্দ্র ৮৮নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীটে (বিজয় সিং নাহারের বাড়ী), কুমার সিং হলে অ্যাম্বুলেন্স ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।" (ঐ ৫৫০ পৃষ্ঠা)।

যাদুদা'ও রাঁচিতে এক নাগরিক রক্ষা সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। "আমরা স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহে মন দিলাম। সহরে যত রকম লোক আছে, সব রকম লোককে আহ্বান জানালাম। আদিবাসীরাও এগিয়ে এলেন। সব রকম লোকের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কার্য-নির্বাহক কমিটি হল। সভাপতি রইলাম আমি। সাধারণ সেক্রেটারী হলেন শ্যামকিশোর শাহু। এঁরা স্বামী ও স্ত্রী গান্ধীজির অনুচর, ওয়ার্ধা আশ্রমে অনেকদিন ছিলেন।

"নিম্নলিখিত বিভাগগুলি গড়া হল, (ক) আন্দোলন বিভাগ; (খ) লোক সংগ্রহ বিভাগ; (গ) প্রচার বিভাগ; (ঘ) চিকিৎসা ও শুশ্রূষা বিভাগ; (ঙ) অগ্নির উৎপাত থেকে রক্ষাকারী বিভাগ; (চ) সংবাদ সংগ্রহ বিভাগ; (ছ) অর্থ সংগ্রহ বিভাগ; (জ) স্বেচ্ছাসেবক বিভাগ; (ঝ) যোগাযোগ রক্ষা বিভাগ; (ঞ) বিপদ কালে নতুন আশ্রয় খোলার বিভাগ।" (ঐ ৫৫২ পৃষ্ঠা)।

"জাপান যেমন সিঙ্গাপুর দখল করে বার্মা মুখো হল, এখানে ইংরেজ সৈন্যদের জঙ্গলের যুদ্ধ শেখাতে আনা হল। দুর্দিন যদি হঠাৎ আসে, তাহলে বোম্বাইয়ের দিকে পালাবার একটা নতুন রাস্তা ছোটনাগপুর থেকে তৈরীতে আগেই মন দিল।

"আমরা বিকেন্দ্রিক সংগঠনে মন দিই। দলে দলে লোকে স্বেচ্ছাসেবকের খাতায় নাম লেখাতে লাগলো। তাদের জমায়েত করে লোক দেখানো হৈ চৈ করলাম না, কিন্তু তাদের প্রস্তুতির শিক্ষা ভাল ভাবেই চলতে লাগলো।" (ঐ ৫৫৩ পৃষ্ঠা)।

"গোয়েন্দা বিভাগ বিচলিত হল। শুনেছে আমাদের স্বেচ্ছাসেবক আছে, কিন্তু তাদের দেখা যায় না। সন্দেহের কথা। (ঐ ৫৫৪ পৃষ্ঠা)।

"শ্যামকিশোর বললেন,—"স্বেচ্ছাসেবকদের চরকা কাটার ব্যবস্থা নেই, বড় দুঃখের কথা।" আমরা জানালাম, "এ কাজের কর্মীরা চরকা কাটে না।" (ঐ ৫৫৫ পৃষ্ঠা)।

"এদিকে গোয়েন্দা বিভাগ আমাদের সম্বন্ধে গুপ্তসংবাদ সংগ্রহে উঠে পড়ে লাগল। বহু নাগরিকের কাছে ঘোরাফেরা শুরু করে দিল। একদিন শুনি আমাদের সেক্রেটারী শ্যামকিশোর এক গোয়েন্দাকে ডেকে আমাদের সভ্য তালিকার খাতাটি দেখিয়ে দিয়েছে।

সে সত্য ও অহিংসার লোক। তার কাছে এ ব্যাপারের অশোভনতা ধরা পড়েনি।" (ঐ ৫৫৬ পৃষ্ঠা)।

"পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের মহা চিন্তা, আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের হৈ চৈ তার দ তে পায় না। আগেই বলেছি আমরা দিকে দিকে সংগঠন গড়েছিলাম। কারণ জাপানীরা রাঁচি আক্রমণ করলে প্রথমেই টেলিফোন সংযোগ বন্ধ করে দেবে। টেলিফোন না চ. । গেলে সকে ন্দ্রক স ংন কাজে ব্যাঘাত পাবে। কেন্দ্রকে সংবাদ না। জাপানীর প্রথম উদ্দেশ্য রাঁচি আক্রমণ নয়। প্রধান উদ্দেশ্য টাটানগর ..... আক্রমণ। অস্ত্র কারখানা বাঁচাবার জন্যে রাঁচি ..... সৈন্যদল ..... বিভাগ থাকে। উপস্থিত সৈন্যেরা লেগে যাবার পর তাদের সাহায্যে রাঁচির সৈন্যেরা, একপ সম্ভাবনা সরকার বুঝত। ওদের কাছ থেকে এ খবর ..... জানতাম।

"সরকারের জমা করা সংবাদ থেকে জানতে পারলাম জাপানীরা বঙ্গোপসাগরের উ দিয়ে উড়িষ্যা উপকূলে নামতে পারে। সেখান থেকে ময়ূরভঞ্জের ..... যেসব খনি আছে তা দখল করবে এবং টাটার কারখানা ..... ধ্বংস করবে। ..... প্রেক্ষিতে আমরা কাজ করছিলাম।" (ঐ ৫৬৯ ১০ পৃষ্ঠা)।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ..... , শ্যামকিশোর ..... বিপ্লবী নেতা ..... এই যে রাঁচি ..... বিপ্লবী ..... বাবুদের ..... প্রেক্ষিতে সুভাষবাবু ..... এবং ..... কংগ্রেস ..... প্রবীণদের নীতির বিচার ..... গান্ধীবাদের ..... যাই হোক, ইতিমধ্যেই ..... পার্টি ..... বৃটিশ ক্যাবিনেট, কংগ্রেসের ..... প্রস্তাব দিয়ে "সোসিয়ালিস্ট স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠিয়েছি, ৪২ সালের মার্চ মাসে। মাসখানেক ..... আলোচনার পর স্যার ক্রিপস মিশন ব্যর্থ ..... ফিরে গেলেন, এবং বলে ..... বৃটেনের সদিচ্ছা প্রমাণিত ..... কংগ্রেসের অযৌক্তিক মনোভাব।

ক্রিপস যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় রাশিয়ায় বৃটিশ রাষ্ট্রদূত ..... সম্পর্কের উন্নতি করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তা ছাড়া ..... ব্যক্তিগত বন্ধু, ... ছাত্রাবস্থার সহপাঠি। মিত্রপক্ষ ..... বৃটেনের ..... সে ভারতের সঙ্গে ..... ভারতের সংযোগিতা ..... যুদ্ধ ..... সেই ..... সনের জন্যে চার্চিল ..... অন্যায় ..... ক্রিপস মিশন পাঠিয়েছিলেন, যাতে মিশন ব্যর্থ হয়, অথচ দোষটা ..... ঘাড়ে পড়ে। সে বিষয়ে চার্চিল সফল হয়েছিলেন।

ক্রিপস প্রস্তাবের মাদ্দা কথা ছিল, যুদ্ধের পরে ভারতকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেওয়া হবে, এবং বর্তমানে বড়লাট থাকবেন সর্বময় কর্তা, কিন্তু প্রধান প্রধান ভারতীয় দলের প্রতিনিধি নিয়ে একটি ..... কাউন্সিল গঠিত হবে, যারা যুদ্ধে ..... সহযোগিতা করবে। বর্তমান সেনা ..... ডিফেন্স মেম্বার, ... ভারতীয় ..... গঠিত হবে এক ডিফেন্স ..... মন্ত্রী দপ্তর, যার ..... কাজের ভার পাবে। যুদ্ধ পরিচালনের কর্তৃত্ব ভারতীয়দের হাতে দেওয়া চলবে না, কারণ

ভারতীয় মানে তো "বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি।" বস্তুত ক্রিপস পৃথক পৃথক ভারতীয় দলের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবেই আলোচনা করেছিলেন।

কংগ্রেস রাজী হল না। মহাত্মাজী বললেন, "যে ব্যাঙ্ক ফেল মারতে চলেছে, সে ব্যাঙ্কের পোষ্ট-ডেটেড চেকের ওপর ভারতের কোন লোভ নেই।" মিলিটারী কতৃত্ব সম্পর্কে ডিফেন্স কো-অর্ডিনেশন মন্ত্রী দপ্তরটাকে লোকে ঠাট্টা করে নাম দিলে, ষ্টেশনারী ক্যান্টিন-পেট্রোল মন্ত্রীদপ্তর।

"যে ব্যাঙ্ক ফেল মারতে চলেছে" অর্থাৎ এ যুদ্ধে জাপানই জয়ী হবে, ইংরেজকে পরাজিত হয়ে ভারত ত্যাগ করতে হবে, এই সম্ভাবনার আশা বা আশঙ্কাই মহাত্মাজীর চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত করছিল। কিন্তু ইংরেজ তা ভাবছিল না, কারণ লেণ্ড লীজ চুক্তি ও জাপানীদের পরাজিত করার গরজে আমেরিকা ভারতে এসেছিল বৃটিশ যুদ্ধোদ্যমের সাহায্যের জন্যে।

যাই হোক, এপ্রিলের শেষে এলাহাবাদে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির এক মিটিংয়ে বলা হল, "কোনো বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ বা আক্রমণ মারফৎ যে স্বাধীনতা আসতে পারে কমিটি একথা বিশ্বাস করে না। সুতরাং বিদেশী আক্রমণকে বাধা দিতেই হবে। কিন্তু যেহেতু বৃটিশ সরকার ভারতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় সম্মত নয়, অতএব ভারতীয়দের পক্ষে এ বৈদেশিক আক্রমণে বাধা দেওয়ার একমাত্র পন্থা হবে অহিংস অসহযোগ, আক্রমণকারীদের কোনো প্রকারে সাহায্য না করা। আমরা তাদের কাছে মাথা নত করবো না, তাদের আদেশ মানবো না, তাদের কৃপাপ্রার্থী হবোনা, তাদের কাছে ঘুস খাবো না। যদি তারা যদি আমাদের বাড়ী-ঘর জায়গা জমি দখল করতে আসে, মরণ পণ করে বাধা দেবো।'

এই সময়েই মহাত্মাজীর "কুইট ইণ্ডিয়া" শ্লোগানের উৎপত্তি হয়। মে মাসের গোড়ায় এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ভারতীয়দের ঐক্যের জন্যে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে আমি বুঝেছি যে, ভারত থেকে বৃটিশ শাসন অপসারিত না হলে ভারতীয়দের মধ্যে সত্যিকারের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, কারণ সকল দলই এই বৈদেশিক শক্তির সাহায্যের আশায় নিজ নিজ মতে দৃঢ় থাকবে। কাজেই আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ভারত থেকে বৃটিশ-শক্তি অপসারিত হবে এবং অন্য কোন বিদেশী শক্তি তার স্থান অধিকার করবে না, এমন অবস্থা না হলে ভারতীয়দের মধ্যে আন্তরিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।"

এই "কুইট ইণ্ডিয়া" শ্লোগানের আদর্শ অনুসারে ১৪ই জুলাই ওয়ার্ধাতে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মিটিংয়ের এক প্রস্তাবে বলা হল: "ভারত থেকে বৃটিশ শাসন অপসারিত করার এই প্রস্তাব দ্বারা কংগ্রেস গ্রেট বৃটেন বা মিত্রশক্তি গোষ্ঠির যুদ্ধ পরিচালনার কোন অসুবিধা সৃষ্টি করতে চায় না, কিম্বা জাপান বা অন্য কোন অ্যাক্সিস শক্তি কতৃক ভারত আক্রমণ বা চীনের প্রতি চাপ বৃদ্ধি করার সম্বন্ধে উৎসাহিত করতে চায় না। মিত্রশক্তি গোষ্ঠির প্রতিরোধশক্তি ক্ষুণ্ণ করার কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নয়। জাপানী আক্রমণে বাধা দেওয়া বা আত্মরক্ষা করার জন্য মিত্রশক্তি গোষ্ঠি যদি ভারতে তাদের সৈন্যবাহিনী রাখতে চায়, কংগ্রেস তাতে বাধা দেবে না। ভারত থেকে বৃটিশ শক্তির অপসারণের এই প্রস্তাবের অর্থ এ নয় যে, ইংরেজদের সশরীরে ভারত ত্যাগ করতে হবে (physical withdrawal)।

"কংগ্রেস চায়, মালয়-সিঙ্গাপুর-বার্মার মতন বিপর্যয় যেন ভারতকে ভোগ করতে না হয়।

তার জন্যে তারা জাপানী বা অন্য যে-কোন বিদেশী শক্তির আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়। কংগ্রেস চায়, বৃটেনের প্রতি বর্তমানে ভারতবাসীর যে বিদ্বেষ ভাব আছে, তার অবসান করতে এবং পৃথিবীর সকল জাতির স্বাধীনতার জন্যে যে যুক্ত প্রচেষ্টা চলছে, তার সকল দায়-দায়িত্বের অংশীদার হতে, যেটা সম্ভব হতে পারে, শুধু যদি ভারত নিজে স্বাধীনতার আনন্দ অনুভব করতে পারে।

"কংগ্রেসের এই 'আবেদন' যদি নিষ্ফল হয়, তাহলে অবশ্য গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস সংগ্রাম ছাড়া কংগ্রেসের আর কোন পথ খোলা থাকবে না, এবং সে সংগ্রাম সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে ৭ই আগষ্ট এ-আই-সি-সির আগামী অধিবেশনে।"

এই হল "কুইট ইণ্ডিয়া" শ্লোগানের মোদ্দাকথা। সরকার এই আবেদনের জবাবে এলাহাবাদের এ-আই-সি-সির অফিসে হানা দিয়ে মহাত্মাজীর খসড়া প্রস্তাব সহ অন্যান্য কাগজপত্র দখল করে নিলে এবং প্রদেশে প্রদেশে সার্কুলার পাঠিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতির নির্দেশ দিলে।

এই প্ররোচনার পর বাধ্য হয়ে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি বম্বের ৮ই আগষ্টের ঐতিহাসিক অধিবেশনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করে, সেই প্রস্তাবই বিখ্যাত "আগষ্ট প্রস্তাব" বলে পরিচিত। তাতে বলা হল :

"চীন ও রুশিয়ার মহামূল্য স্বাধীনতার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় এবং সম্মিলিত রাষ্ট্র গোষ্ঠীর প্রতিরক্ষা শক্তির যাতে কোন ক্ষতি না হয়, সে দিকে কমিটির যথেষ্ট লক্ষ্য আছে, কিন্তু ভারত এবং ঐ সব দেশের যে সঙ্কট ঘনিয়ে আসছে, তাতে ভারতের পক্ষে এক বিদেশী শাসনের অনুগত হয়ে নিষ্ক্রিয় থাকাটা শুধু অপমানজনক বা তার আপন প্রতিরক্ষা শক্তির অক্ষমতাই নয়, পরন্তু সম্মিলিত রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সঙ্কটের প্রতিকারের ও ঐ সব দেশের জনগণের স্বার্থরক্ষারও অনুকূল নয়। অতএব ভারতের মুক্তি ও স্বাধীনতার অবিসংবাদী অধিকার প্রতিষ্ঠা কল্পে কমিটি যতদূর সম্ভব ব্যাপক আকারে অহিংস গণসংগ্রাম আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত মঞ্জুর করছে, যাতে ভারত গত বাইশ বছরের সঞ্চিত সর্বপ্রকার অহিংস সংগ্রামের শক্তির ব্যবহার করতে পারে।"

এই মিটিংয়ের আগে এক সাক্ষাৎকার উপলক্ষে মহাত্মাজী বলেছিলেন, "প্রস্তাব পাশ করার পর এবং সংগ্রাম শুরু করার আগে বড়লাটের কাছে অবশ্যই একখানা পত্র দেওয়া হবে, চরম পত্ররূপে নয়, পরন্তু সংগ্রাম এড়ানোর জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ ক'রে। যদি অনুকূল সাড়া পাওয়া যায়, তাহলে আমার সেই চিঠিই হবে আপোষ আলোচনার ভিত্তি।"

মিটিংয়ে মহাত্মাজী বলেছিলেন,—"জাপানীদের অভ্যর্থনা করার মনোভাব ত্যাগ কর। আমি চাই, তোমরা অহিংসাকে একটা পলিসী হিসেবেই গ্রহণ কর। আমার কাছে অহিংসা একটা ক্রীড, কিন্তু তোমাদের কাছে এটা একটা পলিসীই হোক। সুশৃঙ্খল সৈন্যের মত তোমরা পুরোপুরি এ নীতি গ্রহণ করবে এবং সংগ্রামের সময় পুরোপুরি পালন করবে।"

সংগ্রাম হবে অহিংস, তাও তখনো শুরু হয়নি, এই অবস্থার মধ্যেই সরকার বিদ্যুৎ-গতিতে আক্রমণ করলে। ৯ই আগষ্ট সকালে মহাত্মা গান্ধী এবং ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্য গ্রেপ্তার ও বন্দী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশের সকল উল্লেখযোগ্য কংগ্রেস নেতাও গ্রেপ্তার হলেন। ওয়ার্কিং কমিটি, এ-আই-সি-সি এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলো

বেআইনী ঘোষিত হল, কংগ্রেসের এলাহাবাদস্থিত কেন্দ্রীয় কার্যালয় দখল করা হল, কংগ্রেসের তহবিলও বাজেয়াপ্ত করা হল। ছাপাখানার কণ্ঠরোধ করে গ্রেপ্তার, গুলি চালানো প্রভৃতির সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করা হল।

মহাত্মাজী ও কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের খবর দাবানলের মত দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বিক্ষুব্ধ জনগণের সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল। সারাদেশ যেন একসঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়ে সংগ্রামের জন্য [illegible] দাঁড়িয়েছিল এবং সেই দেশজোড়া গণবিক্ষোভকে সরকার বাহাদুর লাঠি, টিয়ার গ্যাস, গুলী চালিয়ে স্তব্ধ করে দেবার দুশ্চেষ্টায় ক্ষেপে গিয়েছিল।

নিষেধাজ্ঞার বেড়াজালের ফাঁক দিয়ে যে যৎসামান্য সংবাদ কাগজে প্রকাশ হত, তাতে প্রকৃত অবস্থা জানার উপায় ছিল না। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় হোম মেম্বার কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ থেকে ১৯৪২ সালের শেষ পর্যন্ত সময়ের যে সরকারী বিবরণ পাওয়া যায়, তদনুসারে,

গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৬০,২২৯ জন, ভারতরক্ষা আইনে আটক বন্দীর সংখ্যা ১৮,০০০; পুলিস ও মিলিটারীর গুলিতে নিহত ১৪০ জন এবং আহত ১৬৩০ জন। ৬০টি জায়গায় সৈন্য আনা হয়েছিল, ৫৩৮টি ঘটনায় গুলি চালানো হয়েছিল এবং জনগণকে ছত্রভঙ্গ করার জন্যে ৫ বার বিমান ব্যবহার করা হয়েছিল।

বেসরকারী সূত্রের খবর থেকে অবশ্য জানা গিয়েছিল, সরকারী বিবরণে অত্যাচার অনেক কম করে দেখানো হয়েছিল, যা বলা বাহুল্য, যা সকলেই বোঝে।

এরপর জনগণের হিংসাত্মক কার্যকলাপের সরকারী বিবরণের কথা। প্রচলিত হরতাল, মিটিং, প্রোসেশন থেকে শুরু করে কয়েক সপ্তাহ পরে সরকারী আক্রমণের পাল্টা আক্রমণে কাজ। সরকারী হিসাব মতে, ২৫০টা রেল ষ্টেশন বিধ্বস্ত বা ধ্বংস করা হয়েছিল; ৫০০টার বেশি পোষ্ট অফিস আক্রান্ত হয়েছিল, যার মধ্যে ৫০টাতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং রাস্তাগুলো বিধ্বস্ত হয়েছিল, যুক্ত প্রদেশের পূর্বাংশ ও বিহারের রেলপথ অনেকদিন পর্যন্ত অচল হয়েছিল, ভারতের অনেক স্থানেই যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল; বহু সরকারী ভবনসহ ১৫০ এর বেশী থানা আক্রান্ত হয়েছিল, কয়েকজন অফিসার ও সৈন্যসহ ৩০ জনের বেশী পুলিস নিহত হয়েছিল। বিহার, ইউ পি-র বালিয়া প্রভৃতি জেলা অনেকদিন পুরো জেলার অনেকখানি জুড়ে [illegible] ইংরাজ সরকারের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল, সাময়িক সরকারী শাসনের পাশাপাশি বেশ কিছুদিন বেসরকারী শাসন ব্যবস্থাও চালু হয়েছিল। “[illegible] ডিরেক্টরেট” নাম নিয়ে একদল গুপ্ত বিপ্লবী কংগ্রেস 'নাশকতা বাহিনী' নামক এক গুপ্ত পত্রিকা, যা ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কার্যপ্রণালী প্রচার শুরু করেছিল।

পুণার আগা খাঁ প্যালেসের বন্দীনিবাস থেকে মহাত্মাজী ৪২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর বড়লাটকে যে চিঠি লেখেন, তাতে তিনি কংগ্রেসের নামে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার হিংসাত্মক কাজের নিন্দা করেন এবং তার জন্যে নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করে বলেন, “যে যাই বলুক, আমি এবং কংগ্রেসের অহিংস-নীতি আজও অব্যাহত আছে। কংগ্রেস নেতাদের পাইকারী গ্রেপ্তারে জনগণের ক্রোধ আত্মসংযমের সীমা অতিক্রম করেছে! সর্বপ্রকার ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য সরকারই দায়ী—কংগ্রেস নয়। আমার মনে হয়, সরকারের পক্ষে

একমাত্র উচিত কাজ হবে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দেওয়া, দমনমূলক আইন প্রত্যাহার করা এবং মিটমাটের উপায় অনুসন্ধান করা। হিংসাত্মক কাজ রোধ করার যথেষ্ট ক্ষমতা সরকারের আছে। দমন নীতি শুধু [illegible] বাড়াতে পারে।"

তারপর '৪৩ সালের ১৯শে জানুয়ারী মহাত্মাজী বড়লাটকে [illegible] এক পত্র লেখেন। তাতে তিনি হিংসাত্মক কাজের [illegible] সরকারকে [illegible]।

"যদি আপনি আমাকে কিছু [illegible] যদি আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন, [illegible] প্রায়শ্চিত্ত করব। আর যদি আপনি [illegible] কোনো নতুন [illegible] করতে বলেন, তাহলে আমাকে [illegible] ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মিশতে দিন। আমি মিনতি করি, এ অচল অবস্থার অবসানের জন্যে আপনি মনস্থির করুন।"

কিন্তু সরকার মহাত্মাজীর কোনো প্রস্তাবকেই আমল দিলে না, [illegible] সরকার ও মহাত্মাজীর মধ্যে এ পর্যন্ত [illegible] পত্র বিনিময় হয়েছিল সেগুলো প্রকাশ করল [illegible] বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়ে মহাত্মাজী ৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২১ দিন অনশন ঘোষণা করেছিলেন। এই পত্রগুলোর মধ্যে সরকার মহাত্মাজীর '৪২ সালের সেপ্টেম্বরের চিঠিখানা প্রকাশ করেনি, যাতে মহাত্মাজী জনগণের [illegible] সরকারী [illegible]কে দায়ী করেছিলেন।

যাই হোক, এই অনশন ধর্মঘটের নোটিশের জবাবে বড়লাট যে জবাব দিয়েছিলেন, [illegible] মহাত্মাজী আবার বড়লাটকে লিখলেন, "আপনি [illegible] এই অনশনকে [illegible] বাজী মাৎ করার কৌশল বলেছেন। [illegible] বন্ধু হলে আপনি যে কেমন করে আমার উপর এমন নীচতার, এমন কাপুরুষতার [illegible] আরোপ করতে পারেন, তা [illegible] ধারণার অতীত। আপনি যা বলেছেন, বলুন, কিন্তু তবু আমার পক্ষে এই অনশন সর্বোচ্চ বিচারালয়ের কাছে ন্যায়বিচারের আবেদন ছাড়া আর কিছুই নয়, যে ন্যায়বিচার আমি আপনার কাছে বারবার চেয়েও পাইনি।"

ঐ অনশন ধর্মঘটের নোটিশের চিঠিতে মহাত্মাজী লিখেছিলেন, "আকাল [illegible] দুর্ভিক্ষের অবস্থায় কোটি কোটি ভারতবাসীর যে দুর্দশা হয়েছে, তা দেখে আমার বুক ফেটে যায়। যদি দেশে প্রতিনিধিদের [illegible] সরকার থাকত, [illegible] লোকের এ দুর্দশা সবখানি না হলেও অনেকখানিই এড়ানো সম্ভব হত।"

যাই হোক, সরকার গ্রাহ্য না করলেও সারা দেশের [illegible] মহাত্মাজীকে বাঁচানোর জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো এবং সরকারের কাছে তাঁর মুক্তির দাবী জানাতে লাগলো। ভারতের খৃষ্টানদের সর্বোচ্চ পুরোহিত মেট্রোপলিটান অব ইণ্ডিয়া মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে বড়লাটের অনুমতি চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হলেন। এমন কি ভারতে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত দূত উইলিয়াম ফিলিপস্ পর্যন্ত মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেলেন না।

শেষ পর্যন্ত অনশনের ২১ দিন কেটে গেল, মহাত্মাজীর মৃত্যু হল না। কিন্তু দেশ যেন হতাশায় ভেঙে পড়লো। এদিকে বাংলার লাটের বঞ্চনা-নীতির কল্যাণে বাজার থেকে চাল উধাও হয়ে গিয়ে পড়েছে মজুতদার মুনাফাখোর চোরাকারবারীদের খপ্পরে।

তার ওপর চাষের দুর্গতির ফলে অজন্মা হল। বিহার-উড়িষ্যা-মাদ্রাজেও অজন্মা। ফলে বাংলা দেশে এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে, যাতে সরকারী মতে ১০ লাখের মতন, কিন্তু বেসরকারী মতে ৩৫ লাখ লোক মারা গেল। সরকার যেন ঠাট্টা করে কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে ইংরেজী পোষ্টার সেঁটে দিলেন Grow more food. এ ঠাট্টা পরবর্তী বহু বৎসর ধরে চলেছিল।

এই ভাবে '৪৩ সাল কাটলো। '৪৪ সালের গোড়ার অবস্থা অ্যাক্সিস শক্তিগোষ্ঠীর পরাজয়ের পালা। রুশবাহিনী তখন ষ্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে নাৎসী সমরনায়ক পলাসকে সসৈন্যে বন্দী করে পশ্চিমমুখে ছুটছে, আর নাৎসী বাহিনী প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে। এই চোটে '৪৪ সালের শেষ পর্যন্ত হিটলারী সমরযন্ত্র চুরমার হয়ে গিয়েছিল এবং হিটলার ঝাড়ে-বংশে নির্মূল হয়েছিল।

এদিকে '৪৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ব ভারতে আসাম মণিপুরে "জাপানী আক্রমণ" পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু তার কোন বড় রকমের প্রতিক্রিয়া ভারতে ঘটেনি। বৃটিশ সেনাপতির মতে সে আক্রমণ একটা "token invasion"।

মে মাসের গোড়ায় মহাত্মাজী ম্যালেরিয়া জ্বরে ভোগেন এবং যে সরকার বজ্রকঠিন পণ করে বসেছিল, আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার না করলে কিছুতেই মহাত্মাকে মুক্তি দেওয়া হবে না, সেই সরকার হঠাৎ "মেডিক্যাল গ্রাউণ্ডে" মহাত্মাজীকে মুক্তি দিলে।

মুক্তি পাওয়ার পরই "নিউজ ক্রনিকেল"-এর প্রতিনিধি ষ্টুয়ার্ট গেল্ডারের সাক্ষাৎকারে মহাত্মাজী বললেন, এখন আবার আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার কথাই ওঠে না, '৪৪ সাল তো '৪২ সাল নয়। আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহারের অধিকার তাঁর নেই, কারণ ওটা ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব, কিন্তু সে প্রস্তাবের ব্যবহারিক অংশ অর্থাৎ সংগ্রামের মঞ্জুরী এখন তামাদি হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে (lapsed)।

তখন লিনলিথগো চলে গেছেন এবং লর্ড ওয়াভেল বড়লাট হয়েছেন। মহাত্মাজী তাঁর কাছে চিঠি লিখে ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে দেখা করে বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করার অনুমতি চাইলেন এবং আর একটি নূতন প্রস্তাব করলেন যে, যদি অবিলম্বে ঘোষণা করা হয় যে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং এখন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার কাছে দায়ী এক জাতীয় সরকার [illegible] হয় যে, যুদ্ধ যতদিন চলবে, ততদিন তার পরিচালনার বর্তমান ব্যবস্থাই বহাল থাকবে কিন্তু ভারতের ঘাড়ে তার ব্যয়ের বোঝা চাপানো হবে না, তাহলে তিনি [illegible] এবং [illegible] যুদ্ধ প্রচেষ্টায় পূর্ণ সহযোগিতা করার পরামর্শ দেবেন।

ওয়াভেল সাফ জবাব দিলেন, মহাত্মার চিঠির এ প্রস্তাব আলোচনার ভিত্তিরূপেও গ্রহণ যোগ্য নয়।

এখন মহাত্মাজী রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করতে উঠে পড়ে লাগলেন। একদিকে তিনি অহিংসার মহিমা প্রচার এবং এখন সংগ্রাম চলবে না, সম্ভবও নয় বলে ফতোয়া দিয়ে চললেন, অপরদিকে রাজগোপালাচারীর ফরমূলা নিয়ে জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার এবং বিশেষ বিশেষ এলাকায় মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সম্বন্ধে আলোচনা চালাবার প্রস্তাব করলেন।

প্রোঃ হীরেন মুখার্জি তাঁর বইয়ে (India Struggles for Freedom) বলেছেন : "দুই সর্ববৃহৎ সংগঠন এইবার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠন করবেন ভেবে সারা দেশ উল্লসিত হয়ে উঠল। কমিউনিস্ট পার্টির আনন্দ হল সবচেয়ে বেশী, কারণ সকলের নিন্দা বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করে তারাই '৪২ সাল থেকে বলে এসেছে, 'জাতীয় ঐক্যই আমাদের ঢাল ও তলোয়ার, আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে শক্তি ছিনিয়ে আনার জন্যে যে হাতিয়ার [illegible] তৈরী করে নিতে হবেই।'

"দেশের স্বাধীনতা এবং সকল প্রতিষ্ঠানের [illegible] জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করতে কংগ্রেস ও লীগের সমঝোতা প্রয়োজন। তাই [illegible] ধ্বনি। তারা কংগ্রেসীদের বোঝাতেন, মুসলিম জাতিগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন, আর মোসলেম লীগকে বলতো, মুসলমানদের স্বাধীনতা [illegible] শুধু কংগ্রেসের সঙ্গে সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা।"

তখন "ভারতের চেতনা" [illegible] '১৮ সালে যাকে 'arch reformist' আখ্যা দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি বর্জন করে, তিনি গান্ধীকে "জাতির পিতা" এবং সুভাষবাবুকে 'ট্রটস্কির দোসর' বলে দিয়েছেন। "আগস্ট বিপ্লবের সন্তান" "লেনিন-স্তালিনের পার্টি" কংগ্রেস-লীগের ঐক্য [illegible] সরকার গঠনে [illegible] বাধ্য করবার জন্য যুদ্ধ [illegible] 'আপনা' হতে "আপনাকে বলতে হবে" বলে [illegible] কংগ্রেসের [illegible] চক্র যখন ঘরপাক খাচ্ছে, তখনকার কথা, ১৯৪৪ সনের [illegible] কথা। হীরেনবাবু লিখলেন, যাচ্ছে আসাম মণিপুরে জাপানী আক্রমণ এবং নেতাজী সুভাষের মুক্তি সংগ্রাম বিরোধী প্রচারের কথা।

যে কথাটা তিনি তার বইয়ে একেবারে চেপে গেছেন, সেটা হচ্ছে কোহিমায় সুভাষবাবুর আজাদ হিন্দ ফৌজের আগমন ও পতাকা উত্তোলনের কথা। তিনি বৃটিশ সেনাপতির উক্তি জাপানীদের token invasion-এর কথা লিখলেন, কিন্তু এ কথাটা লিখলেন না যে, সুভাষবাবু জাপানী সৈন্য নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন নি।

কিন্তু কোহিমায় আজাদ হিন্দ ফৌজের পতাকা উত্তোলনের কথা যখন জানা গেল, তখনই এ কথারও জবাব পাওয়া গেল, কেন সরকার [illegible] আশাতীতভাবে উদার হয়ে হঠাৎ মহাত্মাজীকে মুক্তি দিয়েছিল। আর সুভাষবাবু ভুল করলেও, ব্যর্থ হলেও, একথা ইতিহাসে লেখা থাকবেই যে, তিনিই ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টার সর্বশেষ প্রতীক ও প্রতিনিধি।

সাইত্রিশ

সুভাষবাবু আশা করেছিলেন, তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে বাইরে থেকে ভারত আক্রমণ করলে ভারতের জনগণ, বিশেষতঃ তরুণ লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে, একটা বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুত্থান ঘটবে এবং এইভাবে তাঁর বিপ্লব প্রচেষ্টা সফল হবে। কিন্তু বৈপ্লবিক সংগঠনও ছিল না, আর আগস্ট বিপ্লবের দেশজোড়া অসংগঠিত

লড়াইয়ে প্রচণ্ড মার খেয়ে জনগণ তখন হাঁপাচ্ছিল। তার ওপর গান্ধী কংগ্রেস, বিপ্লবী দাদারা, কমিউনিষ্ট দল, সকলে একযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এবং বিপ্লবের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহ প্রচার চালাচ্ছিলেন। তারও পরে ছিল তাঁর আজগুবী ঘোলা আইডিয়া, গান্ধী-কংগ্রেসের ওপর ভক্তি এবং তার প্রচার, যার নিদর্শন আজাদ হিন্দ ফৌজের নাম নেহরু ব্রিগেড, আজাদ ব্রিগেড প্রভৃতি।

তার বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বহরও কম ছিল না, তিনি নাকি জাপানী সৈন্য নিয়ে ভারত আক্রমণ করতে আসছেন এবং দেশটাকে জাপানের হাতে তুলে দিয়ে ফ্রান্সের পেতাঁর মতন জাপানীদের তাঁবেদাররূপে ভারতের বুকে ফ্যাসিষ্ট শাসন কায়েম করতে আসছেন। এই কমিউনিষ্টরা তাঁকে ট্রেটর বোস আখ্যা দিয়েছিল।

কিন্তু বিপ্লবী দাদাদের তাঁর বিরোধিতা করার কোন সঙ্গত অজুহাতই ছিল না। নিজেদের বিপ্লব বিরোধী গান্ধীপন্থী আদর্শই তার মূল। আজ "বিপ্লবী মহানায়ক" বলে যে রাসবিহারী বসুর স্মৃতি দিবসে তারা বক্তৃতা করে জনগণকে বুঝিয়ে দেন, তাঁরাই সেই বিপ্লবী মহানায়কের আদি ও অকৃত্রিম সগোত্র, সেই বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুই যে ছিলেন সুভাষবাবুর friend, philosopher and guide, একথাটা যেন চাপা পড়ে গেছে।

আজ এ কথাটাও সকলেই জানে যে সুভাষবাবু জাপানী ফৌজের ভারতে প্রবেশে বিরোধীই ছিলেন এবং তাঁর পিছনে জাপানী ফৌজ ভারতে প্রবেশ করেনি। এ বিষয়েও রাসবিহারী বসু ছিলেন তার সমর্থক ও পরামর্শদাতা, এটাও বোঝা কঠিন নয়। অনেকে বলে থাকেন, এই কারণেই জাপান তাঁকে পুরোপুরি সাহায্য দেয়নি। প্রকৃত কথা, ভারতে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আশা তিনিও করেছিলেন, সুভাষবাবুর ইতিহাস এবং বিশ্বাস থেকেই। সুতরাং আর যেই সুভাষবাবুর বিরোধিতা করুক, রাসবিহারীর আপন সগোত্র বিপ্লবী দাদাদের বিরোধিতার কোন সঙ্গত বা প্রশংসনীয় কারণই ছিল না।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিপ্লবী দাদারা আমাদের শত্রুর শত্রুর সাহায্য নিতে গিয়েছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সুভাষবাবুও সেই চেষ্টাই করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, বিশেষতঃ মধ্যপ্রাচ্যে, বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লব প্রচারের চেষ্টা, এমন কি তুর্কী সুলতানের হাদা ফতোয়ার সুযোগ নিতেও ভারতীয় বিপ্লবীরা পিছপাও হননি, আর দ্বিতীয় যুদ্ধে সুভাষবাবু ও রাসবিহারী বসু একটা আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলতে সফল হয়েছেন। যাদুদা তাঁর বইয়ে (বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি) বলেছেন, তাঁরা জার্মান ফৌজ ভারতে আমদানী করতে চাননি, সুভাষবাবুও জাপানী ফৌজ ভারতে আমদানী করতে চাননি। তিনি অপরাধটা করলেন কোথায়?

আসলে বিপ্লবী দাদাদের মতিগতির পরিবর্তনই যে তাঁর বিরোধিতার কারণ, সে পরিচয়ও ঐ বইটাতেই পাওয়া যাবে। তিনি ঐ বইয়ে তাঁর বিপ্লবের চতুরঙ্গ বাহিনীর প্ল্যানের কথা বহুবার বিজ্ঞাপিত করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত বলেছেন, তাঁদের বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার কারণ, তাঁদের পিছনে সংগঠিত গণশক্তি ছিল না। চমৎকার কথা। কিন্তু তারপরে তিনি বলেছেন, গান্ধী-কংগ্রেসের কৃপায় যখন জনগণ স্বাধীনতা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, তখন বিপ্লব এবার সফল হবেই, সনাতন বিপ্লবাদের কাজ এখন শুধু গান্ধী-কংগ্রেসের পিছনে

দাঁড়ানো। তাই তিনি আগস্ট-বিপ্লবকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় অভিনন্দিত করেছেন। গান্ধী কংগ্রেসের সমর্থনে সেই বিপ্লবের আদর্শ আর তার পরিণতির কথা আজ সর্বজন বিদিত ইতিহাস। কিন্তু সে বিপ্লবে এটা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে, ভারতের জন দেহ সংগ্রাম-প্রকৃতি, শক্তি, মনোবল, সবই ছিল সন্দেহাতীতরূপে সুপরিণত, শুধু সংগঠিত বিপ্লবী নেতৃত্বের অভাবে সেই বৈপ্লবিক গণশাক্তির অভ্যুত্থান বিপ্লব-বিরোধী গান্ধী কংগ্রেসের সমর্থনে একটা বিরাট অন্ধ গণবিক্ষোভমাত্রে পর্যবসিত হল এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবাধ বেপরোয়া বিপুল নির্যাতনে ব্যর্থ হল।

মহাত্মাজী সম্বন্ধে যাদুগোপাল বাবুর অভিমতও এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর গ্রন্থে লিখছেন: "১৯২১ সালে তাঁর সঙ্গে দেখা করে কথা কয়েছিলাম। তিনি বৃটিশ সম্পর্ক ছিন্ন পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করতে রাজী হননি। তিনি চাইতেন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী পাশ হয়। মহাত্মাজী ১৯৩০ সালে স্বাধীনতা আনার আন্দোলন করেন। কিন্তু ১৯৩১-৩২ সালে বিলাতে গোল টেবিল বৈঠকে গিয়ে চেয়ে বসলেন পূর্ণ-স্বাধীনতার সারাংশ (Substance of independence)। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় যুদ্ধ বাধলে তিনি বিনাসর্তে ইংরেজকে সাহায্য করার পক্ষে ছিলেন। ১৯৪২ সালে মার্চ মাসে ক্রীপস যে প্রস্তাব আনেন তা দেখেই প্রত্যাখ্যান করেন।

"(করো দেশে ব্যর পর) বলতে গেলে বলা যায় জাপানীরা ভারতের একেবারে দ্বারদেশে উপস্থিত। ভারত আক্রমণ তার পক্ষে আর কল্পনার বিষয় নয়। মহাত্মা গান্ধী এই বার বিলক্ষণ বুঝে 'ভারত ছাড়ো' রব তুললেন ইংরেজ রাজত্ব ভারত থেকে যায় যায়। 'ভারত ছাড়ো' রব এ অবস্থায় তাঁর সারাজীবনের সাধনের প্রয়োজনে হৃদয়ের মধ্যস্থল হতে উত্থিত হল।"

"মহাত্মাজীকে আমি বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে তুলনা করি। রাজা হরিশ্চন্দ্র এক সময়ে উদরী রোগে আক্রান্ত হন। বরুণ দেবকে তুষ্ট করতে পারলে তবে তিনি রোগমুক্ত হবেন। এই বিপদে পড়ে তিনি বরুণের উদ্দেশ্যে নিজের পুত্রকে অর্ঘ্য দেবেন সংকল্প করেন। কিন্তু পুত্র বাৎসল্যে নিজের কথা রক্ষা করতে পারলেন না। তাই তিনি পরের একটি ছেলে বিশ্বামিত্র শিষ্য দেবরাতকে এনে নরমেধ যজ্ঞ করেন। বিশ্বামিত্র রাজাকে যথোচিত শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর হলেন। তাঁকে শেষ পর্যন্ত রাজ্যহীন, স্ত্রী পুত্র থেকে বিচ্যুত ও নগরান্তবাসীর ভৃত্য, শ্মশানচারী করে ছাড়লেন। রাজ্যে, কিন্তু তাঁর লোভ ছিল না, স্পৃহাও ছিল না। তাই হরিশ্চন্দ্রকে শুধরে তাঁরই হাতে রাজ্য পুনঃসমর্পণ করে নিজ শান্তিপূর্ণ দীন আশ্রমে ফিরে গেলেন।

"গান্ধীজীও ইংরেজকে শোধরাতে চেয়েছিলেন। তাকে সমূলে তাড়ানো তাঁর কাছে প্রাণের জিনিস হতে পারে না। কিন্তু ইংরেজেরা শোধরাবার পথে যাচ্ছিল না বলেই "ভারত ছাড়ো" বলতে হয়েছিল।

বাঁচা গেল। যাদুবাবুর স্বচ্ছ বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিচয় পাওয়া গেল এবং বহু বড়াযিত "কুইট ইণ্ডিয়া" মন্ত্রশক্তির একটা বৈপ্লবিক বিশ্লেষণও পাওয়া গেল। "গান্ধী বাদের বৈপ্লবিক ভূমিকা"।

তারপরে '৪৪ সালে মহাত্মাজীর বিনাসর্তে মুক্তির পর দেখা গেল একদিকে ইংরেজ কোহিমা থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজকে হটাচ্ছে ভারতবাসীর সহায়তার জোরে এবং বার্মা থেকে জাপানীদের হটিয়ে নিজেরা আবার গিয়ে চেপে বসছে বর্মীদের সাহায্যে, আর এক দিকে মহাত্মাজী সারা দেশ জুড়ে প্রচার করছেন, আগষ্ট বিপ্লব আমার কাজও নয়, কংগ্রেসের কাজও নয়, ওর জন্যে দায়ী সরকারী নির্যাতন এবং সঙ্গে সঙ্গে সুগ্রীব দোসর (জয়প্রকাশ নারায়ণ) প্রচার করছেন, এখন দেশ আর বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত নয়। সুতরাং এটা বেশ বোঝা যায় যে মহাত্মাজীকে বিনাসর্তে মুক্তি দেওয়ার পিছনে ইংরেজের প্ল্যান ছিল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ন্যূনতম সম্ভাব্যতাকেও বানচাল করার জন্যে বিপ্লব বিরোধী শক্তিকে কাজে লাগানো। সে কাজ হাসিল হল গান্ধী-জয়প্রকাশ বিপ্লবীদল-কমিউনিষ্ট জোটের কল্যাণে।

* * * * *

এখন আমার নিজের অবস্থার কথা। আমার ব্যবসায়ী জীবনের দৌড়ের কিছু পরিচয় আপনারা পূর্বেই পেয়েছেন। এবারকার ব্যবসায়ের দৌড়ও প্রায় তদ্রূপ। ব্যবসা চলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। বিনা মিস্ত্রিতে পুরনো ফার্নিচারের ব্যবসা। নিজেই নিলামে মাল খরিদ করি, নিজেই ছুতোর মিস্ত্রি, পালিসওয়ালা, এমন কি চেয়ারের গদীমিস্ত্রী পর্যন্ত। দু'বছর কাজ চালাবার পর প্রথম মিস্ত্রী রেখেছি। মাল বিক্রীর জন্যে বড়লোকের বাড়ী বা অফিসে না ঘুরলে ব্যবসা চলে না, অথচ আমার এই ক্যানভাসিং-এর বিদ্যে একেবারেই নেই, না আছে প্রবৃত্তি, না আছে সময়।

নিলামে সুযোগ পেলে সস্তায় দামী আর্ট-কিউরিওর জিনিস কিনতুম, যা বড়লোকদের কাছে বেচতে পারলে মোটা লাভ পেতে পারতুম, কিন্তু তা-ও কখনো হয়নি। দুটো একটা সচ্ছল গৃহস্থ বন্ধু বান্ধব নিয়েই ছিল আমার কারবার,—তাদেরই কারো কাছে অল্প লাভ নিয়ে সেগুলো বেচতে পারলেই এই মনে করে সান্ত্বনা পেতুম যে, সস্তায় এটা ভাল জিনিস যখন বেচতেই হবে, তখন সেটা বন্ধু বান্ধবদের বেচতে পারাই ভাল।

এই রকমের ব্যবসার মধ্যে কিন্তু প্রাণপণে কাগজ পড়ি, ইউরোপ এবং ভারতের লড়াই সম্বন্ধে যথাসম্ভব ওয়াকিবহাল থাকার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করি। কাগজ কিনে পড়া সম্ভব নয় বলে কয়েকটা জায়গা রোজ যাই বিভিন্ন কাগজ পড়ার জন্যে। এর মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির বইয়ের দোকান ন্যাশান্যাল বুক এজেন্সীতে এক গাড়ী পুরনো "মস্কো নিউজ" এসে পড়লো এবং ওরা তা থেকে কতকগুলো বিভিন্ন সেট তৈরী করে বেচতে লাগলো। আমি তার এক সেট কিনে ফেললুম,—এবং তারপর "মস্কো নিউজের" গ্রাহক হয়ে গেলুম।

তখন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এমন জটিল যে তার ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা আন্দাজ করা সহজ ছিল না এবং সব বুঝে উঠতেও পারতুম না। তবে সোটা সব দিক থেকে সরে এসে কমিউনিষ্ট পার্টির ওপরই সন্দেহ হচ্ছিল, অথচ তার যে বিফলই পথেই চলছে, এটাও মনে হত এবং হতাশ হতুম। তবুও মনে মনে কল্পনা করতুম, একটা সত্যিকারের বিপ্লব যদি কোনো দিন ঘটে, তাহলে আর একবার দুর্গা বলে ঝুলে পড়বো। অক্ষম নিরুপায়ের সান্ত্বনা—যাকে বাঙালীরা বলে "আত্মাইংরা কথা।"

সর্বত্রই যুদ্ধের কথা—যেখানে যাই, যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু কথা না হয়ে অন্য কথা হয় না।

আমি বলতুম, জার্মেনী যুদ্ধে হারবে। যে শুনতো, সেই মনে করতো লোকটা Pro-British—জার্মেনীর বিরুদ্ধে কথা বলা া তখন যেন ভারতবাসীর পক্ষে unpatriotic কাজ।

জাপান যে ভারত আক্রমণ করতে পারবে না, এ কথাও বলতুম এবং কেউ মানতো না। কলকাতায় বোমা ফেলে গেল, আর বলে কিনা জাপান আক্রমণ করবে না! আমি বলতুম, বৃটেন-আমেরিকার সামরিক শক্তি আর চীন ও ভারতের জনবল এবং মাল-মশলা একসঙ্গে যুক্ত হয়েছে—এ অবস্থায় জাপান যতদূর সম্ভব এগিয়েছে এবং ছড়িয়েছে তার পরে ভারত আক্রমণের মতন বড় আড়ম্বর কখনই করবে না। যদি ইন্দোচীন-মালয় বার্মায় সে তার শক্তি সংহত করতে না পারে তাহলে তার ধ্বংস অনিবার্য।

ইতিমধ্যে আমার ঘরে নিলামে কেনা কিছু খুচরো জিনিস এবং আর্ট কিউরিও জমে গিয়েছিল এবং সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মার্কেটে একটা ঘর পেয়ে কিছু জিনিস দিয়ে সাজিয়ে এক দোকান খুলে আমার ছোট ভাগ্নেকে বসিয়ে দিয়েছিলুম, বাত্রে আমিও যেতুম। আগষ্ট হাঙ্গামার সময় কলকাতায় আমেরিকান সৈন্য এসেছে, অনেকে মার্কেটে আসতো টুকটাক কিউরিও শ্রেণীর মাল সংগ্রহের জন্যে। একটা দল—৫।৭ জন প্রায় রোজ আসতো। আমার সঙ্গে তাদের আলাপ হয়ে গিয়েছিল। একদিন একজন দল ছেড়ে পিছনে পড়ে আমাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, আমি কিছু জিনিস কিনতে পারি কি না। কি জিনিস, জিজ্ঞাসা করতে সে বললে, "যা চাও, সবই দিতে পারি।" ইসারায় বুঝিয়ে দিলে সব রকমের small arms তারা দিতে পারে, যত চাই।

একটু কৌতূহল হল, কিন্তু সামলে নিয়ে বললুম, আমি গরীব মানুষ, আমার কি টাকাকড়ি আছে!" তারপর বললুম, "আমি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি, আর কেউ কিনতে পারে কিনা।" সে বললে, "বেশ, কয়েক দিন পরে আমাকে বোলো।"

ভেবে-চিন্তে কয়েক দিন ধরে আগষ্ট হাঙ্গামার গা ঢাকা কংগ্রেসী মহলে এবং কমিউনিষ্ট মহলে খুব সন্তর্পণে খোঁজ নিয়ে দেখলুম, এ সুযোগ নিতে কেউই রাজী নয়। তখনকার বলে হাল ছেড়ে দিলুম এবং আমেরিকান বন্ধুকে নিরাশ করে বিদায় করলুম।

আগষ্ট-বিপ্লবীরা যে সশস্ত্র বিপ্লব করতেও পারবে, এ বিশ্বাস অবশ্য আমার ছিল না। কিন্তু ২।৪ জন ছটকে বিপ্লবী আগষ্ট হাঙ্গামার সুযোগে বৈপ্লবিক কণ্ডুয়ন মেটাবার জন্যে কোন কোন স্থানে গোপনে হাঙ্গামার নেতৃত্ব দিতে ছুটেছিলেন, জানতুম। সরকারী অত্যাচারের কিছু সশস্ত্র জবাব দেওয়ার কাজ তাঁরা হয়তো করতে পারেন ভেবেছিলুম। সম্ভবত তাদের সম্পর্কেই হীরেন বাবু তাঁর বইতে লিখেছিলেন—"There was the inevitable handful of fifth columnists and political irresponsibles who wanted to fish in troubled waters." কিন্তু আমার লোভ হয়েছিল এই জন্যে যে প্রচুর অস্ত্র কেনার সুযোগ একটা দুর্লভ ব্যাপার,—যে কেউ যদি কিনে রাখতে পারে, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

আমি ইতিমধ্যেই Pat Sloan-এর How the Soviet State is run বইখানা পড়েছিলুম এবং খুব ভাল লেগেছিল বলে প্রায় নিষ্কামভাবেই, কারণ প্রকাশের কোন সম্ভাবনাই ভাবতে পারিনি, বইটার মর্মানুবাদ লিখে ফেলেছিলুম। শেষ পর্যন্ত বইটা

বুক এম্পোরিয়াম কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল '৪৫ সালে, "সোভিয়েট রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার কাঠামো" নামে।

এদিকে বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি চলেছে অভাবনীয় ধারায়। ষ্টেলিনগ্রাড সহরটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করবার পরও নাজী সেনাপতি মার্শাল পলাস আড়াই লাখ সৈন্য সহ লাল ফৌজ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে হাজার হাজার নাজী সৈন্য বলি দিয়েও শেষ পর্যন্ত সসৈন্যে বন্দী হয়েছেন। সেই যে লাল ফৌজের পাল্টা মার শুরু হয়েছে, শেষ পর্যন্ত বার্লিনের পতনে তার শেষ হয়েছে। তিন বছর অবরোধের পর লেনিনগ্রাড মুক্ত হয়েছে এবং তার পর একে একে বল্টিক ও পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোও মুক্ত হয়েছে।

স্বয়ং চার্চিলের মুখে উচ্চারিত হয়েছে "গ্রেট ষ্টালিন"। সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ ষ্টেলিনগ্রাডের বাসীদের সম্মানচিহ্নরূপে এক তরবারি উপহার দিয়েছেন। কিন্তু এই '৪৪ সাল পর্যন্ত ইউরোপের লড়াইয়ে একা রুশিয়াকে হিটলারের সমগ্র শক্তির সঙ্গে লড়তে হয়েছে। '৪২ সালের পশ্চিম ইউরোপে বৃটেন আমেরিকা কর্তৃক দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার যে চুক্তি তারা রুশিয়ার সঙ্গে করেছিল, চার্চিলের বিশ্বাসঘাতকতায় সেটা '৪৪ সালের আগে কার্যকরী হয়নি। হিটলারের নিশ্চিত পতনের শেষ অধ্যায়ে যখন লালফৌজের হাতে বার্লিনের পতন অবশ্যম্ভাবী বলে বোঝা গেল, তার আগে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা হয়নি।

এদিকে জাপানীদের যথেচ্ছাচারে জর্জরিত বর্মীদেরও ভুল ভেঙ্গেছে এবং বর্মী অ্যান্টি ফ্যাসিষ্ট অং সানের নেতৃত্বে বর্মীদের সহযোগিতা পেয়ে বৃটেন জাপানকে তাড়িয়ে আবার বার্মায় জেঁকে বসেছে। ড বা মো প্রভৃতি বৃটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী বর্মী নেতাদের পরে বৃটেন ফাঁসিতে লটকেছে।

'৪৫ সালের গোড়ায় হিটলারের পতনের সঙ্গে ইউরোপের লড়াই শেষ হওয়ার কয়েক মাস পরে জাপানের পিছু হটা সম্পূর্ণ হল। মালয়-ইন্দোচীনও জাপানী কবল থেকে মুক্ত হল। ওদিকে বিজয়ী লাল ফৌজ মাঞ্চুরিয়ায় আক্রমণ শুরু করলো। জাপান সাইবিরিয়ার মেরিটাইম প্রভিন্স অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগর সংলগ্ন প্রদেশ দখলের উপযোগী লাইন মাঞ্চুরিয়ায় তৈরী রেখেছিল, ভাবেনি যে রুশিয়া কোনদিন আক্রমণ করতে পারবে এবং লাই ডিফেন্সিভ লড়াইয়ের ব্যবস্থা করেনি। ফলে রুশ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের মুখে তৃণের মতন তার সামরিক শক্তি উড়ে গেল।

কয়েকটি দিনের মধ্যে রুশিয়া কোরিয়ার সীমান্তে এবং মাঞ্চুরিয়ার বন্দর ডাইরেনে পৌঁছে গেল। অবস্থা এত কাহিল হওয়া সত্ত্বেও তোজো আত্মসমর্পণে রাজী নয়, হাজারে হাজারে জাপানী জীবন বলি দিয়েও লড়াই চালাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া যখন জান বাঁচানোর আর কোন উপায় নেই, তখন আমেরিকা কোরিয়ার ধারে পৌঁছতে পারেনি, অথচ কোরিয়াও লাল ফৌজের হাতে পড়ার আসন্ন সম্ভাবনা। তাই, আমেরিকা নাগাসাকি এবং হিরোশিমায় অ্যাটম বোমা ফেলে জাপানীদের আত্মসমর্পণ ত্বরান্বিত করে।

জাপানীদের আত্মসমর্পণের পর উত্তর কোরিয়ায় লাল ফৌজ এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় আমেরিকান বাহিনী প্রবেশ করলো। এদিকে মাঞ্চুরিয়া এবং উত্তর চীনে মাও সেতুংয়ের চীনা লাল ফৌজ জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়ছিল এবং জাপানীদের আত্মসমর্পণের পর তারা মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীনে জাপানী সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে শুরু করে দিলে। দক্ষিণ থেকে

সেনাপতি চিয়াং কাইশেক হুকুম দিলেন, তাঁর প্রতিনিধিরাই জাপানীদের নিরস্ত্র করবে, কমিউনিষ্টরা অস্ত্র সংগ্রহ বন্ধ করুক। আমেরিকা জাহাজ ও বিমান দিয়ে চিয়াংএর দলকে উত্তর অঞ্চলে পৌঁছে দিলে। লাগলো গৃহযুদ্ধ, চিয়াং এবং কমিউনিষ্টদের মধ্যে। সেই যুদ্ধের শেষ পরিণতি হল চীন থেকে চিয়াং এবং আমেরিকার বিতাড়ন এবং ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে নয়া চীনের প্রতিষ্ঠা।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিণতি ও স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে এই ব্যাপারগুলোর প্রভাব অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, যেটা পরে বোঝা যাবে। তাই এ ব্যাপারগুলো আমাদের জেনে রাখা এবং মনে রাখা প্রয়োজন।

যুদ্ধ শেষ হলে ভারতে আবার একটা নতুন নির্বাচনের বন্দোবস্তের কথা উঠলো। কংগ্রেস এবং মোসলেম লীগের সমান সমান প্রতিনিধিত্ব নতুন ব্যবস্থাপক সভায় থাকবে বলে দুই পার্টির মতৈক্য হল। এ বিষয়ে পরামর্শ করার জন্যে লর্ড ওয়াভেল বিলাত ঘুরে এলেন। তারপর '৪৫ সালের জুন জুলাইয়ে ওয়াভেল প্ল্যান নিয়ে এক সম্মেলন বসলো। দেখা গেল বিলাতের পরামর্শে লর্ড ওয়াভেল প্ল্যান করেছেন, ব্যবস্থাপক সভায় 'কংগ্রেস-লীগের' সমান প্রতিনিধিত্বের বদলে 'হিন্দু-মুসলমানের' সমান প্রতিনিধিত্বের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। দুই দলই এই টোপ গিললো। কংগ্রেস মনে করলে, তারা সমস্ত হিন্দু সিট তো পাবেই, উপরন্তু মুসলমান সিটেরও কিছু পাবে কংগ্রেসী মুসলমানদের মারফৎ, আর লীগ মনে করলে, সকল মুসলমান সিটই লীগ পাবে, কংগ্রেস একটাও মুসলমান সিট পাবে না। ফলত এই নিয়ে ওয়াভেল প্ল্যানও ফেঁসে গেল। বৃটেন সাধু সেজে কংগ্রেস-লীগের দুই জাতের অনৈক্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করলো।

তখন কংগ্রেস নেতারা কারামুক্ত হয়েছেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সৈন্যদের দিল্লীর লাল-কেল্লায় সামরিক আদালত বসিয়ে বিচারের ব্যবস্থা হয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ বন্দীদের মুক্তির দাবীতে দেশ উদ্বেল হয়ে উঠেছে। কলকাতায় নভেম্বর মাসে তিন দিন ধরে জনসমাবেশ, সভা, বিক্ষোভ মিছিল চলেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও অশ্বারোহী পুলিশের তাণ্ডবও চলছে। ধর্মতলায় এক মিছিল আটকে রেখে গুলী চালিয়েও পুলিশ মিছিল ভাঙতে পারলো না। ছাত্রদলের রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশের গুলীতে নিহত হল, তার পরও দুদিন ধরে অশ্বারোহী পুলিশের ঘোড়ার পায়ে পিষ্ঠ হয়েও মিছিলকারীরা রাস্তায় বসে থাকলো। ট্রাম-বাস বন্ধ হল, রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড করে জনসাধারণ পুলিশের সঙ্গে লড়তে লাগলো, অনেক লোক জখম হল, শেষ পর্যন্ত গণবিক্ষোভ দমিত হল। শ্রীনেহরু ব্যারিষ্টার বেশে সজ্জিত হয়ে লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ বন্দীদের পক্ষ সমর্থনে দাঁড়িয়ে বিক্ষুব্ধ জনগণকে কিছু সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করলেন। —সামনে ইলেকশন।

ওদিকে অশান্ত ভারতকে শান্ত করে বাগ মানানোর জন্যে বিলাতের লেবার পার্টি নির্বাচনে জিতে লেবার গভর্ণমেন্ট তৈরী করলে। এক দিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে বিরাটকায় দৈত্যের মত সাম্রাজ্যবাদীদের হৃৎকম্প উদ্রেককারী সোভিয়েট তার বিপুল শক্তি ও সম্মান নিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখে ভারতের চাষা-মজুর উৎসাহিত, সংঘবদ্ধ ও জঙ্গী হয়ে উঠেছে, যুদ্ধের সময়ের সাম্রাজ্যবাদীদের "ফোর ফ্রীডম"-এর প্রতিশ্রুতির উল্লেখ

করে দাবী তুলেছে, সে আও স্বাধীনতা, আব একদিকে কংগ্রেস এবং লীগও লেবার গভর্ণমেন্টের কল্যাণে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশায় উল্লসিত হয়ে উঠেছে। আব কমিউনিষ্ট পার্টি নিজেদেব তৃতীব বৃহত্তম পার্টি বলে দাবী কবে ধুয়ো তুলেছে, কংগ্রেস-লীগ কমিউনিষ্ট এক হও। তাদেব সভা সমাবেশে তিন পার্টির তিন পতাকা এক সঙ্গে ওড়ে, দুপাশে তেরঙ্গা ও চাঁদ তাবা, মাঝখানে একটু নীচে লাল ঝাণ্ডা।

এমনি এক সময়ে হঠাৎ মহাত্মাজী মেদিনীপুব পবিদর্শনে এলেন। '৪২ সালে আগষ্ট বিপ্লবে মেদিনীপুরবাসীরা যেমন লড়েছিল, তেমনি সরকারী নির্যাতনে পিষ্ট হয়েছিল। নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ মিছিল গিয়েছিল থানা দখল করতে, সামনে তেবঙ্গা ঝাণ্ডা নিয়ে চলছিলেন গ্রাম্য রমণী মাতঙ্গিনী হাজরা। পুলিশ গুলী চালিয়ে মিছিল ভেঙ্গে দিলে, কিন্তু মাতঙ্গিনী হাজরা পিছু হটেননি এবং পুলিশের হাতে নিহত হয়েও ঝাণ্ডা ছাড়েন নি। গ্রামে গ্রামে পুলিস অভিযান, ক্ষেত খামার গৃহ লণ্ডভণ্ড করে আগুন লাগিয়ে গ্রামকে গ্রাম ছারখার কবে দিয়েছিল। তারপর '৪৩ সালের অন্নাভাব ও দুর্ভিক্ষ, যে দেশজোড়া দুর্ভিক্ষে বাংলার ৩৫ লক্ষ মানুষ মরেছিল। মেদিনীপুরবাসীরা একবার মহাত্মাজীর দর্শন ভিক্ষা করছিল।

মহাত্মাজী মুক্ত হয়েছেন '৪৪ সালে। এতদিন পরে তাঁর মেদিনীপুব পবিদর্শনের সময় হল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, সর্দার প্যাটেলের কি-একটা ব্যামো ছিল, মহাত্মাজী তাঁর "নেচার কিওরে" ব্যস্ত ছিলেন। অতএব নেচার কিওর করতে সময় লাগে বৈ কি!

কিন্তু এই উপলক্ষে আব একটা বৃহৎ ব্যাপারও ঘটে গেল। তিনি সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানে এসে উঠেছিলেন এবং সেখান থেকে গভর্ণর কেসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। লোকে মনে করেছিল একটা Courtesy visit মাত্র। রাজনীতিতে বিপক্ষ হলেও, সামাজিক হিসাবে বন্ধু তো! কিন্তু দেখা গেল, দেড়ঘণ্টা দুই বন্ধুতে আলাপ হল দরজা বন্ধ করে এবং তার পরদিন মহাত্মাজী আবার গেলেন। তারপর উপর্যুপরি ছয় দিন এমনি গোপন আলোচনা চললো, তৃতীয় কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে পারেনি।

এত দীর্ঘ গোপন পরামর্শ কিসের? লোকে বলতে লাগলো, একটা কিছু বৃহৎ ব্যাপার ঘটবেই। কিন্তু দেখা গেল, ছয় দিন গোপন পরামর্শের পর কলকাতায় হঠাৎ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং হল এবং সেখানে প্রধান যে দুটি প্রস্তাব পাশ হল, তার একটি হল কংগ্রেসের অহিংসা নীতির পুনর্ঘোষণা, আর একটি হল, ধর্মতলায় পুলিসের গুলীচালনা এবং রামেশ্বর হত্যা সম্পর্কে "জুডিসিয়াল এনকোয়ারীর" দাবী। তার পরই সপ্তম দিন গান্ধী-কেসী গোপন আলোচনা হল, এ পর্ব সমাপ্ত হল!

তার পর থেকেই কংগ্রেস নেতারা ধুয়ো তুললেন, Independence knocking at the door—স্বাধীনতা ভারতের দরজা ঠেলাঠেলি করছে। লোকে বুঝলো, গান্ধী-কেসী আলোচনা ভারতের স্বাধীনতারই আলোচনা। আমার চোখে কাণ্ডটা আর একটু ঘোরালো লাগলো। এ যেন একটা ষড়যন্ত্র, ভারতবাসীর চোখে ধুলো দিয়ে স্বাধীনতার নামে একটা বাজে মাল চালাবার ষড়যন্ত্র। ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ও প্রস্তাবেই আমার সেটা মালুম হল।

ইলেকশন একটা আসন্ন, সুতরাং কংগ্রেস নেতাদের মুখপাত্র শ্রীনেহরু রাশিয়ায় গিয়ে

আগষ্ট বিপ্লবীদের বাহাদুর বলে পিঠ চাপড়ে এসেছেন এবং আজাদ হিন্দ বন্দীদের মুক্তি দাবী করেছেন। সুতরাং বৃটিশ সরকার ভুল বুঝতে পারে যে, হয়ত বা কংগ্রেসের মতিগতি অহিংসার পথ ত্যাগ করার দিকেই ঝুঁকছে। ওয়ার্কিং কমিটির প্রথম প্রস্তাবটা বৃটিশ সরকারের সেই সম্ভাব্য ভুল ভাঙ্গার জন্যে।

আর রামেশ্বর হত্যা সম্পর্কে সকল দলের সভা-সমাবেশ থেকেই দাবী উঠেছিল বে-সরকারী প্রকাশ্য তদন্তের। সেটা বানচাল করে সরকারের মুখরক্ষার জন্যে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে বিবাট ভক্ষের চেয়ে দ্বিতীয় প্রস্তাব পাশ করা হল, জুডিসিয়্যাল এনকোয়ারী চাই। পুলিশের গুলীচালনা সম্পর্কে কংগ্রেস বা জনগণের তরফ থেকে তদন্তের দাবী এতাবৎকাল পর্যন্ত যখনই হয়েছে, তখনই দাবী হয়েছে প্রকাশ্য তদন্তের, Public enquiry-র। সরকার করতো Judicial enquiry। আর লোকে বলতো "ওটাতো White washing enquiry"। এখানে দেখা গেল, প্রকাশ্য তদন্তের দাবীটা বানচাল করে দিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সেই White washing enquiry-র দাবীই করলেন, আর জনগণও থতোমতো খেয়ে চেপে গেল।

বিপ্লব প্রচেষ্টার ব্যর্থতা আমি যেমন মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করে এসেছি, এখন বিপ্লব-বিরোধিতার সাফল্য দেখার জন্যে তেমনি মনোযোগ সহকারে ঘটনা ও বাণী লক্ষ্য করতে লাগলুম, এবং এটাও অবশ্যই পরিষ্কার লক্ষ্য করলুম যে, ওয়ার্কিং কমিটির "জুডিসিয়্যাল এনকোয়ারীর" দাবীর প্রতিবাদও কেউ করলে না এবং "পাবলিক এনকোয়ারীর" কথাও কেউ আর মুখেও আনলে না। আর স্বাধীনতার হঠাৎ এমন গরজ কেন হল যে সে ভারতের দরজা ঠেলাঠেলি শুরু করে দিলে, এ প্রশ্নও কারো মনে জাগলো বলে বোঝা গেল না। আমার ধারণা দেখলুম একান্তই আমার একার, নিজস্ব। আমি স্বাধীনতারও একটা রকম-ফের দেখার আশায় রইলুম।

স্বাধীনতা যে ভারতের দরজা ঠেলাঠেলি করছে, তার লক্ষণও দেখা যেতে লাগলো। ওয়াভেল আর একবার বিলেতে গিয়ে লেবার গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করে ফিরে এসে বললেন, ইলেকশনের পর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করার পরে ছাড়া হিজ ম্যাজেষ্টির গভর্ণমেণ্ট ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্ত করতে পারবেন না।

তারপর ৮ঠা ডিসেম্বর নূতন ভারত সচিব ভারতে এক "পার্লামেণ্টারী কমিশন" পাঠাবার বন্দোবস্ত করে ঘোষণা করলেন যে, তাঁদের লক্ষ্য ভারতকে "পূর্ণ-স্বায়ত্তশাসনাধিকার" দান, যাতে ভারত "বৃটিশ কমনওয়েলথের এক স্বাধীন অংশীদারিত্বের পূর্ণ অধিকার" লাভ করে। লেবার-ইম্পিরিয়্যালিজমের মতিগতিও বোঝা গেল।

তখন এযুগের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা রাষ্ট্রসংঘ সংগঠিত হয়েছে, যাতে আর কখনো যুদ্ধ না বাধে, যাতে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রসংঘের প্রথম অধিবেশন হয়েছিল সানফ্রান্সিসকো সহরে। সেখানে নতুন পোল্যাণ্ডের সদস্যপদের জন্যে সোভিয়েত রুশিয়া প্রস্তাব করলে বৃটিশ প্রতিনিধিরা তার বিরোধিতা করে। তারা বলে, নতুন পোল সরকার পোল্যাণ্ডের বৈধ সরকার নয়।

তার জবাবে রুশ পররাষ্ট্র-সচিব মলোটভ বলেন, যারা নাজীদের বিরুদ্ধে লড়েছে,

মরেছে এবং তাদের হাত থেকে পোল্যাণ্ডকে মুক্ত করেছে, তারা পোল্যাণ্ডের বৈধ সরকার হতে পারে না, অথচ বৃটেন তার মাইনে-করা একজন ভারতবাসীকে এনে এখানে বসিয়ে বলছে, ইনি ভারতের প্রতিনিধি। এ চালাকি বেশী দিন চলবে না। শীঘ্রই এমন দিন আসবে, যখন এই আসনে সত্যিকারের স্বাধীন ভারতের একজন প্রতিনিধি এসে বসবে।

সেটা '৪৫ সালের মে-জুনের কথা। তখনও বিলেতে চার্চিলের রাজত্ব চলছে। বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব ইডেন মুখ বুজে মলোটভের টিটকারী শুনে নিঃসাড়ে উঠে গেছেন। বেশ বোঝা যায়, রাষ্ট্রসংঘে "স্বাধীন ভারতের একজন প্রতিনিধি" না বসালে ইংরেজের মুখ রক্ষা হয় না, আর ভারতের একজন কংগ্রেস নেতাকে এনে বসাতে পারলেই ইংরেজের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সুতরাং কংগ্রেসের সঙ্গে এমন একটা বন্দোবস্ত করা দরকার, যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে – বৃটিশ স্বার্থ আর স্বাধীন ভারত এক সূত্রে গাঁথা থাকে। ভারতের জঙ্গী গণবিক্ষোভ প্রশমিত করাও দরকার, আর মহাত্মা গান্ধীই তা বারবার বলেছেন এবং বলছেন—Only Congress can deliver the goods.

আটত্রিশ

স্বাধীনতা সংগ্রামের অপরূপ কাণ্ড কারখানা দেখে আমার মনটা যতই অশ্রদ্ধায় ভরে উঠছিল এবং আমার নিষিদ্ধ পুস্তক "শ্রী ভাঁওতার" কথা মনে পড়ছিল, ততই ভারতীয় জনগণের, চাষী এবং মজুরদের ওপরে কংগ্রেস এবং মহাত্মার প্রভাব দুরপনেয় দেখে হতাশ হচ্ছিলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিষ্টদের দিকে ঝুঁকছিলুম। কারণ ভবিষ্যতের ভরসা তারাই। ভুল করুক, চাষী-মজুর যথেষ্ট সংগঠিত না হলে তারা কিই-বা করতে পারে। কিন্তু মার্কসবাদী লেনিনবাদী মতাদর্শও আছে এবং একদিন চাষী-মজুর সেই মতাদর্শে সংগঠিত হবেই। তখন আর একটা সংগ্রাম অবশ্যই শুরু হবে। ওরা সেই কাজেই মন দিয়েছে।

সুতরাং ক্রমে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলুম, তাদের সার্কুলার রোডের অফিসে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কাগজ পড়া শুরু করলুম। বিশেষ বিশেষ দোস্তর কাছে তাদের মৃদু সমালোচনাও শুরু করলুম, কিন্তু বাইরের অপর কোন লোক তাদের বিরুদ্ধে কথা বললে, তাদের সঙ্গে তর্ক করাও অভ্যাস হয়ে গেল।

আমার পূর্বোল্লিখিত বন্ধু বীরেন ঘোষ এক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবসা করেছিলেন। লড়াইয়ের সময় দর্জিপাড়ার শিশির মিত্রের সঙ্গে মিলে ব্যবসা বন্ধ করে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয় ছোট-ছোট মাল তৈরীর কন্ট্রাক্ট নিতেন। তাঁদের প্রয়োজনীয় ফার্নিচার আমি দিতুম। পরে শিশিরবাবু আর এক কোম্পানী গঠন করে নানাবিধ ওয়ার সাপ্লাইয়ের কাজ করতেন, এবং তাঁদের ফার্নিচার এবং নানা প্রকারের "ঢেও-ঢাকনা' আমি যোগাড় করে দিতুম। তিনি প্রকাণ্ড বাড়ী সাজাবার জন্যে আর্ট কিউরিও সংগ্রহ করতেন, আমার কাছে প্রচুর জিনিস কিনেছিলেন লড়াইয়ের শেষ দিকে এবং কিছুদিন পরে পর্যন্ত, আমার ব্যবসা চালু ছিল প্রায় একা তাঁর দৌলতেই।

আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট ছিল না বলে তিনি আমার পাওনা টাকা থেকে কিছু-কিছু

কেটে রেখে এক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করে দিয়েছিলেন আমার নামে এবং দু'বছরে প্রায় চোদ্দ'শো টাকা তাতে জমেছিল। এ অবস্থায় লোকে "নিবেনব্বইয়ের ধাক্কায়" পড়ে, কিন্তু আমার স্বভাব এবং বুদ্ধিশুদ্ধি তার বিপরীত। '৪৬ সালের জানুয়ারীতে কংগ্রেসী গুণ্ডারা 'গান্ধী কি জয়' ধ্বনি সহকারে যখন কমিউনিষ্ট পার্টির বন্ধের অফিস এবং প্রকাশালয় আক্রমণ করে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করে দিলে, তখন আমি প্রায় ক্ষেপে গেলুম। ওরা তখন এক লাখ টাকা সাহায্যের জন্যে এক পাবলিক আবেদন করলো।

এই সময়ে একদিন শিশিরবাবুর নাটের দাওয়ার ঘরে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তায় কমিউনিষ্টদের কথা উঠেছে। উনি ওদের লক্ষ্য করে একগাদা অব । কুকথা বলেছেন এবং আমি প্রতিবাদ করে শেষ পর্যন্ত বলেছি, সব চেয়ে ভাল কংগ্রেসম্যানের চেয়ে সব চেয়ে খারাপ কমিউনিষ্টটাও ভাল। শিশিরবাবু তাঁর বন্ধুকে সমর্থন করে কথা বলা মাত্র আমি ক্ষেপে গিয়ে এমন চীৎকার করে এক লম্বা লেকচার দিয়েছি যে পাশের ও সামনের বাড়ীর বারান্দায় লোক জমে গেছে।

শিশিরবাবু অপ্রস্তুত হয়ে চেপে গেলেন। আমি বললুম, আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তুলে দিয়ে আমার টাকা এনে দিন। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে চোদ্দশো টাকা এনে দিলেন। আমি দেখলুম, এ সুযোগ আর আসবে না, তৎক্ষণাৎ পাঁচশো টাকা সোমনাথ লাহিড়ীর হাতে দিয়ে বললুম আপনাদের আপীল-ফাণ্ডে জমা করে নিন। তিনি নিঃশব্দে টাকাটা নিয়ে আমার মুখপানে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন।

তারপর ব্যাপারটার গল্প করে একখানা রসিদ নিলুম এবং শিশিরবাবুর প্রাণে ব্যথা দেওয়ার জন্যে তাঁর বাড়ী গিয়ে তাঁকে রসিদটা দেখালুম। ব্যথা তিনি পেলেনও, বললেন এমনি করে নষ্ট করার জন্যে আমি আপনার টাকা জমিয়ে দিয়েছিলুম? আমি একটু দন্তবিকাশ করে চলে এলুম, আমার ব্যবসায়ে আবার ভাঁটা শুরু হল। এখানে এ গল্প লেখাটা আমার আত্মপ্রচার বলে গণ্য হলেও একথাটা আমার আত্মবিশ্লেষণও বটে। আমি বিপ্লবের সন্ধানী, নিবেনব্বইয়ের ধাক্কা তাই আমার কাছে অচল। পরে আবার যথেষ্ট দুর্দশা ভোগ করেছি, কিন্তু অনুতাপ করিনি। যাক—

ইতিমধ্যে ডিন অফ ক্যান্টারবেরীর Socialist Sixth of the World বইখানা পেয়েছিলুম এবং পড়ে খুব ভাল লেগেছিল। বইটা বাংলায় অনূদিত হওয়া দরকার, যাতে আমাদের দেশের লোকের রাশিয়া সম্বন্ধে পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা একটু কমে। আমি গোপনে সেটা অবলম্বন করে তার সঙ্গে "মস্কো নিউজ" থেকে '৪৪ সাল পর্যন্ত কিছু মালমশলা জুড়ে দিয়ে (বইটায় ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত খবর ছিল) "সোভিয়েট চীন।" নামে এক বই খাড়া করে ফেললুম এবং সেটা শেষ পর্যন্ত কমিউনিষ্ট পার্টির 'ন্যাশানাল বুক এজেন্সি" কর্তৃক প্রকাশিত হল। আড়াই টাকা দামের বই, তিন হাজার ছাপা হল, বয়েলটি হিসেবে বেশ কিছু টাকাও পেলুম। বইটার খুব সুখ্যাতিও হয়েছিল এবং হাজার দুই বই হুড়মুড় করে বিক্রী হয়ে গিয়েছিল।

লড়াইয়ে হিটলার-তোজো (মুসোলিনী তো ইটালীর জনগণের হাতে আগেই মারা পড়েছিল) যখন আমাদের নেতাদের বাধিত না করে হেরে গেল এবং ইংরেজ বিজয়ীর গর্বে ভারতের বুকের ওপর আরো জাঁকিয়ে বসলো এবং যুদ্ধকালের অসহযোগীদের জেল

থেকে বার করে নতুন ইলেকশন করে আবার তাদের পুরানো ছেঁড়া গদীতে বসাবার বন্দোবস্ত করলে, তখন একদিকে নেতারা ওয়াভেলের দরবারে ঘাড় হেঁট করে ধর্ণা দিচ্ছেন, আর এক দিকে জনগণ তাদের দাবী নিয়ে সংঘবদ্ধ হচ্ছে এবং সংগ্রাম শুরু করেছে। আবার একদিকে ইংরেজ তাদের ওপর দোর্দণ্ড প্রতাপে লাটি-গুলী চালাচ্ছে, আর একদিকে নেতারা সেই ডাণ্ডার অনুপান স্বরূপ কোমর বেঁধে প্রোপাগ্যাণ্ডা চালাচ্ছেন, তাদের বিভ্রান্ত করতে এবং সংগ্রামী মনোবল ভাঙ্গতে।

এত বড় চার্জের পক্ষে অন্ততঃ গোটা কয়েক প্রমাণ না দিলে চলে না, তাই আমি এখানে তিন রকমের তিনটি প্রমাণ দিচ্ছি :

(১) মহাত্মাজী এক অভিনব প্রোপাগ্যাণ্ডা মেশিন তৈরী করেছিলেন, post prayer meeting, যা দেখলে স্বয়ং গোয়েবলসও লজ্জা পেতো। তিনি রোজ বিকেলে এক প্রকাশ্য গণ-প্রার্থনা সভার ব্যবস্থা করেছিলেন, যে সভায় সমস্ত প্রার্থনার পর তিনি এক বক্তৃতা দিয়ে জনগণের মনোরঞ্জণ করতেন, আর সে বক্তৃতা পরদিন সকালের সংবাদপত্রে ছাপা হতো। তার একটা নমুনা হচ্ছে, যখন বিলেতের লেবার গভর্ণমেণ্ট ভারতে এক পার্লামেণ্টারী মিশন এবং তারপর এক ক্যাবিনেট মিশন পাঠাবার বন্দোবস্ত করলে, তখন অনেকে ইংরেজের মতলব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। মহাত্মাজী তখন post prayer meeting-এ বলেছিলেন, "Emphatically it betrays want of foresight to disbelieve British declarations...Is the official deputation coming to deceive a great nation? It is neither manly nor womanly to think so" .. (Amrita Bazar Patrika –27. 2. 46.)

অর্থাৎ আমাদের মতন একটা মহান জাতির পক্ষে ইংরেজকে অবিশ্বাস করাটা দূরদৃষ্টির অভাবের পরিচয়। তারা যে তোমাদের ঠকাতে আসছে, একথা মনে করাটা বেটাছেলের উপযুক্ত কাজও নয়, মেয়েছেলের উপযুক্ত কাজও নয় (অর্থাৎ—হিজড়ের কাজ !)।

প্রথমে যে পার্লামেণ্টারী মিশন আসে, তার অন্যতম সদস্য সোরেনসেন আগেই এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'The idealism of Gandhi will save India and the entire mankind. The British Government should be profoundly grateful to him. Every Indian, be he a congressman or a Moslem Leaguer should appreciate that Gandhi is one of the greatest souls of the day I do not want my country to be an imperialist power. I want a free India, because it is good for my country so that she should no more dominate in other lands."—(Amrita Bazar Patrika – 11. 1. 46).

অর্থাৎ- "গান্ধীর আদর্শ ভারতকে এবং সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচাবে। গান্ধীর প্রতি বৃটিশ সরকারের গভীরভাবে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কি কংগ্রেসী, কি লীগী, প্রত্যেকটি ভারতবাসীরই বোঝা উচিত যে, গান্ধী এ যুগের অন্যতম মহাত্মা। আমি চাই না যে, আমার দেশ সাম্রাজ্যবাদী হয়। আমি স্বাধীন ভারত চাই এই জন্যে যে, সেটা আমার দেশের পক্ষে ভাল, যাতে সে আর অন্য দেশের ওপর কর্তৃত্ব না করে।"

অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী হওয়াটা যেন ইংরেজের পক্ষে একটা বদ অভ্যাস মাত্র,—যেন তার মধ্যে শোষণের প্রয়োজনের কোন বালাই নেই। আর ভারতবন্ধু সোরেনসেনের এই বক্তৃতার সঙ্গে বৃটিশ বন্ধু মহাত্মাজীর উপরোক্ত কথা টোট্যাল দিলেই একটা সর্বাঙ্গসুন্দর ষড়যন্ত্রের রূপই দেখতে পাওয়া যাবে।

কিন্তু আমেরিকার ডিট্রয়েট ফ্রি প্রেস, যার এ ষড়যন্ত্রের কোন গন্ধ নেই, তার এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের এক উদ্ধৃতি '৪৬ সালের ৩রা মার্চের "অমৃত বাজার পত্রিকায়" প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে বলা হয়, "The hard fact in the way of an Anglo-Indian agreement is that, with India gone, the British empire would be only a skeleton of its former self. 140 millions of Americans can deal with the Philippines as a luxury, 40 millions Britons cannot regard India with its 400 millions and the tremendous natural resources as other than an economic necessity if they are to remain a first class power."

অর্থাৎ – টিক ভাব ... সম্বন্ধে বটেন ... আর ভারত হাতছাড়া হলে বৃটিশ সাম্রাজ্য একটা কঙ্কাল মাত্রে পর্যবসিত হবে। ... কোটির দেশ আমেরিকা ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দিতে পারে, ... যদি প্রথম শ্রেণীর শক্তি হিসাবে বেঁচে থাকতে হয়, ... দশে ৪০ কোটি লোকের বাস এবং যার প্রাকৃতিক সম্পদ বিপুল, সেই ভারত তার পক্ষে ... অপরিহার্য অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয় বস্তু ছাড়া আর কিছু বলে বিবেচনা করতে পারে না।'

এই কথা শেষ পরদিন ঐ কাগজেই ... কথা প্রকাশিত হল—তাতে তিনি বৃটেনের অর্থনৈতিক ... বেশ করে বললেন, "They want to know from us if we would give them trade facilities in India."

অর্থাৎ '৪২ সালে ... যখন লড়াইয়ে যাব ... , তখন যে আমরা তাদের কুইট ইণ্ডিয়া করতে বলেছিলুম, কিন্তু এতদিন তা কার্যকরী করতে পারিনি, এখন ইংরেজ লড়াইয়ে জিতে আমাদের ... জন্যে কুইট ইণ্ডিয়া ... করছেন, উপরন্তু ভিখিরির মতন আমাদের কাছে তা ... ব্যবসা করবার অধিকার প্রার্থনা করছে।

(২) ... মজুরদের ... সংগ্রামে ... বলেছে বিড়লা হাউসে কংগ্রেসী হিন্দুস্থান মজদুর সেবক ... নামে এক সর্বভারতীয় মজদুর-সংস্থা গঠন করেন, এবং তার ... সভায় কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী আচার্য কৃপালনী এক বক্তৃতায় বলেন: ('৪৫ সালের ... ডিসেম্বর)—

"যে শ্রমিক সব কিছুই উৎপাদন করে, সেই শ্রমিকই ... অভাবে সব চেয়ে বেশী ভোগে। কিন্তু এজন্যে অনেকে ধনিকশ্রেণীকে দায়ী করে দেখে আমার ভারি দুঃখ হয়। দোষ কিন্তু কারুরই নয়, তুমি ধনিক হলে তোমার ব্যবহারও ধনিকের মতই হ'ত,

"ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজ একটা নিয়মে চলে, যাতে ধনিক শ্রমিক দুই শ্রেণীকেই দুঃখের বোঝা বইতে হয়। আহমদাবাদের মিল মালিকদের ছেলেপিলেদেরও অনেক অসুখ-বিসুখ, অনেক অসুবিধে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। বাইরে থেকে দেখে মনে

হয়, ধনিকরা বেশ সুখে আছে, তারা মটর চড়ে বেড়ায়, ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদেরও অনেক দুঃখ-কষ্ট আছে। এর জন্যে সমাজ দায়ী। সাধারণ সৎ ব্যবসায়ীরাও আজ চোরাকারবার করতে বাধ্য হচ্ছে, কিন্তু তাদের কোন দোষ নেই। বর্তমান গভর্নমেন্ট না থাকলে পারলে চোরা কারবার বন্ধ হবে না।

"কিন্তু পাশ্চাত্যের হাওয়া যাদের গায়ে লেগেছে, তারা ধনিকদের মেরে তাদের সব কিছু কেড়ে নিতে চায়। কমিউনিষ্টরা বলে, শিল্পবাণিজ্য রাষ্ট্রের হাতে যাওয়া দরকার। পক্ষান্তরে গান্ধীজী চান কিষাণ মজুর প্রজার রাজত্ব, আর সেইটেই হচ্ছে খাঁটি কমিউনিজম্। তার মোদ্দা কথা হচ্ছে, কৃষক শ্রমিক হবে নাবালক পোষ্যতুল্য, এবং ধনী জমিদার ও কলকারখানার মালিকরা হবে তাদের অভিভাবকতুল্য।" (People's Age—13. 1. 46)।

এ বক্তৃতা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ, কিন্তু এ আদর্শের ওরিজিন্যালিটির কৃতিত্ব কৃপালনীজীর নয়। '৩৩ সালে হিটলারের হাতে জার্মানীর সর্বকর্তৃত্ব আসার পর '৩৪ সালের জানুয়ারীতে জার্মান লেবার ফ্রন্টের এক ডিগ্রী জারি করে জার্মান ট্রেড ইউনিয়নগুলো ভেঙ্গে দিয়ে, তাদের যাও বাজেয়াপ্ত করে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, "অতঃপর কারখানার মালিকরাই শ্রমিকদের নেতা বলে গণ্য হবে, এবং কারখানা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে এই মালিক নেতার মতই চূড়ান্ত বলে শ্রমিকদের মানতে হবে।" (Imperialism and the People—Frank Verulum)।

প্রোফেসর হীরেন মুখার্জি তাঁর বইয়ে (India struggles for Freedom) গাদী গাদী লিখে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, কংগ্রেস অ্যান্টিফ্যাসিষ্ট সংস্থা।

(৩) কয়েক বছরের যুদ্ধে হাজার হাজার মজুর খাটিয়ে বিড়লা কয়েক কোটি টাকা মুনাফা করেছেন, তাঁর কেশোরাম কটন মিলের মজুররা এক মাসের মজুরী দাবী করলে বিড়লা তা দিতে অসম্মত হলেন, এবং মজুররা ধর্মঘট করলো। বিড়লা নতুন মজুর আমদানী করলেন। ধর্মঘটীরা বাধা দেওয়ার জন্যে কারখানার ফটক আটকে শুয়ে পড়লো। বিড়লা পুলিশ ডাকলেন, তারা এসে ধর্মঘটীদের ওপর লাঠি চালাল। হিন্দুস্থান মজুর সেবক সংঘ পুলিসের সঙ্গে যোগ দিলে।

ঠিক সেই সময়ে সর্দার প্যাটেল হলেন বিড়লার অতিথি। বিড়লা গান্ধীভক্ত এবং কংগ্রেসভক্ত, কংগ্রেসকে মোটা মোটা চাঁদা দিয়ে থাকেন। সুতরাং সর্দার প্যাটেল সমগ্র কাণ্ডটা দেখলেন এবং শেষ পর্যন্ত রায় দিলেন, বিড়লাজীও মজুরদের জন্যে বড়ই কাতর।

এই সব নেতার স্বাধীনতার সংগ্রাম যুদ্ধশেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে গণবিক্ষোভ দমনের সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে, কেমন করে তারা ইংরেজের বেপরোয়া লাঠি-গুলীর পিছনে দাঁড়িয়ে সক্রিয় অহিংসার বাণী সংযোগে তাদের প্রতি সক্রিয় বিশ্বাসঘাতকতা করছেন, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বম্বের নৌ-বিদ্রোহের ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে।

রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভির তরুণ ভারতীয় নাবিকেরা চাকুরীর দুর্দশা এবং উৎকট বর্ণ-বৈষম্যের শাসনে জর্জরিত হয়ে ১৯শে ফেব্রুয়ারী তাদের দাবী পেশ করে শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘট করে। ইংরেজ অফিসারেরা সটান একচোটে তার জবাব দিলে তাহাদের জাহাজের ওপর গোলাবর্ষণ করে'। তখন ধর্মঘটী নাবিকেরাও সশস্ত্র সংগ্রামে মরিয়া হয়ে পাল্টা

গুলী চালাতে শুরু করে এবং বম্বের জনগণের কাছে সমর্থন ও সাহায্যের আবেদন করে। ফলে সমগ্র বম্বে সহরে সাধারণ ধর্মঘট হয় এবং সারা সহরে কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পতাকা ওড়ে এবং সারা সহরের লোক রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভির ভারতীয় নাবিকদের ধর্মঘট নেহাৎ শ্রমিকদের ধর্মঘট নয়,—সেটা ভারতে ইংরেজের শাসনের মূলে আঘাতের লক্ষণ। সুতরাং এই ধর্মঘট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘটী জাহাজটার ওপর গোলাবর্ষণ করে অক্টোবর্ট সে কিছুক্ষণ বিনাশের চেষ্টা হল। কিন্তু ফল হল বিপরীত—শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট পরিণত হল এক গাণিক নৌ বিদ্রোহে। ধর্মঘটীদের জাহাজে কামানের গোলাবর্ষণের জবাবে তারা তাদের জাহাজ এবং ব্যারাকের ওপর বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দিয়ে পাল্টা কামানের গোলাবর্ষণের জবাব দিলে, এবং তারপর সাত ঘণ্টা চললো সেই কামানের যুদ্ধ।

বিদ্রোহী নাবিকদের অস্ত্রবল শেষ হল, কিন্তু তবু তারা আত্মসমর্পণ করলো না। মরণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে জাহাজে ও ব্যারাকে অবরুদ্ধ অবস্থায় থেকে বম্বের জনগণের কাছে সমর্থনের আবেদন করলে। জনগণ ইতিমধ্যেই সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করে পথে বেরিয়ে পড়েছিল।

এই সর্বাত্মক গণবিক্ষোভ দমনের জন্য বম্বের সরকার মিলিটারী সৈন্য লেলিয়ে দেয় এবং তারা দুদিন ধরে গুলী চালিয়ে সে বিক্ষোভ রক্তস্রোতে ডুবিয়ে দেয়। সরকারী হিসাব মতেই দুদিনে ২৫০ জন লোক নিহত হয়। কংগ্রেস নেতারা এই হত্যালীলা দেখার পর ধর্মঘটী নাবিকদের ধমক দিলেন। পণ্ডিত নেহরু বললেন, কংগ্রেস নেতাদের ডিঙিয়ে বম্বের জনগণের কাছে আবেদন করা, এ বেআদবী "I won t tolerate")

তিনি তখন লর্ড ওয়াভেলের সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ—ওয়াভেল-প্ল্যানের কল্যাণে পুরানো মন্ত্রীত্বের গদীতে কংগ্রেসের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর। বম্বের জনগণের ওপর সরকারী মিলিটারী আক্রমণে তারা রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী করে লড়ছিল,—এ ব্যাপারটার মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লব এবং কমিউনিষ্ট প্রভাব দেখে তিনি তার নিন্দা করে বলেছিলেন, এমন লড়াই অষ্টাদশ শতাব্দীতে চলতে পারতো, আজকের দিনে সেফ বেকুফী।

তার পর সর্দার প্যাটেল ধর্মঘটী নাবিকদের আত্মসমর্পণ করার পরামর্শ দিলেন এবং আশ্বাস দিলেন, তিনি ব্যবস্থা করবেন, যাতে তাদের প্রতিহিংসা মূলক শাস্তি না দেওয়া হয়। সে পরামর্শ গ্রহণ করে তারা আত্মসমর্পণ করলে, কিন্তু সরকারী প্রতিহিংসামূলক শাস্তি থেকে তারা রেহাই পেলো না। কংগ্রেস-নেতারা তত্ত্বকথা শোনালেন, ইংরেজ কুইট ইণ্ডিয়া করতে চলেছে, তাদের শান্তিতে যেতে দেওয়া দরকার, এখন গোলমাল করলে সব পণ্ড হবে।

আত্মসমর্পণের সময় Central Naval Strike Committee তাদের manifestso তে লিখলে,—'এই প্রথম সমর বিভাগের ভারতীয় কর্মী এবং ভারতীয় জনগণের রক্ত এক লক্ষ্যে এক খাতে মিশলো—আমরা একথা কখনো ভুলবো না, এবং আমরা জানি আমাদের অসামরিক সাথী ভাইবোনেরাও ভুলবে না। ভারতের জনগণ দীর্ঘজীবী হোক —জয়হিন্দ—"

এই সব কাণ্ড দেখে অরুণা আসফ আলী বললেন, "If this is the way of the

British quiting India, it is a very grim way indeed !" এ কোন্ দেশী কুইট ইণ্ডিয়া রে বাবা !

যুদ্ধে জিতে ইংরেজের কেন এমন কুইট ইণ্ডিয়ার গরজ হল, কেন হঠাৎ স্বাধীনতা আমাদের দরজায় ঠেলাঠেলি শুরু করলো, সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে, যুদ্ধের পর ইংরেজের অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারলে। বৃটেন একটা ছোট দেশ, লোকবসতি ঠাসা, দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্যের সিকি অংশ মাত্র দেশে জন্মায়, বাকিটা বাইরে থেকে আমদানা করতে হয়। তার জন্যে শিল্পজাত-পণ্যের উৎপাদন এবং রপ্তানীই ভরসা, কিন্তু সেই শিল্পজাত-পণ্য উৎপাদনের জন্যে অনেক কাঁচা মালও বাইরে থেকে আমদানী করতে হয় এবং তার পরিবর্তে আরো রপ্তানী করতে হয়। অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যই তার জীয়ন-কাঠি মরণ-কাঠি।

৬ বছরের যুদ্ধে এই বৈদেশিক বাণিজ্যের বাজার প্রায় একেবারে হাতছাড়া হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যের দেশগুলো থেকে কাঁচা মাল আমদানী করে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াইয়ের মাল তৈরী করে যুদ্ধক্ষেত্রে রসদ দিতে হয়েছে, সে আমদানীর পরিবর্তে রপ্তানী কিছুই হয়নি, সবই দেনা জমে গেছে,—সাম্রাজ্যের বৃহত্তম দেশ ভারতের কাছে ঋণ দাঁড়িয়েছে ২০০০ কোটি টাকা। এ ব্যাপারটার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ও ভারতের জনগণের জীবনে তার ফলাফল সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটা কথা বলা দরকার, কারণ ব্যাপারটা অর্থনীতির একটা চমৎকার কেরামতি, অর্থনীতির জ্ঞান ছাড়া বোঝা যায় না।

বিলেতের কাছে ভারতের পাওনা মানে বিলেতের চার্চিল সরকারের কাছে ভারতের লিনলিথগো সরকারের পাওনা। কারণ লড়াইয়ের ক'বছর ধরে লিনলিথগো সরকারই বিলেতের লড়াইয়ে ভারতের সবপ্রকার মাল ধারে সরবরাহ করেছে।

"লে আও অমুক মাল এৎ,—যত টাকা লাগে",- এই ছিল তার মাল সংগ্রহের কায়দা। ওয়ার সাপ্লাইয়ের বড় বড় কণ্ট্রাক্টর বিড়লা-টাটা-ইস্পাহানী-আদমজীর দল এবং তাদের শত শত ডেপুটী সাব ডেপুটী কণ্ট্রাক্টরেরা হুড়মুড় করে মাল সাপ্লাই করেছে, এবং লিনলিথগো সরকারও হুড়মুড় করে বেপরোয়া ভাবে বাড়তি নোট ছেপে তার দাম দিয়েছে। যারা মাল যুগিয়েছে, তারা নগদ দাম তো পেয়েছেই,—উপরন্তু বাড়তি লাভের অঙ্কও তাদের ফেঁপে উঠেছে অভাবনীয়ভাবে।

কল-কারখানার কাজ বেড়েছে প্রচুর, বহুলোক কাজও পেয়েছে, তাদের মজুরীও কিছু বেড়েছে। অর্থাৎ ভারতবাসীর জীবনে নগদ টাকার ব্যবহার বেড়েছে প্রচুর। কিন্তু ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়লেও উৎপাদন বাড়েনি। এর ফল হয়েছে, জিনিস পত্রের দর হয়েছে আকাশচুম্বী, লোকের বাড়তি আয়টা তার নাগাল পায় না।

লড়াই শেষ হলে দেখা গেল, "ভারত" হয়েছে বিলেতের মোটা পাওনাদার, ভারতীয় ধনিকদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বেড়েছে শত কোটি টাকার অঙ্কে, আর ভারতীয় জনজীবনে হয়েছে বিপরীত ফল, ভোগ্যপণ্যের আকাশচুম্বী দরবৃদ্ধি—যার অর্থনৈতিক নাম ইনফ্লেশন, বাজারে মাসের তুলনায় চলতি টাকার পরিমাণ অনেক বেশী, আগে লোকে এক টাকায় যা পেতো, এখন তিন টাকায়ও তা পায় না।

বাণিজ্যিক নৌ-বহরের মারফৎ জাহাজী কারবারে আগে বিলেতের যে আয় ছিল,

অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলে invisible export,—যুদ্ধের মাল বহনে এবং শত্রুর মারের ঠেলায় তার আয়তন এবং আয় দুই-ই কমে গেছে।

সাম্রাজ্যের দেশে দেশে কিছু কিছু শিল্পও বেড়েছে এবং তার সঙ্গে আর এক বিপদ বেড়েছে, অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ। ফলে সাম্রাজ্যের বাজারও বৃটিশ মালের পক্ষে কিছু সংকীর্ণ হয়ে গেছে। আমেরিকায় বৃটেনের যে সব বাণিজ্যিক সম্পত্তি ছিল, যুদ্ধকালের লেণ্ডলীজ ব্যবস্থার কল্যাণে সেগুলো এবং তার আয় হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং তার ওপর আমেরিকার কাছে বিরাট ঋণ জমেছে।

তার ওপর একদিকে যুদ্ধ-শেষে নৈতিক বাজার ভেঙ্গে যাওয়ায় বেকার বৃদ্ধি এবং সামাজিক বীমার ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে, আর একদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনের দায় ঘাড়ে চেপেছে।

অর্থাৎ যুদ্ধে জয় হয়েছে বটে, কিন্তু অর্থনৈতিক যুদ্ধ বিরাট রূপ নিয়ে সমুপস্থিত হয়েছে, যে যুদ্ধে জয় হওয়াটা সামরিক যুদ্ধজয়ের চেয়ে কম কঠিন নয়। ভারতের বিরাট বাজারে সম্ভব পুনঃপ্রতিষ্ঠা বৃটেনের সামনে জরুরী প্রাথমিক প্রয়োজনরূপে দেখা দিয়েছে।

এর সঙ্গে দুটো রাজনৈতিক গরজও দেখা দিয়েছে, যথা—কাশ্মীর 'খোঁটা' থেকে মুখ রক্ষা, "স্বাধীন ভারতের" প্রতিনিধি বসানো, আর গণবিক্ষোভ দমন, এ দুটো কাজেই কংগ্রেস নেতারাই সহায় হতে পারে, যারা "প্রিন্স অ্যাণ্ড পপার" সমর্থিত রামরাজ্য পন্থী এবং বিড়লা-টাটার রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে কমিউনিজমের জুজুর হাত থেকে ভারতকে বাঁচানোর জন্যে বৃটেনের অর্থনৈতিক গরজেরও পার্টনার হতে পারে।

কুইট ইণ্ডিয়ার এই পরিকল্পনা এখন বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দেখে মিলিয়ে নিন। যখন বিলেতের নতুন লেবার গভর্ণমেন্ট '৪৫ সালের গোড়ায় ভারতে ইলেকশনের সিদ্ধান্ত করে, তখন লর্ড ওয়াভেল বিলেত থেকে ঘুরে এসে ঘোষণা করেন,—"হিজ ম্যাজেষ্টির গভর্ণমেন্টের দৃঢ় অভিমত হচ্ছে, ইলেকশনের পরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা নির্ধারিত করা হবে।"

তারপর যখন লেবার গভর্ণমেন্ট স্থির করলেন, ইতিমধ্যে ভারতে এক পার্লামেন্টারী কমিশন পাঠানো হবে,—তখন ভারত-সচিব ঘোষণা করলেন,—"তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ভারতকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দেওয়া এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের এক স্বাধীন অংশীদাররূপে প্রতিষ্ঠিত করা।"

আজ যাঁরা বলেন ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বৃটিশ এম্পায়ার মরে কমনওয়েলথ গজিয়েছে, তাঁরা লক্ষ্য করুন, প্রথমত, '৪৬ সালেও কমনওয়েলথ বলেই এম্পায়ারকে অভিহিত করা হচ্ছে, আর দ্বিতীয়ত, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পেয়েই কমনওয়েলথের "স্বাধীন" অংশীদার হওয়া যায় এবং তার নামই স্বাধীনতা।

এই পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার বৃটিশ প্ল্যানটাকেই স্বাধীনতা বলে চালাবার জন্যে জমি প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে পণ্ডিত নেহেরু ভারতের জনগণকে বলছেন, "Britain wants to transfer power to India but she does not know whom to give it...It should be made to the Indian representatives of the constitution making body which will come into existence after the provincial election." (A B P—4. 3. 46)

অর্থাৎ "বৃটেন ভারতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে চায়, কিন্তু ঠিক করতে পারছে না, কার হাতে ক্ষমতা দেবে। প্রাদেশিক নির্বাচন শেষ হওয়ার পর যে "সংবিধান প্রস্তুতি সংস্থা" গঠিত হবে, তার প্রতিনিধিদের হাতেই ক্ষমতা দেওয়া উচিত।"

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত যে 'কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলির' কথা নেহেরু বরাবর বলে এসেছেন, এখানে তিনি সে কথা ছেড়ে অত্যল্পসংখ্যক ভোটে নির্বাচিত 'কনষ্টিটিউশন মেকিং বডি'র কথা বলছেন। এর কারণ হচ্ছে প্রকৃত বৈধ কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি গঠনের ক্ষমতা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট দিতে চায়নি। তার বদলে নিজেদের মতলবমত এক "কমিটি" গঠনের ব্যবস্থা করেছে, যারা ভারতের নতুন সংবিধান রচনা করবে।

রয়টারের রাজনৈতিক সাংবাদিক ইতিপূর্বেই লণ্ডনে ক্যাবিনেট মিশনের নেতা পেথিক লরেন্সের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের রিপোর্টে বলেছেন : (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২১।২।৪৬),

"Asked if the British Government was prepared to accept sovereign independence of India and if such a constitution was framed, the minister said "That has been accepted for a long time."

Question—Was the mission going to India to transfer power or to negotiate transfer of power ?

Answer—Proposal to transfer power had already been made.

Q—Would Britain transfer power to the "Constituent Assembly" when it was in being ?

A—Transfer of power would be to the constitutional authority which was devised by the "constitution-making body."

Q—Don't you think that since provincial franchise in India is so limited that the constitution making body would be undemocratic ?

A—You have to begin somewhere.

Q—Has the mission full authority to negotiate freely ?

A—Before the mission goes out the Cabinet will come to certain broad decisions. Within these principal decisions the mission will be free to act.

অর্থাৎ ভারতের সার্বভৌম স্বাধীনতা বৃটেন মেনে নিয়েছে কি না, বা তদনুযায়ী সংবিধান রচিত হয়েছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেছেন,—ওটা তো বৃটেন অনেক কাল আগেই মেনে নিয়েছে।

প্রশ্ন—মিশন ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে, না সে বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করবে ?

উত্তর—ক্ষমতা হস্তান্তর করার প্রস্তাব আগেই হয়ে গেছে।

প্রশ্ন—ভারতে "কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি" তৈরী হলে, তার কাছেই কি ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে ?

উত্তর—"কনষ্টিটিউশন-মেকিং বডি" যে বৈধ কর্তৃপক্ষ গঠন করবে, তার হাতেই ক্ষমতা দেওয়া হবে।

প্রশ্ন—ভারতের প্রদেশগুলোতে ভোটাধিকার যে রকম সীমাবদ্ধ, (শতকরা ১৩ জন) তাতে কি আপনি মনে করেন না যে 'কনষ্টিটিউশন মেকিং বডি"-টা অগণতান্ত্রিক হবে?

উত্তর—যেখান থেকেই হোক, আরম্ভ তো করতে হবে।

প্রশ্ন—মিশনের কি স্বাধীনভাবে আলাপ-আলোচনার অধিকার আছে?

উত্তর—মিশন ভারতে যাওয়ার আগে বৃটিশ মন্ত্রিসভা কতকগুলো মূল সিদ্ধান্ত স্থির করবে, এবং তার গণ্ডীর মধ্যে মিশন স্বাধীন ভাবেই কাজ করবে।

অর্থাৎ—স্বায়ত্ব শাসনদানের এই আধাখেঁচড়া বৃটিশ প্ল্যানকে স্বাধীনতার বৈধ ভিত্তি বলে চালাবার জন্যে নেতারা কোরাসে গান ধরেছেন, বৃটেন ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে বাড়ী চলে যাচ্ছে, বৃটিশ সাম্রাজ্য একটা অতীতের কথা হতে চলেছে।

প্ল্যানটা ভারতবাসীর দিক থেকে 'আধাখেঁচড়া' হলেও বৃটেনের দিক থেকে আট ঘাট বাঁধার ত্রুটি নেই। "অমৃতবাজার পত্রিকা"র লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি লিখলেন (৩৷৩৷৪৬)

The Government is prepared to go as far as possible even all the way for assuring India of full independence. Defence and the control of external policy are the safe guards. They wish to reach a position whereby India can be free as other Dominions to decide its foreign policy. This can be achieved only if extremism does not enter into actual control of the Indian Political State

অর্থাৎ প্রতিরক্ষা আর বৈদেশিক নীতি-নিয়ন্ত্রণ, এই দুটো ব্যাপার বাঁচিয়ে ভারতকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া পর্যন্ত যেতেও বৃটিশ গভর্ণমেন্ট রাজী হতে পারে, এমন কি বৈদেশিক নীতিও ছেড়ে দিতে পারে, যদি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে চরমপন্থী নীতি না প্রবেশ করে।

যাই হোক, এই মূলতত্ত্বই সব নয়, এর সঙ্গে বৃটিশ ক্যাবিনেটের যে সব মূল-সিদ্ধান্তের গণ্ডীর মধ্যে ক্যাবিনেট মিশন কাজ করবে, তার মধ্যে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কুপল্যাণ্ড প্ল্যান, আর এম্পায়ার ডিফেন্স প্ল্যান অন্যতম, যে ডিফেন্স প্ল্যানে ভারতকে বৃটেনের প্রাচ্য-ঘাঁটী বা ইষ্টার্ণ বেসের অন্তর্ভুক্ত রাখার কথা বলা হয়েছে

এর পর ইলেকসন হল, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা দেশের শতকরা একজন মাত্র,—আর প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা দেশের শতকরা ১৩ জন। পরে এই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা এবং তার সঙ্গে দেশীয় নৃপতিদের একদল প্রতিনিধি ও প্রত্যেক প্রাদেশিক সভার কয়েকজন প্রতিনিধি মিলিয়ে নিয়ে সরকারী কাগজপত্রে যে "কনষ্টিটিউশন মেকিং বডি" গঠিত হয়েছিল, দেশী কাগজ-ওয়ালাদের কলমের কল্যাণে কালক্রমে 'সেটাকেই সরকারী কাগজপত্রেও 'কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি' বলে লেখা শুরু হল।

যাই হোক, ইলেকশনে দেখা গেল, কেন্দ্রে এবং প্রদেশগুলোতে প্রায় সব অ-মুসলমান 'জেনারেল সিট' দখল করলে কংগ্রেস, আর সব মুসলমান সিট দখল করলে মোসলেম লীগ। শুধু "ফ্রন্টিয়ার গান্ধী" আবদুল গফুর খানের দেশ উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশে লীগ হারলো

এবং কংগ্রেস জিতলো। তারপরে প্রদেশগুলোতে কংগ্রেস আবার মন্ত্রিসভা গঠন করলে, '৩৫ সালের শাসনবিধি অনুসারেই, কিন্তু লাটসাহেবের বিশেষ ক্ষমতার প্রশ্ন না তুলেই।

কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট আবুল কালাম আজাদ এর কারণ ব্যাখ্যা করে বললেন (ষ্টেটসম্যান—২১।২।৪৬):

"এখন যখন ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হতে চলেছে, তখন গভর্ণরদের বিশেষ ক্ষমতা ও হস্তক্ষেপের প্রশ্ন না তুলেই কংগ্রেস প্রদেশে মন্ত্রিত্ব নেবে এবং কেন্দ্রে সরকার গঠনের জন্যে অপেক্ষা করবে। কারণ, এখন এ প্রশ্ন তোলার অর্থ আমাদের বর্তমান সাফল্যকে অস্বীকার করা। এখন যদি কোনো প্রদেশে মন্ত্রিসভার সঙ্গে গভর্ণরের কোনো বিরোধ হয়, তা হলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হবে না, হবে গভর্ণরকে।"

জনগণের কাছে বড়াই করে লাগের বোক। বুঝিয়ে তিনি কিন্তু পাঞ্জাবে ৯৩ ধারার প্রবর্তন এবং গভর্ণরের শাসনের আসন্ন সম্ভাবনা দেখে লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

আর ইলেকশনের কল্যাণে, একদিকে কংগ্রেসের ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী, আর একদিকে লীগের পাকিস্তানের দাবী, এই দুই বিরোধী প্রচারের দৌলতে হিন্দু মুসলমান বিরোধ আরো তীব্র হয়ে উঠলো। ক্যাবিনেট মিশন যথাশাস্ত্র এই বিরোধকে আরো দৃঢ় করার ব্যবস্থার উপযুক্ত বাণী দিয়ে দুই পক্ষের নেতাদের সঙ্গে পৃথকভাবে আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত যে রিপোর্ট দিলেন, সেটা ঠিক সুপারিশ নয়, প্রকৃত পক্ষে অ্যাওয়ার্ড বা রোয়েদাদ।

তাতে প্রদেশগুলোকে এ বি সি, তিন গ্রুপে ভাগ করা হল। হিন্দু মেজরিটি প্রদেশগুলো এ গ্রুপ, মুসলমান মেজরিটি প্রদেশগুলো বি-গ্রুপ, আর বাংলা ও পাঞ্জাব সি-গ্রুপ যেখানে হিন্দু মুসলমান প্রায় সমান। এই তিন গ্রুপের শাসন ব্যবস্থা কি রকম পৃথক হবে, সেটা সংবিধান রচয়িতারা ঠিক করবে। আর দেশীয় রাজ্যগুলোর ওপর থেকে বৃটিশ প্যারামাউন্সি বা চূড়ান্ত কর্তৃত্বের ব্যবস্থাটা তুলে নেওয়া হবে, কিন্তু বৃটিশ ভারতের উত্তরাধিকারী সরকারগুলো সে প্যারামাউন্সির উত্তরাধিকারী হতে পারবে না, অর্থাৎ দেশীয় রাজারা আইনত সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে।

এদিকে কামউনিষ্ট পার্টি যে আগে কংগ্রেসের কার্ড সই করে কংগ্রেসে ঢুকেছিল, ইলেকশনের আগে তারা কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এল এবং শ্রমিক কেন্দ্রগুলো থেকে নির্বাচনে দাঁড়ালো। নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেস-লীগ বিরোধ বৃদ্ধির মতন কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী প্রচারে তাদের আগষ্ট বিপ্লবের বিরোধী, লীগের দালাল, দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বলা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের অফিসগুলোর এবং ব্যক্তিগতভাবে তাদের ওপর হামলাও শুরু হয়েছিল। এমন কি কমিউনিষ্ট কর্মীদের বাড়ী এবং আত্মীয়দের ওপরও হামলা চলেছিল। বহু কর্মী, তাদের বাড়ীর মেয়েরা, এমন কি তাদের বুড়ো বাপও গুণ্ডা-কংগ্রেসী এবং হিন্দুস্থান মজদুর সেবক সংঘের গুণ্ডাদের হাতে মার খেয়ে জখম হয়েছে, তাদের কমিউনিষ্ট পার্টির অফিসে আনা হয়েছে, প্রকাণ্ড হলের মেঝেয় অনেক জখমী পড়ে আছে, স্বচক্ষে দেখেছি। নিজেকে তাদের দলের লোক বলে মনে করতে শুরু করেছি।

অবশ্য পার্টির সদস্য হইনি অনেকের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও, কারণ "ইণ্ডিয়ান ষ্টেলিন" পি, সি, যোশী এবং তাঁর প্রাদেশিক লেফটন্যান্ট ভবানী সেনের মতিগতি আমার কখনো

ভাল লাগেনি। এমন কি "সোভিয়েট দুনিয়া" প্রকাশ করার পর স্বয়ং মোজাফ্‌ফর আহ্‌মদ যখন প্রস্তাব করেছিলেন, বাজে ব্যবসা নিয়ে না থেকে যদি আমি ন্যাশান্যাল এজেন্সিতে তাঁদের বই-এর কাজ নিয়েই থাকি, তাহলে তিনি একটা অ্যালাউন্সের ব্যবস্থাও করে দেবেন, তখন সে প্রস্তাবও আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলুম,—কারণ তাতে আমার স্বাধীন রাজনীতিক মতামত ছাড়তে হবে।

কিন্তু ইলেকশনে তাদের কর্মী হয়ে জগদ্দল কেন্দ্রে গেলুম। কংগ্রেসী নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের সঙ্গে কমিউনিষ্ট শ্রমিক চতুরানার দ্বন্দ্ব ইলেকশনের ভোটযুদ্ধের একটা চূড়ান্ত নমুনা। সারাদিন ধরে ভোটা ছুটির ভড়োহুড়ি, মুসলমানরা ভোট দিচ্ছে চতুরানাকে আর হিন্দুরা নীহারেন্দুকে—একটা রীতিমত কম্যুন্যাল ইলেকশন। মাঝে মাঝে এক একবার দাঙ্গা বাধার উপক্রম হয়, অতিকষ্টে থামানো হয়। আর ভোট দুপক্ষেরই একধার থেকে জাল ভোট!

যারা ভোট দিচ্ছে, তারা সবাই প্রায়ই ভোটার, বাজে লোকও কিছু আছে। কিন্তু তার চেয়ে মজার কথা হচ্ছে, পাশাপাশি দু'দলের কর্মী আর ভোটারদের হুড়োহুড়ির মধ্যে কে যে কে, তার ঠিক ঠিকানা নেই, যে-কোনো ভোটার যে কোনো ভোটারের নাম নিয়ে ভোট দিয়ে আসছে।

আমরা বহু কর্মী মিলে ভোটার লিষ্ট দেখে নামে নামে স্লিপ লিখে রেখেছিলুম, ভোটার এসে নাম বললেই তার নামের স্লিপটা তার হাতে দেওয়া হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, তা অসম্ভব, স্লিপ খুঁজে বার করতে হয়রান হতে হয়। সুতরাং অপরপক্ষের হুড়োহুড়ির সঙ্গে সমানে পাল্লা দেওয়ার জন্যে আমরা যে আসে তাকেই একখানা স্লিপ দিয়ে বলে দিই তোমার নাম জান্ মহম্মদ আর তোমার বাবার নাম খোদাবক্স। তাই সই, তারা মুখস্থ করতে করতে গিয়ে ভোট দিয়ে আসে।

মাঝে মাঝে এক একজন মাঝপথ থেকে ফিরে আসে, বলে কেয়া বোল দিয়া, ভুল গিয়া, এক দফে আউর বাতা দিজিয়ে। আর একবার চীৎকার করে বলে দিই, জান্ মহম্মদ—বাপ খোদাবক্স। একজন একটু তফাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললুম, খাড়া হায় কাহে? সে একটু মুখ টিপে হেসে বললে, হাম দো দফে গিয়া, ফের আনেসে পয়ছান লেগা। দুসরা ঘরকা (বুথ) সিলিপ দিজিয়ে। বললুম, দুসরা ঘরকা সামনে যাও! সে চলে গেল।

ইলেকশনে প্রয়োজন মত এ রেওয়াজ চালু হয়ে গেছে। দুই পক্ষই পরস্পর সম্বন্ধে বলে ওরা false vote-এ জিতেছে। কেউ বলে না, কেউ false vote-এ হেরেছে। অর্থাৎ দরকার মতন এ কায়দা সর্বক্ষেত্রেই চালু হয়ে গেছে। এই হচ্ছে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী সিষ্টেমের ইলেকশন। স্বচক্ষে দেখলুম, স্বহস্তে কাজ করলুম, বিবেকে বাধেনি। কিন্তু ঐ প্রথম, আর ঐ শেষ। কি কর্পোরেশন, কি কাউন্সিল-অ্যাসেম্বলী, সারা জীবনে আমি কখনো কোনখানেই ভোটার নই এবং কর্মীও হইনি।

অনেকে হয়ত নাক সিঁটকে বলবেন, ভারী বাহাদুরী করেছ। তাদের স্মরণ করতে বলি, নিজে চেষ্টা করে ভোটার লিষ্টে নাম ঢোকায় ক'টা লোক? সবাইকেই ভোটার লিষ্টভুক্ত করে দেয় কোন না কোন ইন্টারেষ্টেড পার্টি বা ব্যক্তি, যারা যাদের ভোটটা পাবার

আশা রাখে। আমার কেসে এমন পার্টি বা লোক আজ পর্যন্ত জোটেনি, যারা মনে করতে পারে, আমি তাদের ভোট দোব। ঝগড়টার মূল এইখানে।

উনচল্লিশ

ক্যাবিনেট মিশনের অ্যাওয়ার্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৬ সালের মে মাসে। অনেকে অগত্যা তারই মধ্যে স্বাধীনতার বীজ দেখতে পেলেন, কিন্তু মোটের ওপর সারা দেশ হতাশই হয়েছিল। বিলেতের লিবারেল লীডার ক্লিমেণ্ট ডেভিস হাউস অফ কমন্সে বক্তৃতায় বললেন, "ভারতের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাদের শিক্ষিত করে এবং সাহায্য করে বর্তমান অবস্থায় পৌছানোর জন্যে আমরা সব-কিছুই করেছি, যাতে তারা নিজেদের দেশের শাসনকার্য স্বহস্তে গ্রহণ করে বিশ্বরাষ্ট্রের সভায় গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করতে পাবে" (ষ্টেটসম্যান ১৭ই মে)।

উদার ভণ্ডামী। সে সময়ে "ন্যাশান্যাল হেরাল্ড" লিখেছিল, "বৃটিশ রাজনৈতিক ভাষার শব্দগুলো অর্থসম্পদে এত সমৃদ্ধ যে, "ইণ্ডিপেণ্ডেন্স" শব্দটার অর্থ খাঁটী স্বাধীনতাও হতে পারে, মেকি স্বাধীনতাও হতে পারে।"—একথার প্রমাণ পরবর্তীকালে পাওয়া গেছে।

যাই হোক, বাংলা ও পাঞ্জাব নিয়ে হিন্দু-মুসলমান মতভেদ প্রবলতর হল এবং মোসলেম লীগের পাকিস্থানের দাবীও আবার প্রবলতর হল। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেসের মিটিংয়ে সে দাবীর বিরোধিতাও বাড়তে লাগলো। লীগ তখন ডিরেক্ট অ্যাকশনের ধুয়ো তুললে এবং কোনো কোনো লীগনেতা বলতে লাগলেন, আমরা নন ভায়োলেন্স নীতি মানি না, এটা কেউ ভুলে যেও না।

এর ফল দাঁড়ালো এই যে লীগ থেকে যখন ১৬ই আগষ্ট হরতাল ঘোষণা করা হল, তখন হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেস মিলে ১৪ই আগষ্ট দেশপ্রিয় পার্কে এক বিরাট সভা করে এক প্রস্তাব পাশ করা হল যে, এ হরতাল কিছুতেই সফল হতে দেওয়া হবে না, আমরা যদি এর বিরোধিতা না করি, তা হলে প্রকারান্তরে আমাদের ঐ পাকিস্থানের দাবীটা মেনে নেওয়াই হবে।

লীগের তরফ থেকেও বিরাট মিছিল করে ধুয়ো তোলা হল, "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান।" ১৬ই আগষ্ট হরতাল উপলক্ষে যে দাঙ্গার সম্ভাবনা ষোল আনা, এটা সকলেই অনুভব করতে লাগলো এবং দুই পক্ষই তার জন্যে প্রস্তুত হ'ল।

আমি তখন "দৈনিক বসুমতীতে" "স্বাধীনতার ষড়যন্ত্র" নামে এক প্রবন্ধ লিখেছিলুম, এবং "Indo Soviet Journal"-এ "Indian Independence and Reactions Plans" নামে আর এক প্রবন্ধ লিখেছিলুম। Mercantile Unions এর Federation-এর Secretary-র সঙ্গে আমার এ বিষয়ে আলাপ আলোচনার কথা হয়েছিল, তিনি হরতালের দিন সকালে আমার বাসায় এসেছেন। কিছু কথাবার্তার পর দুজনে হরতালের অবস্থা দেখতে বেরোলুম। শিয়ালদার সামনে ফুটপাথে বরাবর সবত্র কিছু কিছু লোক দাঁড়িয়েছে, হিন্দু এবং মুসলমান দুইই আছে, দোকান সবই বন্ধ। শ' দুই খাকী

উর্দীপরা ন্যাশন্যাল গার্ডের ভলান্টিয়ার নীরবে মার্চ করে চলে গেল উত্তর দিকে, মুসলমানদের সংগঠন।

আমরা হ্যারিসন রোডের মোড়ে গিয়ে শুনলুম, মির্জাপুর-হ্যারিসন রোডের মোড়ে গোলমাল বেধেছে, পুলিসের গাড়ী গেছে। আমরা ঐ দিক এগিয়ে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের মোড়ে যেতে যেতেই দেখি, মোড়ের পরই দক্ষিণ দিকের একটা সরু গলির ভেতর থেকে ইট ছোড়া হচ্ছে এবং রাস্তায় জমা কিছু মুসলমান সেই ইট নিয়ে আবার গলির ভেতর ছুড়ে মারছে। দেখতে দেখতে উত্তর দিকের মুসলমানপাড়ার গলি থেকে কিছু লোক লাঠি নিয়ে তর্জন গর্জন করতে করতে আসছে।

দক্ষিণ দিকের সরু গলিটা খাটো দেওয়াল দিয়ে বন্ধ হয়েগেছে, সেখানে একটা সরু কোল্যাপসিবল গেট আছে, ইট ছোড়া হচ্ছিল তার ভেতর থেকে। লাঠিধারীরা সেখানে ঢুকতে না পেরে উত্তর দিকের বন্ধ দোকানগুলোর দরজায় লাঠির গুঁতো দিতে লাগলো। এইবার হয়ত দোকান ভেঙে লুটপাট শুরু হবে ভেবে আমরা দুজনে সরে পড়লুম। কিন্তু শিয়ালদার মোড়ে গিয়ে দেখি বাঁদিকের গলিতে লোকের ভিড়, তারাও মোড়ের দিকে ইট ছুড়ছে এবং মধ্যে মুসলমানদের একটা ছোটোখাটো ভিড় পাল্টা ইট ছুড়ছে।

আমরা আবার বৌবাজার স্ট্রীটে ফিরে এসে [illegible] লেনে একটা ছোট চায়ের দোকানে চা খেয়ে বৌবাজারের মোড় পর্যন্ত এক সঙ্গে গেলুম, তখনও কোনো গোলমালের চিহ্ন নেই। তার পর আমার সঙ্গী সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে মোড়ে বিখ্যাত ২৪৯ নম্বর বাড়ীতে ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে চলে গেলেন, আর আমি ওয়েলিংটন স্ট্রীট ধরে এগোলুম।

ফুটপাথে কিছু কিছু লোক জমেছে, দু'একটা ছোকরার হাতে লাঠিও আছে। ভীম নাগের দোকানের সামনে গিয়ে পিছনে গোলমাল শুনে ফিরে দেখি একটা সার্ট-প্যান্ট পরা লোককে কয়েকটা ছোকরা লাঠিপেটা শুরু করেছে, সে পশ্চিম দিকের রাস্তায় দৌড়ে পালালো, তার পিছনে তাড়া করে লোক ছুটলো। লোকটা কালো ও রোগা, এই অপরাধে তাকে মুসলমান মনে করা চলতে পারে।

কিন্তু আমার মুখে তখন বেশ ঘন ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি—একজন ভদ্রলোক আমাকে আটকালেন, বললেন, ওদিকে যাবেন না, গোলমাল, ফিরে চলুন। গতিক ভাল নয় দেখে তাঁর সঙ্গেই আবার বৌবাজার চৌমাথায় ফিরে এসে পুব দিকে ফিরেছি, ভদ্রলোক আবার বললেন, ও দিকেও যাবেন না, গোলমাল আছে, এই দিকে যান, বলে পশ্চিম দিক দেখিয়ে দিলেন। বুঝলুম, তিনি আমায় মুসলমান মনে করে নিরাপদ রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। সুতরাং আমিও ঐ দিকই নিরাপদ মনে করে ঐ ২৪৯ নম্বর বাড়ীতে গিয়েই উঠলুম।

তারপর একে একে কয়েক জন লোক এল এবং খবর দিলে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে, সুতরাং আমি সেইখানেই আটকে গেলুম। বিকেলে হরতালের মিটিং ভাঙ্গা লোকের ভিড় ঐ চৌরাস্তায় এসে যাওয়ার পর হঠাৎ মোড়ের একটা ভুজাওয়ালার দোকানের ঝাঁপে একটা লোক এক লাঠির গোঁজা দিল। দেখতে দেখতে ঝাঁপটা ভেঙ্গে ছিঁড়ে চাল-ছোলা ভাজার গামলা উল্টে একটা হরির লুটের হল্লা, আর, তারপরই আশপাশের সব দোকানের

ঝাঁপ দরজা ভাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। তারপর প্রথমে জিনিস পত্র ভাঙ্গা এবং ক্রমে রীতিমত লুট শুরু হয়ে গেল।

সেদিন শুক্রবার। আমরা ২২ জন লোক, সবই হিন্দু, রবিবার দুপুর পর্যন্ত ঐ বাড়ীতে আটক ছিলুম। বাড়ীর দরজার পাশের রোয়াকে এক বুড়ো মৌলবী সাহেবের তালা চাবির ছোট্ট একটা দোকান ছিল, বাড়ীটার দরজায় তালা লাগিয়ে মৌলবী সাহেব চাবি নিয়ে তিন দিন পাহারা দিয়েছিল। পোষ্টাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারী বীরেন ঘোষ তাঁর স্ত্রী এবং একটি ছোট মেয়ে নিয়ে ঐ বাড়ীতেই অফিস সংলগ্ন ঘরে থাকতেন, তাঁরাও আমাদের সঙ্গে আটকে পড়েছিলেন। ইনি ২ নম্বর বীরেন ঘোষ।

শনিবার সারাদিন লুট চলেছিল, কাছের একটা বাড়ী হয়েছিল লুটের মালের আড়ত। রাত্রে ঐ বাড়ীর সামনে পর্যন্ত মুসলমানদের ভিড় এবং কালী বাড়ীর পূর্ব পর্যন্ত হিন্দুদের ভিড়, উভয় পক্ষে ইট ছোড়াছুড়ি, লাঠি আস্ফালন এবং খিস্তির লড়াই চলছিল। ঐ বাড়ীর ছাদ থেকে যত দূর দেখা যায়, একটাও খুনোখুনি দেখা যায়নি। খুন চলছিল ফিয়ার্স লেনে এবং তার দুই মোড়ে, বৌবাজার ও সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ। মৌলবী সাহেব বলেছেন ঐ দিকে "গোলমাল হ্যায়।"

রবিবার সকালে আমাদের ঐ বাড়ীর নীচের একটা দোকানের দরজা ভাঙ্গা হল, বোধ হয় ঐ ২।১টা দোকানই বাকি ছিল, মৌলবী সাহেব খবর দিলেন। বীরেনবাবুর স্ত্রী বললেন, আর আমার ঐ বাড়ীতে থাকার সাহস হচ্ছে না। ঠিক করলুম, সকলে এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে হবে। পুলিসের গাড়ী টহল দিচ্ছিল, কিন্তু ওখানে দাঁড়ায় না। আমরা দল বেঁধে তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছিলুম। হঠাৎ এক পুলিসের গাড়ী মোড়ে এসে থামতেই আমরা বেরিয়ে পড়ে রাস্তা পার হয়ে কেণ্ডারডাইন লেনে ঢুকে পড়লুম হিন্দুস্থানের সীমানার মধ্যে নিরাপদ এলাকায়।

গোপাল মুখার্জি রেসকিউ ও রিলিফ সেণ্টার খুলেছিল, সকলে সেখানে পৌছালুম। বীরেন বাবুদের সঙ্গে লোক দিয়ে তাঁর ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। আর উকীল মন্মথ সরকার আমাদের নিয়ে চললেন শাঁখারীটোলার রাস্তা ধরে। সেখানে রাস্তায় লোকের ভিড় আমার দাড়ি দেখছে কটমট করে, কিন্তু আমার মুখে চোরা হাসি। আর সঙ্গীরা ত্রস্ত হয়ে "নারানদা" বলে ডেকে ফাঁড়া কাটাচ্ছে।

এরই মধ্যে হঠাৎ একজন এসে আমাকে ধরেছে। চোখে মুখে অস্বাভাবিক কঠোরতা, আমার পিলে চমকে উঠেছিল, কিন্তু মন্মথবাবু ফিরে দেখে একগাল হেসে বললেন; ঠিক আছে, ঠিক আছে, উনি ব্রাহ্মণ। লোকটা আমায় যেন ঘেন্নায় ছেড়ে দিয়ে বললে, খুব বেঁচে গেছেন, যান, দাড়িটি কামিয়ে ফেলুন গে।

ক্রীক রোর কাছে এক বাড়ীতে কমিউনিষ্টদের এক কমিউন বা মেস ছিল। সেখানে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে কোলে বাজারের খবর নিলুম, শুনলুম দাড়ি নিয়ে সেখান পর্যন্ত পৌছান যাবে না। সুতরাং সেইদিন সেইখানে, আমার বহুকালের সখের দাড়ি বিসর্জন দিয়ে বাসায় ফিরে এলুম।

পরদিন সকালে উঠে একজন বন্ধুর সঙ্গে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ারে বীভৎস মুসলমান মড়ার গাদা দেখে মনটার যেন দম আটকে আসতে লাগলো। মুসলমান

এলাকায় হিন্দুদের মড়ার গাদা দেখার উপায় ছিল না, কিন্তু অনেক লোমহর্ষক রিপোর্ট পেলুম। সে সব কথা এখানে প্রয়োজন নেই। কলকাতার জবাবে হল নোয়াখালি, তার জবাবে হল বিহার, গড়মুক্তেশ্বর, এমনি অনেকদিন ধরে চলেছিল। '৪৭ সালের গোড়ার অর্ধেক জুড়েও কলকাতা হিন্দুস্থান পাকিস্তান এলাকা ভাগাভাগি ছিল এবং এক এলাকার লোক অন্য এলাকায় যেতে পারতো না। হঠাৎ মাঝে মাঝে খুনের খবর আসতো, একতরফা cold blooded murder, মহাত্মাজী বলেছেন, আত্মা অবিনশ্বর।

'৩৫ সালের শাসনবিধি চলছে, তাতে প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী চীফ মিনিস্টার,— আর রাজ্যপাল গভর্ণর, বৃটিশ পার্লামেন্টের লোক। '৩৫ সালের শাসনবিধিতে প্রদেশের গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্বের মধ্যে একটি ছিল, প্রদেশের শান্তিরক্ষা। তার মধ্যে একটা প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে দাঙ্গা থামানো, দাঙ্গা দমনের দায়িত্ব গভর্ণরের এবং তার জন্যে সরকারের বিশেষ ক্ষমতা ঐ শাসনবিধিতে গভর্ণরকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি বললেন, আমি "Constitutional Governor" মাত্র, আমার কিছুই করবার নেই, চীফ মিনিস্টারই এ বিষয়ে সর্বেসর্বা। অথচ কংগ্রেসের নেতারা এবং কংগ্রেসী কাগজের সম্পাদকেরা জানেন যে, শাসনবিধি অনুসারে সকল দায়িত্ব গভর্ণরের। কিন্তু সে কথাটা কেউ বললে না বা লিখলে না, সাম্প্রদায়িকতার বিষকুম্ভ নেতারা সব দায়িত্ব সুরাবর্দীর ঘাড়ে চাপিয়ে সাম্প্রদায়িকতার আগুনে ইন্ধন জুগিয়েই চললেন।

কিন্তু মহাত্মাজী দেখছিলেন, যে স্বাধীনতা ভারতের দরজা ঠেলাঠেলি শুরু করেছিল, দাঙ্গার ধাক্কায় সেটার আর দিশা পাওয়া যায় না। বাক্যের কথার আড়ালে একটা চাপা পৈশাচিক উল্লাসও সুপরিস্ফুট। সুতরাং তিনি শান্তি স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। নোয়াখালীতে পদযাত্রা শুরু হল, কংগ্রেসীরা প্রচুর দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলেন, বিশ্বাসঘাতক জাতিকে একটা বিশ্বাস করা একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হঠকারিতার সামিল। কিন্তু দেখা গেল, মুসলমানেরা সর্বত্রই তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলে, তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলে, শান্তি স্থাপিত হল।

এ লক্ষণ তো ভাল নয়! '৪৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে (২০শে) বৃটিশ গভর্ণমেন্ট এক বিবৃতিতে বললেন, তাঁরা ঠিক করেছেন, তাঁরা '৪৮ সালের জুন মাসে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বদ্ধপরিকর (গরজটা তাঁদেরই বেশী)। যদি ভারতবাসীর এক মিলিত প্রতিষ্ঠান নাও থাকে, তাঁরা যেখানে যাদের প্রাধান্য দেখবেন, সেখানে তাদের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবেন।

স্বভাবতই এর ফল হল এই যে, আমাদের হিন্দু মুসলমান ঐক্যের যেটুকু গরজবোধ বাকি ছিল, তাও উবে গেল, আমাদের পারস্পরিক ক্ষমতার পাল্লা আবার জোরদার হয়ে উঠলো। গান্ধীর দেখাদেখি কলকাতায় শচীন মিত্র এবং স্মৃতীশ ব্যানার্জি পার্কসার্কাস অঞ্চলে শান্তিপ্রচারে বেরিয়ে শেষপর্যন্ত একদল মুসলমানের আক্রমণে নিহত হলেন।

মহাত্মাজী কলকাতায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এলেন, বেলেঘাটায় আড্ডা গাড়লেন, সুরাবর্দী তাঁর সঙ্গে দেখা ও আলাপ করে তাঁর রিক্রুট হয়ে গেলেন। মহাত্মাজী বললেন, হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষই শান্তির সদিচ্ছার প্রমাণস্বরূপ তাঁর কাছে অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ

করুক। তদনুসারে সুরাবর্দীও কিছু অস্ত্র সমর্পণের ব্যবস্থা করলেন, বেলেঘাটার হিন্দুরাও কিছু অস্ত্র সমর্পণ করলে। অন্তত সাময়িকভাবে শান্তি স্থাপিত হল।

আচার্য কৃপালনী পাটনায় এক বক্তৃতায় বললেন, "অনেক লোক এখনও বলে, শেষ সংগ্রাম আসন্ন। কথাটা হাস্যকর। সাম্রাজ্যবাদ মরেই গেছে, মরা ঘোড়াকে চাবকানোর কোন প্রয়োজনই নেই।" (রয়টার—ষ্টেটসম্যান—১৯।২।৪৭)।

সুরাবর্দী বললেন (ষ্টেটসম্যান—২৪।২।৪৭) "ইতিহাসের প্রারম্ভকাল থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে সাম্রাজ্যবাদ, সে আজ গতায়ু হল দেখে আমার মন বিপুলভাবে আন্দোলিত হচ্ছে। তারিখ বেঁধে দেওয়া হয়েছে, এখন আমাদের দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।"

গোবিন্দবল্লভ পন্থ বললেন, 'আমাদের কুইট ইণ্ডিয়া প্রস্তাবের এ এক বিরাট জয়" (হুচম্বারা।)।

এর আগেই, যখন আমাদের নেতারা আমাদের অনবরত শোনাতেন স্বাধীনতা আমাদের দরজা ঠেলাঠেলি করছে, তখন অ্যাটলীর সরকার চার্চিলকে বোঝাচ্ছেন (ষ্টেটসম্যান ২।১২।৪৬) আপনি ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে যে ভাবে কথা বলেন, তাতে মনে হয় যেন আপনি ক্রিপস্ মিশনের কথা ভুলে গেছেন, সেটা আপনার সরকারেরই তরফ থেকে মিঃ আমেরী ঘোষণা করেছিলেন। আর আমাদের ঘোষণাটা সেই ক্রিপস মিশনের ঘোষণাকে একটুও ছাড়িয়ে যায়নি।"

আবার স্বয়ং ক্রিপস্ সাহেব হাউস অব কমনসে বললেন (ষ্টেটসম্যান ৬।৩।৪৭) "ভারতের 'স্বায়ত্ত শাসনের' প্রস্তুতির পথে অবিরাম চলার পর আজ আমরা তার অব্যবহিত এ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছি।'

হাউস অফ কমন্সের ঐ অধিবেশনেই চার্চিল ফেব্রুয়ারী ঘোষণা সম্পর্কে বললেন, "ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে ১৪ মাস সময় দিয়ে পাকা তারিখ বেঁধে দেওয়ার ফলে ভারতের ঐক্যের সম্ভাবনা একেবারে শেষ করে দেওয়া হয়েছে, ক্রিপস মিশনের মধ্যে যেটা ছিল এক প্রধান কথা, হিন্দু মুসলমানের ঐক্য হওয়া চাই, যাতে একটামাত্র উত্তরাধিকারী সরকার হয়।" (ষ্টেটসম্যান ৮।৩।৪৭)।

ভারতের ঐক্য সম্বন্ধে চার্চিলের ঐ মাথাব্যথার অর্থ অবশ্য ছিল এই যে, ঐক্য যাতে না হয়, তাও তাঁরা দেখবেন এবং ঐক্যের অভাবের অজুহাতে ক্ষমতা হস্তান্তরও স্থগিত করবেন।

কিন্তু ক্যাবিনেট মিশনের অন্যতম সদস্য আলেকজাণ্ডার বললেন, "কেউ কেউ হয়ত মনে করতে পারেন যে, উত্তরাধিকারী সরকার যাতে একটি হয়, তা করতে আমরা বাধ্য, কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। মিঃ চার্চিলের আমলেই অ্যামেরী বলেছিলেন, ভারতে উত্তরাধিকারী সরকার একাধিকও হতে পারে, তার আমরা ভারতকে "স্বায়ত্ত শাসন" দেওয়ার ব্যবস্থায় ঠিক ঐ নীতিই অবলম্বন করেছি। (ষ্টেটসম্যান—ঐ)।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, '৪৭ সালের গোড়াতেই বৃটিশ সরকার ভারত বিভাগের মতলব আঁটছে। অর্থাৎ মহাত্মাজী যে পরে বলেছিলেন, ইংরেজ ভারত বিভাগের জন্যে দায়ী নয়, সে কথা ঠিক নয় এবং তা তিনি জানতেন।

যাই হোক, তার পর চার্চিল যখন বললেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তর শেষ করতে যাওয়া হচ্ছে বর্ণহিন্দু নেতাদের হাতে, তখন অ্যাটলি জবাব দিলেন, "আপনি যা-ই বলুন, ভারতীয়দের হাত দিয়েই, শিক্ষিত ভারতবাসীর হাত দিয়েই তো আপনাদের ভারত শাসন করতে হবে, After all, you have to govern India through educated Indians" (ষ্টেটসম্যান—ঐ)।

তারপর চার্চিল যখন বললেন, "ঐ তথাকথিত রাজনৈতিক শ্রেণীর লোকগুলো খেলো বাজে লোক, men of straw তখন মিঃ আলেকজাণ্ডার বললেন, "ইংরেজরা যখন ভারতবাসীর সঙ্গে একটা দীর্ঘমেয়াদী বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে যাচ্ছে, তখন একজন কর্তৃত্ব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষে এই পার্লামেন্ট ভবনে ভারতীয় নেতাদের সম্বন্ধে এইভাবে কথা বলাটা একটা মারাত্মক অবিবেচনার কাজ" (ঐ)।

ঐ ষড়যন্ত্রের আর একটা দিক প্রকাশ হল ৩০।৫।৭৭ এর ষ্টেটসম্যানের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ Changing Commonwealth মারফৎ। তাতে বলা হল, "সাম্প্রতিককালের আলোচনাদি থেকে বোঝা যাচ্ছে, কমনওয়েলথের বিকাশের ধারা নানাদিকে চলেছে। ১৯৪৪ সালের ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সের শেষের ঘোষণায় বলা হয়েছিল,

"আমরা,—বৃটেন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের রাজার প্রধান মন্ত্রীরা"—ইত্যাদি।

"কিন্তু এখন যখন এই বিভিন্ন জাতির সংযুক্ত কমিটির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সদস্যেরা "ডোমিনিয়ন" কথাটা আর পছন্দ করছেন না, তখন ভারত কমনওয়েলথে থাকুক বা না থাকুক, "ভারতের সম্রাট" কথাটা বর্জন করাই ভাল। "বৃটিশ প্রজা" কথাটাও লেখা বন্ধ করাই ভাল। "ডোমিনিয়ন" এর মতন "প্রজা" কথাটাও শুনতে ভাল নয়। ভবিষ্যতে "কমনওয়েলথের নাগরিক" কথাটা চালু করাই ভাল হবে।"

এদিকে গোপনে ৩রা জুনের ভারত বিভাগের প্ল্যানও তৈরী হতে লাগলো। লর্ড ওয়াভেলের রাস্তা খসে গিয়েছিল বলে বৃটিশ রাজপরিবারের আত্মীয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে তার স্থলে বড়লাট করে পাঠিয়ে তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যবস্থা হল, আমাদের নেতারা তাঁর গুণগান প্রচার করতে লাগলেন। দুজন বৃটিশ শাসন বিধি বিশেষজ্ঞ ক্ষমতা হস্তান্তরের আইন প্রণয়নের জন্যে নিযুক্ত হলেন, এবং তাঁরা দু' মাসের মধ্যে এক আইন খাড়া করে ফেললেন, India Independence Act

ষ্টেটসম্যান আহ্লাদে গদগদ হয়ে লিখলে, "The name is a master stroke, আইনটার নামটা হয়েছে ওস্তাদির চূড়ান্ত" (অর্থাৎ ঐ নামের গুণেই ভারতবাসী আলুথালু হয়ে পড়বে)।

সত্যিই আইনটার নাম দেখেই আমরা আলুথালু হয়ে পড়লুম। ফলে এটুকু আমাদের নজরে পড়লো না যে, আইনটার ভিত্তি যে '৩৫ সালের শাসন বিধি, একথা বলেই আইন তৈরী শুরু হয়ে ছিল, এবং আইনটার প্রথম কথাই হল, "The purpose of this Act is to make India an Independent Dominion.

আমরা স্বাভাবিক আর্যরক্তের তেজেই ধরে নিলুম, আইনটা '৩৫ সালের শাসন বিধির

পরিবর্তে অন্তর্বর্তীকালীন শাসন বিধি রূপে চালু হবে, যতদিন না আমাদের তথাকথিত কনষ্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি স্বাধীন ভারতের শাসনবিধি তৈরী শেষ করে।

অর্থাৎ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্ট চালু হলেই আমরা পাকা ডোমিনিয়নের পর্যায়ে উঠবো, আর কনষ্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির রচিত শাসনবিধির কল্যাণে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবো। আমাদের নেতারাও আমাদের এই ভাবের ধোঁকা দিয়েই বোকা বুঝিয়েছিলেন।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হল এই যে, যেহেতু '৩৫ সালের শাসনবিধির কেন্দ্রীয় সরকার সংক্রান্ত ফেডারেশন প্ল্যানটা গঠিত বা কার্যকরী হওয়া তখনো ঘটে ওঠেনি,—তাই ঐ '৩৫ সালের শাসনবিধির ঐ অংশটার সংশোধন করে তাকে সম্পূর্ণ করাই ঐ আইনটার মোদ্দা কথা। '৩৫ সালের শাসনবিধিই যে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্টের ভিত্তি, একথার প্রকৃত তাৎপর্য এই।

আর কনষ্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলী যে সংবিধান রচনা করবে, সেটা পূর্ণস্বাধীনতার সংবিধান নয়, পরন্তু ঐ পাকা ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ডোমিনিয়নের সংবিধান। কথাটা পরিষ্কার বোঝা যাবে পরবর্তী ঘটনাগুলো বিচার করলে।

'৪৭ সালের ৩রা জুন মাউন্টব্যাটেন প্ল্যানে ভারত বিভাগের প্রস্তাব প্রকাশ হওয়ার আগে পর্যন্ত নেতারা কথাটা আমাদের কাছে গোপন রেখেছিলেন, যে প্ল্যানটা আগে থেকে তাঁরা দেখে সমর্থন দেওয়ার পরই সেটা প্রকাশ করা হয়েছিল।

শুধু তাই নয়। পাছে ভারতবাসী হঠাৎ ভারত বিভাগের ব্যবস্থা দেখে আঁৎকে ওঠে এবং কোন অবাঞ্ছনীয় অঘটন ঘটিয়ে বসে, তার জন্যে ঐ ষড়যন্ত্রের মূলপাণ্ডা মহাত্মাজী আগে থেকেই জমি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেছিলেন। ২রা জুন বিকালে দিল্লীতে প্রার্থনাসভার শেষে তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলছেন, (ষ্টেটসম্যান—৩।৬।৪৭)।

"কি হচ্ছে বা হবে, তা বলার সাধ্য আমার নেই। বড়লাট যে বিলাত থেকে কি এনেছেন, তা নিয়ে আমাদের মতন রাস্তার লোকের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। আমি গতকাল বলেছি, পণ্ডিত জহরলাল কেমন চমৎকার কাজ করছেন। তিনি বিলেতের হ্যারোর স্কুলের ছাত্র, কেমব্রিজের গ্রাজুয়েট এবং একজন ব্যারিষ্টার—ইংরেজদের সঙ্গে আলোচনা ও বোঝাপড়ায় তিনিই উপযুক্ত লোক। কিন্তু শীঘ্রই এমন দিন আসবে, যেদিন ভারত রিপাবলিক হবে, এবং ভারতবাসীদের সেই রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে হবে। একথা ভাবতে আমার পরম আনন্দ হয় যে, একটি সচ্চরিত্র ও দৃঢ়হৃদয় মেথর-মেয়েই আমাদের প্রথম প্রেসিডেন্ট হতে পারে। এ একটা অসম্ভব স্বপ্ন নয়

সাধুসন্ত যদি বা নৈতিক নেতা হন, তাহলে তাঁর ভণ্ডামী হয় অতুলনীয়। জনগণের মনে রিপাবলিকের মনোহারী চিত্র এঁকে দিয়ে '৪৭ সালের ২রা জুন মহাত্মাজী যে "প্যাড" তৈরী করে দিলেন, ঠিক তার পরের দিনই ৩রা জুনের ভারত বিভাগের প্ল্যান তার ওপর নিক্ষেপে ধাক্কার আঘাতের মতন পড়লো এবং প্যাডের কল্যাণে আমরা সে বিরাট ধাক্কা সামলে নিলুম।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, যে চার্চিল এই স্বাধীনতার ষড়যন্ত্রটা আগে বুঝতে না পেরে ভেবেছিলেন বুঝি বা বৃটিশ সাম্রাজ্যটাকে অ্যাটলী-ক্রিপসের দল লিকুইডেশনেই দিতে বসেছে, সেই চার্চিল ব্যাপারটা বুঝে সন্তুষ্ট হয়ে বলছেন, (ষ্টেটসম্যান ঐ) "একথা অবশ্য

ঠিকই যে, ভারত বিভাগের ভিত্তিতেই ভারতের বিভিন্ন পার্টির মধ্যে চুক্তি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু একথাও ঠিক যে, যদি এর সবটা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যেই থেকে যায়, তাহলে ভারতের ঐক্য ও রক্ষা থাকবে, আর ভারতের [illegible] ব্রিটিশ রাজ মুকুটের রহস্যজনক চক্রের মধ্যেই তাদের [illegible] খুঁজে পাবে।

পাক-ভারত লড়াইয়ের আগে [illegible] পাকিস্তান নয় যে সব রাজনৈতিক পণ্ডিত ও প্যাট্রিয়ট [illegible] [illegible] পারেন নাই যে, বৃটেন ওয়েস্টের বন্ধনের ঐক্য [illegible] না।

এদিকে তখন [illegible] প্রধান [illegible] মাউন্টব্যাটেন দিল্লীতে এক প্রেস কনফারেন্সে [illegible], [illegible] ১৮ [illegible] সম্পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা আছে, আমি সেটা [illegible] না, I am not bluffing" ([illegible])।

'৪৭ সালের [illegible] কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার বর্তমান সরকারের। সর্বপ্রথম চুক্তি [illegible] এবং বহির্বিষয়ক [illegible] ([illegible] —১৯৪৭)।

অর্থাৎ দলের [illegible] ডোমিনিয়ন স্বাধীন হবে, কিন্তু [illegible] ব্রিটিশ সাম্রাজ্য [illegible] ব্রিটিশ-ভারতের সরকার ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে [illegible] আগে ডোমিনিয়ন মেনে [illegible] থাকবে। [illegible] ব্রিটিশ-ভারতের সরকার নিজেরা যেখানে যার সঙ্গে সব চুক্তি [illegible] করে গেছে তা মেনে এসেছে, উত্তরাধিকার সূত্রে স্বাধীন [illegible] ডোমিনিয়ন সেগুলোও [illegible] দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে অবশ্যই কংগ্রেস [illegible] সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের একটা চুক্তি না হলে মহাত্মাজী উপরোক্ত কথাগুলো বাড়িয়ে [illegible] পারেন না। [illegible] তেমন চুক্তি যে হয়েছিল, যদিও ভারতের জনগণের কাছে [illegible] সত্য কথনো প্রকাশ করেননি, তার বহু প্রমাণও আছে। সে দিকে যাতে আমাদের নজর না পড়ে, [illegible] ভাবে আমাদের শুনিয়ে চলেছিলেন, ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে চলে যাচ্ছে।

প্রথমত ধরুন, বার্মা স্বাধীন হওয়ার আগে [illegible] এক গুড উইল মিশনের নাম করে বার্মায় গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে [illegible] এক প্রেস কনফারেন্সে বলেছিলেন, "As the necessary corollary of the transference of power, a treaty has been made with Burma, the details of which I am not at liberty to divulge at present" অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তরের অপরিহার্য সর্ত রূপে বার্মার সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি হয়েছে, যার বিশদ বিবরণ দেওয়ার অধিকার আমার বর্তমানে নেই।

না বোঝার মতলব না থাকলেই এটা বোঝা যায় যে, যদি বার্মার বেলায় ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা অপরিহার্য সর্ত থাকতে পারে, তা হলে ভারতের বেলায়ও তা অবশ্যই থাকবে। বস্তুত তা যে ছিল, এবং তেমন চুক্তি যে হয়েছিল, তা ফেব্রুয়ারী ঘোষণার আলোচনাকালে হাউস অফ কমন্সে স্বয়ং ক্রিপস সুস্পষ্ট ভাষায়ই বলেছিলেন। "Racial and religious

minority'র স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে রক্ষণশীল দলের উৎকণ্ঠা নিবারণ করে তিনি বলেন, "proper protection of the minorities was made a condition of transfer of power, as was indeed the negotiating of a treaty as to the condition of transfer. It will make provision for the protection of racial and religious minorities." অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তরের সর্তরূপে একটা চুক্তিও হয়েছে এবং তার মধ্যে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর স্বার্থ রক্ষার সর্তও বাধা হয়েছে। (ষ্টেটসম্যান -৬।৩।৪৭)।

সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জরিত দৃষ্টি আমাদের, তাই আমরা বুঝলুম, মুসলমানরাই সংখ্যালঘু এবং তাদের জন্যেই চার্চিলের গুষ্টির এত মাথাব্যথা। একথাটা কারো মাথায় ঢুকলো না যে, সব চেয়ে ছোট অথচ সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, "racial minority হচ্ছে বৃটিশ সম্প্রদায়, এবং তাদের স্বার্থই চার্চিলের গুষ্টির কাছে সব চেয়ে গুরুতর, বিশেষ ব্যবস্থা না রাখলে যাদের স্বার্থের হানি হওয়ার ভয় সব চেয়ে বেশী।

২রা জুন মহাত্মা বললেন, কি হচ্ছে, তিনি কিছু জানেন না, অথচ ৩রা জুনের প্ল্যান প্রকাশ হওয়ার পরই, ৮ই জুন তিনি আমাদের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সমস্ত অবস্থাই বললেন, এর অর্থ কি এই নয় যে, সবই তিনি জানতেন? বস্তুত ছ'দিন ধরে কেসীর সঙ্গে দরজা বন্ধ ঘরে তাঁর গোপন আলোচনায় সকল অবস্থা ও ব্যবস্থার, চুক্তি এবং উত্তরাধিকারের, আলোচনা এবং নীতি নির্ধারণ সম্পূর্ণ হয়েছিল। যা কিছু হয়েছে, "নাটের গুরু" তিনিই। তিনি এটা জানতেন না, ওটা ভাবেননি, এসব কথা নেহাৎই মিথ্যা কথা।

৩রা জুনের প্ল্যানের ভারত বিভাগের ব্যবস্থা যখন এ-আই সি-সির সমর্থন লাভের জন্যে অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়, তখন পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন, কে এম মুন্সী প্রমুখ নেতারা তার প্রতিবাদ করেন এবং সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। সে সভায় পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ বলেন, (ষ্টেটসম্যান—১৫।৮।৪৭)।

"দেশের মুক্তি ও স্বাধীনতার একমাত্র উপায় ৩রা জুনের প্ল্যান গ্রহণ করা। এ প্ল্যান বাতিল করাটা হবে আত্মহত্যার সামিল। ২০শে ফেব্রুয়ারীর বৃটিশ ঘোষণাটা হচ্ছে কংগ্রেসের কুইট ইণ্ডিয়া প্রস্তাবের জয়, আর ১৫ই আগষ্ট বৃটিশ সরকার ভারত থেকে তার শাসনের শেষ চিহ্ন মুছে দেবে বলে স্থির করেছে, এর অর্থ কংগ্রেসের বিরাট জয়।"

কিন্তু ট্যাণ্ডনের সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে সভায় গণ্ডগোল পেকে উঠলো। অবস্থা ঘোরালো দেখে মহাত্মাজীকে আনা হয়, যদিও তিনি সদস্য নন। তিনি বললেন, আপনাদের প্রতিনিধি নেতা (নেহেরু) যে চেক কেটেছেন, তা "অনার" করা আপনাদের পবিত্র দায়িত্ব। অর্থাৎ নেহরু যে-প্ল্যান মেনে এসেছেন, তা' মেনে নেওয়াই আপনাদের উচিত, কারণ তা না হলে বৃটেনের কাছে কংগ্রেস নেতাদের কথার মূল্য থাকবে না।

এই ভাবে মহাত্মাজী এ আই-সি সির সমর্থনটা ম্যানেজ করে দিলেন। Gandhi is Congress, Gandhi is India মিছে কথা নয়, সমগ্র নাটের গুরু তিনিই।

যাই হোক উত্তরাধিকারী ভারত সরকার রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ আই, এল, ওর সদস্যপদ সবই উত্তরাধিকার সূত্রে পেলো, সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ ভারতের সরকারের সঙ্গে পণ্ডিচেরীর ফরাসী সরকার এবং গোয়ার পর্তুগীজ সরকারের পাশাপাশি শান্তিতে বাস করার জন্যে যে

সব ব্যবস্থা ও চুক্তি ছিল, সেগুলোও স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়ন উত্তরাধিকার সূত্রে পেলো, অর্থাৎ মেনে চলার বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ হল।

ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্ট যখন রচিত হয়, তখন ভারত বিভাগের ব্যবস্থাটা বাস্তবে পাকা হয়নি বলে একটামাত্র উত্তরাধিকারী সরকার ধরে নিয়ে আইনটিতে অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল কথাটা একবচনে লেখা হয়েছিল। কিন্তু ভারত বিভাগের প্ল্যান যখন পাকা হল, তখন তাড়াতাড়ি তার মধ্যে একটা নতুন ধারা জুড়ে দিয়ে বলা হল, এই আইনে যেখানে যেখানে গভর্ণর জেনারেল কথাটা আছে সেখানে পড়তে হবে Governors General of the two Dominions কারণ দুটো ডোমিনিয়নই এক আইনে স্বাধীন হচ্ছে, এবং তাদের সরকার দুটোও এক রকমেরই হবে।

পাকিস্তান হল একটা নবজাত রাষ্ট্র, কাজেই সে ভারতের মতন চুক্তিগুলোর অটোমেটিক্ উত্তরাধিকারী হল না, কিন্তু যেহেতু দুটো সরকার এক আইনে একই রকমের হওয়া চাই, অতএব পাকিস্তান ও বিদেশের সঙ্গে আইন আপ করার জন্যে সব চুক্তি নূতন রাষ্ট্র হিসাবে মেনে নিলে, রাষ্ট্রসংঘের নতুন সভ্য হল, ইত্যাদি।

তারপর আভ্যন্তরীণ চুক্তির উত্তরাধিকারের কথা। এক একটা ব্যাপারেই তার স্বরূপ সুপরিস্ফুট হল। ১৮৫৭ খৃঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বে নবাব মীর জাফর কোম্পানিকে যে সাহায্য করেছিল, তার পুরস্কারস্বরূপ কোম্পানি তাকে বছরে কয়েক লক্ষ টাকার বংশানুক্রমিক পেনসন দিয়েছিল। এখন উত্তরাধিকারী স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়ন সরকার সেই আগা খাঁর বংশের বর্তমান আগা খাঁকে সেই পেনসন দিয়ে চলেছেন।

পক্ষান্তরে ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করে মরেছিলেন বলে তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়ে ইংরেজ তাঁর বংশধরদের মাত্র কয়েকশো টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিল স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়নের সরকার আজ পর্যন্ত তাদের সে বৃত্তি এক পয়সাও বাড়ায়নি।

আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ও চুক্তির উত্তরাধিকারের আর একটা অন্য রকমের উদাহরণও কম মনোহারী নয়। বিদ্রোহের অপরাধে বৃটিশ সরকার বীর সাভারকরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল। এখন ভারত স্বাধীন হল বলে সাভারকর স্বাধীন ভারতের সরকারের কাছে দাবী করলেন, তাঁর সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হোক। অনেক দিন নানা অজুহাতে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারের তরফ থেকে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ জবাব দিলেন পার্লামেণ্ট থেকে, "আমরা বিশেষজ্ঞ আইনজীবীদের পরামর্শ নিয়ে দেখেছি, সাভারকারের সম্পত্তি প্রত্যর্পণের আইনগত অধিকার এ সরকারের নেই।"

আর একটা দৃষ্টান্ত আই-সি-এস অফিসারদের চাকরী সম্পর্কে, যাকে ভারত সচিবের চাকরী বলা হত। তাতে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার যে স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়নের ছিল না, এ কথাটা চাপা দেওয়ার জন্য সর্দার প্যাটেল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলেন যে, তিনি তাদের চাকুরীর সকল সর্ত, মোটা বেতন ও পেনসন, ছুটী ও অন্যান্য বিশেষ সুবিধা, সব সম্পর্কেই গ্যারাণ্টি দিয়েছেন, সুতরাং তা নিয়ে গণ্ডগোল করা চলবে না।—ব্যাপারটা কি সর্দার প্যাটেলের পৈত্রিক জমিদারীর কথা?

ইংরেজদের মোটা মাইনেটাকে দেশের লোক এবং কংগ্রেস নিজেই বরাবর লুট বলেছে,

এবং '৩৭ সালে কংগ্রেস মন্ত্রীরা অল্প বেতন নিয়েছিল, কিন্তু অফিসারদের মোটা মাইনেতে হাত দিতে পারেনি, সেটা ছিল পরাধীনতার বিড়ম্বনা।

এখন জনগণের কাছে স্বাধীনতার বড়াই করতে হবে, অথচ অফিসারদের মোটা মাইনেতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। এ দুর্দশা ঢাকা দেওয়ার উপায় কি? '৩৭ সালের প্রদর্শনীর পুনরভিনয় করতে গেলে এ দশা ঢাকা দেওয়া যায় না। সুতরাং চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে নিজেরাই বৃটিশ লুটের মতন মোটা মাইনে নিয়ে ভারতের নতুন ইজ্জতের কথা বলে আমাদের বোকা বুঝিয়ে ব্যাপারটার কদর্যতা ঢাকা দেওয়া হল। আর চক্ষুলজ্জা যখন কেটে গেল, তখন কংগ্রেস নেতারা নবাবীতে ইংরেজদের ওপর টেক্কা মেরে চললো। জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার দাবী ও সংগ্রাম যে এত সহজে ম্যানেজ করা যায় এবং "মাউন্টব্যাটেন কি জয়" বলে তাদের দুহাত তুলে নৃত্য করানো যায়, এ ভেল্কিবাজী দেখে আমেরিকার ধনিক মালিকরা রোমাঞ্চ কলেবরে বৃটিশ শাসনতান্ত্রিক প্রতিভার (constitutional genius) তারিফ করেছিল।

'অ্যামেরিক্যান্‌স ফর ডেমোক্রেটিক' অ্যাকসন নামক সংস্থার তরফ থেকে লিয়োঁ হেণ্ডারসন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলীকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিল, "আজ ভারতে যা ঘটছে, সারা দুনিয়ার স্বাধীন মানুষ চিরকাল তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। দুদিন আগেও যে সব বাধা দুরতিক্রম্য বলে মনে হয়েছিল, আপনার সরকার তা অপসারণ করে ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার স্থপতিরূপে যে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে এবং গণতান্ত্রিকতার একটা উন্নততর মানের প্রতিষ্ঠা করেছে, তাতে আমরা আপনার এবং আপনার সরকারের কাছে ডেমোক্রেসীর অশেষ ঋণ স্বীকার করতে গর্ব অনুভব কচ্ছি।" (ষ্টেটসম্যান—২০।৬।৪৭)

চল্লিশ

সশস্ত্র বিপ্লবের সাহায্যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের উচ্ছেদ করতে না পারলে যে পরাধীন জাতি স্বাধীন হতে পারে না, দুনিয়ার ইতিহাসের এই চিরন্তন সত্য অনুসরণ করেই ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলন, গুপ্ত সমিতি, ষড়যন্ত্র প্রচেষ্টা ভারতে বৃটিশ শাসনের ইতিহাসের একটা বিশিষ্ট গৌরবময় অধ্যায়। সে প্রচেষ্টার শেষ প্রতিভূ সুভাষ বসুর বৈপ্লবিক তত্ত্বাদর্শের সঙ্গে কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংঘর্ষের মূলকথাই ছিল, ইংরেজের সঙ্গে আপোষ বন্দোবস্ত করে ভারত স্বাধীন হতে পারে না। সুভাষ বাবু তাঁর সমগ্র শক্তি দিয়ে ভারতবাসীকে এই কথাটা বোঝাবার এবং মানাবার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিপ্লব প্রচারের মধ্যে এই কথাটাই ছিল সর্বপ্রধান।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পড়েছিলেন একা। ভারতের মার্কামারা বিপ্লবীদলগুলো বিপ্লবের পথ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে গান্ধীবাদের বৈপ্লবিক ভূমিকা হৃদয়ঙ্গম করার ছল করে কংগ্রেসের আপোষ পন্থার চোরাগলিতে আশ্রয় নিয়েছিল। সুভাষ বাবুর সাংগঠনিক দুর্বলতার মূল এইখানে। তাঁর সঙ্গে মিলেছিল তাঁর কোটি কোটি ভক্তের জয়ধ্বনির অন্তরালে লুকানো চরম বিশ্বাসঘাতকতা। গান্ধী-কংগ্রেস তাদের অবহেলে দিশাহারা করে

স্বাধীনতার ঢাক পিটিয়েই নিজেদের পিছনে জড়ো করতে পেরেছিল। ফলে বিপ্লবের শেষ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হল।

কংগ্রেস নেতারা তখন স্বর ধরেছিলেন, Only Congress can deliver the goods. তার প্রকৃত অর্থ, একদিকে ইংরেজের আর্থিক, বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যিক স্বার্থ নিরঙ্কুশ করা, এবং আর একদিকে স্বাধীনতার নামে জনগণকে স্বায়ত্তশাসনাধিকারের, ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের, দিল্লীকা লাড্ডু গলাধঃকরণ করানো, একমাত্র কংগ্রেসই যে এই ভেল্কিবাজী সফল করতে পারে, ইংরেজকে এ কথাটা নিঃসন্দেহে বুঝিয়ে দেওয়া। তাদের সে চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হল।

'৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তর কার্য পরম গাম্ভীর্য সহকারে সমাধা হল, ভারত স্বাধীন হল। সমগ্র দেশ জুড়ে হিন্দু-মুসলমান জনগণের সম্মিলিত উন্মত্ত আনন্দোৎসবে দাঙ্গার দাগ সাময়িক ভাবে সম্পূর্ণরূপে মুছে গেল। কারণ ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল, বৃটিশ ভারত তিনটি স্বাধীন ডোমিনিয়নের রূপ পরিগ্রহ করেছিল, কাটাছাঁটা ভারত, পাকিস্তান এবং সিংহল।

আর "ভারতীয় ভারত", অর্থাৎ নেটিভ ষ্টেটগুলো সম্বন্ধে ক্যাবিনেট মিশনের অ্যাওয়ার্ড বলবৎ হল, কারণ ওরা জুনের মাউন্টব্যাটেন প্ল্যানের মধ্যে ঐ ক্যাবিনেট মিশনের নেটিভ ষ্টেট সংক্রান্ত অ্যাওয়ার্ড সমগ্রভাবে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল। তাদের ওপর থেকে বৃটিশ প্যারামাউন্সি তুলে নেওয়া হল, বৃটিশ ভারতের উত্তরাধিকারী সরকারগুলো সে প্যারামাউন্সির উত্তরাধিকারী হল না,...৫৬৩ টি দেশীয় রাজ্য আইন ও বৈধতা অনুসারে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে গেল। সেদিকে ভারতীয় জনগণের হুঁস বা মাথাব্যথা ছিল না, তাদের বোঝানো হল, মাউন্টব্যাটেন ভারি ভাল বড়লাট, তারা মাউন্টব্যাটেন কি জয় বলে নাচতে লাগলো।

যুদ্ধোত্তর বৃটেনের অর্থনৈতিক হাড়ির হাল, নতুন আমেরিকান লোনের টাকা ফুরোবার আগেই ভারতের বাজারে জেঁকে বসার গরজ, রাষ্ট্রসংঘে স্বাধীনভারতের প্রতিনিধি বলে একজন কংগ্রেস লীডারকে বসানোর গরজ, ভারতের জঙ্গীজনগণকে কংগ্রেস লীডারদের দিয়ে ঢিট করার প্রয়োজন, এসব কথার ধার দিয়েও কারো চিন্তা গেল না। তাদের বোঝানো হল, এবং তারা বুঝলো, হোমরা-চোমরা পণ্ডিত মূর্খের দল পর্যন্ত, মাউন্টব্যাটেন এমন ভাল বড়লাট যে বৃটিশ সরকারের নির্ধারিত '৪৮ এর জুনের বদলে তিনি '৪৭ এর আগষ্টেই ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজটা সেরে দিলেন।

স্বনামখ্যাত মডারেট নেতা সি, পি, রামস্বামী আয়ার সোৎসাহে কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি দিলেন, "আমাদের রাজনৈতিক আদর্শই যে ঠিক, তা এতদিনে প্রমাণিত হল।" অর্থাৎ "Self Government within British Empire by constitutional means" কংগ্রেসের প্রাক-অসহযোগ যুগের আদর্শ এতদিনে গান্ধী-নেহরুর সুবুদ্ধির ফলে সার্থক হল।

আমিও উৎসাহের চোটে এক কবিতা লিখে ফেলেছিলুম আগেই :

হায় রে মোদের বড়ই সাধের আটচল্লিশের জুন
তোরে দিল যে ফাঁক কইর‍্যা

আগষ্ট মাসের মইদ্দেই নাকি ইংরেজের গো—শুন্
ভাই রে যাসে ভাবন ছাইর‍্যা
বড়লাট তো মিথ্যা কয় না ভাই
খপরের কাগজে ল্যাখে, গান্ধীও কয় তাই
মিথ্যা শুধু হইয়া গেল স্বাধীনতাটাই
(মিঞা) হিন্দু মসলমানে মরলাম লইর‍্যা
কার সাথে লাবাইয়ের কথা, কার সাথে বা লবি
কার রাজত্ব ক দেশ কাগে মোরা ছবকটু করি
বৃটিশের সাম্রাইজ্যটা আর নাই
কংগ্রেস নেতা জহর পণ্ডিত সইত্যই কইছে ভাই
হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানটা ডোমিনিয়ন তাই
(নিল) দোনো স্থানের হকল পাওয়ার হইর‍্যা
ফিরোজ খান মুন, আর ভাই, মেহেরচাঁদ খান্না
বৃটিশেরি গুণগানে কেউই তো কম যান না
বাইজ্যা দিল, দৌলত দিল, কইন্যাও দিব নাকি ?
(এত) হকাল হকাল হকল দিল, হকল বা হয় ফাকি।
দিব বইল্যা নিল হকল, নিব যেটুক বাকি
(মোরা) ভারতবাসী আকল খাইচি পুইর‍্যা

তখন স্বাধীনতার বাজার গরম গেলেও কবিতা ছাপা গেল না। স্বাধীনতাটা যে শাসন সংস্কারের শেষ ধাপ, বৃটিশ শাসনযন্ত্রের ভারতীয়করণ মাত্র, এর অসংখ্য প্রমাণ নিত্য নতুন আকারে দেখা যেতে লাগলো। একদল ইংরেজ আই সি এস অফিসার ভারতীয় মন্ত্রীদের অধীনে কাজ করার মতন অপমান থেকে আভিজাত্য বাঁচানোর উদ্দেশ্যে চাকরী ছেড়ে দিলে, এবং আনুপাতিক পেনসনের ওপর ক্ষতিপূরণের দাবী করে বসলো। সর্দার প্যাটেল সে দাবীর অযৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্যে বললেন :

"১৯২০ সালের শাসন সংস্কারের পর কয়েকজন আই-সি-এস অফিসার যখন চাকরী ছেড়ে দিলেন, তখন তাঁরা শুধু আনুপাতিক পেনসনই দাবী করেছিলেন, ক্ষতিপূরণের দাবী করেননি। তারপর যখন লী কমিশন আই-সি-এস অফিসারদের চাকরীর সর্তাদি পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেন, তাতেও ক্ষতিপূরণের কোন কথায় উল্লেখ করা হয়নি। তারপর '৩৫ সালের শাসন সংস্কারের পর যখন আর এক দল আই-সি-এস অফিসার চাকরী ছাড়েন, তারাও আনুপাতিক পেনসন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, ক্ষতিপূরণের দাবী করেননি। সুতরাং আজই বা ক্ষতিপূরণের কথা উঠবে কেন ?"

যুক্তির এই ধারা দেখলেই বোঝা যায়, '৪৭ সালের কাণ্ডটা আর একটা শাসন সংস্কার ভিন্ন কিছুই নয়। কিন্তু এসব ব্যাপারে লোকের মাথাব্যথা ছিল না, দেশবিভাগ, ডোমিনিয়ন, প্রভৃতি বড় বড় ব্যাপার হজম করতে করতে তাদের মন একটা হিপনোটিক অসাড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল। আরো বৃহৎ অঘটন ছাড়া তাদের মনে সাড়া জাগে না।

তেমন অঘটনও ঘটলো, যখন কিং জর্জ সিক্সথ লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের

প্রথম বড়লাট নিযুক্ত করলেন, এবং পণ্ডিত নেহরু হলেন তাঁর প্রধান মন্ত্রী। দেশের লোক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে পরস্পরকে প্রশ্ন করতে লাগলো, এটা হল কি!

যাদুকর মহাত্মাজী, যিনি সাতেও নেই পাঁচেও নেই, তিনিই আবার এগিয়ে এলেন এবং জনগণের মাথার ওপর যাদুদণ্ড ঘুরিয়ে বললেন, আমরা স্বাধীন হয়েছি, আমরা যেমন ঝাড়ুদারও নিযুক্ত করতে পারি, তেমনি বড়লাটও নিযুক্ত করতে পারি, আর এ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রাক্তন শত্রুদের প্রতি উদারতা দেখাবার জন্য তাদের একজনকেই বড়লাট করেছি।

মরা ছেলের মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে যেমন গুরুঠাকুর শ্লোক আওড়ান, আত্মা অবিনশ্বর, তখন সে মা যেমন নিরুপায়ে পুত্রশোক হজম করে, জনগণও তেমনি নিরুপায়েই এত বড় প্রকাশ্য কেলেঙ্কারীও হজম করে ফেললে। তখন তাদের মুখস্থ হয়ে গেছে, বৃটিশ ইম্পিরিয়্যালিজমের এজেন্ট হচ্ছে জিন্না।

পাকিস্তানের বড়লাট নিযুক্ত হলেন জিন্না। ব্যাপারটা ভারতের মতন অশোভন হল না। ভারত এমন কাণ্ড কেন করল? আমরা স্বাধীন উদারভাবে মাউন্টব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের প্রথম বড়লাটরূপে নিযুক্ত করেছি, মহাত্মাজীর এই উদারতার পিছনে এই ইঙ্গিতই ছিল যে, কিং জর্জ সিক্সথ আমাদের পরামর্শেই তাঁকে নিযুক্ত করেছেন।

কিন্তু সে কথাটাও অর্ধসত্যের বেশী নয়। পরামর্শ অবশ্য মহাত্মারা দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু পরামর্শ তাঁরা মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে করেছিলেন। "বড়া সাব, ছোটা সাব, এক দিল" হয়েই ভারতবাসীকে বোকা বানানো হচ্ছিল। মাউন্টব্যাটেনকে বড়লাট করার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল।

স্বাধীনতা দেওয়ার মালিক ইংরেজ, তাদের প্রয়োজন এবং তাদের প্ল্যান অনুসারেই সমগ্র কাণ্ডটা চলছিল, ভারতবাসীকে বোকা বানানো এবং ভাগমানানোর কাজটাই ছিল তাদের স্থানীয় এজেন্ট এবং ছোট পার্টনারদের কাজ। সংবিধান রচনা কারা করবে, কেমন করে করবে, তা থেকে শুরু করে দুই ডোমিনিয়ন একভাবে সংগঠিত করার ব্যবস্থা পর্যন্ত, সবই ইংরেজের প্ল্যান।

দুই ডোমিনিয়ন এক ভাবে সংগঠিত করতে হলে ব্যবহারিক ব্যবস্থায় যে অনেক রদবদল এবং নতুন বিধি-নিষেধ চালু করতেই হবে, সেই জন্যে বৃটিশ সরকারই ঐ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্টের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা হিসাবে বড়লাটদের এক নতুন ক্ষমতা দিলেন, তাঁরা যাতে প্রয়োজনীয় রদবদল ও বিধি-নিষেধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে, নিজেদের ব্যক্তিগত বিবেচনা অনুসারে, মন্ত্রীসভা বা কাউন্সিলের সঙ্গে পরামর্শ না করেই, "অর্ডার ইস্যু" করতে পারেন।

সুতরাং ডোমিনিয়নের দুই বড়লাট বিবেচনার তারতম্য অনুসারে দুই রকমের "অর্ডার ইস্যু" করে বসতে পারেন, অথচ ইংরেজের প্ল্যান অনুসারে দুই ডোমিনিয়নের জন্ম-কর্ম একরকম হওয়া চাই। এ সমস্যার সমাধানের উপায় কি? কংগ্রেস নেতা এবং লীগ নেতা বড়লাট হলেই যে একমতে কাজ করতে পারবে তার তো কোন গ্যারাণ্টি নেই। তাড়াতাড়ি এই সব রদবদল ও বিধি-নিষেধ চালু করতে লণ্ডনে বিলেতের সঙ্গে বা পরস্পরের মধ্যে চিঠি চালাচালি এবং গরমিল মেলাতে জান হয়রাণ হতে পারে।

তাই বৃটিশ প্রতিনিধি মাউন্টব্যাটেনকেই ভারতের বড়লাট করা হল, যাতে বৃটিশ প্ল্যান অনুসারে তিনিই এই সব বন্দোবস্ত ও বিধিনিষেধের দাবি করার প্রথম উদ্যোগ (initiative) গ্রহণ করেন এবং পাকিস্তানের বড়লাট নির্বিবাদে সেই লাইন অনুসরণ করতে পারেন। কংগ্রেসের কাজ, জিন্দাবাদ ছাড়া, জনগণকে বোকা বোঝানো ও বাগ মানানো।

মাউন্টব্যাটেনকে প্রথম বরণের পর জনগণ এমন বাগই মানলো যে, তারপর একে একে অনেক দুষ্পাচ্য জিনিস হজম করলো। প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার কথাই ধরুন। এটা নেহাৎ আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়। বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ এর সঙ্গে জড়িত। এতকাল যে-ভারত বৃটিশ-সাম্রাজ্যের মূল প্রাচ্য ঘাঁটি ছিল, আজ হিন্দু মুসলমান প্রভৃতিকে আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন দিলে কি সাম্রাজ্যের এই অন্যতম মূল ঘাঁটী ভেঙ্গে যেতে পারে? না তা ভেঙ্গে দেওয়া যায়? (তাই অনেক বছর আগেও শ্রীনেহেরু পার্লামেন্টে বলেছিলেন Politically, Pakistan and India make a compact unit)।

সুতরাং লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে কিছু বৃটিশ সৈন্য ছাঁটাই করে পেনসন দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া এবং কিছু দেশী সৈন্য ভর্তি করা শুরু হল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করা হল, দুই ডোমিনিয়নের সৈন্যবাহিনী, নৌ বহর ও বিমান বহরের বৃটিশ নায়কেরা বহাল থাকবেন, ইংরাজ সামরিক ইঞ্জিনিয়ার-বিশেষজ্ঞ বাহিনীও যেমন ছিল তেমনি থাকবে, অফিসার স্তরের বহু ইংরাজও বহাল থাকবেন, এবং দুই ডোমিনিয়নের ইংরাজ সেনাপতিদের ওপর লর্ড অকিনলেক থাকবেন সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চীফ।

আজ আমরা ভারত নামের জোরে প্রাচীন ভৌগোলিক ভারতের সবটার মালিকের চংয়ে সব সময় নানা দাবী করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি, এবং ভুলে গেছি, এভারত সেভারত নয়, পরন্তু প্রাচীন ভৌগোলিক ভারতের একাংশ ছিল যে বৃটিশ ভারত, তারই একাংশ মাত্র, যেটার আয়তন পরে কিছু বেড়েছে দেশীয় রাজ্যগুলোর পূর্ণ ভারত ভুক্তির কল্যাণে।

সুতরাং আইনত আমরা আমাদের এলাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মালিক, যেমন পাকিস্তান তাদের এলাকার প্রতিরক্ষার মালিক। কিন্তু সমগ্র উপ-মহাদেশের যৌথ প্রতিরক্ষার ব্যবস্থার যদি কোন দিন প্রয়োজন হয়, তাহলে সেটার দায়িত্ব বৃটেনের। এইটে হিসেব করেই অকিনলেককে দুই ডোমিনিয়নের উপরে সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চীফ করা হল।

এ হিসেবটা যে আজও কার্যকরী রয়েছে, তা দেখা গেল, যখন চীনা আক্রমণের সময় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বৃটিশ মিলিটারী এসে পড়লো। বলা হল "বন্ধুরাষ্ট্রের সাহায্য"। কিন্তু এতখানি বন্ধুত্ব আর কোথায় কে কবে দেখেছে?

আর স্মরণ করুন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনের কথা—"আমাদের ডিফেন্সলাইন হচ্ছে হিমালয়।"

এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যে স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন পাকিস্তানের, এ-কথা প্রমাণ করার জন্যে বলা হল, বৃটিশ সরকার ভারতবাসীদের সেনাপতিগিরিতে পোক্ত করে তোলার জন্যে এই সব ইংরেজ অফিসার কর্মচারী "ধার" দিচ্ছে। ক্রমে জানা গেল, এদের ভারতে চাকুরীকালেও এদের শেষ আনুগত্য থাকবে বৃটিশ প্রতিরক্ষা বিভাগের কাছে।

এর অর্থ বোঝা যাবে, যদি বৃটেনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ কিম্বা বৃটেনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত কোন শত্রুপক্ষের সঙ্গে ভারতের যোগ দেওয়া কল্পনা করা যায়। তা হলে দেখা যাবে,

ভারতের প্রতিরক্ষার এই ভাড়াটে ইংরেজ কর্তারা ভারতের বিরুদ্ধে বৃটেনের দিকেই ভিড়ে গেছে।

ক্ষমতা হাতে পেয়ে ভারত-পাকিস্তান এবং [illegible] কোনো দিন বৃটেনের প্রতি বেইমানী করে তাদের স্বার্থে রচিত [illegible] চুক্তিগুলো বাতিল করে দেবে [illegible] সন্দেহ [illegible]। আশঙ্কা অবশ্য কারো ছিল না, [illegible] ব্যবস্থা [illegible]।

এত বড় [illegible] [illegible] এক ইংরেজ সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চীফ, [illegible] ছয় মাস অনেক পরে আকিনলেকের পদ [illegible] চলতে পারত না, [illegible] হলেন। কিন্তু এটা বোঝা সোজা নয় যে, বৃটিশ সরকারই [illegible] মাউন্টব্যাটেনকে [illegible] স্বাধীন ভারতের মাথার ওপর বসিয়েছিলেন, এবং তাঁদের [illegible] কাজ [illegible] হয়েছিল, তাঁরা প্রকারান্তরে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেই [illegible] করছিলেন।

তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলো [illegible] তাদের পরম সহায়। তারা অবিরাম জনগণের কানের কাছে ঢাক [illegible], ইংরেজ ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। জনগণের মধ্যে যারা চালাক প্যাট্রিয়ট, তারা [illegible] ভাবে, ইংরেজ গেলেই তো ভারতের মঙ্গল আসবে — [illegible] "[illegible] পাকিস্তান।"

আর একদল পণ্ডিত প্যাট্রিয়ট ছ' মাসের মেয়াদ [illegible], [illegible] না, ওরা ছ' মাসের মধ্যেই মরবে। বিড়লা-টাটাগোষ্ঠির কল্যাণে ভারতের কত রকমের কত শিল্প কারখানা আছে, তার এক [illegible] প্রচার করে তারা রায় দিলেন, পাকিস্তানের যখন এসব শিল্পের কিছুই নেই, তখন ওরা আলবৎ মরবে।

অর্থাৎ যে সাম্প্রদায়িক শান্তির উদ্দেশ্যে কংগ্রেস-লীগ [illegible] দেশবিভাগ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ছত্র ছায়াতলে দুই ডোমিনিয়ন হয়ে পাশাপাশি শান্তিতে বাস করার মতলব করেছিল, প্যাট্রিয়টিক জনগণের এবং সংবাদপত্রের কল্যাণে সেই সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়া আবার দেখা দিতে বেশী দেরী লাগলো না।

এদিকে দেশবিভাগের কার্যকরী ব্যবস্থার বড় বড় কাজগুলো একে একে সারা হতে লাগলো। কতকগুলো প্রদেশ নিয়ে ভারত ও কতকগুলো প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান নির্ধারিত হয়ে গেল, জনসংখ্যা প্রধানতঃ হিন্দু বা মুসলমান দেখে। পাঞ্জাব ও বাংলা নিয়ে গণ্ডগোল বাধলো হিন্দু মুসলমান প্রায় সমান সমান দেখে। সুতরাং এই প্রদেশ দুটোকে ভাগাভাগির ব্যবস্থা করা হল। পাঞ্জাব ভাগাভাগি অপেক্ষাকৃত চটপটই হয়ে গেল, কিন্তু বাংলায় কয়েকটা নতুন সমস্যা দেখা দিল।

মুসলমান বেশী বলে পাকিস্তান পুরো বাংলা দাবী করে,— হিন্দু বাংলা তার বিরোধিতা করে, এর মধ্যে শরৎ বসু ও সুরাবর্দী একযোগে ধুয়ো তুললেন, ঝগড়া বন্ধ হোক, বাংলা একটা পৃথক অটোনমাস ষ্টেট হোক। তাঁদের এ ধুয়োর পিছনে ক্যাবিনেট মিশনের সি গ্রুপ ষ্টেটের আইডিয়া ছিল, কিন্তু কেউ সেটাকে আমল দিলে না। হিন্দুমহাসভা ও শ্যামাপ্রসাদের এবং তাদের কংগ্রেসী দোস্তদের বিশেষ চেষ্টায় বঙ্গবিভাগই স্থির হল। সীমা নির্ধারণ কাজটা কিন্তু সহজ হল না।

ছুটো কারণে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য আবার চরমে উঠলো, ভবিষ্যৎ দাঙ্গা-হাঙ্গামার ক্ষেত্র তৈরী হয়ে গেল। প্রথমতঃ অনেকগুলো জেলাকেও ভাগাভাগি করতে হল এবং কয়েকটা মহকুমাকেও। এই সব সীমানা নির্ধারণে প্রচুর সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল চললো।

আর দ্বিতীয়তঃ, দুই বড়লাটের আদেশ অনুসারে ঠিক হয়েছিল, সরকারী কর্মচারীরা ইচ্ছা করলে এক বাংলা থেকে আর এক বাংলায় বদলী হতে পারবেন, দুই সরকারই বদলী অফিসারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে। তদনুসারে বহু অফিসার বদলী হয়েছিলেন। তাঁদের দেখাদেখি বড়লোকেরাও স্থাবর সম্পত্তি ছেড়ে টাকাকড়ি নিয়ে বাস-বদল করতে শুরু করেছিলেন। আবার তাদের দেখাদেখি অনেক গরীব লোকও দেশ বদল করতে শুরু করেছিল। এইভাবে উদ্বাস্তু সমস্যার গোড়াপত্তন হয়েছিল।

হিন্দু মহাসভা আন্দোলন শুরু করেছিল, অনেক তথাকথিত কংগ্রেসী হিন্দুও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছি।, দুই বাংলার সমগ্র হিন্দু-মুসলমান অধিবাসী বদল করার ব্যবস্থা হোক। কিন্তু দু কোটি উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন একটা অসম্ভব ব্যাপার, কাজেই সরকার তাতে রাজী হয় নি। বেসরকারী ভাবেই আন্দোলন চললো, পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসুক, আমরা তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবো।

জনগণের দারিদ্র্য দুর্দশা এবং বেকারী দুই বঙ্গেই প্রচুর এবং চিরন্তন, তাদের জন্যে মাথাব্যথার দায়িত্ব কোনো কালে কারুরই নেই, কিন্তু ডেকে আনলে সঙ্গে সঙ্গে সে-দায়িত্ব এসে। পূর্ববঙ্গের হিন্দু দরিদ্রদের এ আহ্বান হল একটা স্বস্তির কথা। দলে দলে তারা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে লাগলো। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পশ্চিমবঙ্গের একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো।

ওদিকে পূর্ববঙ্গের অবস্থাও আর একদিক দিয়ে কাহিল হচ্ছিল। পূর্ববঙ্গে কাজ-কারবারী পয়সাওয়ালা লোকের অধিকাংশই হিন্দু। তারা দলে দলে চলে আসার ফলে সেখানকার কাজ-কারবার বন্ধ হচ্ছিল, বেকার বাড়ছিল। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতাবাদী মোল্লা এবং তাদের চেলা চামুণ্ডা গুণ্ডারা গরীব হিন্দুদেরও সেখান থেকে তাড়াবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিল, ভয় দেখানো এবং অত্যাচার দুই-ই চালিয়েছিল।

সুতরাং অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, ওদিক থেকে মুসলমান মোল্লারা ঠেলছে এবং এদিক থেকে হিন্দু মোল্লারা টানছে, আর ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে একটা প্রবল উদ্বাস্তু স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা বিরাট আকার ধারণ করলো।

বঙ্গ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে সাময়িক এক ছায়া মন্ত্রিসভা গঠিত হল (Shadow Ministry) প্রফুল্ল ঘোষ হলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বিলিতি লাটসাহেবের কাছে আনুগত্যের শপথ নিচ্ছেন, কাগজে ফটো ছাপা হল। বসুমতীতে লেখা হল,—"স্বাধীন হিন্দু বঙ্গ রাষ্ট্রের বিজয় শঙ্খ গর্জিয়া উঠিয়াছে।"

তখন লর্ড লিষ্টওয়েল ভারত সচিব। তিনি গদ গদ হয়ে এক বাণী দিলেন, "ভারতের বর্তমান মহান "শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন" সম্পর্কে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো যে মহান ভূমিকার অভিনয় করছে, এবং জনমতের ওপর যে ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, তাতে তাদের গর্ব করার অধিকার আছে।"

সর্বশক্তিমান বড়লাট মাউন্টব্যাটেনরূপী বৃটিশ সরকারের এ সব তুচ্ছ ব্যাপারে, খুচরো কথায়, কোন মাথাব্যথা নেই। তাঁরা তখন আর এক বৃহত্তর ব্যাপারে মন দিয়েছেন।

৫৬৩টা সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশীয় রাজ্য যদি বৃটিশ ভারতের সঙ্গে লাইন-আপ না করে পৃথক ভাবে চলতে থাকে,—যদি তাদের পররাষ্ট্রনীতিও স্বাধীন ভাবে চলে, তা হলে বৃটিশ প্ল্যান সহজে সম্পূর্ণ হওয়ার পথে বাধা আসতে পারে। তাদেরও ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে মিলিয়ে এক "পলিটিক্যাল ইউনিট" সম্পূর্ণ করা দরকার। অথচ তাদের রাজ্য ও ধনসম্পত্তির ওপর হামলা করলে চলবে না। তাই তাদের সম্পর্কে এক নতুন প্ল্যান তৈরী হল, "অ্যাকসেশন প্ল্যান" যেটা হবে আসল বৃটিশ প্ল্যানের অঙ্গ।

তদনুসারে মাউন্টব্যাটেন ও মহাত্মাজী একযোগে দেশীয় রাজাদের কাছে এক "আবেদন" করে বললেন, আইন ও বৈধতার হিসাবে আপনারা আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু আপনারা যদি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পৃথক ভাবে চলতে থাকেন, তা হলে ভারতের অবস্থা কি রকম খণ্ড-বিখণ্ড (Balkanized) হবে, তা আপনারা নিশ্চয়ই বোঝেন। তা ছাড়া ভারতের একাংশ যদি কোন বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তা হলে সে বিপদ ভারতের সর্বাংশে ছড়িয়ে পড়বে, এ কথাও আপনারা নিশ্চয়ই বোঝেন।

সুতরাং আমরা আপনাদের দেশপ্রেমিক কর্তব্যবোধের কাছে আবেদন করছি, আপনারা আপনাদের পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষাশক্তি এবং যানবাহন-যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করুন।

রাজা ও রাজ্যের পৃথক সত্তা বজায় রেখে তিনটে পরস্পর সম্পর্কিত বিভাগ ভারত বা পাকিস্থানের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করার এই প্ল্যানের নাম অ্যাকসেশন, এবং এর জন্যে যে চুক্তি হবে তার সর্তাবলীর নাম ইন্‌স্‌ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন, বাংলায় যে ব্যবস্থার নাম হল আংশিক ভারতভুক্তি।

যে চুক্তিপত্রে রাজাদের সই করতে হবে, তার বয়ানে লেখা হল, আমি অমুক, আমার রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার অমুক অমুক বিভাগ ভারতের (বা পাকিস্তানের) সঙ্গে সম্মিলিত করার জন্যে এই সর্তে রাজী হয়ে এই চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করছি যে, এ চুক্তির বাধ্যবাধকতার মেয়াদ আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে, ইচ্ছা হলে আমি এ চুক্তি বাতিল করতে পারবো। আমার উত্তরাধিকারীরা এ চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ হবে না, ইচ্ছা হলে তারা স্বাধীন ভাবে এ চুক্তি গ্রহণ করবে। আর ভারত (বা পাকিস্তানের) বর্তমান শাসনবিধির পরিবর্তন হলেও আমি এ চুক্তি বাতিল করতে পারবো, ইচ্ছা হলে নতুন করে এ চুক্তি মেনে নোব।

এ ব্যবস্থার মূল যে বিলেতে তার প্রমাণ আগেই প্রকাশিত হয়েছে, যদিও ভারত-বাসীর রাজনৈতিক বোধ বিবর্জিত দৃষ্টিতে সেটা ধরা পড়েনি।

বৃটিশ প্যারামাউন্সি উঠে যাওয়ার ব্যবস্থা হওয়া মাত্র কয়েকজন দেশীয় নৃপতি স্বাধীনতা ঘোষণা করতে যাচ্ছেন দেখে অ্যাটলী কমন্সসভার আলোচনায় বললেন, "আমি দেশীয় নৃপতিদের বলি, তাড়াতাড়ি কিছু করা উচিত নয়। যা করবে, তা ভেবেচিন্তে কোরো, আর বৃটিশ ডোমিনিয়নের মধ্যে থাকার লাভটার কথাও ভেবে দেখো।'

১৩।৭।৪৭ এর অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক লিখলেন, অ্যাটলীর ইঙ্গিতের অর্থ

স্বাধীন ডোমিনিয়নগুলো কমনওয়েলথের মধ্যেই থাকবে, এই সর্তেই দেশীয় রাজারা তাদের সঙ্গে যোগ দেবে, অন্যথায় স্বাধীনতাই ঘোষণা করবে।

মাত্র গোটাকয়েক দেশীয় রাজ্যের মালিক মুসলমান, বাকি সব রাজ্যের মালিক হিন্দু। একটা মুসলমান রাজ্য এবং একটা হিন্দুরাজ্য বাদে সকল রাজ্যেই রাজা ও প্রজা এক জাতের। রাজারাই মালিক, অ্যাকসেশনের মালিকও তাঁরাই, প্রজারা কেউ নয়। প্রজাদের মতামতের বালাই না রেখেই যেমন হিন্দু বা মুসলমান জনসংখ্যা অনুসারেই ভারত বিভাগ হয়েছিল, তেমনি অ্যাকসেশনও পটাপট হয়ে গেল জনসংখ্যা অনুসারেই। হিন্দুপ্রধান রাজ্যগুলো ভারতের সঙ্গে এবং মুসলমানপ্রধান রাজ্যগুলো পাকিস্তানের সঙ্গে ভিড়ে গেল।

রাজা-প্রজা এক জাতের বলে কেউ টের পেলে না, রাজারাই অ্যাকসেশনের মালিক, প্রজারা নয়। সেটা টের পাওয়া গেল দুটো বৃহৎ রাজ্যে, যেখানে রাজা-প্রজা একজাতের নয়। হায়দারাবাদে রাজা মুসলমান, প্রজা হিন্দু, আর কাশ্মীরে রাজা হিন্দু, প্রজা মুসলমান। রাজা-প্রজার টান একমুখী না হওয়ায় ঐ দুই রাজ্যের রাজারা ঘোষণা করলেন, তাঁরা স্বাধীন এবং পৃথকই থাকবেন। সুতরাং ঐ দুই রাজ্যের সঙ্গে ভারতের তখনকার মত একটা স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পাদিত হল।

হায়দারাবাদে রামানন্দ তীর্থ প্রভৃতির নেতৃত্বে ষ্টেট কংগ্রেস নিজামের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে লড়ছিল এবং কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে কাশ্মীর ন্যাশানাল কনফারেন্স মহারাজা হরি সিংয়ের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে লড়ছিল। এই অবস্থার মধ্যে এই দুই রাজ্যে দুটো পৃথক রকমের দুর্দৈব দেখা দিল। মনে রাখা দরকার, ষ্টেট কংগ্রেসগুলো ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের শাখা সংগঠন নয়।

হায়দারাবাদের হিন্দু প্রজাদের ষ্টেট কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলমান প্রজাদের রাজাকার সংগঠন লড়াই করতো। এর মধ্যে অন্ধ্র কমিউনিষ্ট পার্টির পরিচালনায় তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহ গড়ে উঠলো। বিদ্রোহী কৃষকদের শত্রু নিজাম সরকার, রাজাকার দল, ষ্টেট কংগ্রেস, জমিদার-মহাজন ধনিক ব্যবসায়ী, সকলেই, এবং বিদ্রোহের মুখে সকলেই পালালো, নিজামের পুলিশ পর্যন্ত। তেলেঙ্গানা হয়ে উঠলো একটা সোভিয়েত এলাকার মতন।

ক্রমে সে কৃষক বিদ্রোহ হায়দারাবাদ থেকে কৃষ্ণা-গোদাবরী জেলায় সংক্রামিত হতে লাগল। তখন মাউন্টব্যাটেন বৃটেনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সেরে চলে গেছেন, রাজাগোপালাচারী হয়েছেন ভারতের বড়লাট। তিনি এ বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থা করলেন। নিজামকে লিখলেন, তোমার রাজ্য থেকে আমাদের রাজ্যে কমিউনিষ্ট বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ছে, তুমি কিছু করতে পারছো না, আমরাও চুপ করে থাকতে পারি না। সুতরাং আমি তোমার রাজ্যে সৈন্য পাঠালুম।

নিজাম রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নয়, তাই তাঁর তরফ থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রসংঘে ভারতের বিরুদ্ধে "অ্যাগ্রেশনের" অভিযোগ পেশ করে বললে, আজ ওরা নিজামের রাজ্য আক্রমণ করেছে, কাল পাকিস্তানের ওপরও আক্রমণ চালাতে পারে।

ভারত জবাব দিলে, আমরা কারো রাজ্য আক্রমণ করিনি, আমরা হায়দারাবাদে সৈন্য পাঠিয়েছি "পুলিশ অ্যাকশন" হিসেবে। রাষ্ট্রসংঘের মাতব্বরেরা বুঝলেন, এবং মামলা

ডিসমিস করলেন। আমাদের প্যাটি্রয়ট পণ্ডিতেরা এই প্রথম "পুলিস অ্যাকশন" কথাটা শিখলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত অনেকেই কথাটার মর্ম বোঝেন না।

পুলিসের কাজ শান্তিরক্ষা করা, এবং তারই জন্যে সমাজ-বিরোধীদের দমন করা। অ-রাজনৈতিক সমাজবিরোধী হচ্ছে চোর ডাকাত, আর রাজনৈতিক সমাজবিরোধী হচ্ছে বিদ্রোহীরা। হায়দারাবাদে ভারতীয় সৈন্য প্রেরিত হয়েছিল কমিউনিষ্ট বিদ্রোহ দমনের জন্যে। আনুষঙ্গিক কাজ, নিজামকে অ্যাকসেশনে টেনে নেওয়া।

প্রথমে বিনাবাধায় হায়দারাবাদ দখল করে নিজামের কাছে দূত পাঠিয়ে তাঁকে বোঝান হল, বর্তমান যুগের ভারতীয় পরিস্থিতিতে স্বৈরাচারী শাসন আর চলতে পারে না। আমরা কমিউনিষ্ট বিদ্রোহ দমন করবো, কিন্তু ষ্টেট কংগ্রেসের গণতন্ত্রের সংগ্রাম দমন করে তোমার স্বৈরাচারী শাসন নিষ্কণ্টক করতে পারবো না। সুতরাং আজ হোক বা কাল হোক, এ শাসনের অবসান হবেই। তার সঙ্গে হয়ত তোমার বাজ্য সম্পদ সবই যাবে।

তার চেয়ে আমাদের দলে ভিড়ে যাও, ষ্টেট কংগ্রেসের নেতাদের মন্ত্রী করে গণতান্ত্রিক শাসন সংস্কার প্রবর্তন কর, তোমার রাজ্যসম্পদ সবই বজায় থাকবে। নিজাম বুঝলেন, ভারতের সঙ্গে ভিড়ে গেলেন এবং তারপরে কমিউনিষ্ট নিধন চললো চার বছর ধরে। এই ভাবে হায়দারাবাদ সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। রামানন্দ তীর্থ মন্ত্রী হলেন।

কাশ্মীরের পরিস্থিতি গড়ালো সম্পূর্ণ অন্য খাতে। দেশীয় রাজ্যের স্বৈর শাসনের পৃষ্ঠপোষক ছিল ইংরেজ, গান্ধী-কংগ্রেস লড়তে ইংরেজের বিরুদ্ধে, আর প্রজারা লড়তো রাজাদের বিরুদ্ধে। ফলে রাজাদের যেমন বিতৃষ্ণা ছিল গণতান্ত্রিক শাসন এবং গান্ধী-কংগ্রেসের প্রতি, প্রজাদের তেমনি ভক্তি-বিশ্বাস ছিল গণতন্ত্রের সঙ্গে গান্ধী কংগ্রেসের ওপর।

হায়দারাবাদের ষ্টেট-কংগ্রেসের মতই কাশ্মীরের ন্যাশান্যাল কনফারেন্সেরও আদর্শ ছিল গান্ধী কংগ্রেসের আদর্শ, এবং শেখ আবদুল্লা ছিলেন নেহেরুর ভক্ত ও বন্ধু। মহারাজা হরি সিং তাঁকে জেলে পুরেছিলেন। ভারতের পুলিস অ্যাকশনের উপযোগী পরিস্থিতিও সেখানে ছিল না। সুতরাং প্রজাবিদ্রোহ ছাড়া মহারাজার স্বৈর-শাসনের অবসানের আর কোনো উপায় ছিল না।

এই অবস্থায়, প্রজারা মুসলমান বলে পাকিস্তান দাবী তুললো, কাশ্মীর রাজ্যের পাকিস্তানের সঙ্গে অ্যাকসেশন করাই প্রয়োজন, এবং তাদের এই দাবীর সঙ্গে ন্যাশান্যাল কনফারেন্সের বহির্ভূত ও পাকিস্তানের প্রতি আকৃষ্ট কাশ্মীরী মুসলমান প্রজাদের তরফ থেকে মহারাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এক "আজাদ কাশ্মীর" দল সংগঠিত হল।

স্বভাবতঃই মহারাজা তাদের দমনের জন্যে পুলিস-সেপাই নিয়োগ করলে, কাশ্মীরের সীমানার বাইরে থেকে পাহাড়ী মুসলমান উপজাতিরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল। পাকিস্তানও প্রয়োজন হলেই সৈন্য পাঠাবে বলে তৈরী হল।

এইবার মহারাজা বিপদ গণলেন এবং তাড়াতাড়ি শেখ আবদুল্লাকে জেল থেকে মুক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসালেন, আর দিল্লীর কাছে অ্যাকসেশনের রাজীনামা পাঠিয়ে সৈন্য সাহায্য চাইলেন। দিল্লীও তৈরী ছিল, সুতরাং পত্রপাঠ সৈন্যবাহিনী কাশ্মীরে প্রবেশ করলো।

এর জবাবে কাশ্মীরের সৈন্যবাহিনীর "গিলগিট স্কাউট" দল বিদ্রোহ করে আজাদ কাশ্মীরের সৈন্যবাহিনী রূপে দাঁড়ালো এবং পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীও তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল। কাশ্মীরে লড়াই শুরু হল। একদিকে একদল কাশ্মীরী সৈন্যের পিছনে ভারতীয় সৈন্য, আর একদিকে আর একদল কাশ্মীরী সৈন্যের পিছনে পাকিস্তানী সৈন্য। আইনত লড়াইটা দুই কাশ্মীরের মধ্যে, ভারত-পাকিস্তান লড়াই নয়। এইখানে একটু পুরানো ইতিহাস বলা দরকার। ১৯২৭।২৮ সালে যখন সোভিয়েট তাজিকিস্তান (কাশ্মীর সীমান্তের পর একটা ৯ মাইল চওড়া আফগান ভূখণ্ডের ওপারে তাজিকিস্তানের সীমান্ত) একটা মডার্ন স্টেট হয়ে উঠেছে, মোটর-রোড, বিজলী বাতি, যান্ত্রিক কৃষি সবই গড়ে উঠেছে, তখন ভারতের বৃটিশ সরকার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় মন দিয়ে ৩০ সালে কারাকোরাম অভিযান করে পর্বত শীর্ষে এক বিমান ঘাটি স্থাপন করে, এবং কাশ্মীরের মহারাজার কাছ থেকে গিলগিট প্রদেশটা খাসলীজ করে নিয়ে সেখানে গিলগিট স্কাউট নামে সামরিক বাহিনীর ঘাটি করে। সে ঘাটিগুলোই আজাদ কাশ্মীর ওয়ালাদের ঘাটি হয়েছিল।

তখন লর্ড মাউন্টব্যাটেনের আমল। কিন্তু "ইংরাজ ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে" সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে ইংরাজের হস্তক্ষেপ ভাল দেখায় না, আর তিনি নিজে তো ভারতের বড়লাটরূপে ভারতের পক্ষভুক্ত। সুতরাং ইংরাজের দুই জুনিয়ার পার্টনারের মধ্যে লড়াইয়ের ফয়শালার জন্যে ইংরেজের আন্তর্জাতিক বড় পার্টনার আমেরিকাকে আসরে নামাবার উদ্দেশ্যে মাউন্টব্যাটেন শান্তিরক্ষার নামে কাশ্মীরের মামলা রাষ্ট্রসংঘে পাঠালেন। যথাসময়ে রাষ্ট্রসংঘের তদারকী কমিশন রূপে একদল আমেরিকান মিলিটারী অফিসার ও গোয়েন্দা কাশ্মীরে এসে জেঁকে বসলো, যুদ্ধ বিরতির ব্যবস্থা হল, রাষ্ট্রসংঘে মামলাও চললো।

কাশ্মীরে আমেরিকার ঘাঁটি স্থাপনের প্ল্যানও বৃটেনের বৃহত্তর প্ল্যানের একটা অঙ্গ। '৪৭ সালের গোড়াতেই চীনের গৃহযুদ্ধের গতি কমিউনিষ্টদের অনুকূলে মোড় ফিরেছিল, মাও-চৌ-চু-তে উত্তর থেকে দক্ষিণে তাড়িয়ে আসছে, আর চিয়াং প্রাণপণে দক্ষিণে পালাতে শুরু করেছে, এই ছিল অবস্থা। আমেরিকা সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করেও চিয়াংকে খাড়া রাখতে পারছে না, তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও হটে আসছে।

এর অর্থ চীনে কমিউনিষ্ট-বিজয় অবধারিত বলে তারা বুঝেছে এবং পাছে কমিউনিষ্ট বন্যা-প্রবাহ হিমালয় পার হয়ে ভারতের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে, তাই সে দুর্দৈব রোধ করার জন্যে বৃটেন-আমেরিকা চিয়াংকে খরচের খাতায় লিখে নেহেরুকে পরবর্তী ঠেকনো রূপে খাড়া করার ব্যবস্থায় মন দিয়েছে। এ অবস্থায় কাশ্মীরে গণ্ডগোল ভাল কথা নয়। নিজেদের একটা ঘাঁটি সেখানে প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

তখন নেহেরু বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে কুটনীতিবিশারদ রূপে গড়ে তোলার জন্যে মাউন্টব্যাটেনের সুপারিশ নিয়ে তাঁকে কিং জর্জ সিক্সথের স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়নের প্রধান প্রতিনিধি করে রাষ্ট্রসংঘে পাঠিয়েছেন, এবং তিনি তাঁর প্রথম বক্তৃতায় বলেছেন কেমন করে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ছেড়ে দিয়েছে এবং কেমন করে ভারতবাসী কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়েছে।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে প্রতিনিধি দলের মধ্যে পাঠানো হয়েছিল অভিজ্ঞ ও সিনিয়র কুটনীতিবিদ সর্দার পানিক্করকে। কেমন করে নেহেরুর বে-সরকারী ব্যক্তিগত নির্দেশে বিজয়লক্ষ্মী

তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বে-সরকারীভাবে আমেরিকার দপ্তরে গিয়ে প্রথম কাশ্মীর পরিস্থিতির বিবরণ পেশ করেন, তার বিস্তারিত বিবরণ পানিক্করের Two Chinas নামক বইয়ে আছে। তিনি চিয়াং চীনের শেষ দু'বছর এবং লাল চীনের প্রথম দু'বছর চীনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ছিলেন এবং আমেরিকার কর্তাদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট আলাপ খাতির ছিল।

যাই হোক, '৪৮ সালের জুনটাকে তাড়াহুড়ো করে '৪৭ সালের আগস্টে টেনে আনার অন্যতম কারণ এই কমিউনিজমের অগ্রগতি রোধের প্ল্যান। আর একটা প্রকাণ্ড কারণও যে ছিল, এবং সে হচ্ছে বৃটেনের যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক অবস্থা। তাই যত শীঘ্র সম্ভব ভারতের বাজারে বৃটেনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা জরুরী প্রয়োজন।—এ কথা আগে বলা হয়েছে।

ছ'বছরের লড়াইয়ে ষ্টার্লিং এলাকার ১৪টা দেশের কাছে বৃটেনের ঋণের বিরাট বোঝা জমে উঠেছিল। এ ঋণের বোঝা ঘাড় থেকে নামাতে হলে ডলার দেশ থেকে আমদানী কমিয়ে রপ্তানী বাড়াতে হয়। বৃটেনের সে সম্পদও প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। প্রচুর উৎপাদন বৃদ্ধি না করতে পারলে তা হয় না,—অথচ তার উৎপাদনের যন্ত্রগুলো হয়েছে পুরানো, সেকেলে, ঝরঝরে, আমেরিকার মত আধুনিক ও উন্নত নয়।

সেগুলো বদলানো দরকার কিন্তু তার সঙ্গতি নেই। কাজেই আমেরিকা থেকে আধুনিক কলকব্জা যন্ত্রপাতি কিনতে হবে আর আমেরিকার কাছ থেকে আর একটা প্রকাণ্ড ঋণ প্রয়োজন। অনেক দরবার করে তারা নিজেদের সংরক্ষিত বাজারে আমেরিকাকে অনুপ্রবেশের সুযোগ দেওয়ার শর্তে ঋণের বন্দোবস্ত হল।

আমেরিকা থেকে ক'বছর কতটা করে কি মাল আমদানী করা চাই, তার হিসেব করে পাঁচ হাজার মিলিয়ন ডলার ঋণের বন্দোবস্ত হল এবং ভারতের বাজারে প্রতিষ্ঠার প্ল্যান করে তারা ঠিক করলে '৪৮ সালের জুন পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে ফয়সালা হলেই চলবে।

ঋণের বন্দোবস্ত হওয়ার পরই আমেরিকায় জিনিসপত্রের দর গড়ে শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি হল, ফলে ৫০০০ মিলিয়ন ডলার ঋণটা প্রকৃত পক্ষে হয়ে দাঁড়ালো ৩৭৫০ মিলিয়ন ডলার। সঙ্গে সঙ্গে বৃটেনের উৎপাদন বৃদ্ধির যে হার আন্দাজ করা হয়েছিল, কার্যত সেটাও অনেক কম হল।

সুতরাং ভারতের বাজার দখলের কাজটা আরো তাড়াতাড়ি করা প্রয়োজন হল এবং '৪৮ এর জুনটাকে টেনে আনা হল '৪৭ সালের আগস্টে। গান্ধী-নেহেরু প্যাট্রিয়টিক সাংবাদিকেরা একযোগে ভারতবাসীকে বোঝালেন, এটা মাউন্টব্যাটেনের গুণ, 'ভারি ভাল বড়লাট'।

ভারতের বাজারে তাড়াতাড়ি জেঁকে বসার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা নতুন বড় প্ল্যান তৈরী হল, Colonial Development Plan, উপনিবেশগুলোতে নতুন ব্যবসার ব্যবস্থার জন্যে অনুসন্ধান এবং উপনিবেশগুলোর উৎপন্ন মালের মার্কেটিং অর্গ্যানাইজেশন সংগঠনের জন্যে বড় বড় বৃটিশ বিশেষজ্ঞ কমিশন প্রেরিত হল, আমদানী-রপ্তানীর জমা খরচ মিলিয়ে "ডলার গ্যাপ" কমাতে না পারলে আর চলে না। বলা বাহুল্য, ভারতও এই নতুন প্ল্যানের আওতায় এল।

লড়াইয়ের ক' বছরে বৃটেনের কাছে ভারতের পাওনা জমেছিল, যাকে ষ্টার্লিং ব্যালেন্স

বলা হয়, দু হাজার কোটি টাকা। আমরা বিলেতকে মাল সরবরাহ করেছি, কিন্তু তার বদলে বিলেত থেকে কিছু আমদানী করতে পারিনি, তাই এই পাওনা জমেছে।

লড়াইয়ের পরও বৃটেনের আমদানীর প্রয়োজন আছে। কিন্তু বাড়তি রপ্তানীর ক্ষমতা নেই। সুতরাং এই পাওনাটা নানা ভাবে উবিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হল। আমাদের সুশাসন দেবার জন্যে কুইন ভিক্টোরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব কিনে নিয়েছিলেন, তার মূল্য স্বরূপ ৪৫০ কোটি টাকা আমাদের পাওনা থেকে কাটা গেল। বছরে ১৩ কোটি টাকা ভারত বিলেতকে দিত "হোম চার্জেস" নামক পরাধীনতার খেসারৎ। আগামী ২০ বছরের হোম চার্জেস ২৬০ কোটি টাকাও এই পাওনা থেকে কাটা গেল।

বাকি টাকার এক চতুর্থাংশ পাকিস্তানের পাওনা, সেটা বাদে যা বাকি রইলো, তা থেকে বছর বছর ২০ কোটি করে টাকা ভারতের ওয়ার কণ্ট্রিবিউশন বলে কাটা হয়। আমাদের এ বাবদ মোট দেয় কত, তা আমরা জানি না। কিছু কিছু টাকা আদায় দেওয়া হয় সামরিক সরঞ্জাম এবং বাতিল মেশিন দিয়ে। ৩৫০-এর ওপর বৃটিশ কারখানায় আধুনিক মেশিন বসেছে, বাতিল মেসিনগুলো এই ভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের এক চেয়ারম্যান, বোধ হয় এন. এন, ব্যানার্জি, তাঁর ভাষণে এ কথা বলেছিলেন।

এ সব ব্যাপারে কংগ্রেস নেতারা তো নির্বিবাদে সায় দিয়ে চললেনই, উপরন্তু এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কনট্রোল লাইসেন্সের ব্যবস্থার মারফৎ ভারতের জাতীয় অর্থনীতিকে তারা বৃটেনের প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চালাতে লাগলেন।

যেখানে বৃটেন থেকে বাড়তি আমদানীর অধিকার আমাদের কেউ অস্বীকার করতে পারে না, সেখানে আমরা প্রত্যক্ষ বৃটিশ শাসনের লুটের ব্যবসার আমলের মতই অদ্যাবধি বৃটেন থেকে আমদানীর চেয়ে রপ্তানী বেশী করে থাকি, ট্রেড ব্যালেন্স আমাদের অনুকূল বলে সন্তোষ প্রকাশ ও প্রচার করি, নানাভাবে ষ্টার্লিং ব্যালেন্স কমে গেলে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করি, আবার পাওনা বাড়িয়ে তুলি এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ পুঁজিপতিদের কাছ থেকে মোটা সুদে এড নেওয়ার ব্যবস্থা করি। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে আমরা বিনা সুদের পাওনাদার এবং বৃটিশ পুঁজিপতিদের কাছে মোটা সুদের দেনাদার। এবং এর নাম, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ছেড়ে দিয়েছে, আর আমরা স্বাধীন হয়েছি। জগতের ইতিহাসের সব চেয়ে বড় ষড়যন্ত্র।

একচল্লিশ

বৃটিশ রাজা স্বাধীন ভারতের বড়লাট নিযুক্ত করবেন, এমন কেলেঙ্কারী বন্ধ করার প্রয়োজন, —এবং শাসনতন্ত্র রাজতন্ত্রী হলে ঐ বৃটিশ রাজাকেই ভারতের রাজা বলে মানতে হয় এবং তাতে স্বাধীনতার চেহারাটা যেমন কদর্য তেমনিই থেকে যায় বলে' কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি প্রথম যে objective resolution পাশ করলে, অর্থাৎ সংবিধানের কাঠামো খাড়া করলে, তাতে বলা হল, ভারত একটা সভারেন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট রিপাবলিক হবে।

শুনে লোকে বুঝলে, এই তো কথা, এবার ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথ ছেড়ে বেরিয়ে

এসে ডোমিনিয়ন পরিচয় বর্জন করে সম্পূর্ণ স্বাধীনই হবে, সংবিধানটা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভারতের সংবিধানই হবে। কিন্তু আসলে '৩৫ সালের শাসনবিধি ও ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্ট মিলে যে ইণ্টারিম ডোমিনিয়নের শাসনবিধি তখন চলছিল, সেটার স্থলে নতুন সংবিধানটা হবে পাকা (full fledged) ডোমিনিয়নের শাসনবিধি, এবং কাজেই ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্তই থেকে যাবে। সভারেন, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি কথাগুলো দেখে ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই, কারণ ঐ দুটো কথা বড়লাট শাসিত স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়ন সম্বন্ধেও বলা হয়ে থাকে। .

এখন মনে হলে হাসি পায়, এই মত প্রকাশ করে দু'এক জন পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে কেমন তাড়াতাড়ি খেয়েছিলুম, এবং শেষ পর্যন্ত পণ্ডিত মশায়রা কেমন উদারতা প্রদর্শন করে ছিলেন। আমার এক বন্ধু (যশোরের পাঞ্জিয়ার শিব মিত্র) একদিন আমাকে এবং তাঁর আর এক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে মুখোমুখি ভিড়িয়ে দিলেন এবং কনস্টিটুয়েন্টের প্রশ্নটা তুলে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছেন। সে বন্ধুটি একজন প্রবীণ, বি সি এস অফিসার, কলচারাল।

তিনি বললেন,—আপনার এমন defeatist mentality (পরাজিতের মনোবৃত্তি) কেন? আমি বললুম,—কারণ "স্বাধীন রিপাবলিক" হয়েও বৃটিশ প্রজা হওয়া যায়। দৃষ্টান্ত আইরিশ ফ্রি ষ্টেট। তিনি মানলেন না,—তর্ক অসমাপ্ত থেকে গেল। পরে আমি বিশ্ববিখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ প্রোফেসার ব্যারিডেল কীথ-এর বই এবং আইরিশ কনষ্টিটিউশন থেকে দুটো উদ্ধৃতি লিখে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, যাতে বলা হয়েছে,—'আইরিশ ফ্রি ষ্টেট দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা থেকে বৃটিশ রাজের উচ্ছেদ করেছে, কিন্তু বিদেশে তার নাগরিকেরা বৃটিশ প্রজার অধিকার চায়ও এবং পায়ও। ব্যারিডেল কীথ বলেছেন, ব্যবস্থাটা anomalous বটে, কিন্তু এ anomaly একটা fact

এদিকে সংবিধান রচনার আলোচনা চলছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন উঠলো, ভারত কমনওয়েলথে থাকবে, কি না? নিরীহ নবলোক একটু ইতস্ততঃ করে গেল সভারেন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট রিপাবলিক সম্বন্ধে এ কেমন প্রশ্ন? কিন্তু কর্তারা সব জবাব না দিয়ে ভারতের এক সংবিধান বিশেষজ্ঞ বি. এন. রাওকে বিদেশে পাঠালেন বিভিন্ন দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আসার জন্যে।

তিনি আমেরিকায় গেলেন রিপাবলিক্যান শাসনতন্ত্র দেখতে, তারপরে বিলেতে গেলেন পার্লামেণ্টারী বিধিব্যবস্থা বুঝতে, আর গেলেন আইরিশ ফ্রী ষ্টেটে অন্য কোন দেশে নয়। দেখে আমার আনন্দ হল। আভ্যন্তরীণ শাসনে রিপাবলিক এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৃটিশ ডোমিনিয়ন, আমার এই থিওরীর সঙ্গে সংবিধান রচয়িতাদের আদর্শের মিল প্রমাণিত হল, এবং তদনুযায়ীভাবেই সংবিধান রচিত হল। তাতে ভারতের পরিচয় দেওয়া হল, সভারেন ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক।

জনগণ তখনও এসব বোঝেনি, এবং এই ভেবেই সন্তুষ্ট আছে যে, সার্বজনীন ভোটাধিকার চালু হলে তার ভিত্তিতে যখন প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হবে, তখন শেষ সিদ্ধান্ত আমাদের হাতেই আছে। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী এক ইণ্টারিম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করলে, এবং রাতারাতি বড়লাটই হয়ে গেলেন ইণ্টারিম প্রেসিডেণ্ট (রাজেন্দ্রপ্রসাদ)।

এদিকে '৪৮ সালের জানুয়ারীতে হিন্দু সভাপন্থী নাথুরাম গড্‌সে কর্তৃক অকস্মাৎ মহাত্মা গান্ধী নিহত হয়েছেন। দেখতে অকস্মাৎ হলেও ব্যাপারটার পিছনে একটা চমৎকার ইতিহাস আছে। দেশ বিভাগের ব্যাপারে সরকারী সম্পত্তি বিভাগও হয়েছিল এবং নানা বাবদে নানা ব্যবস্থার মধ্যে ভারতের পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ছিল। পাকিস্তান তাগাদা করে, ভারত টাকা দেয় না, এই নিয়ে মনোমালিন্য চলছিল। এই অবস্থায় কাশ্মীরের লড়াই শুরু হল।

সর্দার প্যাটেল কলকাতায় আসেন এবং প্যারেড গ্রাউণ্ডে বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দেন। তাতে নানা কথার মধ্যে তিনি পাকিস্তানের ঐ টাকার দাবীর কথা তুলে বলেন, "আমরা ৫৫ কোটি টাকা দোব, আর তোমরা সেই টাকায় গোলাগুলী কিনে কাশ্মীরে ভারতের সঙ্গে লড়বে, সেটি হচ্ছে না।" শুনে লক্ষ লক্ষ লোক হাততালি দিয়ে সমর্থন জানালো।

ওদিকে মহাত্মাজী বলেন, টাকাটা আটকে রাখা অন্যায়, দিয়ে দাও। সর্দারজী রাগ মানেন না। শেষে পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী (বোধ হয় গোলাম মহম্মদ) রাষ্ট্রসংঘে প্রচারের জন্য দশ দফা এক ফিরিস্তি পেশ করে দেখালেন, ভারত পাকিস্তানের ওপর কি রকম অন্যায় জুলুম করছে।

যেদিন কাগজে এই খবর বেরুলো, তার দু'এক দিন পরেই খবর বেরুলো ভারত সরকার ঐ টাকা দিয়ে দেবে স্থির করেছে। সর্দার প্যাটেলের বক্তব্য কারণ হল, 'মহাত্মাজীর পীড়াপীড়ির জন্যে" ভারত সরকার মত পরিবর্তন করেছে। আরো শোনা গেল, মহাত্মাজী বলেছিলেন, টাকাটা না দিলে তিনি অনশন শুরু করবেন, এবং সর্দার প্যাটেল নাকি বলেছিলেন, "মরুক্‌ বুড়ো"।

এই সব খবর এবং গুজব শুনে গড্‌সের দল ক্ষেপে গেল, তাদের মতে মহাত্মাজী মুসলমানদের বন্ধু, সুতরাং দেশদ্রোহী (ইংরেজের বন্ধু বলে নয়)। অতএব গড্‌সের দল তাদের প্যাট্রিয়টিক ডিউটি পালন করলে।

ওদিকে সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ইন চীফ জেনারেল অকিনলেককে সরানোর পর ভারতের তিনজন বৃটিশ সেনানায়কের (আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স) ওপর প্রধান সেনাপতি করে বসানোর জন্যে জেনারেল কারিয়াপ্পাকে বিলেতে পাঠানো হল, সেনাপতিগিরী শিখে আসার জন্যে। বলা বাহুল্য, শিক্ষাটা রাজনৈতিক।

শ্রীনেহেরু বলেছিলেন অক্টোবর নাগাদ নতুন সংবিধান তৈরী হয়ে যাবে। তাতে লোকে মনে করেছিল, তাহলে বুঝি '৪৮ এর জুনে নতুন সংবিধান চালু হবে। এ টাইম টেবল ঠিক হয়নি, কিন্তু এতে লোকের '৪৮ এর জুন আঁকড়ে থাকার সাহায্য হয়েছিল, এবং নেহেরুর ঐ কথাটাকেই 'প্রতিশ্রুতি' বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

তারপর যত দিন যায় লোকে দেখে "ইংরাজ ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে" কৈ? দেখে আর ভাবে, বোধ হয় '৪৮ এর জুনে যাবে। এমনি করে আমাদের মগজের দুর্বুদ্ধির খোপের মধ্যে '৪৮ এর জুন বাসা বেঁধে বসেছিল।

তারপর নতুন সংবিধান রচিত হল এবং দেখা গেল, ইংরেজ তার মধ্যে আগের মতই জেঁকে বসে আছে, বৃটেনের সাম্রাজ্যিক স্বার্থ নিরঙ্কুশ করার জন্যে '৩৫ সালের শাসনবিধিতে

লাট সাহেবদের যে স্পেশাল পাওয়ার দেওয়া হয়েছিল, নতুন সংবিধানে তাদের দিশী পার্টনার লাটসাহেবদেরও সেই স্পেশাল পাওয়ার দেওয়া হয়েছে, আর বৃটেনের অর্থনৈতিক শোষণ নিরঙ্কুশ করার জন্যে '৩৫ সালের শাসন বিধিতে ভারতে বিলাতী ব্যবসাগুলোকে যে ভারতের জাতীয় ব্যবসাগের সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছিল, নতুন সংবিধানে সেটাও ঠিক রাখা হয়েছে।

জনগণের মৌলিক অধিকার বলে অনেক ভাল ভাল কথা লেখা হল, কিন্তু তার প্রত্যেকটার সঙ্গে এক গাদা করে সর্ত্ত দিয়ে [illegible] "সাত নকলে আসল খাস্তা"—যার তারই [illegible] সংবিধানটা [illegible] দেশের সংবিধানের চেয়েও বড, ওজন পোয়া আধ মণ। দেখে আমরাও দুলে উঠলুম। তার উপর এবার হিপনোটিক প্যাঁচ মারা হল, না' মিনিষ্টার আম্বেদকর সংবিধান রচনার কল্পনাকে [illegible] তাকে এ যুগের মনু বলে ঢাক পেটানো হল। আমরাও [illegible]।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভায় ভারতের প্রতিনিধি [illegible] বললেন, "[illegible] পৃথিবীতে আমেরিকাই সব চেয়ে সমৃদ্ধিশালী দেশ,—অন্য সব অন্যান্য দেশের শ্রী সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে সাহায্য করা তার একটা বিশেষ দায়িত্ব—ভারতকে সাহায্য করা তো তার নিজের স্বার্থেই দরকার।"

আমেরিকান এশিয়াটিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট [illegible] বললেন, 'ভারতে আমাদের কম প্রচেষ্টা [illegible] মালিক [illegible] যে, এশিয়ার মধ্যে ভারতই ব্যক্তিগত স্বাধীন কাজ [illegible] (free world) শেষ [illegible] ঘাঁটি। এই ঘাঁটিকে [illegible] সঙ্গে একযোগে সোসিয়ালিষ্টদের শিল্প জাতীয়করণ প্রচেষ্টাকে বাধা দিতে হবে।"—(ষ্টেটসম্যান—১৫.৬.৪৮)।

অর্থাৎ '৪৮ এর জুনে ভারতের বুকের উপর ইংরেজই শুধু নয়, আমেরিকাও চেপে বসার ব্যবস্থা শুরু করেছে।

পণ্ডিত নেহেরুও উৎকামণ্ডে এক বক্তৃতায় বললেন, We want to co-operate in the fullest measure with any policy or programme laid down for the world's good even though it might involve the surrender, in common with other countries of any particular attribute of sovereignty.

(অর্থাৎ দুনিয়ার কল্যাণের জন্যে যদি কোন বিশেষ নীতি ও কর্মপন্থা গৃহীত হয় এবং তার জন্যে যদি অন্যান্য দেশ সার্বভৌমত্বের কোন বিশেষ অধিকার ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়, তাহলে আমরাও তার সঙ্গে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে প্রস্তুত)।

(অমৃতবাজার পত্রিকা, ২.৬.৪৮)

ইংরেজ কেন ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্যে এত হুড়োহুড়ি করলে এবং আমেরিকা কেন তার এত তারিফ করলে, তা ক্রমে প্রকাশ হতে লাগলো। ভারত যে রিপাব্লিক হলেও বৃটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ করবে না, এটা যখন জানা গেল তখন বিড়লার কাগজ ইষ্টার্ন ইকনমিষ্ট লিখলে (৩১।১২।৪৮), "এই রাজনৈতিক তথ্যটার আইনগত ফলাফল বোঝা

দরকার। রাষ্ট্রসংঘে বা আর কোথাও আমরা মামুলী ও তুচ্ছ বিষয়ে ছাড়া কমনওয়েলথ বা আমেরিকার নীতির বিরোধী নীতি অবলম্বন করতে পারবো না।"

১৯৪৯ সালের শেষে যখন চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে আমেরিকাও চীন থেকে বিতাড়িত হয়েছিল, তার অনেক আগে থেকেই আমেরিকা চিয়াংকে খরচের খাতায় লিখে কমিউনিজমের বন্যাপ্রবাহ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে বাঁচানোর জন্যে ভারতকে ঘাঁটি করার মৎলব এঁটেছিল। '৪৯ সালের অক্টোবরে জন ফষ্টার ডালেস নিউ ইয়র্কে বললেন (নিউ ইয়র্ক টাইমস, ২১।১০।৪৯) "চীনে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে আমেরিকার শেষ চেষ্টাকে পাছে লোকে সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা বলে মনে করে, তার জন্যে দূর প্রাচ্যে কমিউনিজমের প্রসার রোধের ব্যাপারে স্থানীয় নেতৃত্ব খাড়া করতে হবে, যাদের স্বার্থ কমিউনিজম-বিরোধিতার সঙ্গে জড়িত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরুই এই নেতৃত্ব দিতে পারেন।"

তার আগেই, ২৫শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৯) ওয়াশিংটন থেকে ওভারসীজ নিউজ এজেন্সীর প্রতিনিধি ম্যালকম হবস্ লিখেছিলেন, "আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির বিকাশের পক্ষে ভারতই হবে পরবর্তী বড় ঘাঁটি। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেভিন এবং আমেরিকার রাষ্ট্রসচিব অ্যাচেসন কিছুদিন আগে এক সঙ্গে পরামর্শ করার পর এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এশিয়ায় আমেরিকার হাতছাড়া ঘাঁটির পুনরুদ্ধারের পক্ষে ভারত একটা মহা সুযোগের স্থল।"

ইতিমধ্যে আমেরিকা শ্রীনেহেরুকে আমেরিকায় আসার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিল। তিনি ঐ সময়েই আমেরিকায় গেলেন। ১৯টা কামানের তোপ এবং শত শত কাগুজে তোপ দেগে তাঁর বিরাট অভ্যর্থনা হল। ঘটা এমন বিসদৃশ, যাকে বাঙ্গালরা বলে "ফুলায়"! তারপরে প্রায় একমাস ধরে চললো সরকারী চার্ট অনুযায়ী সফর, বক্তৃতা, ভোজ।

আমেরিকার ডেমোক্রেসীর সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ দেখে একদল ঠোঁট কাটা সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করে বসলো, নিগ্রোদের সঙ্গে দেখা করলেন না কেন? শ্রীনেহেরু বললেন, সরকারী চার্ট যারা তৈরী করেছে, তারা জানে। কিন্তু কয়েকদিন পরেই দেখা গেল, চার্টের মালিকরা ঐ সাংবাদিকদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছেন। যে নেহেরু আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষ বা নিগ্রো লিঞ্চিং সম্বন্ধে ঘূণাক্ষরেও একটা কথা বলেননি, হঠাৎ দেখা গেল একদল পোষা নিগ্রোর সভায় নিগ্রোরা তাঁকে নিগ্রো-কল্যাণ স্পিনগার্ন গোল্ড মেডাল পুরস্কার দিচ্ছে।

আমেরিকার হাউস অফ রিপ্রেজেণ্টেটিভসে বক্তৃতায় শ্রীনেহেরু বললেন "তোমাদের যে সব নেতা আমেরিকার স্বাধীনতা ও শক্তি বৃদ্ধির জন্যে সংগ্রাম করেছেন, তাঁরা নমস্য। তোমরাও স্বাধীনতা অর্জন করেছ একটা বিপ্লব করে, আমরাও স্বাধীন হয়েছি বিপ্লব করেই। তবে কিনা, আমাদের বিপ্লবটা একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তবে, আমাদের বিপ্লবটা এখনো শেষ হয়নি লোককে খেতে-পরতে দিতে না পারা পর্যন্ত সেটা চলবে। তার জন্যে আমরা তোমাদের কাছে সাহায্য চাই।

"আমাদের বৈদেশিক নীতি শান্তিকামী। আমরা গান্ধীপন্থায় চ'লে স্বাধীনতা তো পৌঁছেছিই, উপরন্তু শত্রুদের বন্ধুত্বও পেয়েছি। গান্ধীর পন্থাই শান্তির পন্থা। অবশ্য বর্তমান যুযুৎসু দুনিয়ায় গান্ধীপন্থার বাস্তব প্রয়োগ কি ভাবে হতে পারে, তা বলা শক্ত। তবে, লোকের মনের ভয়টা গান্ধীপন্থায় উড়িয়ে দিতে পারা যায়।"

শ্রীনেহেরু নিরপেক্ষ নীতিও ঘোষণা করে সঙ্গে সঙ্গে (যেন খুড়ি দিয়ে) বললেন, But where freedom is menaced or justice threntened or where aggression takes place, we cannot be and shall not be neutral. (কোথাও যদি স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, ন্যায়বিচার ব্যাহত হয়, বা পররাজ্য আক্রান্ত হয়, তাহলে আমরা আর নিরপেক্ষ থাকতে পারি না এবং থাকবো না।)।

ষ্টেটস্‌ম্যানের ওয়াশিংটনস্থ বিশেষ প্রতিনিধির চিঠিতে বলা হল (১৬ই অক্টোবর) "আমেরিকার কর্তারা নেহেরুর কথায় খুব খুশী হয়েছেন। যারা কমিউনিস্টদের দমন করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর অর্থ নাই। ... ছাড়া অ্যাচসন এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে নেহেরুর যে এক ঘন্টা গোপন আলোচনা হয়, তার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ হতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু সে আলোচনায় যারা যোগ দিয়েছিলেন আমেরিকার চীননীতি বিশেষজ্ঞ মিঃ জেশাপ ... এবং ... নষ্টমন্ত্রণাদ বিশেষজ্ঞ মিঃ কেন্নান তার মধ্যে ছিলেন। সুতরাং আলোচ্য বিষয় আন্দাজ করা যেতে পারে।"

নিউ ইয়র্কের নাগরিকদের অভ্যর্থনা সভায় শ্রীনেহেরু বলেন, 'আমেরিকা যে পৃথিবীর সব ভাল কাজেরই মুরুব্বী, সেটা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে, এবং সেইজন্যে সে অবশ্যই ভারতের বন্ধুত্ব এবং শুভেচ্ছা পাবে। আমি এ দেশের ধন দৌলত দেখে আকৃষ্ট হইনি, কিন্তু আকৃষ্ট হয়েছি এই জন্যে যে, আমেরিকা মানুষের স্বাধীনতার সমর্থক ও সহায়ক। আমাদের দুই দেশের মধ্যে কোনো-কোনো বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ সত্ত্বেও দুনিয়ার সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাধারার একটা ঐক্য আছে। সুতরাং সে বিষয়ে আমরা দুই দেশ পরস্পর সহযোগিতা করতে পারি।"

ইউনাইটেড ষ্টেট নিউজ অ্যাণ্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট লিখলে, ভারতের প্রধান মন্ত্রী আমেরিকা সফরে এসেছেন, যেটাকে তিনি শুভেচ্ছা সফর বলছেন। তিনি চিন্তান্বিত এবং আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান। আমেরিকায় ঘুরে যে শুভেচ্ছা তিনি সংগ্রহ করতে পারবেন, তাই ভাঙ্গিয়ে দেশের জন্যে ডলার সংগ্রহ করাই তার উদ্দেশ্য। আমাদের উদ্বৃত্ত গমের গাদা দেখে তিনি বুভুক্ষু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন, লাখ দশেক টন ধার পাওয়া তাঁর ইচ্ছে। তিনি বৃটিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে নম্বার জেলে গেছেন। তিনি খুব লম্বা বক্তৃতা দিতে পারেন এবং শ্রোতাদের ধমক দেন।"

এটা হল বে-সরকারী আমেরিকার অভ্যর্থনার একটা নমুনা। এ ধরনের আরো নানা কথা আমেরিকার আরো অনেক কাগজে লেখা হয়েছিল। আর শ্রীনেহেরু এবং তাঁর সরকারের যে স্বরূপ এই-আমেরিকার কল্যাণে প্রকাশ হয়েছে, সেটাও অপূর্ব।

'৪৯ সালের ডিসেম্বরে নিউ দিল্লীতে ইণ্ডিয়া-আমেরিকা কনফারেন্সে ফরেন পলিসী অ্যাসোসিয়েশনের ডীন ভেরা মিচেলস্ বললেন, আমেরিকানদের অনেকের মনে একটা উৎকণ্ঠা ছিল যে, আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মাঝে ভারত বুঝি-বা নিরপেক্ষই থাকবে। কিন্তু ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথের সঙ্গে থেকে যাবে শুনে এখন তাদের সে ভয় কেটে গেছে। কারণ আমেরিকা ১৯৪৫ সাল থেকেই বৃটেনের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারে একযোগে কাজ করে আসছে।"

বামপন্থী জনগণকে ভোগা দেওয়ার জন্যে শ্রীনেহেরু দেশে অনেক বামপন্থী ঢংয়ের কথা

বলতেন এবং বীরত্ব হুঙ্কারও দিতেন। তাতে পাছে আমেরিকানরা ঘাবড়ায়, সেজন্যে আমেরিকার ইণ্ডিয়া লীগের প্রেসিডেন্ট জে. জে. সিং বললেন, "দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোটি কোটি বুভুক্ষু জনগণের মধ্যে কমিউনিস্টদের রণধ্বনি (প্লে গান) এবং বামপন্থী প্রোগ্রামই আওড়ানো দরকার।"

দিন কতক আগে কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলির এক মাতব্বর শ্রীনেহেরুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইউরোপের জন্যে যেমন মার্শাল প্ল্যান হয়েছে (আমেরিকার ঋণ-এড লগ্নীর ব্যবস্থা), ভারতের জন্যে তেমন একটা ব্যবস্থা কেন করা হচ্ছে না? তার জবাবে শ্রীনেহেরু হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন, India is an independent country and she cannot be expected to go to foreign countries with a beggar's bowl in hand, অর্থাৎ ভারত স্বাধীন দেশ সে কি ভিক্ষার ঝুলি হাতে করে বিদেশে যেতে পারে।

লংজাম্পের আগে যেমন পিছিয়ে এসে দৌড় নেয়, এ কথাগুলোও তেমনি শ্রীনেহেরুর আমেরিকা সফরের প্রস্তুতি। সেখানে বিজয়লক্ষ্মী আগেই গিয়ে জমি তৈরী করেছিলেন, এবং দশ লাখ টন গম বাজ পাওয়ার ব্যবস্থাও হল। এ ঋণের সর্ত সম্বন্ধে শ্রীনেহেরুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, সে সব বিজয়লক্ষ্মী জানে। অর্থাৎ স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী খবর রাখেন না, পাঁচেও নেই।

বামপন্থী ও সাম্যবাদীদের আন্দোলনের ফলে নেহেরু কিছু বিশেষ শিল্প জাতীয়করণের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছিলেন। ভারতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত গ্রেডি বলেছিলেন, এই সব কথার জন্যে আমেরিকা ভারতে অর্থ লগ্নী করতে উৎসাহ পায় না। তারপর শ্রীনেহেরু বললেন, আপাততঃ দশ বছরের জন্যে জাতীয়করণ বন্ধ রাখা হবে, এবং তারপর থেকে আমেরিকার ডলারের প্রবাহ শুরু হয়।

এদিকে ভারত জনসাধারণ কষ্ট পাচ্ছে, তখন সাড়ে পাঁচশো'র ওপর দশায় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনে স্বৈরাচার চলছে, অথচ ঐ সব রাজ্যের সঙ্গে ভারত রিপাবলিকের অ্যাকসেশন বিবেচনা করছিল না, এ এক অতি বিসদৃশ ব্যাপার। সুতরাং অ্যাকসেশন বা ভারত-ভুক্তির স্থলে 'মার্জার' বা সম্পূর্ণ ভারত ভুক্তির ব্যবস্থার জন্যে সর্দার প্যাটেল কাজে নামলেন। রাজাদের রাজ্য ও স্বার্থ বজায় রেখে ছাড়া কিছু করার উপায় নেই, সমান দুই পক্ষের চুক্তি ছাড়া যেমন অ্যাকসেশনও হয়নি, তেমনি সমান দুই পক্ষের চুক্তির দ্বারাই ঐ "মার্জার" বা পূর্ণ ভারত ভুক্তির ব্যবস্থা করা চাই। কিন্তু সেটা কেমন করে হবে?

সর্দার প্যাটেল তার উপায় বের করলেন। বৃটিশ ভারতে যে সব নাবালক বা অন্যান্য জমিদার খাজনা আদায় করা বা সংসার চালাতে পেরে উঠতো না, সেই বিপন্ন জমিদারদের জমিদারী রক্ষার জন্য বৃটিশ সরকারের কর্তারা কোর্ট অফ ওয়ার্ডস ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। তার মোদ্দা কথা, সরকার জমিদারীটা হাতে নিতো, আর খাজনা আদায়ের পর তার একাংশ ম্যানেজমেণ্টের খরচ হিসেবে রেখে বাকি এক অংশ জমিদারকে দিতো। জমিদার নির্বিবাদে একটা আয় ভোগ করতো।

সর্দার প্যাটেল সেই পদ্ধতির সুবিধা দেখে দেশী রাজাদের "মার্জার" বা সম্পূর্ণ ভারত-ভুক্তির প্রস্তাবে তাঁদের রাজী করালেন এবং ব্যবস্থা হল, রাজাদের রাজসম্মান, ব্যক্তিগত ধন-

দৌলত সবই বজায় থাকবে এবং রাজ্যের আয়ের অনুপাতে 'প্রিভি পার্স' নামক একটা মোটা বৃত্তি তাঁদের দেওয়া হবে এবং তার পরিবর্তে তাঁদের রাজ্য ভারতের শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হবে।

এই ভাবে, ছোট ছোট রাজ্যের রাজাদের ২৫০৲। ৫০০৲ টাকা থেকে শুরু করে বড় বড় রাজাদের দশ-বিশ পঞ্চাশ লাখ পর্যন্ত টাকা প্রিভি পার্স নির্ধারিত হল, নিজামের প্রিভি পার্স হল বোধ হয় এক কোটি টাকা, এবং সকল দেশীয় রাজ্যের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তি হয়ে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে এ ব্যবস্থাও হল যে, পাশাপাশি কয়েকটা দেশীয় রাজ্য শাসনকার্যের সুবিধার জন্যে একসঙ্গে মিলিয়ে এক-একটা ছোট প্রদেশের মতন ইউনিয়ন করা হলে, ঐ সব দেশীয় রাজাদের মধ্যে এক জনই রাজপ্রমুখ হতে পারবেন (গভর্ণরের মতন) এবং কোন বড় রাজা যে প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হবে, সে প্রদেশের গভর্ণরের পদে নিয়োগের ব্যবস্থাও দরকার মত করা হবে।

জনগণ এই ব্যবস্থার এত কথার ধার ধারে না, তারা আনন্দে গদ গদ হয়ে বলতে লাগলো, দেশী রাজাদের রাজ্যগুলো সর্দার প্যাটেল "লে লিয়া।" যেন সেগুলোকে ভারত সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। অথচ রাজাদের রাজ-সম্মানের অধিকার বজায় রইলো এমন ভাবে যে, নিজামের প্রাসাদে তিনশত ক্রীতদাসী আছে বলে, তাদের মুক্তি দাবী করে হায়দ্রাবাদের এক উকীল হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টে এক দরখাস্ত করলে হাইকোর্ট জবাব দিলে যে, নিজামের প্রাসাদের ওপর হাইকোর্টের কোন এক্তিয়ার (Jurisdiction) নেই।

যাই হোক, এই মাজাবের ব্যবস্থা থেকে কাশ্মীর রাজ্য বাদ থেকে গেল, ভারত-পাকিস্থান দ্বন্দের কল্যাণে। অথচ অ্যাকসেশন না আর ভারতভুক্তির ফলে আভ্যন্তরীণ শাসনে যে স্বৈর রাজতন্ত্রই চলছিল, তাকে একটা গণতান্ত্রিক রূপ না দিলেও চলে না। তারও উপায় বের করা হল।

মহারাজা হরি সিংয়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত হল, তিনি বছরে দশ লাখ টাকা প্রিভি পার্স নিয়ে গদী ত্যাগ করলেন, তাঁর পুত্র যুবরাজ করণ সিং গদী পেলেন, কিন্তু তাঁকে রাজা হিসাবে রাষ্ট্রপতির পদে না রেখে একটা হাত-তোলা ধরনের নির্বাচন করে প্রেসিডেন্টের অনুরূপ পদে বসানো হল, সদর ই রিয়াসৎ।

সঙ্গে সঙ্গে বিধান পরিষদের মতন একটা গণপরিষদও তৈরী হল এবং প্রায় রাতারাতি একটা পৃথক সংবিধানও রচিত হয়ে গেল। আর ভারতভুক্তির সঙ্গে এই ব্যবস্থা মিলে কাশ্মীরের (আধখানা) প্রশাসনিক রূপ দাঁড়ালো ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটা স্বশাসিত রাজ্যের মতন এবং ভারতের পার্লামেন্টে কাশ্মীরের জন ছয়েক প্রতিনিধি নেওয়ারও ব্যবস্থা হল। জনগণের কাছে বলা হল, কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, তবে কিনা, ভারত কাশ্মীরকে কয়েকটা বিশেষ অধিকার দিয়েছে। কেন দিয়েছে, তা বলার গরজও কারো নেই, আর জিজ্ঞাসার বা বোঝারও গরজ কারো নেই। (সংবিধানের ৩৭০ ধারা)

সভারেন রিপাবলিকের সংবিধান রচনা হচ্ছে, জনগণের তাতেই আনন্দ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তলে তলে ইংরেজের সঙ্গে আর একটা রফাও চলছে। '৪৮ সালে বৃটেন ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট নামক এক আইন পাশ করলে, আমাদের সংবিধানের ৩৭২ ধারায় তদনুযায়ী ব্যবস্থা

লেখা হয়ে গেল এবং স্বাধীন ভারতের আইনব্যবস্থার মধ্যেও ঐ বৃটিশ ন্যাশান্যালিটি অ্যাক্টের ব্যবস্থা ঢুকিয়ে নেওয়া হল। সে আইনের মর্ম, কমনওয়েলথের দেশগুলোর নাগরিক সবই বৃটিশ প্রজা, ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে ভারতের নাগরিকরা যেমন বৃটিশ প্রজা ছিল, তাদের সে মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে, ভারতে ইংরেজ এবং অন্যান্য কমনওয়েলথ-দেশের নাগরিকরা বিদেশী বলে গণ্য হবে না, বিদেশী সংক্রান্ত আইনের আওতায় তারা আসবে না, তাদের পরিচয় অতঃপর হবে অ-ভারতীয় (Non-Indian)।

এর আগে শ্বেতজাতিগুলোই ডোমিনিয়ন ছিল, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি, ঐ সব দেশের কালা আদমীদের রাজনৈতিক অধিকার বলতে কিছুই ছিল না, এখন একটা প্রকাণ্ড কালা আদমীর দেশ ডোমিনিয়ন হল, সুতরাং "এম্পায়ার" সাইনবোর্ডের স্থলে কমনওয়েলথ সাইনবোর্ড চালু হল এবং বরাবর বছর বছর ডোমিনিয়নগুলোর প্রধান মন্ত্রীদের নিয়ে বৃটেন যে ইম্পিরিয়াল কনফারেন্স করতো, যার উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সুবিধামূলক অর্থনৈতিক আদান প্রদানের আলোচনা ও ব্যবস্থা এবং সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে ডোমিনিয়নগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্যের পর্যালোচনা, ১৯৪৯ সালে সেই ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সেও নতুন সাইনবোর্ড লাগানো হল—কমনওয়েলথ কনফারেন্স—এবং সেটাকে প্রথম কমনওয়েলথ কনফারেন্স বলে জনগণকে বোঝানো হল, বৃটিশ সাম্রাজ্যটা অতীতের কথা, কমনওয়েলথটা কতকগুলো স্বাধীন দেশের স্বেচ্ছামূলক সমবায়।

১৯২৯ সালে কানাডার অটোয়ায় ডোমিনিয়নগুলোর পারস্পরিক আর্থিক আদান-প্রদানে পারস্পরিক সুবিধাজনক শুল্কব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল, যার নাম ছিল ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স সিষ্টেম,—সে ব্যবস্থাটা ঠিকই এবং ঐ নামেই রয়ে গেল। '২৯ সালে ভারত ছিল কলোনী, খাঁটি গোলাম, বৃটেনের কাঁচামাল সংগ্রহের এবং শিল্পজাত পণ্য বিক্রির বাজার। ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স ব্যবস্থার গুণে ভারতের কাঁচা মালের ওপর বৃটেন অন্যান্য দেশ থেকে আমদানী কাঁচা মালের চেয়ে কম শুল্ক ধার্য করতো, আর ভারত বৃটিশ শিল্পজাত-পণ্যের ওপর অন্যান্য দেশ থেকে আমদানী শিল্পপণ্যের চেয়ে কম শুল্ক ধার্য করতো। দেখতে সুবিধাটা পারস্পরিক হলেও, দু-দিক দিয়েই বৃটেনেরই লাভ হত। '৪৯ সালেও যখন ভারতের শিল্পবাণিজ্যের অবস্থা প্রায় '২৯ সালের মতই অনুন্নত, তখনও ঐ ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্সের কল্যাণে দু'দিক থেকে বৃটেনের লাভই চলতে লাগলো। আর সিষ্টেমটার নামেও থেকে গেল "ইম্পিরিয়াল" কথাটাই।

কানাডা-অষ্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্য ঐ প্রেফারেন্স ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্সের তথাকথিত সুবিধার সঙ্গে ভারত কমনওয়েলথ থেকে আর একটা মস্ত সুবিধা পাবে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হলে বৃটেন ও কানাডা প্রভৃতি দেশের সাহায্য পাবে।

কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া স্বায়ত্তশাসিত দেশ, কলোনীর মতন গোলাম নয়, তাদের চেয়ে অনেক বেশী স্বাধীনতা তাদের আছে। আমরাও কানাডার পর্যায়ে উঠেছি, আমাদেরও সেই রকম স্বাধীনতা হয়েছে, এটাই প্রচার চলতে লাগলো। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার বহর যে কানাডা প্রভৃতির চেয়ে সংকীর্ণ সে কথাটা ঢাকা পড়ে গেল। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া

সাদা আদমীর দেশ বলে তারা সোজা পথে স্বায়ত্ত শাসন পেয়েছে, কিন্তু আমরা কালা আদমীর দেশ বলে একটা এমন সর্তে স্বায়ত্তশাসন পেয়েছি, যাতে আমাদের হাত-পা অনেকখানি বেশী বাঁধা রয়ে গেছে।

বৃটিশ-সাম্রাজ্যের মৌলিক স্বার্থের বিরুদ্ধে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া কিছু করতে পারে না, তাদের স্বাধীনতার ঘাটতি এইটুকু মাত্র, কিন্তু আমাদের ঘাটতি অনেক বেশী, কারণ we have inherited all the agreements and commitments, internal and external, of the former British Indian Govt. Inherited কথাটার অর্থ "মেনে চলার সর্ত"।

বিয়াল্লিশ

জনগণের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের শাসনের নাম গণতন্ত্র বা রিপাবলিক, যাতে রাজার কোন স্থান নেই। তাই পৃথিবীতে যে-সব পুরানো রিপাবলিক আছে, সেগুলোর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল রাজতন্ত্র শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান করে, রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে। বৃটিশ রাজ কর্তৃক নিযুক্ত বড়লাট শাসিত ডোমিনিয়ন ভারত যে বৃটিশ রাজার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে, তাঁর সম্মতিক্রমে রিপাবলিক হতে চললো, এটা দুনিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অভিনব ব্যাপার।

তাই এটা ঠিক বুঝতে না পেরে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী জেনারেল স্মাটস বললেন, ডোমিনিয়ন আপোষে রাজাকে উড়িয়ে দিয়ে রিপাবলিক হবে, অথচ ডোমিনিয়নের সব সুযোগও (ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের সাহায্য প্রভৃতি) ভোগ করবে, এটা কেমন করে হতে পারে?

'৪৭ সালে ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক লিখেছিলেন, ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসটা ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের চেয়ে ভাল, কারণ ওর মধ্যে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স তো আছেই, উপরন্তু আরো কিছু সুখ-সুবিধা আছে।

এই জন্যে ভারতকে ডোমিনিয়ন পর্যায়ে উন্নীত করার আগে বৃটেনকে অন্যান্য ডোমিনিয়নের সঙ্গে পরামর্শ করতে এবং তাদের সম্মতি নিতে হয়েছিল। নতুন রিপাবলিক্যান ষ্ট্যাটাসও তাদের সম্মতি সাপেক্ষ। তাই '৪৯ সালের কমনওয়েলথ কনফারেন্সে গিয়ে শ্রীনেহেরুকে লম্বা বক্তৃতা দিয়ে স্মাটসদের বোঝাতে হয়েছিল, তাঁরা যা মনে করছেন, ব্যাপারটা ঠিক তা-ও নয়, আর আইনের দিক থেকেও নতুন ব্যবস্থার কোনো বাধা নেই।

তিনি ওঁদের বুঝিয়ে দিলেন যে, রাজা ষষ্ঠ জর্জ যে আমাদের বড়লাট নিযুক্ত করেন, সে তো আমাদের দলের একজনকেই এবং আমাদেরই সুপারিশে, কারণ তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কাউকেই জানেন না। আমরা সুপারিশ করি, তিনি নিয়োগপত্র দেন। সুতরাং আমরা যদি সুপারিশের বদলে একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেই তাঁকে রিপোর্ট দিই, তাহলে আমাদের নির্বাচিত সেই প্রেসিডেন্টকেই তাঁর ডোমিনিয়নের শাসক রূপে গ্রহণ করতে রাজা ষষ্ঠ জর্জের আপত্তি হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? ভারতের জনগণকে স্বাধীনতা দেখাতে হলে বর্তমান বড়লাটের শাসন তুলে দিতেই হবে, কিন্তু

আমরা রিপাবলিক হয়েও যখন কমনওয়েলথেই থাকবো, তখন আমাদের ষ্ট্যাটাস ঠিকই থাকবে। বৃটিশরাজকে আমরা কমনওয়েলথের প্রধান, কমনওয়েলথের ঐক্যের প্রতীক এইভাবেই মেনে নিয়ে আমাদের আনুগত্য বজায় রাখবো।

আর যেহেতু কমনওয়েলথের কোনো ধরা-বাঁধা সংবিধান নেই, বহুকাল ধরে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে নানা নতুন নতুন ব্যবহারবিধি (convention) গড়ে উঠেছে, সুতরাং ভারত ডোমিনিয়ন সম্পর্কে এই নতুন ব্যবস্থাটাকে যদি আপনারা একটা নতুন convention রূপে মেনে নেন, দেখবেন এ ব্যবস্থা কমনওয়েলথের পক্ষে ভবিষ্যতে একটা চমৎকার সুবিধাজনক ব্যবস্থা বলে প্রমাণিত হবে।

অ্যাটলেরা দল ব্যাপারটা বুঝলেন এবং নেহেরুর প্ল্যান মেনে নিলেন এবং নেহেরুর বৈধতা-প্রতিভার তারিফ করলেন। এই ভাবে এযুগের নিও-কলোনিয়্যালিজমের সূত্রপাত হল এবং নেহেরুই হলেন তার প্রথম নিবাহী বাস্তুকার। আর এ ব্যবস্থা যে কমনওয়েলথের পক্ষে একটা চমৎকার সুবিধাজনক ব্যবস্থা, নেহেরুর একথাটাও প্রমাণিত হল, যখন বৃটিশ কলোনিগুলো একে একে পটাপট অংশ যাবে স্বাধীন হয়ে কমনওয়েলথের equal partner হতে লাগলো।

জনগণ এবং তাদের তথাকথিত বামপন্থী প্রগতিশীল নেতাগণ এবং ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি সোরগোল তুললে, নেহেরু নাকি স্বাধীন ভারত রিপাবলিককে কমনওয়েলথের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছেন। এই সব রাজনৈতিক পণ্ডিতদের এটা হুঁস নেই যে, ভারত তখনও interim dominion, ruled under the 1935 constitution as amended by the India Independence Act which provided the new set up in the Central Govt. ১৯৩৫ সালের শাসনবিধি এবং তার ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্ট কর্তৃক সংশোধিত কেন্দ্রীয় নতুন শাসনব্যবস্থা, এগুলো যে '৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী পর্যন্ত বলবৎ ছিল, এ হুঁস ছিল না বলেই, কিম্বা এদিকে চোখ বুজে থাকার গরজেই তাঁরা বুঝতে পারেননি, বা বলতে চাননি যে '৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী রিপাবলিক হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারত ছিল ইন্টারিম ডোমিনিয়ন, পাকা ডোমিনিয়ন নয়, বুঝতে পারেননি যে, রাতারাতি গভর্ণর জেনারেল ইন্টারিম প্রেসিডেন্ট হওয়ার অর্থ বড়লাটেরই খোলস পরিবর্তন এবং নতুন সংবিধান চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত সব ব্যবস্থাই ইন্টারিম, বুঝতে পারেননি যে, ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস সম্পূর্ণ ও পাকা করতে হলে যে নতুন সংবিধান প্রয়োজন, আমাদের তথাকথিত কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী সেই সংবিধানই তৈরী করেছে, সম্পূর্ণ স্বাধীন রিপাবলিকের সংবিধান নয়, শাসনযন্ত্রটাকে রিপাবলিকের রূপ দিয়ে জনগণমন অধিনায়ক ভারত ভাগ্যবিধাতারা, ইংরেজ ও কংগ্রেস, একযোগে নতুন সংবিধানের মধ্যে বৃটেনের সর্বপ্রকার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করেছে, বুঝতে পারেন নি যে, ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস পেয়ে কলোনি ভারত ইংরেজের কৃপায় এই প্রথম কমনওয়েলথ কনফারেন্সের চৌকাঠ পার হয়ে ডোমিনিয়নগুলোর প্রধান মন্ত্রীদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসবার অধিকার পেয়েছে, কমনওয়েলথ ছাড়ার প্রশ্নও ওঠে না, এবং ইন্টারিম ডোমিনিয়নের প্রধান মন্ত্রীর সে কথা উত্থাপন করার অধিকারও নেই।

নতুন সংবিধান অনুসারে সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত পার্লামেণ্ট যখন পাকা

ডোমিনিয়নের পার্লামেন্ট হবে, তখন সেই পার্লামেন্টে কমনওয়েলথ ছাড়াব প্রশ্ন উঠতে পারে। (কিন্তু আজ পর্যন্ত সে চেষ্টা কেউ করেন নি)।

আব একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপাব সকলেই চেপে গেছেন। স্মাট্‌সের দল যে সমস্যার কথা তুলেছিলেন এবং শ্রীনেহেরু তার যে সমাধান ব্যাখ্যা কবেছিলেন, সেগুলোকে আইন ও বৈধতাব ছাঁচে ঢালাই করে একটা নতুন ব্যবস্থাব রূপ দেওয়ার জন্যে বৃটেন এক নতুন আইন পাশ করলে, কনসিকোয়েনসিয়াল প্রভিশন এ্যাক্ট, যাতে বলা হল, বিপাবলিক হওয়ার ফলে, বৃটিশ আইনে ভাবতের যে সব অধিকার ছিল, সেগুলো বদলাবে না, সবই আগেব মতই থাকবে, as if India had not been a Republic, ভাবত রিপাবলিক না হলে যা হ'ত। অর্থাৎ বিপাবলিক হওয়াব পরেও ভারতের ডোমিনিয়নের ষ্ট্যাটাস অক্ষুন্ন থাকবে।

এই আইন বৃটিশ পার্লামেন্টে পাশ হল '৪৯ সালেব ডিসেম্বর মাসেই, এবং পার্লামেন্টের ঐ অধিবেশনেব উপসংহাব কালে (১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯) বাজা ষষ্ঠ জর্জ তাঁর বক্তৃতায় বললেন, India's assumption of the status of a Sovereign Independent Republic, while remaining full member of the British Commonwealth was an historic agreement" অর্থাৎ ভাবত যে সভাবেন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বিপাবলিকও হবে এব' বৃটিশ কমনওয়েলথেব পূর্ণ সদস্যও থাকবে, এটা হল একটা ঐতিহাসিক চুক্তি। সেই সঙ্গে তিনি বৃটিশ কলোনিগুলোর জনগণেব "স্বায়ত্তশাসনেব পথে অগ্রগতিব" আব একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ কবলেন গোল্ডকোষ্ট (ঘানা)। ভারতের বন্দোবস্তের সাফল্যের পব সে ব্যবস্থা গোল্ডকোষ্টেও চালু হতে চলেছে, দ্বিতীয় কালা ডোমিনিয়নরূপে।

আমি তখন "কাঁঠালেব আমসত্ব" নামে প্রবন্ধ লিখে বিপাবলিক্যান ডোমিনিয়নের ব্যাখ্যায় লিখেছিলুম, "পাংলুন পবে হ্যাবিংটন সাহেব সেজে অচেনা লোকেব কাছে চাল মেরে বেড়ালে কি হবে, মুলো বাগদীর বাপ তাকে মুলো বলেই ডাকবে। সে প্রবন্ধ তখন ছাপা হতে পাবে নি।

যাই হোক, '৫০ সালের ২৬শে জানুয়াবী কংগ্রেসী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে-তে রিপাবলিক ঘোষিত হল এবং দেশজোড়া মহোৎসব হল। জাতীয়তাবাদী বিপ্লবেব সকল কারণ ও সম্ভাবনা অপসারিত হল, এবং শ্রমিক বিপ্লবেব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেব "ইস্যুর" সামনেকাব প্রধান বাধারও অবসান হল। ভাবতেব কমিউনিষ্ট আন্দোলন এবং বৈপ্লবিক সংগঠনেব পথও পরিষ্কার হল।

এ বিষয়ে ভারতেব পুঁজিপতির দল এবং তাঁদের পলিটিক্যাল পার্টি কংগ্রেস এবং নেহেরু সরকারও অবহিত ছিলেন এবং তদনুযায়ীভাবে প্রস্তুতও ছিলেন।

গান্ধী-নেহেরুর ভক্ত পি সি যোশীর নেতৃত্বে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি '৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের মহোৎসবে সামিল হয়েছিস, এবং পশ্চিমবঙ্গেব সেক্রেটারী ভবানী সেন ফতোয়া দিয়েছিলেন, সর্বত্র কমিউনিষ্ট পার্টিব অফিসে কংগ্রেসী ঝাণ্ডা ওড়াতে হবে, তার পাশে কমিউনিষ্টদের লাল ঝাণ্ডাও ওড়াতে হবে, কিন্তু জনগণের তরফ থেকে আপত্তি হলে লালঝাণ্ডা নামিয়ে ফেলতে হবে। আর যদি কোন কমিউনিষ্ট তেরঙা ঝাণ্ডা ওড়াতে দ্বিধা করে, তা হলে সে প্রতিক্রিয়াশীল বলে গণ্য হবে।

কমিউনিষ্ট অ-কমিউনিষ্ট, সচেতন অচেতন সমগ্র চাষা-মজুর শ্রেণী আশা করেছিল, এইবার তাদের দুর্বিষহ জীবনের বিড়ম্বনার অন্তত কিছুটা আসান হবে। কিন্তু তার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। সুতরাং তাদের দাবী দাওয়ার আন্দোলন দেখতে দেখতে প্রব হয়ে উঠলো, এবং ধর্মঘটের হিড়িকও শুরু হল। কমিউনিষ্ট পার্টি স্বভাবতই এ-স আন্দোলন ও ধর্মঘটে প্রধান নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করলো। ক্রমে পুঁজিপতি-সর দমন নীতি ও নির্যাতন শুরু করলে। শ্রেণী-সংঘর্ষ সুস্পষ্ট ও ব্যাপক হয়ে উঠলো।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৪৭ সালেই এসেছিল সবচেয়ে বড় ধর্মঘট জোয়ার। সরকারী হিসাব মতেই, ধর্মঘট ও লক-আউটের ফলে মোট এক কো সাড়ে ষাট লাখ কাজের দিন নষ্ট হয়েছিল। শুধু বাংলা দেশেই এই সংখ্যাটা ছি প্রায় ৬০ লাখ। এই সব অর্থনৈতিক ধর্মঘট ছাড়াও ১৯৪৭ সালে সারা ভারতে ২১৬ রাজনৈতিক ধর্মঘট হয়েছিল, তাতেও অংশগ্রহণ করেছিল প্রায় ২৬৮,০০০ শ্রমিক, এবং তাতে কাজের দিন নষ্ট হয়েছিল প্রায় ৬ লাখ।

১৯৪৮ সালেও প্রথম তিন মাসেই অর্থনৈতিক কারণে ধর্মঘট হয় ৪১৪টি, এবং তাতে কাজের দিন নষ্ট হয় প্রায় ৪০ লাখ। বাংলা দেশে এর অংশ '৪৭ সালের তুলনায় আরো বেশী ছিল। এই ধর্মঘটের লড়াই ক্রমেই বেড়ে চলেছিল, বিশেষত বাংলা দেশে। সুতরাং এই সময়ে সরকারী দমনযন্ত্রকে আরো জোরদার করা হল পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন পাশ করে।

এই নতুন সরকারী আক্রমণের প্রতিবাদে কমিউনিষ্ট পার্টি ও তাদের ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে কলকাতা ও সহরতলীর এক লাখ শ্রমিক একদিনের জন্যে ধর্মঘট করে। এই রাজনৈতিক ধর্মঘটের সময় থেকে শ্রমিক আন্দোলনের অ-কমিউনিষ্ট দলগুলো কমিউনিষ্ট পার্টির প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করতে থাকে এবং শেষ পযন্ত তারা হয়ে দাঁড়ায় সরকারী দমন-নীতির সহায়ক ধর্মঘট ভাঙ্গার হাতিয়ার স্বরূপ।

এই অবস্থায় ১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হয় এবং সরকার কমিউনিষ্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বিনা বিচারে বন্দী করতে শুরু করে। কমিউনিষ্ট পার্টি গা-ঢাকা দেয়। তখন বাংলার পুলিসমন্ত্রী ছিলেন কট্টর কমিউনিষ্ট-বিরোধী কিরণশঙ্কর রায়।

কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ডেকার্স লেনের বিরাট অফিস, "স্বাধীনতা" কাগজের অফিস ও প্রেস, বইয়ের দোকান ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, রেড এড হসপিটাল, সবই পুলিস সীল করলে। লোকে মনে করেছিল এর ফলে দেশজোড়া শ্রমিক বিক্ষোভ ফেটে পড়বে, কিন্তু কিছুই হল না। চাষা-মজুররা যেন হকচকিয়ে গিয়েছিল।

বোধ হয় শ্রীনেহেরুও একটা দেশজোড়া শ্রমিক বিক্ষোভ আশা করেছিলেন। একটা গল্প শোনা গিয়েছিল, তিনি নাকি দিল্লী থেকে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে টেলিফোনে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সে সময়ে কিরণশঙ্কর রায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ রায় শ্রীনেহেরুকে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলেন। নেহেরু কিরণশঙ্করকে বলেন, তোমার সাহস আমার চেয়ে বেশী। কিরণশঙ্কর জবাব দেন, আপনার জনপ্রিয়তা আছে, সুতরাং

জ- প্রিয়তা হারাবার ভয়ও হয়ত আছে, কিন্তু আমার ও দুটোর কোনটাই নেই।—যেমন স্বচ্ছ দৃষ্টি, তেমনি স্পষ্ট কথা।

ইতিমধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যেই একটা বিরাট ওলটপালট হয়ে গেছে। ধর্মঘটের ...য়ের মুখে যোশীর লড়াই-বিমুখতার ফলে পার্টি আবিষ্কার করে ফেলেছে, যোশী ...াদবিরোধী চূড়ান্ত সংস্কারবাদী, এবং এতকাল ধরে পার্টির নাকে দড়ি দিয়ে সে ...জমের রাস্তায় ঘুরিয়ে পার্টির দফা রফা করেছে। স্বাধীনতা, নেহেরুর প্রগতিশীলতা, ... সব বিরাট ভুয়ো কথায় পার্টি এতদিন বিশ্বাস করে এসেছে যোশীর পাল্লায় পড়ে।

সুতরাং '৪৮ সালের গোড়াতেই যোশীকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে তারা রণদিভেকে জেনারেল সেক্রেটারী করেছে এবং রিফর্মিজমের পথ ছেড়ে "রেভোলিউশনারী ওয়ে" ধরেছে। এবং তারপর থেকে পার্টির মধ্যে বিরাট ও বিপুল মতভেদের হুড়োহুড়ি লেগে গেছে।

হুড়োহুড়ি মানে, মতভেদ বহুমুখী, এবং ঘরোয়া লড়াইয়ের ফল বাইরে শ্রেণী সংঘর্ষ এবং সরকারী দমননীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ওপরও ফলছে। আটফাটা পার্টির বিভিন্ন গ্রুপ একে অন্যের বিরোধিতা করে, মার্কসবাদ ও রুশ চীন নিয়ে যার মাথায় যত বিদ্যের বোঝা ছিল, সকলে তা উজাড় করে সকলের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করছে, নানা রকমের উল্টোপুল্টো থীসিস এবং "পোলেমিক" এর (যুক্তিতর্কের) লড়াইয়ে কে কত লম্বা—১০, ২০, ৫০, ১০০ পাতা—লিখতে পারে তার কম্পিটিশন লেগে গেছে।

রেভোলিউশনারী-ওয়ে ধরা হল তো প্রশ্ন উঠলো,—রাশিয়ান ওয়ে, না, চায়না ওয়ে? শত শত পাতা লেখা চালাচালি হল, আমাদের দেশের অবস্থার সঙ্গে কোথায় রাশিয়ার বা চায়নার সঙ্গে কতটা মিল আছে বা অ-মিল আছে। তার সঙ্গে আমাদের দেশের অবস্থা সম্বন্ধেই ধারণার বিভিন্নতা মিলে পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রামটা দাঁড়ালো তেএঁটে।

জেনারেল সেক্রেটারী রণদিভে রাশিয়ান-ওয়ের প্রবক্তা। তিনি বলেন, আমাদের দেশের বুর্জোয়ারাই এখন সরকারী ক্ষমতা পেয়েছে, সুতরাং বুর্জোয়া-বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই আমাদের কাজ, এবং শ্রমিক শ্রেণীই সে বিপ্লবের শক্তি, কাজেই সহরে ও শিল্পকেন্দ্রে শ্রেণী সংঘর্ষই তার প্রধান পন্থা, যা রুশিয়ার বিপ্লবে হয়েছে।

তাঁর বিরোধীরা রিফর্মিজমের পথ ছাড়ার কল্যাণে ঠিক করলেন, স্বাধীনতাটা ভুয়ো, সুতরাং ভারতীয় ধনিকরা আসল ক্ষমতা পায় নি, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই এখনো অপ্রত্যক্ষ ভাবে ভারত শাসন করছে, সুতরাং তারাই এখনো প্রধান শত্রু, তাদের হাতিয়ার ফিউড্যালিজম্, জমিদার-শ্রেণী। কাজেই বুর্জোয়া-বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবস্থা এখনো আসেনি। আমাদের এখনো লড়তে হবে ইম্পিরিয়ালিজম ও ফিউড্যালিজমের বিরুদ্ধে এবং চীনের মতন জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে আমাদের এখনো জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।

তার জবাবে কথা উঠলো, চীন "আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের" বিরুদ্ধে লড়েছে, এবং তাদের বিরোধী "জাতীয় বুর্জোয়াদের" সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। আমাদেরও তাই করতে হবে।

তার জবাবে কথা উঠলো, চীনে শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে চারটে বড় বড় হাউস—সুং, কুং

প্রভৃতি সরকারী ক্ষমতারও মালিক, তাই তাদের বুরোক্রেটিক বুর্জোয়া বলা হয়েছে। তাদের নীচেকার স্তরের বুর্জোয়ারা অনেকখানি নীচে, ছোট ছোট কাজ-কারবারের মালিক, ওপরতলার চার হাউসের সঙ্গে তাদের স্বার্থের কোনো মিল নেই, তাই তাদের জাতীয় বুর্জোয়া বলা হয়েছে। আমাদের দেশে এই রকম বড় ফারাকওয়ালা স্তর নেই। আমাদের দেশে বুরোক্রেটিক কারা, জাতীয় কারা ?

তখন ঠিক হল, বৃহৎ পুঁজিপতিদের একটা দল, যারা সাম্রাজ্যবাদীদের দলে ভিড়ে গেছে; তাদের সঙ্গে কাজ-কারবারে জড়িয়ে তাদেরই মতন ছোট বণিকদেরও শোষণ করে, তাদের বিরুদ্ধেও লড়তে হবে। এই অস্পষ্টতা ও গোজামিল, অর্থনীতি বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই পাণ্ডিত্যের বাগাড়ম্বর কাজের ক্ষেত্রে কোনো সঠিক নির্দেশ দিতে পারে না। পার্টির ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইউনিটের এক প্রোফেসর (অজিত রায়) বললেন, শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে নাগপাশ বিস্তার করে যে একচেটিয়া পুঁজিপতির দল সমাজের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করে, তারাই ঐ সাম্রাজ্যবাদী এবং ফিউড্যাল জমিদারদের সগোত্র এবং জনগণের শত্রু।

কিন্তু পার্টি নেতৃত্বের অর্থনৈতিক পাণ্ডিত্য তাঁকে পাত্তা দেন না, ভারতে মনোপলি ক্যাপিট্যাল এখনো গজায়নি। শেষে অজিত রায় স্বাধীনভাবে এক বই লিখে বাজারে ছেড়ে দেখালেন, ভারতে মনোপলি ক্যাপিট্যাল কেমনভাবে কতখানি গড়ে উঠেছে এবং দিন দিন শশিকলার মতন বেড়ে উঠছে, কতগুলো বড় বড় ভারতীয় ধনিকগোষ্ঠী কতগুলো বড় বড় ব্যাঙ্কের পরিচালক, কত ডজন ডজন বড় বড় শিল্পের ডিরেক্টর এবং দেশী-বিলাতী কত শিল্প-ব্যবসায়ে এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ।

তারপরে পার্টি ঠিক করলে, আমাদের শত্রু দুটো নয়, তিনটে, ইম্পিরিয়্যালিজম এবং ফিউড্যালিজমের সঙ্গে মনোপলি ক্যাপিট্যালও বটে।

কিন্তু চায়না-ওয়েই যদি ওয়ে হয়, তাহলে সংগ্রামের মূল শক্তি কৃষক, মূলকেন্দ্র গ্রামাঞ্চল, এবং সরকারী হামলার প্রতিরোধ, সশস্ত্র সংগ্রাম পর্যন্ত। এই আদর্শের ফলেই গড়ে উঠেছিল তেলেঙ্গানা। গ্রামাঞ্চলে এইরকম ঘাঁটি থাকলে সহর ও শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিকদের লড়াইয়েরও একটা মস্ত সুবিধে হবে এই যে, সহরে সরকারী হামলায় পর্যুদস্ত হলে জঙ্গী মজুররা এই সব গ্রামাঞ্চলের ঘাঁটিতে আশ্রয় নিতে পারবে এবং তাদের সাহচর্যে গ্রামাঞ্চলের জঙ্গী কৃষকরাও আধুনিক ধরনে লড়াই চালাবার কায়দাও শিখতে পারবে।

এই ভাবে লড়াই এগিয়ে চলবে, যতদিন না সশস্ত্র বিপ্লব করে ক্ষমতা দখলের অবস্থা পেকে ওঠে। ইতিমধ্যে সহর বা শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের লড়াই সশস্ত্র সংগ্রাম ও ক্ষমতা দখলের দিকে যাবে না।

কিন্তু জেনারেল সেক্রেটারী রণদিভে তা মানতে চান না। ওদিকে চায়না-ওয়ে ওয়ালারা গ্রামাঞ্চলে ছোট বড় রেড পকেট তৈরী করে চলেছেন। ক্ষেতমজুররা হয়েছে সংগ্রামের প্রধান শক্তি, তাদের ধর্মঘটও শুরু হয়েছে। তাঁদের সহযোগী বলে ধরা হয়েছে গরীব চাষাদের, এবং শত্রু বলে ধরা হয়েছে জমিদার জোতদারদের সঙ্গে ধনী বা সম্পন্ন কৃষকদের তো বটেই, এমন কি মাঝারী স্তরের কৃষকদেরও।

খাদ্যাভাবে জর্জরিত নীচের স্তরের লোকগুলো খেটে-খুটে যে ধানের চাষ করে, তার অনেকখানি গিয়ে জোতদার ও বড় চাষীদের গোলায় ওঠে। সংগ্রামী গরীব চাষা ও

ক্ষেতমজুররা মাঠ থেকে ধান কেটে আনার চেষ্টা করে, জোতদারদের দলবল বাধা দেয়, দাঙ্গা হয়, জোতদারেরা ধান কেটে নিয়ে গেলে সংগ্রামী বুভুক্ষু চাষা ও ক্ষেতমজুররা সেই ধান লুঠ করে আনে, জোতদারেরা পুলিস ডাকে, পুলিস গুলী চালায়, পুলিসের সঙ্গে চাষাদের লড়াই হয়, নতুন সশস্ত্র পুলিস এসে সংগ্রামী চাষাদের বাড়ীঘর ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড করে দেয়, নির্বিচারে চাষাদের গ্রেপ্তার করে, মারে, পুলিস আসার খবর পেয়ে পুরুষরা পালায়, পুলিস এসে মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে, ক্রমে মেয়েরাও স্থানে স্থানে প্রতিরোধে নামে রাত্রের অন্ধকারে হঠাৎ দেখা যায় জোতদারদের ঘরে আগুন লেগেছে, মধ্যচারী চাষাদের ওপরও গরীবরা হামলা করে, তারা বড় চাষী এবং জোতদারদের দিকে সরে যায়। এই রকমের সংগ্রাম বহু স্থানে গ্রামাঞ্চলে চললো কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে এবং শেষ পর্যন্ত চাষারা কোণঠাসা হল এবং পরাজিত হল।

এই পদ্ধতির বিরোধীরা তখন রুশিয়ার নজীর দিয়েই প্রমাণ করে দিলে, সেখানেও বিপ্লবের দুটো ধাপ ছিল, প্রথম ধাপের কাজ বুর্জোয়া ডেমোক্রেটিক রেভোলিউশন সম্পূর্ণ করা, এবং সে ধাপে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর মূল মিত্রশক্তি সমগ্র কৃষক শ্রেণী, আর দ্বিতীয় ধাপ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, এবং তার সংগ্রামে ছোট কৃষক এবং ক্ষেতমজুর প্রধান মিত্রশক্তি, ধনী চাষাদের জমিদার জোতদারের দোসর বলে গণ্য করা এবং মাঝারী চাষাদের নিষ্ক্রিয় করা।

আমাদের দেশে এই প্রথম ধাপটার অবস্থা, সুতরাং যা করা হয়েছে, তা ভুল। অতি বামপন্থী বাহাদুরী মাত্র, তাই হার হয়েছে, আন্দোলনই বানচাল হয়ে গেছে।

যোশী ছিল সরকারী হামলার সামনে প্রতিরোধেরই বিরোধী এবং তাই তেলেঙ্গানারও বিরোধী। রণদিভে সর্বত্র প্রতিরোধের বিরোধী নয় কিন্তু গ্রামাঞ্চলে প্রধান সংগ্রামের ক্ষেত্র, এই নীতির বিরোধী এবং তাই তেলেঙ্গানারও বিরোধী।

প্রতিরোধপন্থীদের কথা হল যোশী সংস্কারবাদী, আর রণদিভে অতিবামপন্থী বাহাদুরীবাদী। দুটো ভুলেরই ফল এক। প্রতিরোধের সংগ্রাম হল বিপ্লবের রিহার্স্যাল, পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে উন্নততর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে এগোতে হবে, তবে না একদিন বিপ্লব সম্ভব হবে।

তারা নজীর দেখিয়ে নিজেদের কথার প্রমাণ দিলে, যোশীপন্থী কেরালা পার্টি সরকারী হামলার প্রতিরোধ না করেই সরে পড়েছিল, তার ফলে সেখানে পার্টির ইজ্জৎ গিয়েছিল, সভ্যসংখ্যাও কমে গিয়েছিল এবং গণআন্দোলনও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। পক্ষান্তরে অন্ধ্রপার্টি প্রতিরোধ-পন্থী বলে, সেখানে তারা সরকারী হামলায় দলে দলে জেলে গিয়েও, গুলী খেয়ে দলে দলে জখম হয়ে এবং মরেও সফল হয়েছিল, পার্টির ইজ্জৎ ও সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং গণ-আন্দোলন আরো জোরদার হয়েছিল।

তারপর হায়দ্রাবাদে ভারতীয় সৈন্য গিয়ে যখন তেলেঙ্গানার কৃষক রাজত্ব ধ্বংস করলে, তখন কমিউনিষ্ট পার্টি নেহেরুর নাম দিলে **Fascist Nehru, The Servitor of British Imperialism**—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের গোলাম ফ্যাসিষ্ট নেহেরু।

কলকাতায় বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাদের এক প্রতিবাদ মিছিলের ওপর পুলিশ হামলা করলে (১৪৪ ধারা জারি করে মিটিং-প্রোসেশন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল

বলে) পুলিসের ওপর এক বোমা পড়ে। এবং পুলিস গুলী চালিয়ে পাচজন মহিলাকে নিহত করে।

কমিউনিষ্ট ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে ইউনিভারসিটি ও কলেজের ছাত্রেরা প্রতিবাদ মিছিল করতে রাস্তায় বেরুলে পুলিসের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে, রাস্তায় ব্যারিকেড করে বোমা ও গুলীর যুদ্ধ হয়, মুখ্যমন্ত্রীর নাম হয় খুনী বিধান রায়, দিনের পর দিন কমিউনিষ্টদের বে-আইনী পত্রিকায় ধিক্কার চলে, এক কাগজ বে-আইনী ঘোষিত হলে ভিন্ন নামে কাগজ বেরোয়, ছাপাখানার নাম থাকে না, কাগজ ছাপা হয় গুপ্তভাবে। ফেরারী কমিউনিষ্টদের গুপ্ত আড্ডায় বোমা তৈরী হয়, অ্যাসিড বাল্‌ব তৈরী হয়, তাই নিয়ে চলে পুলিসের সঙ্গে লড়াই। এর নাম রেভোলিউশনারী ওয়ে, যার ফতোয়া দিয়েছিলেন ভবানী সেন "শেষ আঘাত হানো" বলে।

জেনারেল সেক্রেটারী রণদিভে পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক সাংগঠনিক নীতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে খাঁটি হিটলারী পদ্ধতিতে পার্টির নেতাদের দাবিয়ে দেওয়া এবং পদচ্যুত করা, পলিটব্যুরো বা সেনট্রাল কমিটির সঙ্গে পরামর্শ না করেই নিজের নামে খুসীমত 'আদেশ-নির্দেশ চালাতে থাকেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের নেতাদের সমালোচনা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, চেপে দিয়ে সমগ্র দেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে প্রায় একাই ম্যানেজ করতে থাকেন। বিতাড়িত হওয়ার ভয়ে প্রাদেশিক নেতাদের দু-এক জন তাঁর দোসররূপে নিজ নিজ এলাকার হিটলার হয়ে ওঠেন। বাংলার এমনি দুজন নেতা ছিলেন রবি ও গৌর—(ছদ্মনাম) রবি প্রাদেশিক হিটলার, গৌর তার দোসর।

এর মধ্যে কলকাতায় (ওয়েলিংটন স্কোয়ার) দক্ষিণ-পূব এশিয়া যুব সম্মেলনে যুগোশ্লাভিয়ার কয়েকজন যুবক নিমন্ত্রিত ফ্রেটারন্যাল ডেলিগেটরূপে আসেন এবং তাদের নিয়ে অসম্ভব রকম ঘটা করা হয়। সভায় মার্শাল টিটোর নাম উঠলেই তুমুল হর্ষধ্বনি চলতে থাকে। তারপর যখন রুশিয়ার কর্তাদের সঙ্গে টিটোর বিবাদ বাধে এবং টিটোকে কমিনফর্ম থেকে বয়কট করা হয়, তখন থেকে প্রচার শুরু হয়, টিটো একজন ইম্পিরিয়্যালিষ্ট স্পাই। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিও কোমর বেঁধে ঐ কথা প্রচার করতে থাকে।

ভিয়েৎনাম তখনও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। সেখান থেকে একদল যুবক প্রতিনিধি গোপনে পলায়ন করে কলকাতার সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিল। তাদের নিয়েও ঘটা হয়েছিল। এবং সম্মেলনে ছাত্র-কংগ্রেসের "বোস গ্রুপ" নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্রের দল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতাজীর কার্যকলাপের প্রশংসা করে এক প্রস্তাব আনলে কমিউনিষ্ট ছাত্র ফেডারেশনের দল যখন তাদের পুরানো ঐতিহ্য অনুসারে তার বিরোধিতা করে, তখন গণ্ডগোল বেধে সভা পণ্ড হয় এবং প্যাণ্ডালে আগুন লাগাবারও চেষ্টা হয়।

তারপর ডিকসন লেনে এক বাড়ীতে ভিয়েৎনাম ডেলিগেটদের সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা হলে সেখানে এক সশস্ত্র হামলা হয় এবং দুজন কমিউনিষ্ট আততায়ীর গুলীর আঘাতে নিহত হয়। তাদের একজন ছিল লেডী অবলা বসুর পালিত পুত্র। সে খুনের কোন কিনারা হয় না।

বাংলার কমিউনিষ্ট হিটলার বেপরোয়া ফতোয়া দিলেন, জেলে কমিউনিষ্টরা বসে খেয়ে খেয়ে বাবু হয়ে যাচ্ছেন, এটা ভাল কথা নয়, তাদেরও জেলের মধ্যেই লড়াই করা দরকার।

সুতরাং সে লড়াই হলও, এবং বন্দী কমিউনিষ্ট কয়েকজন গুলীর আঘাতে নিহতও হল, বহু জন আহতও হল। মেয়ে কমিউনিষ্ট বন্দীরাও এ লড়াই থেকে বাদ যায়নি।

বাংলার হিটলারের ক্ষমতা এত বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে, তিনি এক থীসিস লিখে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, মাও-সে-তুং চীনের বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। কারণ তিনি সর্বতোভাবে রুশিযার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নি। আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট কাগজগুলোতে তার কড়া সমালোচনা বেরোতে পরে 'হিটলারকে' মাপ চাইতে হয়েছিল।

বুর্জোয়া জগতে তখন মাও এশিয়ার টিটো বলে গণ্য। বৃটেন তার হংকংএর ব্যবসার ঘাঁটি বাঁচাবার জন্যে নয়া চীনকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর শ্রীনেহেরুও স্বীকৃতি দিয়ে বলেছিলেন, পাছে মাও সর্বতোভাবে রুশিয়ার সঙ্গে মিলে যান, তাই তিনি তাকে আগলে রাখার জন্যেই স্বীকৃতি দিচ্ছেন।

যাই হোক, প্রোলেটারিয়্যান রেভোলিউশনের দফা রফা হয়ে গেল। এর সঙ্গে আর এক আন্তর্জাতিক ব্যাপারের চমৎকার এক কাকতালীয় সম্পর্কও দেখা গেল। ভারতে কমিউনিষ্ট পার্টি যখন রিফর্মিষ্ট ওয়ে ছেড়ে রেভোলিউশনারী-ওয়ে ধরছে, তখন দেখা গেল মস্কো থেকে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত লয় হেণ্ডারসন ভারতে বদলী হলেন। কমিউনিষ্ট আন্দোলন ও সোভিয়েট বিরোধী প্রচার ও সংগঠন কাযে তিনি আমেরিকার রাষ্ট্র বিভাগের পয়লা নম্বর বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত।

তাঁর আমলেই কমিউনিষ্টদের বিপ্লবের পথ ধরাটা অ্যাসিড বাল্‌ব কেলেঙ্কারীতে পযবসিত ও বানচাল হল। তারপরই তিনি বদলী হলেন ইরানে, তখন প্রধান মন্ত্রী মোসাদ্দেক তৈলশিল্প জাতীয়করণের জন্যে লড়ছেন। লয় হেণ্ডারসনের আমলেই মোসাদ্দেকের পতন হল এবং জেনারেল জাহিদীর সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। আবার ঠিক তার পরেই লয় হেণ্ডারসন আমেরিকায় ফিরে গেলেন এবং "মূল্যবান কাজের জন্যে" রাষ্ট্রীয় প্রশংসা ও সম্মান পেলেন।

এদিকে কমিউনিষ্ট রাজ্যে রণদিভে গোষ্ঠীরও পতন হল। পদচ্যুত নেতাদের বাধ্যতামূলক আত্মসমালোচনায় তাঁরা প্রায় এক বাক্যে বললেন, আমি মার্কসবাদও ভাল বুঝি না, আর আমার স্বভাবেও মধ্যবিত্ত-সুলভ ব্যক্তিগত বাহাদুরীর দুর্বলতা আছে এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের আদর্শও বদ্ধমূল, তাই আমি এত ভুল এবং অপকর্ম করেছি।

এ হল '৫০ সালের কথা। তখন শ্রীনেহেরুর সবতোমুখী সাফল্যে ভারতবাসী গদগদ —'৫২ সালের ইলেকশনের প্রস্তুতি পর্ব আসন্ন। পক্ষান্তরে পরাজিত কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা জেলে পচছেন, আর নিরুপায় গবেষণায় দিনগত পাপক্ষয় করছেন। অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পযন্ত তাঁরা এ অচল অবস্থার অবসানের এক অভিনব উপায় স্থির করে ফেললেন। '৫২ সালের ইলেকসনে দাঁড়াতে হবে, এবং তার জন্যে গত ৪ বছরের পার্টি-ইতিহাসকে একটা দুঃস্বপ্নের মতন করে মন থেকে মুছে ফেলে '৪৭ সালে ফিরে যেতে হবে।

এরপর পার্টি নেহেরুর কাছে বৈধ পার্লামেণ্টারী পথে চলার মুচলেকা দিয়ে মুক্তি পেলো, নেহেরু আবার হলেন পার্টির হিরো। আমার বিপ্লবের সন্ধানও শেষ হল।

সমাপ্ত

নির্ঘণ্ট